

পূজাবার্ষিকী ১৪৩০

আনন্দলোক





K's

Books & Magazines





K's

Books & Magazines





পূজা বার্ষিকী ১৪৩০

আনন্দলোক

সম্পাদকীয়

১৭



উপন্যাস

ইউক্রেনের দিনগুলিতে প্রেম:
ইন্দ্রনীল সান্যাল

৩৯

ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে
প্রথমবার যুদ্ধের সম্মুখীন হয়
ভারতীয় ছাত্ররা। যে-কোনও
মুহুর্তে যেতে পারে প্রাণ। দেশে
ফিরতে পারবে রুহি, অহম,
আয়েশা, সমুদ্ররা?





অলিগলির কথামালা: রূপক ঘটক

১৫৩

দেশ আর নদীর আইনি বিয়ের পরই শুরু হয়
গোলমাল। নদী কেবলই চায় বিয়েটা ভাঙতে। এ
দিকে দেশের বন্ধু দ্বিভু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে ঘরে
বসে যায়! দেশের বালকাবাসের রাঁধুনি ঠাকুর
মোহরদাও কার অপেক্ষায় বসে থাকে জীবনভর?



দ্বীপান্তরের দিনলিপি: সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২৭

রেনবো কোম্পানির আর্থিক তহরুপের জেরে
শহর ছাড়তে বাধ্য হয় শৈলেন। এদিকে
বিপাশাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যায় চিত্রা।
কী কারণ লুকিয়ে আছে নেপথ্যে?

প্রহর শেষের আলোয়: নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

২৬৪

শিজিনীর ডাক্তার স্বামী রূপক মজেছে তার
সহকারী ময়ালীর শরীরে। ওদিকে লেখক
নবারুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠছে
শিজিনীর! এই চার কুশীলবের জীবন এবার
বইবে কোন খাতে?





৭৩

নব আনন্দে জাগো

এমনিতে শাড়ি পরেন না।
কিন্তু আনন্দলোক-এর
জন্য শাড়ি শুটের প্রস্তাব
বেশ খোশমেজাজেই
গ্রহণ করলেন বলিউডের
নতুন সেনসেশন **নোরা**
ফতেহি

রকুল প্রীতের শাড়ি প্রীতি

আনন্দলোক-এর
পুজোসংখ্যার জন্য উৎসাহ
নিয়ে শাড়ি পরে শুট
করলেন অভিনেত্রী
রকুল প্রীত সিংহ

৭৭





লখনউয়ের বাঙালিবারু

উত্তরে জন্ম, পশ্চিমে কর্ম। কিন্তু

আলি ফজল

মনে-মনে বেশ বাঙালি।

আনন্দলোক-এর জন্য বাঙালি

সাজে ধরা দিলেন মির্জাপুরের

গুড্ডু ভাই।

৮১



১৮

উন্নতি করতে হলে, ‘আমি’
থেকে ‘আমরা’ হয়ে উঠতে
হবে: দীপিকা পাডুকোন

অকপট সাক্ষাৎকারে ধরা দিলেন
বলিউডের অন্যতম সেরা
অভিনেত্রী।



৩৪

সাফল্যের কৃতিত্ব কিংবা
ব্যর্থতার দায়, দুটোই আমার:
রণবীর কপূর

তাঁর নিজস্ব কোনও
ম্যানেজার নেই। তাই
হয়তো এত মন খুলে
সাক্ষাৎকার দিতে
পারেন এই
কপূর কুলপ্রদীপ।

আমার অনেকের কাছে
অনেক কিছু প্রমাণ করার
ছিল: করণ জোহর

তিনি সচারচর সাক্ষাৎকার
দিতে চান না। সম্প্রতি
মুম্বইতে ‘রকি রানি কী
প্রেম कहानी’র সাফল্য
উদযাপনের অনুষ্ঠানে,
কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই
মিলে যায় তাঁর সঙ্গে কথা
বলার সুযোগ।

৮৫





সা ক্ষা তে

অথ শাস্ত্রত কথা
বিশ্বাস করেন না
মাল্টিটাস্কিংয়ে। মনে
করেন, একসঙ্গে একাধিক
কাজ করলে কাজের মান
খারাপ হয়। কীভাবে তৈরি
হল **শাস্ত্রত চট্টোপাধ্যায়**-
এর অভিনেতা সত্তা?

৯৫



গ ল্প ন য়



২৩

সংসার সুখী হয়
দু'জনের গুণে
রণবীর কপূর-আলিয়া
ভট্ট থেকে ভিকি কৌশল-
ক্যাটরিনা কাইফ...
হালফিলে বলিউডের
সেলেব দম্পতিরা তৈরি
করছেন এক সিগনেচার
স্টাইল!



২৮

তারকা যখন প্রযোজক

তাঁরা ‘তারকা’। কলটাইমে সেটে যাবেন, শুটিং করবেন, শুটিং শেষে পার্টি। নো হেডেক। এটাই দস্তুর। কিন্তু এখনকার তারকারা প্রযোজকদের শত সমস্যার কথা জেনেও, হাতে নিচ্ছেন সেই কাজই! আসছেন প্রযোজনায়। নিচ্ছেন হাজারো ঝক্কি! কিসের মোহে?

আপনজন

দর্শকই ফিল্ম
সেলেবদের
‘পরিবার’। তবে
সত্যিকারের পরিবার-
পরিজনদের প্রতি
কতটা যত্নশীল
এই সেলেবরা?
পরিজনদের কতটাই
বা কাছের মানুষ
তাঁরা?

১২৫





গল্প নয়

ব্রহ্মাণ্ড-এ মজে বলিউড

ফ্র্যাঞ্চাইজ থেকে ধীরে-
ধীরে সিনেম্যাটিক
ইউনিভার্স তৈরির দিকে
ঝুঁকছে বলিউড। এবং
শুধু সিনেমায় নয়, ওটিটি
প্ল্যাটফর্মেও সেই একই ট্রেন্ড
প্রবেশ করেছে গুটি-গুটি
পায়ে।

১৮৫



সপ্তক



৯১

বল্লে বল্লে বলিউড

হিন্দি ছবি এবং গানের ইন্ডাস্ট্রি ভর করে আছে পঞ্জাবি গানের শক্ত
ডানায়। নাকি পঞ্জাবের ডানা শক্ত করাতে রয়েছে বলিউডেরই ভূমিকা?



১৪৮

সাহসী এক সুন্দরী

কেরিয়ারের প্রথম ছবিতেই
নগ্ন দৃশ্যে অভিনয়! কুখ্যাত
মাফিয়া ডনের সঙ্গে প্রেম,
কেরিয়ারের মাঝপথে সব
ছেড়ে বেরিয়ে আসা...
এরকম নায়িকাকে
সাহসী বলবেন না তো
কাকে বলবেন? একান্ত
আলাপচারিতায় মন্দাকিনী



২০৯

আরতি সমীপে

একটা সময় ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গানের জন্য
মুন্সই-কলকাতা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। কিন্তু আরতি
মুখোপাধ্যায় হঠাৎ চলে গেলেন অন্তরালে! কেন?



ও টি টি F L A S H

মুঠোয় ধরা চাঁদ

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম না থাকলে কত
অভিনেতার স্টারডম যে অধরাই
থেকে যেত! তবে এখন দর্শক
চাইলেই মুঠোবন্দি করতে পারেন
এই তারকাদের

রাশি খন্না, বিজয় ভর্মা,
অপারশক্তি খুরানা, করিশমা তন্না,
ওয়ামিকা গাব্বি, সিদ্ধান্ত গুপ্ত,
জিম সর্ভ, রাধিকা মদন

২১৪



ও য়ে ব দু নি য়া



৩০৮

ওটিটি-র 'বাস্তবতা'

বাস্তবকে আধার করে তৈরি হচ্ছে
নানা ওটিটি সিরিজ। মানুষও যেন
সেগুলোই ভালবাসছেন বেশি।
কী হতে পারে এর কারণ?
সাধারণ মানুষের জীবন থেকেই
কি আজকাল অনুপ্রেরণা খুঁজে
পাচ্ছেন দর্শক?



অ ফ বি ট



২২২

ট্রোল সাম্রাজ্য ও তারকারা

বলিউড থেকে টলিউড,
সর্বত্র বিস্তৃত ট্রোল-সাম্রাজ্য।
ছোট-বড়-মাঝারি কোনও
তারকাই রেহাই পাননি
ট্রোলের হাত থেকে। কীভাবে
সামলান তাঁরা নেটমাধ্যমের
টক্সিসিটিকে?



টে লি ক থা



৩২২

গল্প যখন ছকভাঙা

কেউ শত বাধা পেরিয়ে গান গাইতে চায়। কেউ হতে চায় পুলিশ। কেউ
আবার রক্ষা করে জঙ্গল। শাশুড়ি-বৌমার কূটকচালি ছেড়ে বাংলা
সিরিয়ালে এখন আসছে ছকভাঙা মেয়েদের গল্প।

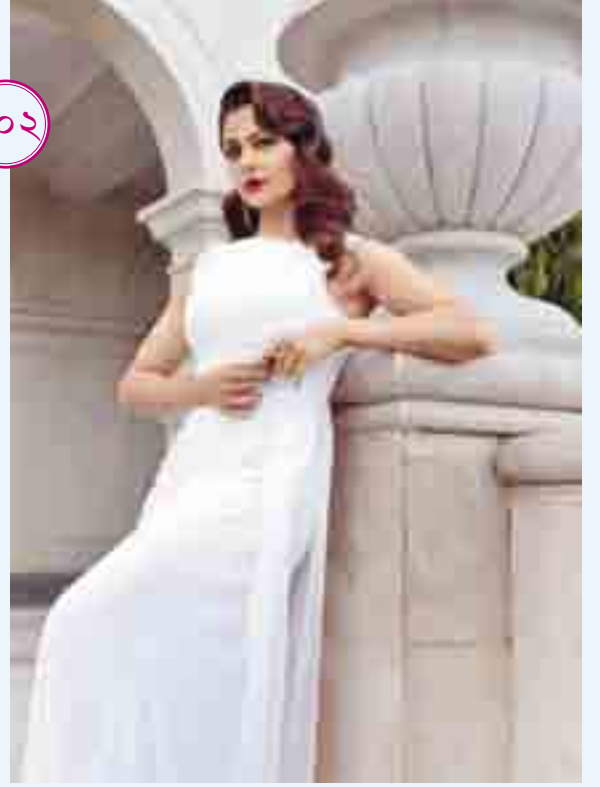


সুদূরের পিয়াসি

১০২

তাঁদের দূর থেকেই দেখতে হয়।
স্বপ্নসুন্দরী তাঁরা। তবে আনন্দলোক-এর
ফোটোশুটে নেমে এলেন মাটিতে

ঋতুপর্ণা, কোয়েল, শ্রাবন্তী, শুভশ্রী,
প্রিয়াঙ্কা, মিমি, নুসরত, সোহিনী,
পাওলি, জয়া, রাইমা, রুক্মিণী,
ঋতাভরী, তনুশ্রী, ইশা, কৌশানী,
মধুমিতা, সৌরসেনী, দর্শনা, তাসনিয়া,
নুসরত ফারিয়া, সুস্মিতা, মিথিলা



১৩১

নক্ষত্রের সমাবেশ

পরদায় চরিত্র অনুযায়ী তাঁদের ভিন্ন লুকে
দেখা যায়। কিন্তু এখানে টলি নায়করা
ধরা দিলেন গ্ল্যাম অবতারে

প্রসেনজিৎ, জিৎ, দেব, জিশু, আবির,
পরমব্রত, সোহম, ঋত্বিক, অক্ষুশ,
বনি, যশ, বিক্রম, অনিবার্ণ ভট্টাচার্য,
অনিবার্ণ চক্রবর্তী, অর্জুন, ওম, সত্যম



১৯১

কুইনস ম্যানসন

তাঁরা কেউ আইক্যান্ডি নন। এই
ফোটোশুটের পাতায় বলি নায়িকারা
ধরা দিলেন স্বমহিমায়

দীপিকা, আলিয়া, ক্যাটরিনা,
প্রিয়ঙ্কা, বিদ্যা, করিনা,
অনুষ্কা, তাপসী, কিয়ারা,
ভূমি, শ্রদ্ধা, জাহ্নবী, অনন্যা,
সারা, কৃতি, দিশা, সোনাক্ষী,
পরিণীতি

ভ্যালি অফ কিংস

বলিউডের প্রথমসারির তারকা
নায়কদের ভিন্ন লুকে খুঁজে পেল
আনন্দলোক

আমির, শাহরুখ, সলমন,
অজয়, অক্ষয়, সেফ, শাহিদ,
ঋত্বিক, রণবীর কপূর, রণবীর
সিংহ, বরুণ, আয়ুস্মান,
রাজকুমার, কার্তিক, সিদ্ধার্থ,
টাইগার, ভিকি

২৯১





৩১২

দক্ষিণ খোলা জানলা

দক্ষিণ ভারতীয় ছবিকে
অগ্রাহ্য করার আর
কোনও জায়গা নেই।
দক্ষিণী তারাদের
উপস্থিতি এখন আমাদের
প্রাত্যহিক বিনোদনের
সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।
সেই তারকাদের
ফোটোফিচার

রামচরণ তেজ,
রশ্মিকা মন্দানা,
সাই পল্লবী, অল্লু অর্জুন,
ধনুষ, সমাস্ত্রা
রুথ প্রভু, ফাহাদ ফাসিল,
বিজয় সেতুপতি,
দুলকর সলমান,
তমন্না ভাটিয়া





৩২৬

দেখে অবাক হয়ে যাই

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও,
ব্র্যাড পিট, কিলিয়ান
মার্কি, ড্যানিয়েল ক্রেগ,
ক্রিস হেমসওয়ার্থ,
ক্রিশ্চান বেল, ক্রিস
ইভান্স, রবার্ট প্যাটিনসন,
অস্টিন বাটলার, অ্যাডাম
গারফিল্ড

তুমি সুন্দর হে

অ্যান হ্যাথওয়ে, গ্যাল
গ্যাডট,
মার্গো রবি, স্কারলেট
ইয়োহানসন, ক্রিস্টান
স্টুয়ার্ট,
ব্রি লারসন, এমিলি ব্লান্ট,
ফ্লোরেন্স পিউ, জেন্ডায়া

৩৩৬



প্রচ্ছদ: দীপিকা পাডুকোন

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল
সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ সিপি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

Edited by Kausik Pal and printed and published by Pradipta Biswas
on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

RNI Regd No. 27039/74

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু
সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি,
সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা নিয়মবিরুদ্ধ।

সম্পাদকীয়



এই বঙ্গে তাঁকে দেবী নয়, প্রাণের মানুষ হিসেবে আরাধনা করা হয়। তাই তো প্রত্যেক বাঙালি সত্তার হৃদয়ে তাঁর প্রকাশ ভিন্ন। কারও কাছে তিনি পরিবারের মেয়ে, কারও কাছে ফসলদায়িনী। কেউ তাঁকে দেখেন রোগ হরণকারী শক্তি হিসেবে, কেউ আবার ডাকেন তিমিরবিনাশিনী বলে। শুধু দেবী মহামায়া নন, তাঁর হাতের প্রতিটি আয়ুধও প্রতীকী বার্তা বহন করে।

জগন্মাতার চালচিত্রে যেমন তাঁর পরিবারের সদস্যদের জায়গা থাকে, তেমন থাকে এই বিশ্বের ফুলে ফলে ভরে ওঠা প্রকৃতি ও প্রাণেরও। আমরা আশা করি, সৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্র এই এক চালচিত্রে জায়গা পাবে আগামী সময়ে। বৈরিতা, দ্বন্দ্ব থাকবে না, ভুবনমনমোহিনীর প্রাণপ্রাচুর্য সঞ্চারিত হবে তাতে।

এবারের আনন্দলোক পুজোসংখ্যায় আমরা তাই ধরলাম সেই বহুত্বের সমন্বয়কে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিশা খুঁজে পাচ্ছে বিনোদন জগৎ। দেবীর অস্ত্র ‘বয়কট গ্যাং’, ‘ট্রোল বাহিনী’র মতো অসুরের নিধন ঘটিয়ে সঞ্জীবনী সুখা দিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিকে। হিন্দি হোক বা বাংলা সিনেমা, হলমুখী হচ্ছে দর্শক, ‘বিগ টিকিট’ ছবির মাধ্যমে খুঁজে পাচ্ছে হতগৌরব। আসলে দেবীর হাতের বজ্র, দৃঢ়তা ও সংহতির প্রতীক... সেই সংহতির স্বপ্ন নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সিনেমা এবং ওটিটি। তবে মায়ের হাতের কালদণ্ডের বার্তা মেনে সৃষ্টির যাবতীয় ‘বিচার ও আনুগত্য’ ন্যস্ত হয়েছে দর্শকের উপর। কারণ শেষ কথা বলেন তাঁরাই। মায়ের

রূপের প্রকাশ যেমন তাঁদের হৃদয়ে, সৃষ্টির রূপরেখা নির্ণয়ও তাঁদেরই হাতে।

সেই বার্তা মনে রেখে এবারের শারদ আনন্দলোক আপনাদেরই অর্পণ করা হল।



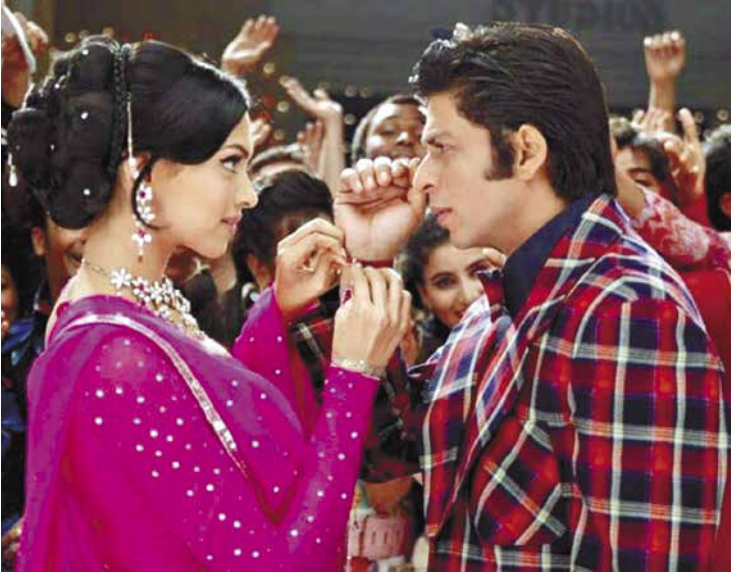
■ দীপিকা পাড়ুকোন

উন্নতি করতে হলে, ‘আমি’ থেকে ‘আমরা’ হয়ে উঠতে হবে: দীপিকা পাড়ুকোন

গত বছর ‘কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এ জুরি মেম্বর তো এবছরই অস্কার মঞ্চে প্রেজেন্টার! আবার তিনিই বাড়ির নীচে সজ্জিওয়ালার কাছ থেকে বেছে-বেছে কেনেন আনাজপত্র। তিনি দেশের অন্যতম বড় তারকা **দীপিকা পাড়ুকোন**। রণবীর সিংহর ঘরণি। তাঁর মুখোমুখি আসিফ সালাম

নায়িকাদের মধ্যে নাকি রেযারেসি থাকে। একে-অপরের সাফল্য তাঁরা নাকি হজম করতে পারেন না, হিংসের আগুনে জ্বলতে

থাকেন। এসবই চিরাচরিত কথা, বহু যুগ ধরে চলে আসছে। তবে নতুন সময়ের সঙ্গে পুরনো প্রথা ও ভাবনাচিত্তাকে দূরমুশ করে, আজকের দিনের



■ ‘ওম শান্তি ওম’ ছিল দীপিকার ডেবিউ ছবি, নায়ক শাহরুখ খান



■ ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’-র দৃশ্যে রণবীর কপুরের সঙ্গে দীপিকা

নায়িকাদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যটন তুলে নিয়েছেন দীপিকা পাডুকোন। তাই তো সম্প্রতি ‘রকি অউর রানি কী প্রেম কহানী’-তে আলিয়া ভট্টের পারফরম্যান্স দেখে ভরা সিনেমা হলে নেচে ওঠেন দীপিকা, আলিয়ার জন্য সিটি, হাততালিতে ভরিয়ে দেন! সেই নিয়েই শুরু হল আড্ডা...

রণবীর সিংহের সঙ্গে ‘রকি অউর রানি কী প্রেম কহানী’ দেখতে গিয়ে আপনি নাকি সিনেমা হলে আলিয়া ভট্টের জন্য ক্রমাগত সিটি ও হাততালি দিয়ে যাচ্ছিলেন!

এটা অস্বাভাবিক তো কিছু নয়। দর্শক হিসেবে আমাকে আলিয়া এন্টারটেন করেছে, তাই আমি আমার আনন্দ প্রকাশ করেছি। রণবীরের জন্যও তো হাততালি দিয়েছি। কেন দেব না?

না আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল,

“আমি আলিয়ার ভাল কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হই আর আমার বিশ্বাস ও-ও আমার কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়। আমরা একে-অপরের ভালটা নেওয়ার চেষ্টা করি।”

সাধারণত নায়িকাদের মধ্যে তো একটা রেয়ারেঞ্চি চলতে থাকে। বর্তমানে বলিউডে আপনি আর আলিয়া প্রায় একই জায়গায় রয়েছেন। তাই কম্পিটিশনের মনোভাব থাকাটাই তো স্বাভাবিক...

কম্পিটিশন তো আছেই, কিন্তু সেটা হেলদি কম্পিটিশন। আমি আলিয়ার ভাল কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হই আর আমার বিশ্বাস ও-ও আমার কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়। আমরা একে-অপরের ভালটা নেওয়ার চেষ্টা করি। এভাবেই তো একজন গ্লো করে। অন্যকে হিংসে করে বড় হওয়া যায় না।

সেটা ঠিক, কিন্তু আপনিও তো রক্তমাংসের মানুষ। কখনও মনে হয়নি করণ জোহর এই ছবিতে আলিয়ার পরিবর্তে আপনাকে নিলে ভাল হত?

একেবারেই না। ‘রানি’র চরিত্র আলিয়া ছাড়া আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারত না। ও এই চরিত্রের জন্য পারফেক্ট ছিল। আবার আমারও এমন অনেক ছবি আছে যেটা আমি ছাড়া অন্য কেউ করলে ততটা ভাল হত না।

এর আগে আপনার হলিউড যাত্রা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। ২০২২ সালে ‘কান চলচ্চিত্র উৎসব’-এ জুরি মেম্বর হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং ২০২৩-এ অস্কারের মধ্যে উপস্থাপক হিসেবে পদার্পণ... বিদেশের মাটিতে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার মধ্যে একটা আলাদা আবেগ কাজ করে নিশ্চয়ই?

তা তো করেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছি। এমনকি বিদেশের মাটিতে প্রবাসী ভারতীয়রা আমাকে নিয়ে যেভাবে উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন, তাতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। এমনিতে আমরা ভারতীয়রা কিন্তু খুব আবেগপ্রবণ। তাই হয়তো খেলার মাঠে প্রতিপক্ষ আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হলেও, মাঠে দর্শকের সমর্থন পেলে আমরা যে-কোনও প্রতিপক্ষকে হারানোর ক্ষমতা রাখি। তবে এখানে আর একটা কথা বলব। নাও দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিকাম আ স্মল প্লেস। জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি উপেক্ষা করে এখন আমরা সবাই একই দলের সদস্য। দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ ইউনাইটেড। তাই সিনেমার জগতেও এখন আর হলিউড, বলিউড, দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি... আলাদা করে কিছু নেই। আমরা সকলে সিনেমা জগতের সদস্য। একটু আগেই বললাম, গ্লো করতে হলে উই হ্যাভ টু গ্লো টুগেদার। ‘আই’ থেকে ‘উই’ না

হলে, আপনার গ্রোথ একটা জায়গায় আটকে যাবে। আর ক্রিয়েটিভ জগতে আইডিয়া এবং ট্যালেন্টের এক্সচেঞ্জ খুবই প্রয়োজন।

‘পাঠান’-এর পর এবার ‘জওয়ান’! কেরিয়ারের প্রথম নায়ক শাহরুখ খানের সঙ্গে আবার এক স্ক্রেনে দেখা যাবে আপনাকে!

‘জওয়ান’-এ আমি অতিথি শিল্পী। তবে শাহরুখ যদি কোনও কাজে আমাকে ডাকে, আমি ওকে কখনও ফেরাতে পারব না।



এটা তো খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়। সারাবছরে শরীর খারাপ হলে আপনি ডাক্তারের কাছে যান না? ঠিক একইভাবে মনও তো অসুস্থ হতে পারে। তখন তো মনের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আসলে কী জানেন তো, এই বিষয়ে আমরা আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের সমাজের মধ্যে ‘লজ্জা’ জিনিসটা একটা খুব বড় ফ্যাক্টর। ‘কে কী ভাববে’, এটা ভেবেই অনেক মানুষের জীবন কেটে গেল! কাউন্সেলিং করানো মানে আপনি পাগল নন, এটা সকলকে বুঝতে হবে। এখন অবশ্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। আমার তো মনে হয় এখন যা ফাস্ট লাইফ, তাতে সকলেরই নিজেদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা উচিত।

শোনা যায়, ‘ছপাক’-এর জন্য শুট করার সময় আপনার নাকি সেটেই কাউন্সেলরের সাহায্য নিতে হয়েছিল?

হ্যাঁ। আসলে আমি যে-কোনও চরিত্রে অভিনয় করার সময় সেটার মধ্যে খুব

“‘কে কী ভাববে’, এটা ভেবেই অনেক মানুষের জীবন কেটে গেল! কাউন্সেলিং করানো মানে আপনি পাগল নন, এটা সকলকে বুঝতে হবে। এখন অবশ্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।”

■ জলের নীচে ফোটোশুটেও তিনি সমান সাবলীল

রণবীরের (সিংহ) কথা মাথায় রেখেই বলছি, ইন্ডাস্ট্রিতে শাহরুখ আমার সবচেয়ে স্পেশাল নায়ক। হি ইজ আ ডার্লিং। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। কীভাবে মাটিতে পা রেখে চলতে হয়, তা শাহরুখের চেয়ে ভাল বোধহয় আর কেউ জানে না। শাহরুখ আর আমার একটা কমন বিষয় হল, আমরা দু’জনেই খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। তাই আমরা জীবনের বেসিক ভ্যালুগুলোকে সম্মান করতে জানি এবং খুব অল্পতেই খুশি হই।

আমাদের দেশে খুব কম সেলেব্রিটি রয়েছেন যারা মেন্টাল হেলথ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন। সেখানে আপনি শুধু কথাই বলেননি, স্বীকারও করেছেন যে একটা সময় আপনাকে নিয়মিত কাউন্সেলিং করাতে হয়েছে...

একটা সময় কেন, আমার তো এখনও মাঝেমাঝেই কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন হয়।



■ ‘ককটেল’ ছবির পোস্টারে ডায়ানা, সেফ ও দীপিকা



■ ‘পিকু’ ছবির শুটিংয়ে ইরফান খান ও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে

“বাড়ির জন্য চাল-ডাল-আটা অর্ডার করা, সবজিওয়ালার কাছ থেকে বেছে-বেছে আনাজ কেনা, প্লাস্কার, কার্পেন্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা... এগুলো নিয়মিত করে থাকি।”

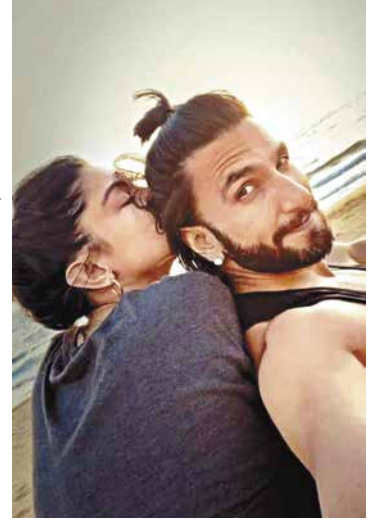
গভীরভাবে ঢুকে যাই। ‘ছপাক’-এ ‘লক্ষ্মী’র চরিত্রটি আমাকে একেবারে নিংড়ে নিয়েছিল। এরকম একটি ইনস্টেন্স চরিত্র করার সময় আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম। সেটা একটা সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছেয়ে যে, আমি সেটাই নিজের কাউন্সেলিং করাই। দেখুন, আমার যদি লজ্জা বোধ কাজ করত, তা হলে হয়তো আমি সেটে কাউন্সেলিং না করিয়ে বাড়িতে গিয়ে করাতাম। আমি যদি ভাবতাম লোকে কী বলবে, কী ভাববে, তা হলে কিন্তু আমি কখনওই সেটে এটা করতে পারতাম না। কিন্তু আমি যেমন জ্বর এলে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেতাম, তেমনই মানসিক চিকিৎসার জন্য মনের ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। ব্যাপারটা এতটাই নরম্যাল।

আচ্ছা একটা জিনিস বলুন, এই যে আপনি এত শান্ত, কম্পোজড। উল্টোদিকে রণবীরকে দেখা যায় সারাফণ চঞ্চল, পিডিএ করতে ভালবাসেন। সংসার করার ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্য সমস্যা সৃষ্টি করে না? একেবারেই না। কথাতেই তো আছে, অপোজিটস অ্যাট্রাক্ট। আসলে বিয়ের আগে আমরা একে-অপরকে প্রায় ছ’বছরের বেশি সময় ধরে ডেট করেছি। তাই আমরা একে-অপরকে হাতের তালুর মতো চিনি। রণবীর পিডিএ করতে ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু সেটাই ওর স্টাইল। আর আমার ও রণবীরের সম্পর্কের ভিতটা গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং বিশ্বাসের উপর। তাই সমস্যা হলেও সেটা আমরা খুব সহজেই মিটিয়ে নিতে পারি। ঠিক যেমন দুই বন্ধুর মধ্যে হয়।

একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কনফিউজড, কিংবা রণবীর ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না একটা চরিত্র কীভাবে ফুটিয়ে তুলবে, তখন আমরা একে-অপরের সাহায্য নিই। অনেকসময় আমরা একে-অপরের সিনও বাড়িতে রিহাসাল করি।

আপনি নাকি মাল্টিটাস্কিংয়ে এক্সপার্ট! কেরিয়ার সামলানোর পাশাপাশি, আপনি নাকি বাড়ির কাজও নিজের হাতেই করতে পছন্দ করেন?

তা ঠিকই বলেছেন। আসলে বাড়িতে হাউজকিপাররা যতই কাজ করে যাক না কেন, আমি নিজের হাতে ফিনিশিং টাচটা না



■ সমুদ্র সৈকতে দীপিকা-রণবীর সিংহ

কেরিয়ারের ক্ষেত্রে আপনারা একে-অপরকে কতটা শলা-পরামর্শ দেন?

এটা খুব স্বাভাবিক যে যদি স্বামী-স্ত্রী একই পেশায় থাকে, তাহলে বাড়িতে কাজ নিয়ে কথা হবেই। আমরা চেষ্টা করি কাজ নিয়ে কম কথা বলে সারাদিনটা কার কেমন গেল, কোনও ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা, এগুলো শেয়ার করে নিতে। তবে কাজের ক্ষেত্রে এরকম অনেকবার হয় যে, আমি কোনও



■ রজার ফেডেরারের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে দীপিকা



■ শাহরুখ খানের সঙ্গে দীপিকার ‘পাঠান’ এবছর ঝড় তুলেছিল বক্স অফিসে

“যখন প্রযোজক হিসেবে কাজ করি, তখন অবশ্যই বক্স অফিস নিয়ে ভাবি। কিন্তু যখন কোনও প্রজেক্টে শুধুই অভিনয় করছি, তখন টাকাপয়সা নিয়ে ভাবার দায়িত্ব আমার নয়।”

দিতে পারলে মন কেমন-কেমন করে। রণবীর অনেক সময় খুব রেগে যায়। কিন্তু আমি শুটিং থেকে ফিরে, বাড়ির কাজ নিয়ে বসে যাই। রণবীর বলে, আমার বিশ্রাম দরকার। কিন্তু তখন যদি ঘুমোতেও যাই আমার ঘুম আসবে না। মনে হবে, কিনেটা কেমন অগোছালো হয়ে আছে কিংবা জানলার পরদাগুলো টানটান নেই! তাই সমস্ত কাজ নিজের হাতে করে তবেই বিশ্রাম নিতে যাই। তবে শুধু ঘর গোছানোই নয়, বাড়ির জন্য প্রতি মাসে চাল-ডাল-আটা অর্ডার করা, বাড়ির নীচে সজিওয়ালার কাছ থেকে বেছে-বেছে সবজি কেনা, দরকার হলে প্লাস্টার, কাপেন্টার, ইলেকট্রিশিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা... এগুলোও নিয়মিত করে থাকি। আসলে প্রথম যখন মুম্বইতে এসে একা থাকতাম, তখন থেকেই এই অভ্যাসগুলো রয়ে গিয়েছে।

রণবীর অনেক জায়গাতেই আপনার হাতের রান্নারও প্রশংসা করে থাকেন।

রণবীরের তো আমার সবকিছুই ভাল লাগে! আসলে আমি রান্না করতে পছন্দ করি। বাড়িতে যদি কোনও অতিথি আসেন, রেস্টুরাঁ থেকে অর্ডার না করে আমি নিজের

হাতে রান্না করতেই প্রেফার করি। আমাদের দক্ষিণী ট্র্যাডিশনে বলে, অতিথিকে যতটা পারবে নিজের হাতে সেবা করবে।

এবার একটু সিনেমায় ফিরি। আচ্ছা, আপনি বরাবর বলে এসেছেন যে, বক্স অফিস নম্বর আপনার কাছে ম্যাটার করে না। কিন্তু শুধুই ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশন দিয়ে কি একটা ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে? এখন তো আপনি প্রযোজনাতেও এসেছেন...

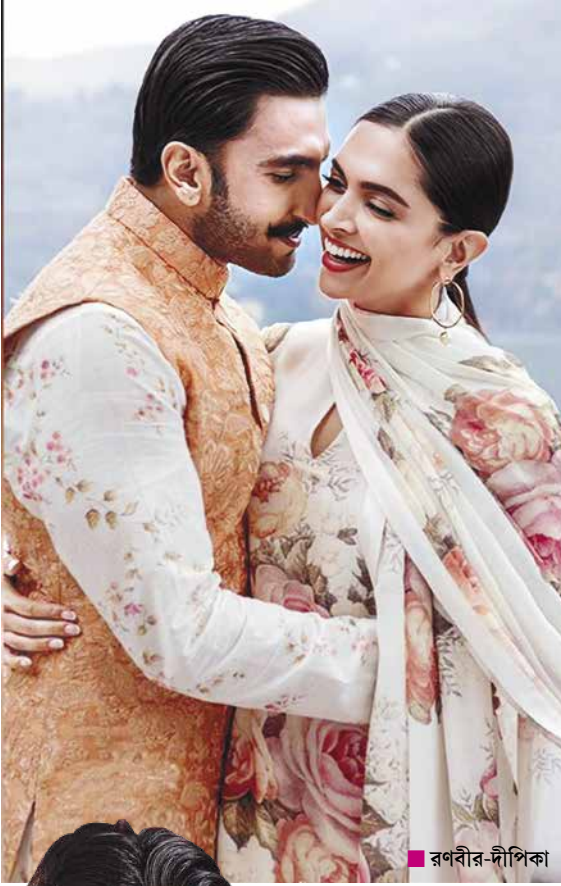
যখন আমি প্রযোজক হিসেবে কোনও ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি, তখন অবশ্যই বক্স অফিস নম্বর নিয়ে ভাবব। কিন্তু যখন কোনও প্রজেক্টে আমি শুধুই অভিনয় করছি, তখন টাকাপয়সা নিয়ে ভাবার দায়িত্ব আমার নয়। তার জন্য ছবির প্রযোজক রয়েছেন। আমি তখন শুধুই ক্রিয়েটিভ দিকে মন দিতে প্রেফার করব। টাকা নিয়ে ভাবতে গেলে আমার ক্রিয়েটিভিটিতে সেটা একটা একগেটিভ ইমপ্যাক্ট ফেলতে পারে। এটা একান্তই আমার নিজের কথা বললাম। এটাকে জেনারলাইজ করবেন না।

আনন্দলোক-এর সাক্ষাৎকারের সুবাদে আপনার সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে।

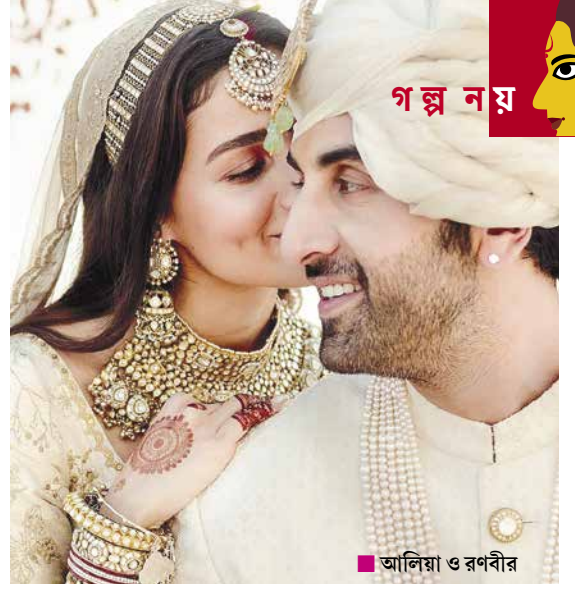
বেঙ্গালুরুতে আপনার বিয়ের অনুষ্ঠানেও গিয়েছি। এছাড়া নানা প্রেস মিটে তো দেখা হয়ই। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখেছি, আপনি খুব ডাউন টু আর্থ, ভীষণ গ্রাউন্ডেড। সাফল্যকে কখনও মাথায় চড়তে দেননি...

সাফল্য আসতেই পারে, কিন্তু তাই বলে সেটা আমাকে মানুষ হিসেবে বদলে দিতে পারে না। মনে রাখবেন, সাফল্য এলে ব্যর্থতাও আসবে। এটাই নিয়ম। তাই সেলিব্রিটি হয়ে গেলাম বলেই আমি আমূল বদলে গেলাম, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। হ্যাঁ, এখন হয়তো আগের মতো সব জায়গায় যেতে পারব না কিংবা গেলেও বাউন্সার নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সেটা তো বাহ্যিক। ভিতরটা কেন বদলে যাবে? আমি সবসময় চেষ্টা করি জীবনটা যতটা সহজ-স্বাভাবিক রাখা যায়... এখনও যখন বেঙ্গালুরুতে নিজের বাড়িতে যাই, আমি সেই আগের মতোই সকলের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করি। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। মানুষ নিজের শেকড় ভুলে গেলে, সাফল্যের তো কোনও মানেই রইল না!

দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে কথা বলার পর কখনওই মনে হয় না দেশের অন্যতম বড় স্টারের সঙ্গে কথা হল। সবসময়ই মনে হয়, ঠিক যেন পাশের বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে আড্ডা হল। জানি না ভবিষ্যতে তাঁর স্টারডম কোন উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেবে। তবে এইটুকু বলাই যায়, মানুষ হিসেবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি একটা চিরস্থায়ী ছাপ সকলের মনে ফেলে যাবেন।



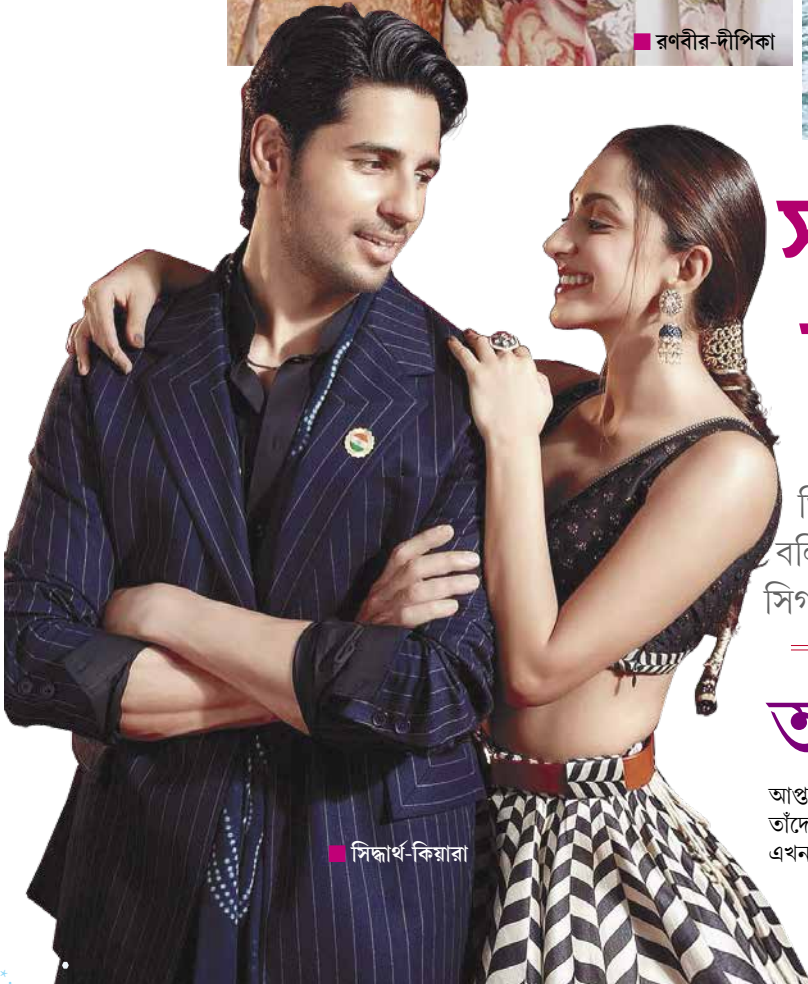
■ রণবীর-দীপিকা



■ আলিয়া ও রণবীর



■ ক্যাটরিনা-ভিকি



■ সিদ্ধার্থ-কিয়ারা

সংসার সুখী হয় দু'জনের গুণে

রণবীর কপূর-আলিয়া ভট্ট থেকে
ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ... হালফিলে
বলিউডের সেলেব দম্পতিরা তৈরি করছেন এক
সিগনেচার স্টাইল! তারই সন্ধান দিল আনন্দলোক

আগে কেরিয়ার, পরে
বিয়ে... হালফিলের
বলিউড তারকারা এই
আগুত্বাক্যটি সামান্য বদলেছেন।
তাদের কাছে কেরিয়ার ও বিয়ে
এখন সমান তালে চলে। তিরিশের

কোঠায় পৌঁছানোর আগেই বিয়ে
সেরে ফেলছেন কেরিয়ারের
মধ্যগগনে থাকা নায়ক-নায়িকারা!
তারপর অবসর তো নয়-ই,
বরং পাল্লা দিয়ে সামলাচ্ছেন
কেরিয়ারও। দাম্পত্যজীবন,



■ আলিয়া ভট্ট ও রণবীর কপূর

মুন্সইয়ের কাজে গেলেও ছোট
রাহার কাছেই যেন তাঁর মন
পড়ে থাকে। এমনকি, ফ্লাইট
ধরার আগে যদি কুড়ি মিনিট
সময়ও মেয়ের সঙ্গে কাটান...

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সমীকরণ ইত্যাদিতে
কেমন পারফর্ম করছেন তাঁরা? কে-ই বা
বেশি সংসারী হয়ে উঠছেন? রইল সেই
গল্পই...

প্রাইভেট কাপল:

রণবীর কপূর-আলিয়া ভট্ট

রণবীর কপূর-আলিয়া ভট্টের বিয়ে, যাকে
বলে ‘ইন্টিমেট সেরিমনি’। বিয়ের পরে
আলিয়া তো বটেই, রণবীরের মনও নাকি
বাড়িতেই পড়ে থাকে। বিশেষত, মেয়ে
রাহা জন্মানোর পর থেকে। কিছুদিন আগে
ছবির প্রচারে কলকাতায় এসে রণবীর
জানিয়েছিলেন, পিতৃত্ব তাঁকে কতটা পরিণত
করেছে। মুন্সইয়ের বাইরে শুটিং বা ছবির
প্রচারে গেলেও ছোট রাহার কাছেই যেন
তাঁর মন পড়ে থাকে। এমনকি, ফ্লাইট ধরার
আগে যদি কুড়ি মিনিট সময়ও মেয়ের সঙ্গে



■ ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ছবির দৃশ্যে রণবীর-আলিয়া

কাটান, মন একেবারে ভাল হয়ে যায় তাঁর।
বাবা হওয়া যে জীবনের সেরা অনুভূতি, তা
একবাক্যে স্বীকার করেন। এমনকি, বাবা
হওয়ার পরে রণবীর যে অনেকটাই বদলে
গিয়েছেন, আরও পরিণত হয়েছেন, তা
তাঁর মা নীতু সিংহও স্বীকার করেন। এ তো
গেল পিতৃত্বের কথা। কিন্তু বিয়ের পরেও
যে তাঁরা বেস্ট ফ্রেন্ড, এ কথা বরাবর স্বীকার
করেন আলিয়া-রণবীর দু’জনেই। আলিয়া
এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বিয়ের পর
তাঁদের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি প্রায় কিছুই
বদলায়নি। রণবীর বিয়ের আগে যেমন

ছিলেন, বিয়ের পরও তেমনই আছেন।
আলিয়াকে সবসময় হাসিখুশি রাখেন তিনি।
বিয়ের পরে স্বামীর কল্যাণে যাবতীয় স্ট্রেস
উধাও আলিয়ার জীবন থেকে। বরাবরই
আলিয়া রণবীরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিয়ের
পর স্বামীর গুণগান করতেও তাই দু’বার
ভাবেন না তিনি। পিডিএ-র স্কেডেও
আলিয়া রণবীরের চেয়ে কয়েক কদম
এগিয়ে। প্রকাশ্যে রণবীরকে জড়িয়ে ধরা বা
চুম্বন করার ভিড়িও নেটমাধ্যমে আগেও
ভাইরাল হয়েছে। অন্যদিকে রণবীরও
বলেন, আলিয়া আগের মতোই আছেন।
পাঁচবছর ধরে প্রেম করেছেন তাঁরা। একটা
সময় রণবীর ভাবতেন, প্রেমের ম্যাজিক
কাজ না করলে, তখন বিয়ে করবেন। কিন্তু
ততদিন আর অপেক্ষা করেননি কেউই।
বিয়ের পর নতুন বাড়ির কাজকর্মের
তদারকি করতেও প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়
তাদের। সন্তান পালন বা পারিবারিক দায়িত্ব
সামলানো, দু’জনেই পরস্পরের মধ্যে ভাগ
করে নেন সবকিছু।
দুই পরিবারের সদস্যরাও যে এই বিয়ে
নিয়ে অত্যন্ত খুশি, তা তো বেশ বোঝা
যায়। শোনা যেত, রণবীরের আগের
প্রেমিকা ক্যাটরিনা কাইফকে মোটেও
পছন্দ করতেন না নীতু সিংহ। উল্টোদিকে
আলিয়া তাঁর ও প্রয়াত স্বামি কপূরের
বড্ড প্রিয়। প্রথম থেকেই কপূর পরিবারে

মিলেমিশে গিয়েছিলেন তিনি। আলিয়া
নিউক্লিয়ার পরিবারে বড় হয়েছেন। মা,
বাবা ও বোনকে নিয়ে ছোট সংসার ছিল
তাঁর। কিন্তু উল্টোদিকে কপূর পরিবারে
সকলে একসঙ্গে ইইছলোড় করে থাকেন,
পুজো-আচ্চাতে কিংবা হোলি বা ক্রিসমাস
পার্টী... সকলে নিয়ম করে একত্রিত হন।
বড়সড় পঞ্জাবি পরিবার বলতে যা বোঝায়,
কপূররা ঠিক তাই। আলিয়ার বেজায় পছন্দ
হয়েছিল এই বিষয়টা। বাড়িতে পুজোর
সময় রণবীর মজার ছলে আলিয়াকে



■ 'গোলিয়ো কী রাসলীলা: রামলীলা' ছবির দৃশ্যে রণবীর-দীপিকা

দীপিকার কথায়, যে-কোনও সুখী সম্পর্কে ধৈর্য প্রয়োজন। তাঁর আর রণবীরের সেই ধৈর্য আছে। তাঁর সব স্বপ্ন, প্রত্যাশাকে সমর্থন করেন রণবীর...

বলতেন, 'তুমি এসব নিয়ম-কানুন কিছু জানো?' আর এখন? আলিয়া একেবারে দক্ষ হয়ে উঠেছেন এসবে। তবে নতুন পরিবারে মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে একটু সময় লেগেছিল বই কী! মহেশ ভট্টও আল্লাদে আটখানা রণবীরকে জামাই হিসেবে পেয়ে। বিয়ের পর প্রথম বড়দিন উদযাপনে রণবীর-আলিয়া তো বটেই, সঙ্গে ছিলেন নীতু, আলিয়ার দিদি শাহিন ও পূজা ভট্ট এবং মা সোনি রাজদান। ছিলেন আলিয়া-রণবীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অয়ন মুখোপাধ্যায়ও।

নাকি নায়িকা ধীরে ধীরে পুরনো দুঃখ ভুলে নতুন ইনিংস শুরু করেন। রণবীরের হাসিখুশি, মজাদার স্বভাব নাকি বড্ড মনে ধরেছিল দীপিকার। অন্যদিকে রণবীর 'রাম লীলা'র সময় থেকেই দীপিকার প্রতি যাকে বলে, 'হেড ওভার হিলস'। কিন্তু বিয়ের পরেই তাঁদের সমীকরণ ঘিরে অন্য গল্প। নিম্নদুর্ভাগ্যের মতে, রণবীরকে কোনওদিনই জামাই হিসেবে পছন্দ ছিল না দীপিকার পরিবারের। রণবীরের ওভার-দ্য-টপ চালচলন তাঁদের নাকি

মোটো পোষায় না! তা ছাড়া রণবীর নাকি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। তাই দীপিকা যখন মানসিক দ্বন্দ্ব ভুগে রণবীরকে পাশে চান, তখন আর তাঁকে পাওয়া যায় না! শোনা যায়, রণবীর নাকি বোয়ের প্রতি ওভার-পোজেসিভও বটে। যতই তিনি দীপিকার প্রাক্তন রণবীর কপুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন না কেন, তার আসল কারণ বোয়ের প্রতি পোজেসিভনেস। এমনও শোনা যায়, বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় কসরত নাকি দীপিকাই করেন। তিনিই জনসমক্ষে সুখী দাম্পত্যের ইমেজ ধরে রাখার জন্য সদা-সচেষ্ট হন। কানাঘুষোয় এ-ও শোনা গিয়েছিল, দীপিকা দাম্পত্যের মানসিক চাপ সামলাতে না পেরেই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। 'প্রজেক্ট কে'-র শুটিংয়ের সময় তাঁকে হাসপাতালে অবধি ভর্তি হতে হয়েছিল। দীপিকার অসুস্থের সময় রণবীর দেশের বাইরে অন্য ইভেন্টে ব্যস্ত ছিলেন। সবমিলিয়ে, তাঁদের টালমাটাল দাম্পত্যের গুজব বহুদিন ধরেই। তবে পজিটিভ দিকও কি নেই? জনসমক্ষে যুগলে যখনই তাঁরা ধরা দেন, 'কাপল গোল' সেট করেন যেন! দাম্পত্য নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানিয়েছিলেন, যে-কোনও সুখী সম্পর্কে ধৈর্য প্রয়োজন। তাঁর আর রণবীরের সেই ধৈর্য আছে। তাঁর সব স্বপ্ন, প্রত্যাশাকে সমর্থন করেন রণবীর, এমনটাও অকপটে জানিয়েছিলেন নায়িকা। অন্যদিকে বিয়ের পরপর রণবীর সর্বসমক্ষে জানিয়েছিলেন, সেবা হাজব্যাড হতে চান তিনি। দীপিকাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে তিনি যেন সুখের সপ্তম স্বর্গে আছেন। তবে নিম্নদুর্ভাগ্যের মতে, এসব নাকি সবই লোক দেখানো। জনসমক্ষে সুখী দাম্পত্যের অভিনয় করেন তাঁরা, আদতে মোটেও এত মাখোমাখো প্রেম নেই। আবার কারও মতে, বিয়ের আগে বা বিয়ের খানিক পরেও যতটা প্রেম ছিল, তা নাকি এখন কমে এসেছে!

পিডিএ মাস্টার:

রণবীর সিংহ-দীপিকা

পাডুকোন

ঐরা অবশ্য পুরনো জুটি। সদ্য বিবাহিতদের মধ্যে নতুন দাম্পত্য নিয়ে যে উৎসাহ থাকে, তা রণবীর সিংহ-দীপিকা পাডুকোনের মধ্যে কি এখনও আছে? এই প্রশ্নের উত্তর এই হ্যাঁ, তো এই না! 'না' এই কারণে যে, মাঝে মাঝেই সুখী দাম্পত্যে বিচ্ছেদের গুঞ্জন ভেসে ওঠে। শোনা যায়, প্রায় ভাঙতে বসা বিয়েকে নাকি অনেক কষ্টে টিকিয়ে রেখেছেন রণবীর ও দীপিকা। তবে প্রকাশ্যে সেসব বোঝার উপায় নেই। রণবীরের স্বভাবসিদ্ধ পিডিএ-র কল্যাণে কে বলবে, মাঝেমাঝেই তাঁদের বিচ্ছেদের খবর চাউর হয়! রণবীর কপুরের সঙ্গে ব্রেক-আপের পরে দীপিকার মানসিক ক্ষতে মলম লাগান রণবীর সিংহ। রণবীর সিংহের সান্নিধ্যই



■ বিয়ের দিনে দীপিকা-রণবীর

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের কথা যদি বলি, দীপিকা আগে জানিয়েছিলেন, রণবীরের বাবার কাছে তিনি মেয়ের মতো। আর তাঁর মায়ের কাছে বন্ধু ও মেয়ে দুই-ই। রণবীরের মা-কে নাকি তিনি যাবতীয় গোপন কথাও অনায়াসে বলে ফেলতে পারেন। রণবীরের বাবা যতটা ইমোশনাল, মা নাকি ততটাই ঠান্ডা মাথার, চাপ না নিতে চাওয়া মানুষ। অন্যদিকে রণবীর ব্যাডমিন্টন তারকা প্রকাশ পাড়ুকোনের বড় ভক্ত। দীপিকাও রণবীরকে ব্যাডমিন্টন কোর্টে আকছার হারিয়ে দেন। রণবীর তাঁর স্বশ্রবাবাড়ির সঙ্গে বসে খেলা দেখেন। তাঁর ননদ ম্যাথোস্টার ইউনাইটেডের ভক্ত। ক্রিকেট, ফুটবল থেকে অলিম্পিকস... সবই একসঙ্গে উপভোগ করেন তাঁরা। তবে এর পাশাপাশি দীপিকার পরিবারের নাকি রণবীরের উদ্ভট স্টাইল মোটেও পছন্দ নয়। তাই স্বশ্রবাবাড়িতে এলে সাদা শার্ট-প্যান্টে আসেন তিনি। স্বভাবে বিপরীত মেরুর হলেও, ঝগড়া-ভাব-ভালবাসা মিলিয়ে দিবি চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

মেড ফর ইচ আদার: ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ

বিয়ের পর থেকে প্রায় নিয়মিত খবরে ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। শুধুমাত্র কাজের জন্য যে তাঁরা শিরোনামে, তা নয় কিন্তু। ভিকি যদিও চুটিয়ে কাজ করছেন, ক্যাটরিনা কিন্তু রয়ে-সয়ে বেছে বেছে ছবিতে সই করছেন। বরং, বিয়ের পর তাঁরা কতটা সংসারী হয়ে উঠলেন, একে অপরকে বাড়ির কাজে কতটা সাহায্য করলেন... এসব নিয়ে খবরওয়ালাদের উৎসাহের অন্ত নেই। কিছুদিন আগে ভিকি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তাঁর আর ক্যাটরিনার বিয়েটা অনেকটা 'পর্যাঠা



■ গায়ে হলুদে ভিকি-ক্যাটরিনা

ওয়েডস প্যানকেক'-এর মতো। পঞ্জাবি আর আধা ব্রিটিশ যুগলের বিয়ে ব্যাখ্যা করতে এর চেয়ে ভাল তুলনা আর কী-ই বা হতে পারে! ভিকি পরোটা খেতে ভালবাসেন, আর ক্যাটরিনা প্যানকেক। কিন্তু বিয়ের পরে সংসারে তাঁদের সহাবস্থান আর বোঝাপড়া এতই মধুর যে, দিবি পরোটা আর প্যানকেক বন্ধুত্ব করে থাকতে পারে। ক্যাটরিনা এক বা দু'সপ্তাহে একবার করে হাউজহেল্পদের মিটিং ডাকেন। বাজেট অনুযায়ী কত খরচাপাতি হল সংসারে, তার হিসেব নেন। আর ভিকি নাকি সেই সময় বসে বসে পপকর্ন খেতে-খেতে পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করেন। বাড়িতে প্রায় দেড়খানা ঘর জুড়ে ক্যাটরিনার পোশাক সাজানো থাকে আর ভিকির ভাগ্যে মাত্র একখানা আলমারি। মজা করে ভিকি বলেছেন, তাঁরা প্রায়ই ক্লজের স্পেস নিয়ে ঝগড়া করেন। কারণ, তাঁর ভাগ্যে বরাদ্দ একটি আলমারিরও অর্ধেক দখল নাকি ক্যাটরিনারই! অন্যদিকে ভিকি হলেন ক্যাটরিনার প্যানিক বাটন। মানে, মাঝেমাঝেই বিভিন্ন বিষয়ে টেনশনে ভোগেন ক্যাটরিনা। তখন ভিকিই হয়ে ওঠেন তাঁর ভরসার জায়গা। এমনকি,



■ বিয়ের দিনে ক্যাটরিনা ও ভিকি

বিয়ের পর যে প্রেম মোটেও ফিকে হয় না, তার সাক্ষাৎ উদাহরণ ভিকি স্বয়ং। একবার ক্যাটরিনার জন্মদিনে টানা ৪৫ মিনিটের লাইভ পারফরম্যান্স দেন তিনি, তা-ও ক্যাটরিনার প্রায় প্রতিটি গানে নেচে। এমনিতো, যুগলে প্রায় সবসময়ই হাসি-খুশি মেজাজে দেখা যায় তাঁদের। তা থেকেই স্পষ্ট, বিয়ের পর একে অপরের সামিধ্য কতটা উপভোগ করছেন তাঁরা। প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে নেট-মাধ্যমে পিডিএ করেছিলেন ক্যাটরিনা ও ভিকি। ক্যাটরিনা একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ভিকি তাঁর জীবনের আলোর রশ্মি। একে অপরের বন্ধুদের সঙ্গেও দু'জনের সম্পর্ক বেশ ভাল। ভিকি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, বিয়ের পর ক্যাটরিনার প্রথম জন্মদিন তাঁরা উদযাপন করেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গেই। ভিকির বন্ধু গ্রুপে নাকি দিবি মিশে গিয়েছেন ক্যাটরিনা। তবে নানা কথাবার্তায় বারবার একটু হলেও যে ক্যাটরিনা বেশি সংসারী, তা প্রমাণ হয়েছে। ক্যাটরিনা প্ল্যান করতে ভালবাসেন, এমনকি নিজের জন্মদিনের প্ল্যানিংও ক্যাট নিজেই করেন। দুই পরিবারের মধ্যেও বিস্তার বন্ধুত্ব। হোলির সময় ভিকি-ক্যাটরিনার রঙিন ছবিতে দেখা গিয়েছিল ক্যাটরিনার বোন ইসাবেলা ও ভিকির বাবা-মাকে। দুই পরিবারের মধ্যে মিলমিশ, দেখা-সাক্ষাৎ যে প্রায়ই হয়, তা সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন ছবিতেই স্পষ্ট। ভিকি আগেও বলেছিলেন, তাঁর বাবা-মা (শ্যাম ও বীণা কৌশল) ক্যাটরিনাকে খুব ভালবাসেন। ক্যাটরিনা যেমন মানুষ, তা তাঁর বাবা-মায়ের বরাবরই পছন্দের। তাই ভিকি যখন বাড়িতে ক্যাটরিনাকে বিয়ের কথা জানান, বাবা-মায়ের সম্মতি পেতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। তাঁরা বেজায় খুশি হয়েছিলেন ছেলের সিদ্ধান্তে। ক্যাটরিনার স্বশ্রব-শাশুড়ি নাকি সবসময় বলেন, মনের দিক থেকে বড় ভাল বোমা। শাশুড়ি তাঁর বৌমার জন্য মিষ্টি আলুর পদ রান্না করেন। তবে বৌমাকে পরোটা খাওয়ার জন্যও সাধাসাধি করতে থাকেন! তাই, মাঝেমাঝে শাশুড়ির হাতের পরোটায় কামড় দিয়েও ফেলেন ক্যাটরিনা, তাঁর যাবতীয় ডায়েট রেজিমের তোয়াক্কা

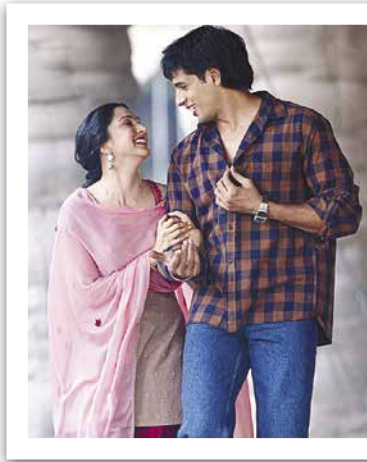


■ বিয়ের সাজে ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল

না করে। ভালবেসে ক্যাটরিনাকে ‘কিটো’ বলে ডাকেন তাঁর আদরের মাম্মিজি (বীণা)। এমনকি, যে ক্যাটরিনা বিয়ের আগে শুধু কফি বানাতে জানতেন, তিনি নাকি এখন শাশুড়ির কাছ থেকে রান্নাও শিখছেন। রুঁধে খাওয়াচ্ছেনও! আসলে ভিকি বরাবরই পরিবারকেন্দ্রিক। বাবা, মা, ভাইকে বড্ড ভালবাসেন তিনি। আর ভিকির এই গুণটিই নাকি মনে ধরেছিল ক্যাটরিনার। ভিকির তাঁর পরিবারের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দেখে ক্যাটরিনার মনে হয়, বিয়ের পরে তিনি ও তাঁর পরিবারও ভিকির কাছ থেকে একই শ্রদ্ধা পাবেন। লাঞ্চ বা ডিনারে যখনই সময় পান, দুই পরিবারের লোকজন একসঙ্গে সময় কাটান। সত্যি, পরিবারের মধ্যে বা সম্পর্কের মধ্যে এত বিচ্ছেদের খবর শোনা যায় আজকাল, সেখানে ভিকি-ক্যাটরিনার রোম্যান্স বোধহয় ব্যতিক্রমই।

বেস্ট ফ্রেন্ড: কিয়ারা আডবাণী-সিদ্ধার্থ মলহোত্র

‘শেরশাহ’-র শুটিংয়ের সময়েই একে অপরের প্রেমে পড়েন কিয়ারা আডবাণী ও সিদ্ধার্থ মলহোত্র। আপাতত দু’জনেরই

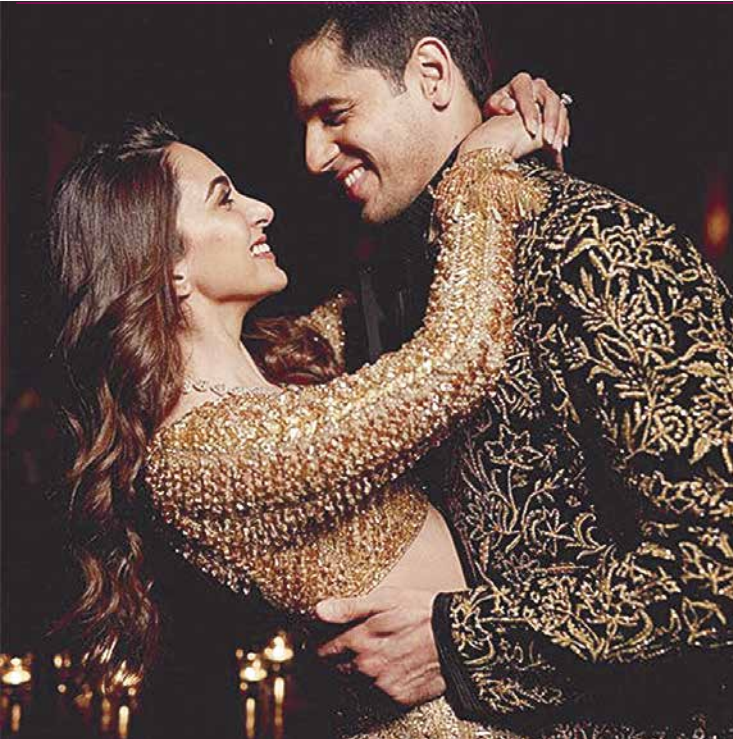


■ ‘শেরশাহ’ ছবির দৃশ্যে

কেরিয়ারের বৃহস্পতি তুঙ্গে। আর দাম্পত্য-সুখের বৃহস্পতি? তাও তুঙ্গেই বটে! বিয়ের পর বর-বৌ চুটিয়ে সংসার করছেন, আবার কাজও করছেন। কিয়ারা বিয়ের পরপর এক সাক্ষাৎকারে জানান, এতকাল বাবা-মায়ের বাড়িতে থাকতেন। কোনও কাজই তাঁকে করতে হত না। কিন্তু এখন প্রথমবার তিনি সংসার চালাচ্ছেন। তাই, মা কতটা পরিশ্রম

করতেন, তার খানিকটা অন্তত কিয়ারা বুঝতে পারেন এখন। কিন্তু সংসার করা যে বেশ উপভোগ করছেন, তাও একবাক্যে স্বীকার করেন কিয়ারা। তবে সংসার যেমন রমণীর গুণে সুন্দর হয়, তেমনই স্বামীর গুণেও। কিয়ারা বরাবরই বলে এসেছেন, সিদ্ধার্থ আদর্শ লাইফ পার্টনার। কিছুদিন আগে জাপান ভ্রমণের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সিদ্ধার্থ। সেখানে হাতে একগাদা শপিং ব্যাগ নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে তিনি। সঙ্গে ক্যাপশন, ‘হাজুব্যান্ডস ডিউটি’! সিদ্ধার্থ সবসময় সবকিছুতে উৎসাহ দেন কিয়ারাকে। এমনকি সকালে উঠে ওয়র্কআউট করতে ইচ্ছে না করলেও সিদ্ধার্থ জোর করে তাঁকে টেনে তোলেন! সম্প্রতি ‘সত্যপ্রেম কি কথা’র ট্রেলার দেখার পরেও নেটমাধ্যমে স্ত্রীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু স্বামী হিসেবে সিদ্ধার্থের সেরা গুণ, তাঁর অ্যাডভেঞ্চারাস স্বভাব। নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে সবসময় পছন্দ করেন সিদ্ধার্থ। বিয়ের আগে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আলাদা করে কিছু না বললেও, বিশেষ রাখচাকও করতেন না তাঁরা। প্রায়ই যুগলে একসঙ্গে বেড়াতে বা রেস্টোরাঁয় খেতে যেতেন। বি টাউনের অন্যতম মিষ্টি কাপল ছিলেন তাঁরা। বিয়ের পরেও তাঁদের বন্ধুত্বে এতটুকু বদল আসেনি। প্রেমের শুরু থেকেই বিয়ের গুঞ্জন ছিল তীব্র। সত্যি বলতে, বলিউডে প্রেম হওয়া আর প্রেম ভাঙা, কোনওটাতাই বিশেষ সময় লাগে না। কিন্তু এই দু’জনের প্রেম দেখে অনেকেই বলেছিলেন, তাঁরা স্টেডি কাপল হতে চলেছেন। আর তেমনটাই হল। কিয়ারা স্বশ্রববাড়িতেও দিবি্য মানিয়ে নিয়েছেন। রিসেপশনের দিন তিনি স্বশ্রবকে ক্যামেরায় সঠিক পোজ দেওয়াচ্ছিলেন। তাঁর সেই ছবি ভাইরাল হতেই প্রশংসায় মাতে নেটমাধ্যম। সেই ছবিতে বৌমার হাত শক্ত করে ধরেছিলেন প্রৌঢ় সুনীল মলহোত্র (সিদ্ধার্থের বাবা)। স্বশ্রববাড়ির সঙ্গে কিয়ারার সমীকরণ কেমন হতে চলেছে, তার একটা ইঙ্গিত বোধহয় ওই ছবিতেই ছিল। শুধু স্বশ্রব-শাশুড়িই নন, সিদ্ধার্থের বোন ইশিতার সঙ্গে বেজায় বন্ধুত্ব কিয়ারার। পেশায় আইনজীবী ননদের সঙ্গে নেটমাধ্যমে ছবিও পোস্ট করেন কিয়ারা। সবমিলিয়ে হ্যাপি ফ্যামিলির পারফেক্ট পিকচার।

আসলে, কেরিয়ারের পাশাপাশি মন দিয়ে সংসার করতেও জানেন এই প্রজন্মের অভিনেতারা। দু’জনেই তারকা হলে দাম্পত্যে ইগোর বিরোধ লাগতে পারে, এসব বস্তাপচা ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছেন তাঁরা। মাঝেমধ্যে খানিক বিরোধ যে ঘটে না, তা নয়। তবে সেসবকে সামলে ফের সুখের সমীকরণ গড়ে তোলেন তাঁরা। চলতে থাকে তাঁদের ‘লভ গেম’।



■ কিয়ারা আডবাণী ও সিদ্ধার্থ মলহোত্র

আসিফ সালাম



তারকা যখন প্রযোজক

তাঁরা ‘তারকা’। কলটাইমে সেটে যাবেন, শুটিং করবেন, শুটিং শেষে পার্টি। নো হেডেক। এটাই দস্তুর। কিন্তু এখনকার তারকারা প্রযোজকদের শত সমস্যার কথা জেনেও, হাতে নিচ্ছেন সেই কাজই! আসছেন প্রযোজনায়। নিচ্ছেন হাজারো ঝক্কি! কিসের মোহে?

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে মনে হয়, এ যেন এক অমোঘ আকর্ষণের বস্তু। তারাকুলের গ্ল্যামস্ট্যাটাস, লাইমলাইট, যশ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা... সব যেন এক বাটকায় বেড়ে যায় প্রযোজক হলে। অভিনেতা হিসেবে পাওয়া খ্যাতিটাই যেন সব নয়, প্রযোজক হলে এক সর্বময় কর্তৃত্বের অদৃশ্য রাশ হাতে এসে যায় যেন। ফলে এখন সেই পছন্দি নিয়েছেন এই বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যাগুরু প্রথমসারির তারকারা। প্রসেনজিৎ থেকে শুরু করে জিৎ, দেব, পরমব্রত, অক্ষুশের হাত ধরে এখন সেই টুপি গিয়েছে

শুভশ্রী, নুসরত, কৌশানীর মাথাতেও। তবে সব গ্ল্যামার কোশেট, অর্থের যুক্তি ছাপিয়েও যে প্রশ্নটি এখন সবচেয়ে বেশি মাথায় ঘোরে, তা হল এত চাপ নিতে অভিনেতার এমনি বদ্ধ পরিকর কেন?

রথ দেখা এবং কলা বেচা

ইতিহাস ঘাঁটলে তো দেখা যায়, সিনেমার তারকা-অভিনেতার যখনই প্রযোজকের রাশ হাতে নিয়েছেন, তাতে তাঁদের সিংহভাগের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভাল হয়নি। রাজ কপুরের কথাই ধরুন, প্রথমদিকে প্রযোজক



■ দেব এখন অত্যন্ত সফল একজন প্রযোজক

হিসেবে সাফল্য পেলেও, ‘ববি’ মুক্তির আগে প্রায় পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। উত্তমকুমার তো হিন্দিতে ‘ছোট সি মূল্যাকাত’-এর প্রযোজনা করতে গিয়ে এমনভাবে টাকাপয়সা খুইয়েছিলেন যে, একটা সময় চিন্তায় হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হয়ে যায় তাঁর। প্রযোজনা করতে গিয়ে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে মনোমালিন্যও হয় তাঁর। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন? কোথায় ‘তারকা’ হিসেবে মুক্ত মনে শুটিং ফ্লোরে আসবেন, শট দেবেন, শুটিং শেষে পাটি করবেন! তা নয়, উলটে এমন বিরাট, বিপুল চাপ নিয়েও কেন প্রযোজনার দিকে ঝুকছেন তারকা অভিনেতার? খোঁজ নিতে গিয়ে যেটা জানা গেল তা হল, বেশিরভাগ অভিনেতাই নিজের পছন্দের কাজের জন্য প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করছেন। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ দেব। তাঁর দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চারস এখন ইন্ডাস্ট্রির প্রথমসারির এবং বড় প্রযোজনা সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। ২০১৭ সালে ‘চ্যাম্প’-এর হাত ধরে প্রযোজক হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন দেব। একটা সময় যে রিমেক, লার্জার দ্যান লাইফ ছবি দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে



উত্তমকুমার হিন্দিতে ‘ছোট সি মূল্যাকাত’-এর প্রযোজনা করতে গিয়ে টাকাপয়সা খুইয়েছিলেন। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে মনোমালিন্যও হয়।



■ ভাবনায় ছাপ রাখতে চান প্রসেনজিৎ

পায়ের মাটি শক্ত করেছিলেন, প্রযোজক হিসেবে কিন্তু সেই রাস্তায় তিনি হাঁটেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন, “২০১৩ সালের পর থেকেই রিমেক ছবির উপর আমার বিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল। কনটেন্ট নির্ভর ছবির দিকে মানুষ যে ফিরবেন, সেই বিশ্বাসটা পেয়েছিলাম ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘বুনোহাঁস’-এর মতো ছবিতে অভিনয় করার পর থেকে। ফলে ঠিক করি, যে ছবিগুলো দেব ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমবার করে নিদর্শন সৃষ্টি করতে পারবে, আমার প্রযোজনা সংস্থা সেই ছবিগুলোই করবে। এতে রিস্ক হয়তো আছে। কিন্তু কোন কাজে রিস্ক নেই? রিস্ক

না নিলে এগোনো যাবে কী করে?” বলতে বাধা নেই, দেব এই চিন্তায় ভীষণভাবে সফল। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা থেকে বেরিয়েছে ‘হবুচন্দ্র রাজা’, ‘গবুচন্দ্র মন্ত্রী’র মতো ছবি। বেঙ্গল টকিজ-এর সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় এসেছে ‘টনিক’, ‘প্রজাপতি’র মতো ব্লকবাস্টার ছবি। কিছুদিন আগেই দর্শকদের মন জয় করেছে ‘বোমকেশ ও দুর্গারহস্য’ এবং পরবর্তী সময়ে আসছে ‘বাঘাযতীন’। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, নিতানতুন বিষয়বৈচিত্র্য দিয়ে যেভাবে দেব তাঁর প্রযোজনা সংস্থাকে সাজাচ্ছেন, তাতে তাঁর প্রশংসা না করে উপায় নেই। তবে অন্যদিকে ‘শতফুল বিকশিত হোক’ আশুবাংলা মাথায় রেখে জিৎ তাঁর ‘জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস’-এর হাত ধরে এখনও করে চলেছেন লার্জার দ্যান লাইফ বাংলা ছবি-ই। জিতের প্রযোজনা সংস্থার নাম আগে ছিল ‘গ্রাসরুট এন্টারটেনমেন্ট’। বলা বাহুল্য, এই বঙ্গের সিংহভাগ সাধারণ দর্শকের কথা ভেবেই ছবি তৈরি করেন তিনি। পরে প্রযোজনা সংস্থার নাম পালটেও জিৎ নিজের স্টাশ পালটাননি। তাঁর মত, “বিগ বাজেটের সিনেমা না হলে, ইন্ডাস্ট্রির চাকা ঘুরবে না। এবং টলিউডকে রিজি়নাল, ছোট ইন্ডাস্ট্রির গণ্ডির মধ্যেই থেকে যেতে হবে। ফলে ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বড় স্কেলের সিনেমার খুব দরকার। এবং আমি আমার প্রযোজনা সংস্থার মাধ্যমে সবসময় নতুনদের সুযোগ দিতে চাই। সেই



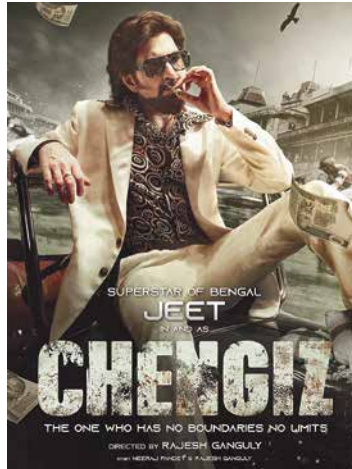
■ প্রসেনজিৎের প্রযোজিত ছবির দৃশ্য



■ শুটিং শেষে টিমের সঙ্গে জিং

নিত্যনতুন বিষয়বৈচিত্র্য দিয়ে যেভাবে দেব তাঁর প্রযোজনা সংস্থাকে সাজাচ্ছেন, তাতে তাঁর প্রশংসা না করে উপায় নেই। অন্যদিকে জিংও পাল্লা দিচ্ছেন। রিলিজ করছেন প্যান ইন্ডিয়া

কারণেই অংশুমান প্রত্যাষ, এম এন রাজের মতো পরিচালকদের ইন্ডাস্ট্রিতে আগমন।” জিং যে নিজের দৃষ্টি বড় রেখেছেন, সন্দেহ নেই। এই তো কয়েক মাস আগেই নিজের বিগ বাজেট ছবি ‘চেন্গিজ’-কে প্যান ইন্ডিয়া মুক্তি দিয়েছেন তিনি। বাংলা সিনেমা জাতীয় স্তরে গিয়েছে এবং তাঁর দেখাদেখি বাকি অভিনেতা-প্রযোজকরাও সেই পথ ধরছেন।



■ লার্জার দ্যান লাইফ ছবিতে বিশ্বাস জিতের

এক্ষেত্রে প্রসেনজিং চট্টোপাধ্যায়ের কথাও বলা দরকার। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ‘এনআইডিয়াজ’ এমন সব ছবি প্রযোজনা করেছে, যা বাংলা সিনেমার ইতিহাসের নিরিখে ছকভাঙা বলা যেতে পারে। ‘তিন ইয়ারি কথা’, ‘দেখ কেমন লাগে’, ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’, ‘মহালায়া’ তেমনই কিছু ছবি। এমনকি ‘নিরন্তর’, ‘উড়নচণ্ডী’র মতো ছবি দিয়ে তো সত্যম ভট্টাচার্য, রাজনন্দিনী পাল, অমর্ত্য রায়, পরিচালক অভিষেক সাহাকেও ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে এসেছেন তিনিই।

কিন্তু পথটা কি এতটাই মসৃণ? সোহম

চক্রবর্তীর ‘অজস্র এন্টারটেনমেন্ট’ বা এখন ‘সোহমস এন্টারটেনমেন্ট’ তো এখনও সাফল্যের মুখ দেখেনি (অর্থকরী বা দর্শকের ভালবাসার নিজ্বিতে), যেমনটা দেখার আশা করা হয়েছিল। সোহম দর্শকদের নতুন নতুন স্বাদের ছবি উপহার দেওয়ার দাবি করে পরপর ছবি তৈরি করেছেন। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। এই প্রসঙ্গে আর এক প্রযোজক অঙ্কুশ জানালেন, “অভিনেতা



■ অভিনয়ের পাশাপাশি নিজেকে ভিন্ন অবতারে দেখতে চান শুভদ্রী



■ ‘আবার প্রলয়’-এর কলাকুশলীরা

হিসেবে কোথাও গিয়ে একটা রিস্ক নিতেই হয়। আমরা এত বছর ধরে অভিনয় করেছি, অনেক সময়ই আমাদের মনে হয় অমুক চরিত্র বা তমুক টাইপের গল্প পেলে ভাল হত। কিন্তু সেটা যে সবসময় পাওয়া যায়, তা তো নয়। অনেক সময় পছন্দের গল্প বা চরিত্র হলেও, সেই ছবি ডিস্ট্রিবিউশনের সমস্যার জন্য আটকে যায়। এই সবার জন্যই প্রযোজক হিসেবে চ্যালেঞ্জটা নেওয়া।” যদিও অঙ্কুশের ড্রিম প্রোজেক্ট ‘মির্জা’ ফিনালারের সঙ্গে আর্থিক সমস্যার জন্য আটকে গিয়েছে। কিন্তু অভিনেতা আশাবাদী, খুব তাড়াতাড়ি এই ছবির কাজ



■ প্রযোজক হিসেবে জায়গা পাকা করছেন পরমব্রত। পাশে তাঁর প্রযোজিত ছবির পোস্টার

আবার শুরু করতে পারবেন। বললেন, “এখন ‘মিজা’র প্রি প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এবং সব দিক যাতে ভাল করে সামলাতে পারি, তাই আমি নতুন দুটো ছবি ছেড়ে দিয়েছি। আসলে একটা সময়ের পরে কত টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা গৌণ হয়ে যায়। বরং মনে হয়, যে কাজটা করছি, সেটা যেন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।” কিন্তু এই যে নিরন্তর চাপ, এতে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় না? একটা সময় প্রযোজকদের বিরুদ্ধে অভিনেতাদের যে অভিযোগ থাকে, সেটা তো তাঁর দিকেও ধেয়ে আসতে পারে! অঙ্কুশ



বললেন, “পারে। কিন্তু প্রথম থেকে গোটা ব্যাপারটা পরিস্কার করে নিলে আর সমস্যা হয় না। আমারও যদি কিছু বলার হয়, আমি মন খুলে সহকর্মীকে বলতে পারি।” আসলে অঙ্কুশ চাইছেন, প্রযোজক হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর পদার্পণ যেন ভাল হয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। ঠিক যতটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের। একটা সময় বন্ধু রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা শুরু করেছিলেন তিনি। পরে ‘রোডশো ফিল্মস’ নিয়ে আলাদা হয়ে যান। কিন্তু পরিচালক অরিত্র সেনের সঙ্গে মিলে এই প্রযোজনা সংস্থা ‘বৌদি ক্যান্টিন’,

অঙ্কুশ চাইছেন, প্রযোজক হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর পদার্পণ যেন ভাল হয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। ঠিক যতটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের



■ বনি-কৌশানীর প্রথম প্রযোজিত ছবি

‘অভিয়ান’ (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বায়োপিক), ‘শহরের উষ্ণতম দিনে’, ‘বিয়ে বিভ্রাট’-এর মতো ছিমছাম সিনেমা উপহার দিয়েছে। ‘কালি’র মতো কিছু হিন্দি প্রোজেক্ট প্রযোজক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও বাড়িয়েছে। পরমব্রত জানিয়েছেন, “আমি মাল্টিটাস্কিং ভালবাসি। তাই অভিনয়, পরিচালনা, প্রযোজনা... কোনওটাতেই আমার আপত্তি নেই। আমি ব্যস্ত থাকতে চাই। এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে চাই। সেটা যদি প্রযোজক হিসেবে ভাল সিনেমা উপহার দেওয়া হয়, তো কেন নয়? অনেক সময় নতুনদের জায়গা করে দেওয়া, ভাল কনটেন্ট মানুষের সামনে নিয়ে যাওয়াটাও তো ইন্ডাস্ট্রির অংশ হিসেবে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে!”

পিছিয়ে নেই নায়িকারাও!

ভাবতে ভাল লাগে যে, এই তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনেত্রীরাও পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে আসছেন প্রযোজনায়। প্রথমে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত



■ সিনেমার টেকনিশিয়ানদের আরও বেশি করে কাজের সুযোগ করে দিতে চান যশ-নুসরত

যে ধরনের সিনেমায় ঋতুপর্ণা বিশ্বাস করেন, সেই কাজই মানুষের সামনে আনতে বদ্ধ পরিকর তিনি। পাশাপাশি শুভশ্রীও হাজির হয়েছেন প্রযোজক হিসেবে। আসছেন নুসরত।



প্রযোজনা সংস্থাটি তাঁর অপেক্ষাকৃত নতুন ভেদগার। এই প্রযোজনা সংস্থা ‘পটাদার কীর্তি’ থেকে ‘দত্তা’র মতো সাহিত্যধর্মী সিনেমাতেও ইনভেস্ট করেছে। এবং বলা যায়, যে ধরনের সিনেমায় ঋতুপর্ণা বিশ্বাস করেন, সেই কাজই মানুষের সামনে আনতে বদ্ধ পরিকর তিনি। উল্টোদিকে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও হাজির হয়েছেন প্রযোজক হিসেবে। তাঁর স্বামী রাজ চক্রবর্তীর জনপ্রিয় ছবি ‘প্রলয়’-এর সিকোয়েল ‘আবার প্রলয়’ (ওয়েব সিরিজ) নিয়ে। সিরিজটি মানুষের পছন্দ হয়েছে। এবং শুভশ্রী নিজের কাজ নিয়ে বেশ খুশিও। তাঁর বক্তব্য, “আমার শাশুড়িমা এবং রাজ বরাবর চেয়েছেন যাতে আমি অভিনয়ের পাশাপাশি নিজে একটা কিছু করি। নিজের একটা আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলি। আর সেটা অবশ্যই কোনও অন্য প্রযোজনা সংস্থার অধীনে নয়। ওঁরা উৎসাহ দিয়েছেন বলেই আমি এই পথে এগিয়েছি।” শুভশ্রীর ইচ্ছে, তিনি তাঁর এই প্রযোজনা সংস্থায় মূলত নতুনদের সুযোগ দিতে। অন্য ধারার কাজ করতেই তিনি বেশি আগ্রহী। অভিনেত্রীর কথায়, “প্রচুর গল্প শুনছি, অনেক নতুন লেখক-পরিচালকরা আসছেন। চেষ্টা করব, নতুন ধরনের কাজ করতে।” কেউ চাইছেন নতুনদের কাজ দিতে, কেউ আবার চাইছেন



■ নিজের প্রযোজিত ছবি ‘দত্তা’তে ঋতুপর্ণা

কথা ধরা যাক। একটা সময় তরুণ মজুমদারের বিভিন্ন সিনেমা থেকে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা (প্রাজ্ঞা), বৌদ্ধায়ন মুখোপাধ্যায়ের ‘তিনকাহন’, রেশমি মিত্রের ‘মুক্তি’তে প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছেন ঋতুপর্ণা। কিন্তু ‘ভাবনা আজ ও কাল’

প্রযোজনা সংস্থার অধীনে নিজের নতুন সত্তা খুঁজে নিতে। কৌশালী এই দ্বিতীয় দলেই পড়েন। তিনি এবং বনি কিছুদিন আগেই একটি প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেছেন। ‘বিকে এন্টারটেইনমেন্ট’। হরনাথ চক্রবর্তীর



■ বারবার ব্যর্থ হলেও সোহম চেষ্টা করছেন নতুন নতুন ছবি দর্শকদের উপহার দিতে



■ ‘মির্জা’ নিয়ে অনেক আশা অঙ্কুরের।
নাচে সেই ছবির পোস্টার
পরিচালনায় ‘ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি’
নামে একটি ছবি প্রযোজনা করেছেন। সেই



ছবিতে অভিনয়ও করেছেন।
কৌশানীর সাফ বক্তব্য, তিনি
যে ভাল অভিনেত্রী, সেটা
প্রমাণ করার জন্য তো জায়গা
দরকার। এতদিন অনেককে
বলেছেন অন্য ধরনের
স্ক্রিপ্টে কাজ করতে চান।
কিন্তু কেউ তাঁর উপর ভরসা
করেননি। এবার কৌশানী
নিজের প্রযোজিত ছবিতেই
অভিনয় করে দেখিয়ে দিতে
চান, তিনি কতটা ভাল
অভিনেত্রী। অবশ্য যশ এবং
নুসরত জাহানের ‘ওয়াইডি
ফিল্মস’ কিন্তু চায় ইন্ডাস্ট্রির
টেকনিশিয়ানদের জন্য কাজ
করতে। বেশিদিন ধরে, ভাল করে শুট

কৌশানী এবং বনি কিছুদিন
আগেই একটি প্রযোজনা
সংস্থা তৈরি করেছেন। ‘বিকে
এন্টারটেইনমেন্ট’। প্রযোজিত
ছবিতে অভিনয়ও করেছেন

করে ছবি তৈরি করতে চান তাঁরা, যাতে
ইন্ডাস্ট্রির এই টেকনিশিয়ানরা বেশিদিন
করে রোজগার করতে পারেন। তাঁদের
প্রথম ছবি হতে চলেছে ‘মেন্টাল’, যেখানে
যশ নিজেই অভিনয় করবেন।

আসলে ভিন্ন ভিন্ন নায়কদের ভিন্ন ভিন্ন
চিত্তাধারা। সেই ভাবনা থেকেই প্রযোজনা
সংস্থা খোলার তাগিদ। এটা অস্বীকার করার
উপায় নেই যে, সকলেই বাংলা সিনেমার
ভাল চাইছেন এবং দর্শকদের রুচির কথা
ভাবছেন। কিন্তু যে সমস্যাগুলো আছে,
সেগুলো অস্বীকার করা যায় কি? একজন
অভিনেতা যখন প্রযোজকের আসনে
বসেন, তখন বাকি প্রযোজকদের খরচের
কথাও ভাববেন, এটা আশা করা যায়।
আর তা যদি হয়, তা হলেই তো সার্বিক
উন্নয়ন হবে বাংলা ছবির।

সায়ক বসু



সাফল্যের কৃতিত্ব কিংবা ব্যর্থতার দায়, দুটোই আমার: রণবীর কপূর

তাঁর সাক্ষাৎকারের জন্য সারাবছর তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতে হয়।
কখন তাঁর কোনও ছবি রিলিজ করবে। সম্প্রতি মুম্বইতে সেরকমই একটি সুযোগ আসে।

রণবীর কপূর-এর মুখোমুখি আনন্দলোক

এ মনিতে তিনি সাক্ষাৎকার দেন না। একমাত্র ছবির মুক্তি থাকলেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তাই এই বছরে তাঁর কোন ছবি কখন রিলিজ হবে, সেই ক্যালকুলেশন করে মুম্বইতে তাঁর

দেখা পাওয়া গেল। তবে একবার যখন তাঁকে পাওয়া যায়, তখন তাঁর মতো ভাল ইন্টারভিউই ইভাঙ্কিতে খুব কমই থাকেন। কারণ তিনি তখন দেশের অন্যতম বড় সুপারস্টার হিসেবে নন, ঠিক যেন পাশের বাড়ির



■ বাবা, মা ও দিদির সঙ্গে বাড়িতে রণবীর কপুর

“আলিয়ার সঙ্গে বিয়ে এবং এখন রাহা আসার পর, শুটিং ছাড়া আমার বাড়ির বাইরে থাকতে ভালই লাগে না। বন্ধুরা দেখা করতে চাইলে, তাদের বলি বাড়িতে চলে আসতো।”

পরিচিতর মতোই ধরা দেন...

রণবীর কপুর নাকি মানুষ হিসেবে এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছেন? ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই এটা মনে করেন। আপনারও কি তাই মনে হয়?

আগে জানতে হবে এই বদলটা ভাল না খারাপ? ইন্ডাস্ট্রির এই লোকেরা কী বলছেন?

অবশ্যই ভাল। খারাপ হলে সাক্ষাৎকারের প্রথম প্রশ্ন হিসেবে এটাকে রাখার ঝুঁকি নিতাম না!

দ্যাটস আ নাইস ওয়ান। দেখুন, বয়সটা তো বেড়েছে। তাই তার সঙ্গে ম্যাচিয়োরিটিও বাড়বে, এটা আশা করা যায়। শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, এটা যে-কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আজ থেকে দশবছর আগে আমি যেভাবে জীবনটাকে দেখতাম, জীবনের প্রায়োরিটি যা-যা ছিল, আজ সেগুলো বদলে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রে বাবার (ঋষি কপুর) চলে যাওয়া, আলিয়ার সঙ্গে বিয়ে আর আমাদের কন্যাসন্তান রাহার জীবনে আসা, এই তিনটে ঘটনা ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে।

আমার জীবনভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। বাবা চলে যাওয়ার পর এখন বুঝি, বাবা কেন আমার উপর অভিমান করতেন। আমার কোন-কোন আচরণ বাবার পছন্দ হত না এবং কেন। আবার আলিয়ার সঙ্গে বিয়ের আগে অবধি, বাড়ির বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বা পার্টি করতেই আমার ভাল লাগত। কিন্তু আলিয়ার সঙ্গে বিয়ের পর এবং বিশেষ করে এখন রাহা আসার পর, শুটিং ছাড়া আমার বাড়ির বাইরে থাকতে ভালই লাগে না। বন্ধুরা দেখা করতে চাইলেও বলি, বাড়ি চলে আসতে। এছাড়া এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শান্ত হয়েছি এবং ধৈর্যশক্তিও বেড়েছে।

আজকের প্রজন্মের স্টার হয়েও আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই! যদিও কানায়ুসোয় শোনা যায় যে, আপনার হিডেন প্রোফাইল আছে। সেখান থেকে আড়ালে আপনি সবকিছুর উপর নজর রাখেন। যদি সত্যি হিডেন প্রোফাইল থাকে, তা হলে আমি তো সেটা আপনাকে কিছুতেই ডিসক্লেজ করব না। কারণ আপনি নিজেই বললেন সেটা হিডেন! আর আমার

সোশ্যাল মিডিয়াতে না থাকার প্রসঙ্গে বলি, আমি একটু ওল্ড স্কুল। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়। আমার বাকি সহকর্মীদের মতো আমার কোনও টিম নেই, যারা আমার কী করা উচিত, কোন ছবি সই করা উচিত, কোন পার্টিতে কী পোশাক পরা উচিত, কার সঙ্গে কথা বলা উচিত, এগুলো ঠিক করে দেবে। আমার নিজের যেটা মনে হয় ঠিক, আমি সেটাই করি। তাই আমার সাফল্যের জন্যও আমি পুরো কৃতিত্ব নিই এবং আমার ব্যর্থতার দায়ও সম্পূর্ণ আমার। আর আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমি এখনও প্রবলভাবে বিশ্বাস করি, সোশ্যাল মিডিয়া আপনার স্টারডম নষ্ট করে দেয়। আমি ফিল্ম পরিবারে বড় হয়েছি, চোখের সামনে দেখেছি স্টারডম কাকে বলে। লোকের উন্মাদনা, টিকিট ব্ল্যাক হওয়া, প্রিয় নায়ককে একবলক দেখার জন্য উপচে পড়া ভিড়। আজ সেগুলো কোথায়? আমি ভুল বলতে পারি কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ এত সহজে তাদের প্রিয় তারকাদের সম্পর্কে এতকিছু জেনে ফেলছে, এতকিছু দেখে ফেলছে যে, তাদের মনে আর আলাদা করে কোনও উন্মাদনা কাজ করে না। আমি যদি নিজেকে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে না রাখতে পারি, তা হলে মানুষের মধ্যে আমাকে নিয়ে উন্মাদনা কেন থাকবে?



■ কলকাতায় ইডেনে সৌরভের সঙ্গে

এই নিয়ে আলিয়ার সঙ্গে তর্ক হয় না? উনি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে সুপার অ্যাক্টিভ এবং ওঁর সব ক্ষেত্রেই এক-একটা বড় টিম রয়েছে।

কেন তর্ক হবে? আলিয়া একজন আলাদা মানুষ, আমি আলাদা। আমাদের জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা, কাজ করার পদ্ধতি, অবশ্যই আলাদা হবে। সেখানে আমি কেন ওর কাজের জায়গায় নাক গলাতে যাব?

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই যখন এক প্রফেশনে আছেন, কাজ নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হয় না?

কেন হবে না? সুস্থ আলোচনা হয়, তর্ক হয়

না। আর এমনিতেও আলিয়াকে আমি ট্রেড পণ্ডিত বলে ডাকি। যত সিনেমা রিলিজ করে, শুক্রবার সকাল থেকে আলিয়া বসে পড়ে সেই ছবি কোথায় কত ব্যবসা করছে, সেই অঙ্ক নিয়ে। আর আমার ছবি রিলিজ হলে তো কথাই নেই! সকাল থেকে বিভিন্ন হলের মালিকদের ফোন করে কালেকশনের খোঁজ নিতে থাকে। ওর কাছ থেকেই আমি প্রথম জানতে পারি, আমার ছবি কেমন ব্যবসা করছে, সেটা হিট হবে না ফ্লপ। আর আলিয়ার চিন্তাভাবনা খুব ম্যাচিয়োরড। তাই কেরিয়ার সংক্রান্ত কোনও কনফিউশন থাকলে ওর সাহায্য নিই, যদিও ফাইনাল সিদ্ধান্তটা থাকে আমার নিজেরই।

এই যে ছবির হিট বা ফ্লপ হওয়া, এটাকে আপনি কতটা গুরুত্ব দেন?

দেখুন, হিট ফ্লপ নিয়ে ভাবতে তো হবেই। আল্টিমেটলি একজন প্রযোজক আমার উপর লগ্নি করছেন, আমি নিশ্চয়ই চাইব না তাঁর আর্থিক ক্ষতি হোক। তবে ছবি সইয়ের সময় সেটা মাথায় রাখি না। তাহলে ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় না। আমার কেরিয়ারে এমন অনেক ছবি আছে, যেরকম ‘বম্বে ভেলভেট’ বা ‘জগ্মা জাসুস’, যেগুলো ক্রিয়েটিভলি আমার মনের খুব কাছের, কিন্তু বক্স অফিসে সফল হয়নি। আবার ‘শামশেরা’র মতো ছবিও আছে যেটা পরে দর্শক হিসেবে আমি দেখার পর বুঝেছি, ছবিটার কোথায় গলদ ছিল।

আমরা জানি রণবীর কপূর ভাস্টাইল অভিনেতা, তিনি সব ধরনের চরিত্র এঙ্গলো করে চান। কিন্তু রমকম ছবির নায়ক



■ বিয়ের মধ্যে আলিয়ার সঙ্গে



■ রণবীর বরাবরই ঘরোয়া। মুম্বইতে দুর্গাপুজোয় ভোগ বিতরণ করছেন নিজের হাতে

“আমি এখনও প্রবলভাবে বিশ্বাস করি, সোশ্যাল মিডিয়া আপনার স্টারডম নষ্ট করে দেয়। আমি ফিল্ম পরিবারে বড় হয়েছি, চোখের সামনে দেখেছি স্টারডম কাকে বলে।”



■ বরাবরের ফুটবল প্রেমিক রণবীর

হিসেবে আপনার যেখানে জনপ্রিয়তা, সেখানে হঠাৎ ইমেজ বদলে ‘শামশেরা’ বা এখন ‘অ্যানিমাল’-এর মতো হার্ড হিটিং অ্যাকশন ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

আমি তো চেয়েছিলাম একই ধরনের ছবি থেকে বের হতে, তাই যখনই অ্যাকশন ছবির

প্রস্তাব পাই, আমার মন সেদিকে ঝুঁকে যায়। দেখুন, এটা আমিও জানি যে ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’র মতো ছবি আমাকে যে মাত্রায় জনপ্রিয়তা আর সাফল্য দিয়েছে, সেটা হয়তো আর অন্য কোনও ছবি দিতে পারবে না। কিন্তু আমাকে নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে হবে। অভিনেতা হিসেবে সেটাই আমার চ্যালেঞ্জ। সেটাই তো আমাকে কিক দেবে। এবার ‘শামশেরা’ হিট হল কী ফ্লপ, সেটা তো পরের প্রশ্ন। কিন্তু আমি যদি আমার কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে না পারি, তাহলে সেই কাজ আমাকে খুব বেশিদিন এক্সট্রাইট করে না। তবে এটাও সত্যি যে, আপনার মতো অনেকেই এটা বুঝতে চান না। লভ রঞ্জনের সঙ্গে আমি ‘তু বুটি ম্যায় মক্কার’ ছবিটি করেছি। ওই জঁরের ছবির জন্যই লভ বিখ্যাত। ইন ফ্যাক্ট, লভ আমার কেরিয়ারের একমাত্র পরিচালক, যাকে আমি নিজে ফোন করে কাজের কথা বলেছিলাম। ফ্লাইটে ‘সোনা কে টিটু কী সুইটি’ ছবিটি দেখে আমি এতটাই উত্তেজিত হয়ে যাই যে, ফ্লাইট থেকে নেমেই লভকে ফোন করি। লভের সঙ্গে কাজ করছি শুনে বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু লভের সঙ্গে প্রথম সিটিংয়ের পর আমাদের পরিকল্পনা হয় অন্য একটি ছবি করার। সেখানে অজয় স্যরও (দেবগন) ছিলেন। অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ হার্ড হিটিং অ্যাকশন ফিল্ম। বাবা যখনই এটা জানতে পারেন, আমাকে ফোন করে ভীষণ ধমক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, লভের সঙ্গে কাজ করলে রমকম ছবিই যেন করি। পরবর্তীকালে অবশ্য অজয় স্যরের ডেটের



■ ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’ ছবির দৃশ্য

“‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’ যে জনপ্রিয়তা দিয়েছে, সেটা অন্য ছবি দিতে পারবে না। কিন্তু আমাকে কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে হবে।”

আমি রাহাকে পৃথিবীর বুকে আসতে দেখেছি। প্রথম যখন ওর হাতগুলো ধরি, মনে এমন এক শিহরণ হয়েছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। দ্যাট ওয়জ দ্য বেস্ট ফিলিং। এটাকে কোনও মূল্য দিয়ে আপনি কিনতে পারবেন না। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকি, আমি রাহার সঙ্গেই থাকি। ও ঘুমোলেও আমি ওকে দেখতে থাকি।



বাবা চলে যাওয়ার পর আপনার মা অভিনয়ের সেকেন্ড ইনিংস শুরু করলেন ‘যুগ যুগ জিও’ ছবিটি দিয়ে। এই নিয়ে আপনার কী বক্তব্য?

ছোটবেলায় আমি কিছুতেই চাইতাম না মা অভিনয় করুক। পরদায় মাকে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে রোম্যান্টিক দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখলে আমি খুব রেগে যেতাম। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাবা চলে যাওয়ার পর মা খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বাবা-মা একে-অপরের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। আমি আর আলিয়া মিলে মাকে জোর করি আবার অভিনয় করার জন্য। সেটা মাকে আনন্দ দেবে বলেই মনে হয়েছিল। আর আলিয়া মায়ের সঙ্গে

■ ‘শামশেরা’র প্রেস মিটে বাণী কপূর ও সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে

সমস্যা হওয়ায় সেই ছবিটি হয়নি। কিন্তু এই গোটা ঘটনাটা এটাই প্রমাণ করে যে, ইন্ডাস্ট্রিতে একটা মানুষ সম্পর্কে একটা মিথ তৈরি হয়ে যায়। আজ লভ রঞ্জন রমকম ছবি ভাল করে বলে সে অ্যাকশন ফিল্ম করতে পারবে না, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমিও চাই না আমার সম্পর্কে এরকম কোনও মিথ তৈরি হোক।

বাবা হিসেবে এখনও অবধি অভিজ্ঞতা কেমন?

আমি বলব, যে কোনও পুরুষের কাছে বাবা হওয়াটা জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা। আমি আলিয়ার সঙ্গে লেবর রুমে ছিলাম।

■ ‘ব্রহ্মাস্ত্র’র প্রচারে রণবীর, আলিয়া, অয়ন





■ লভ রঞ্জনের পরিচালনায় ‘তু ঝুটি ম্যায় মক্কার’ ছবির গানের দৃশ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে

“আমার সব চেয়ে বড় সম্ভূষ্টির কারণ হল, এই এতগুলো বছরে আমি যে ক’টা ছবি করেছি, সব নিজের ইচ্ছেতে করেছি। কারও প্রেশারে করিনি। এটা কখনও ভাবিনি যে...”

খুব সহজে মিশে যেতে পেরেছে। কখনও কখনও মা আমার চেয়ে ওকে বেশি প্রেফার করে! ভাবুন কী অবস্থা!

ইন্ডাস্ট্রি এখনও অবধি আপনাকে যেভাবে এন্ট্রোল করেছে, তাতে আপনি সন্তুষ্ট?

আমার সব চেয়ে বড় সম্ভূষ্টির কারণ হল, এই এতগুলো বছরে আমি যে ক’টা ছবি করেছি, সব নিজের ইচ্ছেতে করেছি। কারও প্রেশারে করিনি। এটা ভাবিনি যে, অমুক ছবিটির প্রযোজক খুব বড় কিংবা অমুক ছবিটি বক্স অফিসে খুব ভাল করতে পারে তাই করি। ক্রিয়েটিভলি একজন অভিনেতা হিসেবে আমার যে ছবি করা ঠিক মনে হয়েছে, আমি সেটাই করেছি। এই ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ তৃপ্তি দেয়। হতে পারে আমার বহু ছবি সফল হয়নি, কিন্তু সেই দায়টা আমি সম্পূর্ণভাবে নিজের কাঁধে নিতে পেরেছি। কাউকে দোষারোপ করার জায়গা রাখিনি। একজন অভিনেতার এটা একটা গর্বের জায়গা বলতে পারেন এবং তাই আমি মাথা উচু করে বলতে পারি, যা করেছি আমি নিজে করেছি।

এই যে অভিনেতা হিসেবে আপনি এতটা সাবলীল, আপনাকে পরদায় দেখলে মনেই

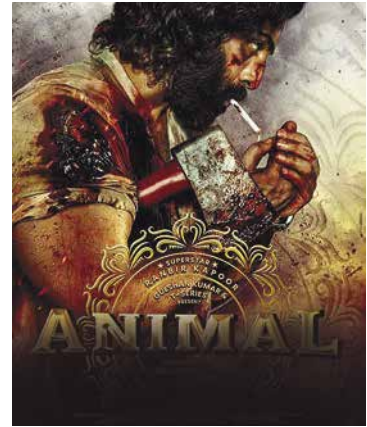
হয় না যে আপনি অভিনয় করছেন...

এটাও নিশ্চয়ই আপনার কোনও কৌশল?

পরদায় দেখলে মনে হচ্ছে না যে আমি অভিনয় করছি, এটা প্রজেক্ট করার জন্য আমাকে কিন্তু ভীষণ খাটতে হয়। বিশেষ করে আমি যে ধরনের ছবির জন্য জনপ্রিয়, সেই রমকম ছবির ক্ষেত্রে তো এই সাবলীল অভিনয় করাটা খুব চ্যালেঞ্জিং।

আচ্ছা, সঞ্জয় দত্ত-র বায়োপিক ‘সঞ্জু’ করার পর থেকেই আপনাকে নিয়ে অনেকগুলো বায়োপিকের কথা শোনা যায়। যেমন কিশোরকুমার, রাজ কপূর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়...

কিশোরকুমারের বায়োপিকের প্ল্যানিং প্রায় ১২ বছর ধরে চলছে। অনুরাগ স্যার (বসু) কিছুতেই ফাইনাল করছে না। এছাড়া রাজ কপূরকে নিয়ে আমার নিজের খুব ইচ্ছে আছে বায়োপিক করার। কিন্তু ওঁর জীবনে এত বিতর্ক রয়েছে যে আমি জানি না, কোনওদিনও রাজ কপূরের বায়োপিক হলে সেটা কতটা অনেস্টলি করা যাবে, কোনও কিছু না লুকিয়ে। আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক সম্পর্কে আমাকে কিছু বলা হয়নি। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো একজন মানুষের

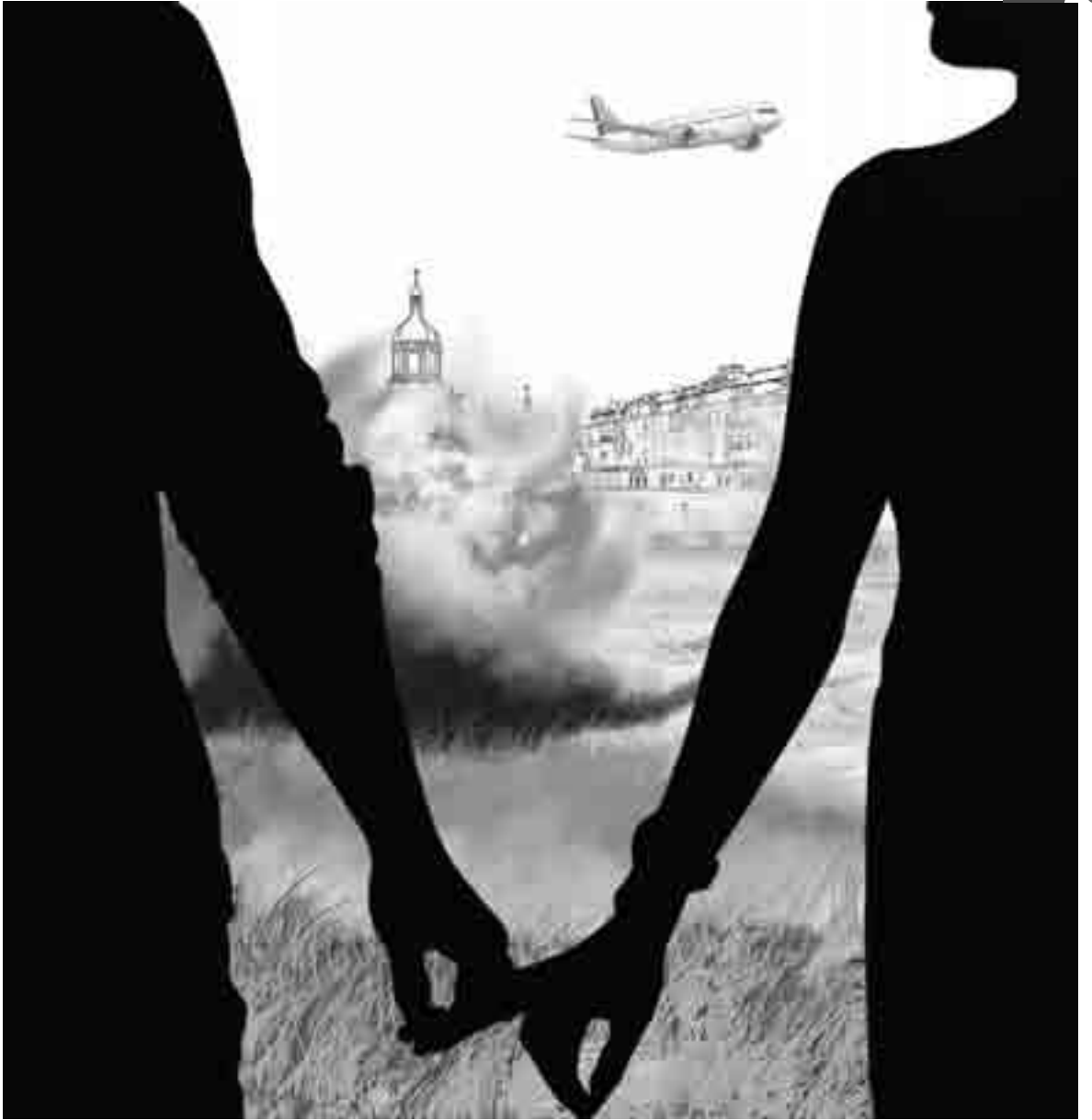


■ ‘অ্যানিম্যাল’ ছবির পোস্টার

বায়োপিকে কাজ করতে পারলে আমার ভাল লাগবে।

তাঁর নিজস্ব কোনও পিআর নেই। ছবির পিআর সাক্ষাৎকার চলাকালীন যখনই বলছিলেন ছবি নিয়ে প্রশ্ন করুন কিংবা তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎকার শেষ করুন, তখন তিনি নিজেই তাঁকে থামিয়ে বলেন, “আমি তো সবসময় সাক্ষাৎকার দিই না। আর আমার হাতে প্রচুর সময় আছে। ওঁকে প্রশ্ন করতে দিন। আর কোন প্রশ্ন উনি করবেন সেটা ওঁর ব্যাপার, কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না সেটা আমার ব্যাপার। তাই ওঁকে ইন্টারাপ্ট করবেন না!” সত্যি তিনি ব্যতিক্রমী... তিনি, রণবীর কপূর।

আসিফ সালাম



অলংকরণ: পিয়ালী বাল

ইউক্রেনের দিনগুলিতে প্রেম

ইন্দ্রনীল সান্যাল

অহম

প্রতিদিনের মতো আজও ল্যাপটপের ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকালেন তিথান্ন বছরের নীলিমা গোস্বামী। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সাল, সোমবার। এখন রাত পৌনে বারোট্টা। অহমকে ভিডিয়ো কল করার সময় হয়েছে। সময়ের হিসেবে ইউক্রেন দেশটি ভারতবর্ষের থেকে আড়াই ঘণ্টা পিছিয়ে। ওখানে সওয়া আটটা বাজে। আশা করা যায় ছেলে এখন রান্নাবান্না করছে।

হাওড়ার ‘রিভারসাইড’ অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের সাততলা থেকে সরাসরি গঙ্গা দেখা যায়। দেখা যায় পশ্চিমবাংলার ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র নবাবগঞ্জ। বাংলার এক নম্বর সংবাদপত্র ‘দিনরাত’-এর ‘পলিটিকাল বিট’ করেন বলে এইখানে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন নীলিমা, এমনটা নয়। তার স্বামী ইরবান গোস্বামীর জন্মস্থান হাওড়ার সদর বস্ত্র লেনে। নীলিমা গড়িয়ার মেয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ‘দিনরাত’-এ চাকরি করতে ঢোকান পরে প্রেম ও বিয়ে। ইরবান দেখতেন ‘কোর্ট বিট’ বা মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত খবর। কোভিড এবং লকডাউন শুরু হওয়ার পরে অন্য অফিসের মতো ‘দিনরাত’-এও ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ সংস্কৃতি চালু হয়েছিল। এখন অফিসে গিয়ে কাজ এবং বাড়িতে বসে কাজ—এই দো-আঁশলা মডেল চলছে।

যে-দু’টি কপি বা খবর লেখা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন নীলিমা, সে-দু’টি ল্যাপটপে সেভ করে চেয়ার থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। হাওড়ার এদিকটা খুবই ঘিঞ্জি, তবে বারান্দায় দাঁড়ালে দৃশ্য, বায়ু বা শব্দদূষণ বোঝা যায় না। বরং গঙ্গার দিক থেকে ভিজে বাতাস বয়ে আসে। এসি না-চালালেও দিবা চলে যায়। গঙ্গার ওপারে কলকাতা শহর বিলম্বিত করছে। সেদিকে তাকিয়ে পুরনো কথা ভাবছেন নীলিমা...

অহমের জন্ম ২০০০ সালে। স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা। ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ—প্রতি বছর ফাস্ট হত। উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টও খুব ভাল। কিন্তু মেডিকাল এন্ট্রান্স টেস্ট বা নিউ ইউজি-তে ব্যাঙ্ক হল ৪৫০০০-এর ঘরে। মেধা তালিকার ওই অবস্থানে থেকে বাংলা বা ভারতের কোনও সরকারি মেডিকাল বা ডেন্টাল কলেজে সুযোগ পাওয়া যাবে না। পড়়ে রইল বেসরকারি মেডিকাল কলেজ। সেখানে খোঁজ করতে গিয়ে নীলিমার চোখ ছানাবড়া। এমবিবিএস-এর একটি সিন্টের দাম ন্যূনতম এক কোটি টাকা। এডুকেশন ফি, হস্টেল চার্জ বা অন্যান্য খরচ ওই টাকার বাইরে।

এক কোটি! কারা এইসব জায়গায় ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠান? তাঁরা মাসে কত টাকা রোজগার করেন? তাদের পেশা কী? এইসব চিন্তায় নীলিমা যখন পাগল হয়ে যাচ্ছেন, তখন ইরবান সন্ধান দিয়েছিলেন ‘স্টাডি ইন ইউক্রেন’ নামের একটি সংস্থার। দিল্লির সংস্থাটির মালিক গুজরাতি। নাম প্রদীপ পটেল। প্রাথমিক মেল চালাচালির পরে জুম মিটিং হয়েছিল প্রদীপের সঙ্গে। ইরবান বলেছিলেন, “আপনার মেল পেয়েছি। সব কিছু পড়ার পরেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। আমার প্রথম প্রশ্ন হল, এত দেশ থাকতে ডাক্তারি পড়তে ইউক্রেনকে কেন বেছে নেয় ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টরা?”

সুট পরা, বছর পঞ্চাশের প্রদীপ ওয়েবক্যামের দিকে তাকিয়ে বললেন, “জয় শ্রীকৃষ্ণ! মোদা কথা হল, আমাদের দেশে যত ছেলেমেয়ে ডাক্তারি পড়তে চায়, তত সিট নেই। কাজেই সবাই আমেরিকের দেশে ডাক্তারি পড়তে পারবে না। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখুন যে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়ার যা খরচ, তার তুলনায় ইউক্রেনের কলেজে পড়ার খরচ অনেক কম। কাজেই উচ্চবিত্ত পরিবারের কম মেধাবী বাচ্চারা পড়বে ইন্ডিয়ায়। আর মধ্যবিত্তের কম মেধাবী বাচ্চারা পড়বে ইউক্রেনে!”

“ওখানকার পড়াশুনার মান?” বিত্ত নিয়ে খোঁচাটা হজম করে জানতে চাইলেন নীলিমা।

ওয়েবক্যামের পক্ষে মানানসই মাপা হেসে প্রদীপ বললেন, “ইন্ডিয়া বা ফর দ্যাট ম্যাটার, বেঙ্গলের মেডিকাল এডুকেশন সিস্টেম কি খুব উঁচু দরের, ম্যাডাম? এটা বরং বলা যায় যে, ইউক্রেনের মেডিকেল কলেজগুলো টিচার বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। ইন্ডিয়ার প্রাইভেট মেডিকাল কলেজে এক কোটি টাকা দিয়ে ভর্তি করবেন না ইউক্রেনের মেডিকাল কলেজে পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে, সেটা ভেবে বলুন।”

জুম মিটিং-এর আগেই নীলিমা এবং ইরবান ঠিক করে রেখেছিলেন, এই প্রস্তাবে রাজি হবেন। এত দিন ধরে দু’জন মিলে চাকরি করছেন। সঞ্চয় ভালই আছে। এ কথা ঠিক যে, ফ্ল্যাট কেনার সময় অনেক টাকা ডাউনপেমেন্ট করতে হয়েছিল। আজও মাস গেলে অনেক টাকা ইএমআই দিতে হয়। তবে দু’জনে মিলে গৃহঋণ প্রায় শোধ করে ফেলেছেন। এখন আর একটা রিস্ক নিয়ে অহমকে ডাক্তারি পড়ানোই যায়।

অহম অবশ্য কখনওই ডাক্তারি পড়তে চায়নি। নিউ ইউজি-র

টিউটোরিয়াল নেওয়ার সময় থেকেই বলে আসছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির অবস্থা জানেন নীলিমা ও ইরবান।

সে সব কথা এখন ভেবে লাভ নেই। নীলিমা বললেন, “আমরা রাজি। কিন্তু অন্যান্য খরচ?”

“দেখুন ম্যাডাম, ইউক্রেনে থাকা-খাওয়ার খরচ ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম বলেই সারা ভারতের ছেলেমেয়েরা দেশটাকে বেছে নেয়,” প্রদীপ বললেন, “আর একটা কথা বলে দিই। ইউক্রেনের মেডিকাল কলেজগুলোকে ‘ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল’ যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। ওখানকার এমবিবিএস ডিগ্রি থাকলে ইন্ডিয়ায় ডাক্তারি করতে অসুবিধে হবে না।”

জুম মিটিং-এ সব ঠিক হয়ে গেল। প্রথম কিস্তির টাকা মেটানোর পরে কাগজপত্র রেডি করে ফেললেন প্রদীপ। ২০১৯ সালের মাঝামাঝি ইউক্রেনের কিভ শহরের ‘কিভ মেডিকাল ইউনিভার্সিটি’-তে পড়তে চলে গেল অহম। এবং সেই বছরের শেষে শুরু হল কোভিড অতিমারি।

২০২০ সালে নীলিমার জীবনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম ঘটনা, ফেব্রুয়ারি মাসে ইরবানের চাকরি গেল।

রাজ্য সরকার বনাম এক বহুজাতিক সংস্থার মামলার ফয়সালা নিয়ে রিপোর্টিং করার সময় ভুল তথ্য পরিবেশন করেছিলেন ইরবান। সেটি প্রকাশ হওয়ার দিনই ‘দিনরাত’-এর লিগাল সেলে মাননীয় চিফ জাস্টিসের চিঠি আসে। তিনি জানতে চেয়েছেন, মিথ্যে প্রতিবেদন পরিবেশনের জন্যে কেন ‘দিনরাত’-এর বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করে ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে না।

পরের দিন সকালে ইরবান ল্যাপটপে লগ ইন করে দেখে, ‘দিনরাত’-এর মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ বা এইচ আর থেকে ছোট্ট একটা মেল এসেছে। ‘ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লম্ভার রিকোয়ার্ড।’

তখন ঘোর কোভিড! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সঙ্গে জুটেছে লকডাউন। সারা দুনিয়া নিজেই গুটিয়ে নিয়েছে, সবুজ গ্রহ নিজেই রিবুট করছে। তারই মধ্যে চলছে নীলিমার ওয়র্ক ফ্রম হোম, দিনে বোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা। সঙ্গে আছে অহমের খবর নেওয়া, একা হাতে ফ্ল্যাট সামলানো। এত কাজের মধ্যে ইরবানের দিকে নজর দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। হাসিখুশি, আমুদে ইরবান চুপ করে গিয়েছেন, প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছেন না, দিলেও মোনো সিলাবেলে; খাচ্ছেন না, ঘুমোচ্ছেন না, স্নান করছেন না— এক ছাদের নীচে থাকা সত্ত্বেও এগুলো খেয়াল করেননি নীলিমা। বুঝতে পারেননি, ইরবান বিষণ্ণতা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

এই সময় নীলিমার জীবনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল। নীলিমার শাড়ি গলায় জড়িয়ে ইরবান আত্মহত্যা করলেন।

লকডাউনের মধ্যেই থানা-পুলিশ, হাসপাতাল-মর্গ, শ্মশান-সংকার! নেহাত নীলিমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়র দাদা প্রফুল্ল বানার্জি এখন পশ্চিমবঙ্গের একজন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব। তাই বিশেষ ঝামেলা হয়নি। নবাব থেকে এক ফোনে সব কাজ হয়ে গিয়েছে।

মুশকিল হল অন্য জায়গায়। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ভারতের আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পরে অহম বাড়ি ফিরতে পারেনি। নীলিমা ই স্বামীর অন্তিম ক্রিয়া সেরেছিলেন। শ্মশানে আর কেউ না এলেও প্রফুল্ল এসেছিলেন। উনবিঘ বছরের লম্বা-চওড়া, সুট পরা, ক্লিন শেভড মানুষটি চুপ করে নীলিমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

দু’ বছর পেরিয়ে এসে শোক অন্তিমিত। নীলিমা একক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ওয়র্ক ফ্রম হোম আর মাঝে মাঝে অফিস যাওয়ার রুটিনের বাইরে একটি মাত্র জিনিসের জন্যে সারাদিন অপেক্ষা করে থাকেন। অহমের সঙ্গে ভিডিও কল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারান্দা থেকে ঘরে ফিরলেন নীলিমা। আজকের কপি দুটো অফিসে মেল করে, ল্যাপটপ শাটডাউন করে মোবাইল হাতে নিলেন। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ডায়াল করে মোবাইলের স্পিকার অন করলেন।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে বাইশ বছরের অহমকে। জিন্স আর লাল টিশার্ট পরা ছেলেটির গড়ন রোগার দিকে। মাঝারি উচ্চতা, এক মাথা বাঁকড়া চুল, গালে দু’দিনের না কামানো দাড়ি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বলল, “হাই মা!”

“আজকের মেনু কী?” জানতে চাইলেন নীলিমা।

“এগ-চাউমিন! জাস্ট দু’ মিনিটস!” দু’ আঙুল নাড়ে অহম। ফুটন্ত জলে নুডলের চাঙড় আর ফেটানো ডিম গুলে দেয়।

“একটা আস্ত জেনারেশন এগ-চাউমিন খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে। তোরা এরকম কেন?” খাবার টেবিলের মোবাইল স্ট্যান্ডে ফোন রেখে সুপের বোল নিয়ে বসলেন নীলিমা।

“তুমিও তো সুপ আর স্যালাড খেয়ে জীবন কাটাচ্ছ। আমি জাজমেন্টাল হয়ে কিছু বলেছি?” কটা দিয়ে নুডল খাটছে অহম।

“আমি ডায়েট করছি। আমার কথা আলাদা। তুই প্লিজ পেট পুরে খা। না-হলে এত পড়াশুনো টানতে পারবি না।”

“পেট পুরে খেলেই বরং টানতে পারব না,” গ্যাস অফ করে অহম, “এখন পড়তে বসব। চলবে রাত তিনটে পর্যন্ত। এই সময় ভাত-ফাত খেলে বিচ্ছিরি ঘুম পাবে।”

মা-ন্যাওটা ছেলে কত বড় হয়ে গেল। দেখে আশ আর মেটে না। তাকিয়ে থাকলেই স্বর্গস্থ! কিন্তু সেটা তো আর করা যায় না। ছেলে রেগে গিয়ে ফোন কেটে দেবে। কথা চালু রাখতে নীলিমা বললেন, “ওদিককার কী খবর?”

একদলা চিনে সুতো কাঁটা দিয়ে তুলে মুখে পুরে অহম বলে, “লুহানস্ক এবং দোনেৎস্কনামের দুটো জায়গায় সৈন্য পাঠানোর আদেশ দিয়েছে ব্লাদিমির পুতিন। একসঙ্গে ওই দুটো জায়গার নাম উনবাস। সেই উনবাসকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিও দিয়েছে পুতিন। লোকটা মহা বদ!”

সুপ শেষ করে স্যালাডের প্লেট টেনে নিয়ে নীলিমা বললেন, “রাশিয়া ইউক্রেন ঝামেলা নিয়ে কলেজ কী বলছে?”

“কলেজ বলছে, তোমরা ভয় পেয়ো না, থেকে যাও। এ হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে নার্সের লড়াই। যুদ্ধ-যুদ্ধ নাকি ভাঁওতাবাজি।”

“কলেজ কেন থেকে যেতে বলছে? এখন তো সারা দুনিয়া অনলাইনে ক্লাস করছে।”

“ডিম্মার মাদার, ডাক্তারিটা অনলাইনে হয় না। পেশেন্টের গায়ে হাত না দিলে কিসসু শেখা যায় না। ওরা অবশ্য আমাদের জন্যে এত ভেবেচিন্তে আমাদের থেকে যেতে বলছে না। আমরা ইন্ডিয়া চলে গেলে হাসপাতালে ওদের ওয়র্কফোর্স কমে যাবে।”

“তুই চলে আয় তো! ক’দিন বাড়িতে কাটিয়ে যা।”

“গেলে আমারই পড়াশুনোর ক্ষতি মা। আমাকে এখানে পড়ানোর জন্যে তোমরা কত লাখ টাকা খরচ করেছ বলো তো!”

নীলিমার গলার কাছটা ভারি হয়ে এসেছে। অপত্য স্নেহ কাঁদিয়েই ছাড়বে এবার। নিজেকে সামলাতে সুপের বোল সিল্কে রেখে এলেন। চেয়ারে বসে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই বিষয়টা নিয়ে তোকে ভাবতে বারণ করা আছে।”

“বাবা মরে না গেলে আমি ভাবতামই না,” চাউমিন শেষ করে সিল্কে বোল রাখতে যায় অহম। কান্না লুকোনোর জন্যে ছেলেকে তাঁরই কায়ালা অবলম্বন করতে দেখে মৃদু হাসেন নীলিমা।

“প্রদীপ পটেলের সঙ্গে কথা বলেছিস?” কথা ঘোরালেন নীলিমা।

“লোকটাকে ফোন করলে ধরে না, টেক্সট করলে উত্তর দেয় না, মেল করলে জবাব দেয় না। ওর কথা বাদ দাও।”

“ইন্ডিয়ান এমবাসির ওই মহিলার কী যেন নাম?”

“গুঞ্জান মেহতা? শি ইজ গুড। উনি আমাদের বলেছেন দেশে ফেরত যেতে। কিন্তু সেটা গুঁর পার্সোনাল ওপিনিয়ন।”

“পার্সোনাল ওপিনিয়ন নয়,” আপত্তি করেন নীলিমা, “১৫ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাস প্রথম অ্যাডভাইসরি... আই মিন... পরামর্শপত্র জারি করে। সেটা আমি পড়েছি। লেখা আছে, ‘ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টরা কিছুদিনের জন্যে ইউক্রেন ছাড়ার কথা বিবেচনা করতে পারো।’”

অহম বলল, “ওই অ্যাডভাইসরি পড়ে অনলাইনে ফ্লাইটের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি টোটাল হাউসফুল। আলিয়েস্ট টিকিট পাওয়া যাচ্ছে সিঙ্গাপুর মাঠের। সেটাই কেটেছি। আর তো মাত্র দুটো সপ্তাহ। তারপরেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আচ্ছা, আমি রাখছি।”

“এত তাড়া কীসের?” অভিমান হয়েছে নীলিমার, “বাইয়ের ফোন আসছে বুঝি?”

হোহো করে হেসে অহম বলল, “বাই নয় মা, কথটা বো। ‘বিফোর

এনিথিং এলস’-এর শর্ট ফর্ম হল ‘বি-এ-ই’ বা ‘বো’। তুমি এসব ল্যান্ডস্লেজ শিখলে কী করে?”

“বে’ না বলে ‘ব্যা’ বলতে পারিস।” হাসছেন নীলিমা, “বাই দ্য ওয়ে, ইউক্রেনের মেয়েরা খুব সুন্দরী হয়!”

“উফ মা! পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় নেই। এখন মেয়ে-ফেয়ের কথা বোলো না, টাটা!”

“মেয়েতে অ্যালার্জি থাকলে বল। ইউক্রেনের ছেলেগুলোকেও ফটাফাটি দেখতে! ‘ব্যা’ হিসেবে মানাবো।”

“বাজে বোকো না তো! এতই যদি ইউক্রেনের ছেলে পছন্দ তা হলে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে মেল করো। উনি আগে টিভি সিরিয়াল আর মুভিতে অভিনয় করতেন। স্ট্যান্ড আপ কমেডিও করেছেন।”

“মায়ের জন্যে পাত্র দেখতে হবে না! নিজের একটা গতি কর। মা আজীবন পাশে থাকবে না,” ছদ্মক্রোধ দেখিয়ে ফোন কাটলেন নীলিমা। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এলেন। ঘুমের ক্লাসে যাওয়া আগে জিভের নীচে ঘুমের বড়ি রেখে ভাবলেন, ছেলেটাকে আবার দেখতে পাবেন আগামীকাল রাতে।

ইউক্রেনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অহম তখন কাউকে ফোন করছে। এনগেজড টোন পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে। রিডায়াল করছে। আবার এনগেজড টোন পাচ্ছে।

উফ! রুহির কাছেও বাড়ি থেকে ফোন এসেছে তা হলে!



রুহি

“এ বাবা! মাত্র চারটে পাউরুটির প্যাকেট পড়ে আছে,” বেকারির তাক থেকে সবক’টা প্যাকেট নিয়ে ট্রিলিতে রাখল বাইশ বছরের রুহি লাইফী। পাশে দাঁড়ানো সমবয়সি আয়েশা খাতুন বলল, “ডিমও মাত্র পাঁচ ক্রেট পড়ে আছে। এক ক্রেট নিয়েছি। আর নেব?”

“এক ক্রেটে তিরিশটা ডিম থাকে। এত ডিম দিয়ে আমরা কী করব?” কুড়িটা কাপকেট ট্রিলিতে রাখছে রুহি।

“ডিম ফুরিয়ে গেলে তুই পাড়বি তো?” সিলপো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আইল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রুমমেট এবং ক্লাসমেটকে মুখঝামটা দেয় আয়েশা।

“বাজে বকিস না।” পেমেন্ট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছে রুহি, “সাড়ে আটটা বাজতে যায়। কলকাতায় এখন রাত বারোটা। এমসিপি বাপ এক্ষুনি ফোন করে খবর নেবে কার সঙ্গে বেলেগ্লাপনা করছি। তার আগে হস্টেলে ঢুকতে হবে।”

“সাড়ে আটটা বেজে গেল? ধুর ভান্নাগে না! তাড়াতাড়ি চল!” ক্রেডিট কার্ডে দাম মেটাচ্ছে আয়েশা, “যা কিনেছি তা দিয়ে এক হপ্তা চলে যাবে। হোপফুলি তার মধ্যে জঘন্য প্রক্সি ওয়ারটা বন্ধ হবে।”

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নামে দু’জনে। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে সাইকেল নিয়ে সাঁসাঁ করে চালায়। পশ্চিম ইউক্রেনের টার্নোপিল শহরে অবস্থিত ‘টার্নোপিল স্টেট মেডিকাল ইউনিভার্সিটি’-র হস্টেলে ঢোকা বা বেরোনোর ব্যাপারে কড়া কড়ি না থাকলেও এখন যা পরিস্থিতি তাতে কেউই ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে না বেরোনোই প্রেফার করছে। রুহি আর আয়েশা তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। দু’জনের স্বভাবের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। রুহি ঠান্ডা মাথার মেয়ে। ভেবেচিন্তে কাজ করে। আয়েশা সব সময় উত্তেজিত, শক্তিত।

টার্নোপিল পশ্চিম ইউক্রেনের অন্যতম প্রধান শহর। এখানে আসার আগে ইউক্রেন সম্পর্কে কিছুই জানত না রুহি। পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত রেস্টুরার মাখনে ভরপুর ‘চিকেন আ লা কিয়েভ’ পদটি ছিল ইউক্রেনের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। ইউক্রেনে আসার আগে জেনেছে,

শহরের ঠিক উচ্চারণ হল ‘কিভ’। টার্নোপিল শহরটা খুব সুন্দর। চারিদিকে সবুজে ঠাসা। সারা বছর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। ঘোরার জায়গা বলতে একটা আর্টস মিউজিয়াম, একটা চার্চ আর টার্নোপিল লেক। লেকটা আদতে কৃত্রিম জলাধার। বিশাল লেকের চারপাশে সুন্দর আর নিরিবিলি একটা পার্ক আছে।

রুহির বাড়ি কলকাতার বালিগঞ্জ প্লেসে। তার বাবা, পঞ্চানন বছরের মেঘনাদ লাহিড়ী নামকরা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মায়া ভট্টাচার্যের কার্ডিওলজিস্ট। রুহির মা, তিপান্না বছরের মেছলি ‘ফ্লাই এয়ার’ প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের ফার্স্ট অফিসার বা পাইলট। দেশ এবং বিদেশ—দু’ জায়গাতেই বিমান চালান। ছোটবেলা থেকেই রুহি দেখে আসছে, বাবাকে বাড়িতে পাওয়া গেলেও মায়ের বাড়িতে থাকার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিন রাত বাড়ির বাইরে কাটান। দিনের বেলাতেও যে থাকেন এমনটা নয়। অন্যদিকে, মেঘনাদকে নিয়মিত টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়। সপ্তাহে অন্তত একবার খবরের কাগজ বা পত্রিকায় সাক্ষাৎকার থাকে। সোশাল মিডিয়ায় তো রোজই পাওয়া যায়।

রুহি বরাবর বাবার পেশার প্রতি আকৃষ্ট হলেও মাকে বেশি ভালবাসে। মাকে বেশি ভালবেসে বাবার পেশায় যেতে চাওয়ার মধ্যে যে-স্ববিরোধ আছে তার কারণ মেঘনাদ। সমাজে ‘ডাক্তার মেঘনাদ লাহিড়ী’-র যে ইমেজ তিনি সচেতনভাবে তেরি করেছেন, তার সঙ্গে বাড়ির মেঘনাদের মিল নেই। বাইরের পলিটিকালি কারেক্ট মানুষটি ঘরে ঢুকলেই তীব্র নারীবিদ্বেষী। মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করেন না, ছোট পোশাক পরা নিয়ে সমস্যা আছে। রুহির তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া ভাল এবং সেটি, প্রেফারেন্সি বারেন্ড ব্রান্ডের সঙ্গে— একথা তিনি বলে থাকেন। শুধুমাত্র এই কারণে বাবাকে ‘এমসিপি’ বা ‘মেল শভিনিস্ট পিগ’ বলে রুহি। অবাক হয়ে ভাবে মা কী করে এত বছর লোকটার সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন!

মেছলির আবার অন্য সমস্যা। কাজের জায়গায় আদ্যন্ত পেশাদার হলেও বাড়িতে ঢুকলেই ছোটখাটো জিনিস ভুলতে শুরু করেন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। মেঘনাদ শুধরে দিলে কুঁকড়ে যান। রুহির বরাবর মনে হয়, ডিভোর্স করলে দু’জনেই সুখে থাকবেন। কথাটা মেছলিকে বলেও দেখেছে। মেছলি বলেছেন, “আমি না থাকলে ওর কী হবে!” রুহি আন্দাজ করে মেঘনাদের আধিপত্য মেছলি অবচেতনে উপভোগ করেন।

রুহি চেয়েছিল ডাক্তার হতে। প্রচুর পড়াশুনা করেও নিট ইউজিতে র‍্যাঙ্ক হল ৪০০০০-এর আশেপাশে। মেঘনাদ চাননি মেয়ে ডাক্তারি পড়ুক। তিনি নিদান দিলেন, “ডাক্তারি সাবজেক্টটা মেধাবীদের জন্যে। রুহি ইংলিশে অনার্স নিয়ে পড়ুক।”

রুহি ইতিমধ্যে ‘স্টাডি ইন ইউক্রেন’ সংস্থার প্রদীপ পটেলের সঙ্গে ইমেলে যোগাযোগ করে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছে। প্রথম জুম মিটিং-এ রুহির সঙ্গে মেছলিও ছিলেন। যাবতীয় তথ্য জেনে, মেঘনাদের সঙ্গে কথা বলেন মেছলি। মেঘনাদ ফুৎকারে সব কথা উড়িয়ে বলেন, “টাকা দিয়ে মেধা কেনা যায় না। তা ছাড়া বাপের টাকায় ডাক্তারি পড়ার এত শখ কেন?”

মেছলি নিচু গলায় বলেছিলেন, “টাকা আমি দেব। তুমি শুধু ঠিক করে দাও মেয়ে কোন কলেজে পড়বে।”

মেঘনাদ কথা বাড়াননি। পরের জুম মিটিং-এ তিনিই প্রদীপকে বলেন যে রুহি টার্নোপিল স্টেট মেডিকাল ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। মেঘনাদ চাইলে আরও কিছু টাকা দিয়ে রুহিকে কিভ বা খারকিভ শহরের আর একটু ভাল মেডিকাল কলেজে ভর্তি করাতে পারতেন কিন্তু করেননি। যদিও রুহি জানে তার অন্য সব খরচ মেঘনাদ বহন করেন। এখানকার টিউশন ফি ৪২০০ ডলার, হস্টেল ফি ১০০০ ডলার, এককালীন চার্জ ১৮০০ ডলার। সব মিলিয়ে ৭০০০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় অনেক টাকা!

রুহির চিন্তার মধ্যেই মোবাইল বেজে উঠেছে। “বাবার ফোন,” বলে সাইকেল চালানো বন্ধ করে ফোন ধরে সে। মোবাইলের পর্দায় দেখা যাচ্ছে মেছলির মুখ।

মেছলির মধ্যে তীব্র এক সৌন্দর্য আছে। তীব্র সেই রূপের অভিঘাতে প্রথম দর্শনে যে কোনও মানুষ কথা ভুলে যান। অন্ধকারের মধ্যে চোখে আলো পড়লে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মেছলিকে দেখলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই অবস্থা হয়। মেছলি সেটা জানেন এবং নীরবে উপভোগ করেন। তিনি বাড়িতে শাড়ি পরে থাকেন, অফিস যাওয়ার সময় সূট।

দু’রকম পোশাকেই ‘সুইস আর্মি নাইফ’-এর মতো ধারালো এবং সুন্দর।

মাকে দেখে রুহি বলল, “সাইকেল চালাচ্ছি।”

বেডরুমের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মেছলি ভুরু কুঁচকে বললেন, “এত রাতে বাইরে? বাবা জানলে কী হবে জানিস?”

যাক! মেঘনাদ ঘরে নেই। রুহি জানে, হস্টেলের বাইরে বেরোনোর কথা মা বাবাকে বলবে না। হাতে মিনিট পাঁচেক সময় আছে। সে সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে বলল, “পাঁচ মিনিট পরে ফোন করো।”

“ধুর বাবা! ভান্নাগে না!” প্যাডেলে পা রেখে গজগজ করছে আয়েশা। দু’জনে মিলে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকে। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। আয়েশা বাথরুমে ঢুকে চেল্লায়, “আমি খিচুড়ি রাঁধব। তুই অমলেট ভাজিস।”

“ঠিক হ্যাঁ!” রুমের মধ্যেই জামাকাপড় খুলছে রুহি। গলাচ্ছে রাতপোশাক। টেবিলে রাখা স্ট্যান্ডে মোবাইল ফিট করতে না করতেই আয়েশা বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। রুহি দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ সাবান দিয়ে ধুয়ে হাতে স্যানিটাইজার বুলিয়ে নিল।

রুহিও মায়ের মতোই সুন্দরী এবং ফর্সা। তবে মোটার ধাত বলে মায়ের ধারালো ভাবটা নেই। টার্নোপিলে এসে ওজনও বেড়েছে। রুহির তুলনায় আয়েশার চেহারা ছিপছিপে। শ্যামলা রং আর চেহারার কারণে রুহির আগে আয়েশাই পুরুষদের নজরে পড়ে।

আবার ফোন বাজছে। সবুজ বৃত্তে আঙুল ঝুঁয়ে ভিডিয়ো কল চালু করে রুহি বলল, “বাবা কোথায়?”

“একটু আগে ঘরেই ছিল,” নিচু গলায় বলেন মেছলি, “আগের ফোনটা কাটার ঠিক পরেই ঢুকল। ও কিছু বুঝতে পারেনি।”

“থ্যাঙ্ক গড!” দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুহি, “তোমাদের খবর বলো।”

“আমি সাতদিনের ছুটি নিয়েছি। ভেবেছিলাম অফিস, ব্যাঙ্ক আর হেলথ ইনশিওরেন্সের কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করে রাখব, ল্যাপটপের যাবতীয় ডেটার ব্যাক আপ নেব, কিচেন আর বাথরুমে মিক্সি লাগাব। সব ঠেঁটে গেল। যাক গে, আমার কথা বাদ দে। তোর খবর বল। শুনলাম রাশিয়ান পার্লামেন্ট নাকি পুতিনকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে?”

“ওদের আবার অনুমতি দেওয়া,” বিরক্তি প্রকাশ করে রুহি, “এমনভাবে বলছে যেন রাশিয়ান পার্লামেন্ট আর ব্লাদিমির পুতিন দুটো আলাদা এনটিটি।”

“আজ কী রান্না হচ্ছে?” প্রসঙ্গ পাল্টালেন মেছলি।

“আমি খিচুড়ি বানাচ্ছি আন্টি,” চিৎকার করে আয়েশা, “রুহি অমলেট বানাবে। সুপারমার্কেটে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।”

আয়েশা এবং তার পরিবারের সঙ্গে রুহির পরিবারের আলাপ কলকাতায়, ইউক্রেনে আসার আগে। তখনই আয়েশা মেছলির কাছে জানতে চেয়েছিল, “আপনাকে কী বলে ডাকব?”

“আন্টি” এবং ‘আঙ্কল’ সম্বোধন মেছলিই বেছে দেন। আয়েশা মুখ গোমড়া করে বলেছিল, “আমি বাগনানের মেয়ে। ওখানে এখনও ‘আন্টি-ফান্টি’ চালু নয়। রুহি যেন আমার বাবা-মাকে ওসব না বলে।”

সে কথা মনে পড়ায় ফিক করে হাসল রুহি। খেয়াল করল আয়েশার কথা থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু বেছে নিয়ে মেছলি বললেন, “তার মানে তোদের ওখানে যুদ্ধের নাম শুনে ‘প্যানিক বাইং’ শুরু হয়েছে। যে-কোনও ক্রাইসিস মোমেন্টে কালোবাজারিদের রমরমা বাজার হয়। আমাদের এখানেও কোভিডের জন্যে লকডাউন শুরুর ঠিক আগে এক জিনিস হয়েছিল। ওসব কথা বাদ দে। প্রদীপ পটেলকে ফোনে পাচ্ছি না কেন বল তো?”

“আমরাও ফোনে পাচ্ছি না,” চোঁচায় আয়েশা, “একদম বাজে লোক।”

“কলেজ অথরিটি কী বলছে?” মেছলি প্রশ্ন করলেন।

রুহি বলল, “তারা বলছে কলেজ ছেড়ে ইন্ডিয়া না যেতে। আমরা নাকি ইমার্জেন্সি সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত! যুদ্ধের সময়েও ছুটি নেই। যত ন্যাকামি।”

“গুপ্তন মেহতা কী বলেন?”

“উনি বলছেন ইন্ডিয়া ফিরে যেতে। কী করব বুঝতে পারছি না।”

“চলে আয়। আমার এসব শুনতে ভাল লাগছে না,” আতঙ্কিত গলায় বলেন মেছলি।

মাকে শান্ত করার জন্যে রুহি বলল, “তুমি চাপ নিও না। লোকাল লোকজন বলছে কিসু হবে না। টার্নোপিল জায়গাটা ওয়েস্ট ইউক্রেনে। রাশিয়ার সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে পূর্ব ইউক্রেনে। আমাদের জায়গাটা যশ

চোপড়ার সিনেমার গানের দৃশ্যের মতো হাঙ্কি ডোরি।”

“ইউক্রেনের ইন্ডিয়ান অ্যান্ডাস্যাডার অভিষেক পট্টনায়ক তাদের সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন না?”

“আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ার! কলেজে এসে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের সঙ্গে দেখা করে ছবিটিব তুলে গিয়েছিলেন। তারপরে আর যোগাযোগ নেই।”

খিচুড়ি রান্না চুকিয়ে আয়েশা বলল, “ইন্ডিয়ান অ্যান্ডাস্যাডার রোজ আমাদের খবর নেবেন এটা এক্সপেক্টেড নয়। তাঁর এক কোটি তিপান লক্ষ কাজ আছে। তবে এই রকম ক্রাইসিস মোমেন্টে আমাদের কথা ভাবা উচিত, তাই না?”

“আমরা মধ্যে ভয় পাচ্ছি। সিচুয়েশন গ্রেভ হলে ইন্ডিয়ান এমবাসি ইনফর্ম করত...” কথা বলতে বলতে রুহি চুপ করে গেল, কারণ মোবাইলের পর্দায় দেখা যাচ্ছে, ঘরে ঢুকেছেন মেঘনাদ।

এক ধরনের চিকিৎসক আছেন যাঁদের চেহারা ডাক্তারসুলভ। দেখলেই রোগীর অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে যায়। মেঘনাদকে সেই রকম দেখতে। লম্বা, ফর্সা, সুন্দর, অভিজাত। জন্ম থেকে রুহি দেখে আসছে, বাবার কাজের পোশাক সুট আর বাড়ির পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি। চোখে লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা। এখন তাঁর হাতে আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির জার্নাল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মেছলির পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি রুহির দিকে হাত নাড়লেন।

রুহি পাল্টা হাত নাড়ার আগেই মেছলি বললেন, “তোর বাবা কোথায় যে গেল! একটু আগেই এ ঘরে ছিল।”

“আমি একটু আগে এই ঘরে ছিলাম?” একটু জোরে বললেন মেঘনাদ, “আমি অনেকক্ষণ আগে আমার ফোনটা তোমাকে দিয়ে বসার ঘরে চলে গিয়েছিলাম।”

“তাই?” বিড়বিড় করেন মেছলি।

“মাথাটা এবার দেখাও! কোনও দিন প্লেন চালানোর সময় এই রকম ভুলভাল কাজ করলে নিজে তো মরবেই, প্যাসেঞ্জারদেরও মারবে।”

আলোচনা অন্যদিকে যাচ্ছে দেখে রুহি বলল, “মা ফোন কাটছি। আমাকে এবার অমলেট বানাতে হবে।” তারপর লাল বৃত্তে হাত ঝুঁয়ে, ফোন কেটে আয়েশাকে বলল, “বারবার অহমের ফোন আসছে। গতকালও এক জিনিস হচ্ছিল।”

“তুই কি এখন অহমের সঙ্গে টেলিসেক্স করবি?” আয়েশা বিরক্ত, “ধুর! ভাল্লাগেনা। আমিই অমলেট ভেজে নিচ্ছি।”

“দু’ মিনিট!” মিনতি করে রুহি।

“এত তাড়াতাড়ি টেলিসেক্স হয়ে যাবে?” ডিম ফেটাচ্ছে আয়েশা।

অহমকে ভিডিয়ো কল করে রুহি বলল, “ধুস! এনগেজড!”



অহম

২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ন’টার সময় অহমের ঘুম ভাঙল ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কানোর শব্দে। বোঝাই যাচ্ছে কাজটা করছে এক বছরের সিনিয়ার দাঙ্গা সমুদ্র সেন। অহমের ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এবং গাইড।

আজকের প্রথম ক্লাস এগারোটার সময়। আরও এক ঘণ্টা আরামসে ঘুমোনো যেত। সমুদ্রের জন্যে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। ধুস! কিভ শহরের বরিস পিলস্কি স্ট্রিটের ‘রাইবালস্কি অ্যাপার্টমেন্ট’-এর চারতলার ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাটের বিছানায় উঠে বসল অহম।

‘স্টাডি ইন ইউক্রেন’-এর ইউক্রেনীয় এজেন্টের সহায়তায় কিভ বিমানবন্দর থেকে কিভ মেডিকাল ইউনিভার্সিটি পৌঁছয় অহম। কলেজ অফিসে ভর্তির প্রক্রিয়া চলার সময় ঢুকেছিল সেকেন্ড ইয়ারের সমুদ্র। প্রায় ছ’ ফুট লম্বা, শ্যামলা গায়ের রং, চওড়া চোয়াল, খাড়া নাক, একমাথা চুল। পরনে জিন্স, চে গোভারার মুখ আঁকা টিশার্ট আর স্নিকার্স। এক পলক অহমের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “খোবড়া দেখে

বাঙালি মনে হচ্ছে।”

বিদেশে একগাদা ভারতীয়র মধ্যে বাঙালি আত্মপরিচয় নিয়ে অস্বস্তি ছিল অহমের। সে ইতিবাচক ঘাড় নেড়েছিল, মুখ খোলেনি। ততক্ষণে অন্য ফ্রেন্ডারদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সমুদ্র। অহম খেয়াল করেছিল, অফিসের সকলে সমুদ্রকে পছন্দ করে। তার একটা কারণ হল ও ইংরেজির পাশাপাশি ইউক্রেনীয় ভাষা বলতে পারে। অন্য কারণ, সমুদ্রের মধ্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার সহজতামত আছে। খুবই সপ্রতিভ ও বহিমুখী, অহমের ঠিক উল্টো।

প্রথম দর্শনে সমুদ্রকে দেখে ইমপ্রেসড হয়েছিল অহম। অ্যাডমিশন পর্ব চোকার পরে অহমকে টানতে টানতে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল সমুদ্র। নিজের ফ্ল্যাটে বসিয়ে মাছের বোল আর ভাত খাইয়ে লম্বা আড্ডা মেরেছিল। অহম সেদিনই ঠিক করেছিল, কলেজের হস্টেলে থাকবে না। এইখানে থাকবে। নীলিমার সঙ্গে ফোনে সমুদ্রের আলাপও করিয়ে দেয় অহম।

বিদেশে গিয়ে বাঙালি বন্ধু পেয়েছে শুনে খুশি হয়েছিলেন নীলিমা। কিভ মেডিকাল ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি ৩৫০০ ডলার, হস্টেল ফি ১০০০ ডলার, এককালীন চার্জ ২৫০০ ডলার। সব মিলিয়ে বছরে ৭০০০ ডলারের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন নীলিমা। হস্টেল ফি বদলে গেল ফ্ল্যাট ভাড়া, পরিমাণ বেড়ে হল ২০০০ ডলার। প্রতি মাসে অতিরিক্ত ডলার পাঠাতে আপত্তি করেননি নীলিমা।

সেই থেকে অহম একা এই ফ্ল্যাটে। গত তিন বছরে সে একই রকম থাকলেও সমুদ্র কিছুটা বদলে গিয়েছে।

ফ্ল্যাটে আসার কিছুদিন পরে অহম জানতে পারে, সমুদ্রের একজন প্রেমিকা আছে। তেইশ বছরের নাতালি মেলনিক সমুদ্রের ক্লাসমেট। নাতালি প্রথম দিকে কলেজের ক্লাস চুকিয়ে সমুদ্রের ফ্ল্যাটে পড়াশোনা করতে আসত। গত এক বছর ধরে ফ্ল্যাটেই থাকছে।

নাতালির বাড়ি কিভের শহরতলিতে। ওর বাবা-মা অশ্বেতাজ ছেলের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কের কথা জানেন। ফ্ল্যাটে এসে আলাপও করে গিয়েছেন। নাতালির কাকা কাদিরভের এই নিয়ে সমস্যা থাকলেও বাকিদের নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়।

সমুদ্রের বাড়ি বা বাবা-মা নিয়ে কিছুই জানে না অহম। এই একটি ব্যাপারে সমুদ্র গুটিয়ে থাকে। অহমের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছু বলতে চায় না। শুধু বলে, “এমবিবিএস পাশ করে সার্জারিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করব। তারপর নাতালিকে বিয়ে করে এখানে থিতু হব। ইউক্রেনের সেরা সার্জন হব।”

সার্জন হওয়া যে সমুদ্রের স্বপ্ন, এটা জানে অহম। ফার্স্ট ইয়ারে যে তিনটি বিষয় পড়ানো হয়, তার মধ্যে অ্যানাটমিতে ক্লাসের মধ্যে হারেস্ট পেয়েছিল সমুদ্র। সেকেন্ড ইয়ার থেকেই হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ঘুরঘুর করত। বকুনি খেয়ে চলে এলেও আবার যেত। এখন নাকি ওখানে টুকটাক ক্লেরিকাল কাজ করতে দেয়। তাতেই সমুদ্র খুশি।

সার্জন হওয়া নিয়ে বা নাতালিকে বিয়ে করা নিয়ে অহমের কোনও বক্তব্য নেই। ইউক্রেনে কেন থেকে যাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে সমুদ্র বলে, “বাহাদুর কফির পেয়ালা হাতে, আর ডিং ডং ঘণ্টার শব্দ শুধু ভেসে আসছে তিব্বতী গোফার, বাস আর কেউ নয়, কিছু নয় শুধুই তুষার, শুধু ধু ধু প্রান্তরে বনে কেবলই তুষার বরছে, শুধুই তুষার”

“বরফ ভাল লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো!” হ্যা হ্যা করে হাসে অহম, “তুষার রায় আওড়ানোর কী আছে?”

নাতালি আবার ঠিক উল্টো। সে চায় সমুদ্রকে বিয়ে করে ইন্ডিয়ায় থিতু হতে। সাহেবদের বানানো নাটক, নভেল আর সিনেমা দেখে ‘এক্সট্রিক ইন্ডিয়া’ নিয়ে অদ্ভুত সব ধারণা আছে নাতালির।

আবার দরজায় ধাক্কা। বিরক্ত অহম লেপ জড়িয়েই দরজা খুলে দিল। জিন্স, টিশার্ট, স্নিকার্স আর ছড়ি পরা সমুদ্র ঘরে ঢুকে সোফায় ব্যাকপ্যাক ছুড়ে বলল, “দরজা খুলতে এত দেরি? হাত গরম করছিলি?”

“শুধুমুদ্র ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। আর একটু ঘুমোতাম।”

“ঘুমিয়ে লাভ নেই। আজকের খবর শুনেছিস? ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৩৫০ ডুমা সদস্যের যাবতীয় সম্পত্তি ফ্রিজ করে দিয়েছে।”

“ডুমা কাকে বলে যেন?”

“স্টেট ডুমা হল রুশ জাতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ। সেখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দাঙ্গাগিরি করছে মানে ব্যাপারটা আমেরিকা

বনাম রাশিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে। দিস ইজ বিকামিং সিরিয়াস।” বকবক করার ফাঁকে কফি মেকারে হাত বাড়ায় সমুদ্র। ঝটপট তিন কাপ কফি বানিয়ে বলে, “দরজা খোল। নাতালি এল বলে!”

বলার সঙ্গে সঙ্গে ডোরবেল বাজল। দরজা খুলতেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল যে মেয়েটি, তাকে কেমন দেখতে সেটা বলতে একটু সময় লাগবে।

ইউক্রেনের মেয়েদের সৌন্দর্যের কথা সারা দুনিয়া জানে। সোনালি চুল, নীল চোখের মণি, বরফের মতো ফর্সা ত্বক, আপেলের মতো গাল— এই রকম ক্লিশে উপমা ব্যবহার করা হয়। এই সবক’টা বৈশিষ্ট্যই নাতালির মধ্যে আছে। অন্যদিন জিন্স আর টিশার্ট পরে কলেজে গেলেও আজ নাতালি পরে আছে ইউক্রেনের জাতীয় পোশাক ‘ভেশ্যভান্কা’।

ইউক্রেনীয় ভাষা উচ্চারণ করা খুব সমস্যা। অহম বলে, “দুটো জিভ না থাকলে ইউক্রেনীয় ভাষা বলা যায় না।” এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ দেশটির নাম। ইউক্রেনীয় ভাষায় দেশটির নাম ‘উক্রাইনা।’ কিন্তু এইটা বললে কেউ বুঝতে পারবে না। নাতালির পরে থাকা জাতীয় পোশাকের আসল উচ্চারণ অন্য রকম, তবে অহম ‘ভেশ্যভান্কা’ বলে।

পোশাক দেখে অহম বলল, “আজ এই পোশাক?”

“সলিডারিটি টু মাই কানট্রি!” নাতালির গলার আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে যে মেজাজ গরম। কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, “নেটো হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া! পুতিন চান না যে আমরা নেটোয় যোগ দিই। নেটো বলছে রাশিয়া অন্য দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে নাক গলাতে পারে না।”

সমুদ্র একক্ষণ ধরে চুপচাপ শুনছিল। এবারে বলল, “ইউক্রেনও ধোওয়া তুলসি পাতা নয়। এখানে নিও নাৎসিদের বাড়বাড়ন্ত আমি দেখেছি।”

“আমার দেশ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,” গজগজ করছে নাতালি। দু’জনে মিলে ঝগড়া করতে করতে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল। দরজা বন্ধ করার আগে পাল্টা চোঁচায় অহম। তার মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছে। একে তো দু’জনে মিলে গাড় ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। তার ওপরে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে মাথায় এক কিলো ভয় ঢুকিয়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা, কাল রাতে রুহির সঙ্গে এক মিনিটের বেশি কথা হয়নি। আয়েশা বারবার চোঁচাছিল, “ধুর ভান্নাগেনা! তুই খাবি আয়!”

বাধ্য হয়ে ফোন কেটেছিল রুহি। কাটার আগে বলেছিল, “আমাদের এদিকে কোনও প্রবলেম নেই। তোদের ওদিকে সব ঠিক তো?”

রুহির কথা মনে পড়ায় মেজাজ ঠান্ডা হচ্ছে অহমের। মনে পড়ছে প্রথম দিন ওর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা...

যে ফ্লাইটে অহম কিভ এসেছিল সেই ফ্লাইটেই ছিল রুহি আর আয়েশা। বারো ঘণ্টা ফ্লাই করার পরে কিভের বরিস্পিল বিমানবন্দরে নেমে কনভয়ের বেল্টের সামনে দাঁড়িয়ে লাগেজ সংগ্রহ করার সময় চোখ পড়ে রুহির দিকে। ও তখন আয়েশার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছিল। বাংলা ভাষা শুনে অহম বলেছিল, “বাঙালি?”

“হ্যাঁ,” ঘাড় না ঘুরিয়ে বলেছিল রুহি।

মিনমিন করে নিজের নাম বলেছিল অহম, “বাড়ি হাওড়া। কিভ মেডিকাল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছি।”

“আমি যাচ্ছি টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিকাল ইউনিভার্সিটি। বাই দ্য ওয়ে, আমি রুহি লাহিড়ী। বাড়ি বালিগঞ্জ।”

“রুহি মানে কী?”

পাশ থেকে আয়েশা বলেছিল, “রুহি মানে রুই মাছ।” তারপর রুহির মাথায় গাঁট্টা মেরে বলেছিল, “তোর লাগেজ একপাক ঘুরে আবার গর্তে ঢুকে গেল। এখন ওয়েট কর। আমি এগোচ্ছি।”

কনভয়ের বেল্ট থেকে নিজের লাগেজ তুলে নিয়ে অহম বলল, “অহম মানে আমি। শুনলেই মনে হয় খুব অহঙ্কার, তাই না?”

“নিট ইউজিতে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজারের ঘরে র‍্যাঙ্ক করার আগে কী নাম ছিল? গোপাল?” নিজের লাগেজ দেখতে পেয়েছে রুহি।

“রুহি মানে কি সত্যিই রুই মাছ?” প্রতিপ্রশ্ন করেছিল অহম।

“আজ্ঞে না! রুহি শব্দটা এসেছে ‘আরোহী’ থেকে। অর্থাৎ যে মেয়েটা অ্যাসেন্ডিং। ক্রমবর্ধমান।”

“আমাদের বাবা-মায়েরা যদি নাম রাখার সময় নিজেদের পশ্চাদ্দেশটা না খাটিয়ে মাথা খাটাত, তা হলে এইসব বেয়াঙ্কলে নাম বয়ে বেড়াতে হত না। তুই হতিস জয় আর আমি বীর। ইয়ে দোস্তি হম

নহি তোড়েঙ্গে।”

“এটা ‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে’-র গান না?”

“ইডিয়েট! এটা ‘শোলে’-র গান। ইন্ডিয়ার বিগেস্ট ব্লকবাস্টার। নাইস্টিন সেভেনটি ফাইভে রিলিজ করেছিল।”

“আমি তো তখন রিলিজ করিনি, তাই না?” শ্রাগ করে রুহি, “বাবা-মা বোধহয় তখন জাস্ট রিলিজ করে আপডেট নিচ্ছিল। হাউ কুড আই নো হোয়াট শোলে ইজ! আমি রণবীর কপূর আর আলিয়া ভাট চিনি, নট সাম জয় অ্যান্ড বীর।”

বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে ওরা দেখেছিল, টার্নোপিলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ‘স্টাডি ইন ইউক্রেন’-এর ইউক্রেনীয় কর্মচারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিভে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আছে অন্য কর্মচারী। যে যার পথে এগিয়ে যাওয়ার আগে ওরা টুইটারে একে অপরকে ‘ফলো’ করেছিল।

‘লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট’ বলে কিছু হয় না। জানে অহম। শরীর দেখে উত্তেজিত হয় শরীর। সেই উত্তেজনাকে ‘প্রেম’ বলে চালাবে বলে মানুষ মাইলের পর মাইল শিল্প-হাঙ্গ নামিয়েছে।

প্রাথমিক ভাল লাগা মাসখানেক পরেও থেকে গেল দেখে ওরা ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়া করল। টেক্সটিং চলল কিছুদিন। বারকয়েক অভিযো কল। অবশেষে একদিন দেখা হল। কিভ থেকে ট্রেনে চেপে অহম এল টার্নোপিল। লেকের ধারে দু’জনে অনেকক্ষণ নীরবে পাশাপাশি বসেছিল। সঙ্গে নামার আগে চলে গিয়েছিল অহম।

পরের সপ্তাহে রুহি গিয়েছিল কিভ। পরের সপ্তাহে অহম টার্নোপিলে। এই করতে করতেই হাতে হাত, পাশাপাশি হাঁটা, চুমু খাওয়া... তিন বছর কেটে গিয়েছে। সেক্স নিয়ে কারও কোনও ট্যাবু না থাকলেও কেউই আগ্রহ দেখায়নি। তার কারণ হল, বাড়ির লোকেরা এই প্রেমের কথা জানে না। জানলে কী ভাবে নেবে— জানা নেই। বিদেশে অনেক টাকা খরচ করে পড়তে এসে অশান্তি কেউই চাইছে না। বাড়ি থেকে আপত্তি করলে প্রেমটা টানা যাবে না, এই বোঝাপড়া আছে দু’জনের মধ্যে।

এটা আদৌ প্রেম কি না, জানে না অহম। তবে মেয়েটার কথা সব সময় মনে পড়ে। রুহির সঙ্গে ফোনে কথা বললে ফুরফুরে লাগে, একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতে পাওয়া যায়, ‘সংসার’ নামের একটা বায়বীয় জিনিস মাথার মধ্যে ঘোরে— এই সবই সত্যি।

এখন রুহির কথা মনে পড়ায় শরীর আনন্দান করছে। টুক করে ফোন তুলে রুহির নম্বর ডায়াল করল।

“সকালে ফোন করলি কেন?” কেজো গলায় বলছে রুহি, “এটা স্টাডি টাইম।”

“তোকে খুব দেখতে হচ্ছে করছে,” মোন্দা কথাটা গোড়াতেই বলে দিল অহম, “আমি কাল কলেজ বান্ধ করে টার্নোপিল যাচ্ছি। আয়েশাকে পটিয়ে পাটিয়ে রুম থেকে বের করে দিস,” কথা শেষ করে ‘পুচুত’ করে মোবাইলে চুমু খায় অহম।

হাসিতে ফেটে পড়ে রুহি বলে, “মোবাইলের স্পিকার অন করে কথা বলছি। আয়েশা সব শুনছে।”

অহম লজ্জা পেয়ে ফোন কাটতে যাচ্ছিল। ওদিক থেকে আয়েশার গলা শোনা গেল, “তোরা প্লিজ সপ্তাহে একবার ‘মেক আউট’ কর। তাহলে হরমোন লেভেল কন্ট্রোলে থাকবে। বে-টাইমে সেক্স চ্যাট বন্ধ হবে। ধুর বাবা! ভান্নাগেনা!”

অহম লজ্জায় চুপ। রুহি হাসতে হাসতে বলল, “চলে আয়। এমনিতেই এই উইকেন্ডে দেখা হবে কি না সন্দেহ! চারদিকে যা অবস্থা!”

অহম ফোন কাটল। কাল রুহির সঙ্গে দেখা হবে, এ কথা ভেবে মন ফুরফুরে। এবার একটু পড়াশুনো করা যাক।



রুহি

২৩ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ির সঙ্গে ফোনলাপ সেরে শুয়ে পড়েছে রুহি আর আয়েশা। দু'জনেই বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছে, টার্নোপিলে কোনও টেনশন নেই। বাড়ির লোক খুশি।

দু'জনেরই দৃষ্টিস্থায় ঘুম আসছে না। দৃষ্টিস্তা যুদ্ধের কারণে নয়, অহম আসবে বলে। আয়েশা নিচু গলায় বলল, “কাল কলেজের ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি কি হস্টেলের বাইরে বসে ভ্যারেন্ডা ভাজব? চেক করার জন্যে রুমে একবার আসতেই হবে। আমার এসব একেবারে ভাল্লাগেনা! ধুর!”

“ন্যাকামি করিস না!” আদুরে বকুনি দেয় রুহি, “আমাদের ফ্লোরে সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরটাতে ফার্স্ট ইয়ারের সুচিত্রা নায়ার থাকে। খুব ভাল মেয়ে। ডাবল বেডওয়ালা রুমে একা থাকে। তুই গেলে খুশি হবে।”

“কাল থেকে ওদের ফার্স্ট সেমিস্টার শুরু হচ্ছে। এই সময় বিরক্ত করা ঠিক হবে?”

“তুই তো মুখে কুলুপ এঁটে পড়াশুনো করবি। এতে বিরক্ত হওয়ার কী আছে?”

আয়েশা চুপ করে গিয়েছিল। একটু পরে ফুরফুর করে নাকও ডাকছিল। ঘুম আসেনি রুহির। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল গত কয়েক মাসের নানান ঘটনার কথা। সামরিক মহড়ার অছিলায় রুশ সেনা প্রবেশ করেছিল বেলারুশে। ইউক্রেন সীমান্তে রুশ ফৌজের গতিবিধি বেড়েছিল। ডনবাস এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানকার রুশ-পন্থী মিলিটারি গ্রুপ খুবই সক্রিয়। ওদের সাহায্য নিয়েই না কি রুশ সেনা কিভে অভিযান শুরু করবে!

“হতে পারে!” টার্নোপিল লেকের ধারের পার্কে সাইকেল চালাতে চালাতে অহম বলল, “সেটা হলে সামনের ওই রাস্তাটা দিয়ে রুশ মিলিটারি ঢুকবে ট্যাক নিয়ে। নীল আকাশ, সবুজ ঘাস আর গাঢ় নীল লেককে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে রাশিয়ান ফৌজ প্যারেড করে আসবে। ঠিক এই সময় ছবি তুললে খুব ভাল আসবে। তবে তুই ইনস্টার ফিলটার ইউজ করা বন্ধ কর। টার্কোয়েজ্জ ব্লু আকাশ আর প্যারট গ্রিন ঘাস দেখলেই বমি পায়।”

সাইকেল দাঁড় করিয়ে রুহি বলল, “শাট আপ!”

অহম ডুয়ালফি তুলে ইনস্টায় পোস্ট করে, #নোফিল্টার #কাপলগোলস।

“তোর মা ইনস্টায় নেই তো?” ভয় পেয়েছে রুহি।

“আছে। আমাকে ফলোও করে।”

“কী হবে তা হলে?” অহমের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিতে গিয়ে রুহি খেয়াল করল, মৃদুস্বরে কে যেন ইংরিজিতে বলছেন, “২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর পাঁচটার সময় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে হামলার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করার কোনও চেষ্টাই বরদাস্ত করা হবে না।”

এটা তো টার্নোপিল লেক নয়! নীল আকাশ আর সবুজ ঘাসই বা কোথায়? এটা তো অন্ধকার ঘর। অহম কোথায় গেল? স্বপ্ন ভেঙে ছড়মুড় করে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ল রুহি। বুঝতে পারল, আয়েশার মোবাইল থেকে নিউজ চ্যানেলের সঞ্চালিকার খবর পড়ার আগুয়াজ আসছে। মোবাইলের নীলচে আভা ঘরে রূপকথার পরিবেশ তৈরি করেছে।

এক লাফে বিছানা থেকে উঠে আয়েশার পাশে বসল রুহি। আয়েশা মোবাইলের পর্দায় চোখ রেখে, উবু হয়ে বসে আছে। মোবাইলে ‘ভঙ্গ চ্যানেল’ চলছে। সঞ্চালিকা বলছেন, “মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের উপর মস্কোর আক্রমণের নিন্দা করে বলেছেন যে রাশিয়াকে জবাবদিহি করতে হবে। নেটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ প্রতিধ্বনি করেছেন বাইডেনের বক্তব্যের। জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস আবেদন করেছেন, ‘রাষ্ট্রপতি পুতিন, মানবতার দোহাই, আপনার সৈন্যদের রাশিয়ায় ফিরিয়ে আনুন।’”

“যুদ্ধটা লেগেই গেলা!” রুহির দিকে তাকিয়ে বলল আয়েশা।

রুহি নিজের মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখল গাদাগাদা নোটিফিকেশন জমা হয়েছে ঘুমের মধ্যে। কলেজ কর্তৃপক্ষের

তরফ থেকে যে মেল এসেছে, তাতে লেখা আছে, ইউক্রেনের উপর পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করেছে রাশিয়া। রাষ্ট্রপতি ভলোদেমির জেলেনস্কি ‘ইমার্জেন্সি স্ট্যাটাস’ জারি করেছেন। সেই কারণে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি তার ব্যতিক্রম নয়। আজ ফার্স্ট সেমিস্টার-এর যে পরীক্ষা ছিল, সেটি অনিদিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল। এখন থেকে সমস্ত ক্লাস অনলাইন হবে। ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল বা ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর প্রয়োজন নেই। সবাই যেন নিজেদের রসদ মজুত রাখে।

বিছানা থেকে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল রুহি। অন্যদিন যেমন শান্ত থাকে কলেজ ক্যাম্পাস, আজও সেই রকম। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশ। যুদ্ধ হলে ঠিক কী কী হবে? অনেক ট্যাক আসবে? আকাশে বোমারু বিমান দেখা যাবে? সৈন্যরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তেড়ে আসবে? হস্টেলের ছাদে বোম পড়বে? সেটা টার্নোপিলে শুরু হলে কী হবে?

রুহির চিন্তার মধ্যে আয়েশা বলল, “আমরা খুব বোকা। কয়েক মাস ধরেই বাবা-মা বলছিল ফিরে যেতে। যদি শুনতাম, তা হলে...”

“নিজেকে দোষ দিস না। আমাদের কলেজ, ইউক্রেন সরকার, আমাদের গভর্নমেন্ট— কেউ কিছু বলেনি। আমরা বুঝব কী করে?”

“ধুর, ভাল্লাগেনা!” দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়েশা বলল, “মা-বাবার কথা মনে পড়ছে।”

“কথা না বাড়িয়ে নিউজ শোন,” বলল রুহি।

আয়েশা আবার ভঙ্গ চ্যানেলে গেল। সঞ্চালিকা বলছেন, “পূর্ব ইউক্রেনের মারিউপোলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বরিস্পিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে কমপক্ষে সাতটি বিকট বিস্ফোরণ শোনা গিয়েছে। বিমানবন্দর থেকে যাত্রী ও কর্মীদের সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দোনেৎস্ক এবং খারকিভের কাছেও বিস্ফোরণ হয়েছে।”

“আমাদের কী হবে?” জিজ্ঞাসা করল আয়েশা।

“পেসিমিস্টদের মধ্যে অলিম্পিক গেম হলে তুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবি,” কনুই দিয়ে বন্ধুকে ঠেলা মারে রুহি, “এই সিচুয়েশনে পজিটিভ দিকগুলো ভাব। আমরা কিভ থেকে অনেক দূরে আছি। এখানে যুদ্ধ হবে না।”

“নেগেটিভ দিকটাও ভাব। আজ কিভে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কাল বা পরশু এখানে শুরু হবে।”

“পজিটিভ দিকটা ভাব। আমরা লোকাল দালাল ধরে প্লেনের টিকিট ব্ল্যাকে কেটে কালকের মধ্যে ইউক্রেন ছাড়তে পারি।”

“নেগেটিভ দিকটা ভাব। আমরা কোনও লোকাল দালাল চিনি না।”

“পজিটিভ দিকটা ভাব। ফার্স্ট ইয়ারের উমেদ সিং নামের ছোকরাটা বলছিল, ওর সঙ্গে লোকাল দালালের চেনাশোনা আছে।”

“নেগেটিভ দিকটাও ভাব। কিভে যুদ্ধ শুরু হয়েছে মানে অহম আজ আসতে পারবে না।”

রুহি এতক্ষণ চালাক চালাক উত্তর দিচ্ছিল। হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর বিকট জোরে ‘ওয়াক’ তুলে বাথরুমের দিকে দৌড়ল। বেসিনের মধ্যে গলগলিয়ে বমি করল। হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে ফিরতেই আয়েশা তাকে বলল, “তাড়াতাড়ি আয়। নতুন নোটস এসেছে।”

আবার মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখে রুহি। সঞ্চালিকা বলছেন, “কিভ শহরে বিস্ফোরণের পর সেখানকার মেয়র নাগরিকদের ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। রাশিয়ান সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় ইউক্রেন তার আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে।”

“বুলশিট!” আর্ভনাদ করে ওঠে রুহি। দালালের কাছ থেকে ব্ল্যাকে টিকিট কেটে ইউক্রেন ছাড়া আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর নিজের মোবাইল দেখে বলল, “ইন্ডিয়ান এমবাসি থেকে মেল এসেছে।”

“দেখি!” বন্ধুর মোবাইল কেড়ে নেয় আয়েশা। মেল পড়ে নিয়ে বলে, “অভিষেক পট্টনায়ক ইউক্রেনের সমস্ত ভারতীয়র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, মানে ইন্ডিয়ার কাছে আমরা অস্তিত্বহীন

হয়ে যাইনি।”

“কাজের কথাটা বল না!” ফোন কেড়ে নিয়ে রুহি মেলে চোখ বোলাচ্ছে, “এমবাসির তরফে উনি বলেছেন যে সোশাল মিডিয়া এবং ইমেল মারফত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে। ফোন করার জন্যে একটা হটলাইনও দেওয়া হয়েছে।”

“আমি এফুনি ফোন করব,” হটলাইন নম্বরে ডায়াল করে আয়েশা। বেশ কয়েকবার এনগেজড টোন পাওয়ার পরে লাইন পাওয়া গেল কিন্তু কেউ ফোন ধরল না।

“কেউ নেই!” হতাশ আয়েশা, “আমার একটুও ভান্নাগেনা!”

রুহি সামুনা দিয়ে বলল, “অস্থির হচ্ছিস কেন? হটলাইন নম্বর তৈরি করে ফেলা সোজা। কিন্তু ‘টুয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন’ সেটাকে মনিটরিং করার জন্যে স্টাফ লাগে। একটু সময় দে।”

আয়েশার শরীরী ভাষায় বদল এল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “লেটস ফেস ইট। আমরা আপাতত ইউক্রেনের একটি হস্টেলে বন্দি। এদেশের সরকার যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। আমাদের সরকার আমাদের খোঁজ যতদিন খোঁজ না নেয়, ততদিন বেঁচে থাকার জন্যে যা যা লাগে, সেগুলো আমাদের আছে?”

রুমের আলো জ্বলে শেলফ খুলে রুহি বলল, “চাল, আটা, ময়দা, আলু, পেঁয়াজ, পাউরুটি, কাপকেক, তেল, মশলাপাতি যা আছে, তাতে এক থেকে দেড় সপ্তাহ চলে যাবে। আরও দু’ ক্রেট ডিম কিনে রাখলে ভাল হত।”

‘ডিম পাড়া’-র প্রসঙ্গ এক সঙ্গে মনে পড়ায় দুই বান্ধবী পরস্পরের দিকে তাকালেও কেউই হাসল না। ফ্রিজ খুলে রুহি বলল, “মাছ, মাংস, ভেজিটেবলস এনাফ আছে।”

“স্যানিটারি ন্যাপকিন আছে?”

রুহি চুপ। দু’জনের মোবাইলেই ‘পিরিয়ড ট্র্যাকার’ অ্যাপ ইনস্টল করা আছে। দু’জনেই জানে যে এক সপ্তাহের মধ্যে আয়েশার পিরিয়ড শুরু হবে। তড়াক করে খাট থেকে উঠে আয়েশা বলল, “চল! একবার সুপারমার্কেট থেকে ঘুরে আসি। এটিএম থেকে ‘হাভনিয়া’-ও তুলে আনি।”

ইউক্রেনে আসার পরে এখানকার মুদ্রার নাম বলতে খুব অসুবিধে হত। অলস জিভ থেকে ‘রিভনিয়া’ বেরোত। এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এক হাভনিয়া মানে ভারতীয় মুদ্রায় দু’ টাকা কুড়ি পয়সা।

গায়ে গরম জামা চাপিয়ে দুই বন্ধু রুম থেকে বেরোল। করিডোরে ভিড় করেছে মেয়েরা। কেউ মোবাইলে খবর দেখছে, কেউ উচ্চস্বরে বাড়ির সঙ্গে কথা বলছে। ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ইউক্রেন, রুশ, ইংরেজি বা ফরাসি ভাষা শোনা যাচ্ছে। উত্তেজিত ও অসহায় মেয়েদের পাশ দিয়ে হেঁটে একতলায় নামল দু’জনে। সাইকেল চালিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে যে এটিএম কিয়স্ক আছে সেটার দিকে এগোল।

অন্ধকার এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে রাস্তায় দৌড়োদৌড়ি করছেন অজস্র স্থানীয় মানুষ এবং বিদেশি। এরা সবাই এই মেডিকেল কলেজের কর্মচারী, শিক্ষক বা ছাত্র। এই এটিএমে হাভনিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে বলে সবাই দৌড়চ্ছে ক্যাম্পাসের বাইরের এটিএম-এর দিকে।

খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে কয়েকটা এটিএম ঘুরে ফেলে ওরা বুঝতে পারল, কোনও এটিএম-এ হাভনিয়া নেই। গোটা শহর এটিএম-এর সামনে লাইন দিয়েছে। সাইকেল চালিয়ে সুপারমার্কেট পৌঁছল ওরা। রুহি বলল, “সুপারমার্কেটে কোনও দিনও তালা পড়তে দেখেছিস?”

টেনশনে ফ্যাকাশে হয়ে আয়েশা বলল, “চল, রুম পালাই।”

ফেরার সময় ওরা খেয়াল করল সমস্ত লোক দৌড়ে যে যার আন্তানায় ঢুকে যাচ্ছে। ওরা যখন ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকল তখন গোটা চত্বরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সব শুনশান।

সাইকেল রেখে ওপরে উঠতে উঠতে আয়েশা বলল, “এখনও ভদ্রতাবোধ আমার মধ্যে কিছুটা রয়ে গিয়েছে, তাই রাতে কাউকে বিরক্ত করছি না। সকাল হলেই আমি গুঞ্জন মেহতা, প্রদীপ পটেল আর অভিষেক পট্টনায়ককে ফোন করব। হাল ছাড়লে চলবে না।”

রুহি রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকামাত্র মোবাইলে ভক্ত চ্যানেল চালান আয়েশা। সঞ্চালিকা সিরিয়াস মুখে বলছেন, “স্লাদিমির পুতিন বলেছেন যে ইউক্রেনের মিলিটারি পরিকাঠামো, সামরিক বিমানঘাঁটি এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিমান চলাচলের ওপরে আজ থেকে হামলা শুরু করা হল।”

রুহি নিজের মোবাইল থেকে অহমকে অডিয়ো কল করছে।

রিং হচ্ছে... রিং হয়েই যাচ্ছে...



অহম

“ভোরবেলা ফোন করলি কেন?” অনিচ্ছার সঙ্গে ফোন ধরেছে অহম। আজ কলেজ বন্ধ করবে বলে কাল অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। শুতে গিয়েছিল আড়াইটে নাগাদ। এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। কাঁচা ঘুম ভাঙানোর কোনও মানে হয়!

“ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?” আদুরে গলায় বলছে রুহি। বিরক্ত অহম বলল, “বোর করিস না প্লিজ।”

রুহি সিরিয়াস গলায় বলল, “তুই যে কুণ্ডকর্ণর মতো ঘুমোস, সেটা শুনেছিলাম। আজ জানলাম কথাটা সত্যি।”

“কী হয়েচ্ছে?” উঠে বসেছে অহম। রুহির গলার আওয়াজ অন্য রকম লাগছে কেন?

রুহি বলল, “জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখ বাইরে কী হচ্ছে।” তারপর ফোন কেটে দিল।

এতক্ষণে সত্যিই ঘুম ভেঙেছে অহমের। বাইরে একটানা ‘গুমগুম’ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওটা কীসের শব্দ? চোখ কচলে, লেপের ওম থেকে বেরিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল অহম। এবং তার পায়ের নীচ থেকে মেঝে সরে গেল। এ কী অবস্থা হয়েচ্ছে শহরটার!

চারতলা থেকে শহরের যতদূর দেখা যায়, সবটা ধোঁয়ায় ভরে আছে। মলিন, বিষণ্ণ এক মশারি খাতানো রয়েছে গোটা কিভ জুড়ে। তারই মধ্যে এখান ওখান থেকে আগুনের হলকা দেখা যাচ্ছে। আর এই বিচ্ছিরি, ডিপ্রেসিভ দৃশ্যের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

“ফোনে আছিস?” চিৎকার করছে রুহি।

“আছি!” কোনও মতে বলল অহম।

“কেমন আছিস?” রুহির গলায় আর্তি।

রুহি জানে না, সেই মুহূর্তে ইথার-তরঙ্গ বাহিত হয়ে এই একটাই প্রশ্ন এক ফোন থেকে অন্য ফোনে অডিয়ো কল, ভিডিয়ো কল বা মেসেজ মারফত বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ছে কিভ জুড়ে, ইউক্রেন জুড়ে, রাশিয়া জুড়ে, পূর্ব ইউরোপ জুড়ে। “কেমন আছিস?” “কেমন আছ?” “কেমন আছেন?”

এই প্রশ্নের আসল মানে অন্য। যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি জানতে চাইছেন, ‘বেঁচে আছ তো?’ ‘তোমার কিছু হয়নি তো?’ আগামী কয়েকদিন এই প্রশ্নটা সবাই সবাইকে করবেন। বেশির ভাগ মানুষ উত্তর পাবেন না। কেউ কেউ উত্তর পাবেন। এবং সেই সব উত্তর সুসংবাদ বয়ে আনবে না।

“ভাল আছি। এখনও পর্যন্ত সেফ। আজ তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।” আপনমনে বলল অহম, “তুই কেমন আছিস?”

“আমরা কিভ থেকে অনেকটা দূরে। কিন্তু তুই কী করবি? কলেজ বন্ধ, বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটও বন্ধ করে দিল।”

অহমকে চমকে দিয়ে আকাশে একটা আগুনের গোলা দেখা গেল। এত বীভৎস, এত ভীতিপ্রদ, এত ভয়ানক কোনও কিছু থ্রি-ডি সিনেমাতেও দেখিনি অহম। অস্তিত্বকে আর্মর্ কাঁপিয়ে গোলাটি আছড়ে পড়ল অনেকটা দূরের এক বহুতলে। মুহূর্তের মধ্যে বাড়িটি মাটিতে মিশে গেল। বিস্ফোরণের অভিঘাতে অহমের ফ্ল্যাটের জানলার কাছে চিড় ধরেছে, মেঝে কাঁপছে থরথর করে, বাড়িটাও কাঁপছে।

“চুপ করে আছিস কেন?” জিজ্ঞাসা করল রুহি।

“পরে ফোন করছি,” ফোন কেটে মেঝেয় বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজল অহম। তার মাথা কাজ করছে না। চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। এখন সে কী করবে? যুদ্ধ লাগলে কী করতে হয়? চারপাশে বিমান হানা ও বোমাবৃষ্টি শুরু হলে বাড়ির মধ্যে থাকা উচিত? না কি বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত?

নিজেকে অনমনস্ক রাখতে কর গুনতে শুরু করল অহম। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ... এক, দুই, তিন চার পাঁচ...

কতক্ষণ এই রকম চলল, জানে না সে। দিশা ও সময়হীন, ভূগোল ও ইতিহাসহীন এক ম্যাট্রিক্সে বসে অহম অপেক্ষা করছে পরের বোমারুর জন্যে, ডুমস ডের জন্যে। ঠিক এই ভাবেই বালিতে মুখ গুঁজে থাকে উটপাখি।

মুখ গোঁজা অবস্থাতেই চোদ্দটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল অহম। ফোনওটা দূরে, ফোনওটা কাছে, কোনওটা এত কাছে যে আতঙ্কে প্যান্টে হিসি করে ফেলল।

হঠাৎ সে খেয়াল করল চতুর্দিক শব্দহীন। কানের কাছে একটানা হুইসল বাজার পরে হঠাৎ থেমে গেলে ভৌতিক নীরবতা মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ে অস্তিত্ব জুড়ে ছড়িয়ে যায়। এখন ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। এত নৈঃশব্দ্য নিয়ে সে কী করবে?

দরজায় ধুমধুম আওয়াজ শুনে চমকে উঠল অহম। বোম পড়ল না কি? পর মুহূর্তে মনে হল সমুদ্র বা নাতালি ছাড়া আর কেউ এইভাবে দরজা ধাক্কাবে না। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল অহম। দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকে নাতালি চিৎকার করল, “প্যাক আপ অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড ফলো মি।”

“কোথায় যাব?” ব্যাকপ্যাক হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল অহম।

“মোট্রো স্টেশনগুলো মাটির অনেকটা নীচে। রুশ মিসাইলের থেকে বাঁচার জন্যে ওটাই একমাত্র জায়গা।”

মিসাইল? এই শব্দটা সিনেমায় শোনা যায় বা কমিক্সে পড়া যায়। সেগুলো জীবনের মধ্যে ঢুকে গেল? পেটে মোচড় দিয়ে পায়খানা পেল অহমের। দ্রুত বাথরুমে ঢুকল সে।

হাত ধোওয়ার সময়েই অহম শুনতে পেল সমুদ্র চিৎকার করছে, “টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সোপ পেপার, দুটো জিন্স, দুটো টিশার্ট, দুটো ছুড়ি আর দু’ সেট আন্ডার গার্মেন্ট! পাসপোর্ট, ফরেন স্টুডেন্টদের রেসিডেন্সিয়াল কার্ড, ইন্টারন্যাশনাল ড্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফোন, ইয়ার বাড, চার্জার, পাওয়ার ব্যাঙ্ক। ড্রাই ফুড, জলের বোতল, মেডিসিন আর হাভনিয়া! কুইক!”

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অহম বলল, “আচ্ছা, আমি যদি না যাই?”

“মানে?” একসঙ্গে চমকে উঠেছে সমুদ্র আর নাতালি।

“আমি... আমি এখানেই সেফ ফিল করছি।” অহম বৃবতে পারছে, মাথা কাজ করছে না। সমুদ্র তার কাঁধে হাত রেখে বলল, “কাকিমাকে ফোন কর! এক্ষুনি।”

মাকে আগেই ফোন করা উচিত ছিল। কেন করেনি কে জানে! সমুদ্রের পরামর্শ শুনে নীলিমাকে ফোন করে অহম। ওখানে এখন সকাল সওয়া দশটা। নীলিমা নিশ্চয় যুদ্ধের খবর পেয়ে দুশ্চিন্তা করছেন!

একবার রিং হওয়া মাত্র নীলিমা ফোন ধরে বললেন, “খবরটা পাওয়ার পরে আমি অন্তত একশো বার তোকে ফোন করেছি। ফোন যাচ্ছে না। তুই কেমন আছিস?”

“তুই কেমন আছিস! আবার সেই প্রশ্ন! অহম শান্ত গলায় বলল, “ঠিক আছি। তবে হাইরাইজের থাকা নিরাপদ নয় বলে সমুদ্রদা মেট্রো স্টেশানে চলে যেতে বলছে। কী করি বল তো?”

অহমের হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে সমুদ্র বলল, “কাকিমা, অহম ঘাবড়ে গিয়েছে। আপনি ওকে জাস্ট বলুন আমার কথা শুনতে।

এই অহম, ফোন নো! মায়ের সঙ্গে কথা বল।”

নীলিমা একটুও না ভেবে বললেন, “সমুদ্র যা বলছে শোনা।”

“আমি যাচ্ছি। তুমি টেনশন কোরো না,” ফোন কাটল অহম। ব্যাকপ্যাকে সবকিছু ঢুকিয়ে ফ্ল্যাটে তালি মেরে লিফটে উঠল। লিফটের ভরসা না করে একতলায় নামল এবং বরিস পিলস্কি স্ট্রিটে পা রেখে আঁতকে উঠল। রাস্তার এ কী অবস্থা!

প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে গাদা গাদা মানুষ বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়ছেন। হঠাৎ দেখলে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ইদুরের পালের কথা মনে পড়ে। চতুর্দিকে থিকথিক করছে ভিড়। ইউক্রেনের বাসিন্দারা যে-ভাবে কোলেপিঠে যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে, বাচ্চাদের হাত ধরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ছেন সেটা দেখে ভয়ের চোটে অন্তরাঝা শুকিয়ে আসে।

ছুটছে নাতালি, সমুদ্র আর অহমও। নাতালি রানিং কমেশ্রির মতো বলে যাচ্ছে, “বাবা আর কাদিরভ কাকা ফোনে বলেছে বাড়ি চলে যেতে। আমি রাজি হইনি। এই নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে একগ্রন্থ ঝগড়া হয়ে গেল।”

“যাচ্ছ না কেন?” এটিএম দেখে হাভনিয়া তোলার লাইনে দাঁড়াল অহম।

“আমার বাড়ি কিভ থেকে এমন কিছু দূরে না। ওখানে গেলেও মরার ভয় আছে। অকারণে বাবা-মাকে বিপদে ফেলব কেন?”

“সেটাই আসল কারণ? না কি সমুদ্রদাকে ছেড়ে যেতে চাইছ না?”

“বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি চল!” অহমের কনুই ধরে টানছে নাতালি।

অহম বলল, “হাভনিয়া সঙ্গে রাখা জরুরি। একটু দাঁড়াও।”

“দাঁড়িয়ে লাভ নেই।” লাইন থেকে অহমকে টেনে বার করেছে নাতালি। “এই এটিএম-এ হাভনিয়া শেষ। সবাই অন্য এটিএম-এ দৌড়চ্ছে।”

সত্যিই তাই। অহমদের চলার পথে আরও দুটো এটিএম পড়ল। একটার সামনে মারামারি হচ্ছে। অন্যটার সামনে মিলিটারি মোতায়েন হয়েছে।

ইউক্রেনে আসার পরে এই প্রথম রাস্তায় মিলিটারি দেখল অহম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা শহর এই ভাবে বদলে যেতে পারে? জীবন বদলে দেওয়া একটি ঢেউ সে পেরিয়ে এসেছে। কোভিড ও লকডাউনের ঢেউ। ভেবেছিল, আগের জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু এ কী হল!

মোবাইলের ইয়ারপড কানে গুঁজে সমুদ্র কিছু একটা শুনছিল। সেগুলো খুলে বলল, “খবরে বলছে যে আমেরিকা পাঁচটা রাশিয়ান ব্যাঙ্কে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থা থেকে নিষিদ্ধ করেছে। চারটি রাশিয়ান ব্যাঙ্কের আমেরিকা-অধিকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। একটা দেশের ইকনমি কীভাবে বাঁঝরা করে দিতে হয় ওরা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে।” তারপর আবার ইয়ারপড কানে গুঁজল।

“আমেরিকা ঠিক করেছে,” বলল নাতালি, “পুতিন আমাদের কিসু করতে পারবে না। উল্টে নিজেই বিপদে পড়ে দু’এক দিনের মধ্যে লেজ গুটিয়ে কিভ থেকে পালাবে।”

অহম হঠাৎ বলল, “ওই দেখো। সুপারমার্কেট খোলা রয়েছে। কিছু কিনতে হবে?”

“না! এখন সব জিনিসের দাম বেশি,” ধমক দেয় নাতালি, “তা ছাড়া, কিছুদিন চালিয়ে নেওয়ার মতো সব কিছু আমাদের কাছে আছে।”

ইয়ারপড আবার খুলে সমুদ্র উত্তেজিত গলায় বলল, “আমাদের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ভলোদেমির জেলেনস্কি আর ব্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন।”

এই কথায় অহম আর নাতালির দূরকম প্রতিক্রিয়া হল। অহম বলল, “এবার নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া আমাদের খবর নেবে।” নাতালি বলল, “উনি পুতিনের সঙ্গে কেন কথা বললেন? দিস ইজ নট ফেয়ার!”

সমুদ্র কিছু বলার আগেই সবাইকে চমকে দিয়ে সাইরেন বেজে উঠল। নাতালি উত্তেজিত হয়ে বলল, “আবার বিমান হানা শুরু হবে। তাড়াতাড়ি মেট্রো স্টেশন চলো।”

অহম দৌড়ছে। সমুদ্র চুঁচিয়ে বলল, “চল, বাসে উঠি।”

নাতালি এর মধ্যেই একটা ভিড় বাসে উঠে, একে তাকে ধাক্কা

দিয়ে সরিয়ে তিনজনের জায়গা করে নিয়েছে। কিভের বাসে এত ভিড় কখনও দেখেনি অহম। কলকাতায় একেই বলে বাদুড়ঝোলা ভিড়।

বাসে উঠে কোনও লাভ হল না। কারণ পরের পনেরো মিনিটে বাস এক ইঞ্চিও নড়ল না। কিভের রাস্তায় এই প্রথম ট্রাফিক জ্যাম দেখল অহম।

নাতালি বলল, “রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে বলে এই অবস্থা। হেঁটে গেলে আগে পৌঁছব।”

তিনজনে বাস থেকে নামল। অহম বলল, “ভাড়া দিলে না?”

“আজ থেকে বাসের ভাড়া নেওয়া বন্ধ করল সরকার,” বলল নাতালি, “কন্ডাক্টর বললেন।”

সমুদ্র বলল, “কন্ডাক্টর এ-ও বললেন যে, অনেক দিন আগে থেকেই রুশ গুপ্তচররা কিভে ঢুক গিয়েছে। সেই জন্যে সেনাবাহিনী সবার কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখবে।”

“কাগজ দেখাতে হবে?” দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলেছে অহম, “নাতালিকে প্রমাণ দিতে হবে, সে নাগরিক না অনুপ্রবেশকারী?”

হঠাৎ কমবয়সি দু’জন মিলিটারি হাভের ইশারায় ওদের থামতে বলে ডকুমেন্ট দেখতে চাইল। নিজেদের পাসপোর্ট আর বিদেশি ছাত্রদের রেসিডেন্সিয়াল কার্ড দেখাল অহম আর সমুদ্র। নাতালি অপমানিত মুখে কাগজপত্র দেখাল।

একজন মিলিটারি কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল, “সোজা মেট্রো স্টেশনে ঢুক যাও। বিমান হানা শুরু হল বলে।”

রাস্তা দিয়ে দৌড়ছে তিনজন আর দেখছে যে ফুটপাথে সারি দিয়ে স্থানীয় মানুষ দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের পতাকা ওড়াচ্ছেন। অনেক মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে আতঙ্কিত মুখে প্রার্থনা করছেন। কমবয়সি কয়েকজন ছেলেমেয়ে ‘ফেসবুক লাইভ’ করে চারিদিক দেখাচ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে সমুদ্র বলল, “রাশিয়ার বিমানহানায় এখানকার সাতজন মারা গিয়েছেন।”

নাতালি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, “অনেক হাজার বা অনেক লাখ মৃত্যুর শুরু হল এই সাতজনকে দিয়ে। আমাদের এখন একটাই কাজ। ওই লিস্টের বাইরে নিজেদের রাখা।”

সামনেই মেট্রো স্টেশন। স্টেশনের গেট দেখে মনে হচ্ছে একটা গুহা। অলিভ রিডলি কচ্ছপের মতো, জাটিঙ্গার পাখিদের মতো, আফ্রিকার গ্যাঞ্জেল আর জেব্রাদের গ্রেট মাইগ্রেশনের মতো স্টেশনের মধ্যে ছড়মুড় করে ঢুকছে মানবপিণ্ড।

সেই পিণ্ডে নিজেদের মিশিয়ে দিল ওরা তিনজন। ভিড়ই ওদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নীচে, আরও নীচে। সমুদ্র খবর শুনতে শুনতে বলাচ্ছে, “সাইবার অ্যাটাক শুরু হয়েছে। অনলাইন কেনাকাটা, ব্যাংক ট্রানজাকশান বন্ধ। ফ্রম নাউ অন, ইউক্রেনের জাতীয় টেলিভিশন ‘রাডা’ ছাড়া অন্য কোনও চ্যানেল দেখা যাবে না।”

তিনজনেই চলে এসেছে প্ল্যাটফর্মে। হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশু প্ল্যাটফর্মের ওপরে অস্থায়ী সংসার পেতেছেন। এঁরা কেউ গরিব নন, এঁরা কেউ ভিখারি নন। এঁদের সবার মাথার ওপরে কিছুক্ষণ আগেও ছাদ ছিল। শোওয়ার জন্যে নরম বিছানা ছিল। ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্যে গরম পোশাক ছিল। ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ভদকায় চুমুক দিয়ে গানবাজনা করার সামর্থ্য ছিল। যুদ্ধ এঁদের শরণার্থী বানিয়ে ছাড়ল।

তাঁদের ফাঁকেই নিজেদের জন্যে একটু জায়গা খুঁজে নিয়েছে নাতালি। গুছুনি মেয়ের মতো প্ল্যাটফর্মে মোটা প্লাস্টিক বিছিয়েছে। তার ওপরে বাহারি চাদর। শুকনো খাবার আর জলের বোতল দেওয়ালের দিকে সরিয়ে সমুদ্রকে বলল, “তুমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বোসো। আমি একটু শোবো। খুব টায়ার্ড লাগছে।”

দেওয়ালে মাথা দিয়ে বসল সমুদ্র। থাইতে মাথা দিয়ে গুটিগুটি মেরে শুয়ে পড়ল নাতালি। তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে সমুদ্র গাইছে,

“If you dance I’ll dance
And if you don’t I’ll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away.”

মানসিক আর শারীরিক ক্লান্তিতে অহমও দেওয়ালে মাথা রেখে চোখ বুজল। রুহি কী করছে কে জানে!



রুহি

বান্ধারটা লম্বায় পঞ্চাশ ফুট আর চওড়ায় ত্রিশ ফুট হলেও উচ্চতায় মেরেকেটে ফুট দশেক। জানলা নেই, একটাই মাত্র দরজা। সেটা দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠলে অ্যানাটিমি বিল্ডিং-এর বেসমেন্টে পৌঁছনো যায়। এখানে দিনের আলো ঢোকে না। দেওয়ালে ফিট করা আছে কম পাওয়ারের বাল্ব। পাখা, এসি বা এগজস্ট ফ্যান থাকার প্রশ্নই নেই। কোনও আসবাব নেই। মেঝেতে প্লাস্টিকের চাদর পেতে বসেছে রুহি, আয়েশা এবং আরও সম্ভবজন ছাত্রী। নোংরা, স্যাঁতসেঁতে মেঝে থেকে ঠান্ডা উঠছে।

টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিকাল ইউনিভার্সিটির অ্যানাটিমি বিভাগের বেসমেন্টে যে এই রকম একটা বান্ধার আছে, সেটা তিন বছর ক্যাম্পাসে কাটিয়েও জানতে পারেনি রুহি। জেনেছে গতকাল, মানে ২৪ ফেব্রুয়ারি, সকাল দশটার সময়। যখন প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে মেডিকাল কলেজের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় মেলটি এল। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর নাম ধরে লেখা আছে কাকে কোন বান্ধারে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, কিভে আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয়। মেডিকাল ইউনিভার্সিটির প্রতিটি বিল্ডিং-এর বেসমেন্টের নীচে যে একটি করে বান্ধার আছে, সেই মেল থেকেই জানতে পারে সবাই।

মেল পড়ে অনেকে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করেছিল। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা তাদের বুঝিয়ে বলে যে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা রুটিন ইভ্যাকুয়েশন। কয়েক বছর আগে একবার যুদ্ধ-পরিস্থিতি দেখা দিলেও বড় কোনও সমস্যা হয়নি। এবারও সেই রকমই হবে। বান্ধারে যাওয়াটা সাময়িক পদক্ষেপ। এবং সেটাও খুব সিরিয়াসলি মানতে হবে, এমনটা নয়। বাথরুম করতে বা মোবাইলে চার্জ দিতে হস্টেলে আসা যেতেই পারে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, মার্টির অনেকটা নীচে হলেও মোবাইলে ফোন করা নিয়ে সমস্যা নেই। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের কথা শুনেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাকপ্যাকে ভরে বান্ধারে চলে এসেছে সবাই।

‘বান্ধার!’ ‘ইভ্যাকুয়েশন!’ রুহি অবাক হয়ে ভাবল, যুদ্ধ কাকে বলে সে জানতই না। কিন্তু দু’দিনেই তার মতো জেন জির নিজস্ব বুলির মধ্যে এই শব্দদু’টি জায়গা করে নিয়েছে।

রুহিদের হস্টেলের সম্ভবজন মেয়ে ছাড়াও এখানে আরও কুড়িজন আছেন। সকলে স্থানীয় বাসিন্দা এবং টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিকাল ইউনিভার্সিটির কর্মচারী। প্রত্যেকেই সপরিবার এসেছেন এবং বিদেশি ছাত্রীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন।

ওঁদের মধ্যে মাত্র একজন কর্মীকে চেনে রুহি। বছর পঞ্চাশের সিডিস্কে লোকটি অ্যানাটিমি ডিপার্টমেন্টের ‘ক্যাডাভার অ্যাসিস্ট্যান্ট’ যাকে বাংলায় ‘ডোম’ বলা হয়। ইভান নামের লোকটির চোখের মণির রং গাঢ় সবুজ, গায়ের রং ফ্যাটফেটে সাদা, ঠোঁটের রং কালচে নীল। ছ’ ফুটের ওপর লম্বা বলে সামনে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটেন। ওভারকোট আর ঢোলা ট্রাউজার্স পরা লোকটার চেহারা ভীতি উদ্বেককারী। শুধু রুহি আর আয়েশা নয়, সব মেয়েই ঝুঁকে এড়িয়ে চলে।

ফোন বেজে ওঠায় ইভানের থেকে চোখ সরাল রুহি। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখল, আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি, এখন রাত সাড়ে এগারোটো বাজে। কলকাতায় রাত তিনটে। মেহুলি ফোন করেছেন।

ফোন ধরে রুহি বলল, “বলো মা।”

“কেমন আছিস?” মেহুলির কণ্ঠে আশঙ্কা।

“ভাল আছি,” গলার আওয়াজে এক্সট্রা খুশির উপহাস দিয়ে বলল রুহি, “গতকাল সকাল থেকে বান্ধারে আছি। মাঝে মধ্যে হস্টেলেও যাচ্ছি।”

“তোরা বাবাকে বলেছি চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে।”

“মা! এটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু। উনি কী করতে পারেন?”

“উনি প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন,” জোরের সঙ্গে বললেন মেছলি।

“চিফ মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তুমি আমাকে কখন বললে?” মা-মেয়ের ফোনালাপের মধ্যে মেঘনাদের গলা শোনা গেল, “আমিই তো গতকাল নিজের থেকে ওঁর সঙ্গে কথা বললাম।”

“আমি তোমাকে কাল বলেছিলাম,” মেছলির কণ্ঠস্বরে দ্বিধা, “তুমি ভুলে গিয়েছ।”

“আমি কিছুই ভুলি না মেছলি। ভোলো তুমি। ভুলে যাওয়া আর টেনশন করা ছাড়া তোমার কোনও কাজ নেই।”

মেঘনাদের রুটিন ধমকে বোর হয়ে রুহি বলল, “আহ! বাবা! মাকে বোকো না।”

“কেমন আছিস?” নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মেঘনাদ। উত্তর না দিয়ে রুহি ফোন কেটে দিল।

আয়েশাও এর মধ্যে বাড়ির সঙ্গে কথা সেরে নিয়েছে। ফোন কেটে সে রুহির দিকে তাকিয়ে বলল, “প্রদীপ পটেলকে ফোন করে ব্যাপক ঝাড় দেব এবার।”

“ফোন ধরবে?”

“বাবা বলল ও নাকি এখন ইউক্রেনে। বাবার ফোন ধরেছিল। আমাকে যোগাযোগ করতে বলেছে। দেখা যাক,” প্রদীপের নম্বর ডায়াল করে স্পিকার চালু করেছে আয়েশা। ফোন ধরে প্রদীপ বললেন, “জয় শ্রীকৃষ্ণ! কেমন আছ আয়েশা?”

“আপনি কেমন আছেন স্যর?” আয়েশার গলায় মধু বারে পড়ছে, “শুনলাম আপনি ইউক্রেনে? বাড়ি ফেরার প্লেন মিস হয়ে গেল?”

প্রদীপ বুঝতে পেরেছেন যে আয়েশা রেগে আছে। তিনি বললেন, “তোমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো, তোমাদের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল যে ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করে দেবা সেই কাজের জন্যে প্রফেশনাল ফি নিয়েছিলাম। কাজটা করে দিয়েছি। আমার আর কোনও দায়িত্ব নেই।”

আয়েশা রাগে ফুঁসলেও ঠান্ডা মাথায় বলল, “বিপদের সময় অচেনা দেশে কাকে ফোন করব বলুন?”

“আমার কাছে দিনে এক হাজার ফোন আসছে। কয়েক হাজার মেল আর মেসেজ আসছে। সেগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব? আমিও এই দেশ থেকে বেরোতে পারছি না। সেটা ভেবেছ?”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়েশা বলল, “ইন্ডিয়া যাব। কিছু একটা করুন, প্লিজ।”

“হয়ে যাবে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে আমার বেঙ্গলের এজেন্টের হাতে দশ লাখ টাকা তুলে দাও। ইন ক্যাশ।”

“দশ লাখ?” আঁতকে উঠেছে আয়েশা, “আপনি কি পাগল? আমরা বিপদে পড়েছি। যে কোনও সময় মরে যেতে পারি!”

“ডাক্তারি পাশ করে যখন মানুষের জীবন বাঁচাবে তখন টাকা নেবে না?”

“সেটা আমাদের প্রফেশন হবে,” গলা চড়াচ্ছে আয়েশা।

“এটাও আমার প্রফেশন। আমি একজন মিডলম্যান। তোমাদের বাংলা ভাষায় যাকে ‘দালাল’ বলে। প্রদীপ নামের এই দালালটি না থাকলে তুমি ডাক্তারি পড়তে পারত?”

“শিক্ষা-দালালি না হয় আপনার প্রফেশন। কিন্তু দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এত টাকা চাওয়ার মানে কী?”

“ভুল বললে। আমার পেশা শুধুমাত্র দালালি। ডাক্তারি পড়ানোর জন্যে শিক্ষা-দালালি। যুদ্ধের সময় ইউক্রেন থেকে উড়িয়ে ইন্ডিয়া পাঠাব। এটা যুদ্ধ-দালালি। শুনতে খারাপ লাগলে ‘প্রফেশনাল ডিজাস্টার সার্ভিস’ বলতে পারো। কিন্তু আমার প্রফেশনাল ফি-র নড়চড় হবে না। দশ লাখ টাকা ইন ক্যাশ! জয় শ্রীকৃষ্ণ!”

“ফাক ইউ!” রাগের চোটে আয়েশা ফোন কেটে দিয়েছে। ক্রোধে চোখ অগ্নিবর্ণ, নাকের পাটা ফুলে আছে।

এবার রুহি ফোন করেছে গুঞ্জল মেহতাকে। দূতাবাসের কর্মীকে জানানো যাক তাদের অবস্থার কথা।

ফোন ধরে গুঞ্জল বললেন, “রুহি, কেমন আছ?”

“আপনারা যেমন রেখেছেন,” রুহির গলায় বিরক্তি ফুটে বেরোচ্ছে।

“টার্নোপিলে এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যা নেই।”

“এই সহজ কথাটা শোনার জন্যে আমি আপনাকে ফোন করিনি।”

“আমি তোমাদের অনেক আগেই বলেছিলাম ইন্ডিয়ায় ফেরত যেতে।”

“সেটা আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়ন ছিল।”

“এখন ক’টা বাজে? রাত বারোটা পাঁচ, ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গিয়েছে। তার মানে দিল্লিতে এখন ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত তিনটে পর্যন্ত। আজই সকালে বা দুপুরে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা মিটিং করবেন। সিদ্ধান্ত কী হবে আন্দাজ করতে পারছি। তোমাদের যদি আকাশপথে উড়িয়ে ইন্ডিয়ায় ফেরত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলেও সেটা ইউক্রেনের প্রতিবেশী বন্ধু দেশ থেকে হবে। কারণ ইউক্রেনের আকাশপথ অলরেডি বন্ধ। তার মানে পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া বা মলদোভা। রাশিয়া আর বেলারুশ নয়। তোমরা অ্যাক্স আল্ট অ্যাক্স পসিবল টার্নোপিল ছেড়ে কোনও বর্ডার টাউনে চলে যাও। প্রেফারেবলি টু শেহায়নি। ওই গ্রামটা লিভিভ প্রশাসনিক এলাকায়, লিভিভ কাস্টমস পুলিশের আধারে। সীমান্তের ঠিক ওপারে পোল্যান্ডের যে গ্রামটা আছে তার নাম মেদিকা। ট্রাভেল করার সময় ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ সঙ্গে রেখো। দিস ইজ মাস্ট।”

রুহি বলল, “এই পরামর্শটা আগে দিলেই পারতেন। তা হলে আমাদের বিপদে পড়তে হত না।”

গুঞ্জল উত্তেজিত হয়ে বললেন, “মনে করে দেখো, আগেও বলেছিলাম। তোমরা বলেছিলে এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। ঠিক আছে। একটু পরেই সরকারি নির্দেশিকা দেখতে পাবে। বাই,” ফোন কেটে দিলেন।

এত রাগ আর উত্তেজনা কেন রে বাবা! ফোন নামিয়ে ইভানের দিকে তাকাল রুহি। দেখল, লোকটি আয়েশার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। রুহি দেখছে বুঝতে পেরে চোখ নামিয়ে নিলেন।

গুঞ্জনের সঙ্গে কী কথা হয়েছে সেটা সংক্ষেপে আয়েশাকে জানিয়ে রুহি বলল, “জাতীয় পতাকা তৈরির একটাই উপায়। ঐকে প্রিন্ট আউট নেওয়া। তার জন্যে রুমে যেতে হবে।”

“চল যাই। আমাকে বাথরুম যেতে হবে।” স্যাঁতসেতে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আয়েশা। ব্যাকপ্যাক নিয়ে বান্ধার থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, “অহমকে ফোন করেছিস?”

“ফোন আউট অফ রিচ। হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট মেসেজ আর অডিও মেসেজ করে রাখছি। ও এখন মেট্রো স্টেশনে আছে। সেখানে মোবাইলের সিগনাল নেই। মাঝেমধ্যে ওপরে এসে মেসেজগুলো রিসিভ করে আবার নেমে যাচ্ছে,” বলল রুহি। তারপর গুঞ্জনের সঙ্গে কী কথা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অহমকে হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস মেসেজ হিসেবে পাঠিয়ে দিল।

হোস্টেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আয়েশা বলল, “রাতটা হস্টলে থাকলে কেমন হয়?”

“কাল রাত বান্ধারে কাটিয়ে গিয়ে হেবির ব্যথা!” রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে রুহি, “এটা ঠিক যে রুমে থাকলে ওয়াই-ফাই ইউজ করে জানতে পারব কোন বর্ডার কাছে হবে এবং অ্যাকসেসিবল হবে। বান্ধারে নেটওয়ার্ক বড্ড স্লো।”

“আমরা কীভাবে বর্ডারে যাব সেটাও ঠিক করতে হবে।” বাথরুম থেকে ঘুরে এল আয়েশা, “ট্রেন বা বাস চলছে না। একটা শক্তপাক্ত চারচাকা জোগাড় করতে হবে। শেহায়নি যেতে কত হতনিয়া নেবে কে জানে!”

দুজনের আলোচনার মধ্যে হঠাৎ দরজায় দুমদাম আওয়াজ! সেই সঙ্গে মহিলা কণ্ঠে চিৎকার, “বাঁচাও! বাঁচাও!”

প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও দু’জনে একই সঙ্গে দরজার দিকে দৌড়ল। দরজা খুলে দেখল অন্ধকার করিডরে একটা লোক একটা মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

“সুচিত্রার গলা!” চিৎকার করেছে আয়েশা। রুমে ফিরে বিছানার নীচ থেকে সাইকেলের চেন বার করে আবার দৌড়ে বেরোচ্ছে দু’জনে। এতদিন কাজে না লাগলেও আজ এটা কাজে লাগবে।

হঠাৎ চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। মোবাইলের টর্চ জ্বেলে রুহি দেখল সুচিত্রা মাঝসিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। এক ধাপ নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইভান। সিঁড়ির শেষ ধাপে পড়ে কাতরাচ্ছে সুচিত্রার ক্লাসমেট উমেদ সিং।

সুচিত্রার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে আয়েশা বলল, “কী হয়েছে? বল! কে করেছে?”

“বাথরুম যাব বলে হস্টেলে এসেছিলাম,” সুচিত্রা কাঁদছে, “উমেদ আমাকে ফলো করেছে বুঝতে পারিনি। ইভান আঙ্কল আজ না থাকলে...”

রুহি ইভানের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি তো আমাদের সঙ্গে বাস্কারে ছিলেন। হঠাৎ এখানে কেন এলেন? আমাদের ফলো করছিলেন নাকি?”

ইভান ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ ম্যাডাম। আপনারা বাস্কার থেকে বেরোনোর পর থেকেই ফলো করছিলাম। নিজের চোখে দেখেছি যে যুদ্ধের প্রথম ভিক্তিম হল মেয়েরা। আজ আপনার দেশের লোক রেপ করতে এসেছিল। কাল আমার দেশের লোক একই কাজ করতে আসবে।”

সুচিত্রা হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে ‘ই-ই-ই’ শব্দ করে জ্ঞান হারাল। আয়েশা তাকে জাস্টে ধরে কোনও রকমে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ইভানের দিকে তাকিয়ে রুহি বলল, “আপনি আমাদের একটু সাহায্য করবেন? সুচিত্রাকে আমাদের রুমে নিয়ে যেতে চাই।”

“নিশ্চয়ই!” সুচিত্রাকে দু’হাতে পাঁজাকোলা করে ইভান বললেন, “কোন রুম?”

চারজনে মিলে রুহিদের রুম ঢুকল। সুচিত্রাকে বিছানায় শুইয়ে ইভান বললেন, “আমি ছেলেটিকে বাস্কারে রেখে আসছি। তারপর সারারাত আপনারদের হস্টেলের বাইরে বসে থাকব। অসুবিধে হলে ডাকবেন। তবে আমার পরামর্শ হল, ইউক্রেন ছেড়ে চলে যান।”

সুচিত্রা চোখ খুলেছে। তাকে খাওয়ানোর জন্যে দুধ গরম করছে আয়েশা। সেদিকে এক পলক দেখে রুহি বলল, “সেটাই করতে চাইছি। আপনার চেনা কোনও ড্রাইভার আছে? আমরা তাঁর গাড়িতে শেহায়নি যাব।”

নোংরা ওভারকোটের পকেট থেকে সস্তার ফোন বার করে ইভান কাউকে ফোন করছেন। সুচিত্রা দুধ খেয়ে সুস্থ। আয়েশা খুব মন দিয়ে ল্যাপটপের মনিটরে জাতীয় পতাকা একে সবুজ, সাদা আর গেরুয়া রং ঢালছে। ফোন কেটে ইভান বললেন, “একজন ড্রাইভার পাওয়া গিয়েছে। ইগর, আমার দাদা। ওর একটা হ্যাচব্যাক আছে। আগামীকাল সকাল সাতটার সময় এখানে চলে আসবে। আপনারদের শেহায়নি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ওর। তবে ভাড়া বেশি নেবে।”

“কত?” জিজ্ঞাসা করল আয়েশা।

“দশ হাজার হভনিয়া।”

মোবাইলে টার্নোপিল থেকে শেহায়নি যাওয়ার ভাড়া দেখে নিয়েছে আয়েশা। সে বলল, “পনেরোশো হভনিয়া লাগার কথা। দশ হাজার হভনিয়া বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না?”

“ওই ভাড়াটা শান্তির সময়কার ম্যাডাম,” কাঁধ বাঁকালেন ইভান, “এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি। আপনারদের মতো আমাদেরও প্রাণের দাম আছে। তা ছাড়া ওকে শেহায়নি থেকে প্যাসেঞ্জার ছাড়া ফিরতে হবে। দু’ পিঠ মিলিয়ে তিন হাজার হভনিয়া লাগার কথা। ইগর তিনগুণ বেশি চাইছে। তিনজনের মাথাপিছু হিসেব কষে দেখুন, ঠিকই আছে।”

আয়েশা বা রুহি কিছু বলার আগে সুচিত্রা বলল, “আমরা যাচ্ছি। ইগর আর আপনার মোবাইল নম্বর আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন।”

ইভান, রুহি আর সুচিত্রা নিজেদের মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আয়েশা প্রিন্টার অন করে ‘কনট্রোল গ্লাস পি’ টিপতেই বেরিয়ে আসছে একের পর এক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। সেদিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে ভালবাসা, ভরসা আর আস্থা খুঁজে পাচ্ছে আয়েশা, রুহি আর সুচিত্রা।



দিল্লি

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি শনিবার হওয়া সত্ত্বেও রাত আটটার সময়

প্রধানমন্ত্রীর অফিসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত আছেন বিদেশমন্ত্রী এস শিবকুমার, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরকিষণ পুরি, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী আদিদেব সিঙ্কিয়া, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ঋজু করণ, সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বিনয় সিংহ এবং বিদেশ সচিব গোবর্ধন শ্রিংলা। এছাড়াও আছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের নানাবিধ সেক্রেটারি।

এত লোক নিয়ে মিটিং স্বাভাবিক নয়। তবে আজকের দিনটাও স্বাভাবিক নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিজের কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে দ্বিধার মধ্যে আছে ভারত। রাশিয়ার সঙ্গে তো বটেই, ইউক্রেনের জোটসঙ্গী আমেরিকার সঙ্গেও ভারতকে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। ভবিষ্যতেও সেটাই করতে হবে। কাজেই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা জরুরি।

কিভ আর খারকিভে যে সব ভারতীয় ছেলেমেয়ে পড়তে গিয়েছে তারা ওখানে আটকে পড়ার পরে হঠাৎ সোশাল মিডিয়ায় কান্নাকাটি শুরু করল। সেই সব ভিডিও এখন ‘ভাইরাল’। প্রবল দাবি উঠেছে, ইউক্রেন থেকে সব ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনতে হবে।

সরকার আগাগোড়াই বিষয়টা জানত। ১৫ ফেব্রুয়ারি জারি করা প্রথম নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ইউক্রেনে যে সব ভারতীয় আছেন তাঁরা যেন দেশে ফিরে আসেন। ছাত্রদের আলাদা করে ইউক্রেন ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশিকা জারি করা আর সেটা কার্যকর করার মধ্যে অনেক তফাত।

দেওয়ালে মাউন্ট করা বিরাট মনিটরে ফুটে উঠছে একের পর এক গ্রাফ, চার্ট আর ডায়াগ্রাম। সে দিকে তাকিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস শিবকুমার বললেন, ইউক্রেনে ২০,০০০ ভারতীয় আছেন। এঁদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৮,০০০। রাফ এস্টিমেট হল, এই মুহূর্তে ইউক্রেনে ১৬,০০০ ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন।”

বিদেশ সচিব গোবর্ধন শ্রিংলা বললেন, “আমরা ইতিমধ্যে ওষুধ ও ত্রাণ সামগ্রী ইউক্রেনে পাঠিয়েছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ‘ইউক্রেনের প্রতিবেশী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির নাগরিকরা যদি চান তা হলে সহায়তা প্রদান করা হবে।’ এই দু’টি ট্যাকটিকাল মুভের পরে আমরা ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধানের অফিসের সঙ্গে কথাও বলেছি। আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একবার ভলোদেমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হবে।”

প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। নীরবতা ভেঙে বললেন, “মোদ্দা কথা হল, ভারতীয় নাগরিকরা বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। ওঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে যা যা করা প্রয়োজন, করুন। এই হল আমার এক লাইনের ব্রিফ।”

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। নীরবতা ভেঙে বিদেশমন্ত্রী বললেন, “ভারতীয় ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি রয়েছে কিভ আর খারকিভ এলাকায়। আমরা ইউক্রেনের সমস্ত কলেজ মারফত নির্দেশিকা জারি করে ছাত্রছাত্রীদের বাস্কারে শিফট করিয়েছি। বেশিরভাগ ভারতীয় এটিএম থেকে হভনিয়া তুলতে পারেননি। এর কারণ হল ইউক্রেনের বাসিন্দারা আগে যুদ্ধ দেখেছেন। যুদ্ধের খবর পাওয়া মাত্র ওঁরা এটিএম থেকে বেশি করে হভনিয়া তুলে নিয়েছেন। দে আর মোর ‘ওয়ার-রেডি’ দ্যান ইন্ডিয়ানস।”

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী, পঁয়ষট্টি বছরের বিনয় সিংহ হঠাৎ রাগী গলায় বললেন, “কিছু ভারতীয় ছাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় বলছে যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ওদের কোনও সাহায্যই করছে না।”

বিদেশ সচিব হাত তুলে বিনয়কে শান্ত হতে অনুরোধ করে বললেন, “ওদের যে অসুবিধে হচ্ছে এটা তো সত্যি কথা। সোশাল মিডিয়ার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একজন ভারতীয় ছাত্রকে ইউক্রেনের মিলিটারি থাপ্পড় মেরেছে।”

মনিটরে ফুটে ওঠা ইউক্রেনের মানচিত্র দেখিয়ে বিদেশমন্ত্রী বললেন, “কাজের কথায় আসা যাক, ইউক্রেনের প্রতিবেশী এবং আমাদের বন্ধু দেশ হল পাঁচটি। রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মলদোভা আর স্লোভাকিয়া। রোমানিয়ার বুখারেস্ট, হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট, পোল্যান্ডের রেজেজো, মলদোভার কিশিনাউ আর স্লোভাকিয়ার কোসিস বিমানবন্দর থেকে ভারতীয়দের এয়ারলিফট করতে হবে।”

প্রধানমন্ত্রী বললেন, “আমি পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। উনি জানিয়েছেন যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পোল্যান্ড ভারতীয়দের পাশে আছে। যুদ্ধের কারণে যাঁরা শরণার্থী

হচ্ছেন তাঁদের পোল্যান্ড সীমান্ত পেরোতে ভিসা লাগবে না। সবাইকেই খাবার ও থাকার জায়গা দেওয়া হবে। উনি বলেছেন ভারতীয়রা যেন জাতীয় পতাকা সঙ্গে রাখে। তা হলে চিনতে সুবিধে হবে।”

বিনয় বললেন, “এই অপারেশনের একটা জোরদার নাম দিতে হবে। আগামী কয়েকদিন এটাই হেডলাইন আর ব্রেকিং নিউজ হবে,”

“আগে প্ল্যান অফ অ্যাকশন ঠিক হোক!” ধমক দিলেন প্রধানমন্ত্রী, “ফান্ড কোথা থেকে আসবে, লজিস্টিক্স কী হবে, কারা লিড করবে, এগুলো ঠিক হোক। তা না করে শুধু হেডলাইনের চিন্তা।”

“সরি স্যার!” বিভ্রিড় করলেন বিনয়।

বিদেশ সচিব গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, “আজকের মিটিং-এর প্রথম সিদ্ধান্ত হল, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ভারত কোনও দেশকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল, রাশিয়ার আক্রমণের মধ্যে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারত সরকারের একটি অভিযান সংগঠিত করছে, যার নাম ‘অপারেশন গঙ্গা’। এই অপারেশনে ভারতকে সাহায্য করছে রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মলদোভা আর স্লোভাকিয়া।”

“নাইস নেমা!” প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন বিনয়।

উত্তর না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, “বাকি দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে?”

বিদেশ সচিব ও বিশেষ মন্ত্রী একসঙ্গে বললেন, “ইয়েস স্যার।”

প্রধানমন্ত্রী বললেন, “এই অপারেশন কো-অর্ডিনেট করব আমি। ওই পাঁচটি দেশে ভারত সরকারের প্রতিনিধি পাঠাতে হবে।”

“যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কাউকে পাঠানো কি ঠিক হবে?” আমলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন বিনয়, “ওঁদের সকলের পরিবার আছে।”

“আমরা তো বেতনভুক কর্মচারী নই। আমরা রাজনীতি করতে এসেছিলাম মানুষের ভাল চেয়ে। নিরক্ষর যেন শিক্ষিত হয়, অভুক্ত যেন খেতে পায়, নিপীড়িত মানুষ যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, ভারত যেন পুরনো মর্যাদা ফিরে পায়— এই সবের জন্যেই তো দিনরাত এক করে রাজনীতি করেছে। পরে না হয় ভোটে দাঁড়িয়েছি, মন্ত্রী হয়েছি, সাধারণ মানুষের টাকায় সুরক্ষিত বাংলায় থাকা অভ্যাস করে ফেলেছি। লাল বিকন লাগানো গাড়িতে চড়লে সামনে আর পিছনে মোটরকেড থাকে, অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে ব্র্যাক ক্যাট থাকে, যানজট ম্যাজিকের মত উধাও হয়ে যায়। তাই না?” বিনয়ের দিকে টাকিয়ে শান্তভাবে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

বিনয় চুপ। তিনি প্রধানমন্ত্রীর এই শান্ত চেহারা ও মিষ্টি কথার মানে খুব ভাল করে জানেন। এক্ষুনি বড়সড় একটা ঝড় উঠবে। উঠবেই।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, “খাঁদের ট্যাক্সের টাকায় আমরা এত সুবিধে পাই, যাঁদের ভোটে জিতে আমাদের এত অহঙ্কার, তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখন বিদেশের বান্ধবের বসে ভয়ের চোটে আর ঠান্ডায় কাঁপছে। মাথার ওপরে ছাদ নেই, বাথরুম নেই, খাবার আর পানীয় জল শেষ হয়ে আসছে। আছে মৃত্যু আর লুটতরাজের ভয়। এই পরিস্থিতিতে আমরা কখনও পড়েছি? এই ভাবে আমরা একটাও ঘণ্টা কাটাতে পারব তো?”

কেউ মুখ খোলার সাহস দেখাচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রী বললেন, “কো-অর্ডিনেশনের জন্যে ওই পাঁচটি দেশে যাবেন পাঁচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আদিদেব সিঙ্কিয়া যাবেন পোল্যান্ড, হরকিষণ পুরি যাবেন হাঙ্গেরি, ঋজু করণ যাবেন স্লোভাকিয়া, বিনয় সিংহ সামলাবেন রোমানিয়া আর মলদোভা।”

“মলদোভাটা কোথায়?” অর্তনাদ করে উঠলেন বিনয়। তাঁর চিৎকারে গুরুত্ব না দিয়ে বিদেশ সচিব বললেন, “ফান্ডের কী হবে স্যার?”

প্রধানমন্ত্রী তাকালেন অর্থমন্ত্রীর দিকে। অর্থমন্ত্রী বললেন, “আমাদের ‘ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড’ আছে। এটা তৈরি করা হয়েছিল বিদেশে বিপদে পড়া ভারতীয়দের জন্যে। ফান্ড নিয়ে সমস্যা হবে না।”

বিদেশমন্ত্রী বললেন, “সরকারি নেটওয়ার্ক মারফত সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি যে ইউক্রেনের সমস্ত ভারতীয় নাগরিক যেন পশ্চিম ইউক্রেনের শহরগুলিতে আশ্রয় নেন। এবং সেই কাজটা করার আগে ইন্ডিয়ান এমবাসির সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করেন। সর্বক্ষণের হেল্পলাইন নম্বর রেডি আছে। তার সঙ্গে ইমেল, ওয়েবসাইট আর ফ্যাক্স চালু করতে বলছি।”

“একটা টুইটার হ্যান্ডল চালু করুন স্যার,” বছর চল্লিশের আদিদেব বললেন, “এখনকার স্টুডেন্টরা ফ্যাক্স কাকে বলে জানে না। ওরা ইনস্টা, ফেসবুক, টুইটার জানে।”

প্রধানমন্ত্রী আদিদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কোন কোন এয়ারলাইনকে কাজে লাগাবেন?”

“সরকারি বিমান সংস্থা ‘আওয়ার ইন্ডিয়া তো থাকবেই,’ পাশাপাশি আমি প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি। এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস। ‘আওয়ারগো’, ‘এক্সপ্রেস ইন্ডিয়া’, ‘এয়ারজেট’, ‘ফ্লাই এয়ার’ রাজি।”

মিটিং-এ বিরতি ঘোষণা করা হল। সবার জন্যে চা এবং সামান্য কিছু খাদ্য এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজের চেয়ারে বসে রইলেন। বাকিরা ঘর থেকে বেরিয়ে ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আধঘণ্টা পরে মিটিং শুরু হতেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললেন, “ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ইজ ইন অ্যাকশন। ওরা প্ল্যানিং শুরু করে দিয়েছে। প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের সঙ্গে ওরাই কো-অর্ডিনেট করবে। সেটা আমি মনিটর করব। সমস্যা একটাই। আগাগোড়া কোভিড প্রোটোকল ফলো করতে হবে।”

আদিদেব বললেন, “‘আওয়ার ইন্ডিয়া’ সব দেশেই নন-স্টপ ফ্লাইট ইমিডিয়েটলি চালু করছে। সব কর্মচারীর ছুটি বাতিল। প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের প্রধানদের সঙ্গে কথা হল। সকলে এক বাক্যে বললেন, প্রতিটি ছেলেমেয়ে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত ফ্লাইট চালু থাকবে। ইনফ্যান্ট, রোমানিয়ার বুখারেস্টে ‘আওয়ার ইন্ডিয়া’-র একটা প্লেন এখন আছে। তাতে চেপে কিছু ছেলেমেয়ে দেশে ফিরবে। দিল্লিতে সেই প্ল্যান ল্যান্ড করবে আগামীকাল, মানে ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোর দুটো পঞ্চাঙ্গ মিনিটে।”

বিনয় বললেন, “আমাদের মিডিয়াকে বলে দিন ল্যান্ডিংটা কভার করতে। সব জায়গায় যেন লাইভ টেলিকাস্ট হয়। প্রেস, এভি মিডিয়া, সোশাল মিডিয়া— সব জায়গায়।”

আদিদেব বললেন, “প্রাইভেট এয়ারলাইন্স নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করে বেস্ট পসিবল রুট তৈরি করেছে। ওরা নিজেদের মধ্যে ফ্লাইট ভাগ করে নেবে। মন্ত্রী আর আমলাদের ওরাই পিক আপ করে নেবে।”

বিনয় আতঙ্কিত হয়ে বললেন, “আমি সিনিয়ার সিটিজেন স্যার। আমার হাই ব্লাড সুগার। রোজ ইনসুলিন নিতে হয়।”

“মিটিং শেষ। আপনি বাড়ি ফিরে ইনসুলিন নিয়ে নিন এবং দিনপাঁচেকের বিদেশ সফরের জন্য তৈরি হোন।” বললেন প্রধানমন্ত্রী, “গুড লাক!”

বিনয় মুখ নিচু করে বসে রইলেন।

আলোচনা শেষ করার আগে প্রধানমন্ত্রী বললেন, “সেক্রেটারিদের আমি একটা কথা বলতে চাই।” বিভিন্ন পদমর্যাদার সেক্রেটারিদের দিকে তাকিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী, “আপনারা ঠিক করে নিন কে কোন এলাকার নোডাল অফিসার হবেন। চেষ্টা করুন প্রতি রাজ্যের জন্যে সেই ভাষায় কথা বলতে পারা নোডাল অফিসার দিতে। এই কঠিন সময়ে সহমর্মিতার জন্যে লোকাল ল্যান্ডস্কেয়েজ জানা লোক লাগবে।”

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বললেন, “আমরা লিস্ট বানিয়ে ফেলেছি স্যার। প্রতিটি জ্ঞানের জন্যে একাধিক নোডাল অফিসার থাকবেন। প্রত্যেকেই একাধিক ভাষা জানেন। তাঁরা এক্ষুনি নিজের অফিসে ফিরে প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে ফোনে কথা বলে আজকের মধ্যেই ভিডিও কনফারেন্স করবেন।”

বছর আটাল্লর এক ক্যাবিনেট সেক্রেটারি বললেন, “বেঙ্গলের চিফ সেক্রেটারি এখন বিদেশে। ওঁর অ্যাবসেন্সে ওঁর কাজ দেখছেন একজন অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি। নাম প্রফুল্ল ব্যানার্জি। আমি ওকে পার্সোনালি চিনি। অলরেডি কথা বলেছি।”

“দেবু বাস, দ্য এভার এনার্জেটিক বং!” ক্যাবিনেট সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। আদিদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আচ্ছা, ওই লেডি পাইলটের কী যেন নাম, যিনি ‘বন্দে ভারত মিশন’-এ খুব ভাল কাজ করলেন! যাকে নিয়ে নিউজ হল...”

করোনা অতিমারি ছড়িয়ে পড়ার পর বহু ভারতীয় বিদেশে আটকে পড়েন। একই ভাবে বহু বিদেশি ভারতে এসে আটকে পড়েন। কোভিড বিধি মেনে এক কোটিরও বেশি মানুষকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ভারত থেকে বিদেশে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই উদ্যোগের নাম



ছিল ‘বন্দে ভারত মিশন।’

একটু ভেবে আদিদেব বললেন, “আপনি বোধহয় ফ্লাই এয়ারের মেছলি লাহিড়ীর কথা বলছেন।”

“হ্যাঁ। ওই মহিলাকে দায়িত্ব দাও। বাঙালি মেয়েরা হল মা দুর্গার জাত।”

“ঠিক আছে স্যার,” মোবাইলে ফ্লাই এয়ারের এমডিকে ধরছেন আদিদেব।

*

প্রধানমন্ত্রীর অফিসে মিটিং চলাকালীন প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যসচিবের মেল আইডিতে ভিডিও কনফারেন্সের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মিটিং শেষ হওয়া মাত্র প্রত্যেক নোডাল অফিসার যে যার চেয়ারে চলে গেলেন। প্রতিটি রাজ্যকে মিটিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে চার ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে।

বাংলার মুখ্য সচিব এখন বিদেশে। তাঁর কাজ সামলাচ্ছেন প্রফুল্ল। তাঁর মেল আইডিতে ভিডিও কনফারেন্সের লিঙ্ক এল রাত এগারোটার সময়। তখন তিনি নবান্ন, নিজের কেবিনে বসে কাজ করছেন। পার্সোনাল সেক্রেটারি মেলটি পড়ে বাংলার প্রতিটি জেলার জেলাশাসককে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলেন। সব জেলাশাসক উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর প্রতিনিধি থাকবেন। এটা আপেক্ষিকালীন মিটিং।

ঠিক চার ঘণ্টার মাথায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাত তিনটেয় মিটিং শুরু হল। দেবু খুবই সিনিয়ার ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। তিনি শুরুতেই সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সেরে ফেললেন। প্রফুল্লর সঙ্গে সামান্য হাসিঠাট্টা করে মূল বিষয়ে ঢুকে গেলেন।

অপারেশন গঙ্গার রূপরেখা জানানোটা প্রাথমিক কাজ। সেটা জানিয়ে দেবু বললেন, “কোন জেলা ইউক্রেনের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কে কে পড়তে গিয়েছে, তার একটা হিসেব চাই।”

সবাই চুপ।

“পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস আছে, থানা আছে, আপনাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে। হয়ে যাবে তো?”

“ইয়েস স্যার,” সবাই এক সঙ্গে বললেন।

“আপনারা রিপোর্ট করবেন অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি প্রফুল্ল ব্যানার্জিকে। উনি রিপোর্ট করবেন আমাকে। আপাতত এই পর্যন্ত,” মিটিং শেষ করে দেবু তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন, “ভারতের ছাত্রছাত্রীদের রিসিভ করার জন্যে কাদের রাখা হচ্ছে? নামের লিস্ট দাও।”

সেক্রেটারি একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। সেটা পড়ে দেবু বললেন, “হর্ব জৈন আর খুশি যাদব। গুড। বন্দে ভারত মিশনের সময় ওরা খুব ভাল কাজ করেছিল।”

*

মিটিং শেষ হওয়া মাত্র নবান্নয় তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রফুল্ল তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন, “বঙ্গ ভবনে আমাদের এফিশিয়েন্ট স্টাফ কে আছে?”

সেক্রেটারি একটুও না ভেবে বললেন, “আনন্দ জানা আর পুলক মিত্র। কোভিডের সময় জান লড়িয়ে দিয়েছিল।”

“গুড। ওদের মেল করো। বাংলার যে সব ছাত্রছাত্রী দিল্লিতে নামবে তাদের কলকাতায় উড়িয়ে আনার দায়িত্ব ওদের। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের পুলিশের তরফে শাল্মলী পাইন বুঝে নেবো।”

দিল্লির মিটিং-এর অভিযাত ছোট ছোট টেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা ভারত জুড়ে। আজ ভারতের প্রতিটি জেলা শাসকের দপ্তরে অনেক মানুষ রাত জেগে ডেটা বেস তৈরি করবেন। রাত জাগবে ক্ষমতার কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরও।

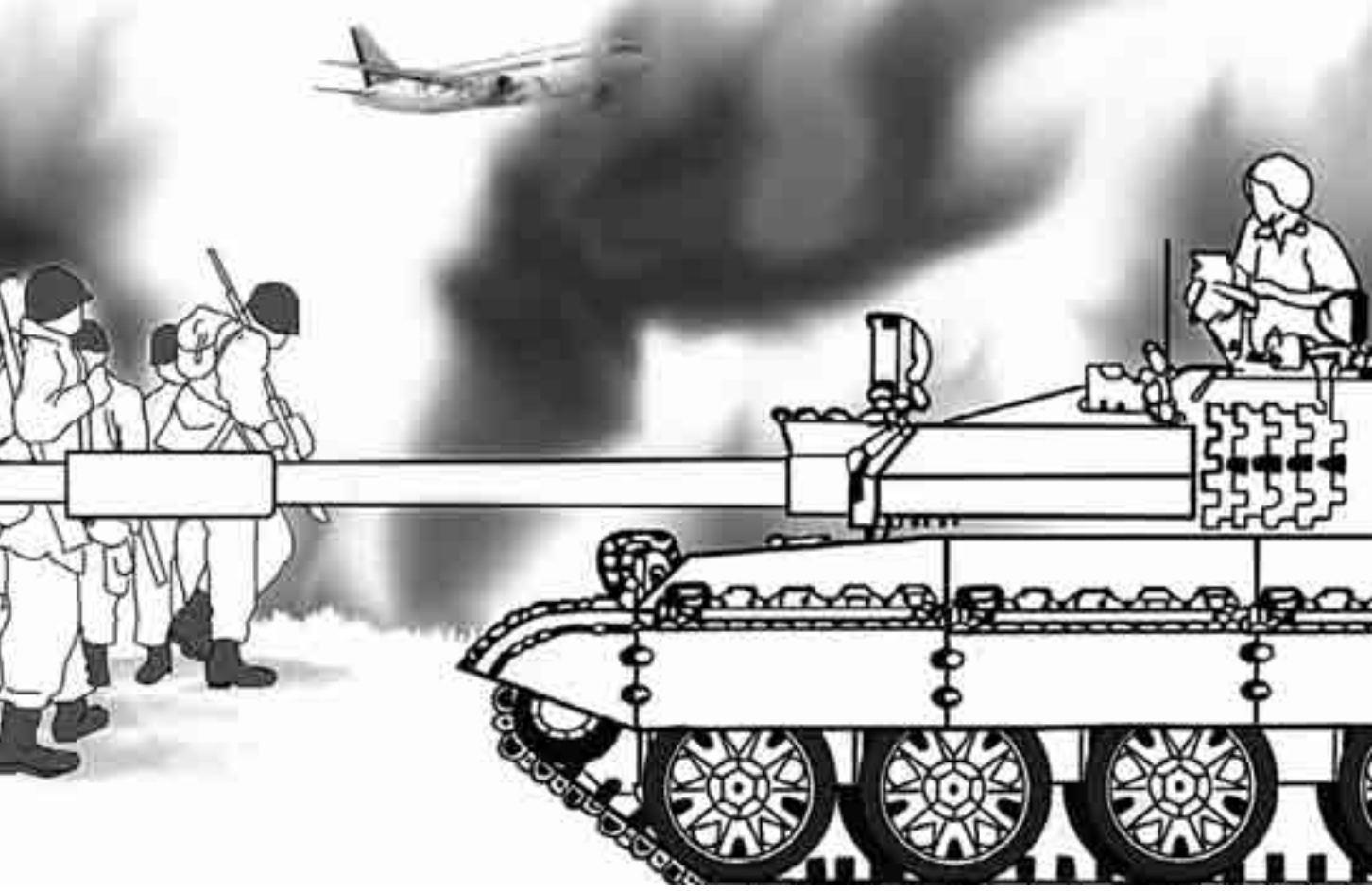
প্রফুল্লর কাজ আপাতত শেষ। তিনি প্রথম ফোনটা করলেন নীলিমাকে। নবান্নর যে ফ্লোরে তিনি বসেন, তার জানলা দিয়ে নীলিমার বহুতল দেখতে পাওয়া যায়।

নীলিমা ফোন ধরে বললেন, “বলো।”

“ছেলেটার ফেরার ব্যবস্থা করা গেল।”

“সত্যি?” কেঁদে ফেললেন নীলিমা।

অল্প কথায় প্রফুল্ল বুঝিয়ে দিলেন অপারেশন গঙ্গার রূপরেখা। বললেন, “একটাই মুশকিল। ওকে নিজের দায়িত্বে কোনও একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যেতে হবে।”



“ওটাই আমারও ভয়। তোমার মতো ডেয়ার ডেভিল নয়। তোমার ছেলে হয়ে কেন যে এরকম হল!” আচমকা কথাটা বলে ফেলে চুপ করে গিয়েছেন নীলিমা।

প্রফুল্লও চুপ। কিছুক্ষণ পরে বললেন, “আমরা এই নিয়ে কখনও আলোচনা করব না, এটা অনেক আগেই ঠিক হয়ে আছে।”

“আমার ভুল হয়ে গিয়েছে,” কাঁদছেন নীলিমা, “আমার আসলে মথার ঠিক নেই। আর কত সহ্য করব বলো তো?”

“আমার বউবাচ্চা আছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে, পেশাগত দায়বদ্ধতা আছে। এর মধ্যে এই প্রসঙ্গ উঠলে আমি ইনেকশিয়েন্ট হয়ে যাই। তুমি এই কথাটা আর কোনও দিনও বলো না। পারলে ভুলে যাও।”

“ভুলে কি আর যাওয়া যায় গো?” নীলিমার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসছে, “তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে এই কথা পেটে নিয়েই আমি মরব। জানাজানি হওয়ার ফল দেখলাম তো। ইরবান মরেই গেল।”

“অনেক কষ্টে এস্টাব্লিশ করা গিয়েছে যে চাকরি যাওয়ার জন্যে হতাশায় সুইসাইড করেছে। এখন আর পুরনো প্রসঙ্গ তুলো না।”

“সেটা তো মিথ্যে নয়! পাশাপাশি ও তোমার আর আমার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কিছু ফোটো দেখে ফেলেছিল। কনফ্রন্ট করায় সত্যি বলতে বাধ্য হই।”

“ফোটোগুলো এখন কোথায়?”

“তোমাকে আগে অনেকবার বলেছি। নেগেটিভ সমেত সব পুড়িয়ে দিয়েছি। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না। আমার আর ইরবানের ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো। তোমার কাছে আর কিছু চাই না।”

“আমার আর ইরবানের ছেলে” শুনে খুশি হলেন প্রফুল্ল। এবার তিনি শান্তিতে, ঠান্ডা মাথায়, সারারাত জেগে কাজ করতে পারবেন।

অহম

“সমুদ্রদা অনেকক্ষণ আগে ওপরে গিয়েছে,” নাতালির দিকে তাকিয়ে বলল অহম।

“সমুদ্রকে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করো না। নিজেকে নিয়ে ভাবো,” মিষ্টি হাসল নাতালি।

অহম ভাবছে অন্য কথা। মাটির নীচে মোবাইলের টাওয়ার নেই। কাজেই ফোন বা মেসেজ ঢুকছে না। সেটা ভালই। মাকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে না। সমস্যা, মোবাইলে ব্যাটারি ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারা মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি, বিকেল সাড়ে পাঁচটা। এর মধ্যে তিনবার ব্যাটারি পুরো শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাওয়ার ব্যান্ড ছিল বলে রিচার্জ করা গিয়েছে। কিন্তু পাওয়ার ব্যান্ডের ক্ষমতাও অফুরন্ত নয়। অন্য সমস্যা হল স্টেশনের বাথরুম আর ব্যবহারযোগ্য নেই।

সমুদ্র ফিরে এসেছে। তাকে দেখে নাতালি বলল, “কোনও নতুন খবর?”

“জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব করেছিল রাশিয়া যেন ইউক্রেন থেকে নিঃশর্তভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করে। রাশিয়া সেই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছে।”

“এ তো জানা কথা!” মুখ ভেটকায় নাতালি, “বাইরে আর কী দেখলে?”

বিষম মুখে সমুদ্র বলল, “এয়ার অ্যাটাক এত বাজে ভাবে হয়েছে যে বলার নয়। আশেপাশের বেশ কয়েকটা হাইরাইজ মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মিলিটারিরা বলাবলি করছিল যে এয়ারপোর্ট, বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন লক্ষ্য করে মিসাইল ছুড়েছে। অলরেডি শ’খানেক লোক মারা গিয়েছে।”

“আর কিছু?” জিজ্ঞাসা করল অহম।

“সমস্ত ফ্লাইট ২ মার্চ পর্যন্ত ক্যানসেল। আমাদের এদিকে হেভি শেলিং হলেও পশ্চিম ইউক্রেন এখনও সেফ। তার মানে রহি নিরাপদ। জ্বেলেনস্কি জাতীয় ভাষণে জানিয়েছেন যে ইউক্রেন জুড়ে সামরিক আইন চালু করা হল।”

“এসব শুনতে ভাল লাগছে না!” বিরক্ত অহম, “আমি বাথরুম যাব।”

“রাস্তার ওপারে সুপারমার্কেটের টয়লেটগুলো সবার জন্যে খুলে দিয়েছে। সেগুলো এখনও ভদ্রস্থ আছে। ঘুরে আয়। নাতালি যাবে নাকি?”

“আমার একটা আইডিয়া আছে।” দুটুমির হাসি নাতালির মুখে।

“কী?” জিজ্ঞাসা করল সমুদ্র।

ঘড়ি দেখে নাতালি বলল, “এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। আমরা টুক করে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঘুরে আসি। বাথরুম যাওয়া হবে, মোবাইলে চার্জ দেওয়া হবে, ড্রেস চেঞ্জ করা হবে, বাসি কাপড় ধুয়েও ফেলা যাবে।”

“সেটা কি ঠিক হবে?” সমুদ্র দ্বিধাযুক্ত।

“নাতালি যখন বলছে তখন একদম ঠিক আছে,” অহম উৎসাহিত।

“তোকে পাকামি করতে হবে না!” অহমকে ধমক দেয় নাতালি। সবার হাতে পাউরুটি তুলে দিয়ে বলে, “আপাতত এই দিয়ে কাজ চালাও।”

পাউরুটি শেষ করে জল খেতে গিয়ে অহম নাতালিকে বলল, “জলের অবস্থা দেখেছ?”

“অনেক আগেই দেখেছি।” ব্যাগ ঘাটছে নাতালি, “খাবারও শেষ হয়ে আসছে। আমরা রাত আটটা নাগাদ বেরোব।”

সমুদ্র চুপ করে রইল।

ঠিক রাত আটটার সময় নাতালি নিচু গলায় বলল, “এবার উঠতে হবে।”

“সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাব?” জিজ্ঞাসা করল সমুদ্র।

“প্লাস্টিক শিট আর খালি জলের বোতলগুলো থাক। না হলে অন্য কেউ বসে পড়বে। আমরা কাল ভোর রাতে চলে আসব।” নিজের ব্যাকপ্যাক নিয়ে উঠল নাতালি। অহম আর সমুদ্র পিছু নিল।

মেট্রো স্টেশন থেকে বেরোনোটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। রাস্তায় কোনও আলো জ্বলছে না। ঘোলাটে অন্ধকারে সেনাদের বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চোখ সইয়ে নেওয়ার পরে ওরা বুঝতে পারল, চারজন সেনা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু লোক স্টেশন থেকে দৌড়ে বেরোচ্ছে এবং দৌড়ে ঢুকছে। সেনারা দেখতে পেলেও কিছু বলছে না।

আঙুলের খোঁচায় সমুদ্র আর অহমকে পিছু নিতে বলে, মাথা নিচু করে মাটির সঙ্গে মিশে মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়েই স্যাট করে ডানদিকে ঘুরে গেল নাতালি।

অন্ধকার! শীত করছে! কঁধে ভারি ব্যাগ! ঝুঁকে দৌড়তে হচ্ছে! মিলিটারির ভয়া! হেঁচট খেয়ে পড়া! উঠে দাঁড়ানো! আবার দৌড়া! ছুটতে ছুটতে অহম ভাবছিল, হাওড়ায় থাকার সময়ে সে ভাবতেও পারেনি যে এই রকম বিপদে কখনও পড়বে! বাঙালির ছেলে অ্যাডভেঞ্চার বলতে বোঝে শঙ্করের আফ্রিকা অভিযান বা দার্জিলিং-এ খুনজখম। কিন্তু এই মুহূর্তে, কিভে যত বদঙ্গস্তান রয়েছে, তারা যে অসম্ভব অচিন্তনীয় অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার কথা কেউ লিখবে না?

একটানা আধঘণ্টা মাথা নিচু করে দৌড়ানোর পরে অহম বুঝতে পারল, তারা বরিস পিলক্ষি স্ট্রিটে চলে এসেছে। এখানে রাস্তায় কোনও লোক নেই। সেনাও নেই। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মনে হল কোমর ভেঙে গিয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, “আর কতদূর?”

“নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলছিস কত দূর?” অহমের মাথায় চাঁটি মেরে রাইবালক্সি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল সমুদ্র। নাতালি আগেই ঢুকেছে। লিফ্টে ওঠার রিস্ক না নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। নিচু গলায় সমুদ্র বলল, “রুমে ঢুকে আলো না জ্বালিয়ে সব কাজ করবি। ভাল করে ঘুমিয়ে নে। কাল ভোরবেলা ডাকবা।”

নাতালি বলল, “মাঝরাতে এয়ার রেড শুরু হলে এমনিই ঘুম ভেঙে যাবে।”

চারতলায় পৌঁছে পকেট হাতড়ে চাবি বের করে নিজের রুমে ঢুকল অহম। নাতালি আর সমুদ্র ওপরে চলে গেল।

ব্যাগ ছুড়ে ফেলে সবার আগে ফোন চার্জে দিল অহম। তারপর বাথরুমে ঢুকল। জামাকাপড় ছেড়ে কমাতে বসে ভাবল, মাত্র দুদিন আগে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছিল। মাত্র ষাট-বাষটি ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তারি ছাত্র থেকে শরণার্থী হয়ে গেল! হাঁটুতে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে হাউসহাউ করে কাঁদতে লাগল অহম।

কতক্ষণ ওই ভাবে কাঁদল জানে না! চোখের জল এক সময় শুকিয়ে গেল। সাফসুতরো হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গ্যাসে চাল, ডাল, আলু আর ডিম সেদ্ধ চাপাল।

একবার শরণার্থী হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে অহম জেনে গিয়েছে কোন কোন জিনিস সঙ্গে রাখতেই হবে। সে সবার আগে

জলের বোতল আর খাবারদাবার ভর্তি করল ব্যাগে। ব্যবহার করা পোশাক ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে মোবাইল হাতে নিল।

ওরেকবাস! মিস্‌ড কল, মিস্‌ড কল অ্যালাউন্স, মেসেজ, ভয়েস মেসেজ আর ইমেলের বন্যা বয়েছে তো! প্রথমে মিস্‌ড কল অ্যালাউন্স চোখ রাখল সে। মা আর রুহি ছাড়া অন্য কেউ ফোন করেনি। এদের সঙ্গে পরে কথা বললেও হবে। বাকিগুলো দেখে নেওয়া যাক। মিস্‌ড কলের তালিকাতেও ওই দু’জন ছাড়া কেউ নেই। তবে হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন গ্রুপে কয়েক হাজার অপঠিত মেসেজ জমা হয়েছে। গ্রুপের বাইরে মা আর রুহির হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আছে।

এবার ইমেল দেখার পালা। তার সংখ্যাও কম নয়। জঞ্জাল ডিলিট করার পরে কলেজ থেকে পাঠানো মেলগুলো পড়ল। কাজের মেল একটাই। কলেজ অনিদিষ্টকালের জন্যে বন্ধ। মোবাইল রেখে খেতে বসল অহম। ফেনা ভাত, ডালসেদ্ধ, ডিম আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখা আলুভাতে খেয়ে বিছানায় ছেড়ে দিল নিজে। মোবাইলের মতো শরীরকেও রিচার্জ করা জরুরি। কাল থেকে আবার প্ল্যাটিফর্ম শুতে হবে।

পরের দিন, সাতাশ ফেব্রুয়ারি, সকাল সাতটার সময় অহমের ঘুম ডাঙল বিমান হানা এবং বোমা বিস্ফোরণের শব্দে। এক লাফে বিছানা থেকে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। অনেকটা দূরে আগুন জ্বলছে, তবে কাছে আসতে সময় লাগবে না। ফোন হাতে নিয়ে অহম দেখল গতকাল মাঝরাতে ইন্ডিয়ান এমবাসি থেকে থেকে একটি মেল এসেছে। তাতে বলা হয়েছে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক যেন পূর্ব ইউক্রেন ছেড়ে অবিলম্বে পশ্চিম ইউক্রেনের দিকে চলে যান। এবং পরের ধাপে প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া বা মলদোভা চলে যান। সীমান্ত পেরোনোর জন্যে কোনও দেশই ভিসা লাগবে না। সবাই যেন ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ ক্যারি করেন। ওই সব দেশে ভারতীয় বিমান অপেক্ষা করছে সবাইকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

এই মেলটি ছাড়া রুহির কাছ থেকে একটি অডিয়ো মেসেজ এসেছে। তাতে ও জানিয়েছে, গুঞ্জন মেহতা পরামর্শ দিয়েছেন পোল্যান্ড চলে যাওয়ার জন্যে। মেসেজটা শুনে মহিলার ওদ্ধত্য পরিকার বোঝা যাচ্ছে।

রাগের চোটে তখনই গুঞ্জনকে ফোন করল অহম। ফোন ধরে গুঞ্জন কেজো গলায় বললেন, “ইন্ডিয়ান এমবাসি।”

“কিভ থেকে একজন ইন্ডিয়ান মেডিকাল স্টুডেন্ট বলছি,” নাম বলার প্রয়োজন বোধ করল না অহম, “আমি কীভাবে পশ্চিম ইউক্রেন যাব যদি বলে দেন। ট্রেন, বাস বন্ধ। রাস্তায় কোনও ক্যাব নেই।”

“প্রাণে বাঁচতে হলে হেঁটে যাও,” রেগে গিয়ে চৈতালেন গুঞ্জন।

“এই ভাবে কথা বলছেন কেন?” ঠান্ডা মাথায় বলল অহম, “কলটা রেকর্ড করছি। এই অডিয়ো ক্লিপ যদি মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সে মেল করি?”

গুঞ্জন অনেকক্ষণ চুপ। তারপর ফোনে ফোঁপানির আওয়াজ শোনা গেল। হঠাৎ বললেন, “আই অ্যাম সরি।”

“ইউ উইল বি সরিয়ার!” রাগে ফেটে পড়েছে অহম, “আপনি দূতবাসের স্টাফ হয়ে এই ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না।”

“আমি কয়েক সপ্তাহ আগে তোমাদের বলিনি দেশে ফিরে যেতে?” কেজো গলায় বললেন গুঞ্জন, “নিজের দায়িত্বে বলেছিলাম। কেন বলেছিলাম জানো?”

“কেন?” অহম গল্প শুনতে আগ্রহী নয়। তাও মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলছে।

“২০১৪ সালে কিভ শহরে পুলিশ আর বিক্ষোভকারীর মধ্যে মারামারি হয়েছিল। সিভিলিয়ান এবং পুলিশ দু’দলেরই অনেকে লোক মারা যায়। তাদের মধ্যে আমার ছেলেও ছিল।”

খবরটা শুনে এতটাই খারাপ লাগছে যে অহম কথা বলতে পারছে না। মা হয়ে সন্তানের মৃত্যুর খবর শোনাতে কারই বা ভাল লাগে? ঢোঁক গিলল অহম।

“ও তোমাদেরই মতো ডাক্তারি পড়তে ইউক্রেনে এসেছিল। পুলিশের লাঠির আঘাতে হেড ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ক্রিটিকাল কন্ডিশন। আমি তখন ওকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সব জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করেছি। কোনও লাভ হয়নি। অসুস্থ রোগীকে নিয়ে দেশে ফেরার সরকারি গ্রিন সিগনাল পেতে এত দেরি

হয়ে গেল যে... ও... এখানেই মারা যায়!” গুঞ্জন টানা কাঁদছেন।

অহম ‘সরি’ বলে ফোন রাখল। গুঞ্জনের কথা ভেবে খারাপ লাগছে। কী সাংঘাতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ওঁকে যেতে হয়েছে সেটা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়! পুত্রের মৃত্যুর স্মৃতির আঘাত পুষে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন এক মা! হয় রে!

নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের মাকে ফোন করল অহম। নীলিমা ফোন ধরলেন না। এখন কলকাতায় এগারোটা বাজে। হয়তো নাইট ডিউটি করছেন। পরের ফোনটা রুহিকে করল অহম।

“কেমন আছিস?” ফোন ধরে প্রশ্ন করল রুহি।

“ভাল,” অল্প কথায় নিজের পরিস্থিতি জানিয়ে অহম বলল, “তুই কেমন আছিস?”

“আমি, আয়েশা আর সুচিত্রা নামের ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে মিলে লিভিং হয়ে শেহায়নি এসেছিলাম গাড়ি ভাড়া করে। রাস্তায় খুব জ্যাম। অনেকটা রাস্তা হটিতে হয়েছে। এখনও বর্ডার উপকালে পারিনি রে!”

“ওখানে পৌঁছে ফোন করিস।” তাড়াহুড়ো করে ফোন কাটল অহম। সমুদ্র আর নাতালি মিলে দরজা ধাক্কাচ্ছে। জোর গলায় ঝগড়া করছে। রুম থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা মারল অহম। আবার কবে এখানে আসা হবে কে জানে!

নাতালি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সমুদ্রকে বলছে, “ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কথা শোনো। বর্ডার উপকে অন্য দেশে চলে যাও।”

“তুমিও চলো,” জোর গলায় বলল সমুদ্র।

“আমি যেতে পারি না। এটা আমার দেশ,” শ্রাগ করে নাতালি।

“দেশ কাকে বলে জানি না নাতালি। গোটা দুনিয়াটাই আমার দেশ।”

“এ সব রোম্যান্টিসিজম গল্পে, গানে, নাটকে, কবিতায় মানায়। লেনিন সেই করে গেয়েছিলেন, ‘ইম্যাজিন নো কানট্রি’ সে রকম কিছু ঘটেছে? কাঁটাভার উঠে গিয়েছে? পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়া তুমি পাশের দেশে যেতে পারো?”

“পারছি তো!” বলল অহম, “এখন ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশে যেতে গেলে ভিসা লাগছে না।”

“কারণ এখন যুদ্ধ চলছে,” রাইব্যালস্কি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে সাততলা বাড়িটার দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকাল নাতালি, “যুদ্ধ মানে গোলাপ আর টেডি বিয়ার নয়। যুদ্ধ মানে গণহত্যা, যুদ্ধ মানে ধর্ষণ, যুদ্ধ মানে বিমান হানা। যুদ্ধ মানে খটখটে বাস্তব। সেখান থেকে তুমি কেন পালাবে না? তোমার নিজের দেশ আছে, তুমি পালাও।”

“তুমিও আমার সঙ্গে চলো,” সমুদ্র নাছোড়া!

অহম অবাক হয়ে দেখছে, ওরা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থেকে নড়ছে না। আবার বিমান হানা শুরু হয়েছে।

“আমার বাবা-মা, কাকা, দাদা আর ভাইবোন আছে। তাদের ফেলে যেতে পারি না,” আকাশের দিকে তাকাল নাতালি, “তা ছাড়া ক’দিন পরে আমাকেও যুদ্ধে যেতে হতে পারে।”

ওদের কথার মধ্যে একটি হলুদ রঙের সেডান এসে দাঁড়িয়েছে। চালকের আসনে বসে আছেন বছর ষাটের এক বৃদ্ধ। একমুখ সাদা দাড়ি-গোঁফের কারণে মুখমণ্ডল কদম ফুলের মতো লাগছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

অহমের দিকে তাকিয়ে নাতালি বলল, “আলাপ করিয়ে দিই। আমার কাকা কাদিরভ। এঁর কথা তোকে অনেকবার বলেছি। সমুদ্রের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ আছে। উনি কিভের স্কুলে পড়াতেন। শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পরে চাষাবাস আর রাজনীতি করেন। আমিই কাকাকে ফোন করে ডেকেছি।”

অনেক মানুষ আছেন যাঁরা চোখ দিয়ে হাসেন। কাদিরভ সেই রকম মানুষ। মৃদু হেসে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, “আপনারা গাড়িতে উঠুন।”

“আমরা কোথায় যাচ্ছি? যেতে কতক্ষণ লাগবে? কত হাভনিয়া লাগবে?” জিজ্ঞাসা করল সমুদ্র।

“তোমরা যাচ্ছ সুসিয়েভা,” বলল নাতালি, “৬০৭ কিলোমিটার যেতে লাগার কথা সাড়ে আট ঘণ্টা। সব কিছু ঠিক থাকলে আজ বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছবে। কত হাভনিয়া লাগবে সেটা গুণল করে দেখে নাও। তবে যুদ্ধের সময় সকলে নর্মাল ভাড়ার তিন গুণ বেশি নিচ্ছে।”

কাদিরভ বললেন, “৪০০ ডলার।”

অহম নেট খেঁটে দেখে নিয়েছে যে কিভ থেকে সুসিয়েভা যেতে ১৩০ ডলার লাগে। উনি ঠিক নামই চেয়েছেন। অহম জিজ্ঞাসা করল, “সুসিয়েভা জায়গাটা কোথায়?”

“রোমানিয়া,” সমুদ্র আর অহমের কাঁধ থেকে ব্যাগ নিয়ে গাড়ির সামনের সিটে রেখে হঠাৎ চিৎকার করলেন কাদিরভ, “তোমরা গাড়িতে ওঠো! কুইক!”

চিৎকারের কারণ আছে। খুব কাছেই একটা বিমান হানা হল। বোম পড়ার বিকট আওয়াজ, আগুনের বলক, গাড়ি ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাওয়া, বহুতল ভেঙে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, মানুষের আত্ননাদ, অ্যান্থ্রাক্সের হুটারের ট্যাঁওট্যাঁও, সেনাবাহিনীর সম্মিলিত বুটের খটখট... সব মিলিয়ে পরিবেশ মুহূর্তে বদলে গেল। এক লাফে সেডানের পিছনের সিটে বসে সমুদ্রের দিকে তাকাল অহম।

এবং দেখল, যুদ্ধবিদগ্ন কভ শহরকে সাক্ষী রেখে নাতালি আর সমুদ্র চুমু খাচ্ছে। চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে, রঙিন শহর ধীরে ধীরে সাদা-কালো হয়ে যাচ্ছে, ব্যথাবিন্দু মানুষের গোঙানি স্তান হয়ে আসছে, বোমারু বিমানের কোলাহল মুছে গিয়ে পিয়ানোর টুংটাং-এ ভরে যাচ্ছে চরাচর...

সমুদ্র আর নাতালি চুমু খাচ্ছে।

রুহি

২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটার সময় যাত্রা শুরু করল ইগরের নীল হ্যাচব্যাক। ইগরের পাশে বসেছে আয়েশা। পিছনের সিটে রুহি আর সুচিত্রা পাশাপাশি বসেছে।

ইগরের বয়স বছর পঞ্চাশ। ভাই ইভানের মতো লম্বা না হলেও শরীর শক্তপোক্ত। সবুজ চোখের মণি, সাদাটে চামড়া, খয়েরি চুল আর কালচে নীল ঠোঁট একদম ইভানের মতো।

ইগর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে না দিতেই রুহি প্রশ্ন করল, “শেহায়নি পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? গুগল ম্যাপ কী বলছে?”

সুচিত্রা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। উত্তর দিল না। আয়েশা বলল, “২১২ কিলোমিটার রাস্তা। গাড়িতে সওয়া তিন ঘণ্টা লাগার কথা।”

“আমরা হাইওয়ে জিরো টু দিয়ে যাচ্ছি।” গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন ইগর, “এটা কিভ ওব্লাস্টকে জুড়েছে টার্নোপিল ওব্লাস্টের সঙ্গে।”

“ওব্লাস্ট মানে কী?” জানতে চাইল রুহি।

ইগর বললেন, “ওব্লাস্ট মানে প্রশাসনিক বিভাগ বা জোন।”

“এখানে আমরা কত স্পিডে যেতে পারি?” জিজ্ঞাসা করল রুহি।

“এখানে আরামসে ১৩০ কিলোমিটার পার আওয়ারে চালানো যায়। তবে আমি অত জোরে চালাচ্ছি না। বয়স হয়েছে, রিস্কেস্স আগে মতো নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হলে সকলের বিপদ। রাস্তার অবস্থাও ভাল নয়।”

“রাস্তা তো ভালই,” আপত্তি করল আয়েশা।

“একটু পরে টের পাবেন রাস্তা কেমন,” হাসলেন ইগর, “ইস্ট ইউক্রেনের রাস্তা এদিককার চেয়ে ভাল। তবে কিভ আর খারকিভের রাস্তায় যে রটে বোম পড়ছে, তাতে আর ভাল থাকবে বলে মনে হয় না! অবশ্য সব মানুষ মরে গেলে রাস্তা আর কোন কাজে লাগবে!”

ইগর এত ক্যাঙ্কালি মরে যাওয়ার কথা বললেন যে তিনিটি মেয়েরই দম আটকে এল। যুদ্ধের প্রসঙ্গ এড়াতে সবাই বাইরে তাকাল।

এখানে জনপদ নেই। দু’দিকে মখমলি সবুজ ঘাসজমি চিরে মাইলের পর মাইল লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে দিগন্ত পেরিয়ে আর একটু দূরে। সবুজের এত রকম বৈচিত্র্য দেখলে আপনা আপনি মন ভাল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় গাছ। এদেশে থেকে থেকে অনেক গাছ চিনে গিয়েছে ওরা। পাইন, ওক, বিচ, স্প্রুস আর বার্চ তো আছেই। পাশাপাশি অনেক অচেনা গাছও রয়েছে। মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে ইগর বলল, “এটা স্যুর্মুখীর সিজন নয়। কিছুদিন পরে এলে দেখতেন পুরো মাঠ হলুদ হয়ে আছে।”

সুচিত্রা বলল, “সানফ্লাওয়ার হল ইউক্রেনের জাতীয় ফুল।”

“কেন জানেন?” গর্বের সঙ্গে বললেন ইগর, “এই ফুল শান্তির প্রতীক। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আমেরিকা, রাশিয়া এবং

ইউক্রেনের মন্ত্রীরা মিলে পারভোমাইস্ক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে সূর্যমুখী গাছ পুঁতে ইউক্রেনকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্যে চিহ্নিত করেন। সেই রাশিয়াই আজ ইউক্রেন তাক করে মিসাইল ছুড়ছে। কাল নিউক্লিয়ার ওয়ারের ভয় দেখাবে। শান্তির পক্ষে ভাল ভাল কথা বলে আমাদের নিরস্ত্র করে নিজে সশস্ত্র হয়েছে।” জানলা দিয়ে ঘোমার খুঁত ফেলে রাশিয়ার নামে অশ্রাব্য গালি দিলেন তিনি।

আবার যুদ্ধ! প্রসঙ্গ বদলাতে রুহি বলল, “আমার খিদে পাচ্ছে।”

“আমারও।” বলল আয়েশা।

সুচিত্রা বলল, “আমার কাছে ইডলি আছে। খাবে?”

রুহি উত্তেজিত হয়ে বলল, “দে তো! পাউরুটি খেয়ে মুখে চড়া পড়ে গেল।”

ইডলি খেতে খেতেই ওরা খেয়াল করল, রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। এতক্ষণ রাস্তায় একটাও গাড়ি ছিল না। এখন তাদের পাশ দিয়ে একের পর এক গাড়ি চলে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানার চারচাকা ছাড়াও আছে ভাড়ার ক্যাব এবং ছোট বাস। সব গাড়িতেই ভারতীয় যাত্রী ঠাসা। এবং সেই যাত্রীর অধিকাংশই রুহি-আয়েশা-সুচিত্রার মতো কমবয়সি ছাত্রছাত্রী।

রুহি মোবাইলে সময় দেখল। সকাল সাড়ে নটা বাজে। ওরা বেরিয়েছিল সকাল সাড়ে সাতটায়। সওয়া দু ঘণ্টার মধ্যে লিভিভ পৌঁছে যাওয়ার কথা। মাত্র ১২৮ কিলোমিটার রাস্তা। কিন্তু লিভিভের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। গুগল ম্যাপ খুলে চোখ কপালে তুলে সে বলল, “রাস্তার রং রঙের মতো লাল! কী ব্যাপার রে আয়েশা?”

ইগর বলল, “গাড়ি বাড়ার কারণ হল ইস্ট ইউক্রেনের শহরগুলো থেকে সকলে এদিকে আসছে সীমান্ত পেরিয়ে পোল্যান্ডে ঢুকবে বলে।” সুচিত্রা ইডলি খাওয়া বন্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করল, “লিভিভ থেকে শেহায়নি কত কিলোমিটার?”

ইগর ব্রেকে পা দিয়ে বললেন, “শেহায়নি অটোরুট এম এগারোর ওপরেই। এখন থেকে ৮০ কিলোমিটার।”

রুহি বলল, “অটোরুট আছে মানে আমরা পুরোটাই গাড়িতে যেতে পারব, তাই তো?”

ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ইগর বললেন, “থিয়োরিটিকালি তাই। কিন্তু পারব বলে মনে হয় না। সামনে দেখুন।”

রুহি সামনে তাকিয়ে দেখল রাস্তা জোড়া শুধু গাড়ি আর গাড়ি। নানা রঙের, নানা কোম্পানির, নানা সাইজের গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে ট্রাফিক জ্যাম তৈরি করেছে। ইউক্রেনে তিন বছর কাটিয়ে এই জিনিস একবারের জন্যেও দেখিনি রুহি।

“কী করবি?” আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করল সে।

ইডলি খাওয়া শেষ করে আয়েশা বলল, “ধুর ভান্নাগেনা! কী আবার করবি? বসে থাকবি। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রিয়ার হয়ে যাবে।”

“তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।” এক চুমুক জল খেল রুহি।

ফুলচন্দন পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল না তিন ঘণ্টা পরেও। দুপুর সাড়ে বারোটার সময় ইগর বললেন, “আমাকে ছেড়ে দিলে ভাল হয়।”

“এই কথার মানে কী?” বাঁঝিয়ে উঠেছে আয়েশা, “আপনার সঙ্গে চুক্তি ছিল যে শেহায়নি পৌঁছে দেবেন। সেটা এখনও অনেক দূর।”

ইগর আড়মোড়া ভেঙে বললেন, “আমি যা বলার বলেছি। এখন সিদ্ধান্ত আপনারা। আমি গাড়িতেই বসে রইলাম। জ্যাম কাটলে শেহায়নি পৌঁছে দেব।”

মন কষাকষির পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে রুহি গাড়ি থেকে নামল। কয়েকটা স্ট্রিটং সেরে সামনের দিকে তাকাল। যতদূর চোখ যায়, গাড়ির লাইন ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই কিছু গাড়ি রাস্তার পাশের ঘাসজমি ধরে ফিরে আসছে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে গাড়িতে ফিরে এল রুহি। দুপুর দুটোর সময় ইডলি, পাউরুটি আর ডিম দিয়ে লাঞ্চ সেরে আবার গাড়ি থেকে নামল। ইগর স্ট্রিয়ারিং-এ মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন। ফেরত আসা গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। এবং সেগুলোই কোনও ছাত্রছাত্রী নেই। শুধু চালক রয়েছেন।

একটা গাড়ির চালককে রুহি জিজ্ঞাসা করল, “ছাত্রদের বর্ডারে পৌঁছে দিয়ে এলেন?”

চালক যা বললেন সেটা শুনে রুহির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। “এখান থেকে লিভিভ পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যাম। তারপর আর গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। বর্ডার পর্যন্ত লাখ লাখ স্টুডেন্ট হেঁটে যাচ্ছে। আপনারাও বসে

না থেকে হাঁটা শুরু করুন। না হলে বর্ডার পেরোতে ভোর হয়ে যাবে।”

গাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় আয়েশা আর সুচিত্রা কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। আয়েশা আঁতকে উঠে বলল, “লিভিভ এখনও কত কিলোমিটার? আর সেখান থেকে শেহায়নি?”

“এখান থেকে লিভিভ তিন কিলোমিটার!” গুগল ম্যাপ দেখে বলল সুচিত্রা, “আমাদের এক্ষুনি হটিতে শুরু করা উচিত।”

“আমি অনেক আগেই আপনারদের বলেছিলাম,” ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙলেন ইগর, “যখনই একটা গাড়িকে লিভিভ থেকে ফিরতে দেখলাম, তখনই যা বোকার বুকে গিয়েছি। আপনারদের কিছু বলিনি, কারণ আপনারা ভাববেন যে আমি আপনারদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার প্ল্যান করছি।”

আয়েশা আর সুচিত্রা গাড়ি থেকে নিজের লাগেজ নিয়ে নেমে পড়েছে। রুহি বলল, “একটু কম নিন। আমরা তো এখনও অনেক দূরে। বুঝতেই পারছেন...”

“যা কথা হয়েছে তাই দিন। আমাকেও যুদ্ধের সময় বউবাচ্চা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।” কঠিন গলায় বললেন ইগর।

“প্লিজ ইগর...” অনুরোধ করছে আয়েশা।

“আপনারা গাড়িতে বসুন। আমি শেহায়নি পৌঁছে দেব। মাঝরাস্তায় নেমে যাওয়ার কথা আমি বলিনি,” ইগর নিজের অবস্থানে অনড়।

সুচিত্রা নিজের মানিব্যাগ থেকে হাভনিয়া বার করে রুহির হাতে তুলে দিল। “ধুর! ভান্নাগেনা” বলে আয়েশাও একই কাজ করল। রুহি কথা না বাড়িয়ে নিজের ভাগের হাভনিয়া যোগ করে পুরো অর্থ ইগরের হাতে তুলে দিল। ইগর হাভনিয়া গুলে ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, “সাবধানে যাবেন, অনেকটা রাস্তা।”

“আপনিও সাবধানে যাবেন।” হাত নাড়ল রুহি। দু’জনেই জানে ওদের আর কোনও দিনও দেখা হবে না।

তিনজনের সঙ্গে তিনটে চাকা লাগানো স্টুকেস, পিঠে ব্যাকপ্যাক। এই অবস্থায় হাঁটা শক্ত। প্রথম এক ঘণ্টা ওরা আনন্দ করেই হাঁটল। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু লিভিভ পেরিয়ে যাওয়ার পরে হাঁটা মুশকিল হয়ে গেল।

এখানে গাড়ি নেই। ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পরিযায়ী শ্রমিকের দল লকডাউনের সময় বাড়ি ফিরেছে। মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় এরা অর্থবান পরিবারের সন্তান। সবাই দামি জিন্স, টিশার্ট, স্নিকার্স আর হুডি পরে আছে। সকলের হাতে আমেরিকান কোম্পানির চাকা লাগানো স্টুকেস আর পিঠে আমেরিকান কোম্পানির ব্যাকপ্যাক। ওরা হাঁটছে।

সঙ্গে ছ’টা বাজল... সাতটা...ওরা হাঁটছে।

রাত আটটার সময় মেহুলির ফোন এল। রুহি ফোন ধরা মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন আছিস?”

সত্যি কথা বললে মা ভয় পেয়ে যাবেন। রুহি বলল, “আমরা গাড়িতে পোল্যান্ড বর্ডার পাচ্ছি।” মেহুলি আর কিছু বলার আগেই টুক করে ফোন কেটে দিল সে।

রাত ন’টা... দশটা... এগারোটা... তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রির আশেপাশে। রুহি স্টুকেস খুলে ওভারকোট আর গ্লাভস পরে নিল। মাথায় উলের টুপি দিল। আয়েশা আর সুচিত্রাও একই কাজ করেছে। ওরা আবার হাঁটতে লাগল। রাত সাড়ে এগারোটার সময় আয়েশা বলল, “রাস্তায় কত স্টুকেস পড়ে আছে দেখেছিস?”

অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে অন্য দিকে তাকানোর কথা মাথায় আসেনি রুহি। সে বলল, “কেন পড়ে আছে?”

“লাগেজ নিয়ে হাঁটতে দেরি হচ্ছে বলে অনেকে স্টুকেস ফেলে গিয়েছে। ওয়াইজ্জ ডিসিশন। আমাদের স্টুকেসে জামাকাপড় ছাড়া আছেটা কী? বেঁচে দেশে ফিরতে পারলে জামাকাপড় আবার হবে।”

অন্ধকারের মধ্যেই রাস্তার ধারে বসে পড়েছে তিনজনে। স্টুকেস খুলে কাজের জিনিস বার করে ব্যাকপ্যাকে ঠেসে নিল। জামাকাপড় ভর্তি স্টুকেস রাস্তার পাশে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করল।

অন্ধকার হাইওয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। নিচু গলায় কথা বলছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। অনেকে মোবাইলে কথা বলছে। মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের হেন প্রদেশ নেই যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা ইউক্রেনে পড়তে আসেনি। বাংলাদেশ,

পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, আফ্রিকা ছাড়াও আমেরিকা আর ইতালির ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

রাত বারোটা বেজে গেল। চলে এল ২৭ ফেব্রুয়ারি। ওরা হাঁটছে। মোবাইলে গুনগুন করে কথা বলা অথবা গান শোনা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাটারি বাঁচাতে হবে। নিজেদের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেল কারণ শরীরের ব্যাটারিও বাঁচাতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গির মতো হেঁটে চলেছে মানবগোষ্ঠী। ওদের জীবনের একটাই লক্ষ্য। এমন একটা জায়গায় চলে যাওয়া যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে রাতের আকাশে আতসবাজির মতো বিকিয়ে উঠছে মিসাইল। অনেক দূরে বিমান হানা এখন থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, পায়ের নীচে মাটির কম্পন অনুভব করা যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে রাত একটা বাজল, দুটো, তিনটে, চারটে... ওরা হাঁটছে।

ভোর ছটা নাগাদ রাস্তায় এত ছেলেমেয়ে হয়ে গেল যে হাঁটাই মুশকিল। ভিড়ের মধ্যে শোনা গেল হিন্দিতে কেউ বলছে, “আমরা শেহায়নি এসে গিয়েছি। আর কিছুক্ষণের মামলা।”

রুহি, আয়েশা আর সুচিত্রা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। সব অন্ধকার টানেলের শেষেই আলো থাকে। সেই আলো দেখা গিয়েছে। রাত পেরিয়ে ভোর এসেছে। উভয়থেকেই রুহি বলল, “কিছু খেলে হয়।”

সুচিত্রা বলল, “আমাকে আগে বাথরুম করতে হবে।” তারপর রাস্তার ধারে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। সে ফিরে আসার পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিল সবাই মিলে। আবার অপেক্ষার পালা।

রুহির ফোন বাজছে। অহম ফোন করেছে। ফোন ধরে রুহি বলল, “কেমন আছিস?”

অল্প কথায় নিজের পরিস্থিতি জানিয়ে অহম বলল, “তুই কেমন আছিস?”

রুহিও অল্প কথায় নিজের অবস্থা জানিয়ে দিল।

“টাটা! পরে আবার ফোন করিস।” তাড়াছড়ো করে ফোন কাটল অহম।

সকাল সাড়ে আটটার সময়ও লাইন নড়ছে না দেখে রুহি বলল, “দাঁড়া, আমি একটু দেখে আসি।” তারপর লাইন ভেঙে এগোল। অনেকটা যাওয়ার পরে রুহি দেখল, সামনেই শেহায়নি চেকপোস্ট। সেখানে কোনও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। পাগড়ি পরা একটি শিখ ছেলেকে সে জিজ্ঞাসা করল, “কী হচ্ছে ওখানে?”

ছেলোটা ভুরু কুঁচকে বলল, “ইউক্রেনের পুলিশ বেছে বেছে ইন্ডিয়ান আর ব্ল্যাক স্টুডেন্টদের বর্ডার ক্রস করতে দিচ্ছে না। নিজের দেশের লোকদের আগে পার করাচ্ছে।”

“কেন?” রুহি অবাক।

ছেলোটা শ্রাব্য করে বলল, “পিয়োর অ্যান্ড সিম্পল রেসিজম।”

“অদ্ভুত ব্যাপার!” রুহি বিরক্ত।

শিখ ছেলোটি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, “নভজ্যোত ফ্রম বেঙ্গল।”

“রুহি ফ্রম বেঙ্গল,” রুহিও হাত বাড়াল।

“আমি ভবানীপুর। তুমি?” এখন বাংলায় কথা হচ্ছে।

“আলিপুর।”

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগিয়েছে। হঠাৎ সমবেত বিকট চিৎকারে ওরা আঁতকে উঠল। ঘাড় উচিয়ে দেখল কী হচ্ছে।

জনা বিশেক ভারতীয় ছাত্রকে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে এক ইউক্রেন পুলিশ। আর এক পুলিশ আকাশের দিকে তাক করে গুলি ছুড়ছে। একটা পুলিশ ভ্যান রুহিদের লক্ষ্য করে যেভাবে ছুটে আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চায়।

রুহি ভয়ের চোটে কী করবে বুঝতে পারছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। নভজ্যোত তার হাত ধরে টান মেরে রাস্তার ধারের ঘাসজমিতে ফেলল। তারপর পুলিশ ভ্যানের দিকে মোবাইল তাক করে চোঁচাতে লাগল, “ফ্রেন্ডস, পোল্যান্ডের চেকপোস্ট শেহায়নি থেকে নভজ্যোত বলছি। আপনারা দেখুন ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ইউক্রেন পুলিশ কী রকম দুর্ব্যবহার করছে। ওরা আমাদের ধরে মারছে, গুলি চালাচ্ছে, চাপা দেওয়ার জন্যে গাড়ি চালাচ্ছে। একজনও ভারতীয় ছাত্র এখানে মারা গেলে তার দায় কে নেবে?”

ঘাসজমিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই রুহি বুঝতে পারল, নভজ্যোত

‘ফেসবুক লাইভ’ করছে। মার খেতে থাকা ছাত্রছাত্রীদের দিকে মোবাইল ঘুরিয়ে বলছে, “কীভাবে মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে টানছে দেখুন। ভাল করে দেখুন। আপনারা জানিয়ে রাখি, শেহায়নিতে আসা ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব কম জনই বর্ডার পেরোতে পেরেছে। আমরা মাইনাস টেম্পারেচারে, আধপেটা খেয়ে, খোলা আকাশের নীচে বসে আছি। আপনারা প্লিজ কিছু করুন, প্লিজ।”

ঘাসজমি থেকে উঠে দাঁড়াল রুহি। সে ফেসবুক লাইভে নিজের মুখ দেখাতে চায় না। এইসব ভিডিও ভাইরাল হবে। বাবা-মায়ের কাছেও পৌঁছবে। তখন ওরা টেনশন করবেন।

হুড়ি মুখ পর্যন্ত টেনে নামিয়ে ভিড়ে মিশে গেল সে।



মেহলি

গতকাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ রুহিকে ফোন করেছিলেন মেহলি। ইউক্রেনে তখন রাত আটটা। মেয়ে ‘হ্যালো’ বলল নিচু গলায়, হাঁফাতে হাঁফাতে। মেহলি জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন আছিস?”

রুহি খুব দ্রুত বলল, “আমরা গাড়িতে পোল্যান্ড বর্ডার যাচ্ছি,” তারপর পট করে ফোন কেটে দিল।

কেটে দিল না কেটে গেল? চিন্তায় পড়লেন মেহলি। টিভির নিউজ চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখাচ্ছে, খবরের কাগজে রোজ যা বেরোচ্ছে, সে সব দেখলে আর পড়লে ভয়ের চোটে ঘুম ছুটে যায়। সারাক্ষণ মাথায় রুহির চিন্তা ঘুরছে। আয়েশা সঙ্গে আছে তো? ওদের ওদিকে মিসাইল অ্যাটাক হচ্ছে না তো?

মেঘনাদকে কথাগুলো বলে মেহলি ক্লান্ত। লোকটা কাঠিন্যের মুখোশ পরে থাকলেও ভিতরে ভেঙে পড়েছেন, বুঝতে পারছেন মেহলি। কিছুই আর ভাল লাগছে না। ছুটিতে থাকা সত্ত্বেও কোনও কাজে হাত দিতে পারেননি।

মেয়ের সঙ্গে ফোনালাপ চুকিয়ে জিভের তলায় চিন্তাহরণ বড়ি ফেলে সব ঘুমের দেশে যেতে শুরু করেছেন মেহলি, এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল। ধড়মড় করে উঠে মোবাইল হাতে নিয়ে মেহলির ভুরু কুঁচকে গেল। অফিসের ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন। রাত সাড়ে এগারোটা? কেন? সিঙ্গল মন্টের গ্লাস হাতে বসে মেঘনাদ তাঁর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

মেহলি ফোন ধরতেই ক্যাপ্টেন সুশান্ত সিংহ বললেন, “হ্যালো!”

সুশান্ত ফোন করেছেন? এত রাতে? অবাক হলেন মেহলি। লোকটাকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করেন।

বছর পঞ্চাশের সুশান্ত সিংহের জন্ম দেবাদুনে। বাবা এবং দাদা ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু প্রশিক্ষণ নিয়ে সুশান্ত যোগ দেন ফ্লাই এয়ার প্রাইভেট এয়ারলাইন্সে। দীর্ঘদিন এই কোম্পানিতে কাজ করেছেন, প্রভুত সুনামও অর্জন করেছেন।

হঠাৎ ওঁর জীবনে ভয়ংকর বিপদ নেমে আসে। কোনও দিনও ধূমপান না করা মানুষটির ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ে।

তারপর যা হয়। কোম্পানি থেকে লম্বা ছুটি নেন সুশান্ত। মুম্বইয়ের বিখ্যাত ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসা করান। অনেকগুলো রেডিওথেরাপি আর কেমোথেরাপির সাইকেলের পরে তিনি এখন ক্যানসার মুক্ত। আবার ফ্লাই এয়ারে জয়েন করেছেন। উনিই এখনও পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় পাইলট যিনি ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে আবার প্লেন চালাচ্ছেন। তবে ওঁকে নিয়ে একটাই মুশকিল। লম্বা ফ্লাইটে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

সুশান্ত এবং মেহলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এবং

ডোমেস্টিক সেক্টরে ‘এ ৩২০’ এয়ারবাস চালান। লম্বা ফ্লাইটে সুশাস্তকে বিশ্রামের জন্যে বেশি সময় দিয়ে থাকেন মেহলি এবং অন্য কো-পাইলট।

ফোন ধরতে একদম ইচ্ছে করছে না। সুশাস্ত জানেন যে তাঁর মেয়ে ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে। হয়তো সেই নিয়ে সমবেদনা জানানেন। সমবেদনা শুনতে একদম ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কিছু করার নেই। অফিসের ফোন না ধরা ক্ষমাহীন অপরাধ। ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর থেকে ফোন এলে না ধরার অপশন ছিল।

“বলুন,” যান্ত্রিক গলায় বললেন মেহলি।

“এখন সাড়ে এগারোটো বাজে। ঠিক দেড়ঘণ্টার মাথায় গাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট চলে এসো। এক্সট্রা ইউনিফর্ম আনবে।” চারটে বাক্য পরপর উচ্চারণ করলেন সুশাস্ত।

ফোনের প্রতিক্রিয়ায় মুহূর্তের জন্যে শরীর ও মন অবশ হয়ে গিয়েছিল মেহলির। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “আমি এখন ছুটিতে। আমার মেয়ে ইউক্রেনে আটকে পড়েছে। এখন আমাকে ফ্লাই করতে বলবেন না।”

সুশাস্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, “ছুটির সময় কাজ না-করার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমি চাই যে তুমি এসো।”

“আমাকে আগে বলতে হবে কোথায় যাচ্ছি,” মেহলি নাছোড়।

“আমি ঠিক একবার বলব। মন দিয়ে শোনো। তোমার মেয়ের মতো হাজার হাজার ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ইউক্রেনে বন্দি। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে ভারত সরকার একটি প্রকল্প নিয়েছে, নাম অপারেশন গঙ্গা। এই অপারেশনে সরকারি এবং বেসরকারি সব এয়ারলাইন্স পার্টিসিপেট করছে। ফ্লাই এয়ারও করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিটিং-এর একদম শেষে তোমার কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে তুমি যেন ফ্লাই এয়ারের তরফে অবশ্যই থাকো। এই কথাও বলেছেন যে বাঙালি মেয়েরা মা দুর্গার জাত। সব অসুরকে একা হাতে বিনাশ করবে।”

মা দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে মেয়েদের দিয়ে ‘মাল্টিটাস্কিং’ করানো হয় বলে উপমাটি পছন্দ নয় মেহলির। কিন্তু এই উক্তির মাধ্যমে তাঁর কাজকে সম্মান দেখিয়েছেন দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটি।

সুশাস্ত বললেন, “কাজ এফুনি শুরু করতে হবে। প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক দেশে ফেরা না পর্যন্ত এই অপারেশন চলবে। এমডির ফোন পেয়েই আমি অফিসে চলে এসেছি। ফ্রেস শিডিউলিং করতে হচ্ছে। রুটিন ফ্লাইটের পাশাপাশি অপারেশন গঙ্গা চালাতে হবে। সমস্যা হল, ইউক্রেনের আকাশসীমা বন্ধ বলে আমাদের নামতে হবে ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। রিফুয়েলিং করতে হবে ইস্তানবুল বা জর্জিয়া থেকে।”

কথা না বাড়িয়ে মেহলি বললেন, “গাড়ি পাঠিয়ে দিন।”

“থ্যাক্স ইউ মেহলি।” ফোন কেটে দিয়েছেন সুশাস্ত। মেহলিও ফোন রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে মেঘনাদ জিজ্ঞাসা করলেন, “ছুটির সময় ফ্লাই করতে বলছে?”

যেটুকু জানতে পেরেছেন, সেটুকুই বললেন মেহলি। সব শুনে মেঘনাদ বললেন, “তুমি কি বলেছ যে মানসিক চাপের মধ্যে আছ?”

“আমি আর কোনও মানসিক চাপের মধ্যে নেই।” পোশাক বদলাতে বাথরুম ঢুকলেন মেহলি। মেঘনাদ চেঁচিয়ে বললেন, “ডিনায়াল মোড়ে যাচ্ছ কেন? এটা মেনে নাও যে তুমি অ্যাংজাইটির পেশেন্ট। ওষুধ খাও। এই অবস্থায় প্লেন চালানো মানে শুধু নিজের ক্ষতি নয়। ইউক্রেনের যুদ্ধ থেকে যদিও বা বাঁচে, ছেলেমেয়েগুলো তোমার জন্যে বেঘোরে প্রাণ দেবে।”

মেহলি একটিও কথা না-বলে প্রস্তুত হলেন। গাড়ি দোরগোড়ায় আসা মাত্র ফোনে খবর এল। তিনি মেঘনাদের কাছে গিয়ে বললেন, “আগামী কয়েকদিন কোথায়, কী অবস্থায় থাকব জানি না। তোমার খবর নিতে পারব না। হয়তো মেয়েটার খবরও নিতে পারব না। তুমি আবার সিএম-এর সঙ্গে কথা বোলো।”

“মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করো না,” নরম গলায় বললেন মেঘনাদ, “প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সিএম-এর কথা হয়েছে।”

রাত একটার সময় বাড়ি থেকে বেরোলেন মেহলি। হোয়াটসঅ্যাপে মেয়েকে লম্বা মেসেজ পাঠিয়ে জানানলেন কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন যাচ্ছেন। একটু ভরসা পাক ওরা।

ফ্লাইএয়ার-এর সূত্রে ইউক্রেন বা রাশিয়া না গেলেও পোল্যান্ডে গিয়েছেন মেহলি। এই সময়ে ওই অঞ্চলে ভারি তুষারপাত হয়। তুষারের মধ্যে রানওয়েতে বিমান নামানো যথেষ্ট বিপজ্জনক কাজ। কী হবে কে জানে! নানা চিন্তা মাথায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন তিনি। রাত দুটোর সময় দমদম বিমানবন্দর থেকে দিল্লির ফ্লাইটে উঠে বসলেন।

মোবাইলের মতো মেহলির মাথাতেও এয়ারোপ্লেন মোড় আছে। তখন প্লেন চালানো ছাড়া অন্য কিছুর কথা মাথায় আসে না। সেই মোড়ে ঢুকে গেলেন মেহলি। ফ্লাইটে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে দিল্লি অফিসে ঢুকলেন। ফ্লাইট শিডিউল দেখে বুঝলেন সকাল সাতটার সময় ফ্লাই এয়ারের রুটিন ননস্টপ ফ্লাইট আছে দিল্লি থেকে ওয়ারশ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যুদ্ধের কারণে ফ্লাইটে যাত্রী খুবই কম। তবে এই ফ্লাইটেই পোল্যান্ড যাচ্ছেন আদিদেব সিদ্ধিয়া এবং চারজন উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। তাঁদের সঙ্গে কেজো আলাপ সেরে ককপিটে ঢুকে গেলেন মেহলি। মন্ত্রী, আমলা এবং বাকি যাত্রীদের খেয়াল রাখার দায়িত্ব ভিকির মতো ফ্লাইট স্টুয়ার্ট আর শ্বেতার মতো এয়ার হোস্টেসদের।

মেহলিকে ককপিটে ঢুকতে দেখে সুশাস্ত বললেন, “ওয়েলকাম!”

ছ’ ফুট লম্বা এবং বিশাল চেহারার অধিকারী মানুষটির চেহারা আগের থেকে অনেকটাই খারাপ। কিন্তু এনার্জিতে ভাটা পড়েনি।

ফ্লাইট শিডিউল দেখিয়ে মেহলি বলল, “ন’ ঘণ্টার ফ্লাইটে কো-পাইলট থাকবে না?”

মেহলির প্রশ্নের পিছনে যুক্তি আছে। আট ঘণ্টা বা তার কম সময়ের উড়ানে দু’জন পাইলট থাকেন। তার বেশি ফ্লাইট টাইম হলে তিনজন। সেই হিসেবে সওয়া ন’ ঘণ্টার ফ্লাইটে তিনজন পাইলট থাকার কথা।

“ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান। আমরা দু’জনই থাকব।” উত্তর দিলেন সুশাস্ত।

হাতে গোনা যাত্রীদের নিয়ে সকাল সাতটায় দিল্লি বিমানবন্দর ছেড়ে ৬০০০ কিলোমিটার দূরে উড়ে গেল ফ্লাইট। ইস্তানবুলে রিফুয়েলিং করে ন’ ঘণ্টা পনেরো মিনিট পরে ওয়ারশ-র শর্পা বিমানবন্দরে পৌঁছল। ভারতের হিসেবে বিকেল চারটে পনেরো মিনিটে বাজলেও পোল্যান্ডের হিসেবে এখন সকাল পৌনে বারোটো।

যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পরে ককপিটে বসে শ্বেতার এনে দেওয়া কাপ নডলস খেয়ে ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিচ্ছেন মেহলি। সুশাস্ত ঘুমোতে গিয়েছেন। ফ্লাইট ক্রু-দের বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গা সব প্লেনেই থাকে। সেটার খবর যাত্রীরা জানেন না। সেখানে বিছানা, চেয়ার, টেবিল, টিভি— সব আছে। মানসিক ভাবে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকার জন্যে পাইলটদের বিশ্রাম খুব জরুরি। লম্বা ফ্লাইটের ক্ষেত্রে প্লেনের মতো মানুষেরও রিফুয়েলিং লাগে।

মোবাইল অন করতেই গাদাগাদা নোটিফিকেশন দেখে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় মেহলির। সকলে তাঁকে কেন অভিনন্দন জানাচ্ছেন, এটা বুঝতে সময় লাগল। একটু পরেই বুঝলেন যে অপারেশন গঙ্গার একমাত্র মহিলা পাইলট বলে তিনি বেশি খাতির পাচ্ছেন। কোনও ভাবে মিডিয়া জেনে গিয়েছে তাঁর পুরো শিডিউল। তিনি যে এখন পোল্যান্ডে, দেশে ফিরেই যে রোমানিয়ার সুসিয়েভা যাবেন— সব তথ্যের উল্লেখ আছে। বিরক্ত হয়ে নোট বন্ধ করলেন মেহলি।

ফ্লাইট স্টুয়ার্ট ভিকি এসে বলল, “ম্যাডাম, অনেক ছেলেমেয়ে প্লেনে উঠে পড়েছে। আরও কয়েকজন আসছে।”

ব্ল্যাক কফি শেষ করে মেহলি বললেন, “সব সিট ভর্তি হলেই আমরা ফ্লাই করব।”

“আপনার রেস্ট?”

ভিকির প্রশ্ন শুনে হাসলেন মেহলি। “সুশাস্ত স্যরকে রেস্টে পাঠিয়েছি। আমি ফ্লাইটের মাঝখানে রেস্ট নেবো। টাচ ডাউন আমাকেই করতে হবে।”

কথা বলতে বলতে ককপিটের দরজা খুলে বাইরে উকি মারলেন মেহলি। হুড়মুড় করে উঠল একগাদা ছেলেমেয়ে। ওদের মধ্যে রুহিকে খুঁজলেন মেহলি। পোল্যান্ডের কোন বর্ডারের ও এসে পৌঁছবে? সেখান থেকে ওয়ারশ কত দূর? এই প্লেনে যে ও নেই, সেটা জানা কথা। দিল্লি ফিরে পরের ফ্লাইট নিয়ে মেহলিকে যেতে হবে রোমানিয়া। তখন আশয়ে যে ফ্লাইট আসবে, তাতে রুহি থাকবে তো? হে চাকুরা! যেন তাই হয়!

ছেলেমেয়েগুলো গাদাগাদি করে বসে পড়েছে। একটি ছেলে

হাউহাউ করে কাঁদছে আর বলেছে, “মা-র কাছে যাব। আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো।” একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে “ইউ ক্যান নট ইম্যাজিন আওয়ার সিচুয়েশন। গাড়ি পাইনি বলে তিন দিন এক টানা হেঁটেছি। একদিন এত স্লো ফল হল যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। তাপমাত্রা মাইনাস ইলভেন! খাবার আর জল ফুরিয়ে গেল। আমাদের লাঠির বাড়ি মেরেছে ইউক্রেন পুলিশ। আমি প্রোটেষ্ট করতে গিয়েছিলাম। আকাশের দিকে ফায়ার করে বলল, ‘প্রতিবাদ করলে এই ভাবে মারা হবে।’ আই অ্যাম সিক অ্যান্ড টার্মার্ড! বাড়ি না-পৌঁছে আমি খাবার বা জল খাব না, বাথরুমও যাব না। প্লিজ, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।”

ককপিটের দরজা বন্ধ করে চালকের আসনে বসে লম্বা শ্বাস নিলেন মেছলি। প্রতিদিনের ফ্লাইটে যা বলতে হয়, আজ সেটা বলার দিন নয়। মাইক তুলে নিয়ে মেছলি কেজো গলায় বললেন, “হ্যালো এভরিওয়ান! ফ্লাই-এয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে ওয়ারশ থেকে দিল্লিগামী এই উড়ানে সবাইকে স্বাগত জানাই। তোমরা যে সুস্থ ও নিরাপদ আছ, এটা ই খেতে। তোমাদের সাহস এবং দৃঢ় সংকল্প দেখে আমরা গর্বিত। তোমাদের অনিশ্চয়তা, ভয় আর কষ্টের দিন শেষ। আমরা মাতৃভূমিতে ফিরে যাব।”

সচেতন ভাবে ‘মাতৃভূমি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন মেছলি। কারণ ‘মাতৃভূমি’ আর ‘মা’ শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। ভারতের অজস্র বাবা-মায়ের মধ্যে মেছলিও একজন, যার মেয়ে পৃথিবীর এই অংশের কোথাও একটা রয়েছে। এই বাচ্চাগুলোর মতো রুহিও তার মায়ের কাছে, তার মাতৃভূমিতে ফেরত আসবে। আসবেই।

বাচ্চাগুলো হাততালি দিচ্ছে। কেজো গলায় তিনি বললেন, “এবার আমরা বাড়ি যাব। পোল্যান্ডের ঘড়ির হিসেবে এখন দুপুর দুটো বাজে। দিল্লি পৌঁছতে সওয়া ন’ ঘণ্টা লাগবে। মানে ভারতীয় সময়ে রাত সওয়া এগারোটা বাজবে। জর্জিয়াতে স্টপওভার নিতে হবে রিফুয়েলিং-এর জন্যে। গোটা সময়টায় তোমরা আরাম করো, বিশ্রাম নাও, ঘুমোও, মুড়ি দেখো। অ্যান্ড গेट রেডি টু মিট ইয়ারের পেরেন্টস। জয় হিন্দ!”

প্রত্যাশিতভাবেই অনেকবার ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দে মাতরম’ এবং ‘ভারতমাতা কী জয়’ ধ্বনি শোনা গেল।

হাতজোড় করে, চোখ বুজে মেছলি বললেন, “হে ভগবান, আমি আমার কাজ করছি। এতগুলো বাচ্চাকে বাবা-মায়ের কাছে ফেরত নিয়ে যাচ্ছি। এবার তুমি তোমার কাজ করো। আমার মেয়েটাকে ভালভাবে বাড়ি পৌঁছে দাও।”

অহম

“হ্যাঁ মা, বলো,” বলল অহম।

“কেমন আছিস?” কাদিনে নীলিমা, “আমি নাইট ডিউটি করে বাড়ি এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! তোর ফোনের আওয়াজ শুনতে পাইনি। সরি!”

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে অহম বলল, “তুমি প্লিজ কৈদো না। তা হলে আমি মেন্টালি উইক হয়ে পড়ব। তুমি আমাকে ভরসা দাও। বলো যে তোরা ভাল ভাবে ওয়েস্ট ইউক্রেন পৌঁছে যাবি।”

“তোরা এখন কোথায়?” অনেক কষ্টে কান্না চেপেছেন নীলিমা, তবে কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছেন। বিরক্ত হয়ে অহম বলল, “আমরা রোমানিয়া বর্ডারের দিকে যাচ্ছি। পৌঁছতে পারব কি না জানি না। এখানে হেভি শেলিং হচ্ছে।” তারপর ফোন কেটে দিল।

“শেষ কথাগুলো মাকে না বললেই পারতিস,” বলল সমুদ্র, “টেনশন কমানোর বদলে বাড়িয়ে দিলি।”

“আমার টেনশন কে কমাবে?” উত্তেজনায় চিৎকার করছে অহম, “আমি কি ‘অ্যাগনি আন্ট’ যে অন্যের টেনশন কমাবে?”

অহমের চিৎকারের কারণ আছে। কিভে টানা বিমান হানা ও বোমাবর্ষণ চলছে। তার মধ্যে দিয়েই কিভের প্রধান সড়ক দিয়ে যাচ্ছে কাদিরভের হলুদ সেডান। সকাল সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে একঘণ্টা পরেও শহর থেকে বেরোতে পারেনি তারা। স্পিডোমিটার বলছে গাড়ির গতি ঘণ্টা পিছু ৫০ কিলোমিটার। এর চেয়ে বেশি জোরে যাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তায় গিজগিজ করছে ইউক্রেন সেনার সাঁজোয়া গাড়ি, ইউক্রেন পুলিশের প্রিজন্ ব্যান, দমকলের গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স। রাস্তার দু’পাশে একের পর এক বহুতল দাউদাউ করে জ্বলছে রুশ বিমান হানা ও বোমাবর্ষণের ফলে। রাস্তায় দৌড়ছে ইউক্রেন সেনা ও পুলিশ,

দমকল বাহিনী, বহুতল থেকে উৎখাত হওয়া বাসিন্দারা। এই আতঙ্কের মধ্যে অহমের পক্ষে ঠান্ডা মাথায় কথা বলা অসম্ভব।

আর আছে মিসাইল আটাক। বহুতলগুলোর গায়ে স্ফেপাণ্ডের আঘাতে বিশাল বড় গর্ত হয়েছে। সে দৃশ্য যে দেখিনি সে বুঝবে না ‘ভয়’ কাকে বলে। অহমের চোখের সামনে একটি বহুতল মিসাইলের আঘাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল।

কাদিরভ নীরবে গাড়ি চালাছিলেন। ভুরু কুঁচকে আছে, কপালে একগাদা ভাঁজ। হঠাৎ প্রধান সড়ক ছেড়ে সরু গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে চৌচালেন, “রকেট! রকেট! মাথা নিচু!”

রকেট লঞ্চারের নাম শুনেছে অহম। সিনেমাতে দেখেওছে। কিন্তু সেই লঞ্চার থেকে ছোঁড়া রকেট যদি তার দিকে তেড়ে আসে তাহলে কেমন লাগে এই প্রথম বুঝতে পারছে।

বিস্ফোরণের ভয়ংকর শব্দটা হল অনেকটা পিছনে। তাদের দিকে উড়ে এল বিরাট বড় বড় কংক্রিটের চাঁই। কয়েকটা চাঁই পিছনে বা ডাঁয়ে-বাঁয়ে পড়ল, কয়েকটা চাঁই গাড়ি টপকে সামনের রাস্তায় পড়ে রাস্তা ব্লক করল। একটা চাঁই গাড়ির মাথায় পড়লেও বড় কোনও ক্ষতি করতে পারল না। সেডান ভীষণ জোরে দুলে উঠে, একটা চাঁইকে পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মেরে, কোনও রকমে নিজেকে সামলে আবার ছুটল। চমকে উঠে অহম দেখল মানুষের হাত, পা, বুক বা পোটের অংশ আর মাথাও উড়ে আসছে; গাড়ি টপকে সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। উপায়হীন ভাবে মানব দেহের কোনও একটি অংশের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন কাদিরভ। ‘মডমড’ শব্দ শুনে জানলা দিয়ে মুখ বের করে গলগলিয়ে বমি করল অহম। সমুদ্র তার চুলের মুঠি ধরে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে বলল, “ন্যাকামি পরে করবি। ড্রোন হামলা হচ্ছে। মাথা ভিতরে।”

“আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল” বা ড্রোন নিয়ে ধারণা আছে অহমের। ইরানে তৈরি ‘কামাকাজি’ বা ‘আত্মঘাতী ড্রোন’ যে ইউক্রেনে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটাচ্ছে সেটা রোজই নিউজ পোঁটালে দেখাচ্ছে। এখনকার কামাকাজিতে বিস্ফোরক থাকে। ড্রোনগুলো লম্বা সময় ধরে আকাশে উড়তে উড়তে টার্গেটের ওপরে নজর রাখে। অপারেটর নির্দেশ দিলেই লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করে।

পিছন দিকে তাকিয়ে অহম দেখল কাগজের তৈরি প্লেনের মত দেখতে একটা জিনিস তাদের মাথার ওপরে উড়ছে।

সরু গলি থেকে আরও সরু গলিতে ঢুকে গেল কাদিরভ। গাড়ির গতি কমে গিয়েছে অনেকটা। অহমের চোখের সামনে পূঁচকে ড্রোনটা একটা গ্যাস স্টেশনের ওপরে আছড়ে পড়ল। তারপর যে ভয়ানক বিস্ফোরণ হল সেটা দেখে আর আওয়াজ শুনে অহম ভয়ের চোটে কুঁকড়ে গাড়ির মেঝেতে বসে পড়ল। চোখের সামনে ভাসছে সর্বভূক অগ্ন্যুৎপাত, কানে বাজছে জ্বলন্ত মানুষের চিৎকার।

কতক্ষণ ওই ভাবে বসেছিল মনে নেই। সমুদ্র পিঠে চাপড় মারতে মাথা তুলল। সে প্যাণ্টে হিসি করে ফেলেছে। ভয়ের চোটে মুখ ফ্যাকাশে।

সমুদ্র তাকে টেনে তুলে সিটে বসিয়ে বলল, “আমরা কিভের বাইরে চলে এসেছি। কাদিরভ গাড়ি দাঁড় করাচ্ছেন। তুই চেঞ্জ করে নে।”

“গাড়ি দাঁড় করাতে হবে না,” চোখ মুছে বলে অহম, “আমি এখানেই চেঞ্জ করে নিচ্ছি।”

কাদিরভ যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। ফাঁকা হাইওয়েতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তার ধারের জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখালেন। সেখানে গিয়ে প্যান্ট বদলাল অহম। টিস্যু পেপার দিয়ে সিট মুছে, কার ফ্রেশনার ছড়িয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। কিভের দক্ষিণ পশ্চিম শহরতলি হয়ে ই-ফার্ট হাইওয়ে ধরলেন কাদিরভ। টানা দু’ ঘণ্টা চলার পরে এল ভিনিতিসিয়া নামের একটা শহর।

রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পেট পুরে ব্রেকফাস্ট করল তিনজনে। কাদিরভ খেতে চাইছিলেন না। অহম আর সমুদ্র জোর করে তাকে গাড়ি থেকে নামাল। পাস্তা উইথ সস, সেন্ড সর্বাভি আর ওমলেট খেয়ে, কফি পান করে শুরু হল যাত্রা। এবারে আর হাইওয়ে ই-ফার্ট নয়, কাদিরভ ধরলেন এম টোয়েন্টি।

সুসিয়েভা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে জানার জন্যে গুগল ম্যাপ খুলল অহম। এতক্ষণ তার মোবাইলে ইন্টারনেট অফ করা ছিল। নেট চালু হওয়া মাত্র গাদা গাদা নোটিফিকেশন আসা শুরু হল।

অহম মোবাইল এগিয়ে দিল সমুদ্রের দিকে। “এই দেখো। সোশাল মিডিয়া নয়। আমাদের দেশের টিভি চ্যানেল।”

সমুদ্র দেখল, নিউজ চ্যানেলের সঞ্চালক বলছেন, ‘ইউক্রেন থেকে আগত ভারতীয় ছাত্রদের জন্য পোল্যান্ড, রোমানিয়া, মলদোভা, স্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরির সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বুখারেস্ট থেকে অপারেশন গঙ্গার প্রথম ফ্লাইটটি ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উড়ান শুরু করেছে।’

মোবাইল ফেরত দিয়ে সমুদ্র বলল, “কখনও কখনও রিয়্যাল টাইম নিউজের গুরুত্ব আছে। তবে আমি ‘ডিসকানেক্টেড’ থাকাই পছন্দ করব।”

“নাতালিকে ফোন করবে না?”

মুচকি হেসে সমুদ্র বলল, “তুই খুব বদ হয়েছিস।”

“তুমি নাতালির কথাই ভাবছিলে, তাই না?” অহমের চোখে মুখেও বিলম্বিত করছে হাসি। উইন্ডফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র ইউক্রেন ভাষায় বলল, “কাদিরভ, সামনে একটা ক্যাফে দেখা যাচ্ছে।”

কাদিরভ বললেন, “আমিও এই কথাটা ভাবছিলাম। টয়লেট যেতে হবে।” তারপর ক্যাফের সামনে সেডান পার্ক করলেন।

সমুদ্র ম্যাকারন আর কফির কাপ নিয়ে এক কোণে গিয়ে নাতালিকে ফোন করল। মেয়েটা ফোন ধরার মতো অবস্থায় আছে তো? কিভের পরিস্থিতি এখন কেমন কে জানে!

“কেমন আছ?” ফোন ধরে প্রশ্ন করল নাতালি। তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের শীতল।

“কী হয়েছে?” উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল সমুদ্র।

নাতালি একই রকম ভাবে বলল, “বাবা, কাদিরভ কাকা আর দাদাকে আর্মিতে জয়েন করতে বলেছে। বাবা সেটা কাদিরভ কাকাকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন।”

দেশের সাধারণ মানুষকে যখন সরকার থেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়, তখন বোঝা যায় যে প্রচুর সেনা মারা যাচ্ছে।

“প্রচুর লোক মারা গিয়েছে সমুদ্র!” হঠাৎ কেঁদে ফেলে নাতালি, “আমি এখন বাড়িতে। কিন্তু এখানে এসেও বাস্কারেই থাকতে হচ্ছে। আমার আর ভাল লাগছে না।”

“ভাল আমারও লাগছে না।” এক মুহূর্তের জন্যে আবেগের আভাস পাওয়া যায় সমুদ্রের গলায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, “সব ঠিক হয়ে যাবে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নাতালি বলল, “কোথায় আছ?”

“আমরা এখন হাইওয়ে এম টোয়েন্টিতে। ভিনিতিসিয়া অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। এখন কোথায় জানি না। আমরা সকলে সুস্থ আছি। তুমি কেমন আছ?”

“বঁচে আছি,” অভিমানী গলায় বলে নাতালি, “আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?”

“খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে!” সমুদ্রের গলায় আত্মবিশ্বাস, “যুদ্ধ শেষ হলেই আমি ফিরছি।”

“তুমি অনেক দূরে সমুদ্র,” ফোঁপাচ্ছে নাতালি, “আরও দূরে চলে যাচ্ছ। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। আমাকে যদি এই যুদ্ধতে যোগ দিতে হয়, তা হলে আমিও কোথায় চলে যাব কে জানে!”

“সময় কিংবা দূরত্ব আমাদের আলাদা করতে পারবে না নাতালি। কারণ কী জানো?”

“জানি না।”

পণ্ডিত মশাইয়ের মতো মাথা নাড়ছে সমুদ্র, “তোমার কাছে যেটা ভালবাসা, সেটাই আমার কাছে মোক্ষা! তোমাকে কামাসুত্রী ভাল করে পড়তে হবে ডার্লিং!”

“ধূস! তুমি না!” কান্না ভুলে হাসতে হাসতে ফোন কেটে দিল নাতালি। সমুদ্র কফি শেষ করে অহমের দিকে তাকিয়ে দেখল সে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সমুদ্রকে আসতে দেখে মোবাইল এগিয়ে বলল, “এই খবরটা দেখো।”

অহমের কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে ভারতীয় নিউজ চ্যানেলের খবর দেখছে সমুদ্র। সঞ্চালক বলছেন, “নভজ্যোতের ফেসবুক লাইভের প্রতিক্রিয়ায় গোটা বিশ্ব নড়েচড়ে বসেছে। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ওপরে ইউক্রেন পুলিশের নিপীড়ন নিয়ে দিল্লিতে ইউক্রেনের দূতাবাসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা সমস্যার সমাধান করবেন। ভারতীয়

মন্ত্রীরাও সীমান্তে দাঁড়িয়ে উদ্ধার অভিযান তদারকি করবেন।”

মোবাইল ফেরত দিয়ে সমুদ্র বলল, “আমরা যখন সুসিয়েভা পৌঁছব, তখন কি ওখানে কোনও ভারতীয় মন্ত্রী থাকবেন?”

“জানি না।” চেয়ার থেকে উঠে অহম বলল, “কাদিরভ ডাকছেন।”

আবার গাড়িতে উঠে বসল ওরা। কাদিরভ গাড়ি ছোটালেন অন্য হাইওয়েতে। ঘণ্টাখানেক পরে হাইওয়ে বদলাল। রাস্তায় গাড়ি বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে এক সময় রাস্তা একদম বন্ধ হয়ে গেল। সারি সারি গাড়ি আর বাস পরপর দাঁড়িয়ে।

আড়মোড়া ভেঙে সমুদ্র বলল, “এই যুদ্ধটা কেন হচ্ছে বলে মনে হয় কাদিরভ?”

“পুতিনের জন্যে,” সংক্ষিপ্ত উত্তর কাদিরভের।

“কাজ পড়ে আর টিভি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রাশিয়ার আক্রমণের উদ্দেশ্য হল ভলোদেমির জেলেনস্কির সরকারকে সরিয়ে ইউক্রেনকে নিজেদের দখলে আনা। কিন্তু কথাটা ঠিক না। সব জিনিসের মতো এই যুদ্ধেরও দুটো দিক আছে।”

“যেমন?” জানতে চাইলেন কাদিরভ।

“ইউক্রেনের এখনকার গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে নিও নাৎসি।”

“ভুলভাল বকছেন।”

“প্রমাণ চাই? ২০১৪ সালে গণহত্যা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ওডেসার বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ভবন, খুন করা হয়েছিল পঞ্চাশ জন বামপন্থীকে। নাৎসি-যুগের বিভিন্ন প্রতীক বা গ্রাফিতি ইউক্রেনে দিব্যি দেখা যায়। এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যে অতি দক্ষিণপন্থী মতবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। সেনাবাহিনীতে দ্রুত বিস্তার ঘটছে উগ্র ফ্যাসিবাদের। মারিয়ুপোলে যে ওরা খুব অ্যাকটিভ, সেটা আমার নিজের চোখে দেখা।”

“বাজে বকবেন না!” উত্তেজিত হয়ে বলেন কাদিরভ। “পড়তে এসেছেন, পড়াশুনো করে চলে যান। এই দেশ নিয়ে কোনও বাজে কথা সহ্য করব না।”

“এটা আমারও দেশ কাদিরভ।” শান্ত গলায় বলল সমুদ্র, “নাতালিকে বিয়ে করে আমি এখানেই থাকব। কাজেই এই দেশের ভালমন্দ নিয়ে কথা বলার হক আমার আছে।”

সিনিয়ার দাদার সঙ্গে গাড়ি চালকের কথা কাটাকাটি বন্ধ করার জন্যে অহম বলল, “খিদে পেয়েছে।”

সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বলল, “ঠিক। বিকেল চারটে বাজতে যায়। কিছু খাওয়া যাক।”

গাড়িতেই শুকনো খাবার দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা। গাড়িতেই ঘুমিয়ে নিল। বিকেল পাঁচটার সময় বাড়িতে ফোন করল অহম। মায়ের সঙ্গে কথা বলা যাক। এখনই কথা বলার আদর্শ সময়!

“কেমন আছিস?” সেই এক প্রশ্ন করলেন নীলিমা।

শান্ত কণ্ঠে অহম বলল, “সকালে খুব টেনশনে ছিলাম। এখন ভাল আছি। তুমি কেমন?”

“তুই ভাল না থাকলে আমি কী করে ভাল থাকব?” হাউহাউ করে কাঁদছেন নীলিমা।

“শোনো মা! তোমাকে একটা কথা বলি।” দম নিয়ে সাহস সঞ্চয় করল অহম, “আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি।”

“এর মধ্যে ভালবাসা কোথা থেকে আসছে?” অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো চিৎকার করে উঠলেন নীলিমা। “আগে বঁচে বাড়ি আয়। তার পরে ওসব কথা হবে।”

“কথাটা এখনই বলতে হবে, মা,” কেটে কেটে বলছে অহম, “ওর নাম রুহি গোস্বামী, টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিকাল ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি পড়ছে। আমার মতোই থার্ড ইয়ার। ও এখন কোথায় আটকে আছে কে জানে। যদি রুহি আমার আগে কলকাতা ফেরে, ওর খবর নিয়ো। কেমন?”

“এই সময় এসব নিয়ে ভাবিস না অহম, প্লিজ!”

“তুমিও কোনও দিন বাবাকে ভালবেসেছিলে মা, তাই না?”

নীলিমা চুপ।

“বাসোনি? বেলো? ভালবেসেছ, বিয়ে করেছ, আমি এসেছি... এগুলো চেন রিঅ্যাকশন, তাই না? তা হলে আমার বেলায় কেন এমন করছ?”

নীলিমা একটিও কথা বললেন না। অহম কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিল। আজ, এই দুঃসময়ে একটা বড় কাজ হল। যে কথা কোনও

দিন মাকে বলতে পারবে ভাবেনি অহম, আজ সেটা বলেই ফেলল। বর্তমানে ফিরল অহম। সঙ্গে ছ'টা বাজে। গাড়ি এক চুল নড়েনি।

রাত সাঁটা বাজল, আটটা... এগারোটা... গাড়ি নড়ল না। ট্রাফিক জ্যাম কাটল না। ওরা রাতের খাবার খেতে বসল।

পাউরুটি আর ডিম খেতে খেতে সমুদ্র বলল, “কাদিরভ, আপনি রেগে গেলেন বটে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করুন। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র ডনবাস অঞ্চলে ইউক্রেনের হামলা ও গণহত্যা বন্ধ আছে। তার কারণ ওখানে ইউক্রেন সরকার হত্যাকাণ্ড চালাত নেটোর মদতে।”

কাদিরভ কথা না বলে মুখ ধুয়ে চালকের আসনে বসে ঘুমিয়ে পড়লেন। পিছনের আসনে ঘুমিয়ে পড়ল অহম আর সমুদ্র। ঘুম ভাঙল ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল নটার সময়। গাড়ি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

সকাল এগারোটার সময় একটু একটু করে গাড়ি চলতে শুরু করল। শমুকগতি বললে শামুকের অপমান হয়। কিন্তু নড়ছে। টুকটুক করে যাচ্ছে বাস আর গাড়ির পালা। আবারও গাড়িতেই শুকনো খাবার দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা। দুপুর একটার সময় ইউক্রেন সীমান্ত টপকে কাদিরভের গাড়ি প্রবেশ করল রোমানিয়ায়। এখানে তুষারপাত হচ্ছে।

যুদ্ধ হচ্ছে না এমন একটা দেশে পৌঁছতে পেরেও একটুও আনন্দ হচ্ছে না অহমের। সে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত। একবার মায়ের কথা ভাবছে, একবার রুহির কথা।

তারই মধ্যে শুনতে পেল সমুদ্র মোবাইলে নিচু গলায় কাউকে বলল, “আমি ভাল আছি। তুমি চিন্তা করো না।”

“বাড়ির ফোন?” জিজ্ঞাসা করল অহম, “আমাকে দাও না। একবার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলি।”

টুক করে ফোন কেটে সমুদ্র বলল, “সুসিয়েভা আর কতদূর কাদিরভ?”

“এসে গোলাম মনে হচ্ছে!” তুষারপাতের মধ্যে গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন কাদিরভ।



রুহি

নভজ্যোতের ফেসবুক লাইভটি উষ্কার বেগে ছড়াতে থাকে। প্রথমে শেয়ার করে ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় ছেলেমেয়েরা। তারপর তাদের বাবা-মায়েরা। একই সঙ্গে তাঁরা উগরে দিতে থাকেন ক্ষোভ। ট্যাগ করতে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, মন্ত্রী এবং আমলাকে। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার নিউজ চ্যানেলে ভাইরাল ভিডিওটি দেখানো শুরু হয়। ভারতের নিউজ চ্যানেলগুলো ‘ব্রেকিং নিউজ’ বলে উদ্ভাদের মতো চোঁচাতে শুরু করার আগেই ইউক্রেন আর পোলিশ সরকার নড়েচড়ে বসে। ভারতে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত অ্যাডাম বুরাকোওস্কি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, “আমাদের পুলিশ কারও সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে না। সমস্ত দেশের শরণার্থীদেরই আমরা আশ্রয় দিচ্ছি। কিন্তু এত ভিসাবিহীন লোককে সীমান্ত পার করাতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। সেই কারণে সময় লাগছে।” ইউক্রেনের তরফ থেকেও এই রকম একটা বিবৃতি পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা আলাদা। সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে রুহিরা। হাজার হাজার শরণার্থীর মধ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য সাদা চামড়ার মানুষদের আগে সীমান্ত পার করাচ্ছে ইউক্রেন সেনা ও পুলিশ। বাকিদের ক্ষেত্রে আপত্তি করছে। ‘বাকি’-দের তালিকায় ভারতীয় আর অ্যাক্সেস আমেরিকানরা পড়ছে। তাড়াহাড়ি সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার জন্যে ইউক্রেন সেনাদের মধ্যে কেউ একশো ডলার চেয়েছিল বা শরণার্থীদের মধ্যে কেউ যেচে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই জেনে গেল যে ঘুষ দিলে আগে সীমান্ত

পেরোনো যাচ্ছে।

আয়েশা আর সুচিত্রার সঙ্গে নভজ্যোতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে রুহি। চারজনে প্রান করতে বসল কী করা উচিত। মুশকিল হচ্ছে, খোলা আকাশের নীচে বসে থাকা যাচ্ছে না। কারণ মিহি তুষারপাত শুরু হয়েছে। হেভি স্নো-ফল শুরু হলে খুব বিপদ!

শেহায়নি গ্রামের বাসিন্দারা নিদ্বিধায় বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছেন। সেখানে আর তিল রাখার জায়গাও নেই। এখানে কোনও ধর্মস্থান বা স্কুলবাড়ি নেই। কিছুটা দূরে স্টেশন আছে, কিন্তু ট্রেনে করে অনেকেই দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছেন বলে সেখানেও প্রবল ভিড়। বাধ্য হয়ে ওরা আশ্রয় নিয়েছে একটা গ্যাস স্টেশনে। মাথার ওপরে ছাদ জুটলেও চারপাশ খোলা। হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া এসে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

প্লাস্টিকের চাদরের ওপরে কন্ডল পেতে বসে রুহি জিজ্ঞাসা করল, “আমাদের মধ্যে কে কে একশো ডলার দিতে পারবে?”

“আমি পারব না,” মুখ চুন করে বলল আয়েশা।

“লৌচস মেক ইট ক্লিয়ার,” তাকে থামিয়ে নভজ্যোত বলল, “আমরা চারজনে এখন থেকে একটা টিম। সবাই সবার দায়িত্ব নেবে। আমাদের মধ্যে সেলফিশনেস থাকবে না। রাজি?”

“রাজি,” ব্যাকপ্যাক থেকে ডলার বার করছে সুচিত্রা। নভজ্যোত আর রুহিও একই কাজ করল। তিনজনে মিলে চারশো ডলার তুলে সেটা আয়েশাকে দেওয়া হল। রুহি বলল, “আমাদের ফার্স্ট কাজ হল যে লোকটা ঘুষ নিচ্ছে তাকে আইডেন্টিফাই করা। নেস্টট স্টেপ হল দরদরি করে চারশো ডলারকে যতটা পারা যায় কমানো। রাজি না হলে, চারশো ডলার ওর পকেটে গুঁজে ল্যাভ ধরে বুলে পড়া।”

“খেয়াল রাখতে হবে, লোকটা মাল কামিয়ে কেটে না পড়ে। এটা ওদের দেশ। হাভনিয়া বোড়ে দিলে আমরা কিছু করতে পারব না,” বলল নভজ্যোত, “মুশকিল হল ভিডিওটার কারণে ওরা আমার মুখ চিনে গেছে। আমি গেলে ক্যালাবো।”

“আমি আর রুহি যাব,” বলল আয়েশা।

ওরা দু’জনে এগোল সীমান্ত চৌকির দিকে। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে রুহি বলল, “লোকটাকে পেয়েছি। দু’ফোঁটা চোখের জল ফেলতেই তিনশো ডলারে রাজি হয়ে গেল। আর একটু কাঁদলে আরও কম করত।”

“চল যাই,” উঠে দাঁড়িয়েছে নভজ্যোত। সবাই যে যার ব্যাকপ্যাক সামলে মিহি তুষারপাতের মধ্যে শেহায়নি চৌকির দিকে এগোল।

ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা রাস্তার ওপরে প্লাস্টিক শিট পেতে বসে আছে। মাথার ওপরে এক টুকরো প্লাস্টিক দিয়ে বরফের কামড় থেকে নিজদের বাঁচাচ্ছে। ওদের পেরিয়ে সীমান্ত চৌকির প্রধান ফটকের বাঁদিকে কিছুটা দূরে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঢাঙা এক সেনার দিকে এগিয়ে গেল আয়েশা আর রুহি। পিছন পিছন বাকি দু’জনে।

ঢাঙা সেনাটি ওদের দেখে আরও বাঁদিকে গেল। ওরাও গিয়ে দেখল এখানে একটা ছোট গোট আছে। সেখানে চেয়ার টেবিল পেতে বসে আছে দুই ইউক্রেন সেনা। রুহি ডলার এগিয়ে দিতেই ঢাঙা সেনা নোট গুনল থুতু দিয়ে। তারপর রুহির গাল টিপে বলল, “গো!”

ওই আঙুলেই থুতু লাগিয়েছিল একটু আগে। জীবনে এই প্রথম কেউ রুহিকে খারাপ ভাবে স্পর্শ করল। রিফ্লেক্স অ্যাকশনে ঢাঙার গালে চড় কষাতে যাচ্ছিল রুহি। আয়েশা কোমরে চিমটি কেটে হিশহিশ করে বলল, “জাস্ট ক্রস দ্য বর্ডার।”

বসে থাকা দুই ইউক্রেন সেনা তাদের পাসপোর্ট আর ফরেন স্টুডেন্টদের রেসিডেন্সিয়াল কার্ডে অঙ্ককারেই নিয়মমামফিক চোখ বুলিয়ে বলল, “যাও।” তারপর আয়েশা আর রুহির পশ্চাদ্দেশে আদরের থাপ্পড় কষাল।

ইউক্রেন সীমান্ত পেরিয়ে চারজনে পোলিশ সীমান্ত চৌকির দিকে এগোল। রাত সাড়ে দশটা বাজে। এখনও তুষারপাত চলছে। রাগে, দুঃখে, প্রতিবাদ করতে না পারার যন্ত্রণায় রুহি আর আয়েশা ঠকঠক করে কাঁপছে।

*

পোল্যান্ড সীমান্ত চৌকি যে গ্রামটিতে অবস্থিত তার নাম মেদিকা। আঞ্চলিক রাজধানী রেজেজো থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে।

পোল্যান্ডের সেনারা বন্ধুভাবাপন্ন এবং কাজ চালানোর মতো ইংরিজি বলতে পারে। পরিচয়পত্র মিলিয়ে নিয়ে রুহিদের বলল, “এক কিলোমিটার দূরে একটা বাস্কার আছে। ওখানে যাও। ফ্রেশ বেডরোল, লেপ-কবল, জল আর খাবার পাবে। ওয়েলকাম টু পোল্যান্ড।”

রুহি জিজ্ঞাসা করল, “ইন্ডিয়ান ফ্লাইট কোথা থেকে ছাড়বে স্যার?”

পোলিশ সেনা আকাশ থেকে পড়ল। “ইন্ডিয়ান ফ্লাইট?”

“এখানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কোনও রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন? কোনও হেল ডেস্ক?”

“ইন্দিয়া!” পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দুই সেনা, তাতে মনে হল দেশটির নাম প্রথম শুনছে। কথা না বাড়িয়ে হাটা লাগাল চারজন।

“আমার ঠাকুরদার পরিবারের বাস ছিল লাহোরে,” হাঁটতে হাঁটতে বলছে নভজ্যোত, “পার্টিশনের সময় ওদিকে কমিউনাল টেনশন এত বেড়ে যায় যে ঠাকুরদা সপরিবার দিল্লি চলে আসে। সেখান থেকে কাজের ধান্দায় কলকাতায়। ঠাকুরদার মুখে ভিটে হারানোর গল্প শুনেছি, এক কাপড়ে দেশ ছাড়ার ইতিহাস শুনেছি। রিফিউজি হওয়ার কষ্ট, কোনও দিনও ফিল করতে পারিনি। আজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে আসার সময় ঠাকুরদার কষ্ট বুঝতে পারছি।”

রুহি এই আলোচনায় অংশ নেয়নি। মোবাইল খুলে দেখে নিয়েছে, মেছলি একটা লম্বা মেসেজ করেছেন। ভারত সরকার ভারতীয় ছাত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্যে অপারেশন গঙ্গা মিশন চালু করেছে। মেছলি তার একটি অংশ হয়ে ফ্লাই এয়ারের ফ্লাইট নিয়ে উড়ে এসেছিলেন পোল্যান্ডে। আজই দুপুর দুটোয় ওয়ারশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছেন। মায়ের জন্যে খুব গর্ব হল রুহির।

ওরা চারজন চলে এসেছে একটি স্কুলবাড়ির সামনে। জনা দশেক পোলিশ সেনা অস্ত্র হাতে ঘোরাঘুরি করছে। ওদের মধ্যে একজন কঠিন মুখে আয়েয়াস্ত্রের নল দিয়ে একটা বাস্কার দেখাল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ওরা পৌঁছল বিশাল বড় হলঘরে। টিউব লাইটের আলোয় ঘর বকবক করছে। মেঝেতে সারি দিয়ে সাদা ম্যাট্রেস পাতা। প্রতিটি ম্যাট্রেসের ওপরে প্লাস্টিকের প্যাকেট রাখা রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে কবল, তোয়ালে, বালিশ। হলঘরে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী থাকার ব্যবস্থা আছে। তবে ঘরের অধিকাংশ জায়গা এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা দখল করেছে।

ওদের স্থান হল হলঘরের মাঝামাঝি। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে, ব্যাগ থেকে খাবার বের করে ভাগ করে খেয়ে চারজন ঘুমিয়ে পড়ল।

*

ঘুম ভাঙতে রুহির মনে পড়ল আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি। সকাল আটটা বাজে। আয়েশা আর সুচিরা বিছানায় না থাকলেও নভজ্যোত ঘুমোচ্ছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে রুহি দেখতে পেল, হলঘরের দেওয়াল ববাবর ছেলেমেয়েদের লম্বা লাইন বাস্কারের বাইরে চলে গিয়েছে। ওরা বাথরুম যাচ্ছে!

আতঙ্কিত রুহি দেখল তার ঘুমের মধ্যে আরও ছেলেমেয়ে বাস্কারে এসেছে। হলঘর এখন ভর্তি। এত ছেলেমেয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্যে লাইন দিয়েছে? রুহি ঠিক করল এখন ওইদিকে যাবেই না। বাথরুম চেপে রাখার অভ্যাস মেয়েদের জন্মগত।

রুহি সারাদিনে বাথরুম যেতে পারল না। কারণ লাইন ক্রমাগত লম্বা হতে লাগল। বাস্কারে ছেলেমেয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হল, তিনগুণ হল... তার পরে আর গোনা গেল না। ছেলেরা বাস্কার থেকে বেরিয়ে মাঠেঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করে এল। সেই নিয়ে পোলিশ সেনার সঙ্গে চূড়ান্ত ঝামেলা হয়ে গেল। বাস্কারে বসেই রুহি জানতে পারল যে ভারতীয়রা পোলিশ সেনাদের তাক করে ইট ছুড়েছে। পোলিশ সেনা আর পুলিশ মিলে ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে।

এতটাই বিধ্বস্ত লাগছে রুহির যে খবরগুলো ঠিক না ভুল জানতে ইচ্ছে করছে না। আয়েশা তাকে দেখে বলল, “তোকে সিক লাগছে। এনি প্রবলেম?”

রুহি বলল, “আমার জ্বর আসছে। কালকে বরফে থাকার ফল।”

আয়েশা তার হাতে অ্যান্টিবায়োটিক আর জ্বরের বড়ি দিয়ে বলল, “মেরে দো!”

ওষুধ খেয়ে রুহি বলল, “নভজ্যোত আর সুচিরা কোথায়?”

“ওরা ব্ল্যাক্সেট জোগাড় করতে গিয়েছে।”

“তোর পিরিয়ডের কী খবর?”

“এখনও শুরু হয়নি। খুব ক্র্যাম্প হচ্ছে। ওষুধ খেয়ে আছি।” ক্লাস্ত গলায় বলল আয়েশা, “মেঝে থেকে ঠান্ডা উঠছে। তুই আমার কবলটা নীচে পাত। গায়ে আর একটা কবল দো।”

কবল মুড়ি দিয়ে রুহি আবার শুল। শুয়েই রইল। মাঝে মাঝে আয়েশা তাকে জল আর বিস্কুট খাইয়ে দিচ্ছিল। জ্বরের ওষুধও দিল আর একবার।

দুপুর তিনটের সময় অহমের ফোন আসতেই মনটা ভাল হয়ে গেল রুহির। ফোন ধরে সে বলল, “কেমন আছিস?”

“তার আগে বল কোথায় আছিস?” হাসছে অহম।

“আমি এখন পোল্যান্ডের বাস্কারে। আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি, এখানে এখন দুপুর তিনটে।”

“আমি এখন রোমানিয়ার সুসিয়েভায়। সামনেই এয়ারপোর্ট। কিন্তু এখানে খুব গন্ডগোল হচ্ছে। ভারতীয় স্টুডেন্টরা অসভ্যতা করছে।”

রুহি স্পষ্ট শুনতে পেল একটা ফ্যারিং-এর শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে অহম বলল, “রাখছি। পরে কথা হবে।”

রুহির টেনশন হচ্ছে। সুসিয়েভায় গুলি চলছে কেন? ওখানে তো কোনও যুদ্ধ হচ্ছে না। তা হলে?

টেনশন নিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল রুহি। বিকেল পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে নিজেকে ফ্রেশ লাগল। মনে হল সে এখন সুস্থ। মনে হল, এখন শারীরিক সমস্যাকে পাত্তা দিলে চলবে না।

বিছানা থেকে উঠে নোংরা বাথরুমে ঢুকতে বাধ্য হল সে। দুর্গন্ধে টোকা দায়। কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজ সেরে দৌড়ে বেরোল। অনেকমগ জল ব্যবহার করে নোংরা জুতো ধুল। তবে পুরীষ মাথা জুতো সাফ হল না। বাস্কার থেকে বেরিয়ে রুহি দেখল অঝোরে তুষারপাত হচ্ছে। পাঁচ ফুট দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

রুহি কিছু দেখতে চায় না। সে শুধু জুতো থেকে নোংরা সাফ করতে চায়। বরফে জুতো ঘষতে ঘষতেই হড়হড়িয়ে বমি করল। গা ঘিনঘিন করছে। জুতোর দিকে কিছুতেই তাকাবে না। জুতোর নোংরা সাফ না করে কিছুতেই বাস্কারে ফিরবেও না। বাস্কারের অন্য দিকে গিয়ে আবার বরফে জুতো ঘষছে রুহি।

ঠিক এই সময়ে সে শুনতে পেল, একটি ছেলে হিন্দিতে বলছে, “ইন্ডিয়ান প্লেন রেজেন্সো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে। আদিদেব সিক্কিয়া নিজে পাঁচটা বাস নিয়ে এখানে আসছেন। পোলিশ সেনা কাউকে জানাতে বাধা করেছে।”

“কেন?” বলল একটি মেয়ে।

“এখন এখানে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট আছে ২০০০। প্লেনে অত প্যাসেঞ্জার ধরবে না। তা ছাড়া পোলিশ সেনা ইউকে আর ইউএসএ-র সিটিজেনদের প্লেনে তুলছে। মিনিস্টার আসছেন বলে ওঁকে দেখিয়ে ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের প্লেনে তোলা হবে।”

“রেজেন্সো এখন থেকে কত দূর?” প্রশ্ন করল মেয়েটি।

“প্রায় ১০০ কিলোমিটার। যেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। পোলিশ গভর্নমেন্ট থেকে বাসের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের ওই বাসে উঠতেই হবে। না হলে ফ্লাইট মিস। পরের ফ্লাইট কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না, ঠিক নেই।”

চুপচাপ বাস্কারের দিকে এগোল রুহি। জুতো মোটামুটি সাফ হয়েছে। কিন্তু রুহির আর অতটা ঘোমা করছে না। মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে।

বাস থেকে নেমে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছেন আদিদেব। পাশে চারজন সরকারি আধিকারিক। কোভিড প্রোটোকল মেনে সবার মুখে মাস্ক। ছাত্রছাত্রীরা লাইন দিয়ে বাসে উঠছে। এক ভারতীয় ডিডিয়োগ্রাফার সব কিছু ক্যামেরায় রেকর্ড করে রাখছেন। প্রথম বাস ভর্তি হতেই সেটি রেজেন্সো এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিল।

দ্বিতীয় বাসে উঠছে ছেলেমেয়ের দল। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে উঠতে দেখে আদিদেব ভুরু কুঁচকে পাশের আধিকারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, “এরা কারা?”

আধিকারিক কিছু বলার আগেই বাস্কারের পাশ থেকে চিৎকার চোঁচামিচি শোনা গেল। সে দিকে তাকালেন আদিদেব। দেখলেন তুষারপাতের মধ্যে তিনটে মেয়ে মিলে একটা ছেলেকে ধরে মারছে আর গালাগালি দিচ্ছে।

“কী হয়েছে?” গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন আদিদেব। কয়েকজন পোলিশ সেনা ওদের দিকে লাঠি হাতে তেড়ে গিয়েছে।

“আরবেন না,” আপত্তি করলেন আদিদেব। ওদের কাছে গিয়ে বললেন, “কী হয়েছে?”

শিখ ছেলেরা গুরুমুখী ভাষায় বলল, “খিদে পেয়েছিল বলে ওদের ব্যাগ থেকে বিস্কুট নিয়েছিল। তাই আমাকে মারছে।”

“আমরা চারদিন খাইনি স্যার!” বাংলা, ইংরিজি আর মলয়লম ভাষায় এক সঙ্গে কথা বলছে তিনটি মেয়ে, “আপনার কাছে বিস্কুট আছে? আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।”

দুন স্কুলের প্রাক্তনী আদিদেব লজ্জা পেলেন। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা খেতে পাচ্ছে না, পরের খাবার না বলে খেয়ে নিচ্ছে... এ জিনিস তাঁর কাছে খুবই দুঃখের। গরিবরা খেতে পাবে না, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিত্তবান ঘরের ছেলেমেয়েরা না খেতে পেলে আদিদেবের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হয়।

আদিদেব বললেন, “তোমরা বাসে ওঠো।”

এক পোলিশ সেনা বলল, “ওদের ডকুমেন্ট চেক করা হয়নি। ওরা ইন্ডিয়ান কি না দেখতে হবে।”

চোখ ইংরিজিতে আদিদেব বললেন, “একটু আগে যে চার শ্বেতাঙ্গ প্লেনে উঠলেন তাঁদের ডকুমেন্ট চেক করেছেন?”

পোলিশ সেনা কোনও কথা না বলে ইশারায় রুহিদের বাসে উঠতে বলল। মুহূর্তের মধ্যে ঝগড়া বন্ধ করে ব্যাকপ্যাক আনতে রুহি, আয়েশা, সুচিত্রা আর নভজ্যোত বাস্কারের দিকে দৌড়ল।

পাঁচটি বাস ভর্তি হওয়া মাত্র সেগুলো রওনা দিল রেজেজো বিমানবন্দরের দিকে। এখনও অনেক ছাত্রছাত্রী রয়ে গিয়েছে বাস্কারে। তারা হাউহাউ করে কাঁদছে।

*

বাস থেকে নেমে প্লেনে ওঠা মাত্র বিমানসেবিকা সবার হাতে চকোলেট আর মাস্ক তুলে দিলেন। সবাই বসার পরে আদিদেব উঠলেন। কেবিন ক্রয়ের কাছ থেকে মাইক নিয়ে বললেন, “আমাদের দেশের নাগরিকদের নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এই খবরটি আপনারা বন্ধু, সহকর্মী, পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে সবাইকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন, দরকার হলে আবার বলবেন।”

আদিদেবের ভাষণটির ভিডিও রেকর্ডিং হল। তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই প্লেন গড়তে শুরু করল। ছেলেমেয়েরা আনন্দে লাফাচ্ছে, একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে, ‘জয় হিন্দ’ বলে চৈচাচ্ছে, হাউহাউ করে কাঁদছে। নভজ্যোত, আয়েশা আর সুচিত্রা বাড়িতে ফোন করে জানাচ্ছে যে তারা ভারতের প্লেনে উঠতে পেরেছে।

রুহি প্রথমে মাকে ফোন করল। মেছলির ফোন ‘নট রিচেবল’ এবার বাবার মোবাইলে ফোন করল সে।

ফোন ধরে মেঘনাদ ভাঙা গলায় বললেন, “কোথায় আছিস? কোনও খবর নেই কেন?”

বাবার গলার আওয়াজ শুনে রুহি বুঝতে পারল যে লোকটা একদম ভেঙে পড়েছেন। সে নরম গলায় বলল, “বাবা, আমরা পোল্যান্ডের রেজেজো এয়ারপোর্ট থেকে ইন্ডিয়ান প্লেনে উঠেছি। ফ্লাইটে ইন্ডিয়ান মিনিস্টার আদিদেব সিদ্ধিয়াও আছেন। আমাদের কোনও ভয় নেই। ম্যাক্স টু ম্যাক্স বারো ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি পৌঁছে যাব। আগামীকাল, পয়লা মার্চ সকাল সাতটা দিল্লিতে। বাই দ্য ওয়ে, মা যে প্লেন চালাচ্ছে এটা আমি জানি। কিন্তু মা এখন কোথায়?”

মেয়ে নিরাপদ আছে জেনে খুশি হলেন মেঘনাদ। একই সঙ্গে মেছলির প্রসঙ্গে বিরক্ত হয়ে বললেন, “সে দেশোদ্ধার করতে বেরিয়েছে। অফিস থেকে ফোন আসতেই নাচতে নাচতে কাজে জয়েন করল। অপারেশন গঙ্গার কাজটাই বড় হল? মা হয়ে মেয়ের খবর নেওয়ার সময় নেই? একে ফেমিনিজম বলে? এটা নারীবাদ না নেড়িবাদ?”

তাদের জন্যে এই ফ্লাইটের কর্মচারীরা কতটা আত্মত্যাগ করছেন, কী পরিমাণ পরিশ্রম করছেন—সে ধারণা রুহির আছে। মেঘনাদের শ্রেষ সে ভাল ভাবে নিল না। বলল, “সবাই সব কাজ পারে না বাবা!”

“তোর মা ঠিক কী পারে এটা বলবি?”

রুহি বলতে যাচ্ছিল, ‘যে মহিলা প্লেন চালায় সে সংসার চালাতে

না-ই পারে। তা নিয়ে অবজ্ঞার কিছু নেই।’ বলল না। এই প্রথম সে একই সঙ্গে মায়ের প্রতি সহমর্মিতা এবং বাবার প্রতি বিরক্তি অনুভব করল।

“রাখছি।” ফোন কাটল রুহি। অহমকে ফোন করতে গিয়েও করল না। সে মক্কেল এখন কোথায় আছে কে জানে! হোয়াটসঅ্যাপ অডিয়ো মেসেজে বলল, “তুই এখন কোথায়? আমরা রেজেজো এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠলাম।”

মেসেজটা পাঠানোর পরে একটা ধূসর টিক পড়া মাত্র ফোনের নেটওয়ার্ক চলে গেল।

অহম

সুসিয়েভা এয়ারপোর্টের প্রধান ফটকের সামনে কাদিরভের গাড়ি পৌঁছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর আড়াইটের সময়। এয়ারপোর্টের বাইরে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখে, চিৎকার আর স্লোগান শুনে সমুদ্রের ভুরু কুঁচকে গিয়েছে। সে বলল, “আমাদের প্ল্যান বি রেডি রাখতে হবে।”

“মানে?” অহম অবাক।

“আমরা রোমানিয়ায় শরণার্থী। আনরুলি ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের দেখে মনে হচ্ছে না যে ওরা কারও শরণে এসেছে বা আশ্রয় চাইছে। ওরা দখলদারি ফলাচ্ছে। এই অ্যাটিটিউড ব্যাকফায়ার করতে পারে। কাদিরভকে এক্সট্রা হাভনিয়া দিয়ে ঘটাদুয়েকের জন্যে থেকে যেতে বলি।”

“কেন?”

“তুই কি খেয়াল করেছিস যে আমরা এখানে পৌঁছানোর পরে তিনটে গাড়ি উল্টোমুখে দৌড় দিল?”

“খেয়াল করেছি। তার থেকে কী প্রমাণ হয়?”

“সবকটা গাড়িতেই ছাত্রছাত্রী বসে আছে। ওরা কোথায় যাচ্ছে? সুসিয়েভা ছেড়ে কেন যাচ্ছে?”

“তুমি কি এখানে কোনও অশান্তির আশঙ্কা করছ?”

অহমের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কাদিরভের সঙ্গে কথা বলছে সমুদ্র। সমুদ্রের প্রস্তাব শুনেই কাদিরভ মুখ লাল করে গাড়ি থেকে ওদের নেমে যেতে বললেন। লম্বা সময় ধরে সমুদ্র কাকুতি মিনতি করার পরে, নাতালির নামে দিব্যি কাটার পরে নিমরাজি হলেন। বললেন, “আগে এই ট্রিপের টাকা মেটাও, তারপর অন্য কথা।”

কথা না বাড়িয়ে প্রাপ্য মেটাল সমুদ্র। ৪০০ ডলার ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে কাদিরভ বললেন, “আরও ৪০০ ডলার।”

অহম আপত্তি করতে যাচ্ছিল। সমুদ্র তাকে থামিয়ে বলল, “রাজি। আপনি কোথায় অপেক্ষা করবেন?”

একটু দূরের জঙ্গল দেখিয়ে কাদিরভ বললেন, “ওই গাছগুলোর পিছনে ঠিক দু’ঘণ্টা অপেক্ষা করব। অ্যাডভান্স দুশো ডলার দিয়ে যান।”

এবারেও সমুদ্র আপত্তি করল না। গাড়ি থেকে নেমে বিমানবন্দরের দিকে এগোনোর সময় অহম বলল, “কাদিরভ যদি চলে যান?”

“যাবেন না। যুদ্ধের বাজারে এক লপ্টে অনেকগুলো ডলার পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট,” বলল সমুদ্র।

ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে কিভ মেডিকাল ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মনোজ সিং-এর। মনোজ বলল, “সমুদ্রদা, এখানে সিচুয়েশন খুব খারাপ। রোমানিয়ান সৈন্যদের তাক করে পাথর ছুড়ছে ইন্ডিয়ানরা। ওরা ব্যাপক খচে আছে। দে ক্যান ডু এনিথিং! আমাদের অনেক স্টুডেন্ট ভয় পেয়ে ওয়েস্ট ইউক্রেনে ব্যাক করছে। কেউ কেউ অন্য নেবারিং কানট্রিতে ঢুকবে বলে গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ছে।”

মনোজের কথা শুনে অহমের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র বলল, “কেন প্ল্যান বি, এবারে বুঝতে পারছিস?”

অহম কোনও কথা বলল না। ওরা তিনজনে অপেক্ষা করছে এয়ারপোর্টের প্রধান ফটক থেকে অনেকটা দূরে। অহম টুক করে রুহিকে ফোন করল।

“কেমন আছিস?” ফোন ধরে জিজ্ঞাসা করল রুহি।

“তার আগে বল কোথায় আছিস?” হাসছে অহম।

“আমি এখন পোল্যান্ডের সীমান্তে মেডিকা নামের একটা গ্রামের বাস্কারে। এখানে এখন দুপুর তিনটে।”

“আমি রোমানিয়ার সুসিয়েভায়। সামনেই এয়ারপোর্ট। এখানে খুব গভগোল হচ্ছে। ভারতীয় স্টুডেন্টরা অসভ্যতা করছে।”
হঠাৎই ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেল। অহম দ্রুত বলল, “রাখছি। পরে কথা হবে।”

অহম ফোন কাটা মাত্র মনোজ বলল, “আমার আশঙ্কাই সত্যি হল। ওরা ফায়ারিং করছে।” তারপর দ্রুত একটা গাছের পিছনে গিয়ে মোবাইলে ফেসবুকে লাইভ হয়ে বকবক করতে লাগল।

অহমকে এক ধাক্কা বরফের চাদরে শুইয়ে, নিজেও শুয়ে পড়ে সমুদ্র বলল, “গুলি খেয়ে মরতে চাস? রোমানিয়ার সেনা ফায়ার করেছে।”

মিহি তুষারপাত হচ্ছে। তার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে এয়ারপোর্টের প্রধান ফটকের বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ভারতীয় ছাত্ররা। ইট ছুড়ছে, স্লোগান দিচ্ছে। ফায়ারিং-এর শব্দে দৌড়ে পালাচ্ছে। আরও কয়েকটা গাড়ি ছাত্রছাত্রী সমেত উল্টো দিকে পাড়ি দিল।

সমুদ্র হতাশ হয়ে বলল, “রোমানিয়ার সঙ্গে ইন্ডিয়া সুসম্পর্ক আছে বলেই এখানে ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফট নামতে পারছে। আমরা ভিসা ছাড়া এখানে ঢুকেছি। এরা জিপ্সোইজমের নামে নিজের পিছনে বাঁশ নিচ্ছে।”

“টু!” বিড়বিড় করল অহম। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই ওরা শুনতে পেল মাইকে ঘোষণা হল, “সুসিয়েভা বিমানবন্দর অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করা হল। আপনারা যে দেশ থেকে এসেছেন সেই দেশে ফেরত যান।”

ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সমবেত হইহল্লার মধ্যে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অহম বলল, “এবার?”

“প্ল্যান বি।” সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র পোশাক থেকে বরফ ঝাড়ছে, “গাড়িতে করে ব্যাক টু ইউকেন! অ্যাটলিস্ট আমাদের কাছে ওখানকার রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আছে। এখানে আমাদের যখন খুশি অ্যারেস্ট করতে পারে।”

সমুদ্র আর অহম একটু হেঁটে গিয়ে কাদিরভের গাড়িতে উঠতেই সেটি ইউকেন সীমান্তর দিকে রওনা দিল।

*

ওয়ারশ থেকে মেহলির উড়ান শুরু হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর দুটায়। ইস্তানবুলে রিফুয়েলিং করে সে দিনই রাত রাত সওয়া এগারোটায় দিল্লি পৌঁছল প্লেন। দিল্লিতে মাত্র দু’ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে মেহলি আর সুশান্ত আবার যাত্রা শুরু করলেন আঠাশে ফেব্রুয়ারি রাত সওয়া একটায়। এবার গন্তব্য রোমানিয়ার সুসিয়েভা বিমানবন্দর। ফ্লাইট টাইম সাড়ে সতেরো ঘণ্টা। বিমানটি সুসিয়েভায় টাচ ডাউন করল ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল পৌনে পাঁচটায়। এবং এই ঘটনাটি ঘটল অহম আর সমুদ্র সুসিয়েভা বিমান বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে।

প্লেন থেকে সবরা আগে নামলেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বিনয় সিংহ। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এসে খুবই বিরক্ত। সঙ্গে থাকা আধিকারিকদের বললেন, “কার সঙ্গে কথা বলতে হবে দেখো! আমাকে এই সবের মধ্যে জড়িও না।”

এক আধিকারিক বললেন, “সীমান্ত চৌকির আধিকারিক গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে আপনাকেই কথা বলতে হবে। উনি খুব রেগে আছেন। আমাদের ছেলেরা সেনাদের তাক করে পাথর ছুড়েছে। ‘রোমানিয়া মুদ্রাবাদ’ বলেছে।”

“অশ্রের ব্যাথাটা এত ভোগাচ্ছে...” নড়বড় করতে করতে সীমান্ত চৌকির দিকে এগোলেন বিনয়।

ককপিটে বসে থাকা সুশান্ত আড়মোড়া ভেঙে বললেন, “মেহলি, আমি রেস্টে যাচ্ছি। বাকিটা তুমি সামলে নিও।”

“হ্যাঁ স্যার!” মোবাইল ফোন সুইচ অন করে ইন্টারনেট চালু করলেন মেহলি। আবারও গান্ডা গান্ডা নোটিফিকেশন! অভিনন্দন জানিয়ে টেক্সট মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ, ভয়েস মেসেজ, ইমেল—কী নয়?

এসবের মধ্যে থেকে রুহির ভয়েস মেসেজ বেছে নিলেন মেহলি। আঙুল ঝুঁইয়ে সেটা চালু করতেই শুনতে পেলেন রুহি বলছে, “মা! টিভিতে বলছে তুমি সুসিয়েভা যাচ্ছ। ওখানে ল্যান্ড করেই অহম গোস্বামী আর সমুদ্র সেনের খবর নিও। ওরা যেন ফ্লাইটে ওঠে এটা এনশিয়ার করো। ওরা এখন সুসিয়েভাতেই আছে। মা, প্লিজ!”

মেয়ে কাদছে কেন? ও তো এখন দিল্লিগামী প্লেনে। তা হলে এত

টেনশন কীসের? সময় আন্দাজ করে মেহলি বুঝলেন দিল্লিগামী প্লেন এখন রিফুয়েলিং-এর জন্যে যদি ইস্তানবুল বা জর্জিয়ায় টাচডাউন করে থাকে এবং রুহি যদি মোবাইল সুইচ অন করে থাকে, তা হলে কথা হবে।

রিং হচ্ছে। ঠিকই আন্দাজ করেছেন মেহলি। রুহি ফোন ধরে বলল, “মা! তুমি সুসিয়েভায়?”

“হ্যাঁ। কেন রে?”

“অহম আর সমুদ্রদা প্লেনে উঠেছে? সুসিয়েভাতে মনোজ সিং নামের একটা ছেলের শুট করা ভিডিও এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তাতে দেখাচ্ছে যে সুসিয়েভার পুলিশ লাঠিচার্জ আর ফায়ারিং করেছে। অহম আর সমুদ্রদাকে দেখলাম বরফের ওপরে শুয়ে পড়ল। ওদের যেন কিছু না হয় মা! তোমাকে পাব না ভেবে অডিয়ো মেসেজ রেকর্ড করে পাঠিয়েছি।”

“অহম কে?” প্রশ্ন করলেন মেহলি।

রুহি চুপ। মেহলির মন আনচান করছে। কয়েক রাত আগের রুটিন ভিডিও কলের মধ্যে কলেজ অফিস থেকে ফোন আসা এবং রুহির তাত্ত্বাতাড়ি ফোন কাটার কথা মনে পড়ছে।

“অহম কে? তার জন্যে তুই কাঁদছিস কেন? সমুদ্রই বা কে?” নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মেহলি।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে রুহি বলল, “আমি অহমকে ভালবাসি। সমুদ্রদা ওর সিনিয়ার। অহমের কিছু হলে আমি মরে যাব মা।”

প্রেম! ভালবাসা! বিবাহ! যৌনতা! ভারতীয় বাবা-মায়ের মননে এগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেহলি। বাবা-মা মেনে নিতে না পারলেও প্রতিটি সন্তান এই ঘটনা ঘটাবেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। তিনি যখন প্রেম করেছেন তখন বাবার কাছে বেধড়ক মার খেয়েছেন। মা গায়ে হাত না তুললেও কথার বিছুটি ঘষেছেন সারা শরীরে। এত অত্যাচার করেও লাভ হয়নি। মেহলি তাঁর পছন্দের মানুষকেই বিয়ে করেছেন।

আজ একই ঘটনা আবার ঘটছে। জীবনের বৃত্ত পূর্ণ হল! মৃদু হেসে মেহলি বললেন, “অহম আর সমুদ্রের ছবি পাঠা। ফোন নম্বর দে। আমি দেখছি।”

“এফুনি পাঠাচ্ছি। আমি নেটওয়ার্কের বাইরে চলে যাব। তুমি কিন্তু আমাকে ভয়েস মেসেজ করে রাখবে যে ওরা প্লেনে উঠেছে। আমি দিল্লিতে নেমেই যেন সেটা শুনতে পাই।”

“চিন্তা করিস না।” ফোন কাটলেন মেহলি। দু’টি ছেলের ছবি, ফোন নম্বর আর যাবতীয় তথ্য এসে গিয়েছে। প্লেন থেকে নেমে তিনি তড়বড় করে এগোলেন সীমান্ত চৌকির দিকে, যেখানে বিনয় মিটিং করছেন গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে। ওঁদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুনে দমলেন না। গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “স্যার, আপনি প্লিজ আমাকে একটু সাহায্য করুন।”

বিনয় বিরক্ত হয়ে বললেন, “আপনার তো প্লেনে থাকার কথা।”

বিনয়ের কথার উত্তর না দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের দিকে নিজের মোবাইল এগিয়ে মেহলি বললেন, “এই দু’টি ছেলের সঙ্গে এফুনি দেখা করতে চাই।”

বিনয়কে পাশ কাটানোর অজুহাত পেয়ে গ্যাব্রিয়েল তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে সীমান্ত চৌকির অন্য আধিকারিককে মিটিং-এ বসতে বলে অফিস থেকে বেরোলেন। হ্যান্ড মাইক মেহলির হাতে দিয়ে বললেন, “ওদের ডাকুন।”

বারচাচরেক অহম গোস্বামী আর সমুদ্র সেনের নাম ঘোষণা করার পরেও কেউ এগিয়ে এল না। গ্যাব্রিয়েল ভুরু কঁচকে বললেন, “ম্যাডাম, আপনি শিয়ার যে ওরা এখানেই এসেছে?”

মেহলি কিছু বলার আগেই ভিড়ের মধ্যে হাত তুলে মনোজ বলল, “ওরা এখানে নেই।”

“কোথায় গিয়েছে?” হাতের ইশারায় মনোজকে কাছে ডাকলেন মেহলি। মনোজ কাছে এসে জানাল কী ভাবে অহমদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এটাও জানাল যে অহমরা হলুদ সেডানে চেপে উল্টোদিকে চলে গিয়েছে।

ভাবে পুরোটা শুনে আঁতকে উঠে মেহলি গ্যাব্রিয়েলকে বললেন, “প্লিজ ডু সামথিং।”

“ওরা কতক্ষণ আগে গিয়েছে?” মনোজকে জিজ্ঞাসা করলেন

গ্যাব্রিয়েল।

“অন্তত এক ঘণ্টা!”

“এক ঘণ্টা মানে তো অনেকটা রাস্তা!” ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মেছলির মুখ। গ্যাব্রিয়েল সেটা শুনে বললেন, “অন্ধকার আর স্নোফলের মধ্যে বেশি দূর যেতে পারবে না। আপনি ওদের ফোন করে ফিরে আসতে বলুন। ওরা না ফেরা অবধি স্নেন ছাড়বে না।”

অহমের মোবাইল নম্বরে ফোন করেছেন মেছলি। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পরে অহম বলল, “হ্যালো?”

“অহম, আমি রুহির মা মেছলি গোস্বামী বলছি,” বাংলায় বললেন মেছলি। “আমি এখন সুসিয়েভা এয়ারপোর্টে। তোমরা ফেরত এসো। আমি নিজে স্নেন চালিয়ে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।”

ওদিক থেকে অহম বাংলায় বলল, “সমুদ্রদা, রুহির মা পাইলট। উনি ফোন করে আমাদের ফিরতে বলছেন।” তারপর ভাঙাচোরা ইউক্রেনীয় ভাষায় বলল, “কাদিরভ, আপনি এয়ারপোর্টে ফিরে চলুন ... আরে আমি বলছি তো! কাদিরভ...”

হঠাৎ অহমের ফোন কেটে গেল। বিরক্ত মেছলি রিডায়াল করলেন। কিছুক্ষণ কুঁককুঁক করার পরে যন্ত্রমানবী জানাল যে অহমের মোবাইল সুইচড অফ। কী হল? উৎকণ্ঠিত মেছলি সমুদ্রকে ফোন করলেন। রিং হচ্ছে, রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না।

মেছলির হাত থেকে মোবাইল নিয়ে গ্যাব্রিয়েল রিডায়াল করলেন। কয়েকবার রিং হওয়ার পরে কেউ একজন ফোন কেটে দিল।

গ্যাব্রিয়েল দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, “দেয়ার ইজ সামথিং রং ভেরি ভেরি রং।” তারপর ওয়াকিটকিতে কাউকে বুলেটের গতিতে নির্দেশ দিতে লাগলেন। তাঁর কথায় সিসিটিভি ফুটেজ ও হলুদ সেডানের প্রসঙ্গ বারবার এল।

মেছলি ভয়ে আর ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে এয়ারবাসের দিকে এগোলেন।

*

অন্ধকার আর তুষারপাত মিলে দৃশ্যমান্যতা শূন্যের কাছাকাছি। এই পরিস্থিতিতে গাড়ি খুব আশ্চর্য আছে। অহম নিচু গলায় বলল, “সমুদ্রদা, এই ভাবে যাওয়ার থেকে ফিরে যাওয়া বোটার নয়?”

অহমের হাত থেকে মোবাইল নিয়ে মনোজের তোলা ভিডিওটা দেখিয়ে সমুদ্র বলল, “মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মনোজের ভিডিওটা পাঁচ হাজার বার শেয়ার হয়েছে। এতে আমাদের দেখা যাচ্ছে, গুলি চলা আর লাঠি চার্জ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে ইউক্রেনীয়দের এয়ারপোর্টে ঢুকতে দিচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে যে আরও কয়েকটা গাড়ি এয়ারপোর্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এরপরেও ফিরে যাবি?”

“তা হলে কোথায় যাব? কোনটা আমাদের দেশ?” কেঁদে ফেলেছে অহম।

ঠিক এই সময়ে অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল অহমের মোবাইলে। চোখ মুছে সে বলল, “হ্যালো?”

“অহম, আমি রুহির মা মেছলি গোস্বামী বলছি,” বাংলা ভাষা অহমের কানে মধুবর্ণ করছে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অহম খেয়াল করল, কাদিরভ গাড়ি থামিয়েছেন। গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙছেন।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অহম বলল, “সমুদ্রদা, রুহির মা পাইলট। উনি ফোন করে আমাদের ফিরতে বলছেন।” তারপর কাদিরভের দিকে তাকিয়ে বলল, “কাদিরভ, আপনি এয়ারপোর্টে ফিরে চলুন...”

কাদিরভ ওভারকোটের পকেট থেকে ছোট্ট রিভলভার বার করে অহমের দিকে তাক করলেন।

অহম অবাক হয়ে বলল, “আরে আমি বলছি তো! কাদিরভ...”

আর কিছু বলার আগেই অহমের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে সুইচ অফ করে দিলেন কাদিরভ। সমুদ্রের দিকে রিভলভার তাক করে বললেন, “দু’জনেই নেমে এসো।”

এবার সমুদ্রের মোবাইল বাজছে।

কাদিরভ তাকে ইশারায় বললেন ফোনে হাত না দিতে। ফোন বেজে বেজে থেমে গেল। অহমের দিকে তাকিয়ে কাদিরভ বললেন, “হাভনিয়া আর ডলার যা আছে দিয়ে দাও।”

কাদিরভের হাতে মানিব্যাগ ভুলে দিয়ে অহম বলল, “আপনি কি পালিয়ে বাঁচতে পারবেন? আমরা নাতালিকে বলে দেব তো! ইউক্রেন

পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করবে।”

আবার সমুদ্রের মোবাইল বাজছে। ওর পকেট থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে ফোন কাটলেন কাদিরভ। ফোন সুইচ অফ করে সমুদ্রকে বললেন, “তোমার কাছে যা আছে দাও।”

সমুদ্র বরফের মধ্যে ছুটে পালানোর চেষ্টা করতই কাদিরভ তুষার চিতার ক্ষিপ্ৰতায় দৌড়ে তার ঘাড়ের রিভলভারের বাঁটের বাড়ি মারলেন। এক পাক ঘুরে স্লো মোশনে বরফের ওপরে পড়ে গেল সমুদ্র। তার মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে বরফ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অজ্ঞান সমুদ্রের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে ডলার আর হাভনিয়া নিজের পকেটে ভরে অহমের দিকে তাকিয়ে কাদিরভ বললেন, “প্রথম কথা, যে নিও-নাৎসি দলের কথা তোমার দাদা বলছিল, আমি সেই দলের লোক। আমরা চাই না অন্য দেশের, অন্য ধর্মের, অন্য জাতির, অন্য রঙের, অন্য ভাষার লোক আমাদের দেশে আসুক এবং থাকুক। আমাদের বিরোধিতা করা মানে তুমি আমাদের শত্রু। সেকেন্ড পয়েন্ট হল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই না। প্রাণে বাঁচতে গেলে পরিবারকে নিয়ে দেশ ছাড়তে হবে। তার জন্যে প্রচুর ডলারের প্রয়োজন।” তারপর সমুদ্রের ডান হাতের ওপরে ভারি বুট দিয়ে আঘাত করলেন। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল সমুদ্র। আঙুল ভেঙে যাওয়ার মড়মড় আওয়াজ শোনা গেল।

কাদিরভ এগিয়ে আসছেন অহমের দিকে। বলছেন, “এটা রোমানিয়া! তোমরা ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট। বরফের মধ্যে মরে পড়ে থাকবে। রোমানিয়া পুলিশ তোমাদের খুঁজে পাবে না। আমাকে ওরা খুঁজবেও না। আমার মতো ইউক্রেনের ড্রাইভার এখানে এখন শয়ে শয়ে ঘুরছে। আমি চললাম ইউক্রেন।” তারপর অহমের ঘাড়ের রিভলভারের বাড়ি মারলেন।

আর কিছু মনে নেই অহমের। বরফের মধ্যে পড়ে রয়েছে দুই যুবকের দেহ। তুষার আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে ওদেরকে। অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। তুষারপাত বাড়ছে।

*

এয়ারবাস ভর্তি হয়ে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা মাস্ক ও চকোলেট পেয়ে গিয়েছে। এক দফা কফি পান করার পরেও স্নেন না ছাড়ায় তারা উত্তেজিত। মনোজের কাছ থেকে ওরা জেনে গিয়েছে যে দু’জন ছাত্রের জন্যে উড়ানের দেরি হচ্ছে। এবং ওই দু’জন পাইলটের পরিচিত।

প্রথমে এই নিয়ে ব্যক্তিগত অসন্তোষ শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে অসন্তোষ বদলে গেল সমবেত প্রতিবাদে। বিনয় কিছু জানতেন না। ছাত্রদের চিৎকার শুনে আসন ছেড়ে উঠে ককপিটে এসে বললেন, “এসব কী শুনছি?”

“স্যার! রোমানিয়ার লোকাল পুলিশ দু’জন ভারতীয় ছাত্রকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসছে। দু’জনেই সিরিয়াসলি ইনজিয়ারড। ওদের এখানে রেখে উড়ে গেলে ওরা জাস্ট মরে যাবে। আমার সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলের মোবাইলে কথা চলছে। পুলিশ জিপ এয়ারপোর্টের এক কিলোমিটারের মধ্যে। আর দশ মিনিট স্যার। প্লিজ।”

“ওই দু’জন তোমার কেউ হয়? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আগে দেশ, পরে পরিবার।’ কথাটা সব সময় মনে রেখো।”

গভীর শ্বাস নিয়ে মেছলি বললেন, “গোটা দেশটাই আমার পরিবার স্যার। ওই দু’জনও আমার পরিবার। ওদের ফেলে আমি যাব না।”

ভুরু কুঁচকে বিনয় তাকিয়ে রয়েছেন মেছলির দিকে। হঠাৎ মাইকে সুশান্তর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। “ভারতের সমস্ত নাগরিককে ফ্লাই এয়ারের বিমানে স্বাগতম। আপনারা সবাই দেশে ফেরার জন্যে, বাবা-মায়ের কাছে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। আপনারদের হাতে সময় নেই। তাই না?”

“হ্যাঁ স্যার!” চোঁচাল ছাত্ররা, “আমাদের হাতে একদম সময় নেই।”

“আমার নাম সুশান্ত সিংহ। ভারতবর্ষের একমাত্র ক্যানসার সার্ভাইভার পাইলট। আমার জীবনের একটা পর্বের কথা বলি শুনুন।”

সমবেত হর্ষধ্বনির মধ্যে সুশান্ত অতীত ইতিহাস বলছেন। বলছেন কী ভাবে তাঁর হাত থেকে সময় ফসকে যাচ্ছিল, যেভাবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায় বালি। কীভাবে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচতে শিখেছিলেন, কীভাবে ক্যানসার তাকে শিখিয়েছিল মনোবল ধরে রাখতে, কীভাবে পরিবারের সবাই তাঁকে আগলে রেখেছিল। সব শেষে বললেন, “হাতে সময় না থাকাটা বড় কথা নয়। আপনারা সেই সময়টা

কীভাবে ব্যবহার করছেন, এটাই বড় কথা। অসুস্থ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যে সময় বাঁচে, তা শয়তানের কাছে বাঁধা থাকে। কাজেই, একটু অপেক্ষা করুন।”

মেহুলির ফোনে গ্যাব্রিয়েলের রিং। “ম্যাডাম। ওরা এসে গিয়েছে। ল্যাডার নামাতে বলুন।”

ফ্লাইট ক্রু ভিকিকে নির্দেশ দিচ্ছেন মেহুলি। বিনয় নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের আসনে ফিরে যাচ্ছেন। মেহুলির ইশারা বুঝতে পেরে সুশান্ত নিজের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে আনছেন। “যখন আপনারা ভাববেন যে খাদের অতলে পৌঁছে গিয়েছেন তখন বুঝবেন যে আর নীচে যাওয়ার নেই। এবারে ওপরে উঠতে হবে। জয় হিন্দ!”

স্ট্রেচারে করে দু’টি ছেলেকে প্লেনে তোলা হয়ে গিয়েছে। ছাত্ররা ‘জয় হিন্দ’ বলছে। রুহির জন্যে মোবাইলে ভয়েস রেকর্ড করলেন মেহুলি। “ওরা এখন প্লেনে। দু’জনেই সিরিয়াসলি ইনজিয়োরড। ফ্লাইটে ফার্স্ট এডের বেশি কিছু করা যাবে না।”

রুহির হোয়ার্টসঅ্যাপ নম্বরে ভয়েস মেসেজটি পাঠিয়ে সঙ্গে ছ’টার সময় উড়লেন মেহুলি। আসার সময় সাড়ে সতেরো ঘণ্টা লাগলেও ফেরার ফ্লাইট টাইম সাড়ে চোদ্দ ঘণ্টা।

মেহুলি উড়লেন। পক্ষীমাতা যেভাবে দুই ডানা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখে, মনে মনে সেইভাবে দুই অনো যুবককে বুকের মধ্যে আগলে তিনি উড়লেন। রোমানিয়ার মাটি থেকে শুধু নয়, নিজের মনের গহিন অন্ধকার থেকেও উড়লেন। এই প্রথম পেশাদার জীবন আর ব্যক্তিগত জীবন এক হয়ে গেল। যে ক্ষুরধার পেশাদারিত্ব নিয়ে প্লেন চালান, সেই স্কিল সেট দিয়ে পারিবারিক জীবনে একবার চোখ রেখেই মেঘনাদের যাবতীয় পরিকল্পনা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি বুঝেছেন, যুদ্ধ শুধু দু’টি দেশের মধ্যে হয় না। দু’টি মানুষের মধ্যেও হয়।

যুদ্ধের ক্লেশ আর মালিনা ছাড়িয়ে মেহুলি উড়ছেন। এতদিন তিনিও খাদে গড়িয়ে পড়ছিলেন। একদম নীচে পৌঁছানোর পরে একটাই উপায়। ওপরে ওঠা।

তিনি উঠছেন। তিনি উড়ছেন।

রুহি

প্লেনের আসনে সিঁটিয়ে বসে রয়েছে রুহি। মুখে মাস্ক, কোমরে সিটবেল্ট, দু’হাত দিয়ে থিমচে ধরে আছে হাতল। আসনে হেলান না দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা। অনেকক্ষণ ধরে রুহিকে দেখে আয়েশা বলতে বাধ্য হল, “একটু রিল্যাক্স কর প্লিজ। যে জিনিসটা তোর হাতে নেই সেটা নিয়ে টেনশন করিস না।”

সুচিত্রা বলল, “দিদি ঠিক বলছে। সুসিয়েভাতে কী হচ্ছে সেটা তোমার কনট্রোলে নেই। কিন্তু মন তোমার কনট্রোলে। তাই না? ডিপ ব্রিদ করো।”

আয়েশার দিকে তাকিয়ে রুহি নিষ্পৃহ গলায় বলল, “তুই যখন টার্নোপিলে দু’বেলা ‘ধূর ভাঙ্গাগেনা’ বলে টেনশন করতিস, তাকে জ্ঞান দিতাম?” সুচিত্রার দিকে তাকিয়ে বলল, “উমেদ যখন তাকে অন্ধকারে মোলেস্ট করছিল, তখন ডিপ ব্রিদ করেছিলি না চেষ্টা করেছিলি?”

প্লেশ নয়, অ্যাসিড উগরোচ্ছে রুহি। আয়েশা অবাক হয়ে বলল, “আমাকে বললি বল। সুচিত্রাকে কী বললি তুই? মাথার ঠিক আছে তো?”

সুচিত্রা বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছে রুহির দিকে। চোখে জল। রাগে ফেটে পড়ে রুহি চোঁচায়, “আমি টেনশন করছি, তাতে তাদের কী অসুবিধে? নিজের মতো থাক! আমাকে খোঁচানোর প্রয়োজন নেই।” তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে সুচিত্রাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “আয়্যাম সরি! আমার মাথার ঠিক নেই।”

সুচিত্রা প্রথমে রেগে গিয়ে, শরীর শক্ত করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল। একটু পরে বুঝতে পারল, রাগ করে লাভ নেই। সিনিয়র দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “আমিও সরি। তোমার অ্যাংজাইটি আমি ধরতে পারিনি। আমার আর আয়েশাদির মেন্টাল প্রেশার প্লেনে উঠেই খতম হয়ে গিয়েছে। তোমার সেটা হয়নি।”

“তুই চুপ কর!” সুচিত্রাকে জড়িয়ে ধরে কঁদেই যাচ্ছে রুহি। “ইস্তানবুলে প্লেন যখন রিফুয়েলিং-এর জন্যে টাচ ডাউন করেছিল, তখন মাকে ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছি। সেটা শুনে মা আমাকে ফোন করেছিল। তখনও সুসিয়েভা থেকে প্লেন ছাড়েনি। মা বলল যে দেখছে।

মা যদি ব্যবস্থা নেয় তো ভাল। না হলে ওদের কী যে হবে!”

“কিছুই হবে না।” রুহিকে নিজের দিকে টেনে নেয় আয়েশা, “যদি এই ফ্লাইটে ফিরতে না পারে, তা হলে পরের ফ্লাইটে ফিরবে। আমাদের দিল্লি পৌঁছে দিয়েই অপারেশন গঙ্গা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সুসিয়েভাতে আরও অনেক ভারতীয় ছেলেমেয়ে আছে।”

“গুলি চলছে যে!” আয়েশার কাঁধে মাথা রাখে রুহি।

“আমরাও নানা অশান্তি দেখেছি রেজেজো এয়ারপোর্টে। কিন্তু সব পেরিয়ে বাড়ি তো ফিরছি। তাই না?”

দুই বান্ধবীর কাছে আশ্বাসবাণী শুনে উড়ানের বাকিটা ঘুমোল রুহি। লম্বা ঘুম ভাঙল আদিদেবের ঘোষণায়। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে তিনি বললেন, “ভারতবর্ষের মাটিতে আপনাদের স্বাগতম।”

মাত্র একটি বাক্য। কয়েকটা মাত্র শব্দ। কিন্তু ওতেই সব যাত্রীর বুকের মধ্যে রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটে গেল। প্রাণে খুশির তুফান মেল দৌড়ল। সব ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে, পম্পরকে জড়িয়ে ধরে, দু’হাত ওপরে ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। একই সঙ্গে বুঝতে পারছে মা’তুভুমি কাকে বলে, পাসপোর্ট ও ভিসাবিহীন জীবন কাকে বলে, স্বাধীনতা কাকে বলে। কাকে বলে শান্তি।

আদিদেব বললেন, “আজ পয়লা মার্চ। এখন সকাল সাতটা। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাকে পরের ফ্লাইটেই পোল্যান্ড যেতে হবে। এখান থেকে আপনাদের দায়িত্ব নিচ্ছেন মিস্টার হর্ষ জৈন। জয় হিন্দ!”

তুমুল হাততালি ও ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনির মধ্যে বিদায় নিলেন আদিদেব। ঊঁর বদলে সামনে এসে দাঁড়ালেন বছর পঞ্চাশের অভিজাত চেহারার লম্বা-চওড়া হর্ষ জৈন। নিখুঁত ভাবে কামানো মাথা, সঙ্গে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা, পরনে স্ট্রট।

মাইক হাতে নিয়ে হর্ষ বললেন, “আমি জানি যে আপনারা বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। কিন্তু সেটা হওয়ার আগে ছোট্ট একটা কাজ সারতে হবে। রানওয়ের পাশে ভারত সরকারের একটি ব্যানার লাগানো আছে। সেটির সামনে দাঁড়ানোর পরে গ্রুপফি তোলা হবে। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেকর্ডিং করা হবে। তারপর আপনাদের তুলে দেওয়া হবে প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধির হাতে।”

“একটু তাড়াতাড়ি করবেন স্যার।” কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে আয়েশা।

আয়েশার কনুইতে চিমটি কেটে রুহি বলল, “মা সুসিয়েভা থেকে ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছে। শোন।”

আয়েশা আর সুচিত্রা কাছিয়ে এল। কান পেতে শুনল মেহুলির গলার আওয়াজ। “ওরা এখন প্লেনে। দু’জনেই সিরিয়াসলি ইনজিয়োরড। ফ্লাইটে ফার্স্ট এডের বেশি কিছু করা যাবে না।”

রুহি কাঁদছে। ওর কান্না না থামিয়ে চুপ করে বসে রইল দুই বন্ধু।

*

ভারত সরকারের মস্ত ব্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রুপফি আর গাদা গাদা সেল্ফি উঠল। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে দিয়ে আধ মিনিট ধরে অপারেশন গঙ্গা নিয়ে প্রশংসা সূচক কথা বলানো হল। সেগুলো তৎক্ষণাৎ সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করাও হল। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে সবই খেয়াল করছে রুহি। সে চুপ করে বসে আছে। দিল্লি থেকে কলকাতা কী করে যাওয়া হবে, এই নিয়ে ভাবিত নয়। তার একমাত্র চিন্তা হল, অহম কেমন আছে? ওর কোথায় চোট লেগেছে? কীভাবে চোট লেগেছে? সিরিয়াস ইনজুরি মানে কী? ও বেঁচে আছে তো? মৃত্যুচিন্তা মাথায় আসতেই বরষার করে কঁদে ফেলে রুহি।

বাকিরা তাকিয়েও দেখছে না রুহিকে। শুধু আয়েশা আর সুচিত্রা দু’দিক দিয়ে ধরে আছে। ছবি তোলা পর্ব শেষ হতে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল এয়ারপোর্টের বাইরে। সেখানে প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নানা কাগজপত্র এই করে তাঁদের হাতে ছাত্রছাত্রীদের তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সুচিত্রা চলে গেল কেরলের প্রতিনিধির কাছে। যাওয়ার আগে রুহি আর আয়েশাকে জড়িয়ে ধরে একচোট কঁদে নিল। রুহির কানে কানে বলল, “জেনে নাও ওই প্লেনটা কখন ল্যান্ড করবে। আমি ফোন করব তোমাকে।”

নভজ্যোত চলল গেল দিল্লি পুলিশের সঙ্গে। যাওয়ার আগে বলল, “পুরনো দিল্লিতে আমাদের বাড়ি আছে। সেখানে ক’দিন থেকে

কলকাতা ফিরব। ফোন করিস।”

“করব,” টাটা করল আয়েশা। রুহি উত্তর দিল না। তাকে, আয়েশাকে এবং আরও কয়েকজন ছেলেমেয়েকে হর্ষ তুলে দিলেন আনন্দ জানা নামের এক আধিকারিকের হাতে। তারপর তিনিও চলে গেলেন।

আয়েশা আর রুহি ছাড়া বাকি সবার বাবা-মা দিল্লি এসেছেন। অন্য ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের সঙ্গে চলে যাওয়ার পরে পড়ে রইল আয়েশা আর রুহি। আনন্দ ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, “খিদে পেয়েছে?”

“হ্যাঁ!” বলল আয়েশা। রুহি কিছুই বলল না। তার খিদে বা তেষ্ঠা পায়নি। মাথায় একটাই প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে। রোমানিয়া থেকে প্লেনটা কখন দিল্লিতে ল্যান্ড করবে।

গাড়ি করে বঙ্গভবন যাওয়ার সময় প্রশ্নটা করেই ফেলল রুহি। আনন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, “দেরি আছে।”

আয়েশা এর মধ্যে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছে যে আজই কলকাতা পৌঁছেছে। আয়েশার বাবা জানিয়েছেন তিনি এয়ারপোর্টে থাকবেন।

রুহি ফোন করেছে মেঘনাদকে। এক দুশ্চিন্তার মধ্যে দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা। মায়ের কাছ থেকে বাবা অহমের কথা জানতে পারেননি তো? তা হলে তো খুব বাজে ব্যাপার হবে! ভয়ের চোটে পেট গুড়গুড় করছে।

ফোন ধরে মেঘনাদ বললেন, “কলকাতার ফ্লাইট ঠিক দু’ঘণ্টা পরে। বঙ্গভবনে লাঞ্চ করেই বেরিয়ে পড়বি। একদম বিশ্রাম নিবি না। আনন্দ জানাকে একবার ফোন দে।”

মেঘনাদ সব তথ্যই জানেন তা হলে! তিনি নিজে থেকে অহমের প্রসঙ্গ তুললেন না বলে রুহিও কিছু বলল না। সে আনন্দের দিকে ফোন এগিয়ে বলল, “বাবা কথা বলবেন।”

“আমি ব্যস্ত,” পাতাই দিলেন না আনন্দ।

“বাবা, উনি এখন ব্যস্ত।” ফিসফিস করে বলল রুহি।

“তুই বলেছিস আমি সিএম-এর কার্ডিওলজিস্ট?”

কথা না বাড়িয়ে ফোন কাটে রুহি। যিনি কথা বলতে চাইছেন না, তাঁকে জোর করে কোনও লাভ আছে? বাবার এই গায়ে পড়ে প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে আলাপ করার স্বভাবটা খুব বিরক্তিকর।

গাড়িতে বসে বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল। বঙ্গভবনে পৌঁছে ওদের দুটো ঘরে ঢুকিয়ে আনন্দ বললেন, “তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নাও। লাঞ্চ সেরে এয়ারপোর্ট যাওয়ার আগে একটা কাজ আছে।”

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে উষ্ণ জলধারার নীচে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে রুহি ভাবছে। কোথায় সে শেষ স্নান করেছিল? টার্নোপিলের হস্টেলে? সেটা কত তারিখ ছিল? কী বার? কোন দেশ? জেট ল্যাগ, শরীর ও মনের অস্থিরতা, বাড়ি ফেরার তাড়না, অহমের জন্যে প্রবল টেনশন— সব মিলিয়ে মাথা ঘুরে গেল রুহির। কোনও রকমে নিজেকে সামলে বাথরুমের মেঝেয় বসে পড়ল। বসে বসেই ভিজছে আর গলা ফাটিয়ে কাঁদছে।

কতক্ষণ ওইভাবে বসেছিল মনে নেই। দরজায় খটখট শুনে গা মুছে, নতুন পোশাক পরে, পুরনো পোশাক ব্যাগে ঢুকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে রুহি দেখল আয়েশা আর আনন্দ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। তিনজনে মিলে ক্যান্টিনের দিকে এগোল। খুব ভাল খাবার থাকা সত্ত্বেও রুহি কিছুই খেল না। খাবার দেলেই বমি পাচ্ছে।

ভোজন পর্বের শেষে আবার রুমে যাওয়া হল। সেখানে রাজ্য সরকারের একটি ব্যানার লাগানো আছে। তার সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললেন রাজ্য সরকারের ক্যামেরা পার্সন। ভিডিয়ো ক্যামেরা এবং বুন্ডের সামনে রাজ্যের সহযোগিতার কথা বলার পরে মুক্তি পাওয়া গেল।

গাড়িতে বিমানবন্দর যেতে যেতেই রুহি মোবাইলে দেখল যে ছবি আর ভিডিয়ো রাজ্য সরকারের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়ে গিয়েছে। কলকাতাগামী বিমানে আনন্দকেও উঠতে দেখে রুহি আর আয়েশা অবাক! আয়েশা বলল, “আপনিও যাবেন?”

আনন্দ বললেন, “তোমরা যতক্ষণ বঙ্গভবনে ছিলে তার মধ্যেই অন্য দেশ থেকে আরও একঘণ্টা জন বাংলার ছেলেমেয়ে দিল্লি এসে পৌঁছেছে। তোমাদের সবাইকে সেফলি কলকাতা পৌঁছে দিয়ে আমি দিল্লি ব্যাক করব। এরকম দিন কয়েক চলবে। সবাই বাড়ি পৌঁছেলে আমার দিল্লি-কলকাতা ডেলি প্যাসেঞ্জারি বন্ধ হবে।”

ডেলি প্যাসেঞ্জারির কথা শুনে হাসলেও আনন্দকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল রুহি। কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওঁকে। শুধু উনি নন,

সারা ভারত জুড়ে কত মানুষ যে অপারেশন গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত আছেন, কেউ কোনও দিনও জানবে না। তাঁদের প্রতি নীরবে কৃতজ্ঞতা জানায় রুহি।

কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পরে তেইজন ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিলেন কলকাতা পুলিশের এক মহিলা আধিকারিক। নাম শাল্মলী পাইন। বছর আটত্রিশের মহিলা যেমন সরু, তেমন লম্বা। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো লালচে চুল। তাঁকে দেখে আয়েশা ফিসফিস বলল, “শাল্মলী মানে শিমূল গাছ না?”

“ঠিকই। পাইনও একটা গাছ।” বলল রুহি।

“নামেও গাছ, পদবীতেও গাছ? কী ব্যাপার বল তো?”

আয়েশা একচোট হেসে নিল। কলকাতার মাটিতে পা দিতেই আয়েশার মন থেকে যাবতীয় খারাপ স্মৃতি, আশঙ্কা আর আতঙ্ক মুছে যাচ্ছে। এখন ওর একমাত্র কাজ হল বাড়ি ফিরে নির্ভেজাল ঘুম দেওয়া। কিন্তু রুহির তা নয়। বাড়ি ফিরতে পেরে ভাল লাগছে। একই সঙ্গে অহমের কী অবস্থা সেটা জানার জন্যে মন উদগ্রীব হয়ে আছে।

শাল্মলী হাতে মাইক নিয়ে বলছেন, “এখানে সাতটি জেলার ছেলেমেয়ে আছে। প্রতিটি জেলা থেকে পুলিশের প্রতিনিধিরা এসে গিয়েছেন। তাঁদের হাতে তোমাদের তুলে দেওয়া হবে। ওঁরাই তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবেন।”

এই কথা শুনে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে প্রতিবাদ করল। কেউ বলছে, “গোটা ইউক্রেন একা ঘুরলাম, এখানে এসে পুলিশের হাত ধরে বাড়ি যেতে হবে?” কেউ বলছে, “এত খবরদারি ইউক্রেনেও ছিল না।” কেউ বলছে, “চল ভাই, ইউক্রেনে ফিরে যাই। ওদিকে অত্যাচার কম ছিল।”

এই সব হাসাহাসির মধ্যে আয়েশা কঠিন গলায় বলল, “আমাদের বাবা-মা এয়ারপোর্টের বাইরে রয়েছেন। আমি রয়েছি ভিতরে। ইউক্রেনের সীমানা পেরোতেও এত কাঠখড় পোড়াতে হয়নি ম্যাডাম। প্লিজ একটু কনসিডার করুন।”

শাল্মলী গম্ভীর মুখে বললেন, “যাদের জন্যে গাড়ি এসেছে, তাদের সঙ্গে পুলিশের গাড়ি যাবে। যাদের জন্যে গাড়ি আসেনি, তারা পুলিশের গাড়িতে ফিরবে। আমার ওপরে নির্দেশ আছে কাজটা এইভাবে করার জন্যে।”

আয়েশা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রুহিকে জড়িয়ে ধরে বলল, “চললাম! বাড়ি গিয়ে ফোন করব।”

রুহির চোখে জল। সে বন্ধুর গালে চুমু খেয়ে বলল, “ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা কর, অহমের যেন কিছু না হয়।”

“কাকিমার ভয়েস মেসেজ শোনার পর থেকে সেই কাজটাই করছি।”

আয়েশা চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

শাল্মলী রুহির দিকে তাকিয়ে বললেন, “ডক্টর মেঘনাদ লাহিড়ী এসেছেন তোমাকে নিতে। তোমাদের সঙ্গে একটি গাড়ি যাবে।”

শাল্মলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে একজন কনস্টেবলের সঙ্গে বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে রুহি দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেঘনাদ। মেয়েকে দেখে এক গাল হেসে তিনি হাত নাড়লেন। ওমনি বাবার ওপর থেকে সব রাগ, সব অভিমান গায়েব হয়ে গেল রুহির। ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল সে। আফটার শেড আর ডিওর গন্ধ, সুটের উল আর শার্টের লিনেনের স্পর্শ দিয়ে যাকে চেনা যায়, যাকে ভরসা করা যায়— সেই লোকটা বাবা!

“বাড়ি চলো,” আদুরে গলায় বলল রুহি।

মেয়ের কাঁধে হাত রেখে মেঘনাদ বললেন, “কিছু খেয়েছিস?”

“হুঁ,” খাবারের কথা শুনে আবারও বমি পাচ্ছে রুহি। অহমের প্লেন কখন দিল্লিতে ল্যান্ড করবে এখনও জানা গেল না।

বাপবেটি মিলে পার্কিং লটের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল, “তুমিই রুহি?”

রুহি দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখছে, মায়ের বয়সি এক মহিলা দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

“বলুন,” মেঘনাদ ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন।

জিন্স ও কুর্তি পরা মহিলা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বিনয় দেখিয়ে মেঘনাদকে বললেন, “আসলে আমার ছেলেও ইউক্রেনে পড়ে। ও এখনও ফেরেনি। তাই রুহির কাছ থেকে খবর নিতাম।”

“টার্নোপিলে আছে? কী নাম?” জিজ্ঞাসা করছেন মেঘনাদ। মহিলাকে দেখে দুমদুম করে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রুহির বুকে। ইনি কি অহমের মা? জানে না রুহি। সে শুধু জানে যে অহমের মায়ের নাম নীলিমা গোস্বামী,

তিনি দিনরাত পত্রিকার সাংবাদিক। অহমের বাবা নেই।

দ্রুত এগিয়ে এসে রুহি মহিলাকে বলল, “আপনি?”

“আমি অহমের মা। তোমার কথা অহম আমাকে গতকাল বলেছে। ও কোথায়? কেমন আছে?” নিজের পরিচয় দিয়েই মূল প্রশ্নে ফিরে গেছেন নীলিমা।

“আমার মা মেছলি লাহিড়ী পাইলট। মা যে ফ্লাইট নিয়ে ফিরেছে তাতে অহম আর ওর সিনিয়র দাদা...”

“সমুদ্র? আমি জানি যে ওর নাম সমুদ্র! ওদের কথা বলো! কী জানো বলো!” উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন নীলিমা।

রুহি খুব দ্রুত বলল, “আপনি আমার নম্বর নোট করুন। নাইন এইট থ্রি থ্রি...”

নীলিমা নম্বর সেভ করতে না করতেই মেঘনাদ এগিয়ে এসেছেন, “কী রে? ওঁর ছেলেকে চিনিস?”

বাবাকে মিথ্যা বলা যাবে না। আজ না হয় কাল জানবেনই। রুহি বলল, “চিনি।”

নীলিমার দিকে হাত নেড়ে মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন মেঘনাদ। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ভিআইপি রোড ধরে দৌড়ছে এসইউডি। হুটার বাজিয়ে এবং বিকন জ্বেলে সামনে দৌড়ছে পুলিশের গাড়ি। রুহির ফোনে অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ এল। ‘হাই রুহি। দিস ইজ মাই মোবাইল নাম্বার। নীলিমা গোস্বামী।’

নম্বরটা সেভ করল রুহি। টুক করে মায়ের পাঠানো ভয়েস মেসেজ নীলিমাকে হোয়াটসঅপে পাঠিয়ে দিল।

প্রথমে একটি ধূসর টিক চিহ্ন। তারপর দুটো। মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নদুটি রং বদলে নীল হয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ঝনঝন করে রুহির ফোন বেজে উঠল।

“নীলিমা গোস্বামী কলিং...”

অহম।

দিল্লির আকাশে যখন রোমানিয়া-ফেরত এয়ারবাস চক্র মারছে, তখন সুশান্ত বিশ্রামপর্ব চুকিয়ে ককপিটে চলে এসেছেন। প্লেন চালাতে চালাতেই মেছলি জানিয়ে দিয়েছেন ল্যান্ডিং-এর ঠিক পরেই তাঁর কী কী চাই এবং কেন চাই। প্লেন টাচডাউন করা মাত্র সুশান্ত ফোনালাপ শুরু করেছেন ফ্লাই এয়ারের ‘শিডিউল ম্যানেজার’-এর সঙ্গে, যিনি পাইলটদের ডিউটি ঠিক করেন।

প্লেন দাঁড়িয়েছে। মেছলি ঠান্ডা মাথায় মনে করছেন ঘটনাবলি উড়ানের কথা। বিমান ছাড়ার ঠিক আগে ভিকি এসে বলেছিল, “ম্যাডাম, একজন মেয়ে একটা বেড়াল নিয়ে প্লেনে উঠেছে। বলছে বেড়ালটা ওর পোষা।”

“কেন?” বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মেছলি। “ওঠার সময় রোমানিয়ার এয়ারপোর্ট স্টাফ ওকে চেক করেনি?”

“কী রকম চেকিং হচ্ছে জানেন তো! বেড়ালটা প্লেনে উঠে বিকট চেল্লাচ্ছে। বিনয় স্যারের ঘুমের ডিস্টার্বেন্স হচ্ছে। উনি বলেছেন রিফুয়েলিং-এর সময় ‘বিল্লিকা ইস্তানবুল মে গিরা দো’ মেয়েটা বলছে, “ফুচকাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।”

“বিনয় স্যার!” দাঁতে দাঁত চিপে বললেন মেছলি, “পেন ইন দি অ্যাস! মিনিস্টারকে বলে দাও অসুবিধে হলে উনি ইস্তানবুলে নেমে যেতে পারেন। ফুচকা দিল্লি যাবে।”

ভিকি বুঝে গেল বিড়াল সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রী মশাইয়ের পরামর্শ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিতে হবে।

সেটাই করা হচ্ছিল। এর মধ্যে নতুন সমস্যা দেখা দিল। জ্বালানি ভরে প্লেন সবে ইস্তানবুল ছেড়ে উড়েছে। ভিকি এসে বলল, “ম্যাডাম, অহমের মাথায় চোট থেকে ব্লিড করছিল। আমি প্রেশার ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। এখন ব্লিডিং কমেছে।”

“দ্যাটস গুড নিউজ!”

“সমুদ্রের কনভালশন শুরু হয়েছে। একটানা থিঁচুনি হচ্ছে।”

থিঁচুনি! ভুরু কঁচকে গিয়েছে মেছলির। মাথায় চোট লাগার পরে ব্রেনে সিরিয়াস কিছু হলে রোগীর থিঁচুনি হয়। ফ্লাইটের সময় চিকিৎসা সংক্রান্ত আপেক্ষিকালীন কোনও সমস্যা হলে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে হয়। কিন্তু এই ফ্লাইটে সেটা করা যাবে না। এটা স্পেশাল ফ্লাইট। সব জায়গার নামার অনুমতি নেই। কারণ যাত্রীদের কাছে অন্য দেশে নামার জন্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট নেই।

অন্য বিকল্প হল প্লেনে চিকিৎসকের খোঁজ করা। কথাটা মাথায় আসতে হেসে ফেললেন মেছলি। প্লেন ভর্তি ডাক্তারি ছাত্রদের মধ্যে একজনও পুরোদস্তুর ডাক্তার আছেন কি? দেখা যাক!

পাবলিক অ্যাক্সেস সিস্টেমে ঘোষণা করার পরে সদ্য পাস করা সাতজন চিকিৎসককে পাওয়া গেল। তাঁরা সমুদ্রকে দেখে একবারো বললেন, অবস্থা সংকটজনক। তবে আপাতত থিঁচুনি বন্ধ আছে।

মেছলির চিন্তার মধ্যেই প্লেন থেকে সবার আগে নামলেন বিনয়। সাংবাদিকদের বাইট দিয়ে, খুশি যাদব নামের এক আধিকারিককে ছেলেমেয়েদের ঘরে ফেরানোর দায়িত্ব দিয়ে দৌড়লেন বিনয়। অর্শের সমস্যাটা খুব ভোগাচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিয়েই মলদোভার ফ্লাইট ধরতে হবে।

খুশি যাদব যখন ভারত সরকারের ফ্লেক্সের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রুপফি ও ভিডিও তোলায় রুটিন ফলো করছেন, ঠিক তখনই দু’টি স্ট্রচারে করে অহম আর সমুদ্রকে প্লেন থেকে নামানো হয়েছে। ফ্লাই এয়ারের চারজন কর্মী স্ট্রচারদুটি ঠেলে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের মেডিকাল সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে দৌড়ছেন মেছলি।

দিল্লি বিমানবন্দরের মেডিকাল সেন্টারগুলি প্রাইভেট কোম্পানি চালায়। ব্যবস্থা খুবই আধুনিক। সেখানে সমুদ্র আর অহমের সিটি স্ক্যান হবে। ওদের পকেট থেকে মোবাইল নিয়ে এক স্বাস্থ্যকর্মী মেছলির হাতে তুলে দিলেন। মেছলির মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। তিনি সমুদ্রের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ালেন ওর মোবাইলের টাচস্ক্রিনে। মোবাইল লক খুলে গেল।

ওদের সিটি স্ক্যান হচ্ছে। মেডিকাল সেন্টারের বাইরে এসে সমুদ্রের ফোনের কল লগে চলে গিয়েছেন মেছলি। ‘লাস্ট ডায়াল্ড নাম্বার’ খুঁজছেন। দেখতে পাচ্ছেন, রোমান হরফে লেখা রয়েছে, ‘মা!’

নম্বরটিতে ফোন করতেই এক মহিলা ফোন ধরে চিৎকার করে বললেন, “হ্যালো? কে?”

উনি চেষ্টাচ্ছেন কারণ ও প্রান্তে অজস্র মহিলা চেষ্টায়ে কথা বলছেন।

নিচু গলায় মেছলি বললেন, “আপনি কি সমুদ্রের মা?”

কিছুক্ষণ মহিলা চুপ করে রইলেন। তারপর বাঁজখাই গলায় ধমক দিলেন, “আই! সবাই চুপ!”

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ বন্ধ। মহিলা বললেন, “বাবুয়াকে ফোন দিন।”

“আমার নাম মেছলি লাহিড়ী। আমি সমুদ্র, মানে আপনার বাবুয়ার ফোন ব্যবহার করছি কারণ ওর সিটি স্ক্যান হচ্ছে।” খুব সাবধানে, থেমে থেমে বলছেন মেছলি। পাশাপাশি ভাবছেন, এই মহিলা কী করেন? খ্যানখেনে গলায় চেষ্টাচ্ছেন কেন? ওঁর কথা শুনে মেয়েরা চুপ করে গেল কেন? উনি এখন কোথায়?

“বাবুয়ার সিটি স্ক্যান হচ্ছে? কেন?” তেড়েফুঁড়ে বললেন মহিলা, “কালই তো ওর সঙ্গে আমার ফোনে কথা হল।”

“আমনার নামটা জানতে পারি?” বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন মেছলি।

“আমার নাম আশা সেন,” মহিলার স-য়ের দোষ আছে, “বাবুয়ার কী হয়েছে?”

“সমুদ্রের মাথায় চোট লেগেছে। ডাক্তাররা অপারেশন করতে বলছেন।”

“চোট? অপারেশন?” আশার গলার আওয়াজ কয়েক পর্দা নিচে।

“আমরা এখন দিল্লিতে। ডাক্তার যদি বলেন যে এফুনি অপারেশন করতে হবে, সে ক্ষেত্রে কী করব? আপনি সমুদ্রের বাবাকে ফোনটা দিন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

শান্ত গলায় আশা বললেন, “আমি যোটা বলব সেটাই হবে। অন্য কারও কথার কোনও দাম নেই। কী বললাম বুঝতে পেরেছেন?”

“হ্যাঁ।”

“বাবুয়াকে কলকাতায় নিয়ে আসুন। বাকিটা আমি বুঝে নিচ্ছি। আর একটা কথা...”

“বলুন।”

“আমি একবার ভিডিও কলে বাবুয়াকে দেখতে চাই।”

সমুদ্র আর অহমের মাথার স্ক্যান হয়ে গিয়েছে। ওদের স্ট্রচার নিয়ে বাইরে এসেছে ফ্লাই এয়ারের কর্মীরা। এক স্বাস্থ্যকর্মী স্ক্যানের রিপোর্ট মেছলির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “অহমের কিছু হয়নি। তবে সমুদ্রের অপারেশন করতে হবে।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশাকে ভিডিও কল করলেন মেছলি। এবং খেয়াল

করলেন যে আশাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি নিজের ফোনের ভিডিও ক্যামেরা বন্ধ করে ভিডিও কল চালু করেছেন।

বিরক্ত লাগলেও কিছু করার নেই। সমুদ্র আর অহমের স্ট্রেকারের দিকে মোবাইল একবার ঘুরিয়ে মেহুলি বললেন, “দেখা হয়েছে?”

“হ্যাঁ।” কাঁদছেন আশা।

“আপনার কথা মতো ওকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছি। আপনি কোথায় থাকেন? এয়ারপোর্টে আসতে পারবেন? প্লেন কলকাতায় পৌঁছে আড়াই ঘণ্টা পরে।”

“কেউ না কেউ থাকবে।” ফোন কেটে দিয়েছেন আশা।

মেহুলি দৌড়ছেন। একই সঙ্গে একের পর এক ফোন করছেন। কখনও সুশান্তকে, কখনও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি পুলক মিত্রকে, কখনও ফ্লাই এয়ারের ‘ডিজিবিটি অ্যাসিস্ট্যান্স টিম’-এর লিডারকে। ফোনাফুনি করতে করতেই সবাই চলে এল ডোমেস্টিক টার্মিনালে। কলকাতাগামী ফ্লাইটে পুলক মিত্রের সঙ্গে মেহুলিও যাচ্ছেন। সাধারণ ফ্লাইটে একটির বেশি স্ট্রেকারের সম্মতি দেওয়া হয় না। এটা স্পেশাল ফ্লাইট বলে দু’টি স্ট্রেকার যাবে। প্লেনে উঠে শরীর এলিয়ে দেওয়ার আগে শেষ ফোনটা রুহিকে করলেন মেহুলি।

“মা, তুমি কোথায়?” রিং হওয়া মাত্র ফোন ধরে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল রুহি।

“কলকাতার ফ্লাইটে, যাত্রী হিসেবে। অহম আর সমুদ্র সঙ্গে আছে। অহমের চোটে থাকলেও ও ভাল আছে। সমুদ্রের ব্রেনে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু তুই কোথায়?”

“বাড়িতে,” রুহি ফিসফিস করে বলল, “অহমের মায়ের সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছিল। উনি ফোন নম্বর নিয়েছিলেন। তারপর থেকে বারবার ফোন করছেন। বাবা খুব বিরক্ত। তুমি বাবাকে কিছু বলোনি তো?”

“এখনও বলিনি। তবে এবারে বলার সময় এসেছে,” জোরের সঙ্গে বললেন মেহুলি, “তুই চিন্তা করিস না।”

শাম্মলী পাইন এবং পুলক মিত্র যখন যাত্রীদের দেখভালে ব্যস্ত, মেহুলি তখন ব্যস্ত অহম আর সমুদ্রকে নিয়ে। ফ্লাই এয়ারের ‘ডিজিবিটি অ্যাসিস্ট্যান্স টিম’ একটি হাই-এন্ড অ্যাম্বুল্যান্স বিমানবন্দরে মজুত রেখেছে। তাতে সমুদ্র আর অহমকে তুলে দিলেন মেহুলি। মেঘনাদ চলে এসেছেন এসইউভি নিয়ে। তাতে বসে রয়েছেন রুহি আর নীলিমা।

বিকন জেলে এবং ছটার বাজিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স চলছে ভিআইপি রোড ধরে। পিছন পিছন সিন্ডিটার এসইউভি। চালকের আসনের ঠিক পাশে বসেছেন মেঘনাদ। ঠিক তাঁর পিছনের সারির দু’টি আসনে বসেছেন মেহুলি আর রুহি। একদম পিছনের সারিতে বসেছেন নীলিমা।

রুহিকে জড়িয়ে ধরেছেন মেহুলি। মা নিরুচ্চারে কাঁদছেন, কাঁদছে মেয়েও। ওদের আলিঙ্গনের উত্তাপে গলে যাচ্ছে টার্নোপিল আর কলকাতার দূরত্ব। মুছে যাচ্ছে ভয়, আশঙ্কা, মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা। ফিরে আসছে ভালবাসা, অপতা স্নেহ। পরমুহূর্তে মা আর মেয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের মনে পড়ছে যে গাড়িতে এমন এক মা বসে আছেন, যাঁর সন্তানের অবস্থা সঙ্কটজনক। গাড়িতে এমন এক বাবা বসে আছেন, যিনি মেয়ের প্রেমের কথা জানেন না। সামনের অ্যাম্বুল্যান্সে এমন এক অসুস্থ মানুষ শুয়ে আছে, যার বাড়ির থেকে কেউ আসেননি। কেন আসেননি, কেউ জানে না!

পিছন ফিরে নীলিমার দিকে তাকিয়ে মেহুলি বললেন, “চিন্তা করবেন না। অহম ঠিক হয়ে যাবে।” তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাই না গো?”

মেঘনাদ ভুরু কঁচকে বসেছিলেন। স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে বললেন, “তোমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই?”

কী হল! অপরিচিত একজনের সামনে হঠাৎ এই আক্রমণে মেহুলি রিফ্রেক্স অ্যাকশনে মাথা নিচু করলেন। পর মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে কথা বলো।”

“আমি, ঠান্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তেই কথা বলেছি,” মেহুলিকে ভেংচি কেটে বললেন মেঘনাদ। “এই মুহূর্তে তোমার কাজ ছিল দিল্লি থেকে মলদোভাগামী বিমান উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। সেটা না করে, দেশের কাজ না করে তুমি টম, ডিক, হ্যারির দেখভাল করছ। এটা কি অপারেশন গঙ্গার কাজের মধ্যে পড়ে?”

মেঘনাদের কথা বলার ধরন শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন নীলিমা। কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি। এবারে মেহুলির দিকে ভুরু কঁচকে তাকালেন। তাঁর

পিঠে হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিলেন।

মেহুলি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, “পিছনের সিটে যিনি বসে আছেন ওঁর নাম নীলিমা গোস্বামী, ওঁর ছেলে অহম সামনের অ্যাম্বুল্যান্সে শুয়ে আছে।”

মেহুলির কথার মধ্যে পিছন ফিরে নীলিমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মেঘনাদ। তিনি নীলিমাকে চিনতে পেরেছেন।

মেহুলি বললেন, “আমাদের রুহি ওই অহম নামের ছেলেটাকে ভালবাসে। টম, ডিক, হ্যারির সঙ্গে অহমকে গুলিয়ে ফেলো না। ওকে কলকাতা আনা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি অফিসের অনুমতি নিয়েই কলকাতা এসেছি। অহমকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে দিল্লি ফিরে যাব।”

মেঘনাদ হেসে ফেলেছেন। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, “একটানা অনেক ঘণ্টা প্লেন চালিয়ে তোমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে। তুমি বলতে যে কলকাতায় এক এনআরআই পাত্র রুহির জন্যে বেছে রেখেছ। জেট ল্যাগের জন্যে ভুলে গেলে? নাকি মাথায় অক্সিজেন কম যাচ্ছে?”

এতদিন এই রকম কথা শুনে মেহুলি আমতা আমতা করতেন। এখন করলেন না। মেঘনাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “কিছুদিন আগেও তোমার এইসব মিথ্যে অভিযোগ আমি মেনে নিতাম। কিন্তু এক প্লেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে উড়ে আসার সময় বুঝেছি যে আমার মাথাটা দিব্যি আছে। তুমিই নানাভাবে সেটাকে গুলিয়ে দাও। একে ‘গ্যাস লাইটিং’ বলে।”

মেঘনাদ হিসহিস করে বললেন, “মুখ সামলে! গাড়িতে বাইরের লোক রয়েছে।”

“আমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে, আমার মাথায় অক্সিজেন কম যাচ্ছে... এই কথাগুলো বলার সময় তোমার মনে হয়নি যে গাড়িতে বাইরের লোক রয়েছে? নাকি বাইরের লোকের সামনে, এমনকি মেয়ের সামনে এটা প্রমাণ করা তোমার কাছে জরুরি যে আমি ইনফিরিয়র? কেন এরকম করো তুমি? আমাকে দাবিয়ে রাখার জন্যে? আমি আর তোমার কথা শুনতে রাজি নই। রুহির আর অহমের প্রেমে আমার সমর্থন আছে। ব্যস!”

“গ্যাস লাইটিং ব্যাপারটা কী?” দৃশ্যত হতাশ মেঘনাদ বললেন, “তুমি সাদা চোখে কোনও কিছু দেখতে পাও না কেন? একটা ফ্যান্সি ইংরিজি নাম দিলেই তোমার অপদার্থতা জাস্টিফায়েড হয় না।”

মেহুলি জোর গলায় বললেন, “গ্যাস লাইটিং এমন একটা ইমোশনাল ওয়েপন যা দিয়ে তুমি আমাকে চিরকাল আমাকে ম্যানিপুলেট করে এসেছ। তোমার মতো নাসিসিস্টিক, অ্যাবিউজিভ হাজ্জব্যান্ডরা বউকে কনট্রোল করার জন্যে এই নোংরামোটা করে। তুমি কথায় কথায় বলো, ‘তুমি এত ইনসেনসিটিভ কেন?’ ‘কেন আবার পাগলামো করছ?’ ‘তুমি কিসসু জানো না,’ ‘তুমি মিথ্যে কথা বলছ,’ ‘তুমি ভুল জানো।’ বলো না? আমাকে সবাব্যবস্থায় ‘সরি’বলতে বাধ্য করো না? বলো?”

মেঘনাদ গলা তুলে বললেন, “নীলিমা, দেবী, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমার গিমির মেন্টাল প্রবলেম আছে। ওর ব্যবহারের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।”

নীলিমা নিচু গলায় বললেন, “এটাও গ্যাস লাইটিং।”

কথটা শুনে চমকে উঠে পিছনে তাকালেন মেঘনাদ। তাঁর চোখে চোখে রেখে মেহুলি বললেন, “আমারই বুঝতে অনেক দেরি হল। বাকিরা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। তুমি কেন এরকম করো? কেন?”

রুহি বাবা-মায়ের কথা কাটাকাটি চুপ করে শুনছিল আর ভয়ের চোটে কাঁপছিল। এবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল অ্যাম্বুল্যান্স বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের আপৎকালীন বিভাগের সামনে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তার পিছনে দাঁড়াল এসইউভি।

জায়গাটা সংবাদ মাধ্যমের কর্মীতে ঠাসা। খবরের কাগজ, নিউজ পোর্টাল, নিউজ চ্যানেলের কর্মীরা ক্যামেরা, মোবাইল আর বুম বাগিয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ তাঁদের মধ্যে বছর তিপান্নর এক মহিলা সাদা থান পরে বাজখাই গলায় হাঁক পাড়লেন, “অ্যাম্বুল্যান্সে পেশেন্ট আছে। এদিকটা ফাঁকা করে গাড়ির দিকে যান। সব ইন্টারভিউ ওদিকে হবে। সরুন।”

মহিলার কথা শুনে মিডিয়া কর্মীরা অ্যাম্বুল্যান্স ছেড়ে দৌড়ে এলেন এসইউভি-র দিকে। সেই সুযোগে ওয়ার্ড বয়েরা এসে দু’টি স্ট্রেকার ঠেলে আপৎকালীন বিভাগের ভিতরে দৌড় দিল। মহিলাও সঙ্গে চললেন।

মেঘনাদ কনফিডেন্সের সঙ্গে সহযাত্রীদের বললেন, “মিডিয়া দেখে

ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমি ওঁদের সাইডে নিয়ে গিয়ে ডেটা ফিড করছি। আপনারা ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে মাসির ক্যান্টিনে গিয়ে বসুন। ওখানকার মাছের কচুরিটা খুব টেস্টি।”

মেঘনাদ এসইউভি থেকে নেমে সাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে যাওয়ার সময় বললেন, “আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। আমি বলছি।”

একজন সাংবাদিকও সরলেন না। তাঁরা এখনও বুম আর ক্যামেরা তাক করে আছেন এসইউভি-র দিকে। তাঁদের লক্ষ্য, ‘অপারেশন গঙ্গা’-র বাঙালি পাইলট মেহলি লাহিড়ী। তাঁরা একের পর এক প্রশ্ন করছেন মেহলিকে লক্ষ্য করে।

“ম্যাডাম, আপনি কোন ইনস্টিটিউট থেকে ফ্লাই করা শিখেছেন?”

“ম্যাডাম, আপনি ছাড়া আর কোনও মহিলা পাইলট এই মিশনে কাজ করছেন?”

“আপনি কোন কোন দেশে গিয়েছেন ম্যাডাম?”

“যখন জানতে পারলেন যে আপনাকে যেতে হবে, তখন কী মনে হচ্ছিল?”

ধীরে সুস্থে এসইউভি থেকে নামছেন মেহলি। নীলিমা আর রুহির পিঠে হাত ইশারা করছেন মেঘনাদের কাছে যেতে। ওরা সেখানেই যাচ্ছে। মেহলি বলছেন কীভাবে তিনি দেড়ঘণ্টার নোটসে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, কীভাবে উড়ে গিয়েছেন পোল্যান্ড ও রোমানিয়া। কীভাবে কফি, বিস্কুট আর নুডলসের ওপরে বেঁচে আছেন। কীভাবে দু’ঘণ্টা ঘুমিয়ে সাড়ে চোদ্দ ঘণ্টা সফর করছেন।

“কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতা ম্যাডাম?” জিজ্ঞাসা করলেন এক সাংবাদিক।

“রোমানিয়া থেকে দু’টি ছেলেকে দিল্লি এনেছি। সেখান থেকে নিয়ে এসেছি কলকাতায়। একটি ছেলের নাম অহম গোস্বামী। আমার মেয়ে রুহি ওকে ভালবাসে। রোমানিয়া সীমান্তে অহম আর ওর সিনিয়র দাদা সমুদ্র সেন মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওদের এই হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমার পারিবারিক দায়িত্ব শেষ। এখান থেকেই আমি এয়ারপোর্টে যাব। তারপর দিল্লি হয়ে পোল্যান্ড।”

আবার হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে। তাঁরা বুম বাগিয়ে দৌড়েছেন আপৎকালীন বিভাগের গেটের দিকে। কারণ সেখানে দেখা গেছে প্রফুল্ল ব্যানার্জিকে।

তিনি সাংবাদিকদের বললেন, “আপনারা ওখানেই দাঁড়ান। আমি আসছি।”

সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মেহলির পাশে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বললেন, “হাজারটা সরকারি আমলার মধ্যে আমিও একজন। আমার ছবি তুলে কী হবে? বাস্তবের হিরো, বলা ভাল ‘শিরো’ হলেন মেহলি। তাঁর পাশে আমি দাঁড়াচ্ছি। আপনারা ছবি তুলুন।” কথা বলার সময় তিনি দেখলেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে নীলিমা তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ফ্ল্যাশবাল্বের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মেহলির। জোর করে চোখ খুলে রেখেছেন। ছবি তোলার পর্ব শেষ হতে প্রফুল্ল বললেন, “পাইলট মেহলি লাহিড়ী এবং ডক্টর মেঘনাদ লাহিড়ীর একমাত্র মেয়ে রুহি ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল। সে সুস্থ ভাবে কলকাতায় ফিরেছে। রুহি, এদিকে এসো।”

স্পটলাইটে রুহির অ্যালার্জি আছে। এত লোকের সামনে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডেকেছেন। ‘না’ বলা যাবে না। সে মাথা নিচু করে মেহলির পাশে দাঁড়াল।

“তোমাকে একটা ভাল খবর দিই,” রুহির কাঁধে হাত রেখে বললেন প্রফুল্ল, “অহমের জ্ঞান ফিরেছে। ওর মাথায় কোনও চোট নেই। কাল ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।”

রুহির বৃকের বাঁদিকে একরাশ প্রজাপতি একসঙ্গে পাখা মেলল। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি... এত রং কখনও দেখেনি সে। প্রজাপতির মতো তারও ডানা গজিয়েছে। সে এপ্পুনি উড়ে যেতে চায় আপৎকালীন বিভাগের দিকে। করিডর দিয়ে উড়তে উড়তে সোজা পৌঁছে যাবে অন্তর্বিভাগে। কার্ডকে বিরক্ত না করে স্যালাইনের বোতলের গায়ে বসে নোনাজলে বিন্দু বিন্দু ভালবাসা মিশিয়ে দেবে। লবণাক্ত ভালবাসা অহমের শরীরে চারিয়ে গেলেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

ভালবাসার থেকে মহার্ঘ্য ওষুধ আজও আবিষ্কার হয়নি।

রুহির চিন্তার মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে প্রফুল্ল গাড়ির

দিকে হাঁটা দিয়েছেন। তাঁকে ঘিরে রেখেছে পুলিশের সুরক্ষা বলয়। রুহি দেখল মেঘনাদ সেই বলয় ভেদ করে ঢুকতে গেলেন, চিৎকার করে কিছু বললেন। প্রফুল্ল ঘুরেও দেখলেন না।

মেঘনাদ সারা জীবনে এত অপমানিত হননি। ক্ষমতাসালী চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের ইমেজ নিয়ে হীনমন্যতা আছে। কেন আছে, জানেন না। সব সময় মনে হয়, যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছেন না। অন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর চেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়ে গেলেন, বেশি অর্থোপার্জন করলেন, বেশি ভাল অ্যাকাডেমিক পেপার করে ফেললেন, কার্ডিওলজি সোসাইটির সেক্রেটারি হয়ে গেলেন। তিনি একটুর জন্যে ফার্স্ট হতে পারলেন না। ‘অনারেবল সেকেন্ড’ হয়েই রয়ে গেলেন।

এই কাল্পনিক ফ্রাঙ্কশন, এই বানানো হতাশা থেকে বেরোতেই তিনি এতকাল মেহলিকে ব্যবহার করে এসেছেন। সেটা যে মেহলি আর নীলিমা ধরে ফেলবে, এ তিনি ভাবতেই পারেননি। আরও হীনমন্যতায় ডুবে যাচ্ছেন মেঘনাদ। তাঁর চোখের সামনে সাংবাদিকদের ভিড় এড়িয়ে অ্যান্ডালুসিয়ার উঠে বিমানবন্দরে চলে গেলেন মেহলি। আর এখন... অবাক বিশ্বয়ে মেঘনাদ দেখলেন খবরের কাগজ, নিউজপোর্টাল আর টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে রুহি। মেয়েটা ইউক্রেনের কথা বলছে। অহমের কথা বলছে। ওদের ভালবাসার কথা বলছে। যুদ্ধের দিনগুলিতে প্রেমের আখ্যানের লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি স্মার্টফোন আর কম্পিউটারে।

মাথা নিচু করে অন্ধকারে মিশে গিয়ে ড্রাইভারকে ফোন করলেন মেঘনাদ। এখান থেকে দ্রুত পালাতে হবে। এবং স্পটলাইট থেকে দূরে থাকা অভ্যাস করতে হবে। অন্তত কিছু দিনের জন্যে...



রুহি

“বাস আর কেউ নেই, কিছু নেই শুধুই তুমি, শুধু

ধূ ধূ প্রান্তরে বনে কেবলই তুমি বরছে, শুধুই তুমি...”

তুমি পাতে কথা লিখেছেন কোন কবি? তিনি কি কিভের বরফ পড়া দেখেছিলেন না দার্জিলিং-এর? রোমানিয়ার নাকি কার্গিলের? মনে পড়ছে না। মাথার মধ্যে কেবলই তুমি বরছে, শুধুই তুমি...

ছায়া ছায়া কারা ঘুরছে চারিদিকে? ইউক্রেন সেনা, লাল ফৌজ? নাকি জলপাই রঙা উর্দি পরা ভারতীয় সেনা? সবুজ গাউন পরে ওরা কী করছে? নাতালি কোথায়?

মাথার ওপরে ওটা কী বলসে উঠছে? কামাকাজি? আবার হামলা শুরু হল? নাতালি কোথায়?

তীক্ষ্ণ, স্নায়ুভেদী আওয়াজ কোথা থেকে আসছে? মাথার ভিতর থেকে? না আকাশ থেকে? নাতালি কোথায়? বাস! আর কেউ নেই, কিছু নেই শুধুই তুমি...

ছবি স্পষ্ট হচ্ছে। ছবি নয়, পরাবাস্তব। পরাবাস্তব না বাস্তব? এটা একটা ঘর। এটা হাসপাতালের কেবিন। সাদা দেওয়াল, সাদা পর্দা, সাদা এপ্রন পরা সেবিকা, সাদা এপ্রন পরা চিকিৎসক, সাদা থান পরা মা।

মা? মা! মা...

কেবলই তুমি বরছে, শুধুই তুমি...

“আবার অজ্ঞান হয়ে গেল?” মায়ের গলা।

“তুমি থামো তো মাসি। তুমি যখন তখন এখানে এসো না তো! কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?”

“খুব সাবধান পূচকু! নেহাত আমার ছেলেটা সুস্থ হয়ে গেল তাই। না হলে বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর থাকা বের করে দিতাম।”

“উফ! তুমি থামবে?”

চোখ খুলল সমুদ্র। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন আশা। পরনে সাদা থানের ওপরে এপ্রন। মুখে মাস্ক। হাতে গ্লাভস। বয়সের তুলনায় বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছেন। মাথার চুল প্রায় সব পাকা। বড় বড় চোখে তাঁর বাবুয়াকে

দেখছেন। আবার সব বাপসা... আবার তুষার বরছে...

তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। চড়া রোদ উঠেছে। সাদা ঘরের সাদা বিছানায় শুয়ে সমুদ্র বলল, “আমি কোথায়?”

“শুরু হল ফিল্মি ডায়ালগ!” রেলিং দেওয়া বেডের পাশে দাঁড়িয়ে খুকখুক করে কাশল অহম, “ম্যায় কওন হুঁ? ম্যায় কাহাঁ হুঁ?”

ক্লান্ত চোখে অহমের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র বলল, “তুই ঠিক আছিস? আমরা কি কলকাতায়?”

“ইয়েস স্যার!” রুহি এসে দাঁড়িয়েছে অহমের পাশে। “এটা বেঙ্গল মেডিকাল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিট। আজ ৪ মার্চ। তুমি বাহান্ডর ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলে। সেই অবস্থায় রোমানিয়া থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতায় ফিরেছ। তোমার ব্রেনে সার্জারি হয়েছে। তুমি বারো ঘণ্টা ভেন্টিলেশনে ছিলো।”

এত তথ্য সমুদ্রের মাথা আত্মীকরণ করতে পারল না। সে চোখ বন্ধ করল। আবার যখন চোখ খুলল, তখন ঘরে আশা ছাড়া কেউ নেই। সমুদ্র বলল, “মা!”

ক্লান্ত সমুদ্র চোখ বুজল। চোখ খুলে দেখল মা আর নেই। দাঁড়িয়ে রয়েছে অহম আর রুহি। অহম বলল, “মায়ের সঙ্গে কথা হল?”

“মা...” ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সমুদ্র। আবার চোখ বুজল।

অহম আর রুহি ‘হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট’ বা ‘এইচ ডি ইউ’ থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে হেঁটে বাইরে যাচ্ছে। অহমের মনে পড়ছে গত ক’দিনের কথা...

*

সমুদ্র আর অহমকে প্রথমে ভর্তি করা হয়েছিল আইসিইউতে। সংবাদ মাধ্যমের আতস কাচের নীচে থাকা, ইউক্রেন ফেরত, অজ্ঞান ছাত্রদের নিয়ে বেঙ্গল মেডিকাল কলেজের ডিরেক্টর ঝুঁকি নেননি। ভর্তির পরে অবশ্য দেখা গেল যে অহমের চোট খুবই কম। কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা চোটের অভিধাত অজ্ঞান হয়েছে। মস্তিষ্কে কোনও সমস্যা নেই।

সমুদ্রের ক্ষেত্রে একদমই তা নয়। মস্তিষ্কে রক্তের ডেলা জমে ছিল। জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করলে আরও ভাল হত। আশা অনুমতি দেননি বলে সেটা করা যায়নি। মাথার চোট ছাড়াও সমুদ্রের ডান হাতের দুটি আঙুলে ফ্র্যাকচার ছিল। তার সঙ্গে ফ্রস্ট বাইট। আঙুলদুটো কালো হয়ে গিয়েছিল। ও দুটো কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

সফল অস্ত্রোপচারের পরেও সমুদ্র পুরোপুরি সুস্থ নয়। মানুষ চিনতে, কথা বলতে, চিন্তা ভাবনা করতে বা মনে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হবে বলা মুশকিল।

অহমকে এক দিনের মাথায় কেবিনে শিফট করানো হয়। তার পরের দিন ছুটি দেওয়া হয়। সমুদ্রকে আজই আইসিইউ থেকে এইচডিইউতে সরানো হয়েছে। সব ঠিক থাকলে কাল কেবিনে পাঠানো হবে।

করিডর থেকেই অহম আর রুহি দেখতে পেল, নীলিমা আর আশা গাছতলায় বসে কথা বলছেন। আশার মুখের সামনে নীলিমা মোবাইল ধরে আছেন। সেটা দেখে অহম বলল, “এই হল ভাল সাংবাদিকের নমুনা। একটা হিউম্যান স্টোরি সবার নাকের ওগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা কোনও নিউজ পোর্টাল, খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার কাল্টিভেট করল না। মা ডেস্কের লোক হয়ে স্টোরিটা তুলে নিল।”

“কী ব্যাপার?” জিজ্ঞাসা করল রুহি।

অহম বলল, “ওদের পাশে দাঁড়ালেই সব জানতে পারবি।”

ওদের আসতে দেখে হাসলেন নীলিমা। আশাকে বললেন, “সমুদ্রের বাবার কথা বলুন।”

আশা পান চিবোতে চিবোতে বললেন, “বাবুয়ার বাবার নাম প্রত্যয় সেন। ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল। দেখতে খুব সুন্দর ছিল, জানো তো! ওই যাকে তোমরা বলো টল, ডার্ক, হ্যাডসাম! ১৯৯৯ সালে কাগিল যুদ্ধে ও শহীদ হয়। তখন ওর বয়স বত্রিশ আর আমার ঊনত্রিশ। আমার পেটে তখন বাবুয়া। ছেলে কখনও বাপকে চোখের দেখা দেখেনি।”

“তারপর?”

“তারপর আর কী! জাতীয় পতাকায় মুড়ে ওর ডেডবডি এসেছিল। আকাশের দিকে তাক করে গুলি ছুড়ে সম্মান জানানো হয়েছিল। কাগজের প্রথম পাতায় ছবি বেরিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো ছবি। জলপাই উর্দি পরা জওয়ানের ছবি একদিকে। অন্যদিকের ছবিতে জাতীয় পতাকায় মোড়া কফিনে মাথা রেখে আমি কাঁদছি। পাড়ার লোকের মুখে সহানুভূতির

ফুলঝুরি। পরের দিন থেকেই সবাই সে সব ভুলে গেল।”

“একই ঘটনা আজও ঘটে,” আশাকে উসকে দিচ্ছেন নীলিমা, “সোশাল মিডিয়ায় আজ যে ট্রেন্ডিং, কাল তাকে আর পাওয়া যায় না।”

“মানুষ বদলায়নি গো!” ক্রোধে ঝিকিয়ে উঠেছে আশার চোখ, “আমাদের ভাব, ভালবাসা, রাগ, ঘোরা, বদম্যেশি— সব আগের মতো আছে। আগে ফেসবুক ছিল না বলে কেউ জানতে পারত না। এখন সবাই জেনে যায়।”

“সবাই প্রত্যয় আর আশা সেনকে ভুলে গেল। কিন্তু আশার জীবন তো থেমে থাকল না। তিনি কী করলেন?”

“বর শহীদ হলে কিছু সুবিধে পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান আর্মি আর রাজ্য সরকারের দয়ায় বেঙ্গল মেডিকাল কলেজে মহিলা পরিচালিত ক্যান্টিনে রান্না করার দায়িত্ব পেলাম আমি। গোদা বাংলায় রাঁধুনি। একগাদা মেয়েকে সকাল থেকে বকুনি দিয়ে কাজ করাতে হয়। বাচ্চা ডাক্তারগুলো আমার রান্না আর বকুনি খেয়ে বড় হয়। বড় হয়ে চাকরি করার জন্যে এখানে ফিরে এসে আবারও আমার খাবার আর বকুনি খায়। ওদের কাছে কোনও আবদার করলে ফেলতে পারে না। তাই রুহির মা যখন দিল্লি থেকে ফোন করে বলল যে অপারেশন করাতে হবে, আমি সোজা ‘না’ বলে দিয়েছিলাম। এখানকার ডিরেক্টরকে সবার সামনে ‘স্যর’ বলি। তবে একা পেলে ‘পুচকু’ বলে ডাকি। ওটাই ওর ডাকনাম। তো, পুচকু বলল, ‘তোমাকে ভাবতে হবে না। সব দায়িত্ব আমার।’ আমি তাই চিন্তা করিনি। ভিডিও কলের সময় ক্যামেরা অফ রেখেছিলাম। নোংরা রান্নাঘরের ছবি কী দেখাব বলো?”

“ঠিক আছে। এতেই হবে। পুচকু-র ব্যাপারটা লিখব না।” মোবাইলের অভিন্যে রেকর্ডার অফ করে বললেন নীলিমা।

আশা চলে যাচ্ছেন সমুদ্রের কাছে। সেদিকে তাকিয়ে নীলিমা বললেন, “মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে কত কিছু লুকিয়ে রাখতে হয় দেখলি? সমুদ্র এই কারণেই বাড়ির লোকের সঙ্গে কারও আলাপ করাত না।”

“কিন্তু আল্টিমেটলি আমরা জেনে গেলাম,” ফিচেল হাসি অহমের মুখে, “আমার আর রুহির খবরটাও তোমরা জেনে গেলে। কোনও দিন দেখবে, তোমার কোনও গোপন খবর সবাই জেনে গিয়েছে...”

অহমের কথা শেষ হওয়ার আগেই তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লাল বাতি লাগানো গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে নীলিমার দিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল বললেন, “ছেলে ঠিক আছে তো?”

নীলিমার মুখ মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিজেই সামলে নিয়ে বললেন, “অহমকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছে। তবে সমুদ্র এখনও ফিট হয়নি।”

“সব ঠিক হয়ে যাবে,” অহমের চুল ঘেঁটে প্রফুল্ল বললেন, “কী ক্যাপ্টেন, খবর কী?”

“ভাল,” শ্রাগ করল অহম, “যুদ্ধ থামার তো কোনও লক্ষণ দেখছি না। আমাদের কী যে হবে!”

“এত নেগেটিভ ভেবো না! এখনও ইউক্রেনে কিছু ভারতীয় ছাত্রছাত্রী রয়ে গিয়েছে। একজন ভারতীয় ছাত্র খারকিভে মারাও গিয়েছে। ওদের তুলনায় নিজের কপালটা দেখো। যুদ্ধ থেকে দূরে আছ। বন্ধুবান্ধবীরা সেফ। মায়ের রান্না করা খাবার খাচ্ছ। এটাই কি যথেষ্ট নয়?”

উদাস কর্তে অহম বলল, “বাবা-মা অনেক টাকা খরচা করে ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিল। বাবা যদি জানতে পারত যে আমি মাঝপথে চলে এসেছি, তা হলে কী ভাবত কে জানে!”

নীলিমা আর প্রফুল্ল পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রফুল্লর খুব ইচ্ছে করছে সন্তানকে জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু নীলিমার চোখের ইশারায় নিজেই সংযত করছেন, হাত এগিয়েও পিছিয়ে নিচ্ছেন, দ্রুত গাড়িতে উঠে দূরে চলে যাচ্ছেন। যাতে অশ্রু কেউ দেখতে না পায়।

রুহি অবাক হয়ে বলছে, “ব্যুরোক্রেটরা এত ইমোশনাল হয় নাকি? উনি গাড়িতে উঠে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলেন।”

কেউ কিছু বলার আগে আশা এসে বললেন, “তোমরা একটু ভেতরে চलो। বাবুয়া আবার খাপামো করছে।”

“কী হল?” জিজ্ঞাসা করল রুহি।

“ও আজ প্রথম বুঝতে পেরেছে যে ডান হাতের দুটো আঙুল আর নেই। খুব চৈচাচ্ছে।”

অহম আর রুহি দৌড়ছে। এই গন্ডগোলটা যে হবে ওরা জানত। একটা চটজলদি সমাধানও ভাবা আছে।

এইচডিইউ-এর বিছানায় উঠে বসেছে সমুদ্র। হাত থেকে খুলে

ফেলেছে স্যালাইনের সূচ। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে টপটপ করে। সে পাগলের মতো চিৎকার করছে, “মা, ডাক্তারদের বারণ করলে না কেন? কাটা হাত নিয়ে আমি কী করে সার্জন হব?”

“বাদ না দিলে হত না বাবুয়া!” ছেলেকে জড়িয়ে ধরে শোয়ানোর চেষ্টা করছেন আশা। অহম বলল, “তোমার আঙুলে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রদা!”

সমুদ্র এক বাটকায় আশাকে সরিয়ে বলল, “আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। আমি মরে যেতে চাই। জাস্ট মরে যেতে চাই।”

“তা হলে আমার কী হবে সমুদ্র?” ইউক্রেনের অ্যাকসেন্টের বাংলা শব্দমালায় ভরে যাচ্ছে ঘর। সমুদ্র অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর বলছে, “না তালি এসেছে? ও কোথায়?”

“এসেছি। আবার আসিওনি,” হাসছে না তালি, “সব সময় কি আর ফ্লাইট ধরে উড়ে আসা যায়? আপাতত আমি কিভেই রয়েছে। অহমের মোবাইলে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার, না?”

সমুদ্র শান্ত হয়ে আসছে। বিছানায় বসে হাত পেতে নিচ্ছে অহমের স্মার্টফোন। পর্দায় দেখা যাচ্ছে না তালির মুখ। সে পরে আছে সেনার পোশাক। হাতে একটা গ্রেনেড। মুখে এক গাল হাসি।

“কেমন আছ?” জিজ্ঞাসা করল সমুদ্র।

“বাড়ির বোটাছেলেরা যুদ্ধে গিয়েছে। আমিও আর্মিতে নাম লিখিয়েছি। ট্রেনিং চলছে।” হাতে ধরে থাকা গ্রেনেড উচিয়ে দেখায় না তালি, “এখানে খুব বরফ পড়ছে। তাও যুদ্ধবিরতির লক্ষণ নেই। পুতিন বিমান হানা চালিয়েই যাচ্ছে।”

“আমার আঙুল কেটে বাদ দিয়েছে না তালি,” কাঁদছে সমুদ্র, “আমি আর সার্জন হতে পারব না।”

“তাই?” খিলখিল করে হাসছে না তালি, “আমি হয়তো ডাক্তারই হতে পারব না। আমি হয় তো বেঁচেই থাকব না। আমার হয়তো তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না।”

“বোলো না! প্লিজ! ও কথা বোলো না,” শিশুর মতো চোঁট ফুলিয়ে আবদার করল সমুদ্র।

খিলখিল করে হেসে না তালি ভেংচি কাটল, “তুমিও ও কথা বোলো না! প্লিজ!”

“ভাটা!” লজ্জা পেয়েছে সমুদ্র। চোখের জল মুছছে।

“কোনও কিছু হতে পারাটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তোমার যা আছে, সেটা নিয়ে খুশি এবং সুখী থাকা। জীবন তোমাকে লেমন দিয়েছে, তুমি লেমনেড বানাও। সার্জন হতে পারবে না তো কী হয়েছে? মেডিসিনের ডাক্তার হও। আরও তো কত সাবজেক্ট পড়ে আছে। তাই না?”

সমুদ্র চুপটি করে বসে।

না তালি বলল, “কী ভাবছ?”

“তুমি ঠিকই বলেছ,” মেনে নিয়েছে সমুদ্র। তার আচরণে এর মধ্যেই বদল এসেছে। সেই খ্যাপামো আর নেই। এখন সে আগের সমুদ্র। ধীর, স্থির, যুক্তিবাদী, সবার খেয়াল রাখা সমুদ্র।

“আমি কিন্তু মাসখানেক পরেই কলকাতা যাচ্ছি,” সাফ জানিয়ে দিল না তালি।

“কেন?” চমকে উঠেছে সমুদ্র।

“বাহ! তোমাকে দেখতে যাব না? তা ছাড়া আমার বাড়িঘর কেমন হবে সেটাও ‘রেকি’ করতে হবে তো!”

আশা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছেলেকে দেখছিলেন। এবারে মোবাইল-ক্যামেরার লেন্সের আওতার মধ্যে ঢুকে হাত নেড়ে বললেন, “কেমন আছ?”

“হাই আন্টি!” হাত নাড়ল না তালি, “আমি কলকাতা আসছি।”

অহম বুঝতে পারল, তার সঙ্গে আলাপ না করালেও না তালির সঙ্গে

মায়ের আলাপ সেরে রেখেছিল সমুদ্র।

আশাকে লেন্সের বাইরে সরিয়ে সমুদ্র বলল, “তোমাকে আসতে হবে না। আমিই সুস্থ হয়ে কিভে ব্যাক করছি।”

“না, আমি যাব।”

“ঝগড়া করতে হবে না,” আবার লেন্সের মধ্যে মুখ গলিয়েছেন আশা, “তোমরা কেউ জানো না যে অহম আর রুহিকে নিয়ে কাগজ আর টিভি দিনরাত খবর করে যাচ্ছে। আমি কি ওদের বলব যে তোমাদের লভ স্টোরিটা বেশি ভাল?”

“দূর হও,” আশাকে আবার লেন্সের বাইরে সরিয়ে দিয়েছে সমুদ্র। আশা কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। অহম আর রুহি দেখছে যে, পাতলা একটি পর্দার দু’দিকে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে আর হাত নাড়ছে। না তালি এক মুঠো বরফ ছুঁড়ে দিয়ে বলছে, “কতভাবে তোমাকে ভালবাসা যায়, সমুদ্র? এই যে হ্যাণ্ড গ্রেনেডটা দেখছ, এটার পিন আমি দাঁত দিয়ে খুলে শত্রুপক্ষের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার আগে তোমাকে চুমু খেতে চাই। লম্বা, দম আটকে আসা, নিজেকে উজাড় করে দেওয়া একটাই চুমু। তুমি সহ্য করতে পারবে?”

কেবিনের মধ্যে তুষার পড়ছে। পোশাক থেকে বরফ ঝেড়ে সমুদ্র বলছে, “পারব! পারব! তোমার দিবি, পারব!”

ছোঁরো রুগির মত ভুল বকছে সমুদ্র। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বিভ্রিড় করছে, “ভালবাসার লড়াই কখনও শেষ হয় না, জানো তো না তালি? যারা ভালবাসে তারা সবাই যোদ্ধা। তোমার মতো। তুমি কাদিরভ কাকার দিকে ভালবাসার মিসাইল ছুড়ে মারো। উনি ভাল হয়ে যাবেন।”

“কাদিরভ কাকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। হি হ্যাঞ্জ ভ্যানিশড উইথ ফ্যামিলি।”

“তোমার অনেক দায়িত্ব না তালি। তোমার পাশের বাড়ির যে বৃদ্ধ মানুষটি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, তাঁকে ভালবাসা খুঁজে দাও। যে মহিলা এই মুহূর্তে ধর্মিতা হচ্ছেন, তিনি কারও প্রেমিকা। ওঁদের প্রেম আগুনের মতো পবিত্র। ওঁরা বেঁচে থাকুন। যে-রাশিয়ান জেনারেল এখন বিমান হামলার খসড়া তৈরি করছেন তাঁকে প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরতে পাঠাও। ওঁরা নীলনদ দেখেননি, থর মরুভূমি দেখেননি, হিমালয় দেখেননি...”

হাতে ধরা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে সমুদ্র বলে চলেছে, “আমাদের সবাই মিলে একে অপরকে জাপটে ধরে থাকলে ওদের নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড উড়ে যাবে, চুমুর অভিঘাতে ধ্বংস হবে বোমারু বিমান। আমাদের আনন্দ-হরমোনের বন্যায় সমস্ত ওয়াচ টাওয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ-পরিকল্পনা বানচাল হবে। ও পুতিন, আপনি বরং একটা বরফপুতুল বানান। ও জেলেনস্কি, আপনি আজ রাতে স্ত্রীকে ডিনার রন্ধে খাওয়ান। বিশ্বাস করুন, খুব আনন্দ পাবেন। আপনাদের মনের মধ্যে ভালবাসার যে গাছটা মরে যাচ্ছে, তাতে জল দিন। প্লিজ...”

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ:

‘অপারেশন গঙ্গা’ নামে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের পটভূমিতে এই উপন্যাস। প্লাদিমির পুতিন, ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং আরও কয়েকজন বিদেশি রাষ্ট্রনেতার নাম এই উপন্যাসে ব্যবহার করা হলেও বাকি সমস্ত চরিত্রদের নাম, পেশা, বাসস্থান; চিকিৎসা সংক্রান্ত, পুলিশি এবং আইনি কার্যকলাপ লেখকের কল্পনাপ্রসূত। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, সংগঠন বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কোনও রকমের সাদৃশ্য একান্তই কাকতালীয়।

জন লেননের লেখা একটি গানের চারটি লাইন ও তুষার রায়ের কবিতার কয়েকটি পংক্তি এই উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে।





নব আনন্দে জাগো

সচরাচর শাড়ি না পরলেও, আনন্দলোক-এর পূজো সংখ্যার শাড়ি শুটের প্রস্তাব বেশ খোশমেজাজেই গ্রহণ করেন বলিউডের নতুন সেনসেশন **নোরা ফতেহি**। যদিও শুটটা কেমন হবে তা নিয়ে একটা দ্বিধাবোধ ছিলই। পুরোটা নজরবন্দি করলেন আসিফ সালাম

নোরা ফতেহির শাড়ির শুট, তাও আবার পূজাবার্ষিকীতে? অনেকেই হয়তো ‘ডালিং কুইন’ নোরা ফতেহির শরীরী বিভঙ্গের সঙ্গে বাঙালি শাড়ির কবিশৈল্য ভাবতে পারবেন না। তবে আনন্দলোক ভেবেছে। প্রথমদিকে নোরার নিজের কিছুটা দ্বিধাবোধ থাকলেও, সেটা কাটিয়ে স্বমহিমায় ধরা দেন তিনি। শুটিং ভেনুতে কিছুটা দেরিতে পৌঁছালেও, মেকআপ অ্যান্ড চেঞ্জ একেবারেই সময় নেননি নোরা। প্রথমেই তাঁর জন্য রাখা ছিল সাদা-লাল সাবেক কাতান বেনারসি। সোনালি জরির ক্লাসিক কাড়ওয়া বুটি পুরো শাড়িটিকে একটা আলাদা সৌন্দর্যে মুড়ে দিয়েছে। শাড়িটির রূপ আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে সোনালি-রূপোলি-লালের কবিশৈল্যে মানানসই পাড় ও আঁচলের ছোঁয়ায়। শুটের সময় ফ্লোরে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়ায়, পুরো লুকটায় একটা পূজো-পূজো আবহও গড়ে ওঠে।

ব্লাউজ: টু ব্রাউনস
গয়না: কিউরিয়ো কটেজ

নোরার দ্বিতীয় লুকের জন্য
বাছা হয় প্যারট থ্রিন স্যাটিন
সিল্কের বেনারসি। শাড়িতে
ছোট-ছোট মুখল বুটি, সঙ্গে
জরির পাড় ও আঁচলে ফ্লোরাল
মোটফ বিশেষ নজর কাড়ে।
এই শুটের আগে টানা এক
সপ্তাহ নোরা গোয়াতে শুট
করছিলেন। সকালে গোয়া
থেকে মুম্বইয়ের ফ্লাইট নিয়ে
সরাসরি হোটেলে পৌঁছেছিলেন
নোরা। তাই তাঁর ক্লান্তি থাকা
স্বাভাবিক। কিন্তু নোরা জানান,
এই সব সুন্দর শাড়ি তাঁর ক্লান্তি
দূর করে দিয়েছে।

ব্লাউজ: টু ব্রাউন
গয়না: কিউরিয়ো কটেজ

নোরার তৃতীয় লুকে ছিল
টারকোয়েজ নীল কাতান
সিল্কের বেনারসি। শাড়ির
জমিতে ছোট-ছোট সোনালি
ফ্লোরাল বুটি, সঙ্গে কনট্রাস্টিং
গোলাপি ফ্লোরাল পাড় ও
আঁচল। এই শাড়িটি পরার
পরে নোরা জানান, ফেস্টিভ
শাড়ি যে এতটা লাইট হতে
পারে তা তিনি কল্পনাও
করতে পারেননি! এর আগে
নোরা শাড়ি পরলেও এতটা
কমফোর্ট ফিল কখনও করেননি,
এমনটাই জানান বলিউডের
এই নতুন সেনসেশন।



ব্লাউজ: অরোকা অফিশিয়াল
গয়না: কিউরিয়ো কটেজ

রূপোলি জরি ও হলুদের
যৌথতায় তৈরি এই শিফন
বেনারসিতে নোরা কে দিয়া
লাগছিল। শাড়ি জুড়ে জাল
ডিজাইন, ভারী আঁচল
ও পাড়। এছাড়া আলাদা
করে ছোট গোলাপি জরির
বুটিতে হ্যান্ড পেটেড
ডিটেলিং শাড়ির সৌন্দর্য
বাড়িয়ে দেয়। এই শেষ
লুকের আগে নোরা বেশ
কিছুটা আবেগতড়িত হয়ে
পড়েন। শুট শেষে ভিডিয়ো
বাইটে তিনি স্বীকারও
করেন যে, কেরিয়ারে
বহু ফোটোশুট করে
থাকলেও, আনন্দলোক-এর
পুজোসংখ্যার জন্য করা এই
শুট তাঁর স্মৃতির এক বিশেষ
জায়গা জুড়ে থাকবে।

ফোটো: তেজস নেররকর
মেকআপ: রেশমা মার্চেন্ট
হেয়ার: মাধব
স্টাইলিং: আয়েশা দেশমুখ
হসপিট্যালিটি: ফেয়ারফিল্ড
বাই ম্যারিয়ট, মুম্বই

শাড়ি সৌজন্য আনন্দ

কুইল ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ব্লাউজ: মেডুসা ব্লিঙ্ক টোয়াইস
গয়না: কিউরিয়ো কটেজ



আনন্দ সাজ

রকুল প্রীতের শাড়ি প্রীতি

শাড়ির প্রতি তাঁর
প্রেম বহুকাল ধরে।
তাই আনন্দলোক-এর
পূজোসংখ্যার জন্য শাড়ি
পরে শুট করার ক্ষেত্রে
তাঁর উৎসাহ ছিল তুঙ্গে।
রকুল প্রীত সিংহ-র
শাড়ি প্রীতি ধরা পড়ল
ক্যামেরার সামনে

রকুল প্রীত সিংহ ব্যক্তিগতভাবে
শাড়ি পরতে খুব পছন্দ করেন।
যে-কোনও অনুষ্ঠান হলে তিনি নাকি
শাড়িটাই প্রেফার করেন। একবার
বন্ধুদের সঙ্গে নাইটক্লাবে যাওয়ার
প্ল্যান ছিল, সেখানেও নাকি শাড়ি
পরেই পৌঁছে গিয়েছিলেন! তো
তিনি যখন শুনলেন আনন্দলোক-
এর পূজো সংখ্যার জন্য শাড়ি
পরে ফোটোশুট করতে হবে,
হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও ঠিক সময়
বের করে নিলেন। আর শুটের
কলটাইমের দশমিনিট আগেই শুটিং
স্পটে পৌঁছে গেলেন! রকুলের
জন্য প্রথমেই রাখা ছিল সি-গ্রিন
শিফন বেনারসি। শাড়ি জুড়ে জরির
জিওমেট্রিক ডিজাইন, সঙ্গে গোলাপি
জরির পাড়ে ফ্লোরাল মোটিফ ও
একইরকমের আঁচল। শুরুতেই
এরকম শাড়ি দেখে রকুলের মন
খুশিতে ভরে ওঠে!

ব্রাউজ: সুপ্রিয়া মুঞ্জল
গয়না: পার্থ জুয়েলস

প্রথম শটের জন্য রেডি হয়েই রকুল
জানান, তিনি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং
করছেন। এবং এখন তাঁর লাঞ্ছের
সময় হয়ে গিয়েছে। খুব খিদেও
পেয়েছে। সাধারণত অন্যান্য বলিউড
সেলিব্রিটিদের জন্য যা ব্যবস্থা থাকে,
এখানেও তাই ছিল। সেলেব তাঁর
সুইট রুমে বসে লাঞ্ছ করবেন আর
ক্রু নীচে রেস্টরাঁতে। কিন্তু রকুল
স্পষ্ট জানান, তিনি শুটিংয়ের বাকি
সদস্যদের সঙ্গে নীচে রেস্টরাঁতেই
লাঞ্ছ করবেন। রকুলের সেকেন্ড
লুকের জন্য ছিল মেরুন তসর
বেনারসি, পাড়ে বালুচরি মোটিফ।
ট্রাইবাল ও বাঁধনি স্টাইলে বোনা
আঁচলে দেখা যায় নানা
রঙের বাহার।

ব্লাউজ: সূতা
গয়না: প্যারেক জয়েলস
আংটি: সিলভার স্ট্রিক

রকুলের জন্য যা-যা শাড়ি বাছা
হয়েছিল, তার মধ্যে এই হলুদ
কাতান বেনারসি ছিল তাঁর
সবচেয়ে প্রিয়। সোনালি জরির
পাড়ের সঙ্গে মুঘল মীনাকারি
কাজের আঁচল দেওয়া এই
শাড়ির মোহ থেকে রকুল
কিছুতেই বেরোতে পারছিলেন
না। এমনিতেও তিনি জানান,
হলুদ তাঁর প্রিয় রঙ।

রাউজ: সুতা
গয়না: জশনা অগ্রওয়াল

শেষ লুকের জন্য বাছা হয়েছিল পিচ
রঙের কাতান বেনারসি। শাড়িটি
বেশ কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে ফিল
করেন রকুল। জানান, এত সফট
বেনারসি তিনি খুব কমই দেখেছেন।
ক্লাসিক মীনাকারি বুটি, তাও আবার
সোনালি জরির কাজে মোড়া,
এটাই ছিল শাড়িটির ইউএসপি।
শুট শেষে রকুল বারবার অনুরোধ
করেন, ছবিগুলো প্রকাশিত হয়ে
যাওয়ার পর তাঁকে যেন দেওয়া হয়।
ফ্রেম করে তিনি বাড়ির দেওয়ালে
ছবিগুলো টাঙাতে চান। কারণ শাড়ি
পরে তাঁর এত ভাল ছবি আগে নাকি
কখনও তোলা হয়নি!

ব্লাউজ: সুতা
গয়না: অ্যাকোয়ামেরিন

ফোটো: পল ডেভিড মার্টিন
মেকআপ: মহম্মদ সাকলিন আনসারি
হেয়ার: বিপাশা শেখ
স্টাইলিং: রচিকা জালান
হসপিটালিটি: গ্র্যান্ড হায়াত, মুম্বই
শুটিং কো-অর্ডিনেশন: আসিফ সালাম ও
অংশুমিত্রা দত্ত

শাড়ি সৌজন্য
আনন্দ

কুইন্স ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫



আনন্দ সাজ

লখনউয়ের বাঙালিবারু

উত্তরে জন্ম, পশ্চিমে কর্ম।
কিন্তু আলি ফজল
মনে-মনে বেশ বাঙালি।
সেই বাংলাপ্রীতি খুঁজে
পেতেই একদিন পুরোপুরি
বাঙালি সাজে ক্যামেরাবন্দি
করা হল তাঁকে।
সঙ্গী অংশুমিত্রা দত্ত

আনন্দসাজের জন্য আলি ফজলের সময় পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ তিনি তখন টানা দেড়মাস দেশের বাইরে। কখনও কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত, কখনও জেরার্ড বাটলারের সঙ্গে বিগ বাজেট হলিউড ছবি ‘কান্দাহার’-এর প্রচারে লন্ডনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সময়ের অভাবে ‘ফুকরে ৩’-এর কাজও ছেড়ে দিয়েছেন, এমন ব্যস্ততা। বিভিন্ন পত্রিকার শুট বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তবু কোনও অজ্ঞাত কারণে আনন্দলোকের এই বিশেষ শুটটি করার জন্য প্রথম থেকেই খুব আগ্রহী ছিলেন তিনি। এবং দিন নির্ধারণ করতে না পারলেও শুট কোনও মতেই বাতিল করতে চাইছিলেন না। যাই হোক, শুটের আগের দিন একটি বিজ্ঞাপনের শুট চলাকালীন তাঁর ভ্যানিটিতে প্রথম যখন পাঞ্জাবি ট্রায়াল দিলেন, মুহূর্তে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। ‘দুলাহা লগ রহা হুঁ না ম্যায়?’ প্রশ্ন করলেন, নিজের ইউনিটের লোকদের ডেকে দেখালেন। প্রথমেই যে পাঞ্জাবিটা তাঁর নজর কাড়ল, তা কালো সিল্কের উপর লাল ও সবুজ সুতোর এমব্রয়ডারি করা। সঙ্গে সরু পাড়ের ঘিয়ে ধুতি।

পরদিন সকালে শুটিং ক্রু-এর
কলটাইম ছিল সকাল সাড়ে আটটা,
আলিকে বলা হয়েছিল ন'টায়
আসতে। এমনিতে সেলেব্রিটিদের
সঙ্গে শুটের অভিজ্ঞতা থেকে বলি,
কখনওই তাঁরা সময়ে এসে পৌঁছোন
না। অনেকক্ষেত্রে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা
পেরিয়ে যায়। কিন্তু ক্রু পৌঁছোতে
না পৌঁছোতে আলি চলে এলেন দুম
করে! পৌনে ন'টায় ঢুকে বললেন,
“সরি, আমি পনেরো মিনিট দেরিতে
এলাম।” সকলে যখন অবাক হয়ে
তাকিয়ে, তখন আলি বললেন,
“আমি আসলে ন'টা বলতে বুঝেছি
ন'টায় মেকআপ করে, পোশাক
পরে পুরো তৈরি হয়ে ক্যামেরার
সামনে দাঁড়াব।” আলির মধ্যে একটা
বাঙালিসুলভ আন্তরিকতা থাকলেও
তিনি যে সময়জ্ঞানে বাঙালি নন,
বোঝা গেল। চটপট তৈরি হয়ে এলেন
বেনারসি সিল্কের ছোট বুটির সেলফ
ডিজাইনের পেস্তা সবুজ পাঞ্জাবি এবং
সাদা আলিগড়ি পাজামায়।

‘মির্জাপুর ৩’-এর জন্য যে পেশিবহুল চেহারা তিনি বানিয়েছিলেন, হলিউডের ছবির জন্য কয়েক মাসেই তা বারিয়ে ফেলেছেন। তবু লম্বা চওড়া চেহারার সুপুরুষ আলি নিমেষে স্পটলাইট কেড়ে নেন নিজের দিকে। বললেন, বছরের শেষের দিকে একটি বিগ বাজেটের ছবির জন্য তাঁকে চুল লম্বা করতে হবে বলে চুল কাটতে পারছেন না। চুলের ব্যাপারে তিনি নাকি নিজের দিদার ধাত পেয়েছেন, ৮০ পেরিয়েও যাঁর চুল নাকি কালো এবং ঘন। আলির মধ্যে একটা অ্যাভোজিনাস ব্যাপার রয়েছে। তাই প্রতিটি লুকের সঙ্গেই মানানসই রুপোর হার, অ্যাংক্রেট, নাকছাবি পরলেন পছন্দমতো। নিজের পৌরুষ সম্পর্কে প্রত্যয়ী না হলে এমন ক্রস ড্রেসিং করা সম্ভবও হয় না। অফ হোয়াইট সিল্কে গলা ও বুকে মেরুন ও নীল ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি করা পাঞ্জাবির সঙ্গে চওড়া নীল পাড়ের সাদা ধুতিটি তাঁর সবচেয়ে পছন্দের লুক। সঙ্গে পরলেন ছোট্ট নাকছাবি।

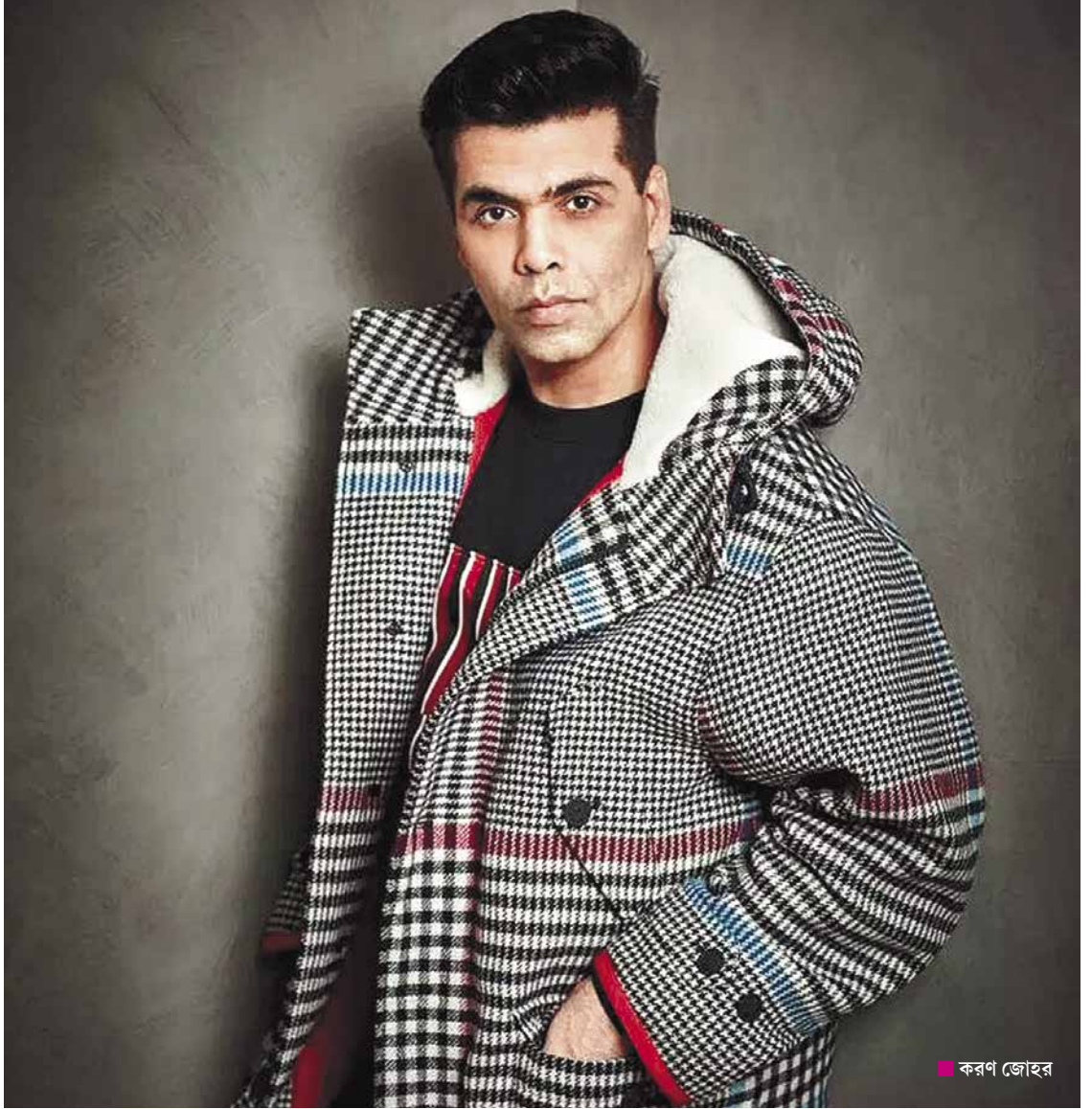


কালো সিল্কের জমি জুড়ে ধূসর সূতো দিয়ে জাল ডিজাইনের এমব্রয়ডারি করা পাঞ্জাবির সঙ্গে লাল ধুতি, আলি পায়ে পরলেন রূপোর অ্যাংক্রেট। তাঁর আগুসহায়ক এবং মেকআপ আর্টিস্টের মত, এমনিতে পোশাক নিয়ে নাকি ভীষণ খুঁতখুঁতে আলি। কিন্তু আনন্দলোকের এই শুটের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নাকি তাঁর হৃদয়ের তার কোথাও একটা জুড়ে গিয়েছে। তাই মুড়ি মানুষটার মেজাজ ফুরফুরে। কারণটা তাঁদের কাছেও ‘অজ্ঞাত’। নিজেই শটের আগে পছন্দের গান চালাচ্ছেন, মীনাকুমারীর গলায় গাওয়া কিছু গজলের ব্যক্তিগত কালেকশন শোনালেন। শট দিতে-দিতে নানা ভঙ্গিমায়ে পোজ দিলেন, নাচের মুদ্রা করলেন... আলি নাকি ছোটবেলা থেকে সত্যজিৎ রায়ের ছবির ভক্ত। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক ত্রীয়ার ছবি তাঁর এতই পছন্দের যে বাঙালিদের প্রতি একটা আলাদা ভালবাসা জন্মে গিয়েছে। আনন্দলোককে জানালেন, “আপনাদের ওখানে যত ভাল পরিচালক আছেন, সকলকে প্লিজ বলবেন আমি বাংলা ছবিতে কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী। কেউ যোগাযোগ করতে চাইলে আপনাদের যেন অবশ্যই জানান...!” আর আনন্দলোকের জন্য বার্তা, “পরের বছর আপনাদের পত্রিকার ৫০ বছরের পার্টিতে কিন্তু আমি যাব। এই শুট দিয়ে বন্ধুত্বের শুরু...”। আলির বাঙালিয়ানা এবং পেশাদারিত্বে আমরা মুগ্ধ হলাম।

ফোটো: পল ডেভিড মার্টিন
মেকআপ: আরবাজ আলি
স্টাইলিং: আয়েশা দেশমুখ
জুতো: রিগাল ফুটওয়াল
গয়না: আশপালি জুয়েলস
লোকেশন: ভাইরাল ভিশন, অক্ষের

পোশাক সৌজন্য
আনন্দ

কুইন্স ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫



■ করণ জোহর

আমার অনেকের কাছে অনেক কিছু প্রমাণ করার ছিল: করণ জোহর

তিনি সচারচর সাক্ষাৎকার দিতে চান না। সম্প্রতি মুম্বইতে ‘রকি রানি কী প্রেম कहानी’র সাফল্য উদযাপনের অনুষ্ঠানে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই মিলে যায় তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ। **করণ জোহর**-এর মুখোমুখি আনন্দলোক

মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশেই অবস্থিত শহরের অন্যতম নামজাদা পাঁচতারা হোটেলে ‘রকি অউর রানি কী প্রেম कहानी’র সাফল্য উদযাপনের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানেই

অনেক কসরত করে একান্তে ধরা গেল তাঁকে। ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রভাবশালী প্রযোজক-পরিচালক বলে কথা, তার উপর আবার বাইরে থেকে শোনা যায়, তাঁর নাকি অ্যাটিটিউড প্রবলেমও আছে। আগে

প্রেস কনফারেন্সে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলো, আরও কয়েকটি প্রশ্ন ছিল লিস্টে। তাই সাহস করে তাঁকে যখন সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাপ্রোচ করা গেল, হোটেলের লবিতে হাঁটতে-হাঁটতেই কথা বলা শুরু করে দিলেন তিনি! মনেই হল না, এই মানুষটার নাম করণ জোহর। ইন্ডাস্ট্রির ‘স্টার মেকার’।

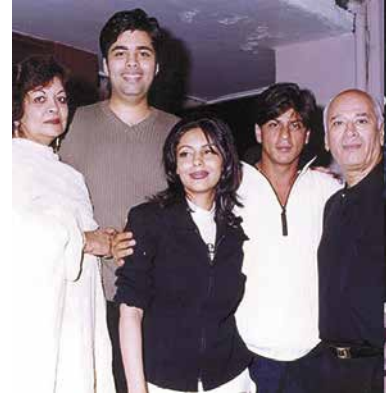
প্রথমেই অনেক শুভেচ্ছা ‘রকি অউর রানি কী প্রেম कहानी’র সাফল্যের জন্য। আর একই সঙ্গে ধন্যবাদ বাঙালি সংস্কৃতিকে এত সুন্দরভাবে বড় পরদায় ফুটিয়ে তোলার জন্য...

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন এই ছবির সাফল্যের অংশ হতে। বাঙালি সংস্কৃতি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেটা যদি আপনার ভাল লেগে থাকে তা হলে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব পাবে এই ছবির রাইটার ঈশিতা মৈত্র, সুমিত রায় এবং শশাঙ্ক খৈতান। ঈশিতার স্বশুরবাড়ি কলকাতায়, সুমিত তো নিজেই বাঙালি আর শশাঙ্কের

করতে পারে (হাসি)। আদি ইজ্ঞ আ ডার্লিং।

রকি আর রানি-র কাস্টিং তা হলে কে করেছিলেন?

ওটা আমি করেছি। লকডাউনের সময় আমার জীবনে একটা খুব রাফ ফেজ চলছিল। হঠাৎ করেই এইসব মুভি মাফিয়া, লবি, পক্ষপাতিত্ব নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল। এই সময়টা আমার মাকে খুব এফেক্ট করেছিল। মা নিয়মিত টেলিভিশনের খবর দেখেন, সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটেন। তিনি যখন প্রত্যেকদিন দেখছেন তাঁর ছেলেকে নিশানা করে যা নয় তাই বলে আক্রমণ করা হচ্ছে, স্বভাবতই আর পাঁচজন মায়ের মতো তিনিও ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ওই



■ প্রথমদিকে মা, বাবা, শাহরুখ ও গৌরীর সঙ্গে

“লকডাউনে আমার জীবনে একটা খুব রাফ ফেজ চলছিল। মুভি মাফিয়া, লবি, পক্ষপাতিত্ব নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল। এই সময়টা আমার মাকে খুব এফেক্ট করেছিল।”



■ ‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে’ ছবিতে অভিনেতা করণ জোহরকে দেখা গিয়েছিল

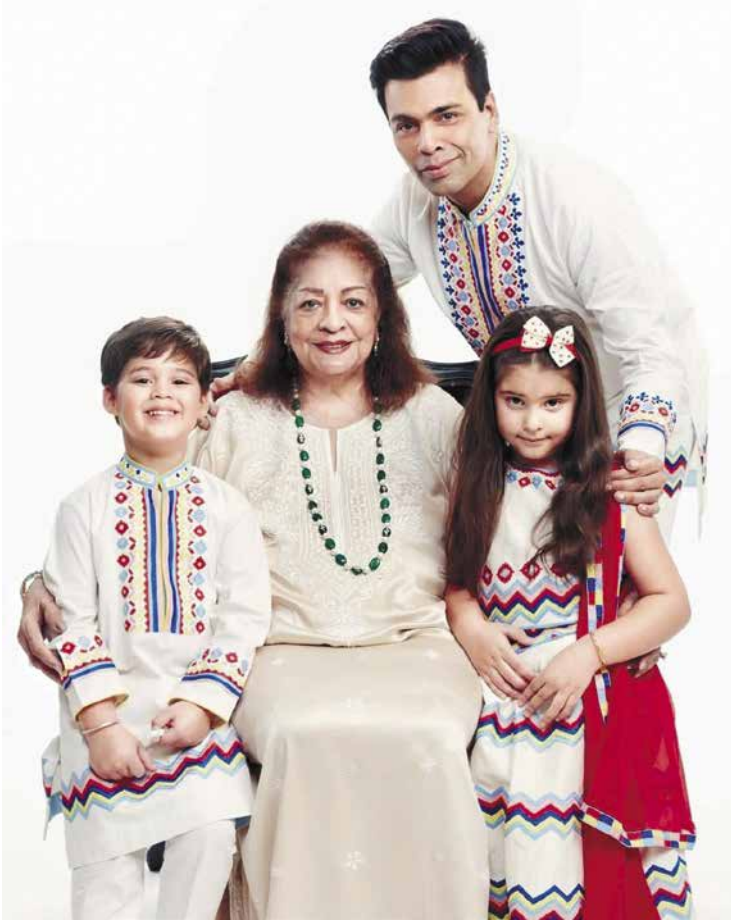
ছোটবেলার অনেকটা সময় আপনাদের শহরেই কেটেছে। তাই বাঙালি সংস্কৃতিকে খুব নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে ওরা। এছাড়া আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয় টোটো (রায়চৌধুরী) ও চুণীর (গঙ্গোপাধ্যায়) কথা। ওদের চেয়ে বেটার এই চরিত্র আর কেউ করতে পারত না। এখানে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মাকে। একমাত্র ‘রকি’ ও ‘রানি’র চরিত্র দুটো বাদে সব কাস্টিংই শানু করেছেন। শানু কিন্তু শুধু যশ রাজ ফিল্মস-এর জন্যই কাস্টিং করে। আদির (আদিত্য চোপড়া) নির্দেশ আছে, আমি যে ছবি পরিচালনা করব শুধু মাত্র সেই ছবির জন্য ও কাস্টিং

পিরিয়ডে নিজেকে শান্ত রাখার জন্য আমি বেশিরভাগ সময়ই নিজের রুম থাকতাম। তখনই আমি ‘রকি অউর রানি...’র গল্পের আউটলাইনটা লিখতে শুরু করি। তারপর সেটাকে পরিপূর্ণতা দেয় সুমিত, ঈশিতা আর শশাঙ্ক। গল্পটা মাথায় আসতে প্রথমেই আমি দুটো লোককে ফোন করি, রণবীর সিংহ এবং আলিয়া ভট্ট। কারণ আমার মনে হয়েছিল, এই দু’জন ছাড়া রকি ও রানিকে কেউ এত ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। আলিয়া তো ঘরের মেয়ে, ইন ফ্যাক্ট আমি ওকে ধর্মা প্রোডাকশনস-এর অংশ হিসেবেই মনে করি। রণবীরের সঙ্গে প্রথমবার কাজ করলাম। তবে দু’জনেই

গল্পের ওয়ান লাইনার শুনে কয়েক মিনিটের মধ্যে ছবিটা করতে রাজি হয়ে যায়।

রণবীর কপূরের সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন আগে। রণবীর সিংহের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

কপূর বরাবরই ভীষণ শান্ত ও কম্পোজড। সেটে এসে চুপচাপ নিজের কাজটা ডেলিভার করে। সিংহ বাইরে থেকে কীরকম সেটা আপনারা সকলেই জানেন। সবসময় হাই অন এনার্জি। এক্সাইটমেন্ট ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু সিংহ মানুষটা ভিতর থেকে একেবারে অন্যরকম। ও যখন নতুন কোনও ছবির কাজ শুরু করে, তার আগে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা বসে সেই চরিত্রটা নিয়ে ভাবে, স্টাডি করে। ইন ফ্যাক্ট ‘রকি অউর রানি...’র প্রথম দিন যেটা দিয়ে শুট শুরু হয়, সেটা ছিল রানির অফিসে রকির সঙ্গে দেখা হওয়া। কিন্তু শেডিউল অনুযায়ী প্রথমদিন অন্য একটি সিনের শুট করার কথা ছিল। কিছু কারণে লাস্ট মোমেন্টে সেটা চেঞ্জ করা হয়। রণবীর যখন সেটা জানতে পারে তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। ওর শরীরীভাষায় একটা অস্বস্তি ধরা পড়ে। আমি আলাদা করে ওর সঙ্গে গিয়ে কথা বলি। ও বলে, ‘করণ, এই সিনটা করার জন্য আমি এই মুহূর্তে প্রস্তুত নই। কারণ আমি অন্য একটি সিনের জন্য হোমওয়ার্ক করে এসেছিলাম। আই নিড সাম টাইম। এটা এমন হয়েছে যে আমি জিওগ্রাফি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি আর পরীক্ষার হলে ঢুকে দেখছি ফিজিক্স পরীক্ষা!’ আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম রণবীরের কথাগুলো শুনে। তাও ওকে আমি ঘণ্টা দুয়েক সময় দিই। পরে উপলব্ধি করি, ওর কাজ করার স্টাইলটাই ওরকম। কোনও সিনের আগে নিজের মধ্যে



করেছিল। এগুলোর বিনিময়ে ও কিন্তু একটা টাকাও পারিশ্রমিক নেয়নি। শাহরুখ খান এখন যে জায়গায় রয়েছে, ওর প্রতিটা সেকেন্ডের একটা বিশাল ভ্যালু রয়েছে। তাই আমি মিস্টার খানকে খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে চাই। আর অনেকেই জানেন না, ‘রকি অউর রানি...’-তে ইনডিরেঙ্কলি শাহরুখের ভূমিকা রয়েছে। ‘তুম কেয়া মিলে’ গানটির শুটের আগে আলিয়া খুব নার্ভাস ছিল। এই ধরনের লার্জ স্কেল রোম্যান্টিক গানে যখন শুটের সময় গান প্লে হয়, তখন তার গতি অনেকটা বেড়ে যায়। সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিপসিঙ্ক করাটা মোটেই সহজ নয়। এই নিয়ে আলিয়া আমাকে ফোন করে এবং আমি ওকে বলি শাহরুখকে ফোন করে একবার পরামর্শ নিতে। আলিয়ার অনুরোধ শুনে শাহরুখ সেই মুহুর্তে ওকে বাড়িতে ডেকে নেয় এবং আলিয়ার পাশাপাশি সুহানাকে (শাহরুখের মেয়ে) সঙ্গে নিয়ে ও প্রায় চার ঘণ্টা সময় ধরে ওদের এই গানে লিপসিঙ্ক প্র্যাকটিস করায়। গানটি দেখলে বুঝবেন, এর আগে কোনও রোম্যান্টিক গানে আলিয়া এর চেয়ে ভাল লিপসিঙ্ক করেনি। কারণটা খুব সহজ, শি গট ট্রেন্ড বাই দ্য রোম্যান্স কিং, ওয়ান অ্যান্ড ওনলি শাহরুখ খান!

আপনাকেও তো মাস্টার অফ রোম্যান্স বলা হয়। এতবছর ধরে আপনি যেভাবে একের পর এক রোম্যান্টিক গল্প বুনেছেন, তাতে আপনার দক্ষতার প্রশংসা না করলেই নয়। আচ্ছা একটা কথা বলুন, রাহুল-অঞ্জলির

■ ছেলে যশ, মেয়ে রুহি ও মায়ের সঙ্গে করণ

“শাহরুখকে কিছু বললে ও কোনওদিনও না করতে পারবে না। ওর সঙ্গে সম্পর্কটাই ওরকম। আমি বারবার তার অ্যাডভান্টেজ নিতে চাই না।”

থেকে ও একটা প্রস্তুতি পর্ব সারে। সেখানে ও কী করে সেটা আমরা কেউ-ই জানি না, কিন্তু আই রেসপেক্ট হিজ মেথড অফ ওয়র্কিং।

অনেকেই ভেবেছিলেন যে এই ছবিতে শাহরুখ খানের ক্যামিও থাকবে...

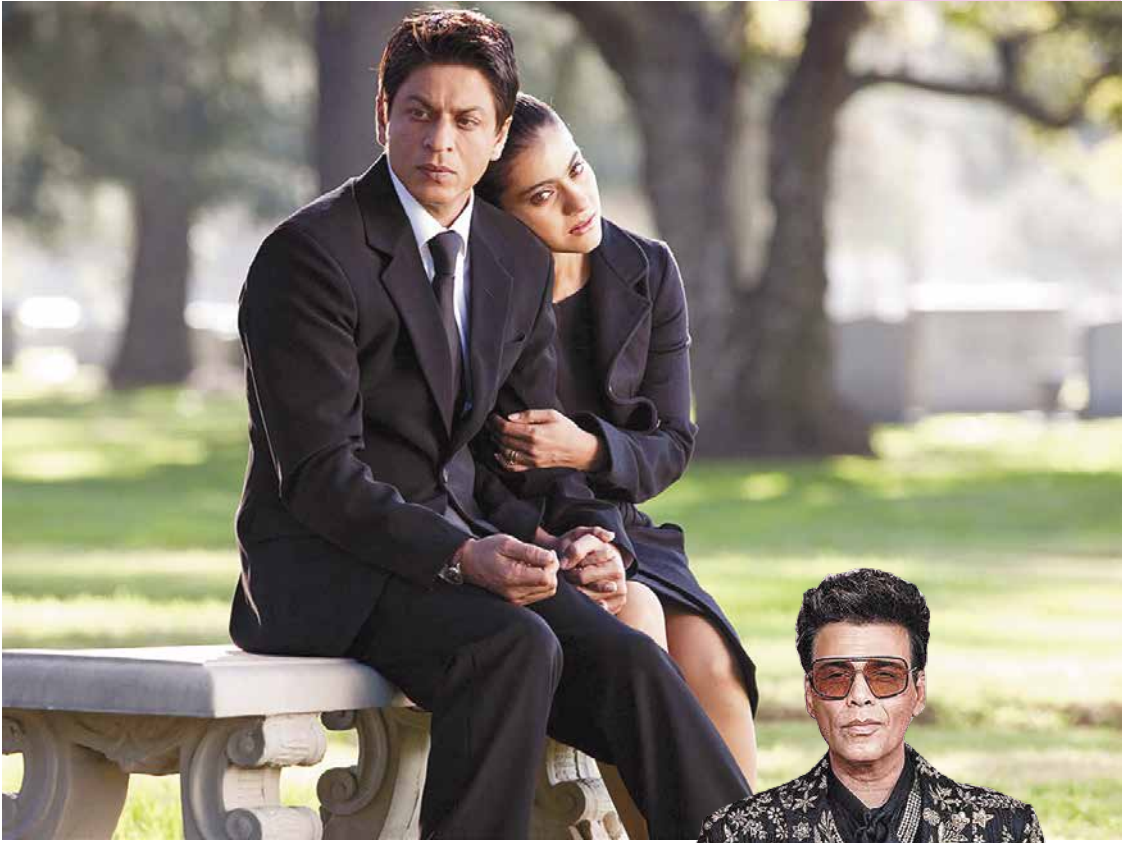
দেখুন, শাহরুখকে আমি কিছু বললে ও কোনওদিনও না করতে পারবে না। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই ওরকম। কিন্তু আমি বারবার তার অ্যাডভান্টেজ নিতে চাই না। শাহরুখ আমার তুরূপের তাস, আমার যখন প্রয়োজন তখন অবশ্যই ওর কাছে যাব।



■ ‘কফি উইথ করণ’-এর একটি এপিসোডে সলমন, সোহেল ও আরবাজকে নিয়ে করণ

এর আগে আমার শেষ পরিচালিত ছবি ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’-এ শাহরুখ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিল। তারপর আমাদের প্রোডাকশনের ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ছবির জন্য ও টানা ১৮ দিন শুট

(কুছ কুছ হোতা হ্যায়) সময় যেভাবে আপনি প্রেমকে দেখতেন এবং সেটার গল্প বুনেতেন আর আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন রকি-রানির প্রেমকাহিনি বুনেছেন, তার মধ্যে তফাত কতটা? কারণ সময়ের সঙ্গে



■ ‘মাই নেম ইজ খান’ করণের ফিল্মোগ্রাফিতে একটি বিশেষ ছবি



■ ‘রকি অউর রানি...’র আগে করণের শেষ পরিচালিত ছবি ‘আয় দিল হায় মুশকিল’

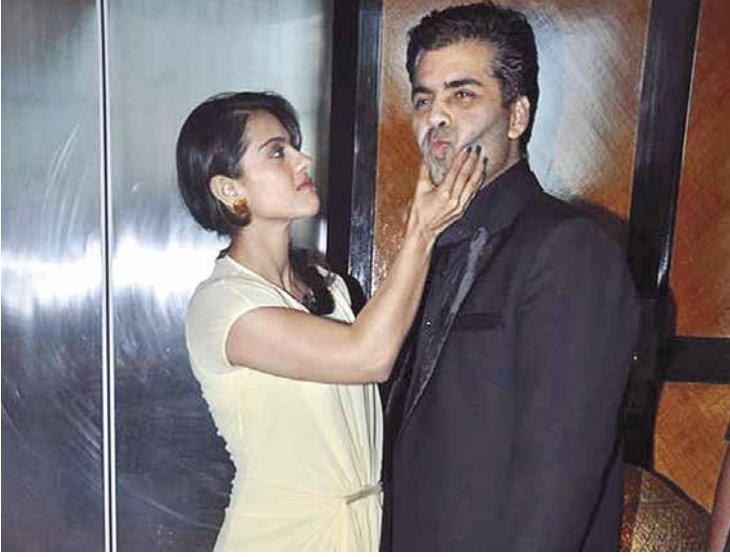
“লকডাউনের সময় আমাকে যে পরিমাণ মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তারপর আই নিডেড টু বাস্ট আউট। অনেকেই বলেছিলেন...”

প্রেমের সংজ্ঞাও তো বদলেছে...

প্রেমের সংজ্ঞা অবশ্যই বদলেছে। রকি-রানি কিন্তু ‘তুম কেয়া মিলে’ এবং কয়েকটি দৃশ্য বাদে সেই অর্থে রোম্যান্স করে না যেভাবে রাহুল-অঞ্জলি করত। কিন্তু এই কথাও সত্যি, শাহরুখ-কাজল হল আমাদের দেশের রোম্যান্স আইকন। পরদায় ওদের চেয়ে ভাল রোম্যান্স আর কেউ করতে পারবে না। শাহরুখ ইজ রোম্যান্স কিং। ও যখন বলে ‘অউর পাস, অউর পাস’, আপনার মনে হবে ওর কাছে চলে যাই। ও যখন বলে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায় তুম নহি সমঝোগি’, আপনি লাইনটার মানে না বুঝলেও ওর সঙ্গে একাত্মবোধ করবেন। শাহরুখের চেয়ে বেটার রোম্যান্টিক নায়ক আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আর একটাও নেই, আর একটাও আসবে না। তাই বলে আমাদের তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে রকির চরিত্রে রণবীর যা



■ ফ্যাশন মঞ্চে করণ



■ ইভান্সের সকলের মধ্যে কাজল করণের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু



■ আলিয়া ভট্ট করণের ঘরের মেয়ে

অনবদ্য পারফর্ম করেছে, তা ভোলার নয়। আমার মনে হয় না এখনকার দিনে পারফেক্ট দিল্লি বয়ের চরিত্র রণবীর ছাড়া আর কেউ এত ভাল করতে পারবে।

আচ্ছা করণ, এই ছবির সাফল্যের পর আপনার মুখে বারবার একটা কথা শুনছি। এই প্রথমবার আপনি ফিল্ম ক্রিটিকদের প্রশংসা পেলেন। বিগত ২৫ বছর ধরে করণ জোহর সফল পরিচালক-প্রযোজক। সেই সাফল্যের মাঝেও এই যে সমালোচকরা আপনার ছবি পছন্দ করছেন না, এটা

“আমি ছোটবেলা থেকেই মায়ের অন্তর্বাসের শপিং করেছি। এটা এত অ্যাবনরম্যাল কেন? আজ মায়ের যদি ওষুধ লাগে বা মুখে মাখার ক্রিম লাগে তা হলে তো আমিই এনে দিই।”

আপনাকে প্রভাবিত করত?

হ্যাঁ করত। ইভান্সিতে যারা খুব জনপ্রিয় বা নামজাদা ফিল্ম ক্রিটিক, তারা অধিকাংশই আমার খুব কাছের বন্ধু। কিন্তু আমি জানতাম তারা কেউই আমার ছবি পছন্দ করে না। একটা জেদ সবসময় কাজ

করত, একদিন এদের মনও জয় করতে হবে। ‘রকি অউর রানি...’ রিলিজের আগে আমি ভীষণ-ভীষণ টেনসড ছিলাম। কারণ সাতবছর পর পরিচালনায় ফিরছিলাম। তার উপর আমার শেষ পরিচালনা ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’ খুব একটা আশাপ্রদ ফল করেনি। আমি চেষ্টা করেছিলাম ওই ছবিতে নতুন কিছু করতে। কিন্তু সবসময় তো আপনার চেষ্টা সফল হয় না। এছাড়া এই লকডাউনের সময় আমাকে যে পরিমাণ মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তারপর আই নিডেড টু বার্স্ট আউট। অনেকেই বলেছিলেন আমার আর নতুন করে কী প্রমাণ করার আছে! কিন্তু ছিল। যারা আমাকে দিনের পর দিন আক্রমণ করে গিয়েছে, বলেছে আমি নাকি স্বজনপোষণ করি, তাদের দেখাতে হত আমি ইভান্সিতে কী কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আসলে কেউ একজন প্রযোজকের ব্যাক স্টোরিটা দেখে না। জানে না, আমরা যখন কাস্টিং করি আর আমাদের মুখের উপর পাঁচজন নায়ক ‘না’ করে দেয়, তখন আমরা কতটা দিশেহারা হয়ে পড়ি। আজ করণ জোহর বড় নাম বা আমার ‘কফি উইথ করণ’ শোয়ে সব সেলিব্রিটি আসে মানেই এটা নয় যে আমি কাউকে ছবির জন্য অ্যাপ্রোচ করলেই সে রাজি হয়ে যায়। ‘রকি অউর রানি...’ রিলিজের এক সপ্তাহ আগে আমার প্রায় সময়ই প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। আমার মা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যেতেন, আমি রীতিমতো কাঁপতাম। আমার প্রিয় বন্ধু কাজল আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত, যাতে আমি শান্ত হই। আমার অনেকের কাছে অনেক কিছু প্রমাণ করার ছিল। যেদিন ‘রকি অউর রানি...’ রিলিজ করল, আমি আমার প্রোডাকশন টিমের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখে দিয়েছিলাম, কেউ যেন কোনওরকমের রিভিউ ওই গ্রুপে না দেয়। কারণ আমি জানতাম, সমালোচকরা তো আমার ছবির প্রশংসা করবে না। কিন্তু তারপর সব ম্যাজিকের মতো হয়ে গেল! একদিকে আমাকে অনুরাগ কশ্যপ ফোন করে বলছে যে সে ছবিটা দু’বার দেখেছে, আবার আর একদিকে রাকেশ রোশনও ফোন করে বলছে তার ছবিটা দারুণ লেগেছে! আমি বুঝলাম, ক্লাস

এবং মাস, উভয়কেই ‘রকি অউর রানি...’ খুশি করতে পেরেছে। এই ছবিতে অনেক দৃশ্যই আমার জীবন থেকে নেওয়া। এর আগে আমি কখনও কোনও ছবিতে নিজের পার্সোনাল অ্যাজেন্ডা ঢোকাইনি। কিন্তু এবার আই ওয়ান্টেড টু শাউট আউট অ্যান্ড



■ মুম্বইয়ে ‘রকি অউর রানি...’র সাফল্য উদযাপন করতে রণবীর, আলিয়া ও করণ

সে আ লট অফ থিংস। আমার সেক্সুয়ালিটি নিয়ে তো কম রসিকতা করা হয়নি। হ্যাঁ, টোটোর চরিত্রের মতো আমিও ছোটবেলায় বাড়িতে গান চালিয়ে নাচতাম। আমার বাবা তা নিয়ে খুব গর্ব অনুভব করতেন, কিন্তু আশেপাশের অনেকেই সেটাকে মেয়েলি বলে ঠাট্টা ইয়ার্কি করত। রকিকে নিয়ে যখন চুর্ণীর চরিত্র বা কিনতে যায়, সেটাও আমার জীবন থেকে নেওয়া। আমি ছোটবেলা থেকেই মায়ের অর্ন্তবাসের শপিং করেছি। এটা এত অ্যাবনরম্যাল কেন? আজ মায়ের যদি ওষুধ লাগে বা মুখে মাখার ক্রিম লাগে তা হলে তো আমিই এনে দিই। তা হলে বা কিনতে পারব না কেন? আমার অনেক বন্ধু ছিল যারা বলত এটা কোনও মেয়েরই কেনা উচিত। আমি সমাজের এই ধারণাগুলো বদলাতে চাই। বিশ্বাস করুন, তা হলেই একমাত্র সমাজে ছেলে-মেয়ের মধ্যে একটা সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

কিন্তু ‘মাই নেম ইজ খান’-এর সময়ও তো আপনি সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন?

পেয়েছিলাম, কিন্তু সব সমালোচকদের

ভালবাসা পাইনি। ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। কারও খুব ভাল লেগেছিল আর কেউ-কেউ বলেছিল খুব খারাপ। তা ছাড়া ‘মাই নেম...’ নিয়ে এতরকমের রাজনৈতিক ডামাডোল শুরু হল যে কোনওকিছুই উপভোগ করতে পারিনি। আমার অনেক ছবির ক্ষেত্রেই এটা হয়েছে। ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর সময় একটা জরুরি কারণে আমাদের সপরিবার দেশ ছাড়তে হয়। ‘কভি খুশি কভি গম’-এর বছরে ‘দিল চহতা হ্যায়’ আর ‘লগান’ রিলিজ করেছিল। ওই দুটো ছবির সাফল্যে ‘কভি খুশি...’ চাপা পড়ে গেল। সেবছর আমি কোনও অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশনও পাইনি। ‘কভি অলবিদা না কেহনা’-র সময় তো সমাজের মরাল পুলিশ আমার ছবি কতটা রিগ্রেসিভ সেটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগল। ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’-এর সময় যশ চোপড়া মারা গেলেন। এবারই প্রথম, যখন আমি ‘রকি অউর রানি...’র সাফল্য পুরোদমে উপভোগ করতে পারছি। সারাদিন বাড়িতে শুয়ে আছি আর হ্যাপি ফিল করছি! যাকে ইচ্ছে ফোন করছি, গল্প করছি। আই অ্যাম অন আ রকি রানি হলিডে মোড! কিন্তু এবার এই ফেজটা থেকে বেরোতে হবে আর পরের

ছবি নিয়ে ভাবতে হবে।

কথা বলতে-বলতে তখন হোটেলের গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। বাড়িতে কিছু অতিথি আসবেন বলে করণকে যেতে হবে। ড্রাইভারকে কল করে তিনি যখন গাড়ির অপেক্ষায়, তখন দেখলাম পাশে কিছু বয়স্ক দম্পতি করণের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে করণের গাড়িও চলে এসেছে। হোটেলের সিকিয়ারিটি গার্ড গাড়ির গেট খোলার জন্যও এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু করণ ড্রাইভারকে গাড়িটা সামনে সাইড করে রাখতে বলে, সেই সমস্ত দম্পতির সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুললেন এবং সকলকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন। যে করণ জোহরের কথা শোনা যায়, আর যে করণ জোহরতে চাক্ষুষ করলাম, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক অনুভব করলাম। বুঝলাম, লোকের কথা শুনে কাউকে বিচার করা ঠিক নয়।

আসিফ সালাম



■ হার্ডি সাঁধু



■ গুরু রনখাওয়া



■ দিলজিৎ দোসাঞ্জ

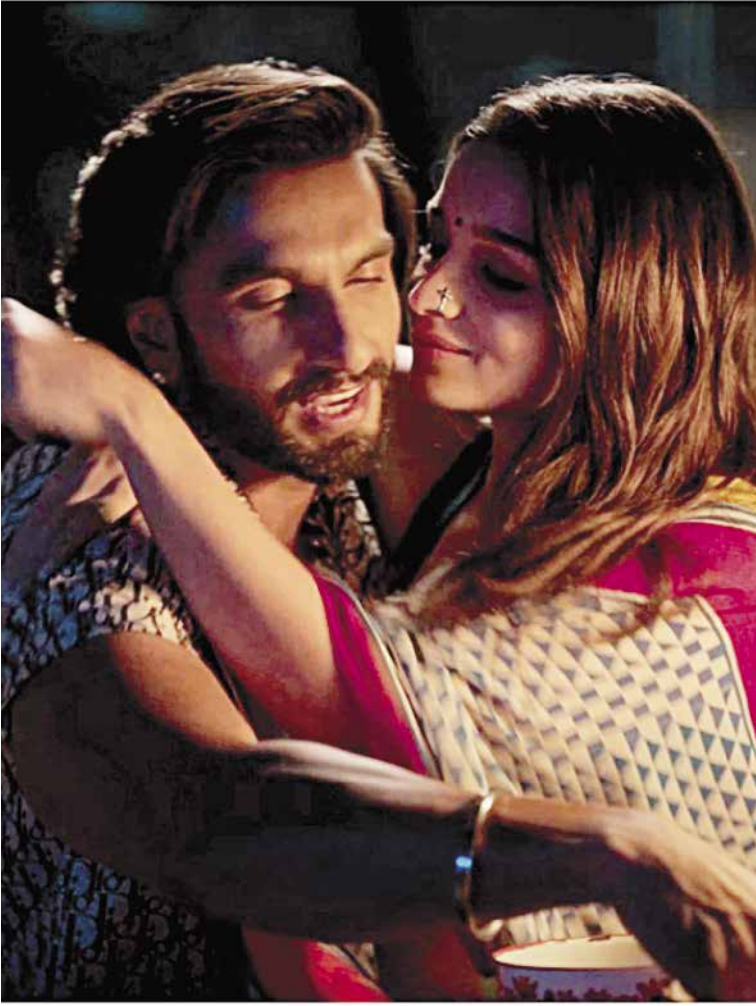
বল্লে বল্লে বলিউড

হিন্দি ছবি এবং গানের ইন্ডাস্ট্রি ভর করে আছে পঞ্জাবি গানের শক্ত ডানায়। নাকি পঞ্জাবের ডানা শক্ত করার ক্ষেত্রে রয়েছে বলিউডেরই ভূমিকা?

সি নেমার প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না কেন, গানের ভাষা বা লকলাইন হতে হবে পঞ্জাবি! না হলে সেই গানের জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। বর্তমানে হিন্দি বিনোদন জগতের পরিস্থিতি এমনটাই। নাকি এই বিষয়টিকেই আতসকাচের নীচে এনে ‘দর্শকের রুচি’ বলে দেখানো হচ্ছে? আদতে পঞ্জাবি গানের এই রমরমা কোথাও কি গ্রাস করে নিচ্ছে বলিউডের গানের জগৎকে? সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টায় নামলাম আমরা...

পঞ্জাব থেকে বলিউড

হার্ডি সাঁধু, বি প্রাক, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, গুরু রনখাওয়া, হর্ষদীপ কওর, জসলীন রয়্যাল, নুরন সিস্টার্স... নামগুলো কয়েক বছরের মধ্যে এই পূর্ব ভারতেও কিন্তু



■ ‘রকি অউর রানি...’ ছবির ‘ওয়ে কমলোয়া’ গানের দৃশ্য

ভীষণ ভাবে পরিচিত। এবং শুধু পরিচিত নয়, কলকাতায় এই শিল্পীদের কনসার্টে উপচে পড়ে লোক, বহুমূল্য টিকিট বিক্রি হয় চোখের নিমেষে! কীভাবে? সাধারণত ‘বক্সের আর্টিস্ট’-এর জন্য বক্সে হাপিত্যশ করে বসে থাকত শ্রোতামহল। কিন্তু এই পঞ্জাবি শিল্পীদের এত কদর এখানে হল কী করে? কারণ এই পঞ্জাবি গানের দুনিয়া এখন বলিউডের অনুমোদনপ্রাপ্ত। দু’রকম গান এই মুহুর্তে মানুষ ‘খাচ্ছে’। এক, রিমিক্স; দুই পঞ্জাবি গান। অনেক ক্ষেত্রে তো পঞ্জাবি সিঙ্গেলগুলো জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তীকালে সিনেমায় ব্যবহার করা হচ্ছে। এই যেমন পঞ্জাবি পপস্টার-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঙ্কের গাওয়া ‘প্রপার পটোলা’ গানটির কথাই ধরুন। ২০১৩-তে তৈরি এই গানটি একটি পঞ্জাবি নন-ফিল্ম হিট। গানটির জনপ্রিয়তার কারণে একেই আবার ২০১৮ সালে অর্জুন কপূর-পরিণীতি চোপড়া অভিনীত ‘নমস্তে ইংল্যান্ড’ ছবিতে ব্যবহার করা হয়। একটি মিউজিক



■ ‘জেডা নশা’ গানের ভিডিওতে নোরা ফতেহি ও আয়ুস্মান খুরানা

অ্যারেঞ্জমেন্ট বদলে বাদশাহ এবং আস্থা গিল এই গানটি গান। আবার সাম্প্রতিককালের উদাহরণ দিই। করণ জোহরের ‘রকি অউর রানি কী প্রেমকহানী’-তে যখন রকি এবং রানি পরস্পরের বাড়িতে যাচ্ছে, তখন গান বাজছে, ‘তেরা নি ম্যায়, তেরা নি ম্যায় লভার’। এই গানটিও দিলজিৎ দোসাঙ্কের ২০২১-এর ‘মুনচাইল্ড ইরা’ অ্যালবামের গান। নভ ইন্ডর এবং বাদশাহর যৌথ প্রযোজনা ‘ওয়াখরা সোয়াগ’ গানটি এমনিতেই ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। তা আবার ‘জাজমেটাল হ্যায় কেয়া’ ছবিতে ব্যবহার করা হয়। ছবিটি না চললেও গানের নতুন রেমিশন সুপারহিট! ভিকি কৌশল-কিয়ারা আডবাণীর ‘গোবিন্দা নাম মেরা’ (২০২২) ছবিতে হার্ডি সাধুর ২০১৮ সালের ওরিজিনাল গান ‘কেয়া বাত হ্যায়’-কেই একটু বদলে ব্যবহার করা হয়। এই ভার্শনটিও হার্ডি গেয়েছেন। গুরু রণধাওয়ার ‘লগদি লাহোর দি’ (২০১৭) গানটি বরুণ ধওয়ান-শ্রদ্ধা কপূর অভিনীত ‘স্ট্রিট ডান্সার’ (২০২২)-এ ব্যবহার করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, ‘স্ট্রিট ডান্সার’ ছবির কোনও চরিত্র পঞ্জাবি নয়! তারা মুম্বইয়ের একটি বসতির বাসিন্দা। অথচ যেসব গানে বসতির ছেলেমেয়েরা নাচে, তার প্রত্যেকটি গান পঞ্জাবি! গুরু রণধাওয়ার ‘তেনু সুট সুট করদা’ গানটি ব্যবহৃত হয়েছে ‘হিন্দি মিডিয়াম’ ছবিতে। হর্দীপ কউরের গাওয়া ‘কতিয়া করু’ গানটি ‘রকস্টার’ ছবিতে একটি কম্বীর মেয়ের বিয়েতে ব্যবহৃত হয়েছে। কেন? সেখানে কি একটি কম্বীর গান ব্যবহার করা যেত না? যেমনটা ‘ভুমরো’ গানের ব্যবহার হয়েছিল ‘মিশন কম্বীর’ ছবিতে?

হকলাইনে পঞ্জাব

১. ‘অন্ধেরা তেরা ম্যায় নে লে লিয়া, মেরা উজলা সিতারা তেরে নাম কিয়া চন্না মেরেয়া, চন্না মেরেয়া...’
২. ‘তুবাকো অম্বর সে জিয়াদা পিঞ্জরে পেয়ারে উড্জা কেহনে সে সুনতা ভি তু কহাঁ

ওয়ে কমলোয়া, ওয়ে কমলোয়া মেরে নাদান দিল’

গানের কথাগুলো একটু মন দিয়ে পড়ুন পাঠক। শুধুমাত্র হুক লাইনের ‘চন্না মেরেয়া’ বা ‘ওয়ে কমলোয়া’ বাদে বাকি কথাগুলো কিন্তু বিশুদ্ধ হিন্দিতে লেখা। এই যে একটি হিন্দি ভাষার গানের মধ্যে পঞ্জাবি হুকলাইন বসিয়ে দেওয়া হঠাৎ করে, এটা যে কবে থেকে হিন্দি ছবির গানের অঙ্গ হয়ে গেল, বলা মুশকিল। ‘কভি খুশি কভি গম’ ছবির ‘শাওয়া শাওয়া’ গানটির কথা মনে পড়ে? তাতে পঞ্জাবি রায়চাঁদ পরিবার ‘কেহ রাহা আখোঁ কা কাজল ইশক মৌ জিনা মরনা’র পরই ‘শাওয়া শাওয়া’ গেয়ে ওঠা

হয় সমবেতভাবে। এবং সেই সঙ্গে ছক-স্টেপ তৈরি হয়। তার আগে কিন্তু পঞ্জাবি পরিবারও হিন্দি গানই গাইত। ছবির ভাষা যেহেতু হিন্দি, তার গানও হত মূলত হিন্দি ভাষাতেই। বেশি পিছনে যেতে হবে না। ‘দিলওয়ালা দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে’ যেভাবে অনাবাসী পঞ্জাবি, পঞ্জাবি বিয়ে, করওয়া চৌথকে ফ্যাশনে এনেছিল, সেখানেও কিন্তু গান ছিল হিন্দিতে। ‘ঘর আজা পরদেসি তেরা দেস বুলায়ে রে’, ‘মেহন্দি লগা কে রখ না’... কিন্তু এখন তো হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকা পঞ্জাবি না হলেও তাঁরা পঞ্জাবি ভাষাতেই গান গাইতে শুরু করেন! এই যেমন ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’ ছবিতে ‘স্যাঙ্গর’ (সাধারণত মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায় এই পদবীর ক্ষত্রিয়দের) পদবীর রণবীর কপূর ‘রাঞ্জন দে ইয়ার বুলায়ে’ গেয়ে ওঠেন। বা ‘সিন্ধা’ ছবিতে গোয়ায় কর্মরত মরাঠি পুলিশ আধিকারিক প্রেমিকাকে নিয়ে গেয়ে ওঠেন ‘তেরে বিন নই লগদা দিল মেরা ঢোলনা’। মানে চরিত্রের মাতৃভাষা, কর্মভূমি যা-ই হোক না কেন, সে গাইবে পঞ্জাবি গানই! অদ্ভুত না?

■ জসলীন রয়্যাল



■ ছকলাইন ‘চন্না মেরেয়া’, অথচ গোটা গানটি হিন্দিতে লেখা



■ ‘দিল শগনা দা’ গানটি এখন বিয়ের জাতীয় সঙ্গীত যেন!

‘চন্না মেরেয়া’ বা ‘ওয়ে কমলেয়া’ ছাড়া বাকি কথাগুলো কিন্তু বিশুদ্ধ হিন্দিতে লেখা। আজকাল একটি হিন্দি ভাষার গানের মধ্যে পঞ্জাবি ছকলাইন বসিয়ে দেওয়ার চল হয়েছে। কিন্তু কেন?

ভোগবাদের মহাযজ্ঞ

ভোগবাদের এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। একটা সময় পঞ্জাবের গায়ক জগজিৎ সিংহ গাইতেন, ‘হোঠোঁ সে ছুলো তুম’, ভূপিন্দর সিংহ গাইতেন ‘এক অকেলা ইস শেহর মৌ’। গজল বা গীতের বাইরে জমাটি গান হিসেবে ছিল বুজ্জে শাহ রচিত ‘দমা দম মস্ত কলন্দর’। তারপর এল দলের মেহন্দির যুগ। ‘না না না রে, ‘তুনা ক তুনা ক তুন’, ‘বোলো তারা রা রা’, তাতে কোথাও মহিলাদের সুবিধাবাদী, পুরুষদের অর্থে জীবনযাপন করা মানুষ হিসেবে দেখানো হত না। একটি ছেলের গাড়ি কোন বিদেশি ব্র্যান্ডের, তা নিয়ে গান লেখা হত না। ‘গুচি’, ‘অরমানি’ কী বস্ত্র বিভবান ছাড়া সাধারণ শ্রোতা জানতেন না। যে নন-ফিল্ম গানগুলোর কথা উল্লেখ করছি, সবক’টিতে ভোগবাদ, পুরুষতন্ত্রের নিদর্শন স্পষ্ট। ‘ছোট ড্রিম উইচ বম্ব লগদি ম্যায়নু’ বা

‘ল্যাম্বরখিনি চলাই জানিয়ো’ বা ‘তেনু সুট সুট করদা’ গানগুলোর সারবস্ত্র কতখানি আলাদা? ‘কুড়ি ম্যায়নু কেহন্দি ম্যায়নু জুতি ল্যায় দে সোনিয়া’ গানটিতে একটি মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডকে দামী জুতো এনে দিতে বলছে, বয়ফ্রেন্ড বলছে, ‘না গোরিয়ে’। কোনদিকে যাচ্ছি আমরা? পঞ্জাবি গান মাত্রই এমন তা বলছি না। এই যেমন ‘কেসরি’ ছবির জন্য বি-প্রাক নামের এক গায়ক ‘তেরি মিট্রি মৌ মিল যাওয়া’ গেয়েছিলেন। আদ্যন্ত দেশাত্মবোধক গান। কিন্তু বাকি গুলো? গিল্পি গ্রেওয়ালের ‘অংরেজি বিট পে’, এ পি থিলোর ‘ব্রাউন মুন্ডে’, জস মনকের ‘ম্যায়নু লেহঙ্গা ল্যায় দে মেহঙ্গা’ গানগুলোতে তো একই বক্তব্য! সুন্দরী মেয়ে, তার রূপের সঙ্গে বিভিন্ন নেশাদ্রব্যের তুলনা, পুরুষের কাছে তার প্রচুর চাহিদা, কয়েকটি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের নাম... গানজুড়ে লিঙ্গবৈষম্য, সুরার ফোয়ারা, উদ্ভূত পয়সা! এই ধরন জসলীন রয়্যালের কথা। তিনি সুন্দর গান বানাচ্ছিলেন। তাঁর বানানো



■ গিল্পি গ্রেওয়াল

‘দিল শগনা দা’ গানটি বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার বিয়ের ভিডিয়োতে ব্যবহার করা হল। বাস, তারপর থেকে ‘স্বপ্নের বিয়ে’ বোঝাতে ওটাই হয়ে গেল বিয়ের ‘অ্যাঞ্জেম’। তারই দেখাদেখি যে-কোনও বিয়ের ভিডিয়ো, বিশেষত আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ের গান মানেই ‘দিল শগনা দা’। এই তো আমাদের বাংলার বিগ ফ্যাট ওয়েডিং রাজ চক্রবর্তী এবং শুভশ্রীর বিয়েতেও বেজে উঠল এই গানটিই। নেহাতই বাঙালি দুই সেলেব। মফসসলে মানুষ হয়েছেন, অথচ তাঁদের বিয়েতে বাজছে পঞ্জাবি গান!

শুরু কোথায়

হিন্দি ছবিতে পঞ্জাবিদের একটি চিত্র একেছিলেন যশ চোপড়া। দেশভাগের পর পঞ্জাবিরা যে দুঃখে নেই, বরং ব্যবসা করে



■ হৃদয়ীপ কওর

জন্ম থেকেই যাদের হাতে মুঠোফোন, শৈশব থেকেই যারা দামী ব্র্যান্ডের পোশাকে অভ্যস্ত, ইনস্টা রিলের ৩০ সেকেন্ডের ভিডিয়ো বা গানের ক্লিপ দেখে অভ্যস্ত যে কানগুলো আর ধৈর্য ধরে একটি বড় গান শুনতে পারে না। ‘স্থায়ী-অন্তরা-সম্ভারী-আভোগ’ সমন্বিত গান যাদের ‘বোরিং’ বা বৃথা সময় নষ্ট মনে হয়, তাদের জন্যই কি তৈরি হচ্ছে এমন গান? যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ‘অ্যাসপিরেশন’, কেবল মাত্র অর্থ এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিচারে। আবার কেউ কেউ বলতে পারেন, পঞ্জাবি গানে ছন্দ খুব ‘ক্যাচি’। পার্টি সংস্কৃতিতে এই ধরনের ‘ডান্স নাম্বার’-ই চলে। তা হলে এমন দ্রুত লয়ের গান তো ‘আয়াম আ ডিস্কো ডান্সার’-ও ছিল, ‘চাহে কোই মুঝে জঙ্গলি কহে’-ও ছিল। সেখানে কেন নারীশরীরকে ‘রেড ভেলভেট কেক’-এর সঙ্গে তুলনা করার দরকার পড়ল না?

‘এই হাওয়া সিলকি সিলকি বলে যায় বাটেঁ দিল কি



■ ‘কেয়া বাত’ গানটি ‘গোবিন্দা নাম মেরা’ ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে

উল্টো পিঠে রয়েছে একটি আদ্যন্ত ভোগবাদী প্রজন্ম। জন্ম থেকেই যাদের হাতে মুঠোফোন, শৈশব থেকেই যারা দামী ব্র্যান্ডের পোশাকে অভ্যস্ত, ইনস্টা রিলের ৩০ সেকেন্ডের...



■ বি-প্রাক গেয়েছেন ‘তেরি মিট্টি মৈ’ গানটি

রয়েছেন বহাল তব্বিতে, তেমন একটা চরিত্র প্রতিটি ছবিতে হাসি-খুশি লার্জার দ্যান লাইফ পঞ্জাবি পরিবার... যশ চোপড়ার মানসপুত্র করণ জোহর সেই পঞ্জাবি পরিবারকে আরও ধনী করে তুললেন সেলুলয়েডে। এর গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বাড়ল যে, পঞ্জাবি পরিবার বললেই একটা ‘হ্যাপি গো লাকি’ ছবি চোখে ভাসে। যতই পঞ্জাবের দাঙ্গা, ড্রাগ সমস্যা নিয়ে ছবি হোক, ওই ছবিটা দর্শকের মনে যাতে না আসে, তার জন্যই এই লার্জার দ্যান লাইফ ছবি, দ্রুত বিটের গান, বাঁ-চকচকে ভিডিয়ো দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। আর উল্টো পিঠে রয়েছে একটি আদ্যন্ত ভোগবাদী প্রজন্ম।

চলনা ভেসে যায় জোয়ারে
রুবারু ওও রুবারু ওও রুবারু ওও
মান্তি মান্দে দিল মাহি ওয়ে
মাহি ওয়ে মাহি ওয়ে...’
‘চ্যালেঞ্জ’-এর এই সুপারহিট গানের সময়কাল কিন্তু ২০০৯! পঞ্জাবি গানের এই আগ্রাসন থেকে বাংলা গানও বেঁচে নেই। তবে বেঁচে আছে দক্ষিণ ভারতের চারটে ইন্ডাস্ট্রি, মরাঠি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও ছোট ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। তবে এগুলো আঞ্চলিক ইন্ডাস্ট্রি। এই দেশ সতিই বৈচিত্র্যে ভরা। একদিকে রাজনীতি বলছে হিন্দি হবে রাষ্ট্রভাষা। অন্যদিকে দেশের একমাত্র হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলিউড গানের ভাষা হিসেবে বেছে নিচ্ছে পঞ্জাবিকে। বিবিধের মাঝে মহান মিলন হবে কতদিনে?



ফোটো: শুভেন্দু চাকী

অথ শাস্বত কথা

তিনি বিশ্বাস করেন না মাল্টিটাস্কিংয়ে। মনে করেন, একসঙ্গে একাধিক কাজ করলে কাজের মান খারাপ হয়। কীভাবে তৈরি হল **শাস্বত চট্টোপাধ্যায়**-এর অভিনেতা সত্তা? অভিনেতার সঙ্গে আলাপচারিতায় সায়ক বসু

নয়ের দশকের শুরুর সময় তখন। ছেলেটির বয়স কতই বা হবে? ১৯ বা ২০ বছর... কলকাতার রাজ বসন্ত রায় রোডে যৌথ পরিবারে বড় হচ্ছে সে। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা আছে। কিন্তু তেমন মন নেই। তার চেয়ে সে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ নিজের বন্ধুদের সঙ্গে। পাড়ার রক কালচারে রীতিমতো সিদ্ধহস্ত। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, চায়ের দোকানে খাতা রাখে। ভাবে ওটাই বুঝি জীবন। ছেলেটির বাবা একদিন করলেন কী, বাড়িতে দুপুরের রান্না বন্ধ করে দিলেন। ছেলেকে নিয়ে গেলেন পার্ক সার্কাসের কাছে একটি রিসর্টে। সেই রিসর্টে একটা ছোট্ট জলাধার

আছে, ঝিল মতো। সেই ঝিলের মাঝে যাওয়ার জন্য বোটে চড়ে বসলেন তাঁরা। অবশ্য চড়ার আগে দু'বোতল বিয়ার কিনে নিয়েছেন বাবা। সেই ঝিলের মাঝখানে গিয়ে ছেলের হাতে বিয়ার দিলেন তিনি। সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক সেই ছেলেকে এক চুমুক বিয়ার খেতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, “তুই জীবনে ঠিক কী করতে চাস বল তো?”

শাস্বত ধর্ম

পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এক শুক্রবারের বিকেলে গন্ধগ্রিনের কাছে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখা গেল, এই



■ শাস্ত্রের মতে, সন্দীপ রায়ের সঙ্গে ফেলুদায় কাজ তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বাড়িয়েছে

সাক্ষাৎকারের জন্যই ফোটোশুট করছেন তিনি। সপরিবার। স্ত্রী মহুয়া, মেয়ে হিয়া এবং তাঁদের আর এক আদরের সন্তান, চার বছরের এক গোল্ডেন রিট্রিভার, ব্র্যান্ডি। অবশ্য শাস্ত্র চট্টোপাধ্যায় ছবি তুলছেন বটে, কিন্তু সেগুলি নিজে থেকে খুব একটা দেখতে চাইছেন না। যতক্ষণ না আলোকচিত্রী তাঁকে ছবিগুলি দেখাচ্ছেন। বিষয়টি অদ্ভুত লাগল প্রতিবেদকের। শাস্ত্রের মতো একজন তারকা, যাকে এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা অভিনেতা বলা হয়, এই ইন্ডাস্ট্রিতে তো বটেই বলিউডেও তিনি প্রচণ্ড জনপ্রিয়... তিনি নিজেকে নিয়ে ভাবিত নন? অন্তত নিজের ইমেজ নিয়ে, তাঁকে কেমন দেখতে লাগছে সেটা নিয়ে? ফোটোশুট শেষে, দুধ চিনি ছাড়া লিকার চা নিয়ে যখন বসা হল, তখন শাস্ত্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, “আমাকে কেমন দেখতে লাগছে বা আমার ইমেজ কেমন হবে, তা নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তা করি না। আমি যে চরিত্রটা করছি ওটা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে কিনা, আমাকে তাঁদের পছন্দ হচ্ছে কিনা, সেটাই দেখার বিষয়। তাছাড়া আমি যেখানে অভিনয় শিখেছি, সেখানে এইসব নিয়ে ভাবার কোনও অবকাশই ছিল না।”

অন্য জীবনবোধ

সাক্ষাৎকারের গভীরে ঢোকার আগে এটা বলে রাখা দরকার যে, শাস্ত্র চট্টোপাধ্যায়

শুধু একজন ব্যস্ত অভিনেতা নন। তাঁর অভিনয় প্রতিভা নিয়ে আজ আর আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ইন্ডাস্ট্রিতে খুব চালু একটা রসিকতা আছে, শাস্ত্রকে যদি অদৃশ্য কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে বলা হয়, সেটাও তিনি খুব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে করে দেবেন। সেই কারণেই হয়তো করণ জোহার থেকে অনুরাগ বসু, বলিউডের প্রথমসারির পরিচালকদের পছন্দের অভিনেতা তিনি। কিন্তু কেরিয়ারের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত শাস্ত্র একটি বিষয়কে প্রায় মস্তুর মতো নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন। তা হল, একটি নির্দিষ্ট সময় একটিই কাজ করা। তিনি বললেন, “মাল্টিটাস্কিং জিনিসটা আমার কোনওদিনই হয় না। আমি একটা সময় একটা ছবি বা সিরিয়ালের শুটিং করতেই পছন্দ করি। আজ অবধি একসঙ্গে দুটো কাজ আমি কখনও করিনি। অনেকে আমার এই কথাটা শুনে অবাক হয়েছেন। বলিউডের পরিচালকরা তো বটেই। বহু বড় সিনেমার কাজ এই কারণে হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু আমি যেটা পারি না, সেটা খামোকা চেষ্টা করতে যাব কেন?” ফলে ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে বহু মানুষেরই শাস্ত্র চট্টোপাধ্যায়কে অদ্ভুত বলে মনে হয়। অনেকেরই মনে হয়, শাস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন একটি ধারণা নিয়ে বাঁচেন। কিন্তু অভিনেতার তাতে থোড়াই কেয়ার। বললেন, “একসঙ্গে

দুটো বা তিনটে কাজ করলে কাজের মান আমার খারাপ হবেই। ফলে সেই সময়টা পরিবারের সঙ্গে কাটানোই ভাল।” আসলে এই ভাবনাটা ধীরে-ধীরে শাস্ত্রের মধ্যে প্রোথিত হয়েছে। নয়ের দশকের শুরুর দিকে তাঁর বাবা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় যখন ছেলেকে নৌ-বিহারে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন জীবনে কী করতে



■ তখন কৈশোর

চায় সে, তখন শাস্ত্রতর মুখ থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়েছিল ‘অভিনয়’। ‘বাবাকে ছোটবেলা থেকে যে প্রফেশনে দেখে এসেছি, তার সূত্রে উত্তমকুমার, রবি ঘোষকে দেখেছি একেবারে বাড়ির লোকের মতো। তাই মনে হয়েছিল, অভিনয় বললেই বোধ হয় সুবিধে হবে। বাবাকে বলেছিলাম, ‘তোমরা যেভাবে সহজে মানুষের কাছে চলে যেতে পারো... ঘুরতে পারো...’ বাবা ভুরু নাচিয়ে বলেছিলেন, ‘সহজে?’ তারপরেই ঘটে ঘটনাটা। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফোন করেন তাঁর সহকর্মী জোছন দস্তিদারকে। ‘চার্বাক’ নাট্যগোষ্ঠীতে শাস্ত্রত অভিনয় শিখবেন, এমনটাই হয় সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রত বললেন, “আমি তখনও ভাবতে পারিনি, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। মায়ের হাত ধরে ট্রায়ালুলার পার্কে যাই। ওখানেই ‘চার্বাক’ রিহর্সাল দিতা।” শাস্ত্রত ঘরে ঢুকেই দেখেন, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এক সহপাঠী ওখানে ঘর মুছছেন। শাস্ত্রত হেসে বললেন, “অনির্বাককে দেখে এত খারাপ লেগেছিল না! মনে হয়েছিল, ইস, ওর এত আর্থিক কষ্ট! শেষে কিনা জোছন দস্তিদারের বাড়ি মুছছে? কী করে জানব, ওটা আমার কপালেও নাচছে?” ‘চার্বাক’-এ টানা দেড় বছর শুধু ঘর মুছেছিলেন শাস্ত্রত। আর কাজ ছিল, নাটকের সেট ঘাড়ে বা গাড়িতে করে একটা শো থেকে অন্য শোয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং বিভিন্ন অভিনেতার হয়ে প্রক্সি দেওয়া। শাস্ত্রত বললেন, “একটা সময় খুব রাগ হয়েছিল জানেন? সত্যজিৎ রায় আমাকে চেয়েছিলেন ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর রুকু চরিত্রটার জন্য। কিন্তু একদিন স্কুল থেকে

ফিরতেই মা ‘খুব গরম পড়েছে’ বলে আমার চুল কেটে দিয়েছিলেন একেবারে ছোট করে। আমার অবস্থা দেখে সত্যজিৎবাবু পর্যন্ত আঁতকে উঠে বাবাকে বলেছিলেন, ‘এ কী করেছ শুভেন্দু? এ তো একেবারে বাটিছাঁট হয়ে গিয়েছে’ ফলে যা হয়, কাজটা আমার করা হয়নি। ভাবতে পারেন, মা ছেলের পড়াশোনার ক্ষতি করতে চাননি। কিন্তু পরে যখন দেখলেন ছেলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে জঘন্য রেজাল্ট করল, তখন নিজেই নিয়ে গেলেন জোছন দস্তিদারের কাছে। ওখানে ‘সতী’ বলে একটা নাটকে একটা সিনে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম দেড় বছর পর। তাতেও নার্ভাস হয়ে সেট ভেঙে ফেলছিলাম প্রায়।”

চার্বাক এবং পরে

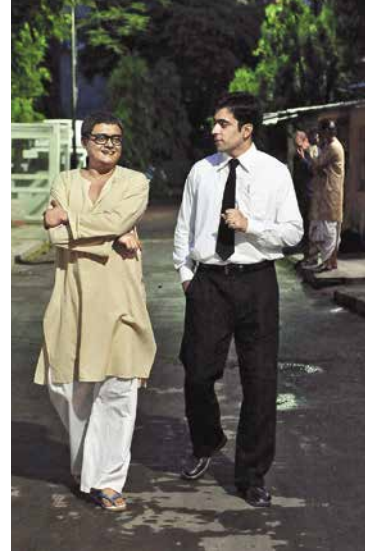
এই নাট্যদলের হয়ে প্রায় চারটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন শাস্ত্রত। যদিও সেগুলি পরে। শুরুতে বেশ কষ্টই হয়েছিল তাঁর। আসলে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে অভিনয়ের বাস্তব মাটিটা



■ ‘কহানী’ ছবিতে কাল্ট হয়ে যাওয়া ‘বব বিশ্বাস’



■ ‘ব্যোমকেশ’ আবার চট্টোপাধ্যায় এবং ‘অজিত’ শাস্ত্রত চট্টোপাধ্যায়



■ ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে শাস্ত্রত এবং আবি

বুঝিয়ে দিতে। উত্তমকুমার, ভানু বা রবি ঘোষকে কাকা-জেরা বললেই যে সব সহজে পাওয়া যায় না, সেটা ছেলের মাথায় ঢোকানো দরকার ছিল। তাই জোছন দস্তিদারের কাছে পাঠানো। সেখানে শাস্ত্রত বকুনি যেমন খেয়েছেন, মাথায় গাঁটাও খেয়েছেন। কিন্তু কাজটা শিখে নিয়েছেন। অবশ্য শুভেন্দু জানতেন, তাঁর ছেলে অসততার পথ নেবে না। কারণ স্কুল জীবনে শাস্ত্রত একবার হোমওয়ার্কে শূন্য পেয়েছিলেন। শুভেন্দু অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে, সুযোগ থাকলেও, টুকে হোমওয়ার্ক করেনি সে। তাই জীবনে প্রথমবার সততার পুরস্কারস্বরূপ গ্র্যান্ড হোটেলে খাইয়েছিলেন ছেলেকে। ফলে শুভেন্দু খুব স্বাভাবিকভাবেই জানতেন, ছেলে ঠিক ঠেকে শিখে নেবে। সত্যি সত্যি শিখে নিয়েছিলেন শাস্ত্রত। প্রথমে ‘চার্বাক’ এবং পরে ‘সনেক্স’-এ। অভিনয় তো বটেই, কীভাবে শুটিং করতে হয়, কীভাবে ক্যামেরা ধরতে হয়, কীভাবে একটা গোটা প্রোডাকশন চলে... সব শিখেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা বললেন, “চার্বাকে ‘সপ্তর্ষি’ নামে পাঁচ এপিসোডের সিরিজ শুট করা হয়েছিল। জোছন দস্তিদার এক শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আমি ছিলাম অনেক

সত্যজিৎ রায় আমাকে চেয়েছিলেন ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর রুকু চরিত্রটার জন্য। কিন্তু একদিন স্কুল থেকে ফিরতেই...



■ বাবার সঙ্গে আড্ডায়

ছাত্রের মধ্যে অন্যতম। সেই প্রথম আমার ক্যামেরা ফেস করা। পরে সেন্সর-এ সব্যসাচী চক্রবর্তী, দেবাংশু সেনগুপ্ত এবং তারও পরে সন্দীপ রায়ের হাত ধরে অনেক টেকনিক্যাল কাজ শিখেছি। রবিরঞ্জন মৈত্রের কাছ থেকে এডিটিং শিখেছি। ক্যামেরা ধরে সেট করছি, দূর থেকে সব্যসাচী হেঁটে আসছেন বা দেবাংশু সুর করছেন, আমি বসে শিখছি... এমন ঘটনার নজির কম নেই। সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কাজ তো আমার জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা। তবে সবচেয়ে বেশি বেগ বোধ হয় পেয়েছিলাম বাবার সঙ্গে বিশ্বরূপা-এ নাটক করতে এসে।” ছোটবেলা থেকে হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে পারতেন না শাস্ত। অন্ধকার ঘরে তাঁর ভয় লাগত বলে কান্নাকাটি করে বাড়ি ফিরে আসতেন। বরং নাটক ছিল তাঁর কাছে অনেক সাবলীল মাধ্যম। বাবার অভিনয় করা নাটক দেখতে ভালবাসতেন তিনি। বিশেষ করে ‘বিলকিস বেগম’ এবং ‘অমর কণ্ঠক’-এ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে রীতিমতো মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন শাস্ত। সেই বাবার সঙ্গেই যখন পরে নাটক করার সুযোগ এল, তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হল তাঁর। সোফায় বসে একটু চুপ করে থেকে শাস্ত বললেন, “বাবা কোনওদিনই আমার অভিনয় দেখে প্রশংসা সূচক কোনও বাক্য বলেননি। বরং যখন একসঙ্গে অভিনয় করতে গিয়েছি, সেটা ফেলুদা বলুন বা পরে গৌতম ঘোষের ছবি ‘আবার অরণো’, উনি পুরোদস্তুর প্রফেশনাল অভিনেতা হিসেবেই আমার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শুধু একবার একটি টেলিফিল্মের স্ক্রিনিং হয়েছিল, পার্থ সেনের পরিচালনায়। বাবা ওটা আমার সঙ্গে দেখেছিলেন। সেদিন আমার বাড়ি ফিরতে একটু রাত

বন্ধুকে দেখে মনে হয়েছিল, ইস, ওর এত আর্থিক কষ্ট! শেষে কিনা জোহন দস্তিদারের বাড়ি মুছছে? কী করে জানব, ওটা আমার কপালেও নাচছে?

হয়। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি এসে টেবিলে দেখি একটা চিরকুট। তাতে লেখা ‘প্রাউড অফ ইউ’। ওই একবারই। নয়তো বাবা সারাজীবন কড়া শিক্ষকের মতো আমার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে গিয়েছেন। যে প্রসঙ্গটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবার সেটা বলি। বাবা তখন বিশ্বরূপা-এ নাটক

নির্দেশনা করেন। আমাকে একদিন এক পাতা একটা সংলাপ দিয়ে বললেন, মুখস্থ হলে যেন রিহাসাল দিতে যাই। মুখস্থ হল। কিন্তু বাবার সামনে গিয়ে পড়লাম আর এক সমস্যায়। একবার ফার্স্ট রো-তে বসে ‘লাউডার’ বলে চিৎকার করেন তো আবার কখনও একেবারে শেষ রো-তে গিয়ে বসে, তিরিশটা ফ্যান চালিয়ে, মুখের উপর প্রচণ্ড আলো ফেলে বলেন সংলাপ বলতে। ওই একটা দিনের কথা মনে আছে, বাবার সামনে রিহাসাল দিতে গিয়ে আমার প্যান্ট ভিজে গিয়েছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে একমাত্র রবি ঘোষ আমাকে প্রচণ্ড প্রশংসা দিয়েছেন। কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমি যখন শট দিয়েছি, তখন সকলের পিছনে গিয়ে বসে থেকে সাহস দিয়ে গিয়েছেন। বাবার



■ নাতনির সঙ্গে শুভেন্দু



ফোটো: শুভেন্দু চাকী

■ বাড়িতে বাবা এখনও আছেন ছাতার মতো

সেদিন বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসে দেখি, টেবিলে একটা চিরকুট যাতে লেখা ‘প্রাউড অফ ইউ’। ওই একবারই। নয়তো বাবা সারাজীবন কড়া শিক্ষকের মতো ছড়ি ঘুরিয়ে গিয়েছেন।

বন্ধু হিসেবে একমাত্র রবি জেঠুই আমার আবদারে সাড়া দিয়েছেন বলা যেতে পারে। এছাড়া বাকি কেউ নয়। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর বন্ধুদের তারকা সুলভ সংগ্রহ থেকে ছেলেকে দূরে রাখতে।” তবে শাস্ত্রত এখন স্বীকার করেন, এই ঘটনাগুলোই তাঁকে পিটিয়ে আরও শক্ত করেছে। এখন যে কেউ এসে টেকনিক্যাল ব্যাপার বুঝিয়ে তাঁকে বোকা বানাতে পারবে না। তাঁর কাছে এখন অসম্ভব বলে কোনও শব্দই নেই। বললেন, “আমি ছোটবেলা থেকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। সেই প্রসেস বারবার রিহাসালে বিশ্বাস করিয়েছে। আমি প্রথম হিন্দি সিরিয়াল করেছি ‘কালপুরুষ’। বা পরে যখন ‘এক আকাশের নীচে’ করছি, তখন মূল শটের আগের দিন রাতে সকলে মিলে একসঙ্গে বসে রিহাসাল দেওয়ার একটা চল ছিল। তাতে অনেক সময় দৃশ্য পছন্দ না হলে সেটা বাদ দিয়ে নতুন করে লেখা হত। এতে সময় যেত বটে, কিন্তু সেরা কাজটা বেরিয়ে আসত। আমার একটা টেকনিক্যাল জ্ঞান ছিল যেটা আগেই বলেছি। এই জ্ঞানের দৌলতেই শেষ দিকে টানা নয় মাস ‘এক আকাশের নীচে’

পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাবার একটাই কথা ছিল, “করছ করো। কিন্তু শিখে করো।” ফলত, শাস্ত্রত এখন নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের ভীষণ ট্যালেন্টেড বলে মনে করেন। কারণ, তাঁদের কাছে এত শেখার সুযোগ নেই। বরং সর্বক্ষণ ডেলিভার করে যেতে হয়... এই চাপ রেখেও তাঁরা যে অভিনয় করে যাচ্ছেন, এটাই শাস্ত্রতর বেশ প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। এবং নিজেকে খানিকটা পিছিয়েই রাখেন তিনি। বললেন, “আমি খুব ইনস্টিংক্টিভ অভিনেতা তো! আমার খানিকটা সময়ের দরকার হয়। তাই একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে গেলেও অসুবিধা হয়।” অভিনেতা শাস্ত্রত চট্টোপাধ্যায় অনেক কিছুই পারেন না। তার মধ্যে অন্যতম হল নাচ। “যে কারণে আমি অনেক বড় চরিত্র ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। করণ জোহর আমাকে ‘রকি অউর রানি কী প্রেম কহানী’-তে, আলিয়ার বাবার চরিত্রে অভিনয় করতে বলেছিলেন। কিন্তু চরিত্রটি যেহেতু নাচের শিক্ষকের, তাই আমার সাহসে কুলোয়নি। আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ওখানে গিয়ে মাসখানেক সময় নিয়ে নাচ শিখে



■ ‘শবর’রূপে ঋত্বিক চক্রবর্তীর সঙ্গে

নিতে। কিন্তু যে যেটা পারে না সেটা কি জোর করে সম্ভব? তাই হাত জোড় করে ‘না’ করে দিই। পরে দেখলাম, ওই চরিত্রটা টোটা (রায়চৌধুরী) করেছে। এবং দুর্দান্ত করেছে! আমি হলে সত্যিই অতটা ভাল পারতাম না।” তবে বলিউডে এখন ভীষণ ব্যস্ত শাস্ত্রত। অনুরাগ বসুর ‘লাইফ ইন আ



ফটো: শুভেন্দু চাকী

■ বাড়ির চার সদস্য। মেয়ে, স্ত্রী এবং পোষ্য সন্তানের সঙ্গে



■ সপরিবার

মেট্রো'র সিকোয়েলে অভিনয় করছেন। এছাড়া আছে বেশ কিছু হিন্দি ছবির কাজ। বাংলায় আবার অনিমেয় দত্ত হিসেবে 'আবার প্রলয়'-তে ফিরে এসেছেন তিনি। কিন্তু এখনও পছন্দের অভিনয় বলতে গেলে 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথাই মনে আসে তাঁর। বললেন, "অনেকে অনেক চরিত্রের কথা বলেন। 'বব বিশ্বাস' সহ আরও বেশ কিছু। সেগুলো আমারও পছন্দ কিন্তু আমার

স্ত্রী মহুয়া বলেন, আমি যখন কমলেশ্বরের এই ছবিটার শুটিং করছিলাম, তখন নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ওর ভয় লাগত। আমারও মনে হয়, 'নীলকণ্ঠ বাগচী' চরিত্রটা আমাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। কমলেশ্বর এত সুন্দর করে লিখেছিল চরিত্রটা যে, ডাবিং করার পরে অনেক সময় আমরা নিজেদের মধ্যেও কথা বলতে পারতাম না। চুপ করে থাকাটাই

মনে হত শ্রেয়।" আসলে কিছু চরিত্র তো আসে অভিনয় জীবনকে আরও বর্ণনায় করে তোলার জন্য, শাস্ত্রের কাছে 'নীলকণ্ঠ' সেরকমই একটি চরিত্র। এবং তিনি বারবার খুঁজে বেড়ান সেই সব চরিত্রকে, যা তাঁকে আরও পূর্ণ করবে। শুভেন্দু চেয়েছিলেন ছেলে অভিনয়ের বাস্তবতাকে ভাল করে বুঝুক। ব্যস্ততার মধ্যে খুঁজে পাক কর্মের পূর্ণতা। পিতার সেই ইচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন শাস্ত্র। অভিনয়ে যেমন তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে, তেমন দিয়েছে ছবি আঁকাও। এখনও তাঁর অবসর কাটে ছবি এঁকে। যাই হোক, কর্মব্যস্ততার কথা হচ্ছিল। ২০০৭ সালে যখন একদিন হঠাৎ করে শুভেন্দুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, শাস্ত্র তখন সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন, ফুসফুসের কোষ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে শুভেন্দু আর মেরেকেটে চার মাস বাঁচবেন। শাস্ত্র শুনেছিলেন কথাটা। চোখের জল লুকিয়ে রেখে বা বলা

২০০৭ সালে যখন একদিন হঠাৎ করে শুভেন্দুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, শাস্ত্র তখন সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন...



■ ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’-এ অনিল কপূরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন শাস্বত

ভাল নিভুতে কেঁদে বাবার জন্য যাবতীয় কর্তব্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু কাজের তাগিদে বাড়ির বাইরে থাকতেই পছন্দ করতেন। শাস্বত বলেন, “ওই সময় বাবার মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করত না। কী বলব? যদি ভাবেন আমি বেশি কষ্ট পাচ্ছি? আমার কষ্ট তো সহ্য করতে পারতেন না! তাই আমার অভিনয়ের ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আমিও চাইতাম বাবা খুশি থাকুক। তাই নয়ের দশকের শেষের দিক থেকে যখন বাংলা সিনেমায় অভিনয় করতে বাবার আর ভাল লাগত না, বারবার অভিযোগ করতেন, খিটখিটে হয়ে যেতেন, তখন আমিই বলি অভিনয় ছেড়ে দিয়ে নাতনি এবং পুত্রবধূর সঙ্গে সময় কাটাতে। সেটা করে বাবা ভালই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবকিছু আর সহ্য না।”

পিতার ছেলে, পিতার বাবা

একটা সময় বাবার সঙ্গে তুলনা ভাল লাগত না শাস্বতর। কিন্তু পরে বুঝলেন, তিনি যে অভিনয়টা করেন, সেটা বাবারই দেওয়া



■ রাজ চক্রবর্তীর ‘প্রলয়’-এ ইনস্পেকটর ‘অনিমেষ দত্ত’ তৈরি করেছেন নিজস্ব ফ্যান বেস

আমার জেঠুতো দাদা ‘পথের পাঁচালী’ দেখে এসে আমার নাম দিয়েছিলেন ‘অপু’। ভাবতে পারিনি, কর্মজীবনে নামটা এইভাবে আমার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।

শিক্ষা। বলেন, “আজ বুঝতে পারি, বাবা কীভাবে অভিনেতা হওয়ার শিক্ষাটা দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন অপেক্ষা করতে। আমি এখন সেই অপেক্ষাটাই করে যাচ্ছি। আমার জেঠুতো দাদা ‘পথের পাঁচালী’ দেখে এসে আমার নাম দিয়েছিলেন ‘অপু’। ভাবতে পারিনি, কর্মজীবনে নামটা

এইভাবে আমার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। আজও যে সততা নিয়ে কাজ করি, সেগুলো বাবা, উত্তমজ্যেষ্ঠ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষকে দেখে শেখা। কাজের প্রতি ভালবাসা ওঁরাই তৈরি করে দিয়েছেন বলা যায়।” কিন্তু কাজের প্রতি ভালবাসা শাস্বতকে কখনও পরিবারের থেকে দূরে নিয়ে যায়নি। এটাও

শুভেন্দুর কাছ থেকেই তাঁর শেখা। এখনও সময় পেলেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান তিনি। তাঁর স্ত্রী মহুয়া স্কুলে ইংরেজি পড়ান। এবং মেয়ে হিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে মাস কমিউনিকেশন এবং ভিডিওগ্রাফি নিয়ে পাশ করেছেন। শাস্বত বলেন, “আমি একটা সময় ভেবেছিলাম বিয়ে করব না। প্রেম-টেম যা দু’-একটা হয়েছিল, সেসব কেটে যেতে আমি একা থাকার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ওসব বললে কী হয়? চারিদিক থেকে জোরজবরদস্তি হতে থাকে। ‘চার্বাক’-এ ব্রততীদি বলে একজন ছিলেন। উনি মহুয়ার কথা এসে বলেন আমাকে। প্রথমে মনে হয়েছিল, ‘একবারে ইংরেজির শিক্ষিকা?’ কিন্তু কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, গোটা আলাপচারিতায় একটা ইংরেজি শব্দও বলল না ও! তারপর আমার স্বশ্রমশাইকে ভীষণ ভাল লেগে গেল। তাই আর বিয়েতে না বলিনি। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, মহুয়া এখনও একই রকম আছে। আমি চেষ্টা

করি, আমি যেগুলো ছোটবেলায় পাইনি, সেগুলো মেয়েকে দিতে। তবে ও এখন এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেটা আমি করলে, বাড়ির লোক আমার পিঠের চামড়া গুটিয়ে দিত। হিয়া পাশ করার পর এখন এক বছর ব্রেক নিয়েছে। ও ভাবতে চায়, জীবনে কী করবে!” কথাটা বলে খুব হাসলেন শাস্বত। আসলে জীবন নিয়ে খুব খুশি তিনি। অন্তত যেটুকু তাঁর কাছে আছে, সেটুকুকেই নিজের প্রাপ্য ভেবে এগিয়ে চলেছেন। যেটুকু পান না, তা নিয়ে অতৃপ্তির কোনও জায়গা তাঁর কাছে নেই। তিনি জানেন, পারিবারিক শিক্ষা তাঁকে অতৃপ্ত হতে দেবে না কখনও।



সুদূরের পিয়াসি

বাংলা বিনোদন
জগতের এই
সুন্দরী নারীরা
যেমন রূপের ছটায়
চোখ ধাঁধিয়ে দেন,
তেমনই অভিনয়ের
গুণে মুগ্ধ করেন
দর্শককুলকে।
তাঁদের নব-নব
সাজে নিয়ে এল
আনন্দলোক

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

সময় তাঁর ব্যস্ততার
কাছে হার স্বীকার
করে। কী করে যে
এত কাজ একসঙ্গে
সামলান এই
দশভূজা, তা শুধু
তিনিই জানেন!

ফোটো: দেবর্ষি সরকার
মেকআপ এবং স্টাইলিং:
কৌশিক এবং রজত
পোশাক: প্রিয়ঙ্কা সিংহ
হসপিট্যালিটি:
পোলো ফ্লোটেল, কলকাতা



কোয়েল মল্লিক

স্নিগ্ধতার মতো
আরও একটি জিনিস
কোয়েলের ক্ষেত্রে
কনস্ট্যান্ট, তাঁর
আন্তরিক ব্যবহার।
সেই আন্তরিকতা
যেন স্পষ্ট ধরা পড়ে
তাঁর ছবিতেও।

ফটো: অমিতাভ সাহা
মেকআপ: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
স্টাইলিং: তদ্বী শাহ

শ্রাবস্তী চট্টোপাধ্যায়

জীবনকে নতুনভাবে
বাঁচার চেষ্টা করেন
শ্রাবস্তী। সেই সঙ্গে
নিজেকেও নতুন-
নতুন চ্যালেঞ্জের
মুখোমুখি ফেলে
পরীক্ষা করেন।

ফোটো: জাভেদ ইব্রাহিম
মেকআপ: প্রিতম দাস
হেয়ার: আশ্রপালি
স্টাইলিং: কিয়রা সেন
হসপিট্যালিটি: পোলো
ফ্লোটেল, কলকাতা

শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

‘ইন্দুবালা’ হয়ে
সকলের মন জয়
করেছেন তিনি।
অভিনেত্রী, স্ত্রী, মায়ের
ভূমিকায় বাজিমাত
করে এবার তিনি
প্রযোজকের ভূমিকায়।
ব্যক্তিত্বে সেই
আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

ফোটো: জাভেদ ইব্রাহিম
মেকআপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা

প্রিয়াক্ষা সরকার

বাড়় ঝাপটা যা-ই
আসুক না কেন,
তাকে শান্ত ঝিলের
মতোই গ্রহণ করেন
প্রিয়াক্ষা। কারণ
তাঁর পাখির চোখ,
'অভিনয়' নামক
অস্ত্রটিকে আরও
শাণিত করে তোলা...



ফোটো: জাভেদ ইব্রাহিম
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: কুশল মল্লিক
পোশাক ও স্টাইলিং: সৌম্য নন্দী
গয়না: অ্যাড্রোস ক্রিয়েশনস
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল, কলকাতা



মিমি চক্রবর্তী

তিনি 'সিঙ্গল' কিন্তু
একা নন। অভিনয়,
রাজনীতি, সারমেয়র
দল এবং সমাজসেবা
তাকে ব্যস্ত রাখে
সারাদিন। মিমি
জানেন, চোখের
মাধ্যমে সম্মোহিত
করতেও।

ফোটো: সায়েন দে

নুসরত জাহান

বিতর্ক তাঁর প্রিয়
সহচরী। সেই কবে
থেকে... এত চাঞ্চল্যেও
নুসরতের নয়ন স্থির।
মন দিয়েছেন কাজে ও
ছেলেকে মানুষ করায়।
যে যা খুশি প্রশ্ন তুলুক,
উত্তর দিতে তাঁর
বয়েই গিয়েছে!

ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: প্রিতম দাস
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
পোশাক: সৌম্য নন্দী
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল, কলকাতা
ফুড পার্টনার: ইলিশ ট্রুলি বং

সোহিনী সরকার

নিজের একটা
স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে
তুলেছেন তিনি।
সিনেমা, সিরিজের
শত ব্যস্ততার
মধ্যেও নাটকের
মঞ্চ ছাড়েননি। তাই
অভিনয়ে করতে
পারেন কিস্তিমাত!

ফোটো: দেবর্ষি সরকার
মেকআপ: সৌরভ দাস
হেয়ার: আম্রপালি
স্টাইলিং: নীল সাহা
পোশাক: প্রশান্ত চৌহান
গয়না: শৌখিন বাই সুত্রানা
লোকেশন: এল এম এন ও কিউ
হেয়ার: করিমস, পার্ক স্ট্রিট

পাওলি দাম

পাওলি অনেকটা
'ওল্ড ওয়াইন'-এর
মতো। সময়ের
সঙ্গে-সঙ্গে নেশা
বাড়তে থাকে, স্বাদ
থাকে অপরিবর্তিত।
পাওলির আবেদনও
কি বাড়ছে না?

ফোটো: উপহার বিশ্বাস
মেকআপ: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: সস্যা
গয়না: সাওয়ানসুখা জুয়েলার্স
হসপিট্যালিটি: জে ডব্লু
ম্যারিয়ট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: চাউম্যান

জয়া আহসান

দুই বাংলার
ছবির জগৎ
জয় করে এবার
তিনি পাড়ি
দিয়েছেন মুম্বই।
জয়ার অভিনয়
এবার দেখবে
সারা ভারত।

ফোটো: উপহার বিশ্বাস
মেকআপ: মৈনাক বিশ্বাস
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক ও গয়না: সস্যা
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল,
কলকাতা

রাইমা সেন

মুন্সইয়ের হাতছানি
একসময় অবহেলা
করেছিলেন। এখন
মুন্সইয়ে নতুন করে
কাজ করছেন, তাই
বাংলায় তাঁকে খুব
একটা পাওয়া যাচ্ছে
না। ‘ব্যালেন্স’-টা
খোঁজার একটু চেষ্টা
করবেন নাকি রাইমা?

ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: মৈনাক দাস
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা

রুক্মিণী মৈত্র

এই ছবির মতো
এথনিক লুকেই এখন
ধরা দিচ্ছেন রুক্মিণী।
নটা বিনোদিনী,
সত্যবতী, দ্রৌপদী...
সাবেক ভারতীয়
নারীর চরিত্রেই তো
পরপর কাজ করছেন!





ঋতাভরী চক্রবর্তী

ফ্যাট টু ফিট, নাকি
ফিট টু ফ্যাট...
কোনটা ঋতাভরীর
বর্তমান পরিচয়?
কোনওটাই নয়,
আসলে তিনি এখন
'মিস ফ্যাটফ্যাট'
বলেই জনপ্রিয়।

ফোটো: জশ মার্টিন
মেকআপ: অর্জুন
হেয়ার: সীমা ঘোষ
স্টাইলিং: পাওলিন

তনুশ্রী চক্রবর্তী

সাফল্য বা ব্যর্থতাকে
কখনও মাথায় চড়তে
দেননি তনুশ্রী। তাই
নিজের ধারাবাহিকতা
ধরে রেখেছেন।
সিঁড়িভাঙা অঙ্ক
করে জীবনে এগিয়ে
চলেছেন একটু
একটু করে।



ইশা সাহা

তিনি সব ধারার
পরিচালকদের প্রিয়।
কখনও 'ইন্দু' হয়ে
জটিল সংসারের
সমাধান খুঁজছেন,
কখনও খুঁজতে
যাচ্ছেন গুপ্তধন।
ইশার জয়যাত্রা
একটি অ্যাডভেঞ্চারে
থেমে থাকার নয়।

ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: সোমা সাহা
স্টাইলিং: সৌম্য নন্দী
হসপিট্যালিটি: দ্য ভবানীপুর
হাউস
ফুড পার্টনার: সপ্তপদী

কৌশানী মুখোপাধ্যায়

জীবনে চলার পথে
চড়াই-উতরাই যা-ই
আসুক, একটা
জিনিসের অভাব
কৌশানীর জীবনে
কোনওদিন হবে
না, আত্মবিশ্বাস।
নিজেকে নিয়ে
ভীষণ আত্মবিশ্বাসী
এই সুন্দরী।



ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: প্রিতম দাস
হেয়ার: গিনি হালদার
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
ড্রেস: কভার স্টোরি
ব্রেজার: জ্বারা
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল,
কলকাতা



মধুমিতা সরকার

বেশ অনেকদিন
ধরে মধুমিতা
অপেক্ষা করছেন
তাঁর দক্ষিণী ডেবিউ
নিয়ো। ‘সবুরে
মেওয়া ফলে’
আগুবাক্যে বিশ্বাস
রাখছেন তিনি।

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: মৌসুমী ছেত্রী
স্টাইলিং: সৃজনী চক্রবর্তী
পোশাক: লেবেল দীপশিখা
অগরওয়াল
গয়না: সারা কস্টিউম জুয়েলরি
হসপিটালিটি: নোভোটেল,
কলকাতা
ফুড পার্টনার: ফাইভ অ্যান্ড ডাইম

সৌরসেনী মৈত্র

হিন্দি ওটিটি সিরিজে
ডেবিউ করেই মাথায়
'তাজ' পরে 'মলিকা-
এ-হিন্দুস্তান' হয়ে
গিয়েছেন তিনি। সেই
তাজটিই এবার ধরে
রাখার পালা...

ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: সাধ্বিকা দেবশর্মা
স্টাইলিং: মাধব সরকার
পোশাক: রিমি নায়েক
গয়না: সারা কস্টিউম জুয়েলরি
হসপিটালিটি: দ্য ভবানীপুর হাউস
ফুড পার্টনার: সপ্তপদী

দর্শনা বণিক

দর্শনার দর্শনেই মন
ভাল হয়ে যায়।
সুন্দরী, লাজুক
এই অভিনেত্রী
ধীরে-ধীরে নিজের
দিগন্ত বিস্তৃত করে
চলেছেন। বড়
বলিউড ডেবিউ
আসছে সামনেই!

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ: বাবুসোনা সাহা
হেয়ার: তনয়া
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
হসপিট্যালিটি: চিজ্জ চেরি
পাইন্যাপল

তাসনিয়া ফারিন

বাংলাদেশের নাটক-
সিনেমার উজ্জ্বল
মুখ তাসনিয়া
এই বঙ্গের একটি
ছবিতেই নিজের জন্য
আবিষ্কার করেছেন
'আরও এক
পৃথিবী'। আর দর্শক
আবিষ্কার করেছেন
তাসনিয়াকে।



ফোটো: নাসির হোসেন

নুসরত ফারিয়া

নাচ, গান, অভিনয়,
সঞ্চালনা কোনটিতে
ব্যুৎপত্তি নেই তাঁর?
নুসরত ফারিয়া যে
বহুমুখী তা কখনও
বোঝা যায় ‘মেনকা’
নাচে, তো কখনও
‘বুঝি না তো
তাই’ গানে।

ফোটো: শিলাদিতা দত্ত
মেকআপ: সোমা সাহা
হেয়ার: সাধ্বিকা দেবশর্মা
স্টাইলিং: নীল সাহা
পোশাক: ওনায়্যা
গয়না: অ্যাড্রোস
ক্রিয়েশনস
হসপিট্যালিটি: দ্য পার্ক,
কলকাতা
ফুড পার্টনার: ওকাও,
এন্টালি

সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়

সুমিত্রার নাম হঠাৎ
করে ফোকাসে
এসে গিয়েছে। কী
করে আটবেন এই
অবাঞ্ছিত চর্চা? তবে
আটকাতে চানও
না তিনি। আপাতত
নিজের জায়গা তৈরি
করতেই ব্যস্ত।

ফোটো: সায়াস্তন দত্ত
মেকআপ: কাজু গুহ
হেয়ার: অভিজিৎ দাস
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
হসপিট্যালিটি: পোলো ফ্লোটেল, কলকাতা

রাফিয়াত রশিদ মিথিলা

বাংলা ছবিতে ডেবিউ
করলেন তিনি। কাজ
করছেন আরও কিছু
ছবিতে। তবে শুধু অভিনয়
নয়, গান, পড়াশোনা, সবই
দক্ষতার সঙ্গে সামলান
তিনি। সবদিকেই যে
ভীষণ আগ্রহ তাঁর!



■ মেয়ে মালতী মারির সঙ্গে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

আপনজন

দর্শকই ফিল্ম সেলেবদের ‘পরিবার’। তবে সত্যিকারের পরিবার-পরিজনদের প্রতি কতটা যত্নশীল এই সেলেবরা? পরিজনদের কতটাই বা কাছের মানুষ?

নিজেকে মানুষের দরবারে পেশ করেছে যে সেলেব, তার আবার ‘সংসার’ কী? বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত তারকাদের কোটি কোটি ভক্ত, সারা দেশ যাঁদের মুখ চেয়ে

থাকে, যে দর্শককুল তাঁদের ‘তারকা’ বানিয়েছে, তারাই তো তারকার সংসার। তবে সত্যিই কি তাই? যে দর্শক আজ শীর্ষে স্থান দিয়েছে, সে দর্শকই কাল এক টানে নীচে নামিয়েও আনতে

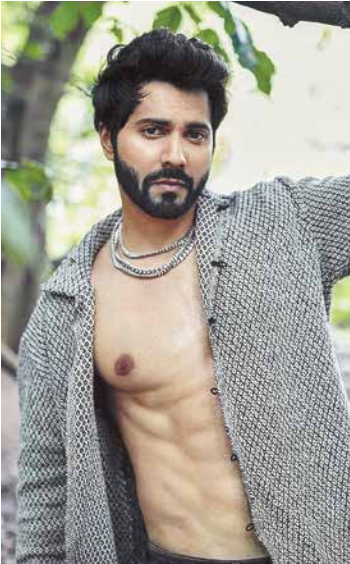


করেছিলেন তিনি, তাতে মনে হয়েছিল, বিয়েটাও বুঝি ব্র্যান্ড প্রিয়ঙ্কার অংশ। তবে পপস্টার নিক জোনাস, যিনি প্রিয়ঙ্কার চেয়ে বয়সে এগারো বছরের ছোট, একটি সম্পর্কে বেঁধে ফেলেছেন তাকে। শারীরিক জটিলতার কারণে প্রিয়ঙ্কা গর্ভধারণের ঝুঁকি নেননি। সারোগেসির সাহায্যে মেয়ে মালতী মারিকে পৃথিবীতে এনেছেন। এবং বর্তমানে মা হিসেবে জীবন উপভোগ করছেন। প্রিয়ঙ্কা মেয়ের জন্মের পরই শুট করেছেন অ্যাকশন সমন্বিত ‘সিটাডেল’ সিরিজের। কিন্তু জোনাস পরিবারের একটি অনুষ্ঠানেও তিনি বাদ ছিলেন না। ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাতায়াত করে উপস্থিত থেকেছেন জোনাসদের পারিবারিক কমেডি থ্রিলে, ওয়াল অফ ফেম অনুষ্ঠানে, নিকের

জোনাস পরিবারের একটি অনুষ্ঠানেও তিনি বাদ ছিলেন না। ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাতায়াত করেছেন নিয়মিত

■ নিক ও জো জোনাস এবং সোফি টার্নারের সঙ্গে বাল্কেটবল ম্যাচ দেখতে গ্যলারিতে প্রিয়ঙ্কা

পারে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থের ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার পঙ্ক্তি অবতারণা করি, “মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা...”। এই যে ‘সত্য’, যাকে ধ্রুবতারা করে সেলেব্রিটিরা এগিয়ে যান, তা-ই হল পরিবার, সংসার। কারণ দর্শক মুখ ফিরিয়ে নিলেও পরিবার মুখ ফেরায় না। এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেই এই সময়কার প্রিয় তারকারা পরিবারকে করেছেন পাথেয়। হয়েছেন ঘোর সংসারী।



■ সংযুক্ত ধওয়ান পরিবারের সদস্য বর্ণণ

পারিবারিক পি সি

স্বাধীনচেতা এবং চৌকিচাকা প্রিয়ঙ্কা চোপড়া কোনওদিন থিতু হবেন, কেউ ভাবেনি। কিন্তু ‘সংসার’ স্বপ্ন কত মানুষকেই না পাল্টে দেয়। প্রিয়ঙ্কা কখনও নামের পাশে স্বামীর পদবি জুড়বেন, এ-ও তো অবিশ্বাস্য। যেভাবে বিভিন্ন এনডারস্ট্যান্ড নিয়ে একটি বিয়ে

জন্মদিনে এবং জোনাস ভাইদের প্রিয় বাল্কেটবল ম্যাচেও! আবার বোন পরিণীতির বাগদান অনুষ্ঠানে উড়ে এসেছেন দিল্লিতেও। প্রিয়ঙ্কা যে কীভাবে এত কাজ, নিজের রেস্টোরাঁ, হেয়ার কেয়ার ব্র্যান্ডের প্রচার সব সামলে পারিবারিক এক নারী হয়ে উঠেছেন, কোথা থেকে খুঁজে পেয়েছেন এই

ভারসাম্য, বলা মুশকিল। তবে নিঃসন্দেহে ‘ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স’-এর ক্লাস তিনি নিতে পারেন।

জুহর সেই ছেলেটি

বরুণ ধওয়ান এবং নতাশা দলাল ফার্টিলিটি ক্লিনিক থেকে বেরোচ্ছেন, অতএব পরিবারে নতুন সদস্য আসছে। এবছরের শুরুতে এমনই গুঞ্জন উঠেছিল। এমনিতে লকডাউনে এক বিগল-শাবককে দত্তকপুত্র বানিয়েছেন বরুণ। তবে শেষমেশ দেখা গেল, ফার্টিলিটি ক্লিনিকের পাশে ডার্মাটোলজিস্টের চেম্বারে গিয়েছিলেন বরুণ ও নতাশা। বরুণ সম্পর্কে তাঁর বাবা ডেভিড ধওয়ান বলেছিলেন, “ও যতই পয়সা রোজগার করুক, বড়া পাও খেতে জুহুতেই যাবে।” পরিবারের ছোট ছেলে বরুণ, নিজের সঠিক অভিভাবক মনে করেন দাদা রোহিতকে। বাবাকে নয়,



■ বোন এবং পোষ্যর সঙ্গে কার্তিক

সাবা সেলেবহুডে হত্যিকের ধারে কাছে আসেন না। তথাকথিত সুন্দরীও নন। কিন্তু সাবার প্রতি প্রকাশ্যে প্রেম জানান দিতে পিছপা হননি হত্যিক। পরিবারের সদস্য এখন সাবা আজাদ

দাদাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পান তিনি। কারণ দাদা নাকি ভীষণ কড়া হাতে মানুষ করেছেন বরুণকে। দাদা-বৌদি তো বটেই, দাদার মেয়েকে বড্ড বেশি ভালবাসেন বরুণ। কেরিয়ার এবং ব্যস্ততার সূত্রে লকডাউনের আগেই তিনি নিজের আলাদা ফ্ল্যাট কিনে শিফট করেছিলেন। বিয়ের প্রস্তুতিও ছিল। তবে গোটা লকডাউন মা-বাবা, দাদা-বৌদির সঙ্গে পুরনো বাড়িতেই কাটিয়েছেন তিনি। বরুণের বিয়েটাও ছিল পরিবার-পরিজন ঘেরা। ইন্ডাস্ট্রির কেউ সেখানে নিমন্ত্রিতও ছিল না। যত হিট ছবিই তাঁর ঝুলিতে থাকুক না কেন, এখনও নিজে হাতে ক্ষীর



■ মায়ের বানানো ক্ষীর খাচ্ছেন কার্তিক

বানিয়ে বাবাকে ইমপ্রেস করতে পারলে, সেটাই বরুণের সবচেয়ে বড় পুরস্কার বলে মনে হয়। এবং সেরা পাসটাইম, স্ত্রী নতাশা এবং পোষ্য জোয়ারি সঙ্গে সময় কাটানো। ওই যে বরুণ কথায় কথায় বলেন, ‘আয়্যাম জাস্ট আ জুহু বয়!’

রোশন রোশন ঘরবাড়ি

হত্যিক রোশন মানুষটি বরাবরই বেশ পরিবার ঘেঁষা। তবে সুজ্ঞানের সঙ্গে



■ সাবার সঙ্গে (পাশে)। রোশন পরিবারের সঙ্গে সাবা আজাদ



■ মীরার পারিবারিক অনুষ্ঠানে শাহিদ- মীরা

হত্যাকার বিবাহবিচ্ছেদ, কঙ্গনা রানাওতের সঙ্গে কেছায় নাম জড়ানোর ফলে একটি গুজব বেশ ছড়ায়, হত্যাকার আদতে ভীষণ ‘নার্সিসিস্টিক’। তবে হত্যাকার পারিবারিক জীবন কিন্তু সেকথা বলে না। হত্যাকার দিদি সুনয়না একটি মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় হত্যাকার নামে মিডিয়ার কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এই মর্মে যে, রোশন পরিবার তাঁর প্রেমের সম্পর্ক মেনে নেয়নি, ভাই হত্যাকার পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু হত্যাকার কোনওদিন দিদির বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি। বরং, আরও বেশি করে আগলেছেন তাঁকে। বাবা রাকেশ, মা পিংকিকে নিয়মিত ওয়র্কআউট করানোর দায়িত্ব তাঁর। এবং সেই কর্তব্যে তিনি কখনও ফাঁকি দেন না। দুই ছেলেকে নিয়ে সময় কাটানো, হুহান ও হুদানের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়া, বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নেওয়া খুব আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন হত্যাকার। এবং তিনি যে আদ্যন্ত ফ্যামিলি ম্যান, সেকথা বারবার স্বীকার করেছেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সূজানা। এমনকি কঙ্গনার সঙ্গে যখন তাঁর বিবাদ তুঙ্গে, সেসময়ও হত্যাকার হাত ধরেছেন সূজানা। বিচ্ছেদের পরও। বর্তমানে হত্যাকার জ্যাজ্জ গায়িকা এবং অভিনেত্রী সাবা আজাদের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে লিপ্ত। এই নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ট্রোল হয়েছে। সাবা সেলেব্রিটি হত্যাকার ধারে কাছে আসেন না। তথাকথিত সুন্দরীও নন। কিন্তু সাবার প্রতি প্রকাশ্যে প্রেম জানান দিতে পিছপা হননি হত্যাকার। এখন সাবাও রোশন পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এমনকি, হত্যাকার কাকা, সঙ্গীত পরিচালক

রাজেশ রোশনের পরিবার এবং তুতো ভাইবোনদের সঙ্গেও নিয়মিত সময় কাটান হত্যাকার। বাইরে নয়, বাড়িতেই সকলের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করেন তিনি। তবে সকলেই আতঙ্কিত থাকেন, পাছে হত্যাকার তাঁদের জিমে নিয়ে ওয়র্কআউট করতে শুরু করেন!

খাসা ছেলে শাশা

শাহিদ কপূরের ভক্তদের বলে দেওয়ার দরকার নেই যে তাঁর ডাকনাম ‘শাশা’। শাহিদের পরিবার নিয়ে বলতে গেলে কিছু ভূমিকা দরকার। শাহিদের মা নীলিমা অজিম, পিতা পঙ্কজ কপূর। বিচ্ছেদের পর পঙ্কজ বিয়ে করেন সুপ্রিয়া পাঠককে এবং নীলিমা বিয়ে করেন রাজেশ খট্টরকে। শাহিদ ছোটবেলা থেকেই পরিবারের প্রতি ভালবাসা লালন না করলে হয়তো তাঁর বৃহৎ পরিবারটি টিকত না। ঈশান খট্টর নিজমুখে স্বীকার করেন, ছোটবেলা থেকে শাহিদের ভালবাসা, গাইডেন্স পেয়ে বড় হয়েছেন। ঈশান কিন্তু তাঁর সৎভাই।

ঈশান স্বীকার করেন, ছোটবেলা থেকে শাহিদের ভালবাসা, গাইডেন্স পেয়েছেন। আবার, পঙ্কজ-সুপ্রিয়ার মেয়ে সানা কপূরের বলিউড ডেবিউ হয়েছিল শাহিদের সাহায্যেই



■ সৎ ভাই ঈশানের সঙ্গে (উপরে)।
পঙ্কজের দ্বিতীয় পক্ষেরও প্রিয় শাহিদ

আবার, পঙ্কজ-সুপ্রিয়ার মেয়ে সানা কপূরের বলিউড ডেবিউ হয়েছিল শাহিদের সাহায্যেই (‘শানদার’)। সানার বিয়ের কনেকর্তা ছিলেন শাহিদই। বিয়ের যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেছেন বড় দাদার মতো। এবং শুধু তা-ই নয়, মা নীলিমার দ্বিতীয়পক্ষ রাজেশ খট্টরের সঙ্গেও শাহিদের সম্পর্ক তেননই ভাল! অন্যদিকে সুপ্রিয়ারও প্রিয় শাশা। এমন নিদর্শন কিন্তু উন্মুক্তমনা বলিউডেও খুব কম। অর্জুন কপূর এবং জাহ্নবী কপূরের মধ্যে বরফ গলতে সময় লেগেছিল বহু বছর! তা-ও শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর তিজতা ভুলতে পেরেছিলেন অর্জুন। সেখানে শাহিদ ছোটবেলা থেকেই পরিবারের প্রতি এত দায়িত্বশীল, মমত্বময়... ব্যক্তি হিসেবে এ তাঁর বৃহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। তবে প্রেমের সম্পর্কে বরাবরই হতভাগ্য ছিলেন তিনি। করিনা কপূর, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, বিদ্যা বালনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালেও কোনওটাই টেকেনি। মীরা রাজপুতের সঙ্গে সম্বন্ধবিবাহেই তিনি থিতু হন। বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও এই সম্পর্ক নিয়ে শাহিদ প্রথম থেকেই ছিলেন সিরিয়াস। এখনও মীরা এবং দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে প্রায়ই ছুটি নেন কাজ থেকে। আবার মীরার পরিবারেরও প্রিয় শাশা। মীরার মা-বাবার ৪০তম বিবাহবার্ষিকীতে নেচে আসার

জমিয়ে দিয়েছিলেন শাহিদ এবং তাঁর ভাই ঈশান। মাঝেমাঝে মীরাও সঙ্গে দিয়েছেন বটে, তবে দুই ভাইয়ের সঙ্গে এনার্জিতে পেরে ওঠেননি!

মা দা লাডলা

কার্তিক যখন মুম্বইতে স্ট্রাগল করছিলেন, তখন ১১ জনের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। তখনই ঠিক করে নিয়েছিলেন, একদিন এই শহরেই নিজের একটি আস্তানা তৈরি করবেন এবং মা-কে নিয়ে আসবেন। কারণ মা ছাড়া তাঁর খাবারের ব্যাপারটা কেউ বোঝে না! ধালিয়রের ছেলে কার্তিক স্ট্রাগলের দিন পেরিয়ে এখন বলিউডের হার্টথ্রব। এবং ঘোষিত ‘প্লেবয়’-ও বটে। ছেলের এই খামখেয়ালিপনা মোটে পছন্দ নয় মায়ের। তাই ছেলেকে এই শহরে একা রাখার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব কার্তিক নিয়ে এলেন মাকে মুম্বই শহরে। বর্তমানে শাহিদ কপুরের পুরনো বাংলায় ভাড়া থাকেন কার্তিক এবং সঙ্গে শুধু মা নন, বাবা, বোন এবং একটি পোয়াও থাকে। আগে যে কার্তিক পার্টি, বাউন্ডলেপনায় ব্যস্ত থাকতেন, এখন অধিকাংশ সময় পরিবারের সঙ্গেই কাটান। বোনের সঙ্গে তার রিল তো বেশ জনপ্রিয়! মায়ের হাতের রান্না খেয়ে শুটিংয়ে যান। বাড়ি ফিরেও মা-বাবার সঙ্গে বসে সিরিজ-সিনেমা দেখেন। তবে বাবার চেয়ে মায়ের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব বেশি, ভয়ও পান বেশি তাঁকেই। কার্তিক যখন একটি বিলাসবহুল স্পোর্টস কার কিনেছিলেন, প্রথম রাইডে কার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন জানেন? মায়ের সঙ্গে। মাকে সেই গাড়ির সামনের সিটে বসিয়ে মুম্বই দর্শন করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই পাপারাজি মহলে কার্তিকের নাম ‘মা দা লাডলা’।

মা-বাবার বাধ্য মেয়ে

কৃতি স্যানন মায়ের বারণের জন্য করণ জোহরের ‘লাস্ট স্টোরিজ’-এর শর্ট ফিল্মটির অফার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেটি কিয়ারা আডবাণীর কাছে যায় এবং ভীষণ জনপ্রিয় হয়। তবে কেরিয়ারের গোড়াতেই করণ জোহরকে বারণ করে দেওয়া... মানে বুঝতে পারছেন, পরিবারের সম্মতি কৃতির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আসলে চার্চাড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাবা এবং ফিজিক্স অধ্যাপক মায়ের মেয়ে কৃতি পাশ করেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং। তা-ও ইলেকট্রনিক্সে। ফলে তিনি অভিনয়ে আসার কথা জানানোয়

সুশান্ত সিংহ রাজপুতের সঙ্গে কৃতির ব্রেক-আপ হওয়ার পর পরিবার কৃতিকে একা রাখতে চায়নি। ফলে দিল্লি থেকে...



■ কৃতির জীবনের স্তম্ভ মা-বাবা এবং বোন নূপুর



ঘাবড়েই গিয়েছিলেন মা-বাবা। তবে মেয়েকে বাধা দেননি দিল্লি থেকে মুম্বই যেতে এবং নিজের স্বপ্নপূরণ করতে। শর্ত ছিল একটাই, কোনওরকম বিতর্কিত দৃশ্যে অভিনয় করা যাবে না এবং প্রথম দুটো ছবি সফল না হলে ফিরে এসে এম টেক-এর প্রস্তুতি নিতে হবে। যাই হোক, ‘হিরোপন্ডি’ এবং ‘দিলওয়ালে’ সফল হওয়ায় ফিরে যেতে হয়নি কৃতিকে। উল্টে তিনিই মুম্বই নিয়ে এসেছেন মা-বাবা ও বোনকে। এর আর একটা কারণ হল, সুশান্ত সিংহ রাজপুতের সঙ্গে কৃতির ব্রেক-আপ হওয়ার পর পরিবার কৃতিকে একা রাখতে চায়নি। আর ওই ব্রেক-আপের ঝড় সামলে তিনি পরিবারে ভর করেই পেশার প্রতি মনোযোগী হতে পেরেছেন। নিজের ফিটনেস চেন খুলেছেন। বোন নুপুর



■ বাবা বেঁচে থাকাকালীন আয়ুত্থানের গোটা পরিবার



বাবার স্মৃতিচারণের ভিডিয়োতে ভ্রাতৃদ্বয় গান চালিয়েছিলেন, ‘আয়াম আ ডিস্কো ডান্সার’। বাবা বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে যেন খুরানা পরিবারের আনন্দময় জীবনযাপনে ব্যাঘাত না ঘটে

স্যাননকে গান এবং অভিনয়ের জগতে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য জনপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছেন। এক-একটি ছবির শুটিং সেরেই মা-বাবা এবং বোনকে নিয়ে ঘুরতে চলে যাওয়া তাঁকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। পরিবারের বাইরে সময় কাটানো কৃতির কাছে বড়ই বিরক্তিকর। ফলে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও ইন্ডাস্ট্রির কারও সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই তাঁর।

যে পরিবার সদা আনন্দময়

খুরানা পরিবারের আত্মা তাঁদের জীবনীশক্তি। কেন্দ্রে আয়ুত্থান খুরানা। আয়ুত্থান খুরানা যখন চণ্ডীগড় থেকে মুম্বই আসেন অভিনেতা হতে, তখন কেবল অভিনেতার কাজ ছিল না তাঁর কাছে। রেডিয়ো জকি ছিলেন, গানের ব্যান্ড ছিল, সঞ্চালনা করতেন... ফলে কাজের অভাব ছিল না। স্ত্রী তাহিরা কশ্যপ তাঁর জীবনের অন্যতম স্তম্ভ। নিজে অধ্যাপনা করে আয়ুত্থানের স্টাগলের দিনগুলিতে তিনি পাশে ছিলেন। মজাটা হল, ভাই অপারশক্তি খুরানাও ঠিক একই ধরনের কাজ করেছেন জীবনে। সঞ্চালনা, রেডিয়ো, গান... দুই ভাই যেন একই রকম। তবে দাদার পিঠে ভর করে অভিনয়ের মাটি শক্ত করেননি অপারশক্তি। দুই ভাই-ই যখন মুম্বইতে শক্ত জমি তৈরি করেছেন, তখন বাবা-মাকে চণ্ডীগড় থেকে নিয়ে আসেন তাঁরা। এই যে আয়ুত্থানের নামের বানান, তা ঠিক

করে দেন তাঁর জ্যোতিষী বাবা। স্ত্রী তাহিরা কশ্যপ যখন ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তাঁর ম্যাসটেকটমি হয়, তখন আয়ুত্থান ‘দম লগাকে হইশা’, ‘বধাই হো’ নিয়ে চরম ব্যস্ত। পুরো অপারেশনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছিল খুরানা পরিবার। কিছুদিন আগে আয়ুত্থানের বাবার আকস্মিক মৃত্যু হয়। বাবাকে নিয়ে স্মৃতিচারণের ভিডিয়োতে ভ্রাতৃদ্বয় গান চালিয়েছিলেন, ‘আয়াম আ ডিস্কো ডান্সার’। কারণ বাবা বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে যেন খুরানা পরিবারের আনন্দময় জীবনযাপনে ব্যাঘাত না ঘটে এবং তাঁর স্ত্রীর যেন খেয়াল রাখে ছেলেরা। তার কিছুদিন পরের দৃশ্য, মা-এর দু’হাত ধরে দুই ভাই নিয়ে যাচ্ছেন এয়ারপোর্টে। চণ্ডীগড়ের বাড়িতে। আয়ুত্থানের সাফল্যে ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধু তৈরি হয়েছে প্রচুর। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির বড় দিওয়ালি পার্টিগুলিতে তিনি যান না। তিনি এবং স্ত্রী তাহিরা বাড়িতেই পরিবারের সকলকে নিয়ে দিওয়ালি পার্টি দেন, যেখানে ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুবান্ধবও আসেন। এবং দেখতে-দেখতে সেই পার্টি এখন বলিউডের অন্যতম বড় দিওয়ালি পার্টিতে পরিণত হয়েছে। পরিবার পাশে থাকলে কী না হয়!

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পর্ক রোজ নতুন মোড় নেয়। আজ সেখানে আলো তো কাল অন্ধকার। কিন্তু পরিবার পাশে থাকলে সাফল্যের সূর্য ডোবে না। এই মন্ত্র বুঝতে পেরেই নবপ্রজন্মের তারকারা পরিবারেই রেখেছেন আস্থা। শুধু আশ্রয় পাওয়ার আশায় নয়, দেওয়ার নিষ্ঠা থেকেও। কারণ ‘অপনে তো অপনে হোতে হায়’।

অংশুমিত্রা দত্ত



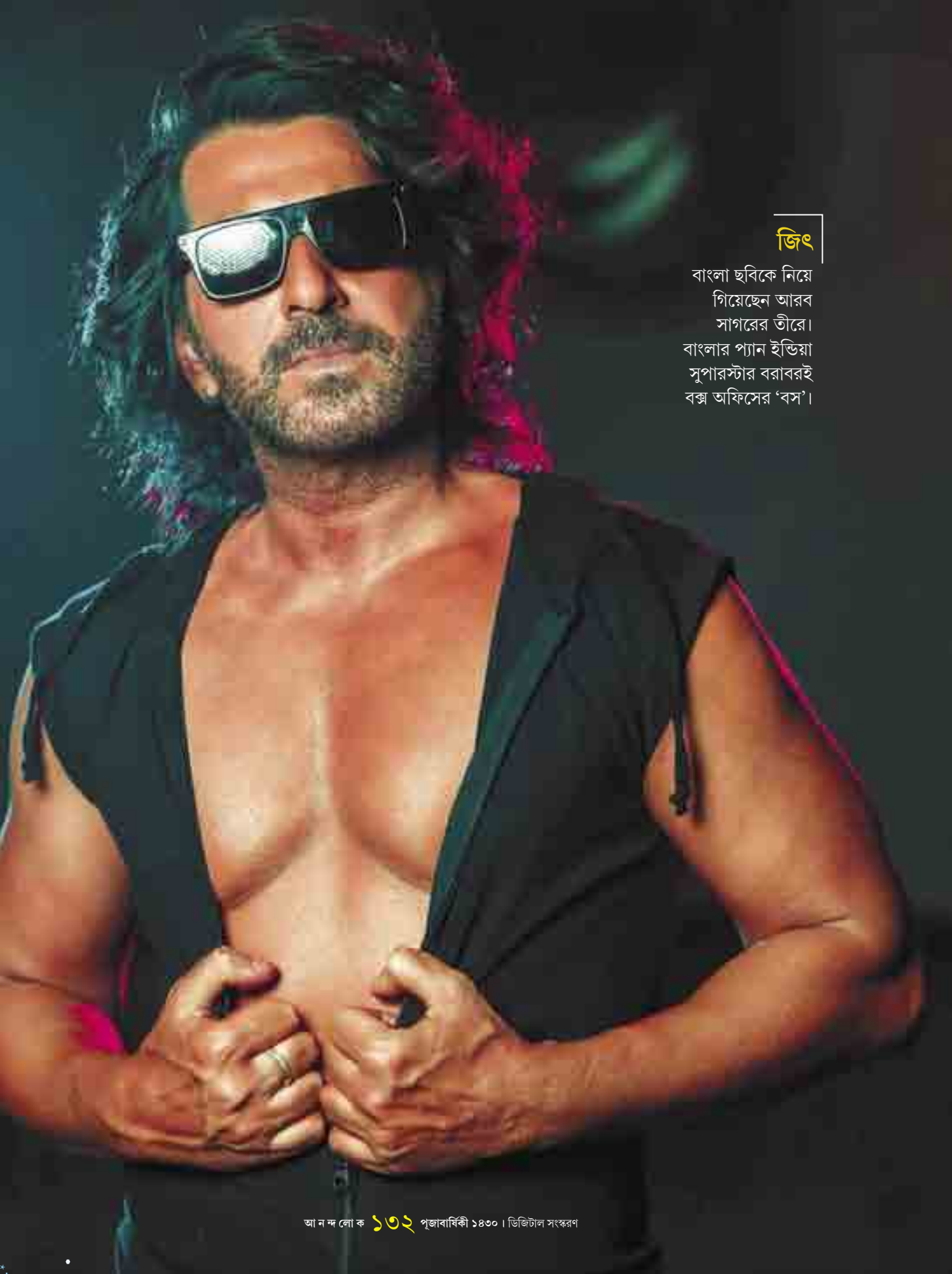
নক্ষত্রের সমাবেশ

পরদায় চরিত্র অনুযায়ী
তাঁদের ভিন্ন লুক
দেখা যায়। কিন্তু
আনন্দলোক-এর জন্য
টলিউডের নায়করা
ধরা দিলেন গ্ল্যামারাস
ফ্যাশন শুটে...

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ছবির অভিনেতা,
তিনিই ইন্ডাস্ট্রি। বাংলার
গণ্ডি পেরিয়ে মুম্বইতেও
অন্যায় বিচরণ। তাঁর
শৃঙ্খলা ও কর্মনিষ্ঠা
তাক লাগিয়ে দেয়
সদ্য ইন্ডাস্ট্রিতে আসা
অভিনেতাদের।

ফোটা: শুভদীপ ধর
মেকআপ ও হেয়ার: সুভাষচন্দ্র বেরা
স্টাইলিং: পোলোমী গুপ্ত
পোশাক: সুরভী পনসারি
ফুড পার্টনার: চাচা জান,
পিকনিক গার্ডেন
হসপিট্যালিটি পার্টনার: আইটিসি
রয়্যাল বেঙ্গল, কলকাতা



জিৎ

বাংলা ছবিকে নিয়ে
গিয়েছেন আরব
সাগরের তীরে।
বাংলার প্যান ইন্ডিয়া
সুপারস্টার বরাবরই
বক্স অফিসের 'বস'।

দেব

যত দিন গিয়েছে
নিজেকে নতুন ভাবে
চ্যালেঞ্জ করেছেন।
নিখাদ বাণিজ্যিক
ছবির তারকা থেকে
পারিবারিক কনটেন্ট
সিনেমার কিং,
নিজেকে বারবার
ভেঙেছেন নতুন
‘ব্যোমকেশ’।

ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ ও হেয়ার: অরুণ মন্ডল
পোশাক: অভিষেক রায়
ফুড পার্টনার: অউথ ১৫৯০
লোকেশন: দ্য পার্ক, কলকাতা



জিশু সেনগুপ্ত

বাংলা, মুম্বই,
হায়দরাবাদ... তিন
ইভাঙ্কিই আপন
করে নিয়েছে তাঁকে।
ইদানীং বাংলা ছবির
সর্বভারতীয় মুখ
বলতে প্রথমেই মনে
আসে তাঁর কথা।

ফোটো: অনিবার্ণ সাহা

আবির চট্টোপাধ্যায়

খাঁটি বাঙালিয়ানায়
মোড়া 'সোনাদা'
বা 'ব্যোমকেশ'।
আবার মেয়েদের
হাটথ্রবও বটে। এমন
নায়কোচিত প্যাকেজ
আর সহজে
কোথায় পাবেন!

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

সেরিব্রাল নায়ক।
বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে
জমিয়ে কাজ
করছেন। পাশাপাশি
সফল পরিচালক-
প্রযোজকও তিনি। এ
তো রীতিমতো
বিরল কন্সিনেশন!

ফোটো: দেবর্ষি সরকার
মেকআপ ও হেয়ার: কুনাল সাহা
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: বিসুটেড, কলকাতা
ফুড পার্টনার: করিমস, পার্ক স্ট্রিট
লোকেশন: এল এম এল ও কিউ, কলকাতা

সোহম

সিনেমা ও রাজনীতি
হাত ধরাধরি করে
চলে তাঁর কেরিয়ারে।
আবার আদ্যন্ত
ফ্যামিলিয়ানও তিনি।
পাশের বাড়ির ছেলের
ইমেজেই বাজিমাত
করেছেন বারবার।

ফোটো: শুভদীপ ধর

ঋত্বিক চক্রবর্তী

বাংলা ছবির সম্পদ
তিনি। সাবলীল
অভিনয়গুণে আট
থেকে আশি, সকলকে
বুঁদ করে রাখেন।
পিআর স্কিল না
থাকলেও যে জনতার
প্রিয় হওয়া যায়, তা
দেখিয়েছেন ঋত্বিক।

অক্লুশ

নাচ, অ্যাকশন,
কমেডি... সবেতেই
তিনি ওস্তাদ। আবার
ছোট পরদায় সঞ্চালক
হিসেবেও লম্বা ইনিংস
খেলেছেন। শুধু
একটাই প্রশ্ন, বিয়েটা
কবে করবেন?

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ: সৌরভ মিত্র
হেয়ার: শর্মিষ্ঠা মাঝি
স্টাইলিং: সিদ্ধা ও তনুমিতা
ফুড পার্টনার: ক্যান্টিন পাব
অ্যান্ড গ্রাব, সল্টলেক
হসপিট্যালিটি পার্টনার:
দ্য পার্ক, পার্ক স্ট্রিট

বনি সেনগুপ্ত

সাফল্য, বিতর্ক
মিলিয়ে বেশ
অনেকগুলো বছর
কাটিয়ে ফেললেন
ইন্ডাস্ট্রিতে। স্টেডি
থ্রেমিক হিসেবেও
বেশ সুনাম
আছে তাঁর।

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: প্রিতম দাস
হেয়ার: গিনি হালদার
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: জ্বারা ও এইচ
এন এম
হসপিট্যালিটি পার্টনার:
নোভোটেল, কলকাতা

যশ

পঞ্জিটিভের
চেয়ে নেগেটিভ
পাবলিসিটিতেই
বেশি থাকেন। তাঁর
ট্যানট্রামের খবরও
সুবিদিত। তবে
সেসবকে পাত্তা না
দিয়ে নিজের শর্তে
জীবন বাঁচেন তিনি।



বিক্রম চট্টোপাধ্যায়

সুপুরুষ। মেয়েদের
দ্রাশ। তাঁর হাসিতে
নাকি মন গলে যায়
অনেকের। নায়ক
সযত্নে ধরে রেখেছেন
তাঁর পাশের
বাড়ির চকোলেট
বয়ের ইমেজ।



অনিবার্ণ ভট্টাচার্য

তাঁর অভিনয় দক্ষতার
প্রমাণ বারবার
পেয়েছেন দর্শক।
সঙ্গে দক্ষ পরিচালকও
বটে। মঞ্চ থেকে
পরদা, সর্বত্র অনায়াস
যাতায়াত। এমন
একজন নায়ক, বিয়ের
পরেও যাঁর মহিলা
ভক্তের সংখ্যা
কমেনি একটুও।

ফোটো: শুভদীপ ধর
মেকআপ ও হেয়ার: অনিরুদ্ধ চাকলাদার
স্টাইলিং: নীল সাহা

অনিবার্ণ চক্রবর্তী

একেনবাবু-র আইকনিক
চরিত্রে অভিনয়
করে দর্শকমনে ছাপ
ফেলেছেন। তবে সেই
চরিত্রের ছক ভেঙে
নিজেকে ভাঙছেন-
গড়ছেন প্রতিদিন।
পরিশ্রমের কোনও
বিকল্প হয় না,
বুঝিয়েছেন তিনি।

ফোটো: অনিবার্ণ সাহা

অর্জুন চক্রবর্তী

মহিলা মহলে বেশ
জনপ্রিয়, তবে তাতে
মাথা ঘুরে যায়নি
তাঁর। অভিনয় করে
ধারাবাহিক সাফল্য
বজায় রেখেছেন। বাবা
অভিনেতা, দাদাও
তাই। তবুও স্বাতন্ত্র্যে
উজ্জ্বল তিনি।



A full-page photograph of a man with dark hair and sunglasses, wearing a vibrant red suit jacket and matching trousers over a black shirt. He is sitting on a blue, textured sofa, leaning back with his legs crossed at the ankles. The background is a dark, textured wall.

ওম

‘রঙ্গবতী’-র উন্মাদনা
ফিকে হয়নি।
সেই গান থেকে
যেন নতুন করে
পরিচিতি পেয়েছেন
তিনি। নাচ,
অ্যাকশন, চেহা়রায়,
পারফরম্যান্সে স্টেডি
রিপোর্ট কার্ড তাঁর।

ফোটো: দেবর্ষি সরকার
মেকআপ: সোমা সাহা
হেয়ার: পিয়া দাস
স্টাইলিং: অরিজিৎ মাইতি
হসপিটালিটি পার্টনার: পোলো ফ্লোটেল, কলকাতা

সত্যম ভট্টাচার্য

সিনেমা, ওটিটি
মিলিয়ে 'বল্লভপুরের
রাজকুমার'-এর
সময়টা বেশ ভাল
যাচ্ছে। বাংলা
সিনেমার ভবিষ্যতের
ব্যাটন কি নিতে
পারবেন তিনি?

ফোটো: অনিবার্ণ সাহা



■ ইয়াসমিন জোসেফ থেকে
হয়ে উঠেছিলেন মন্দাকিনী

সাহসী এক সুন্দরী

কেরিয়ারের প্রথম ছবিতেই নগ্ন দৃশ্যে অভিনয়! কুখ্যাত মাফিয়া ডনের সঙ্গে প্রেম, কেরিয়ারের মাঝপথে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসা... এরকম নায়িকাকে সাহসী বলবেন না তো কাকে বলবেন? কথা হচ্ছে **মন্দাকিনী**-কে নিয়ে। মুম্বইয়ে তাঁর সম্মুখীন আসিফ সালাম

কিছু-কিছু নাম থাকে, যা শুনলেই শরীরে শিহরণ জাগতে বাধ্য। মন চঞ্চল হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। ইয়াসমিন জোসেফ নামটা শুনলে হয়তো আপনি নড়েচড়ে বসবেন না, কিন্তু যদি বলি মন্দাকিনী? অবশ্যই তা হবে। একদিকে তিনি যতটা লাস্যময়ী, অন্যদিকে ঠিক ততটাই বিতর্কিত। এরকম কন্ট্রিভিশনের কাউকে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলে, তা যে-কোনও সাংবাদিকের কাছেই বাড়তি পাওনা। মুম্বইয়ে জুছর কাছে এক কফি শপে যখন তাঁর দেখা পেলাম, তখন মধ্যরাত। চারিদিকে রাতের অন্ধকার নেমে এলেও সেই মানুষটিকে ঘিরে ছিল এক অভূতপূর্ব ঔজ্জ্বল্য। ৫৫-তে পা রাখার পরেও রাজ কপুরের ‘গঙ্গা’র ঔজ্জ্বল্যের ধার যেন এতটুকুও কমেনি। আড্ডা শুরু হল ১৯৮৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মন্দাকিনীর ডেবিউ ব্লকবাস্টার ছবি ‘রাম তেরি গঙ্গা ম্যায়লি’ দিয়ে...

রাজ কপুরের কটেজে চুড়িদারেই বাজিমাত!

কিছু-কিছু অভিনেতা থাকেন, যাঁদের কেরিয়ারে একটি ছবিই মাইলস্টোন হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে তাঁরা একাধিক ছবি করলেও, সেই একটি ছবিই তাঁদের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। মন্দাকিনীর ক্ষেত্রে সেই ছবি হল রাজ কপুর পরিচালিত ‘রাম তেরি গঙ্গা ম্যায়লি’। তবে এই ছবিতে যে তিনি সুযোগ পেয়ে যাবেন, তা কল্পনাও করেননি ইয়াসমিন জোসেফ। রাজ কপুর সেই সময় ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছবিতে সুযোগ পাওয়া আর হাতে চাঁদ পাওয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মন্দাকিনীর জীবনে সেই অসাধ্য সাধন কীভাবে হল, তা নায়িকা নিজেই জানালেন। ব্ল্যাক কফি আর পনির পায় অর্ডার দিয়ে মন্দাকিনী জানালেন, “আমার জন্ম মিরাতে। ছোটবেলা থেকেই নাচগানের দিকে



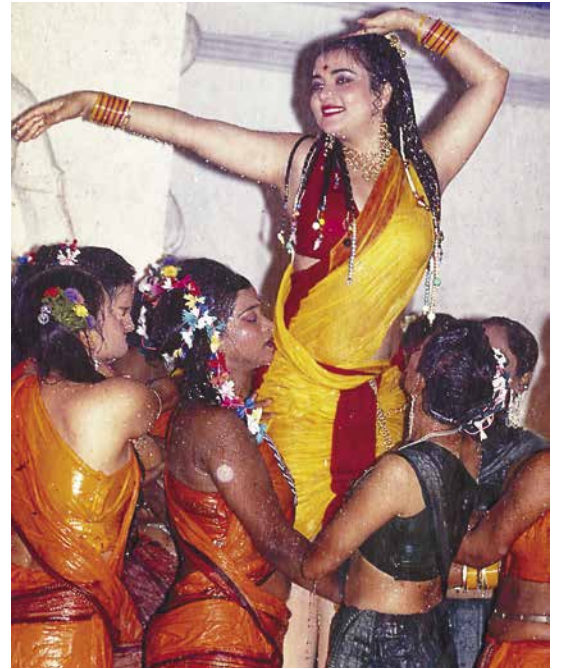
যাই তখন কিন্তু আমার মাত্র ১৭ বছর বয়স। আমি একটা সাধারণ চুড়িদার পরেছিলাম। রাজজি একটা বই পড়ছিলেন, আমি রুমে ঢুকতেই উনি চোখ তুলে তাকান। তারপর প্রথম প্রশ্ন আমাকে করেন, ‘তোমার বাড়িতে কোনও ছোট ভাই বা বোন আছে, যাকে কোলে নিয়ে তুমি খেলা করো, যার যত্ন নাও?’ আমি বলি ‘হ্যাঁ, আমার ভাই-বোনদের নিয়েই তো বাড়িতে আমার বেশির ভাগ সময়টা কাটে।’ সেই সময় বাড়ির বড় মেয়েরাই ছোট ভাই-বোনদের খেলা রাখত। বাস, তারপর একটা স্ক্রিন টেস্ট, অ্যান্ড আই গট সিলেক্টেড। পরে রাজজি বলেছিলেন, সেদিন আমাকে চুড়িদারে দেখে উনি খুব ইমপ্রেসড হয়েছিলেন। সেদিন যদি আমি ওয়েস্টার্ন কিছু পরে আসতাম তা হলে হয়তো উনি আমাকে প্রথমেই রিজেক্ট করে দিতেন। আসলে রাজজির মাথায় একটা চরিত্রের ছবি আঁকা থাকত। সেই ছবি মিলে

“সেদিন আমাকে চুড়িদারে দেখে রাজজি খুব ইমপ্রেসড হয়েছিলেন। আমি যদি ওয়েস্টার্ন পরে আসতাম, উনি রিজেক্ট করে দিতেন।”

■ ‘রাম তেরি গঙ্গা ম্যায়লি’র সেই বিখ্যাত স্নানের দৃশ্য

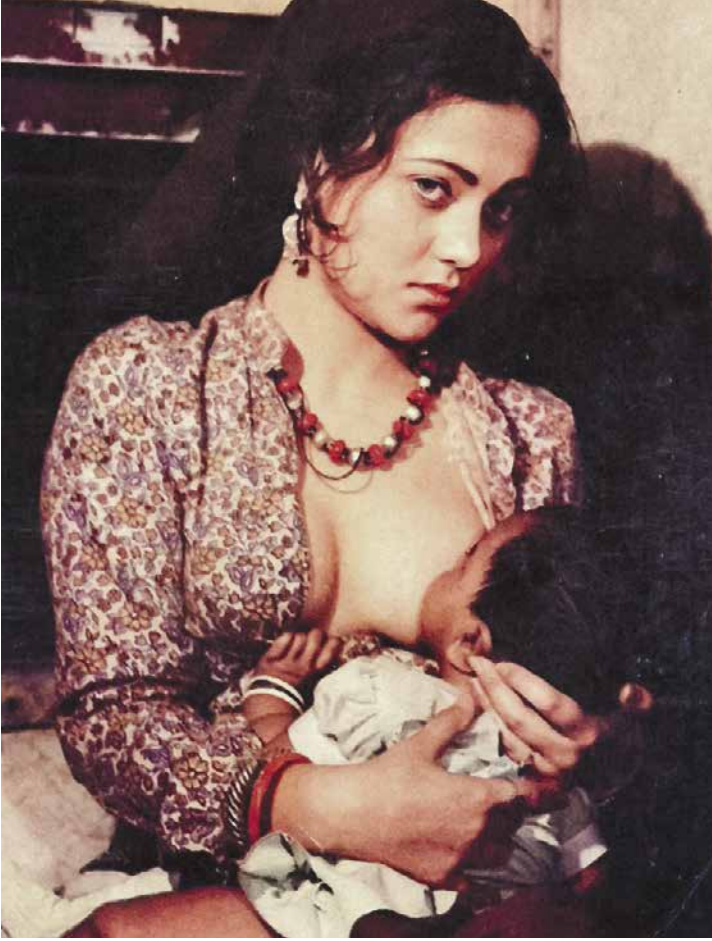
ঝোঁক ছিল। বাড়িতে বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই গান চালিয়ে সিনেমার নায়িকাদের মতো নাচতাম। খুব কম সময়ের মধ্যে আমিও যে নায়িকা হয়ে যাব সেটা ভাবিনি। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের মতো আমারও ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা করে বড় কিছু হওয়ার। মীরাটে বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রাম ভরদ্বাজ। তিনি পেশায় গীতিকার ছিলেন এবং বলিউডের একাধিক সিনেমায় গান লিখেছেন। গুর মেয়ে আর আমার এক দিদি একসঙ্গে স্কুলে পড়ত। বাবার সঙ্গে রাম আঙ্কলের বন্ধু ছিল বহুদিনের। আমার তখন ১৭ বছর বয়স। আঙ্কল একদিন বাড়িতে আসেন এবং আমাকে দেখে বাবাকে বলেন, আমি নাকি একেবারে নায়িকা মেটিরিয়াল! আমার অবিলম্বে মুম্বই যাওয়া উচিত। আঙ্কলের সামনে একটা নাচের পারফরম্যান্স ও করি এবং তিনিই মুম্বইতে একাধিক প্রযোজক-পরিচালকের কাছে আমাক রেফার করেন। বাবা-মাও রাজি হয়ে যান। আমার নায়িকা হওয়ার ইচ্ছে তো সেই কবে থেকেই মনে মনে ছিল। মুম্বইতে গিয়ে সেই আঙ্কলের পরিচিত জে পি সিংহলের কাছে যাই। সেই সময় উনি ছিলেন মুম্বইয়ের নামজাদা ফোটোগ্রাফার। উনিই আমার প্রথম পোর্টফোলিও শুট করেন এবং সেই ছবি

রাজ কপুরের কাছে যায়। রাজজি তখন তাঁর ছেলে রাজীব কপুরের বিপরীতে নায়িকা খুঁজছিলেন। ডিম্পল কপাড়িয়া অডিশন দিলেও রাজজি ‘রাম তেরি গঙ্গা ম্যায়লি’র জন্য ফ্রেস ফেস খুঁজছিলেন। আমার ডাক পড়ে চেষ্টুরে আর কে স্টুডিয়োতে। ততদিনে মা, বাবারা সকলে মীরাট থেকে আমাকে নিয়ে মুম্বইতে শিফট করে গিয়েছেন। মনে আছে, বাবা ও দিদির সঙ্গে প্রথমদিন স্টুডিয়োতে যাই। আর কে স্টুডিয়োতে রাজজির জন্য একটা বিশেষ কটেজ ছিল। কাজের মাঝে উনি ওখানে বসে বিশ্রাম করতেন। সেখানে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। উইকিপিডিয়াতে সব ভুলভাল বয়স দেওয়া আছে, আমি যখন এই অডিশনে



■ ‘রাম তেরি...’-র গানের সঙ্গে মন্দাকিনীর নাচ

না যাওয়া অবধি উনি ফাইনাল কাস্টিং করতেন না।” কথাগুলো বলতে-বলতে মন্দাকিনী বেশ কিছুটা আবেগতড়িত হয়ে



■ ‘রাম তেরি...’র এই ব্রেস্ট ফিডিংয়ের দৃশ্য সেই সময় সর্বত্র শোরগোল ফেলে দেয়

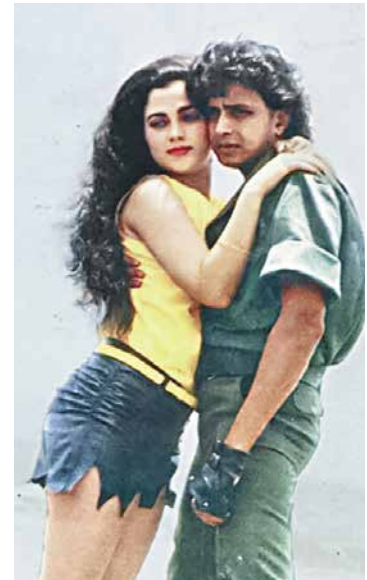
“এর আগে জ্বিনত অমানের ‘সত্যম শিবম সুন্দরম’-এর মতো ছবি হয়েছে, তখন কেউ কিছু বলেনি। শুধু আমার বেলাতেই কেন ‘সাহসী সাহসী’ বলে হাইপ ক্রিয়েট করেছিল কে জানে!”

পড়েন। নিজের মোবাইল খুলে ইউটিউবে ‘রাম তেরি...’র টাইটেল ট্র্যাকের ভিডিও খুলে এই প্রতিবেদককে দেখিয়ে বলেন, “দেখুন, এতবছর পরেও এই গানের ভিউ এক মিলিয়নের উপরে। এখনও ভাবলে গা শিউরে ওঠে। জীবনের প্রথম কাজ, আর সেটাই শ্রদ্ধেয় রাজ কপুরের পরিচালনায়। আমার ‘ইয়াসমিন’ নামটা বদলে দিয়ে উনিই তো ‘মন্দাকিনী’ করে দেন! শট দেওয়ার আগে গা-হাত-পা রীতিমতো ভয়ে কাঁপত! রাজজি আমার জীবনে দেবদূতের মতো এসেছিলেন। আমাকে উনি গুঁর পরিবারের সদস্যের মতোই ট্রিট করতেন। উনি আমার উপর এতটা বিশ্বাস দেখিয়েছিলেন বলেই হয়তো আমি আমার কেরিয়ারের প্রথম ছবিতে দর্শকের মনে এতটা দাগ কাটতে পেরেছিলাম।”

সাহসী কিছুই ছিল না

মন্দাকিনীকে বরাবর ‘সাহসী’ নায়িকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার মূল কারণ, সেই ‘রাম তেরি...’। এই ছবিতে যেমন আছে মন্দাকিনীর আইকনিক ব্রেস্ট ফিডিংয়ের দৃশ্য, একইভাবে রয়েছে ব্লাউজ ছাড়া শাড়ি পরে জলে ভেজার সিকোয়েন্স। বিশেষ করে সেই সময়ের নিরিখে সেগুলোকে সাহসী বলতেই হয়। তাও আবার কেরিয়ারের প্রথম ছবিতেই মন্দাকিনী এই ধরনের কাজ করার কনফিডেন্স দেখিয়েছিলেন! এবং সেই কারণে তাঁকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। যদিও এটি একেবারেই মানতে নারাজ রাজ সাহেবের ‘গঙ্গা’। আর এক কাপ ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিয়ে তিনি জানান, “আমি এখানে সাহসিকতার কিছুই দেখি না। আপনি আমার অভিনয়ের জন্য আমার

প্রশংসা করুন, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সাহসী দৃশ্য করেছি বলে প্রশংসা কুড়োব, এটা আমার পছন্দ নয়। প্রথমত, ‘রাম তেরি...’-র শুটিংয়ে এমন কিছুই হয়নি যেটা সাহসী ছিল। দর্শক যেটা পরদায় দেখেছে আর শুটিং যেভাবে করা হয়েছিল, তাতে বিস্তর ফারাক ছিল। রাজজি গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে শুট করেছিলেন যে, আমার কোনওরকম ডিসকমফোর্ট হয়নি আর দর্শকও বুঝতে পারেনি যে আসলে ওগুলো কীভাবে শুট করা হয়েছে। তা ছাড়া আমার এই ছবির আগে জ্বিনত অমানের ‘সত্যম শিবম সুন্দরম’-এর মতো ছবি হয়েছে, তখন তো কেউ কিছু বলেনি। শুধু আমার বেলাতেই কেন ‘সাহসী সাহসী’ বলে দর্শক ও মিডিয়া হাইপ ক্রিয়েট করে কে জানে! রাতারাতি আমাকে বোল্ড নায়িকার তকমা দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা এতটা প্রাধান্য পেলে যে, আমি কেমন অভিনয় করেছি, সেটা নিয়ে আর কেউ কথাই বলল না! হাসি পায় এখনকার কথা ভেবে। এই তো কয়েকদিন আগে একটি ওয়েব সিরিজ দেখছিলাম। এমন সব নোংরা দৃশ্য যে আমি লগ আউট করে গেলাম। এখনকার দিনে তো অধিকাংশ সিরিজ কিংবা সিনেমা পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে দেখাই যায় না। লজ্জা লাগে। এখন সকলে নানা উপায়ে যৌনতা প্রদর্শন করতে চান। তাও মিডিয়া এখনও আমার সেই কবেকার কিছু দৃশ্য নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে!”



■ ‘ডান্স ডান্স’ ছবিতে মিঠূনের সঙ্গে

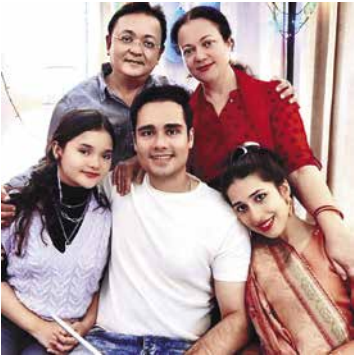
কথাগুলো বলার মাঝে লক্ষ্য করলাম, কফি শপের এসির মধ্যেও মন্দাকিনীর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। বুঝতে পারলাম, ‘রাম তেরি...’-র সেই সমস্ত দৃশ্য নিয়ে মানুষের আলোচনা মন্দাকিনীকে এখনও অস্থিত্তিতে ফেলে। তবে সেই অস্থিত্তির সঙ্গে কিছুটা যে

রাগও আছে, তা বুঝলাম কিছুক্ষণ পর।

নিমেষের মধ্যে কেমন যেন বড় হয়ে গেলেন

মন্দাকিনীর জীবনের দুটো ভাগ রয়েছে। প্রি-‘রাম তেরি...’ এবং পোস্ট ‘রাম তেরি...’। এই ছবির আগে অবধি মন্দাকিনীকে সেরকমভাবে কেউ গুরুত্ব দেননি। বাবার পরিচিত রাম আঙ্কলের সৌজন্যে মুম্বইতে কিছুটা সাহায্য পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এক স্টুডিও থেকে আর এক স্টুডিওতে প্রচুর ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু সেই সময় মা-বাবা মন্দাকিনীকে আগলে রাখতেন। ‘রাম তেরি...’ হিট হয়ে যাওয়ার পর মন্দাকিনীর জীবন আমূল বদলে যায়। তাঁর আশেপাশের চেনা মানুষগুলোও কেমন

“মানুষ ধীরে-ধীরে উপরে
ওঠেন, কিন্তু এখানে আমি
প্রথম ধাপেই উপরের
জায়গাটা দখল করেছিলাম।
তাই তারপর থেকে
আমাকেই নীচে নামতে হল।”



■ সপরিবার মন্দাকিনী

যেন অচেনা হয়ে যান। বিশেষ করে তাঁর বাবা-মা। কথাগুলো বেশ পার্সোনাল, তাই হয়তো আগের তুলনায় গলার স্বর অনেকটা নিচু করে মন্দাকিনী বলেন, “আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি রাজ কপুরের মতো লেজেন্ডের সঙ্গে কেরিয়ার শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু সেটাই আবার আমার জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। সেই সময় রাজ কপুরের চেয়ে বড় ফিল্মমেকার তো আর কেউ ছিলেন না। তাই একবার আমি যখন গুঁর সঙ্গে কাজ করে ফেললাম, তারপর আর যার সঙ্গেই কাজ করি না কেন, আমি সেই ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশনটা পাচ্ছিলাম না। বারবার মনের মধ্যে সেই ছবির পরিচালকের সঙ্গে রাজজির একটা



■ নিজের ফ্ল্যাটে মন্দাকিনীর ফোটোশুট

তুলনা চলেই আসছিল। সেই সময় আর কে ব্যানারের ছবি মানেই টপ ক্লাস। এই ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষ ধীরে-ধীরে উপরে ওঠেন, কিন্তু এখানে আমি প্রথম ধাপেই সবচেয়ে উপরের জায়গাটা দখল করে নিয়েছিলাম। তাই তারপর যখন বাকিদের সঙ্গে কাজ করা শুরু করলাম, তখন আমাকেই নীচে নামতে হল। আমি কাউকে খাটো করছি না, কিন্তু যা বলছি তা বাস্তব। আর ‘রাম তেরি...’ হিট হওয়ার পর থেকে আমার কাছে কাজের সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল, ঠিক একইভাবে আমার কাছের মানুষদের আমার প্রতি ব্যবহার কেমন যেন বদলে গেল। যে মা-বাবা আমাকে সবসময় আগলে রাখতেন, তাঁরাই আমাকে একা ছেড়ে দিলেন! সকলেই ধরে নিলেন, আমি বড় হয়ে গিয়েছি। কাছের বন্ধুরাও আমাকে সেলেব্রিটি হিসেবে ট্রিট করতে লাগল। আমি কেমন যেন একা হয়ে গেলাম!” তবে প্রথম ছবি হিট মানে তো তারপর আরও ভাল ছবি বুলিতে আসা। কিন্তু মন্দাকিনীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। ‘ডান্স ডান্স’ বা ‘তেজাব’-এর মতো হাতেগোনা কয়েকটা ছবি ছাড়া, সেরকম এ-লিস্টার ছবি কিন্তু মন্দাকিনীর কেরিয়ারগ্রাফে নেই। তার ব্যাখ্যাও দিলেন মন্দাকিনী। “সেই সময় মহিলাকেন্দ্রিক ছবি খুব কম হত। সেই ট্রেন্ডটাই তো ছিল না। তাই ‘রাম তেরি...’-তে অথর ব্যাকড রোল পাওয়ার পর আমার প্রত্যাশা থাকলেও, আমি আর সেই ধরনের রোল পাইনি। আর সেই সময় নায়িকাদের জন্য রাখা থাকত দুটো বা তিনটে গানের

দৃশ্য, কয়েকটা রোম্যান্টিক দৃশ্য আর ক্লাইমাক্সে ভিলেনের হাতে বন্দি হওয়া এবং নায়কের হাত ধরে রক্ষা পাওয়া। তাই ‘রাম তেরি...’-র পর একাধিক ছবি করেছি শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। মন থেকে নয়। পুরোপুরি নায়ক প্রধান ইন্ডাস্ট্রি ছিল তখন। নায়িকাদের কোনও ভ্যালুই ছিল না। মেরেকেটে এক থেকে দেড় লাখ টাকা পারিশ্রমিক পেতাম। একবার মনে আছে, একটা ছবির জন্য এক লাখ টাকায় আমাকে সাইন করা হয়েছে। পরেরদিন দেখলাম আমাকে বাদ দিয়ে অন্য নায়িকা নেওয়া হয়েছে। কারণ? সেই নায়িকা এক লাখ নয়, ৭৫ হাজারে কাজ করতে রাজি হয়ে গিয়েছে! আর প্রযোজক আমাকে বললেন, ‘নায়িকাকে কী আর করতে হবে? ওই তো কয়েকটা রোম্যান্টিক সিন, যে কোনও মেয়ে করে দেবে।’ ছবিটার নাম বা সেই নায়িকার নাম আর বলছি না। এরকমও হয়েছে যে, প্রভাবশালী নায়কের প্রভাবে আমাকে ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, নায়কের পছন্দের নায়িকা নেওয়া হয়েছে। এবার নায়িকা সেই নায়কের মন কীভাবে জয় করেছিল সেটা আশা করি আর খোলসা করে বলে দিতে হবে না। তাই আমি কোনওদিনই ইদুর দৌড়ে ছিলাম না।”

দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই কি কেরিয়ারে পতন?

মন্দাকিনীকে যে ‘সাহসী’ বলা হয় তার



■ মিউজিক ভিডিও ‘মা ও মা’-তে ছেলে রব্বিল ও অন্যান্যদের সঙ্গে মন্দাকিনী

দুবাইতে একটা সময় নিয়মিত শো করতে যেতেন মন্দাকিনী এবং সেখানেই নাকি আলাপ, পরিচয় ও প্রেম হয় দাউদের সঙ্গে। একটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে ম্যাচও দেখেন।

একটা কারণ যদি হয় ‘রাম তেরি...’র বোল্ড সিন, তা হলে আর একটা কারণ অবশ্যই সেই গসিপ, তিনি নাকি একটা সময় আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। জানতাম এই প্রসঙ্গে শুধু তিনি নন, কেউই কথা বলতে স্বস্তিবোধ করবেন না। মন্দাকিনীও স্বভাবতই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একটা সময় বলিউডের অধিকাংশ ছবিই তৈরি হত আন্ডারওয়ার্ল্ডের ঢাকায়। তার প্রধান কারিগর ছিলেন দাউদ। দুবাইতে একটা সময় নিয়মিত শো করতে যেতেন মন্দাকিনী এবং সেখানেই নাকি আলাপ, পরিচয় ও প্রেম হয় দাউদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের শারজাতে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে ম্যাচ উপভোগ করতে দেখা যায় মন্দাকিনী ও দাউদকে। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বলিউডে মন্দাকিনীকে একঘরে করে দেওয়া হয়। ‘বয়কট’ ট্রেন্ড কিন্তু শুধু এখন নয়, তখনও ছিল। ‘বয়কট মন্দাকিনী’ স্লোগান আগুনের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর হয় যে, মন্দাকিনী যে সমস্ত ছবিতে অভিনয়

করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশতেই নাকি দাউদের ফান্জি ছিল। শুধু তাই নয়, এমনও শোনা যায় যে, দাউদ নাকি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালক-প্রযোজকদের ফোন করে আদেশ দিতেন যাতে মন্দাকিনীকে নায়িকা হিসেবে নেওয়া হয়। তবে এটার পিছনে একটা প্রশ্নটিই থেকেই যায়। যদি সত্যি কোনও প্রভাবশালী মন্দাকিনীর জন্য সুপারিশ করতেন, তা হলে তো তাঁর কেরিয়ারে আরও বেশি সংখ্যক ছবি থাকার কথা। যাই হোক, এই প্রসঙ্গে কথা উঠতেই মন্দাকিনীর চোখ-মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাঁর শরীরীভাষায় একটা অস্বস্তি ধরা পড়ে। “আগে এই বিষয়ে মিডিয়া অনেক মুখরোচক গল্প লিখেছে। তাতে তাদের রিডারশিপ হয়তো বেড়েছে, কিন্তু আমি এই নিয়ে নতুন করে আর কিছুই বলতে চাই না।” কিন্তু এই যে ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে খেলা দেখা বা দুবাইতে শোয়ের সময় তাঁদের একসঙ্গে দেখতে পাওয়া... প্রতিবেদককে মাঝপথে থামিয়ে মন্দাকিনী বলেন, “আমার জীবনে আমি প্রচুর জায়গায় শো করতে গিয়েছি। সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়। ব্যাস, এর বেশি

আর একটা কথাও বলব না।” দাউদের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই কি ইতি পড়ে মন্দাকিনীর কেরিয়ারে? উত্তরে নায়িকা বলেন, “যে সময় আমি কেরিয়ার থেকে অবসর নিই, সেসময় আমার কাছে প্রায়োরিটি ছিল আমার পরিবার। আমার ছেলে-মেয়ে তখন একেবারে ছোট, তাদের জন্য আমাকে সময় দিতেই হত। আমার স্বামীকে সময় দিতে হত। এরপর যখন ছেলে-মেয়েরা একটু বড় হয়, তখনও আর কাজে ফিরে যাওয়ার কোনও তাগিদ অনুভব করিনি।” কিন্তু একটা মানুষ যখন লাইমলাইটে থাকেন, তখন হঠাৎ করে সব ছেড়ে আড়ালে চলে যাওয়া কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? মন্দাকিনীর সোজাসাপ্টা উত্তর, “মানুষ তাঁর ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অভ্যাস তৈরি করেন। আপনি যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই থাকতে পারবেন। খ্যাতির নেশা বা অভ্যাস হয়ে যাবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। প্রথমবার ক্রিনটেষ্টের সময় ধূমপান করার দরকার হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন একবার ধূমপান করলে অভ্যাস হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ছবির পর আমি আর কখনও কোনওদিন ধূমপান করিনি।”



■ সেই বিতর্কিত ছবি, যেখানে ক্রিকেট মাঠে ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা যায় মন্দাকিনীকে

বর্তমানে অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে, আরও একবার ক্যামেরা ফেস করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মন্দাকিনী। কয়েকমাস আগে ‘মা ও মা’ নামক একটি মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে রব্বিল ঠাকুরও। রব্বিলের ইচ্ছেতে আবার অভিনয়ে আসা। মন্দাকিনীও এখন বেশ কিছু ক্রিপ্ট শুনছেন। সাক্ষাৎকার শেষে তাঁর সঙ্গে একটি ছবি তোলার অনুরোধ করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখায় মন্দাকিনীকে। কিছুটা সময় নিয়ে তিনি বলেন, “ছবিটা পরের বারের জন্য তোলা থাক প্লিজ। আসলে এখন তো একেবারেই মেকআপ করে আসিনি, এখনও আমার যে কয়েকজন ফ্যান আছেন, তাঁরা ছবিটা দেখলে নিরাশ হবেন!” বোঝা গেল, পরিবারকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি যতই লাইমলাইটের আড়ালে চলে যান না কেন, গ্ল্যামার জগতের যে আকর্ষণ সেটা বোধহয় এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি আমাদের সকলের প্রিয় গঙ্গা।



অলংকরণ: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

অলিগলির কথামালা

রূপক ঘটক

প্রথমে ভাবলাম কোনও উত্তর দেব না। কিন্তু পর মুহূর্তেই সশব্দে টেবিলের উপর একটা চাপড় মেরে নদী হিসহিসে গলায় বলল, “তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?”

তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখের মধ্যে শরীরের সব রক্ত যেন এসে জড়ো হয়েছে। চোখ জ্বলছে। চিবুক দৃঢ়। দেখে মনে হচ্ছে ও হাতও চালিয়ে দিতে পারে। আমি মাথা নেড়ে বোঝালাম যে হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

পরের মুহূর্তেই দু'হাত দূরে থাকা কাঠের চেয়ারখানা কর্কশ শব্দে সামনে ঘষটে টেনে বসল ও। এ বার টেবিলের অপর প্রান্তে দুই কনুইয়ে ভর করে সামান্য এগিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে সেই হিসহিসে, শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল, “এই, তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ?” এ বারও সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়িলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই টেবিলের উপর আমার ফোনটা বেজে উঠল। চোখের মণি না ঘুরিয়ে ফোনটা নীরব করে ড্রায়ারে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার ব্যবসার জন্য বেলার দিকের এই সময়টায় পর পর সব দরকারি ফোন আসে। কিন্তু নদীর এখন যা মেজাজ, বলা যায় না হয়তো আছড়ে ভেঙেই ফেলল ফোনটা। ওকে বিশ্বাস নেই। এ বার গলা আরও নামিয়ে কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, “তুমি শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না আমি কী বলছি?” এ বার উত্তর দিতেই হল। আমি নদীর চোখে চোখ রেখে সেই নিচু গলাতেই বললাম, “না, বুঝতে পারছি না।” এ বার চিবুক আরও দৃঢ় হল নদীরা। গলা আরও নামিয়ে থেমে থেমে বলল, “আমি তোমার থেকে ডিভোর্স চাইছি। এইটুকু করুণা করা যাবে?” আমি চোখের পলক ফেললাম না। ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, “কী করে দেব? ওটা তো আমার পকেটে নেই।” নদী এ বার তীব্র তচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “তোমার পকেট থেকে কিছুটি দিতে হবে না। কথটা হাজার বার বলেছি, আবারও বলছি, তুমি শুধু মিউচুয়াল ডিভোর্সের কাগজে সই করে দাও। সব ঝঞ্জাট আমি সামলে নেব। বলা, রাজি?” আমি নদীর চোখ থেকে চোখ সরালাম না। মুখের পেশি একটুও না-বদলে ধীরে ধীরে বললাম, “বিয়ে করব বলে আমি তো কোনও দরখাস্ত দিইনি। বিয়ে ভাঙার জন্যও আমি কোনও আবেদন করব না।”

রণে ভঙ্গ দিল না নদী। চেয়ারের পায়া ঘষটে ওটাকে আরও একটু এগিয়ে এনে বলল, “তুমি কী চাও, খোলাসা করে বলবে?” শান্ত গলায় বললাম, “শান্তি চাই।” নদী যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তরটা লুফে নিয়ে বলল, “আমিও তা-ই চাই। শান্তি। তাই তো বলছি, তোমার কাছে একটা সই ছাড়া তো কিছু নয়।” আমি এ বারও কথা বলা পেশির একটাও একটুও না-কাঁপিয়ে বললাম, “আর তোমার কাছে?”

মানুষের আদৃত এক একটা বিষয়ে দর্বলতা থাকে। এক এক জনের কাছে তালিকাটা এক এক রকম। নদীর বিষয়টা আমি জানি, অন্য কেউ ওকে ধরতে পারুক, সেটা ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ও থাকতে চায় সেই রকম বই হয়ে, যার হরফ অন্য সকলের অচেনা। তাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না ও, আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। এ বার মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, “সোজা রাস্তা সবার পছন্দ হয় না। এ বার সই নকল করব।” আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, “ঠিক আছে।” নদী এ বার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “অন্য একটা লোককে তুমি সাজিয়ে কাঠগড়ায় তুলে বলাব যে, সে ডিভোর্স চায়।” আমি একটুও না-রেগে সামান্য হেসে বললাম, “সে-ই ভাল। বিয়ে যে ভাবে হয়েছে ডিভোর্সও সে ভাবেই হওয়া উচিত।” মুহূর্তের মধ্যে ও ফোঁস করে উঠল, “বিয়ে নিয়ে যখন এত রাগ তা হলে সেটা ধরে রাখার জন্য এত গরজ কেন?” আমি আবারও একই রকম নিষ্পূহ ভঙ্গিতে বললাম, “বিয়েটা যে ভাবে হয়েছিল সেই পদ্ধতিটা কেমন তা বলেছি, আমি বিয়ে নিয়ে তো কিছু বলিনি তোমায়!” এ বার চূড়ান্ত বিরক্তি ও ঘৃণা মিশিয়ে নদী বলল, “কেন, কেন, কেন? এই বিয়ে ধরে রাখায় এত শখ কেন? তুমি কী পেচ্ছে, হ্যাঁ? নাকি কিছু পাবে?” আমি এ বারও রাগলাম না। নরম গলায় বললাম, “আমরা কি আদৌ বিবাহিত?”

আর কোনও উক্তি-প্রতুক্তিতে গেল না নদী। আগের থেকেও কর্কশ শব্দে চেয়ারটা পিছিয়ে ব্যাগ থেকে এক গোছা কাগজ বের করে সেগুলো মাঝখান থেকে ছিড়ে দলা পাকিয়ে আমার দিকে ছুড়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই নীচ থেকে ওর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

তার পর আমি ঠিক আঠারো সেকেন্ড মাথা টিপে বসে থাকার ফুরসত পেলাম। তার মধ্যেই ফোন বেজে উঠল। সেই ফোনে উল্টো দিক থেকে কেউ এক জন কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল, “কী ব্যাপার! অতিথির কি ফিরে যেতে বলব?”

ছত্রিশ জন অতিথির জন্য বাহাতর খণ্ড ভেটকি পাতুরি। আর

দুপুরের মাছ ভাত। পাতুরি আগে পাঠাতে বলা ছিল। আগে বলতে বলা বারোটা, এমনটাই কথা ছিল পাটির সঙ্গে। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এখন এগারোটা আঠাশ। মাথাটা তড়াক করে গরম হয়ে গেল। তাও রাগ চেপে ভদ্র সভ্য গলায় বললাম, “আপনার অতিথিরা এসে গেছেন?” কর্কশ গলা বলল, “কয়েকজন তো এসেছেনই!” বললাম, “আমাদের মাল রেডি, ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে পাঠাইনি। দশ মিনিটের মধ্যে পাতুরি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাকি খাবার বেলা সাড়ে বারোটায়ে ঢুকে যাবে, নিশ্চিত থাকুন।”

কথা শেষ করে ফোন ঘেঁটে দেখলাম, খানিক আগের ফোনটাও তিনিই করেছিলেন। দোকান, বাজার আর হাজারও ঝঞ্জাটের চৌহদ্দি ঘাড়ের উপর নিয়ে একটা ম্যাজেনাইন ফ্লোরের ঘরে আমার অফিস, এখানে আমিই মালিক, আমিই কেরানি, আমিই রিসেপশনিস্ট। এখান থেকে একটু দূরে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির এক তলায় আমার অতিথি আপ্যায়ন সংস্থার হৈশেল। আজকাল মানুষের আলাস্য বেড়েছে, সামাজিকতা কমেনি। তাই আমার হৈশেলও বন্ধ করতে হয় না। প্রায় রোজই কিছু না-কিছু উপলক্ষ থাকে। বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ তো আগেও ছিল। এখন নতুন নতুন উপলক্ষ এসেছে। আঠারো বছর বয়স হওয়ার প্রাপ্তবয়স্কতা, চাকরিতে পদোন্নতি বা ব্যবসায় বড় দাঁও মারলে সাফল্য পালনের মতো উপলক্ষ হঠাৎ হঠাৎ উদিত হচ্ছে। পুরনো বন্ধুদের পুনর্মিলনও আজকাল অনেক হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও করে কয়ে খাচ্ছি। কিন্তু সে জন্য ব্যবসায় সময় দিতে হবে তো! সময় ও মন। অখণ্ড মনঃসংযোগ! কিন্তু নদী হঠাৎ এসে সব গুলিয়ে দিয়ে গেল। দু'হাতে রগ চেপে বসে থাকলাম কত ক্ষণ।

অথচ অনেকগুলো দরকারি কাজ ছিল। পদু হাজারির মুদির দোকানে একটা লম্বা ফর্দ পাঠানোর ছিল। পরের সপ্তাহের বাজারের তালিকা ঠান্ডা মাথায় বসে আজই করে রাখব ভেবেছিলাম। সিমেন্ট ব্যবসায়ী রাতুলদা এক দিন বলছিল, “মুঞ্চবোধ” অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে ঘুরে খাওয়াদাওয়া করে অন্য রকম দিন কাটাবে। তার যাবতীয় দায়ভার আমায় দেবে। তার সঙ্গে দেখা করে, পরিকল্পনা যা করেছি তা শুনিয়ে অনুমোদন নিয়ে নেওয়ার কাজটাও আজ-কালের মধ্যেই সারতে হবে। সেটাও হল না। সবটাই এলোমেলো করে দিয়ে চলে গেল নদী। অবশ্য এতে ওকে আমি দোষ দিই না। ও বরাবরই হুড়ুম দড়ুম করা মেয়ে। ও তো এই রকমই করে। দোষ আমার। ওকে দেখলে বা ওর কথা শুনলেই রক্তচাপ বেড়ে যায়। আর মাথার সব দরকারি সুতোগুলোয় জট পড়ে যায়। এই লভভভ অবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি আর স্বাভাবিক হতে পারে না। আমি জানি, এটা আমার এক ব্যামো। এই ব্যামোয় এক জন সচল, সবগ মানুষ আচমকা পেঁচায় পাওয়া অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে মাথার রগ চেপে বসে থাকে চূপচাপ।

কত ক্ষণ বসে থাকতাম জানি না, ফোনটা বেজে উঠল। পর্দায় ভেসে উঠল মল্লবীরের নাম। মল্ল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমার বড়বেলায় আর কোনও বন্ধু হয়নি। ছোটবেলার সহচরদের সঙ্গে এখনও গলায় গলায় ভাব। এটুকু অনেক করে টিকিয়ে রেখেছি। ফোনটা ধরতেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। মল্ল ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞেস করল, “শুনেছিস?” উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, “কী শুনব?” ও এক রাশ দ্বিধা নিয়ে বলবে কি বলবে না করে বলেই ফেলল, “দ্বিজু আর নেই।”

“মানে! কী বলছিস তুই?” আমি আত্ননাদ করে উঠলাম। তার পরই জিজ্ঞেস করলাম, “কখন হল? কী করে? তুই কোথায়?”

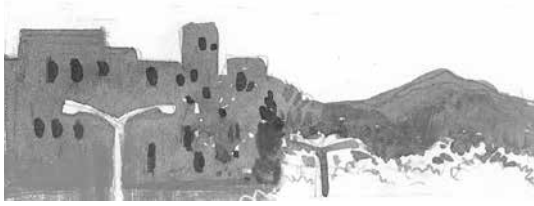
এতগুলো প্রশ্ন শুনে শান্ত গলায় ও কেবল এইটুকুই বলল, “আমি ওদের বাড়িতেই রয়েছি। যদি সম্ভব হয় তুই চলে আয়।”

“আর কাউকে খবর দেব?”

“না, আমিই ফোন করছি সকলকে। তুই চলে আয়।”

ফোনটা রেখে স্থবিরের মতো বসে থাকলাম কত ক্ষণ। দ্বিজেন ওরফে দ্বিজু আমাদের ছোটবেলার সেই দলটার অমর-অক্ষয় সদস্য, আমরা ছিলাম তুমুল ডানপিটে আর পরম দস্যু, সব ক'টার স্নায়ু একই রকম বিটলেপনা দিয়ে বাঁধা ছিল। সেই দলের জলজ্যান্ত এক জন এই রকম না বলে কয়ে তিরিশ-বত্রিশ বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে! তা হয় না। আমার সঙ্গে অবশ্য চার-পাঁচ মাস দেখা সাক্ষাৎ হয়নি ওর। সে তো সকলেই কম-বেশি ছিটকে আছি।

তার পর আস্তে আস্তে মাথা তুললাম। রাজুকে ডেকে ভোজবাড়ির যাবতীয় বিষয় বুঝিয়ে দিলাম। রাজু আমার সহকারী। খাবার গাড়িতে উঠিয়ে, পরিবেশন করার ছেলোদের রওনা করিয়ে তার পর মোটরসাইকেল চালিয়ে দিলাম দ্বিজুর বাড়ির দিকে। হাত ঘুরিয়ে গতিবেগ বাড়াতে পারলাম না। মনে হল কে যেন টানছে পিছন দিকে। টেনে বলছে, এত দিন এক বারও মনে হল না ওর সঙ্গে দেখা করার কথা! আমি তাকে কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু এটাও জানি, এই খারাপ লাগা সাময়িক। দু'দিন পরই আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ব বাজার থেকে বড় পাবদা বেছে তার দাম নিয়ে দরাদরি করতে। তখন মনেও পড়বে না দ্বিজুর কথা।



দৃশ্যটা মিলল না। কোথাও কোনও দৃষ্টানো ঘটে গেলে পাড়ার মোড়ে দেখা যায় মানুষের জটলা। প্রতি গলির মুখে কিছু নারী পুরুষের থমথমে মুখ দেখা যায়। এখানে সে সব কিছুই দেখা গেল না। দ্বিজুদের পাড়াটা এখনও বেশ পুরনো গন্ধ মাখা। এই রকম জায়গায় এক বাড়ির লোক অন্য বাড়ির খোঁজ রাখে। তারা জিরারফের মতো কৌতূহলী হয়ে পড়শির খোঁজ নেয় ও মার্জারের মতো গায়ে পড়া হয়ে প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে কাতর হয়। সেখানে একটা তিরিশ-বত্রিশ বছরের তরতাজা প্রাণ চলে গেছে জেনেও তারা এত উদাসীন হবে! কে জানে, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা হয়তো তাদেরকেও বদলে দিয়েছে।

দ্বিজুদের বাড়ি পৌঁছে দেখলাম তিনটে মোটরসাইকেল জিরোচ্ছে। সেকলে পাড়ার তেঁকেলে বাড়ি ওদের। জরাজীর্ণ দোতলা। রং নেই। রেলিং জড়িয়ে বাড়ছে একটা বটগাছের চারা। দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় পলেন্তরা এমন ভাবে খসে পড়েছে, দেখে মনে হয় বাড়িটা যেন জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। কত দিন পর এলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল স্কুল জীবনের ছবি। তখন অবাধ সজ্জা খাকলে বন্ধুরা সকলে ওদের বাড়ির উঠানে সাইকেল রেখে খেলতে যেত। দ্বিজুর চমৎকার একটা ব্যাট ছিল। আমার নিজস্ব ব্যাট ছিল না। আমি, আমরা ওর ব্যাটটা বগলদাবা করে খেলতে নেমে যেতাম। ও কখনও না বলেনি। তখন না শব্দটা সম্ভবত অভিধানেই ছিল না। অথচ এখন! আজ ওদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মনে হল হাজার হাজার স্মৃতি বটের বুরির মতো আমার মাথার উপর থেকে নেমে আসছে। আর আমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি তাদের কাছে। তাই এক ভাবে বেশ কিছু সেকেন্ড ওদের উঠানে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

দ্বিজুর ঘরটা ছিল চিলেকোঠায়। এখনও সম্ভবত তা-ই। আমি কাউকে কিছু না-বলে সেখানেই উঠে গেলাম। বাইরের মোটরসাইকেল দেখেই বুঝলাম, বন্ধুরা কয়েক জন এসে গেছে। উঠতে উঠতে মনকে শক্ত করলাম। কোন শেষ দৃশ্য দেখতে হবে তা অনুমান করতে পারছিলাম।

কিন্তু খটকাও লাগছিল। এক তলায় দ্বিজুর কাকার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে এক জন প্রৌঢ়া দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে কুটনো কাটছেন। দোতলায় ওর দাদা থাকে। সেখানে বন্ধ দরজার পিছন থেকে ভেসে আসছে গম গম করে টিভি চলার শব্দ। সেখানে কোনও পুরুষ কণ্ঠ আগেগে থর থর গলায় বলছে, “আমি কী বললাম সেটাই শুনবে, আমি কী বলতে চাইলাম সেটা বুঝবে না?” একটু থমকে গেলাম। এর কোনও লক্ষণই দুমড়ে থাকা, কাতর হয়ে থাকা শোকবাড়ির মতো নয়। তা হলে?

চিলেকোঠায় উঠে আরও চমকে গেলাম। একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে পা নাচাতে নাচাতে ঠোঙা থেকে মুড়ি খাচ্ছে দ্বিজু! দিবা জলজ্যাস্ত দ্বিজু। আর মেঝেয় গম্ভীর, করুণ, হতাশ মুখে বসে আছে মল্লবীর, সম্ভাষণ, তেজদীপ।

চড়াং করে মাথাটা আঙুন হয়ে গেল। ফাজলামোরও মাত্রাজান থাকা দরকার। মল্লের দিকে তাকিয়ে রূঢ় ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, “তুই যে বললি দ্বিজু মরে গেছে?” প্রশ্নটা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে খুব হতাশ, ক্লান্ত গলায় মল্ল বলল, “তাকিয়ে দেখ, ও কি বেঁচে আছে?”

এ বার ভাল করে দেখলাম। আমায় দেখে কোনও ভাবান্তর হয়নি দ্বিজুর। এমনকি আমাদের দিকে ফিরেও দেখছে না। এক মনে ঠোঙা থেকে মুড়ি খেয়ে যাচ্ছে। এক বার মনে হল, ও কেন ঠোঙা থেকে মুড়ি খাচ্ছে? বাড়িতে লোকে বাটিতে ঢেলে মুড়ি খায়। পর ক্ষণেই ওর চেহারা লক্ষ করে শিউরে উঠলাম! এ কী হাল হয়েছে শরীরের? রোগা, হাড় গিলগিলে চেহারা। মাথার চুল উস্কাখুস্কা। তারও একাংশে পাক ধরেছে। গালে পাকা দাড়ি, ময়লা একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা পরে আছে। এই পাজামাটার অন্তত এক বছর আগে ন্যাটা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল! গায়ের চামড়া শুকনো চিমড়ে হয়ে আছে। গালের চামড়া বুলে পড়েছে বৃদ্ধদের মতো। আর সবচেয়ে বড় কথা, চোখে কোনও ভাষা নেই। দিবা পা নাচিয়ে নাচিয়ে মুড়ি খাচ্ছে।

রাগ, উদ্বেগ, শোক, সংশয় আর প্রশ্নচিহ্ন মিলে মাথাটা কেমন যেন করে উঠল। আমি এ বার দ্বিজুর দিকে ফিরে বললাম, “কেমন আছিস দ্বিজু?” প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে খুব সহজ ও স্বাভাবিক গলায় ও বলল, “ভাল আছি। তুই কেমন আছিস দেশ?” বললাম, “আছি, ভালই আছি।” যার সঙ্গে এত কাল পরে দেখা হল তার থেকে আর একটু উচ্ছ্বাস আশা করেছিলাম। মল্ল চোখ লাল করে বলল, “কেমন আছে জানতে চাইলি, জিজ্ঞেস কর, ক’দিন পর খাচ্ছে!”

কথাটা সটান বুকের ভিতরে গিয়ে ধাক্কা মারল। ভয়ে ভয়ে ফের তাকলাম দ্বিজুর দিকে। এ বার চোখে ধরা পড়ল, বড় বেশি রুগ্ন লাগছে ওকে। চেহারায় কালচে ছোপ পড়েছে। হাত দুটো যেন লিক লিক করছে! কিন্তু কেন? এ রকমটা হওয়ার কথা ছিল না তো। মোটামুটি সম্পন্ন ঘরের ছেলে ও। নিজেও ভাল মাইনের চাকরি করে। ইতিমধ্যে ওর মুড়ি খাওয়া শেষ হয়েছিল। চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়ে মুড়ির ঠোঙাটা দলা পাকিয়ে বাইরের দিকে ছুড়ে ঘরের কোনায় রাখা বালতি থেকে মগে করে জল নিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফের চেয়ারে এসে বসল। মল্লের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই মল্ল, বিড়ি আছে বিড়ি?” মল্ল রেগে বলল, “আমি ও সব খাই?” দ্বিজু মাথা নেড়ে বলল, “তা-ই তো। ভুলে গেছিলাম।” সম্ভাষণ ওর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, “দুপুরে কী খাস দ্বিজু?” দ্বিজু নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বলল, “যা হোক, ডাল-ভাত, মাছ, রুটি, চিড়ে, ছাতু আমি সব খাই!” মুহূর্তের মধ্যে সম্ভাষণের মুখটা সমবেদনায় কঁচুকে উঠল। আমার মনে পড়ল একটা দৃশ্য। তালবাগান মাঠে আমাদের নিজেদের মধ্যে দল তৈরি করে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সম্ভাষণ ব্যাট করছে। দ্বিজু বল। দ্বিজুর একটা বল গোলার মতো সম্ভাষণের ঘাড়ে এসে পড়ল। পরের বলেই বেদম জোরে ব্যাট চালিয়ে বল বাউন্ডারি পার করে দিল সম্ভাষণ। তার পর দ্বিজুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কে ব্যাট করছে দ্যাখ!” দ্বিজু দু’পা এগিয়ে এসে বলল, “তা বলে অত জোরে মারবি!” ওর মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল বলে নয়, ওর উপরেই যেন ব্যাট চালিয়ে দিয়েছে সম্ভাষণ। আজ এক যুগ এ দিক-ও দিক অনেক পথ ঘুরে আমরা আবার যখন এক সঙ্গে হলাম, তখন আমাদের খেলার মাঠটাই বদলে গেছে। আমরা কেউ কেউ আলাদা আলাদা মাঠে বেদম মার খাচ্ছি। আর কেউ বাউন্ডারি মেরে বুক চাপড়ে বলছে, কে ব্যাট করছে দ্যাখ!

পুরনো কথা মনে পড়া কি এক ব্যাধি? আমার হঠাৎ কেমন যেন মায়া হতে শুরু করল দ্বিজুর জন্য। দ্বিজু তো কেবল পা নাচিয়ে মুড়ি খাওয়া রুগ্ন যুবক নয়। দ্বিজু তো আমিও যার নদীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠা উচিত ছিল, “এত জোরে মারবো” কাজের ক্ষতি হচ্ছে বলে ভিতরে ভিতরে এত ক্ষণ যে রাগ হচ্ছিল এ বার তা দূর হল। যেখানে খাবার পাঠিয়েছি সেই খিটখিটে ভদ্রলোককে জানলার কাছে সরে গিয়ে ফোন করলাম। দেখলাম তিনি আর ততটা ক্ষিপ্ত নন। তাঁকে বললাম, রাজুর হাতে পাওনা টাকা দিয়ে দিতে। ফোনটা কেটে পকেটে ঢোকাতে না-ঢোকাতেই দেখি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল সজীব। তার পর দ্বিজুকে বসে থাকতে দেখে সে আত্ননাদ করে উঠল, “সে কী রে!

তুই মরিসনি!” দ্বিজুর মুখখানা শুকিয়ে গেল। পাশ থেকে মল্ল গর্জন করে উঠল, “না, সামান্য বাকি আছে। তোর জন্যই অপেক্ষা করছে। আহাম্মক কোথাকার!”

কথাটা শুনে সবাই হেসে ফেললাম। মল্ল এ রকমই। কঠোর শাসনওয়াল। নেতা। এখন সে নেতৃত্বের ব্যাটিন হাতে তুলে বলল, “দ্বিজু পটল তোলার আগে আমাদের কিছু কাজ আছে।” কথাটা শুনে দ্বিজু ফিক ফিক করে হেসে ফেলল। কেন কে জানে, আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, “বল তো কী কাজ? কোমর বেঁধে করে ফেলব সকলে।”

সজীব কিন্তু চুপ করে গেল না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “এ সব ফাজলামির মানে কী?” আমরা কেউ উত্তর দিলাম না। তাতে আরও রাগ বেড়ে গেল সজীবের। ও গলা চড়িয়ে বিরক্তি দেখিয়ে বলল, “মানুষের সময়ের দাম আছে!” এ বার সম্ভাষণ বলল, “তুই আবার মানুষ হলি কবো?” সে কথার উত্তর না-দিয়ে আমরা চুপ করে থাকলাম, তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সজীব বলল, “কত দরকারি কাজ ফেলে এলাম জানিস! না! এর পর থেকে তোদের ফোন ধরবই না।” বলে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। আর তখনই মল্ল বলল, “তোরা দরকারি কাজ মানে তো ওই ঢাঙা মেয়েটাকে গাড়িতে বসিয়ে পৌঁছে দেওয়া। ছাড়, এক দিন অটোয় যাবো।” কথাটা শুনে রাগে সজীবের মুখ লাল হয়ে উঠল। ও “তুই...!” বলে কিছু বলতে গিয়ে বলে উঠতে না-পেরে ততোলাতে থাকল। মল্ল বলল, “আর ছুটিস না, ও তোকে টিকিট দেবে না! তার চেয়ে পুরনো বন্ধুদের দিকে তাকা, কাজ হবে।” এ বার আরও খেপে কিছু বলতে গিয়ে শেষে হতাশ হয়ে মেঝেতেই ধপ করে বসে পড়ল সজীব। বলল, “বল, কী বলছিস?” সম্ভাষণ এ বার দ্বিজুর দিকে তাকিয়ে বলল, “এই দ্রব্যটিকে কি বাঁচাতে চাস?” আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্কুল থেকেই বিশুদ্ধ বাংলা বলার নেশা পেয়ে বসেছিল সম্ভাষণকে। পুরো বাংলা না হোক, অন্তত ইংরেজি শব্দ বর্জন করে ও। এত দিন পর “এই পিসটাকে কি বাঁচাতে চাস” না বলে ঘুরিয়ে বলা কথাটা শুনে মনে পড়ে গেল। সজীব তৎক্ষণাৎ, “কী হয়েছে দ্বিজুর, ভালই তো আছে!” বলে ওর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একেবারে ওর সামনে গিয়ে বলল, “এই দ্বিজু, কী হয়েছে রে তোর?” দ্বিজু একই রকম হাসি মুখে পা নাচাতে নাচাতে বলল, “কিছু হয়নি তো। এই, বিড়ি হবে একটা?” পকেটের প্যাকেট থেকে একখানা সিগারেট বের করে ওর হাতে দিয়ে দ্বিতীয় বার ধপাস করে মেঝেয় বসে পড়ল সজীব। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “এ তো মরেই গেছিস তুই!” মল্ল বলল, “সেটাই তো বলছি তোদের। তবে এখনও বাঁচানো সম্ভব। তুই গাড়ি এনেছিস?” সজীব উৎসাহ ভরে বলল, “হ্যাঁ এনেছি। কী দরকার বল?” মল্ল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “চল আমি, দেশ আর সজীব মিলে কিছু কিনেটিনে আনি, তোরা তত ক্ষণ দ্বিজুর সঙ্গে কথা বল।”



“কোথায় যাব? অন্তত এটুকু জানা না-থাকলে গাড়িটা চালাব কোন দিকে?” গাড়ির চালকের আসনে বসে প্রশ্নটা করল সজীব। আমি সামনে চালকের পাশের আসনে বসেছি, আমিও জানি না কোথায় যাব, কেন যাব। আমি এ-ও জানি না, দ্বিজুর বাড়িতে কেন ডাকা হল এবং কেনই বা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। সজীবের প্রশ্ন শুনে মল্ল হেসে ফেলল। পিছনের আসন থেকে গলা তুলে বলল, “সোজা চালা। বেশি দূর যাব না, বটতলার কোনও একটা দোকান থেকে শুকনো খাবার বেশি করে কিনে নেব।” এ বার আমি চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, “শুকনো খাবার কেন? আমরা কি গাড়ি নিয়ে লাদাখ যাচ্ছি নাকি?” মল্ল বলল, “ব্যস্ত হোস না দেশ, এ সব খাবার দ্বিজুর জন্য।”

সজীব আমার মুখ থেকে প্রশ্নটা কেড়ে নিয়ে বলল, “আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।” মল্ল বলল, “বলছি, আগে একটা চায়ের দোকান দেখে দাঁড়া। এই তো সামনের মোড়েই একটা দোকান পাবি।”

তা পাওয়া গেল। এখানে কোনও পাড়া নেই। রাস্তার দু’পাশই ফাঁকা। আর এক দিকে সুবিশাল শিরীষ গাছের নীচে বেশ সুন্দর একখানা চায়ের দোকান দিয়েছে গণা। সেখানেই গাড়ি থামাল সজীব। আমরা নেমে গিয়ে বসলাম গাছের ছায়ার নীচে বাঁশের মাচায়। মল্ল যখন চায়ের নির্দেশ দিচ্ছে তখন আমার মৃদু অশ্রুতি হল। মনে হল মল্ল যা বলতে চাইছে তা কোনও কঠোর বাস্তব। এই গল্পটা না-শুনলেই ভাল হত। কেন বলছে, দ্বিজু বেঁচে নেই! কী বোঝাতে চাইছে যে, ওর কঙ্কাল আর চামড়াটাই নড়াচড়া করছে, ভিতরের মানুষটা ফুরিয়ে গেছে! জানি না, অন্য সময় কোনও গল্প বা ঘটনা শুরু হলে তার বাকিটা জানতে ইচ্ছে হয়। এখানে কৌতূহল হল না, ভয় হল। কেন? কোনও দিন আমিও দ্বিজুর মতো হয়ে যেতে পারি, সেই চিন্তা কি সঞ্চারিত হচ্ছে অবচেতনে? মানুষ কি এ ভাবেই স্বার্থপর হয়ে যায়?

চায়ের বসতে না-বসতেই সজীব খোঁচা দিয়ে বলল, “আমার কিন্তু সতিই একটা দরকারি কাজ ছিল!” মল্ল বলল, “তোরা গাড়ির বদলে একটা ট্যাক্সি চড়ে চলে গেল তোর বান্ধবী, এতে তোর ক্ষতিটা কী হল!” সজীব এ বার হেসে ফেলল, “তুই পারিসও মল্ল। বল, এ বার ঘটনাটা কী বল।” মল্ল আচমকা আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, “আগে এই ব্যাটা দেশ বলুক ও যা জানে, তার পর আমি বলব। সকাল থেকে বাবুদের ফোন করে করে গলা বসে গেল!” এই কথায় আমি পড়লাম ফ্যাসাদে। দ্বিজুর হালহকিকত আমার কিছুই জানা ছিল না। তাই বললাম, “আমার সঙ্গে দ্বিজুর শেষ বার দেখা হয়েছে মাস কয়েক আগে। কিন্তু কথা হয়নি। মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার পথে দেখতাম রাস্তার ধারের বেঞ্চে বসে আছে। এমন দৃশ্য তো প্রায়ই দেখতাম। নিজের মতো বসে আছে বা গালে হাত দিয়ে কিছু ভাবছে। চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে যেটুকু দেখা যায়, কথা হত না ব্যস্ততার সময়।” আমার থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সজীব বলল, “সেটা আমিও দেখেছি। এক দিন গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘গুরু, খবর কী?’ তা বলল, ‘দারুণ।’ জানি ও বিয়ে থা করেনি। চাকরি করে। নিজের মতো ভালই আছে ভেবেছি, কিন্তু সেটা কি ভুল? এ রকম চেহারা হল কী করে? ভেতরে ভেতরে কোনও রোগ বাসা বেধেছে কি না জানিস?” সজীব যেখানে থামল, সেখান থেকেই শুরু করল মল্ল, “আমরা সবাই দেখেছি ও বসে আছে। ভেবেছি দিব্যি আছে। আমিও তা-ই ভেবেছি। যাতায়াতের পথে দু’-একটা কথা ছুড়ে দিয়েছি। বুঝতে পারিনি, ও ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে!”

আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তখন থেকে কেন এক কথা বলে যাচ্ছিস বল তো! কেন, শেষ হবে কেন?” প্রশ্নটা শুনে মল্ল পাল্টা প্রশ্ন করল, “দ্বিজু শেষ কবে অফিসে গেছে জানিস?” আমি মাথা নাড়লাম। মল্ল বলল, “গত চার-পাঁচ বছরে এক দিনও যায়নি!” সজীব বলল, “চাকরির জায়গায় গন্ডগোল? আমি কোনও ব্যবস্থা করব?” মল্ল বলল, “কোনও গন্ডগোল নেই। ওর বাবা যখন মারা যান তখন ছেলেদের কেউ চাকরিটা পেত। দ্বিজুর দুই দাদাই তখন নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই দ্বিজুই পেল চাকরিটা। আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, এটা জানতাম। এক-এক দিন ইভনিং ডিউটি সেরে ফেরার পথে আড্ডা দিত আমাদের সঙ্গে। তবে সে অন্তত পাঁচ-সাত বছর আগের কথা। গত বেশ কয়েক বছরে ও এক দিনও আড্ডায় আসেনি।’ মল্ল বলল, “এই সময়েই গন্ডগোলটা হয়েছে। ও প্রথমে অফিসে কামাই করা শুরু করল। ক্রমশ সেটা বাড়তে বাড়তে পুরোপুরি বন্ধই করে ফেলল অফিস যাওয়া।” আমি আতকে উঠে বললাম, “মানে? সে আবার হয় নাকি?” মল্ল বিষণ্ণ মনে উত্তর দিল, “হয় মানে! অফিসের সহকর্মীরা বাড়ি গিয়ে নালিশ করত ওর মায়ের কাছে, ‘কাকিমা, দ্বিজু অফিস যায় না। এমনকি মাইনে নিতেও না।’ সজীব বলল, “কিন্তু কেন?” মল্ল ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, “প্রশ্ন সেখানেই। কেন? এর উত্তর কে যে জানে!” আমি জানতে চাইলাম, “তা হলে ওর চলে কী করে?” মল্ল বলল, “ওদের সব ভাইদের সংসার আলাদা। দ্বিজু আর ওর মা এক সঙ্গে ছিল। ওর এই উৎপাটাংগিরি দেখে বোন এসে ওদের মাকে নিয়ে গেছে নিজের কাছে।” আমি বললাম, “দ্বিজুর বোনের নাম সম্ভবত দোলা।

মাথার দু'দিকে বিনুনি বুলিয়ে বাড়ির উঠানে একা দোকা খেলত মনে আছে। তার খবর কী রে?” মল্ল আমাদের খবরের জাহাজ। সবার তথ্য থাকে ওর কাছে। বলল, “দোলা এখন দক্ষিণের একটা কলেজে পড়ায়। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে যারা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের এক জন ও।” সজীব বলল, “তা হলে দ্বিজুর চলছে কী করে?” মল্ল উত্তর দিল, “চলছে না তো! কোনও দিন দাদাদের ঘর থেকে দিলে খায়, না দিলে খায় না। কোনও অভিযোগ নেই। চোঁচামেচি, বাগড়াঝাটি কিছু নেই। অফিস যাবে না, এটুকু বাদ দিলে অন্য কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়বে না।” আমি আত্ননাদ করে বললাম, “এ রকম চললে মরে যাবে তো!” মল্ল বলল, “সেটাই তো বলছি! ও কি আদৌ বেঁচে আছে! মৃত্যুর তারিখ লিখে রেখে যেন বাকি দিনগুলো কোনওক্রমে কাটিয়ে দিচ্ছে!” সজীব জোর গলায় বলে উঠল, “তা হলে কিছু একটা করতে সব বন্ধুদের এক দিন ডাকলি না কেন?” মল্ল মৃদু হেসে বলল, “এই তো ডাকলাম!” সজীব তেড়েফুঁড়ে উঠল, “তা বলে এ ভাবে কেউ ডাকে?” মল্ল শান্ত গলায় উত্তর দিল, “অন্য ভাবে ডাকলে আসতিস?” আমি বা সজীব কেউই এই কথাটার উত্তর দিতে পারলাম না।

দোকান থেকে বিস্তর শুকনো খাবার কিনে দ্বিজুর বাড়ি পৌঁছে দেখলাম, সেখানে গল্পদাদুর আসর বসে গেছে। বজ্রা দ্বিজু। ওর সেই হাতলভাঙা চেয়ারে বসে কী বকবক করে চলেছে, আর অন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা শুনছে। আমরা ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রাখলাম আমাদের কিনে আনা জিনিসগুলো। দ্বিজু এক বার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, “একটা বিড়ি দিবি, বিড়ি?” তার পর সজীবের থেকে একটা সিগারেট নিয়ে আয়েস করে ধোঁয়া ছেড়ে বলতে শুরু করল, “অনেক দিন পর খুব আনন্দ হচ্ছে রে। তোরা কত খাবার আনলি, কয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে থাকব। এই সজীব ইশকুলে কত জ্বালাত, এখন কী সুন্দর সিগারেট দিল। বুঝলি দেশ, একটা গল্প বলছিলাম ওদের, বেশি দূর বলা হয়নি, তাদের জন্য আবার প্রথম থেকে শুরু করি, বলা!”



আমরা বেরোনোর পর এ কথা-সে কথার শেষে সম্ভাষণ দ্বিজুকে জিজ্ঞেস করেছিল, “তোর সেই বান্ধবীর খবর কী?” দ্বিজু বলেছিল, “ভালই আছে।” সম্ভাষণ জানতে চেয়েছিল, “দেখাটেকা হয়?” দ্বিজু হাসি মুখে বলেছিল, “ওর হাসি মুখ দেখার জন্যই তো বেঁচে আছি।” তেজদীপ ঝুলে পড়েছিল, “এ গল্প তো আমি জানি না দ্বিজু, খুলে বলা!” আমরা ফেরার পর সেটা গুছিয়ে পরিপাটি করে বলতে শুরু করল দ্বিজু।

“আমি বোধ হয় তাদের থেকে একটু বেশিই পাকা ছিলাম। পাকা নয়, ডেঁপো। না হলে ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় কেউ প্রেমে পড়ে!” মল্ল গলা খাঁকারি দিতে গিয়েও চুপ করে গেল। আর দ্বিজু ওর উদাসীন দৃষ্টিতে এক বার মল্লর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে নিজের চিরাচরিত নরম গলায় বলতে শুরু করল, “উত্তর দিকের ওই জানলার সামনে দাঁড়ালেই একটা সবুজ রঙের এক তলা বাড়ি দেখতে পাবি। ওটাই বুল্টিদের বাড়ি। বুল্টি আমারই বয়সি, বড় জোর দু’চার মাসের বড় হবে। তা হোক, সেই ছোটবেলাতেই কেউ আমার কানে কানে বলে দিয়েছিল যে, বুল্টি তোর বৌ হবে। তখন মাঝে মধ্যেই অশরীরী কেউ এসে আমার কানে কানে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে যেত। যেমন, আজ আমাদের বাড়ি পায়ের রাস্তা হবে, আজ আমাদের বাড়ি রঙিন টেলিভিশন আসবে। এর একটাও মিলত না। কিন্তু মাথায় চিন্তাটা ঘুরত। বুল্টির কথাটাও ঘুরতে শুরু করল। ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বাসে পরিণত হল। আমি তখন সর্বক্ষণ ওর কাছে কাছে থাকতাম। বেশ

ভাবও ছিল দু’জনের। ও বাড়ি থেকে লুকিয়ে আলুর বড়া এনে খাওয়াত আমাকে। আমি ওকে গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিতাম, ‘বুল্টি, চাকরি পেয়ে তোর জন্য সোনার হার গড়িয়ে দেব, দেখিস!’ ও বড় বড় চোখের ভাষায় সম্মতি জানাত। চোখ দুটো খুব সুন্দর ওর। দাঁড়া, এক দিন তাদের দেখাব। এখনও একই রকম সুন্দর আছে ও। মানে সুন্দরী। ছিপছিপে রোগা, কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুল। তা কী বলছিলাম যেন?”

“তোর কানে কানে কেউ এসে বলে গেল, বুল্টির সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।”

“হ্যাঁ। কিন্তু সে তো বুল্টির কানে কানে কিছু বলেনি। ধর এই পাড়ার আনাচে কানাচে আমরা সদলবলে লুকোচুরি খেলছি, বুল্টি আমার হাত ধরে বড় কদম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দেখছে চোর আসছে কি না, ওর সাদা মনে দোষ নেই, কিন্তু আমার বুকের ভেতরে গুড়গুড় শুরু হয়ে যেত! মল্ল, কিছু বললি ভাই?”

“পালপাড়ায় পারিজাত প্রেম! পায়ের ধুলো দে ভাই!”

দ্বিজুদের এই পাড়াটার নাম পালপাড়া। ও লাজুক হেসে বলতে শুরু করল, “ক্লাস এইটে উঠে মনে সাহস আনলাম। তত দিনে বুল্টিরও অনেক ডানা-পাখানা গজিয়ে ছিল। পাশের পাড়ায় ওর জ্যাঠার বাড়ি। সেই দাদার বন্ধুদের দু’-এক জনের সঙ্গে ওকে ইতিউতি ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল। পাড়াতেও সর্ব সময় টো টো কোম্পানি হয়ে ঘুরে বেড়াত। এক দিন খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময় ওর সঙ্গে দেখা। সে দিন ঠিক করলাম, এসপার ওসপার করে ফেলব। পাড়ার রাস্তা তো, লোকজন কম, গাছপালার ছায়া, আড়াল আবডালও অনেক। তো, ওর কাছে গিয়ে বললাম, ‘বুল্টি, তোকে একটা কথা বলব।’ আমার ভাবগতিক দেখে ও কী বুঝল কে জানে, ভুরু নাচিয়ে বলল, ‘বলতেই হবে?’ আমার রোখ চেপে গিয়েছিল, বললাম, ‘বলতেই হবে।’ ও বলল, ‘না-বললে কী হয়?’ আমি বললাম, ‘না-বললে প্রাণে বাঁচব না।’ ও বলল, ‘না, না, মরতে হবে না তোকে, বালাই যাট। বল, কী বলবি বল!’ তখন আমার ফানুস গেল ফেটে। লজ্জা পেয়ে বললাম, ‘বলছি তো, মানে সবাই যা বলতে চায় আর কী!’ বুল্টি অমনি বেগি দুলিয়ে বলল, ‘আমি ক’দিন ভেবে নিই? এমনিতেই দাদার বন্ধু প্রশান্ত এত জ্বালাচ্ছে না...’

আমরা সমস্তের বলে উঠলাম, “তার পর?”

দ্বিজুকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। চোখ দুটো খুশি খুশি লাগছে। ও বলতে শুরু করল, “ভাবনা তোলা থাকল চুলোয়। আর আমাদের হাসি, ঠাট্টা, খেলাধুলো বহাল থাকল আগের মতো। এক দিন ও নিজেই বলল, ‘জানিস, কাল প্রশান্তদার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।’ শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। দপ করে প্রদীপ নিভে গেলো যেমন হয়, তেমন। বুল্টি আমার মুখ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করল। তার পর টক করে আমার গাল টিপে বলল, ‘আহা, মন খারাপ করিস না, তুই তো আমার ভূত। তোকে আমি ছাড়তেও পারব না, আঁকড়াতেও পারব না।’”

বলে থামল দ্বিজু। আমি বলে উঠলাম “তার পর?” এখানে আসার পর ওর চোখে কেমন যেন ভাষাহীনতা ছিল। লক্ষ করলাম, গল্প করার সময় স্বাভাবিক থেকে আরও স্বাভাবিক লাগছে চোখের ভাষা। দ্বিজু বলতে শুরু করল, “বুল্টির কথায় আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, ‘থাক তুই তোর প্রশান্তকে নিয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলিস না।’ তখন বুল্টি আমায় প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, ‘ওরে বাবাবে, ছেলের রাগ দেখো! আচ্ছা, ভূত কি মানুষ হয় না? একটু সময় দিতে হবে তো!’ আমি হেসে ফেললাম। বুঝলাম, আমি ওই কথা-টখা বলার জন্যই ঠিক আছি। তার পর পড়ার চাপ বাড়ল, পাড়ায় চষে বেড়ানো কমে গেল। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় কমে গেল, বুল্টির সঙ্গেও দেখা বিশেষ হত না। দেখা হলেও সে ভাবে কথা হত না। কয়েক বছর পর এক দিন রেল স্টেশনের কাছে দেখি এক জনের সঙ্গে ফুচকা খাচ্ছে। আমায় দেখে হই হই করে উঠল। পরিচয় করিয়ে দিল ছেলেটার সঙ্গে, ‘দ্বিজু, এটা হল অরবিন্দ।’ আর আমায় দেখিয়ে বলল, ‘ও হল আমার একটা লক্ষ্মী ভাই!’ তার পর নির্লজ্জের মতো বলল, ‘ফুচকা খাবি দ্বিজু?’ আমার মজাই লাগছিল। লক্ষ্মী ভাই সেজে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মাসিমা ভাল আছে?’ বুল্টি চোখ নাচিয়ে বলল, ‘আর কেমন থাকবে? আমার জ্বালায় রোজ দু’বার করে গঙ্গাযাত্রা

করতে চায়।’ আমি বললাম, ‘মাসিমা কে বরং এক বার সাগর দেখিয়ে আন, একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর!’ বুল্টি রাগাত স্বরে বলল, ‘না ভাই, গঙ্গাই ভাল। সব সাগরেই নোনা জল।’ পাশ থেকে ফুচকা মুখে সেই অরবিন্দ বলে উঠল, ‘হেই ডুড, ইউ লাইক ওশান?’

একটু থেমে এ বার আমাদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল দ্বিজু, ‘তোরা ‘হীরামানিক’ চিনিস?’ সজীব উত্তর দিল, ‘কেন চিনব না, এ তল্লাটের সবচেয়ে জালি মিষ্টির দোকান। হীরা মণ্ডল, মানিক মণ্ডল, দুই ভাই এর মালিক।’ দ্বিজু মাথা নেড়ে বলল, ‘সেই হীরার সঙ্গে বছর কয়েক আগে বিয়ে হয়ে গেছে বুল্টির।’ মল্ল জিঙ্গেস করল, ‘তুই কী ভাবে জানলি বিয়ের খবরটা?’ দ্বিজু বলল, ‘বুল্টিই এসে নেমন্তন্ন করেছিল। আমি হেসে বললাম, ‘বিয়ের কার্ড দেখাতে এসেছিস? তার থেকে একটু বিষ এনে দিতিস!’ বুল্টি আবার আমার গাল টিপে দিয়ে আদুরে গলায় বলেছিল, ‘ভূত কখনও বিষ চায়? বিয়েতে আমায় কি উপহার দিবি রে দ্বিজু?’ সে দিন ওর কথার উত্তরে ‘বিষ দেব’ বলতে গিয়েও বলতে পারিনি।’ মল্ল জিঙ্গেস করল, ‘বিয়েতে গিয়েছিলি?’ দ্বিজু হেসে বলল, ‘একটা বিড়ি দে তো কেউ!’ আমি খেয়াল করলাম কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে ওর বিড়ি চাওয়ার ধরনটাও বদলে গেছে। এটা কেন হল? তা হলে কি কখনও সুস্থ আর মানসিক ভাবে কখনও অসুস্থ থাকে? নাকি আমাদের সাহচর্যে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে! কিন্তু আমরা আর কত ক্ষণ! ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে ধোয়া ছেড়ে দ্বিজু বলতে শুরু করেছে, ‘না, ওর বিয়েতে যাওয়া হয়নি। ওই দিন অফিসে পর পর দুটো ডিউটি নিয়েছিলাম, ইভনিং আর নাইট। তবে বিয়ের পর অনেক বার দেখা হয়েছে। ওর ব্যবহার একটুও বদলায়নি। বুঝলি, এই হল আমার বান্ধবীর খবর। আর কিছু জানতে চাস?’

‘জানতে চাই তুই কবে অফিস যাবি,’ ঝপ করে কথাটা বলে ফেলল সম্ভাষণ। গল্প শেষ করে আমাদের দিকে বেশ হাসি হাসি মুখে তাকিয়েছিল দ্বিজু। কথাটা শোনার পর দাঁত বের করা হাসিটা থাকল, কিন্তু কে যেন ভিতর থেকে পট পট করে আলোগুলো নিভিয়ে দিল। ও সরাসরি কোনও উত্তর না-দিয়ে মাথা নাড়িয়ে বৃদ্ধদের মতো একটা ভঙ্গি করল। মল্ল নিচু গলায় বলল, ‘না হলে চাকরিটা থাকবে না যে দ্বিজু।’ দ্বিজু পাশ কাটানোর ভঙ্গিতে নিপ্রাণ গলায় বলল, ‘যাব যাব, এ বার যাব।’ সজীব হঠাৎ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘কাজে না গিয়ে বাড়িতে বসে বসে সময় কাটাতে তোর ভাল লাগে?’ দ্বিজু ম্লান হেসে পাল্টা জিঙ্গেস করল, ‘কাজে যেতে তোর ভাল লাগে?’ সজীব আরও জোরে কিছু বলতে উঠে হঠাৎ চুপসে গিয়ে বলল, ‘আমারও ভাল লাগে না। শালা বসের মুখখানা আর চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথাগুলো মনে পড়লে আমারও অফিস যেতে ভাল লাগে না। কিন্তু আমার বস তো তোর অফিসে নেই। তা হলে তোর কেন অফিস যেতে ভাল লাগে না দ্বিজু?’ উত্তরটা দিল মল্ল, ‘তিনি সর্বত্র আছেন, বাবা সজীব, সব অফিসেই ওই ভাবেই কথা বলেন, তোমার একার তাকে খারাপ লাগে তা নয়!’ এ বার আমরা সবাই হেসে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা অধিবেশন যেন শেষ হল। আমরা যে যার কাজের জায়গায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছি যখন, তখন শুনতে পেলাম সিঁড়ি ধরে নেমে এসে আমাদের বিদায় জানাতে গিয়ে রুগ্ন দ্বিজু সম্ভাষণকে বলছে, ‘তোর কাছে আর একটা বিড়ি হবে ভাই, বিড়ি?’

‘কী হল, ফোন করছে কেন?’

‘তোমাকে একটা কথা বলার আছে নদী।’

‘তুমি কি মত বদলেছ? ডিভোর্স পেপারে সই করবে?’

‘তোমার একটা দরকারি জিনিস আমার কাছে আছে।’

‘তুমি কি সই করবে জানাতে ফোন করছে?’

‘না, আমি অন্য একটা দরকারে ফোন করছি।’

‘এক মাত্র ডিভোর্সের কাগজে সই ছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার না কোনও দরকার আছে, না আমার কোনও জিনিস তোমার কাছে আছে।’

‘তুমি কি প্রিন্স মেরিতে চাকরির দরখাস্ত করছ?’

‘এই, তুমি কি আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ?’

‘না, বাবুদার।’

‘কী সব আজেবাজে বকছ! ক’পেগ গিলেছ?’

‘আমার অফিসের ঝাড়ুদার আজ এক গোছা কাগজ দিল। সেটাই দরখাস্ত। ডিভোর্সের কাগজ ভেবে যেটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে গিয়েছিল আজ।’

‘তা কী করতে হবে?’

‘আমার মনে হয় এটা তোমার দরকার।’

‘কিন্তু আবার তোমার অফিসে যাওয়ার মুড নেই আমার। সরি।’

‘তা হলে কী হবে?’

‘কেন, আমার বাড়ি তুমি চেনো না?’

‘তোমার বাড়ি যাওয়ার মুড নেই আমার। আমার যেতে আপত্তি নেই, যেতেই পারি। কিন্তু তুমি তো জানোই, আমায় দেখলেই তোমার মা কাঁদতে কাঁদতে বলবেন, ‘মেয়েটার মাথার ঠিক নেই!’

‘থাক, থাক, এক কথা শুনতে ভাল লাগে না।’

‘শোনো, অন্তত এখানে মেজাজ দেখাবে না। দরকারটা তোমার, আমার না।’

‘আমার কোনও দরকার নেই তোমার সঙ্গে। শুধু ডিভোর্সের সইটা ছাড়া।’

‘আপ্যায়নে আসতে পারবে? তা হলে সেখানেই কাগজগুলো ফেরত দিতে পারি।’

‘কিসের আপ্যায়ন? কোথায়?’

‘মনে করে দেখো, আমাদের ওই নাম মাত্র বিয়ের আগে যেখানে তোমার ভাই-বোনদের খাওয়ানো হয়েছিল।’

‘তোমার সঙ্গে আমার কোনও বিয়ে হয়নি।’

‘তা হলে ডিভোর্স চাইছ কেন?’

‘কাগজগুলো তা হলে কখন পাব?’

‘এখন সাতটা বাজে। সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি পৌঁছে যেতে পারব।’

‘আর কিছু!’

‘ফেরার সময় আমি তোমায় পৌঁছে দিতে পারি।’

‘খবরদার। আমায় পৌঁছে দিতে চাইলে আমি পুলিশ ডাকব।’

‘ডেকো, তারা হেসে বলবে, ‘স্যর, আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে বাইকে চড়িয়ে নিয়ে যাবেন, এতে আর আপত্তি কী!’

‘সামনে থাকলে আমি তোমায় গুলি করে দিতাম!’

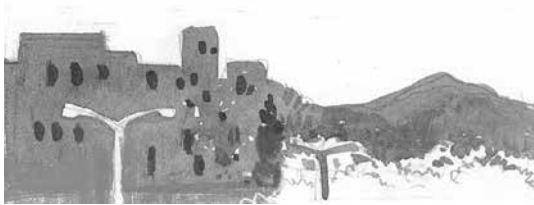
‘যে একটা কাগজের বদলে অন্য দরকারি কাগজ ছুড়ে পালায়, দরকারের সময় সে বন্দুকের বদলে ছাতা তাক করবে, ছাতা! যাক গে, আর বাজে কথার দরকার নেই। সঙ্গে সাড়ে সাতটা, আপ্যায়ন।’

দ্বিজুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ দুপুরে সোজা চলে গিয়েছিলাম আমার হৈশেলে। আমার খাওয়া দাওয়া সেখানেই সারি। এক মাত্র যে দিন কোনও কাজের বরাত থাকে না সে দিন রাঁধুনিকে আসতে বারণ করে দিই। কোনও হোটেল চুকে পড়ি। একলা মানুষের বাক্সি বিশেষ নেই। ইচ্ছে ছিল ঠান্ডা মাথায় কয়েকটা কাজ সেরে নেব। বিশেষ করে সামনের সপ্তাহে যে-কাজগুলো আছে তার শুকনো বাজারের তালিকা তৈরি করে মুদির দোকানে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমার আবার একটা ব্যামো আছে। ভাবার ব্যামো। নিজের অফিসের দরজা খুলে যেই না নিজের জায়গায় এসে বসলাম, অমনি শত শত জানলা খুলে সেখান থেকে প্রশ্নগুচ্ছ আসতে শুরু করে দিল। কত শত প্রশ্ন। প্রত্যেকটা মানুষের আলাপা একটা জগৎ তৈরি হয় তার কাজের জায়গায়। দ্বিজুর কেন হয়নি? দ্বিজু কেন কাজে যায় না? বুল্টির যে গল্প ও করল, তাতে কোনও হাহুতাশ নেই। তা হলে ওই গল্প করার সময় ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন? কথাবার্তায় দ্বিজু কি পুরোপুরি স্বাভাবিক? কেন মনে হচ্ছে, ও এক পা, এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিকত্বের দিকে? মনে হল ও যেন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। যেন ও একটা দ্বীপ বা একটা দুর্গ, যার চার পাশে শত্রুরা ঘাঁটি গেড়ে খাবার পাঠানোর রাস্তা অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু কেন? কেন এই স্বেচ্ছা নির্বাসন? সব কিছু রহস্যময় লাগে।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ চোখ গিয়েছিল মেঝের দিকে। এক দলা কাগজ। কিসের কাগজ? খুলে দেখেছিলাম সেন্ট মেরিজে চাকরির আবেদনপত্র। নীচে নদীর দস্তখত। তখনই ইতস্তত করে ফোনটা করাই ফেললাম। কিন্তু তাতে মাথাটা শান্ত হল না। ভোঁ ভোঁ করতে

থাকল। অন্য দিন হলে বন্ধুদের ফোন করতাম। মল্ল, সজীব, সম্ভাষণ সময় সুযোগ মতো সন্দের পর বা ছুটির দিন সকালে আমার অফিসে টু মারে। দিব্যি আড্ডা জমে ওঠে। আসলে আমি এখনও তত বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাইনি যে, লোকে অফিসে এসে হরেক রকম মেনু কার্ড দেখে কাজের বরাত দেবে। সে রকম হয় কদাচিৎ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোকে ফোনেই বলে, “আমি অমুকের থেকে আপনার নম্বর পেলাম। আমার কিন্তু বাছাই বাছাই অতিথি আসবে, আপনি পারবেন তো? আসুন দেখি এক দিন, সামনাসামনি কথা বলি!” আমি তখন চুপচাপ তাদের ঠিকানা শুনে নিই। কচিং কদাচিৎ বন্ধুরা এক সঙ্গে এসে পড়ে। কাজের চাপ থাকলে আমি সে সব সারতে সারতেই আড্ডা চালাই। না হলে খাতা বন্ধ করে আড্ডা। মল্ল আমায় উপদেশ দিয়েছে, “অফিসের পবিত্রতা ঘড়ি ধরে অফিস খোলা। সেটার অন্যথা করবি না। সন্দের পর কোথাও যেতে হলে আমায় বলবি, আমি বসে তোর অফিস পাহারা দেব।” আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তুই একা একা বসে কী করবি?” ও বলেছিল, “ফোন করবি। ফোন করলে কেউ একা হয় নাকি? তুই জানিস না দেশ, নিরিবিলি জায়গা থেকে ফোন করার মজা কী!” আমি আর প্রশ্ন করিনি। আমার সঙ্গে যাদের ফোন যন্ত্র মারফত যা যা কথা হয়, তা শিয়ালদহ স্টেশনে বসেও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব!

এটা অবশ্য কথার কথা নয়। বিয়েবাড়ি বা বিভিন্ন কাজে আমায় প্রায় সন্দের বাইরে থাকতে হয়। তখন কয়েক বার মল্ল একাই এই অফিসে বসে থেকেছে। কিন্তু আজ আপ্যায়ন যাওয়ার সময় আর ওকে জ্বালালাম না। প্রায় সারাটা দিন তো এক সঙ্গেই কাটলাম বন্ধুরা। কোনও ক্রমে মনকে একটা বিন্দুতে এনে কিছু কাজ সারলাম। তার পর হঠাৎ দেখি সাতটা বেজে পাঁচ। লাফিয়ে উঠলাম। দেরি না হয়ে যায়। নদীর আগেই আমায় পৌঁছাতে হবে আপ্যায়নে। মাথা ঠান্ডা, শ্বাসকে শান্ত করে অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্যকে বলতে হবে, তোমায় আমি ছাড়ব না! এই কথাগুলোকেই আগে পরে সাজিয়ে নিজের সুরে গান গাইতে গাইতে পক্ষীরাজে চড়ার মতো মেজাজে এগিয়ে চললাম নগরপথ ধরে।



রেন্তুরায় লোকে আসে হালকা মেজাজে বসে স্বাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। কেউ কেউ হয়তো আসে ক্ষুধার্ত হয়ে গোথ্রাসে গিলতে। কেউ নিছক কাউকে সঙ্গ দিতে। এক মাত্র আমি এলাম লোকের গাল শুনতে। একটু পরেই নদী এসে ডিভোর্সের কথা তুলবে এবং তার পরই মেজাজ হারাবে। অথবা হয়তো আসবেই না। তখনও বসে থাকব আমি, যে কখনওই মেজাজ হারায় না। বসে থাকার জন্য চক্ষুলজ্জাজনিত কারণে একটা করে ডিশ অর্ডার করব। তার পর সেটার রন্ধন প্রণালী বুঝে ওঠার চেষ্টা করব। এবং ভাবব, জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী, কোনও ক্লায়েন্টকে কী ভাবে ভজানো যাবে এই পদ পরিবেশনের জন্য। এ ভাবেই আমি রেন্তুরার খাবারকে বিয়েবাড়ির হৈশেলে নিয়ে ফেলি। এক দিন নদীকে এই সব গল্প করেছিলাম। তখন অবশ্য ছিল অন্য রকম ব্যাপার। সে এক অন্য নদীর গল্প। বিয়ের কালো মেঘ তখনও নদীর উপর ছায়া ফেলেনি। দুই সমবয়সি কিশোর-কিশোরী হিসেবে আমাদের মধ্যে তখন ছিল বন্ধুর মতোই সম্পর্ক। তুইতোকারিতেই স্বচ্ছন্দ ছিলাম আমরা। নদীদের গুপ্তধর ব্যবসার এক জন কর্মচারী ছিলাম আমি। তবে গুর বাবা এবং পরে মায়ের অকৃষ্ট স্নেহে আর প্রশ্রয়ে ওদের অন্দরমহলেও ছিল অবাধ যাতায়াত। তাও নদীর সঙ্গে তখন সম্পর্কটা মালকিন-কর্মচারীর মতো ছিল না। এক দিন ওকে গল্প করেছিলাম, আমার স্বপ্ন মহাকাশে পর্যটক বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবসা করা। মহাকাশ ভ্রমণের ট্রাভেল এজেন্ট হওয়া।

প্রথমে একচোট হেসে নদী বলেছিল, “তোর হবে দেশ। আমার মন বলছে, তোর দ্বারা এটা হবে।” আমি কৌতূহলীর চোখে তাকিয়েছিলাম। ও তখন ভেঙে বলেছিল, “তোর সুবিধে কী জানিস? তুই লেগে থাকতে পারিস। যদি মনে করিস করবি তা হলে সেটা করেই ছাড়বি।” তার পর নিজেকে দেখিয়ে বলেছিল, “আর আমায় দ্যাখ, কোনওটাতেই লেগে থাকতে পারি না। যদি মনে করি এটা করতে হবে তা হলে সেটাও হেঁটেমেটে একশা করি।” আমি তখন প্রতিবাদ করিনি। সবাই বলত, ননীবাবুর মেয়ে বড্ড জেদি। ননীবাবু নিজেও তাই বলতেন। তখন মাঝে-মাঝে তাঁরা বেড়াতে যেতেন। ব্যবসার ভার এর গুর ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যেতেন চার-পাঁচ-সাত দিন ঘুরে বেড়াতে। এক বার ডুয়ার্স ঘুরে এসে বললেন, “এক জায়গায় কয়েকটা বন্য প্রাণী দেখলাম। মেয়ে হাতি দেখে আমায় বলল, ‘দেখো বাবা, তোমার মতো মোটা।’ আমি একটা বাইসন দেখিয়ে বললাম, ‘দেখ, তোর মতো, ভাল-মন্দ বিচার না-করে তেড়ে যায়।’” আজ মনে হয়, নিজের মেয়ে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ ছিল নিখুঁত।

আপ্যায়নে কোণের দিকে একটা টেবিলে এক গ্লাস ব্লু লেগুন শরবত নিয়ে বসেছিলাম। বেশি ক্ষণ বসতে হল না, নদী চলে এল। কোঁচকানো ভুরুতে দু’পলক এ দিক-ও দিক তাকিয়ে আমায় দেখতে পেয়ে দ্রুত পায়ে এসে সামনের চেয়ার টেনে বসে পড়ল। আমি মনে মনে বললাম, ‘হে আপ্যায়ন দেব, আপনার এই অতিথি খেতে আসেননি, যেতে এসেছেন।’ আমার আশঙ্কাকে সত্যি করে বশা মাত্রই নদী তাগাদা দিয়ে বলে উঠল, “কী বলতে চাও?”

নদী রোগা এবং লম্বা। গুর বান্ধবী উর্মি অবশ্য বলে, না, না, ও আসলে লম্বা বলে রোগা লাগে। তবে আমার বেশ লাগে। কণ্ঠ পর্যন্ত চুলা। তার কয়েক গোছা নিয়ম করে চোখের উপর এসে পড়ে। এই নদীতে যখন সুখের স্রোত বয় তখন তার রেশ দু’পাশেও ছড়িয়ে পড়ে। আমি দিব্যি মনে করতে পারি, হাসি-খুশি মেয়েটা যেখানে থাকত সেখানকার পরিবেশটাই বদলে যেত। এই মুহূর্তে গুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গলার কাছেও কয়েক বিন্দু। একটা দুধসাদা কুর্তি আর ডেনিম পরে এসেছে। সকালে এই পোশাক ছিল না। কিন্তু কী ছিল মনে পড়ল না। আমি ওয়েটারকে ডেকে ওকেও একটা শরবত দিতে বললাম। প্রত্যাশা মতোই নদী প্রতিবাদ করে উঠল, “আমি এখানে খেতে আসিনি।” আমি মৃদু হেসে বললাম, “জানি। তুমি এসেছ কথটা বলতে। কথটা দরকারি। হালকা স্টাটার বলছি, সেটায় না-না করে শুরুতেই কথা কেটে দিয়ো না!” কী বুঝল কে জানে, তবে উত্তর না-দিয়ে ঢক ঢক করে গ্লাসের জলটা খেতে শুরু করল। আমি বেকড ফিশ দিতে বললাম। এটা নদীর প্রিয়।

জল খেয়ে “এক মিনিট,” বলে ব্যাগ নামিয়ে রেখে ওয়াশরুমের দিকে গেল। কেন যেন মনে হল, মেয়েটা খুব ক্লান্ত। ক্লান্ত ও চিন্তিত। হয়তো বিভ্রান্তও। আমি চাইছি গুর দিকে বন্ধুর মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তা ও ধরবে না। বিয়ের পর এই প্রথম দু’জনে, শুধু দু’জনে কোনও রেন্তুরায় খেতে আসা। অথচ তার পূর্নির্ধারিত যে-আলোচাসূচি, তা হল বিবাহবিচ্ছেদ। আমরা বিবাহিত, কিন্তু একটা বারের জন্যও আমি আর ও কখনও ঘরবন্দি হইনি। আমি কখনও নদী স্লুজ ঘরের ছিটকিনি বন্ধ করিনি। এখনও রাতে একা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময় মনে হয়, সেখানে নদী থাকলে আমার বুক টিপ টিপ করত কি না। এখন এই এক মিনিটের অবসরে ভাবার চেষ্টা করলাম, আমরা যেন কোনও স্বাভাবিক দম্পতি। এখানে নৈশাহার সেরে মোটরসাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ছুটিতে কোন গন্তব্যে বেড়াতে যাব, তা নিয়ে ঝগড়া করব। আচ্ছা, সুখী দম্পতির খুনসুটিতে শেষ পর্যন্ত কে জেতে? আর আমাদের মতো অপরিণত ও অসম্পূর্ণ দম্পতিদের মধ্যে বোধ হয় জয়ী হয় হিংসাই। এক বার মনে হল, থাক, ওকে যখন সুখী করতে পারবই না, তখন অসুখীই বা করব কেন? দিয়েই দিই বিচ্ছেদ সম্মতি। এমনিতেও আমরা বিচ্ছিন্ন, আইন মেনেও সেটাই হয়ে যাক। আর তখনই বৃকের বাঁ দিকে একটা তির তির করা ব্যথা শুরু হল। কে যেন বলল, ও কিছুতেই ভাল নেই। ওকে হয়তো অনেকেই সঙ্গ দিতে পারবে, কিন্তু গুর পুরোটা জেনে আমার মতো ভাল করতে পারবে না।

ওয়াশরুম থেকে ফিরে নদী চেয়ার টেনে বসতে না-বসতেই স্টাটার

চলে এল। জানতাম, কথা হলেই বিতর্ক, তাই “চলো, আগে খাওয়া যাক, খুব খিদে পেয়েছে,” বলে খেতে শুরু করে দিলাম। মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে নদীও খেতে শুরু করল। কেবল খেয়ে যাওয়াটা অসভ্যতা, ভেবে জিজ্ঞেস করলাম,

“আজ কোনও ইন্টারভিউ ছিল?”

“হুঁ।”

“ভাল হয়েছে নিশ্চয়ই।”

“মনে হয় নেবে না, না হলে এমন অভ্যুত প্রশ্ন করে!”

“কী প্রশ্ন?”

“আপনি ক্লাস নেওয়ার সময় হঠাৎ ভূমিকম্প হলে কী করবেন?”

“তুমি টেরই পাবে না। পাশের ঘরে চিৎকার চেঁচামেচি হলে হয়তো জানতে চাইবে কী হয়েছে!”

“হ্যাঁ, সেটাই তো। কিন্তু সেটা তো বলা যায় না। বানিয়ে বানিয়ে ভাল ভাল কথা বললাম।”

“তুমি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারো? মনে তো হয় না।”

“শিখছি।”

“মনে হয় না শিখতে পারবে। কত বার বললাম রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করো। সফল পাবে। আমার মতো হতে পারো না? রাগকে বোতলে পুরে রেখে হাসি মুখে কথা বলে যাওয়া...”

“এখন যেমন বলছ?”

“যাচ্ছিলে, তোমার ওপর রাগতে যাব কেন?”

“তা হলে সইটা করে দিচ্ছ না কেন?”

“সইটা করলে তোমার বাড়তি লাভ কী হবে? তুমি তো তোমার মতোই আছ।”

“তা হলে সইটা করলে তোমার ক্ষতি কী হবে?”

“সই সই সই! ডিভোর্স পেলে কী করবে নদী?”

“নাচব। আনন্দে ধেই ধেই করে নাচব। দেবে! আজ দেবে?”

“এ বার মেন কোর্স বলে দিই! বাসন্তী পোলাও আর কষা মাংস খাবে?”

“আমি এখানে খেতে আসিনি দেশবাবু।”

“এত বিদ্বেষ নিয়ে বলবেন না নন্দীদেবী। রাষ্ট্রপ্রধানদের আলোচনাও হয় খেতে খেতে।”

“সেখানে আলোচনার শেষে সইসাবুদও হয়। এ তো তোমার অজানা থাকার কথা নয় দেশবাবু।”

“সইসাবুদ হয় দুই দেশের স্বার্থ রক্ষা করে। দু’জনেরই কিছু প্রাপ্তিযোগ্য থাকে সেখানে। এক পক্ষকে কেবল হারাতে হয় না!”

“বাহ! এই তো চাই। কাম টু দ্য পয়েন্ট। বলো, কত টাকা হলে রফা হবে? বানু ব্যবসায়ীর মতোই খেলছ। বলো, আমি রাজি।”

“তুমি আর একটু জল খাও। খুব তৃষ্ণার্ত মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে।”

“আমাকে দেখে আর কী কী মনে হচ্ছে?”

“মনে হচ্ছে তুমি খুব খারাপ আছিস।”

“নাটক করবে না, একদম নাটক করবে না।”

“কী করব! সব সময় করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে।”

“এত ক্ষণে একটা সত্যি কথা বলেছ।”

ওয়েটার এলে মেন কোর্সের খাবার দিতে বললাম। নদী অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। ওয়েটার চলে যেতে আমি নরম ভাবে বললাম, “তোমার সঞ্চয় কত সেটা আমি জানি। এ ভাবে ডিভোর্সের জন্য না উড়িয়ে ওই টাকাটা অন্য একটা ভাল কাজেও তো লাগাতে পারো!”

“ব্যবসায়? প্রজাপতি কেটারিংয়ে?”

“যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলে সেই রকম একটা স্কুল তো নিজেই চালু করতে পারো!”

“থাক, হাতা-খুস্তি ছেড়ে স্কুল নিয়ে জ্ঞান না হয় এখানে না-ই দিলো!”

“না হয় একটু দিলামই! হাতা-খুস্তির স্কুলও তো হয়, হয় না?”

“ব্যবসা ছাড়া আর কিছু কোনও দিন চিনেছ?”

“কেন? নাটক?”

“তাও যদি সত্যিকারের নাটক পারতো।”

“পারতাম তো। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের হস্টেলের

ছেলেরা মিলে একটা নাটক করেছিলাম, মশাইয়ের মশকরা। সে দমফটা হাসির নাটক। তার একটা সংলাপ শুনবে, শোনো। “ওরে পটলা, আমার গিমি বলছে দরদাম করে জিনিস কিনবে! তা হলে তুমি কেন বলছিস, যে দাম ইচ্ছে হয় দিন কর্তা, এ বার বাড়ি যাব! আমি এখন গিমির কথা রাখি কী করে...” তুচ্ছ একটা নাটকের নগণ্য একটা চরিত্র, তারও গিমি রয়েছে! কী দিনকাল!”

“আমায় ডিভোর্স দিয়ে গ্রামের একটা মেয়েকে বিয়ে করে গিমি গিমি করো না, কে বারণ করেছে?”

“আর তুমি বিয়ে করবে না?”

“তাতে তোমার কী?”

“কেমন পাত্রকে বিয়ে করবে?”

“আর যাই হোক, ব্যবসায়ী পাত্রকে নয়!”

“কিন্তু এক দিন যে বলেছিলে, লোকের চাকর হিসেবে নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ালেই দেশ নামের এক জনের গলায় তুমি সানন্দে...”

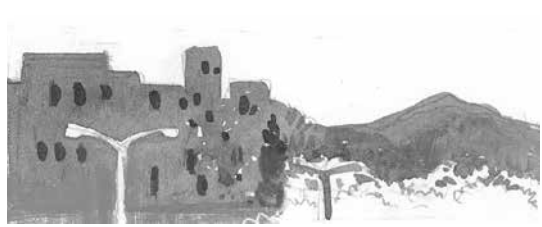
“তুমি এই জন্যে আমায় ডেকে আনলো! ঝগড়া করবে আর কথা শোনাবে। কিন্তু সই দেবে না!”

“আমি ডেকেছি তোমায় কাগজগুলো দেব বলো।”

ব্যাগ থেকে বের করে কাগজগুলো দিলাম। এক বারও না-দেখে এ বার সেটা মাঝখান থেকে চিরে ছিঁড়ে ফেলল নদী। বলল,

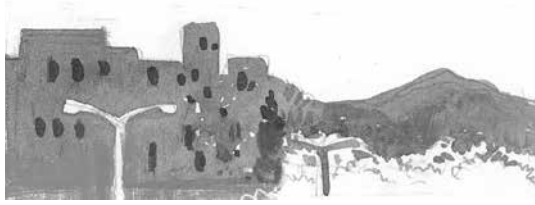
“দেখলে তো, এই কাগজের জন্য আমি আসিনি। এটুকু বুঝলে না, ওর আর একটা প্রিন্ট বের করতে এক সেকেন্ড লাগে! আমায় সইটা দিয়ে দাও দেশ, দিয়ে দাও। যে-গাছটা মরে গেছে, কেন তার ডালপালা আঁকড়ে পচা গন্ধ তৈরি করবে? কী পাবে তুমি?”

এ কথার আর উত্তর দিতে পারলাম না। পাশের টেবিলে আমাদের বয়সি একটা জুড়ি বসে রয়েছে। হয়তো দম্পতি তারা। দু’জনের কাগজ ছেঁড়ার দৃশ্য দেখে এ দিকে তাকাল। চিবুকের নীচে হাত রেখে এক বার ভাবলাম, থাক, যে যাতে শান্তি পায়, পাক। সই করেই দিই! ঠিক সেই মুহূর্তেই নদীর ব্যাগে থাকা ফোনটা বেজে উঠল। নির্লিপ্ত ভাবে ফোনটা কানে ঠেকিয়ে ও বলল, “বলো।” আর তার পরই মুহূর্তের মধ্যে মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কোনওক্রমে উচ্চারণ করল, “অ্যাঁ!” মনে হল এখনই কান থেকে ফোনটা খসে পড়বে। আমি সৌজন্য ভুলে দিলের মতো ফোনটা ছিনিয়ে নিজের কানে চেপে ধরলাম। উল্টো দিকে ওর মার গলাটা চিনতে আমার কোনও ভুল হল না। তিনি তখন পাগলের মতো চিৎকার করছেন, “কিছু একটা কর বুবু, কিছু একটা কর। তোর বাবা বুকের ব্যাথাটা সহ্য করতে পারছে না। কেমন নেতিয়ে পড়ছে রে!”



কোনও কোনও মানুষ হয়, যখন বিপদ আসে তখন তাদের স্নায়ু উত্তেজিত হওয়ার বদলে শীতল হয়ে যায়। দীর্ঘ অনাথ জীবনযাপনের জন্য কিনা জানি না, আমিও খানিকটা ওই রকমই হয়ে গেছি। নদীর হাত থেকে আমি ফোনটা কেড়ে নেওয়ার পর ওকে দেখে এতটাই বিধ্বস্ত লাগছিল যেন বাড়ির ঠিকানাও মনে করে বলতে পারবে না। আমি ফোনটা কাটার আগে একটা বিশেষ ওষুধ ওর বাবার জিভের নীচে দিতে বললাম। তার পর ফোনটা ওর হাতে দিয়ে ব্যাগে ভরে ফেলার ইঙ্গিত করলাম। পরের তিরিশ সেকেন্ডে ওয়েটারের হাতে বিলের সম্ভাব্য অঙ্কের একটু বাড়তি টাকাই গুঁজে দিয়ে নদীর হাত ধরে ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মোটরসাইকেলের কাছে পৌঁছে সেখানে চালু করে নদীকে পিছনে বসানোর মধ্যেই কানে ফোন গুঁজে মল্লকে ধরলাম। বললাম, “যে ভাবে হোক একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে নদীদের বাড়িতে পাঠা।” ও জানতে চাইল ওকে যেতে হবে কি না। বললাম, “পৌঁছে যাচ্ছি, দরকার হলে জানাব।” তার পরই

মোটরসাইকেল চালিলাম, তবে তীব্র গতি তুললাম না। নদী আমার কাঁধে হাত রাখল। অনেক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানেও আমার হঠাৎ মনে হল, বাইরে রাতের খাওয়া সেরে দু'জনে বাড়ি ফেরার কষ্ট-কল্পনা আজও আচ্ছন্ন করেছিল আমাকে। এখন এক রকম তাই-ই হচ্ছে, অথচ পরিস্থিতি কত আলাদা! নদীর বাবা এখন চরম বিপদে। উনি কি শুধু নদীর বাবা? আমার এই দীর্ঘ প্রায় অনাথ জীবন অমনিবাসে তিনিই তো ছিলেন এক ও এক মাঝে স্বৈচ্ছা অভিভাবক। সময় বাঁচাতে বড় রাস্তার সিগন্যাল আপদ থেকে বাঁচতে অলি গলি দিয়ে চালাতে শুরু করলাম। এই শহর এই সব পথ-বিপথ আমাকে চিনিয়েই আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে আপন করে নিয়েছে। চলতে চলতে টের পাচ্ছিলাম কাঁধে হাত দিয়ে আমায় কেবল ধরে নেই নদী, যেন আঁকড়ে আছে। অথবা গোটাটাই হয়তো আমার মনের ভুল। স্বৈচ্ছা বিভ্রম!



মানুষের জীবনের কিছু কিছু মুহূর্ত একেবারে দাগ কেটে যায়। নিত্য দিনের সহস্র এক নিমেষের থেকে তারা আলাদা। এখন, ঠিক এই মুহূর্ত আমার ও নদীর জীবনেও তেমনি। তবে আলাদা আলাদা কারণে।

আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি শহরের জলাভূমিময় এলাকার বুক চিরে জেগে ওঠা একটা সুউচ্চ, বেসরকারি হাসপাতালের কার্ডিয়াক ইউনিটের সামনে। আমাদের সামনে ঘষা কাচের দুটো পাল্লার দরজা বন্ধ করা রয়েছে। তার ও পারে নদী, তার বাবা, আরও অনেক নদী ও তাদের বাবা-মারা অসুস্থ, অর্ধ জীবিত অবস্থায় অপেক্ষমাণ রয়েছেন। আর এ পারে আমাদের মতো নিরুপায় কৌতুহলী এবং ভেঙে পড়পড় মানুষের সারি। নদীকে দেখে সত্যিই ভেঙে পড়া মানুষের মতো লাগছে। মনে হচ্ছে ওর শরীরে যেন কোনও হাড় নেই। বসার জায়গা থাকলেও আমি দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছি। ও আমার ঠিক পাশটায় আমার হাত ধরে রেখে অপেক্ষা করছে। শুকনো কান্না বলে যদি কিছু হয় তা হলে তা ইতিমধ্যেই ওর চোখ, গাল, গলা দিয়ে বইতে শুরু করেছে। ওর কিছু আত্মীয়, ওর বাবার বন্ধু হাসপাতালে এসেছেন, তাঁরা নীচে সুবিধৃত ভিজিটর রুমে অপেক্ষা করছেন। উপরে মাত্র দু'জন, ননীবাবুর অফিসিয়াল মেয়ে জামাই!

মোটরসাইকেলে রেস্টুরাঁ থেকে বাড়ি ফেরা, ওর বাবার অর্ধ অচেতন শরীরটাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা, সেখানে বসে থাকা এবং হাসপাতালে পৌঁছে জরুরি বিভাগে যাওয়া, অ্যাডমিশন কাউন্টারে গিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা, এর সবটাই করেছে দু'জন। ঠিকঠাক বললে দেড় জন। প্রতিটা জায়গায় নদী উপস্থিত থেকেছে বোবা, ভীরা, শব্দশূন্য মানবপুতুলের মতো! ওকে দেখে মনে হচ্ছে এক প্রচণ্ড বজ্রপাত ওর কথা, মাথার চিন্তাশক্তি আর দেহের ক্রোধকে স্রেফ শুষ্ক নিয়েছে। ওদের বাবা-মা-মেয়ের সুখ-সংসারে এই আকস্মিক বিপর্যয়ে এটাই হয়তো স্বাভাবিক। ওর অবস্থার ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমার অবস্থানের ব্যাখ্যা কী? এই যে আমি আর ও পাশাপাশি কাজগুলো করছি, আদর্শ দম্পতির মতোই দায়িত্ব পালন করছি, সেটা আমায় একটা অদ্ভুত তৃপ্তি দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এই শহরের কোনও এক দু'কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে আমাদের সাজানো সংসার তালাবন্ধ রয়েছে। আমরা বিপদে পড়ে এই হাসপাতালে এসে ওর বাবাকে বাঁচানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করছি। এই চেষ্টাটাই আমার মনকে খুশি করে রাখছে, চিন্তায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে না। এটা কি স্বাভাবিক?

দরজা খুলে এক জন অল্প বয়সি মেয়ে বাইরে এল। গলায় স্টেথো। জিজ্ঞেস করল, “ননী চ্যাটার্জি পেশেন্টের বাড়ির কেউ আছেন?” মুহূর্তের মধ্যে নদী আমার হাতটা খামচে ধরল। ওর নখ বসে গেল আমার হাতে। আমি নদীর কাঁধটা শক্ত করে ধরে বললাম, “হ্যাঁ, আছি।” মেয়েটি কর্কশ গলায় বলল, “পেশেন্টের অবস্থা ভাল

না। আইসিসিইউ-তে দেওয়া হল। এক বার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। সেটা সেমি সিভিয়ার।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “উনি কেমন আছেন?” ডাক্তার বলল, “এখন ঠিক আছে। কিন্তু...” আমরা মুখ তুলে তাকালাম। মেয়েটি আমাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বলল, “এই রকম ক্ষেত্রে ক্লোজ অবজার্ভেশনে রাখাই দরকার। রাতে কিন্তু পেশেন্ট পাটির লোক এখানে থাকবেন। দরকার হলে ফোন করা হবে। ভিজিটর রুমে থাকলেই হবে।” আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “আবার কি অ্যাটাকের ভয় আছে?” মেয়েটি সেই রকম গলাতেই বলে উঠল, “টু হান্ড্রেড পারসেন্ট আছে।”

কথাটা শুনেই ডুকরে কেঁদে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল নদী। আমি ওর মাথায় হাত দিতেই ও আমার বুকে মাথা রেখে অঝোরে কেঁদে ফেলল। এই রকম পরিস্থিতিতেও কেন যে স্বস্তি লাগল কে জানে! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, মহিলা চিকিৎসক দরজার একটা পাল্লা ঠেলে চলে গেলেন। আমি নদীর কাঁধ ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে বললাম, “নীচে চল নদী। কিছু হবে না। কাকু কেমন লড়াকু লোক, তুই জানিস না?” আমি এক কালে ওকে তুইতোকাকারি করতাম। বিবাহ সংস্করণের পাল্লায় একটু একটু করে সেটা তুমিতে বদলে গিয়েছিল। আজ, এই কঠিন সময়ে দেখলাম ভিতর থেকে তুই-ই চলে এল। আমি তাকে আটকালাম না। দেখলাম আমার কথা শুনে ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে লিফটের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। নদী অশ্রুট গলায় বলল, “ঠিক বলেছ। বাবা তো লড়াকু মানুষ। লড়ে নেবে, বলো?” আমি বললাম, “টু হান্ড্রেড পারসেন্ট। উনি কি হাসপাতালে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন? উনি লড়াই করছেন।” বলে ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিলাম। ও এক বার আমার হাতের মুঠোটা চাপ দিয়ে ধীর পায়ে লিফটে ঢুকল। নিজেই প্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপল। আবার এক বার উদ্গত কান্নাকে গিলে নিয়ে বলল, “লড়াই ছাড়বে না বাবা। আমরাও রয়েছি তোমার সঙ্গে।”

দরজা খুলতেই চোখে পড়ল অনেক অনেক অচেনা অপেক্ষমাণ মানুষের মধ্যে কিছু চেনা মুখ। ননীবাবুর মেয়ে জামাইকে দেখে তাঁরা এগিয়ে এলেন। আমাদের হাঁটা দেখে এটুকু অন্তত বুঝলেন যে, লড়াই এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আমি চুপ করে থাকলাম। এক বার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে নদী ধীর গলায় তাঁদের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে লাগল। তার পর হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে আমার কাছে এসে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, “দেশ, রাতে কী হবে?”

ছোট্ট একটা প্রশ্ন। আর তার গায়ে লেগে থাকা অনিবার্য কিছু চিন্তা, দৃষ্টান্ত, আশঙ্কা। আমি সে সব টের পেলাম না। আমি শুধু টের পেলাম, কী পরম নির্ভরতা আর ভরসায় ভর করে আমার সঙ্গে কথা বলছে নদী। বৃকের ভিতরে কেমন একটা মোচড় দিল। এর বাবার অসুস্থতার কথা ভুলে মনে হল বলি, “আর কিছু চাই না আমি। তোর সব কথা শুনব আমি নদী। বল, কোথায় সই করতে হবে!” মুহূর্তের ভগ্নাংশে এক বার ভেবে নিলাম, কাল কোথায় কাজের বরাত আছে! তার পর নদীকে আশ্বস্ত করে বললাম, “একটুও চিন্তা করিস না। আমার ছোট্ট একটা কাজ আছে। সেটা সারার পর আমিই সারা রাত এখানে থাকব।” আমার কথা শুনে এক রাশ দ্বিধা মুখে মাথিয়ে নদী জিজ্ঞেস করেই ফেলল, “কী কাজ?” আমি বললাম, “আগে তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি!” নদী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, “আমি কোথাও যাব না। আমি এখানে থাকব।”

সেই মুহূর্তে নদীর দিকে তাকিয়ে জানতে ইচ্ছে করল, সকালের নদী না রাতের নদী, কোনটা আসল? কোথায় এতটুকু পলির আন্তরণ নেই? আচ্ছা, মানুষও কি নদীর মতো? জল, জল আর ডেউয়ের সমন্বয়ে গড়া নদীও বারো ঘণ্টার এ দিকে-ও দিকে জোয়ারে আর ভাটায় সম্পূর্ণ অন্য রূপ ধারণ করে। তার যদি দু'টি রূপই বাস্তব হয় তা হলে আমাদের নদীরও তা-ই। এখন অসহায় বলে হয়তো তার এক চেহারা, বিপদ কেটে গেলে সে আবার জোয়ারের ভরা রূপে ফিরে যাবে। নাকি, সেটাই সব নয়? এই যে আমি তুমি-তুমির সম্বোধন সেরে সম্পর্কহীন অতীতের মতো তুইতোকাকারিতে ফিরে গিয়েই কি পুরনো নদীকে খুঁজে পেলাম? সম্পর্কের ভারই কি নতুন সম্পর্কের অন্তরায়? জানি না। শুধু বুঝতে পারছি একটা কাঁটাতার ঘেরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমি। হয় নদীর সঙ্গে সম্পর্কটা এগোবে, নয় নদীকে তার খাতে

বইতে দিতে হবে। দু'কূল ছুঁয়ে এই নদী ধরে বয়ে যাওয়া যাবে না।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সেটা ভেঙে গেল নদীর ডাকে। কী একটা বলছে ও। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম এর মধ্যেই জায়গাটা শুনশান হয়ে গেছে। চেনা মুখগুলোকেও দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় নদী দ্বিতীয় বার প্রশ্নটা করল, “দেশ, আমরা কোথায় থাকব?”



কোনও কোনও মানুষ আছে যারা তাদের যাবতীয় না পাওয়া, পেতে পেতে না পাওয়া এবং না পেয়েও চেয়ে যাওয়া স্বপ্নকে কেবল ভেবেই পুষিয়ে নিতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে। সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো। পুরস্কার পাওনি তাও পেলে, এই যা। মনে হয় আমিও ক্রমে ক্রমে সেই রকম হয়ে যাচ্ছি। বাইরের যাবতীয় কাজ সেরে যখন নিশুতি রাতে একার সংসারে ঘরে ফিরি, তখন প্রতি দিনই এক বার করে মনে হয়, আমি বিবাহিত। আর বার বার করে মনে হয় নদীর কথা। যদি নদী আমার অপরিচিত হত, যদি নির্দিষ্ট কোনও কারণে দু'জনের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে অলঙ্ঘনীয় পাঁচিল, তা হলে আমার আক্ষেপ থাকত না। কিন্তু আস্ত একটা বছরের প্রত্যেকটা ঋতুকে সাক্ষী রেখে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ওকে আপন করার স্বপ্ন। এখনও প্রতি রাতে আমি একটা খেলা খেলি নিজের সঙ্গে। ভেবে নিই আমার ঘরেই রয়েছে নদী। কথা বলতে শুরু করি। ধরে নিই তুচ্ছ কোনও খুনসুটিতে মুখ বন্ধ করে রয়েছে ও। কল্পনা করি পিছন থেকে গিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে মানভঞ্জন করছি। প্রতি বার প্রতি রাতে বাড়ি ফিরে দরজার ছিটকিনি তোলার সময় এক বার করে বুকটা ধক করে ওঠে। যে দিন সত্যি সত্যি নদী থাকবে আমার ঘরে, সে দিন এই ছিটকিনি তোলার মুহূর্তটা কেমন হবে!

এই প্রশ্নের উত্তর নেই আমার কাছে। কারণ আজ পর্যন্ত এই সম্ভাবনা সফল হয়নি। বিবাহিত দম্পতি হলেও আমরা কখনও শুধু দু'জনে নিভুতে থাকতে পারিনি। আজ অবশেষে যখন সেই মুহূর্ত এল তখন কোথাও ছিটকিনি দেওয়ার অবকাশ নেই। প্রায় ঘুমিয়ে পড়া ঘড়ি টিমে তালে চলতে চলতে জানাচ্ছে, সময় দুটো চল্লিশ। আমি আর নদী দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসে রয়েছে। মিনিট দেশেক আগে দু'জনে এক বার আইসিসিইউ ঘুরে এসেছি। তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন, রোগী নিদ্রামগ্ন। হৃদযন্ত্রের দোলাচল আপাতত নিয়ন্ত্রণে। চিকিৎসকদের ভাষায়, স্থিতিশীল। তবে চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে বিপদ কেটেছে কিনা বলা যাবে না।

কোনও কোনও হাসপাতালের অপেক্ষা-ঘর হয় এমন যে, দমবন্ধ হয়ে আসে। আর এখানে, এই সমন্বয়-এ এলে তো মনই ভাল হয়ে যায়। এখানে মাথার উপর ছাদ এত উঁচুতে যে, এ রকম স্নান-মুদ্র আলোর রাতে তাকেই আকাশ বলে ভুল হয়। এখানে অনেক দূরে দূরে রয়েছে কাচের দেওয়াল। তাও এতই নিশ্চল যে, তাকে দেওয়াল বলে মনেই হয় না। এই ঘরের তাপমাত্রাও এমন চমৎকার মানানসই যে, তাতে দিবা বসন্ত বসন্ত অনুভূতি জাগে, আবার বাইরে গেলেও উষ্ণতার তফাতটা মালুম হয় না। বসন্ত আমি এক বার টুক করে ভেবেও নিলাম যে, এটা আদৌ কোনও হাসপাতাল নয়, পাঁচ তারা হোটেল। আমাদের ঘর মিলবে সকাল দশটায়। অন্য কোনও সময় টিকিট না মেলায় মাঝ রাতের উড়ানে আগেভাগে চলে এসে লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করছি। আমার চোখে ঘুমের লেশ মাত্রাও নেই। নদীও ঘুমোয়নি। কখন কী হয় ভেবে কাঠ হয়ে বসেছিল। রিসেপশন থেকে মাইকে কোনও ঘোষণা হলেই চমকে উঠে। ফোন বেজে উঠলেই মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে ওর।

একটু আগে আমরা যেচেই গিয়েছিলাম আইসিসিইউ-এর দরজায়। সেখানে দিন রাতের কোনও তফাত নেই। আগেও এখানে

এসেছি বলে জানি, আলো-আঁধারির এক মায়াবী পরিবেশ থাকে এই করিডরে। তার এক পাশে নার্সদের টেবিল। ঝকঝকে চেহারার নানা বয়সি সেবক-সেবিকা। তাদের কখনও টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোতে বা চেয়ারে বসে ঢুলতে দেখিনি। মনে হয় ঘুমহীন দেশের স্পটলাইট এখানে এসে পড়েছে। তাই এইটুকু বৃত্তে কোনও ঘুম নেই। তার সামনে আমাদের চিন্তা-উদ্বেগের রাজ্য। আর বন্ধ দরজার পিছনে শীতল, অন্ধকার ও শান্ত এক মায়াবী রাজ্য। লোকে এই পথ চলার দুনিয়ায় ফিরবে কি না তার সাপলুডো খেলা হয় ওই রাজ্যে। বাবার খোঁজ নেওয়ার পর বেশ কিছু ক্ষণ পিছনের দরজাটার দিকে তাকিয়ে চূপ করে থাকল নদী। আমি বললাম, “চল।” কিন্তু ও নড়ল না। অস্ফুটে বলল, “বাবার কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।” বলার চেষ্টা করলাম, “তুই কী করবি।” কিন্তু ও আমার কথা না-শুনে বলতে শুরু করল, “মানুষটার কত রকম চিন্তা। সে সব কোনও দিন বোঝার চেষ্টা করিনি। সমানে দৌরাডু চালিয়ে গেছি। গত ছ'মাসে বাবা আমাকে নিয়েই সব থেকে বেশি চিন্তা করেছে।” আমি মৃদু ভাবে বললাম, “সব বাবাই ছেলেমেয়েকে নিয়ে চিন্তা করে, তার সঙ্গে অসুস্থতার সম্পর্ক কী?” সঙ্গে সঙ্গে কথা কেটে নদী বাঁধিয়ে উঠল, “আমিই বাবার অসুস্থতার কারণ। বিয়ে নিয়ে এক প্রস্ত হয়েছিল। তার পর ডিভোর্স ডিভোর্স করে...” বলে থেমে গেল নদী। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, “সে তো আমিও সমান দায়ী।” নদী ফুঁসে উঠল, “তুই! তোর কোনও দোষ লোকটা দেখেছে নাকি কখনও?” আমি কথা না-বাড়িয়ে বললাম, “চল, নীচে গিয়ে বসি।” নদী পিছন ফিরল। তার পর আবার পিছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অদৃশ্য শয্যার দিকে অনুমান করে নদী বলে উঠল, “ভুলেও ভেবে না তুমি সুস্থ হয়ে এলেই আমি শুধরে যাব। আমি তো ছোট থেকেই অবাধ্য, তা হলে তুমি কেন রাগ করবে?” আমি ওর কাঁধ ধরে “আচ্ছা চল, আর ঝগড়া করতে হবে না,” বলে লিফটের দিকে নিয়ে গেলাম। লিফটের মধ্যে দেখলাম, চেষ্টা করেও চোখের জল আটকাতে পারছে না নদী।

এখন লাউঞ্জে চূপ করে বসে রয়েছে ও। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, “এই, মা তো চিন্তা করছে। মাকে তো ফোন করা হয়নি!” আমি আশ্বস্ত করে বললাম, “আমি ফোন করেছি। ওঁর সঙ্গে নীলিমা দি আজ থেকে যাচ্ছে।” নদী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “তুই কখন ফোন করলি?” বললাম, “তুই যখন সকলের সঙ্গে কথা বলছিলি!” নদী বলল, “ও হ্যাঁ, এক বার দেখছিলাম বটে ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলি! নিশ্চয়ই কিছু খায়নি! এ বার মারও ত্রেশার বেড়ে গেলে সোনায়ে সোহাগা!” আমি বললাম, “আশা করি সেটা হবে না। কাকু ভাল আছে বলেছি আমি। আমরা খেয়ে নিচ্ছিও বলেছি। নীলিমা দিকেও ডেকে বলে দিলাম, যাতে খাবার খাইয়ে মনে করে রাতের ওষুধটা খাইয়ে দেয়।” তার পর একটু থেমে বললাম, “একটা কথা বলব?” নদী কৌতুহল নিয়ে তাকাল। আমি বললাম, “এখানকার একটা কফি শপ সারা রাত খোলা থাকে। চল গিয়ে খেয়ে আসি। কাল সারা দিনও তো দৌড়োদৌড়ি করতে হতে পারে!” নদী দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, “আমি কিছুই খাব না। তুই গিয়ে খেয়ে আয়।” আমি গলা নামিয়ে বললাম, “চল। তা হলে যেখানে বলবি সেই করে দেব।”

কথাটা শুনে এই পরিস্থিতির মধ্যেও ফিক করে হেসে ফেলল নদী। হাত বাড়িয়ে বলল, “দে, এখনই করে দে।” তার পর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “চল। তুইও তো কিছু খাসনি, সে আমি জানি। ইশ, আমারই তো বলা উচিত ছিল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ডাকবে না বলা! আর বলল তো, দরকার হলে ফোন করবে। চলা!”

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এর মধ্যে ও-ও যে কখন সেই আগের মতো তুইতোকারি করতে শুরু করেছে, খেয়ালও করিনি। কিন্তু টের পেলাম এখন কথা বলতে অনেক সাবলীল, নির্ভার লাগছে। পাশাপাশি হাঁটতে দ্বিধা হচ্ছে না। তা হলে কি সম্পর্ক আর সম্বোধনের ভারই আমাদের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্কে বেলাইন করে ফেলেছিল? এ ভাবে হাঁটতে হলে কি তা হলে চাপিয়ে দেওয়া বৈবাহিক সম্পর্ককে ত্যাগ করতে হবে? জানি না। শুধু জানি চাপিয়ে দেওয়া বিয়ের এক জন হোতা এখন সামান্য দূরে মুখে অস্লিভেন মুখোশ পরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আর যাদের বিয়ে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই দু'জন কফি খেতে খেতে লড়াই করছে জীবন নিয়ে। আজ

সকালেও একচোট যুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন চলছে যুদ্ধবিরতি। কিন্তু কে না জানে, যুদ্ধবিরতি সব সময়ই হয় সাময়িক। পরিস্থিতি অনুকূল হলে উভয় পক্ষই তাদের তুণ থেকে বের করতে শুরু করে অস্ত্র। হয়তো দেখা যাবে এখনও নদীর ব্যাগের মধ্যে ঘাপটি মেরে মুখ লুকিয়ে বসে রয়েছে ডিভোর্সের পত্রগুচ্ছ।

কফি খেয়ে আমরা ফিরে এলাম লাউঞ্জে। ঠিক সেই চেয়ার দুটোতেই বসলাম আমরা। খানিক ক্ষণ পরে টের পেলাম, অকাতরে ঘুমিয়ে নদী ওর মাথা রেখেছে আমারই কাঁধে। হয়তো বাইরের দিকে তাকালে দেখতে পেতাম রাত শেষ হয়ে আসছে। তাই তাকলাম না। তাকলাম আমাদের মাথার কৃত্রিম আকাশের দিকে। সেখানে অন্ধকারের রাত তখনও ঘন হয়ে লেপ্টে রয়েছে। প্রার্থনা করলাম, তা যেন অসুতহীন হয়। আমাদের একত্রে প্রথম নেশ অভিজ্ঞতা হোক আরও একটু দীর্ঘ।



কথা আসলে ভাইরাসের মতো। কথার চার পাশে অদৃশ্য কাঁটার আন্তরণ থাকে। কার মনে কখন কোন কাঁটা আটকে সেই কথাকে গঁথে রেখে দেবে তা বলা যায় না। যেমন আমার মনে সেই ছেলেবেলায় অমর মাস্টারের বলা একটা কথা অক্ষয় হয়ে আছে।

ছেলেবেলায় এই পর্ব আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছিল। তখন সিন্ধু, সেভেনে পড়ি। দূরন্তপনা নয়, দৌরাঙ্গ্য করে বেড়াইতাম। থাকতাম স্কুলের লাগোয়া অনাথ আশ্রমে। তার নাম ছিল বালকাবাস। সেখানে সকালে বিকেলে পড়াতে আসতেন ইশকুলের শিক্ষকেরাই। তাঁরা অধিকাংশই বয়স্ক। তাঁরা হয় পড়াতেন নয় শাস্তি দিতেন। ব্যতিক্রম ছিল অমরদা। তার বয়স কম। সে-ও এক কালে আমাদের বালকাবাসেই থাকত। লেখাপড়ায় ভাল ফল করে শহরের বড় কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। পড়ানো ছাড়াও সে অজস্র অসংখ্য গল্প করত আমাদের সঙ্গে। তার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি উজাড় করে দিত। আমরাও আমাদের বালক জীবনের কামড়াকামড়ি আঁচড়াআঁচড়ির নালিশনামা হাজির করতাম তার কাছে। এক দিন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অমরদা বলল, “নালিশ করবি না তো, একদম নালিশ করবি না। ক্রিকেট মাঠে কখনও দেখেছিস, ব্যাটসম্যান এসে আঁপায়ারের কাছে নালিশ করছে! সে যা জবাব তা দেয় তার ব্যাটে। তোরোও তাই কর। কারও উপর রাগ হলে এক ঘুমিতে তার নাক ফাটিয়ে শাস্ত ভাবে ফিরে এসে পড়তে বসে যা। তার জন্য শাস্তি যা দেবে তা ভোগ করবি। কিন্তু খবরদার, অভিযোগ করবি না। ওতে নিজের ক্ষতি।” কী ভাবে কে জানে, কথটা কাঁটার মতো মনে গঁথে গেছে। আমি আজও তাই অভিযোগ করি না, হজম করি।

আজ সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল ছুটোছুটি আর ছুটোছুটি। সকালে আইটিইউ-এর বাইরে গিয়ে এক বার অনুসন্ধান। আটটার সময় সেখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানালেন, রোগীকে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তার পর মোটরসাইকেলের পিছনে নদীকে বসিয়ে ওদের বাড়িতে নামিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলাম বাজারে। আজ সন্ধ্যায় জন্মদিনের আয়োজন করার কাজ মাথায় ছিল। মেনুতে ছিল চিকেন বিরিয়ানি, মাটন কষা আর ফিশ ফ্রাই। আশি জনের আয়োজন। ব্যবসা চালাতে চালাতে আমি বীজগণিতের সূত্রের মতো এখন হৈশুলে সামলানোর হিসেবপত্রও আয়ত্ত করতে শিখে গেছি। কী অনুষ্ঠান, কী কী মেনু, এ সব দেখলেই কত জন নিমন্ত্রিত থাকলে আমায় কতটা মাছ, মাংস কিনতে হবে তা ভেবে মাথা চুলকাতে হয় না। জিনিসপত্র কিনে হৈশুলে পৌঁছে দিয়ে তবে নিজের আস্তানায় পৌঁছেছিলাম। কলঘরে যাওয়ার আগেই বেজে উঠেছিল ফোন। পর্দায় নদীর নাম। বুকেটা ভয়ে ধক করে উঠল। গত কাল সকালে আমার

থেকে ওর চাহিদা ছিল একটা সই। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টায় চাহিদা কত বদলে যেতে পারে।

ভাবছিলাম, হাসপাতাল থেকে কোনও খারাপ বার্তা এল কিনা! কিন্তু নদীর গলা শুনে বুঝলাম, সে সব নয়। আমি ওকে বলেছিলাম ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরে ওকে সঙ্গে নিয়েই হাসপাতালে যাব। সেই প্রসঙ্গ তুলেই নদী বলল, “তুই কিন্তু এখানেই দুটো খেয়ে নিবি।” আমি বললাম, “আরে না না, তার দরকার নেই। তুই কাকিমাকে বল, আমি বাইরে খেয়ে নেব।” নদী ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, “তোর কাকিমা নয়, আমিই কথটা বলেছি। বাইক রাখবি, খাবি, তার পর যাবি। তাতে কিছু দেরি হবে না।”

নদীর থেকেও ওর বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গভীর। ননীবাবুকে আমি বরাবর কাকু বলেই ডাকি। সেই সূত্রেই ওর মা কাকিমা। বিয়ে বিয়ে খেলা বা খেলা খেলা বিয়ে এই সম্বন্ধে কোনও প্রভাব ফেলেনি। সম্পর্কেও না। নদীর ধারণা, রক্তের সম্পর্কে অগ্রাহ্য করে ওর বাবা-মাই আমায় পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছেন, যাতে তাঁদের কন্যার আবদার শুনে আমি বিবাহবিচ্ছেদের কাগজে সই না-করি। এই অনুনয় না-থাকলে এত দিনে হয়তো বিয়ের ঘুড়ি ভোকাটা হয়ে উদার আকাশে পাক খেত।

এ দিকের কাজ সামলে, দরকারি ফোনাফুনি মিটিয়ে মোটরসাইকেলে চেপে বসলাম। প্রতি দিন প্রতি বার এই যানমহাশয়, আমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। সে আমায় নিয়ে চলতে শুরু করে। পাশ থেকে ছবির মতো চলমান জনতা, চলমান জীবন সরে সরে যায়। সে তর তর করে এগিয়ে চলে। যেন বলে, সকলের জন্যই একটা পথ থাকে। পথ বা কক্ষপথ। সে সেখানেই ঘুরবে, পাক খাবে, বৃত্তাকারে ঘুরে চলবে। তোমার চিন্তা তত ক্ষণ, যত ক্ষণ না নিজের কক্ষপথ খুঁজে পাচ্ছ! খুঁজে পেলো চিন্তা করা ছেড়ে দাও। তুমি তখন মাঝ আকাশের ঘুড়ি। উড়ে বেড়াবে আর উড়ে বেড়াবে। তার পর এক বার তো ভোকাটা হতেই হবে।

আজ আমার হৈশুল থেকে নদীদের বাড়ি যাওয়ার পথে কী মনে হল, একটা অন্য রাস্তা ধরলাম। ভাবলাম যাওয়ার পথে এক বার দিছুর পাড়া হয়ে যাব। থামব না, দেখব পাড়ার চায়ের দোকানে ও বসে আছে কি না। মুখোমুখি দেখা হলে জিজ্ঞেস করব, কী রে, আজ অফিস যাবি? তার পর লোভ দেখাব, যা ভাই যা, অফিস যা, তা হলে কাল তোকে এক প্যাকেট বিড়ি দেব। গণার চায়ের দোকানের সামনে এসে মাটিতে পা রেখে মোটরসাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করলাম। দেখলাম মাচার এক পাশে দিছু চুপটি করে বসে রয়েছে। মুখখানা শুকনো। একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাইরের প্রকট আলোয় মুখের অকাল বলিরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা সুস্থ স্বাভাবিক তরতাজা যুবক যেন ধুকছে। এই মুহূর্তে আইসিসিইউয়ে ভর্তি ননীবাবুর সঙ্গে ওর কি বিশেষ তফাত আছে?

বাইক দাঁড় করিয়ে গণার কাছে গেলাম। দিছু খেলালও করল না। গণা স্নান হেসে বলল, “ও ভাবেই বসে থাকে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা। দুপুরে দোকান বন্ধের সময় টুক টুক করে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়।” আমি কিছু বললাম না। ঘুগনি পাউরুটি আর দু’বার চা দিতে বলে তার দাম দিলাম গণাকে। মোটরসাইকেলে উঠলাম। এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম পাথরের মূর্তির মতো সেই ভাবেই বসে আছে দিছু। কেন? ও কি নিজের বুগুই পথ হারিয়েছে?

মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে মনে হল, আমার জীবনে এখনও পর্যন্ত দুটো রহস্যের কোনও নিষ্পত্তি হল না। এক, সুস্থ সবল হাসি-খুশি দিছু কেন বাজ পড়া গাছের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে? কেন অফিস যায় না? কেন কিছু খুলে বলতে পারে না ছেলেবেলায় সঙ্গীদের? আর দুই, শ্রীমতি নদী চট্টোপাধ্যায়। আমার সঙ্গে হই হই করে আইনি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আনুষ্ঠানিক বিয়ের আগেই কোনও অজ্ঞাত কারণে বৈধ বসল ও। বরযাত্রী, কন্যেযাত্রীরা তাদের অভিযান শুরু করে কারণ খুঁজতে বসল। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত জন, বন্ধু-সহপাঠীরা তাদের মতো করে তদন্ত কমিশন বসাল। কিন্তু একটা মাত্র “না” ছাড়া অন্য কোনও কথা বলল না নদী। আমি তুললাম না একটা অভিযোগও। কারণ সেটা আমার পছন্দ নয়। লোকজন কিছু দিন পর নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও পড়লাম। কিন্তু রহস্যের সমাধান হল

না। বরং তার পর থেকে শুরু হল বিবাহবিচ্ছেদের জন্য পীড়াপীড়ি। ক্রমশ তা তীব্র হয়েছে। আমার বন্ধুদের মধ্যে স্বঘোষিত নেতা হল মল্লবীর। নেতারা অল্পবিস্তর গোয়েন্দাও হয়। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কী সব খোঁজপন্ডর লাগিয়ে এক দিন এসে আমায় বলল, “না রে, তোর টু বি অর নট টু বি ওয়াইফের কোনও ইয়ে আছে বলে মনে হয় না।” আমি সে দিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, “ছাড় তো ও সব হাবিজাবি বিষয়,” কিন্তু মল্লকে দমনো কঠিন। ও ভুরু কঁচকে জানতে চেয়েছিল, “কী ব্যাপার বল তো? তোরই গোপনে গোপনে কোনও চক্রের চলছে না তো? নদী হয়তো সে সব জেনে গিয়েই সরে পড়ল। ঝেড়ে কাশ তো ভাই!” আমি আবার হেসেছিলাম। তার পর বলেছিলাম, “আমি কিছু করলে তোর টাওয়ারে ধরা পড়ত না?” মল্ল কাঁধ নাচিয়ে বলেছিল, “কে জানে। আমার টাওয়ার তো এখন শুধু একটা সিগন্যালই ধরছে।”

রহস্যকে রহস্যের জায়গায় রেখে আমি পৌঁছেছিলাম নদীর বাড়িতে। এখানে বহু দিন ধরেই আমার অব্যবহিত বিচরণ। বাইরে বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। সামনে বাগান। দ্বাররক্ষা ও বাগান পালনের কাজ করে মৌর্যদা। কেশব মৌর্য। সে দরজা খুলে প্রথমে উদ্বেগের সঙ্গে ননীবাবুর ও পরে সন্মুখে আমার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিল। ভিতর মহলে পৌঁছে দেখলাম, নদী তৈরি হয়ে ব্যস্ত পায়ে ছুটোছুটি করছে। এটা ওর বহু কালের অভ্যাস। কোথাও বেরোনোর আগে ও দশ বার পাক খায়। কে জানে, এটাও হয়তো নিজের বৃত্তে ঘোরা।

নদীর মার দিকে তাকলাম। মুখ থম থম করছে। আমি বললাম, “চিন্তা কোরো না।” বললেন, “তুই আছিস, এটা জেনে আমি নিশ্চিত হয়েছি।” বললাম, “কী যে বলো! কাকুর শরীর খারাপ, আমি থাকব না?” কাকিমা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “মানুষটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আন, তোকে জামাই আদর করে খাওয়াবা।” আমি কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই খাবার ঘর থেকে নদীর গলা ভেসে এল, “আমি খেতে শুরু করে দিলাম কিন্তু।”

তার পর আমরা উপস্থিত হয়েছি সেই ছবির মতো সুন্দর হাসপাতালে। এই হাসপাতালে আগেও বহু বার এসেছি। তখন তো তাকে এত সুন্দর লাগেনি। তা হলে কি নদীতে এসেই পাল তুলে দিল আমার নৌকা? কিন্তু এ নদীপথে তো পাক খেতে খেতে নৌকাডুবির ভয় মারাত্মক। আমার ক্ষেত্রে ভয় ভরাডুবির।

সারা দিন কেটে গেল দফায় দফায় চিকিৎসার নানা কাজে। কত বার কত রকম পরীক্ষা হল। ননীবাবুর বাড়ির লোকদের ডেকে তা জানানো হল। যদিও সরাসরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হল না। তার পর সঙ্গে সাতটা নাগাদ আমাদের ডাক পড়ল আইটিইউ-এর সামনে। মুহূর্তে মুখ শুকিয়ে গেল নদীর। আমরা শশব্যস্ত হয়ে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম চিন্তার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বললেন, “কাল হৃদযন্ত্র আচমকা একটা ধাক্কা দিয়েছিল বটে, তবে এখন রোগী বেশ সুস্থই আছেন। চিন্তার চক্ৰবিশ ঘণ্টা নিরুদ্বেগে কেটেছে। কাল আইসিইউ-তে দেওয়া হবে।” শুনে আমরা বড় একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।

লিফট থেকে নামতে নামতে বললাম, “তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই, আমি থেকে যাচ্ছি।” নদী এক গাল হেসে বলল, “কেন, তুই কি আমার সঙ্গে রাতে থাকতে ভয় পাচ্ছিস?” হেসে ফেললাম। মনের মধ্যে থেকে কে যেন ফের বলে উঠল, “এখানে গাছ, ফুল, আকাশ, মায়াবী পরিবেশ সবই আছে, কেবল দরজায় কোনও ছিটকিনি নেই।”



হাসপাতালটা হোটেলের মতো সুন্দর নাকি নদীর সঙ্গে থাকার ফলে আমার সর্পে রঞ্জুধর্ম হচ্ছে, সে রহস্যের নিষ্পত্তি কে করবে? রাতের মৃদুমন্দ মায়াবী আলোয় আমরা কবি থিয়ে এক চক্রের ঘুরে এলাম

বাইরে থেকে। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আলাদা আলাদা দ্বীপের মতো এক একটা ব্লক। মাঝখানে সবুজ লন আর অসংখ্য টগর ফুল গাছ। তাদের গোড়া সুন্দর ভাবে বাঁধানো। সেখানে বসো যায়। ঘটনাচক্রে আজও গত কালের চেয়ার দুটো ফাঁকা ছিল। আমরা গিয়ে বসলাম সেখানে। মাথার অনেকটা উপরে সেই কৃত্রিম আকাশ। দেখলাম, গত কালের কিছু চেনা মুখ আজও রয়েছে। আমাদের কক্ষপথের সঙ্গে তাদের পাক খাওয়ার পথ এখানে, এই বিন্দুতে এসে মিলে গেছে। পরের গন্তব্য কোথায়, তা কেউ জানে না। সবার আশা, প্রিয় জনকে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। ব্যতিক্রম আমি, যার ক্ষেত্রে এই আশাবারী রাগ প্রযোজ্য নয়।

আজ নদীর চোখে মুখে সেই চিন্তার ছাপ নেই। একটু হলেও আশ্বস্ত লাগছে। আমি বললাম, “আশা করা যায় দু-তিন দিনের মধ্যে কাকুকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবি।” নদী মাথা নেড়ে বলল, “এত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম না! তুই-ই বল, কোথাও কিছু নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ একটা মানুষ যদি হঠাৎ করে এ ভাবে অসুস্থ হয়ে যায়...”

“কাল সময় মতো ভর্তি করাটা কাজের কাজ হয়েছে। না হলে মুশকিল হত।”

“আমি একা থাকলে কী যে হত কে জানে! হয়তো বাবার ওপরই টেচামেচি শুরু করতাম। ভাগ্যিস তখন তোর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। তুই না থাকলে বাবাকে বাঁচাতে পারতাম না রে দেশ।”

“আমি কী করলাম? বাঁচালেন তো সমন্বয়-এর ডাক্তাররা। ওঁরা সময় মতো ইঞ্জেকশন-টিজেকশন না দিলে...”

“কোনও টিজেকশন নেই সার, আমি জানি, সেই টিজেকশন হলি তুই!”

“আমি? আমি কেন?”

“আমি জানি দেশ, তুই-ই ওই মুহূর্তে বাবার ওষুধ। হয়তো দেখা যাবে বাবার রোগের কারণ আমি। আমাকে নিয়েই তো তার চিন্তা, চিন্তা আর চিন্তা। অন্য দিকে সেই চিন্তার সার্বক সমাধান তুই!”

“ছাড় তো! বয়স্ক মানুষের মতিভ্রম।”

“কী ভ্রম জানি না, কিন্তু আমার মনে হল অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানোর সময় বাবা চোখের কোণ একটু ফাঁক করে তোকে দেখল। তার পর যেন মৃদু একটা স্বস্তির হাসি খেলে গেল ঠোঁটে।”

“ভুলভাল গল্প বানাচ্ছিস।”

“গল্প? তার পর থেকে কার্ডিয়োগ্রাফ দেখলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, তেমন কোনও বিপদ বাড়েনি সেখানে।”

“হ্যাঁ, আমি ছবি ঐকে গ্রাফটাকে শুধরে দিয়েছি।”

“অন্তত বাবা-মা’র কাছে তুই-ই তো ওষুধ দেশ।”

“সে জন্য তোকে ব্যস্ত হতে হবে না।”

“কী হতে হবে জানি না। আমি উদ্ভাস্ত।”

“তুই আসলে ক্লান্ত। কাল সারা রাত জেগে। আজ সারা দিন ছুটোছুটি করলি। এ বার বরং ঘুমো একটু। আমি জেগে আছি।”

“তোর ওপর আমার রাগ। অনেক অনেক রাগ। কিন্তু এটাও দেখলাম সত্যি যে, তুই কাছে থাকলে আমি নিশ্চিত থাকি।”

কখন যেন লাউঞ্জের ভিড় কমে গিয়েছিল। অল্প কয়েক জন তাদের নিজের নিজের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। প্রত্যেকের নিজস্ব কক্ষপথে কি বিশ্রামের জন্যও আলাদা কক্ষ থাকে? ইতিমধ্যে উঁচু ছাদের আবডালেও আলো শ্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। কথা বলতে বলতে নদীও এক সময় চোখ বুজল। এক সময় ঘুমন্ত নদী তার ঘুমন্ত মাথার ভার ছেড়ে দিল আমার কাঁধে। বেশ লাগল আমার। একটু শান্তি আর একটুখানি গর্ব। আর অনেকটা সন্তুষ্টি। যার নাম ভাল লাগা। সেই ভাল লাগার রেশ চোখে মুখে মেখে আমিও কখন চোখ বুজলাম কে জানে। ঘুমের মাঝখানে অনুভব করলাম, নদী আমার কাছে ঘেঁষে এসে অকাতরে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। সম্ভবত ঘুম থেকে এক-দু’নিমেষের বিরতি নিয়ে দৃশ্যটা দেখেই চোখ বুজলাম আমি। চোখ বুজলাম কিন্তু বন্ধ চোখের পর্দায় দৃশ্যটা ঘুরতে থাকল। আধা ঘুমন্ত নাকে বাতাস টেনে পূর্ণ ঘুমন্ত নদীর ঘ্রাণ নিলাম। আচ্ছা, এই নদীও কি আমার উপর তীব্র রাগ চেপে নিশ্চিত হয়ে ঘুম জগতে পাড়ি দিল? ও কি নিছক ঘুমোচ্ছে? কিন্তু আমি যে ঘুমের মধ্যেও একটা পেগলায় দরজার ছিটকিনি খুঁজে যাচ্ছি। পরস্পরকে নিবিড় করে পাওয়ার শর্ত

এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম। আমার কাছে তার পূর্বশর্ত ছিটকিনি।

বালকাবাসে একদম ছোটবেলায় আমরা যে-ঘরে থাকতাম তাকে ঘর নয়, জাদুঘর বলা যায়। একটা লম্বা হলঘরে গোটা চল্লিশ খুদে বিছানা পাতা। সেখানে সর্ব সময় কলরব। সেখানে দরজা ছিল, তার পাশে ছিল না। আমি ভাবতাম কবে বড় হব আর দাদাদের মতো ছিটকিনিওয়ালা ঘর পাব। শুনতাম, অনেক বড় দাদারা ছিটকিনিবন্ধ ঘরে বিড়ি পর্যন্ত খায়। সেই দুঃসাহসের কথা ভেবে বুক কেঁপে উঠত। হাই স্কুলে ওঠার পর আড়ে বছরে বাড়লাম আমরা। ঘরও ছোট হল। তখন যেনো জন থাকতাম এক একটা ঘরে। আমাদের ঘরটার নাম ছিল উদ্দীপন কক্ষ। সেই কক্ষে দরজা ছিল, দরজায় পাশে ছিল, কিন্তু পাশেই ছিটকিনি ছিল না। নাইন টেন থেকে আমরা সম্মানিত বড় ছাত্র হলাম। তখন আমাদের প্রতি চার জনের জন্য একটা করে ঘর। প্রত্যেকের বিছানার পাশে আলমারি। একটা করে আলনা। কিন্তু তখনও আমাদের ঘরের ছিটকিনি ছিল ভাঙা। অন্য ঘরগুলোতেও সেই একই ছিটকিনি। আমরা সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে আবেদন জানালাম। তিনি ভুরু কঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয় ছিটকিনিতে?” আমরা উত্তর দিতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে নেতা ছিল টগর। ছেলেদের নামও টগর হয়, তা শুনে দেখে জেনেছিলাম। সব বিষয়ের জুতসই কারণ খুঁজে বের করতে সিদ্ধহস্ত ছিল টগর। সে মাথা নেড়ে বলল, “এক কালে ছেলেরা দরজা বন্ধ করে বিড়ি টানত। বিড়ির ধোঁয়ায় মেঘ জমত আকাশে। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হত না, শুধু দুর্গন্ধ ছড়াত। তার পরই জিতেন কবিরাজ প্রেসক্রিপশন করে দিল, ছিটকিনি ভেঙে গুঁড়ো করে সকাল সন্ধ্যা ধোঁয়া দিতে হবে বালকাবাসে। সেই থেকে ছিটকিনি শূন্য হয়ে যায় বালকাবাস।” আমরা শুনে এত হেসেছিলাম যে, পেটে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। জিতেন স্যার ছিলেন আমাদের অঙ্কের মাস্টার। বড্ড কড়া। কথার আগে হাত চলত। তিনি বালকাবাসেই থাকতেন। বিয়ে থা করেছেন কি না কেউ জানত না। তাঁকেই জিতেন কবিরাজ বানিয়েছিল টগর। পরে একটা গানও বানিয়েছিল সে। কথা, সুর সবই টগরের। আমাদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল তা। “জিতেনের দোরে, ধাক্কা দাও জোরে, জিতেনের কনে, রোজ দিন গোনে, জিতেনের তিনি, ভাঙা ছিটকিনি।” ঘুমোতে ঘুমোতে মনে পড়ে যায় গানটা। চোখের পিছনের পর্দায় বাজতে বাজতে তার সুরটা করুণ হয়ে ওঠে। গভীর আফসোস ঠেলে উঠতে থাকে। বিয়ে হলেও আমি বিবাহিত হয়ে উঠলাম না। জিতেন মাস্টারই হয়ে উঠলাম। আমি বিবাহিত না চিরকুমার, দু’চার জন বাদে তা কেউ জানবেই না। মাঝখান থেকে বিয়ে, না-বিয়ের পাকেচক্রে ঠোঁকর খেতে খেতে জীবনের বড় চাওয়া পাওয়া লক্ষ্য-অলক্ষ্যগুলো দূরে চলে যাবে।

হঠাৎ বিকট একটা শব্দে ঘুম ছুটে গেল। আমার সঙ্গে নদীও তড়বড় করে জেগে উঠল। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের বয়সি একটা মেয়ে প্রবল শক্তিতে বসার চেয়ারে হাতের চোটো দিয়ে আছাড় মারছে আর বলছে, “জানি না, জানি না, জানি না।”



এত ক্ষণ এই জায়গাটা ছিল চোখ জুড়ানো কোনও পর্যটনস্থল। এত ক্ষণ এই জায়গাটা ছিল তিন তারা হোটেল। মুহূর্তের মধ্যে মাত্র এক জনের আর্ট চিত্রকারে জায়গাটা হয়ে উঠল হাসপাতাল। যেখানে লোকে হাঁটতে হাঁটতে ঢোকে আর হারিয়ে যায় কোন সে রাসতালে।

মেয়েটার চোখে এক বিন্দু জল নেই। কালো ছিপছিপে চেহারা। তার সঙ্গে অদ্ভুত মানানসই ডাগর দুটো চোখ। এক মাথা ঘন কোঁকড়া চুল। বেশ সুন্দর সালোয়ার কামিজ পরনে। মেয়েটা তীব্র অবিশ্বাস,

প্রতিবাদ আর রাগে গর গর করা মুখে চিৎকার করে বলছে, “মানি না।” তার চার পাশে বেশ কয়েক জন। সম্ভবত নিকটাত্মীয়। তাঁরা কোনও কথা বলছেন না। লাউঞ্জে যে দু’চার জন বসে, তারা এগিয়ে গেল। আমি আর নদীও পাশে গিয়ে দাঁড়লাম। কেউ কাউকে চিনি না। কিন্তু সুখের মতো শোকও অচিন আত্মাকে বোধ হয় আপন করে নেয়। হয়তো তাই ওদের সঙ্গে থাকা এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিচু স্বরে বললেন, “মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন।”

এত বড় লাউঞ্জ এত ক্ষণ প্রায় জনশূন্য মনে হচ্ছিল। যারা বসে বা চেয়ারে গা এলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা সকলেই এসে ঘিরে দাঁড়াল তরুণীকে। ভিড় হয়ে গেল। এক সঙ্গে অনেক কক্ষপথের জট পাকানোকেই কি তা হলে ভিড় বলে? সেই ভিড় থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছিল?” ভদ্রলোক গলা নামিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, “হাট অ্যাটাক।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “বয়স কত?” ভদ্রলোক বললেন, “তিরিশ হবে কিনা সন্দেহ।” কেউ এক জন জানতে চাইলেন, “অনেক দিন ভুগছিল?” তিনি বললেন, “সে সব কিছুই না। সারা দিন আমাদের সঙ্গে দোকান করল। তরতাজা ছেলে। সন্ধ্যার সময় নাকি বুকে ব্যথা করছিল। ওর স্ত্রী দরকারে-অদরকারে সব সময় আমায় ডাকে। আমার পাশের দোকানটাই ওদের। আজ ডেকে বলল, “কাকু, দেখো মাস্তু কেমন করছে।” আমি বললাম, “ডাক্তার ডাকব?” তখন মাস্তুই হাত নেড়ে বলল, “কমে যাবে।” কিন্তু ওর গিমি জেদ ধরে বলল, “না কাকু, চলো হাসপাতালে নিয়ে যাই।” বললে বিশ্বাস করবেন না, একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা তিন জন এলাম। নেনে ও হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ভর্তি হল এমার্জেন্সিতে।” ভিড় থেকে কেউ এক জন জানতে চাইলেন, “চিকিৎসা হয়নি? ফেলে রেখেছিল নাকি?” ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “না! কাউকে অভিযোগ করার নেই। এখানকার ডাক্তাররা খুব চেষ্টা করেছে। ভালই ছিল জানেন তো! ইঞ্জেকশন দিল। ব্যথা কমল। একটা বেডে শুয়ে ছিল। ডাক্তার বলল, অবজার্ভেশনে রাখবে, রাতটা থাক। ইসিজি করার তোড়জোড় চলছে, তখনই হঠাৎ বুক চেপে ককিয়ে উঠল। রমা, ওর গিমি চিৎকার করে উঠল। ডাক্তার কত ভাবে চেষ্টা করল। লাভ হল না। বলছে, ধাক্কাটা খুব বেশি ছিল।”

এর পর নীরবতা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা থাকে না। ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন এসে পৌঁছোলেন। প্রৌঢ় বললেন, “ব্যবসায়ী সমিতির ছেলেরা আসছে। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবুন, সারা দিন কাজ করলাম। এখন আমি আছি, দোকান আছে, মাস্তু নেই। দু’চার ঘণ্টা আগেও টাকা নিয়ে বিল কেটেছে। ক্যাশমেমোয় এখনও জ্বলজ্বল করছে ওর সই। দু’ঘণ্টা পর ও ডেডবন্ডি। বলুন, মানা যায়।”

হাতে চাপ পড়ল। দেখলাম নদীর নখ চেপে বসেছে আমার হাতে। ও একদৃষ্টে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। এ দিকে নতুন আসা মুখগুলোর কেউ এক জন সামনে গিয়ে কিছু একটা বলল মেয়েটাকে। ও ভেঙে পড়ল না। তার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন ছাড়ল, “দুলুদা, ওরা এ সব কী বলছে দুলুদা? আমি জানি না। আমি এখানে ভর্তি করব না। বন্ডে সই করে নিয়ে যাব। অন্য কোথাও ভর্তি করব। তুমি বলো তো দুলুদা। তোমার নাম বলো, তোমায় তো সবাই চেনে, বলো না, আমি যেমন এনে দিয়েছিলাম তেমন মাস্তুকেই নিয়ে যাব, ওদের কিছু করতে হবে না। কিছু করতে হবে না।”

পরিস্থিতি ক্রমশ বদলে গেল। এই সুদৃশ্য, স্নানতর আলোর আলপনা ঝোলানো কৃত্রিম আকাশের নীচের আলতো শীতল স্বর্গের বাতাসও ভারী হয়ে উঠল। যারা এসেছে, যারা ঘিরে রেখেছে মেয়েটিকে, তারা কেউ সাহুসা দিতে পারছে না। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিড় বিড় করে বললেন, “কী বলব রমাকে? আমি কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।” কে যেন বলল, “কত দিন বিয়ে হয়েছে ওদের? ছেলেপুলে...” প্রৌঢ় বললেন, “বেশি দিন বিয়ে হয়নি। এই তো সাত-আট মাস হবে। আমরা সব কজি ডুবিয়ে খেলাম। ছেলেপুলে হয়নি। এখানে কেউ নেই ওদের, সবাই থাকে দেশের বাড়িতে। সেই রাখিকাপুরে।” হাসপাতালে অপেক্ষমাণ এক জন বললেন, “সামলে নিতেই হবে দাদা, এর নাম জীবন। মেয়েটার বয়স অল্প, একটু জিরিয়ে ফের নতুন করে শুরু করতে হবে। জীবন থেমে থাকে না।” ভদ্রলোক শুনলেন, তর্ক করলেন না। সেই রকমই নিচু অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন,



“আমার অভিজ্ঞতা কম, বলতে পারব না। তবে দেখতাম, দু’জনে খুব মিল। কাস্টমারের চাপ বেশি থাকলেও এক সঙ্গে না হলে টিফিনটুকুও খেত না। নতুন করে শুরু করতে পারবে কি না জানি না, আসলে হার্ট হোক বা কাচ, যে-ধাক্কাটা জোর দিয়ে পড়ে, তার দাগ তোলা যায় না।” আর কেউ উত্তর দিতে পারল না। এ দিকে মেয়েটি তখন ওড়নায় মুখ ঢেকে সেই বয়স্ক ব্যক্তিকে বলল, “আর দেরি করব না। দুলুদা, তোমাদের ভাইকে নেমে আসতে বলো। আমাদের চিকিৎসার দরকার নেই। ও তো সন্ধ্যে বলল, রাতে ফেরার পথে চিলি চিকেন কিনে নিয়ে যাবে। বলো, তুমি তো তখন সামনে ছিলে, বলো, ছিলে না! আমি রাখিকাপুরে কী বলব দুলুদা?”

আবেগের এই বিস্ফোরণের সামনে অপেক্ষা করা যায় না, চোখ ভারী হয়ে আসে। আমি নদীর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। বাইরে তখন রাত গভীরের নিকষ কালো অন্ধকার। দূরে দূরে আলো জ্বলছে। এই আলোর দীপ্তি কমিয়ে রাখা আছে। না হলে বোঝা যাবে কী করে যে রাত নেমেছে! অন্ধকারে টগর গাছের ফুলগুলো চকচক করছে। গাছগুলোর গোড়ায় পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে চওড়া বসার বন্দোবস্ত করে রাখা আছে। আমি আর নদী কোনও কথা না বলে সেখানেই বসে পড়লাম। ও তখনও আমার হাত ধরে ছিল। অনেক ক্ষণ আমরা চুপ করে থাকলাম। তার পর চেষ্টা করলাম পরিস্থিতির গুমোট ভাবটা কাটাতে। বললাম, “যাঁরা এখানে চাকরি করেন, এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁদের গা সাওয়া হয়ে গেছে।” শুনে সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না নদী। একটু পরে বলল, “ছেলেটা রোগে ভুগে মারা গেলে মেয়েটা হয়তো ভেতরে ভেতরে তৈরি হওয়ার একটু সুযোগ পেত। বিষয়টা এত হঠাৎ হলে মনে নেওয়া খুব কঠিন।”

“পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও তো কঠিন হয়, তা বলে লোকে কি পরীক্ষা দেয় না! লড়তে হবে মেয়েটাকে। লড়ে ব্যবসাটা দাঁড় করাতে হবে।”

“ব্যবসাই কি সব? দোকান বন্ধ করার পর বাড়ি ফিরে কী করবে ও? ক্যাশবান্ড তো সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাবে না!”

“একটা মানুষ ছাড়া অন্য মানুষ কি কখনও অচল হতে পারে নদী? শোক তো থাকবেই। শোক কষ্টের, যন্ত্রণার। কিন্তু মানুষ তা বেশি দিন বইতে চায় না। কিছু সময় পর তা খোলসের মতো খসে পড়ে। মেয়েটাকে দেখে তোর মানতে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তব।”

“সেটা অন্য সব সম্পর্কের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু একটা মেয়ে আর একটা ছেলে যখন মিলেমিশে থাকে তখন সেটা অন্য রকম কিছু। দু’জনে মিলে একক। সেখান থেকে এক জন খসে পড়লে সেই খসে পড়ার ক্ষতিপূরণ হয় না দেশ।”

“তুই কি এটা বিশ্বাস করিস?”

“এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করি। জীবন তো অভিজ্ঞতার যোগফল, ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।”

“তা হলে নদীর সঙ্গে কোথায়, কোন মোহনায় কোন সে নদের মিলন হবে?”

কথাটা শুনে নদী চমকে উঠল। এত ক্ষণ ও কেবল মেয়েটার দৃশ্য, মেয়েটার ভবিষ্যৎ কল্পনা করেই কথা বলছিল। স্রোত যে ইতিমধ্যে তার নিজের দিকে ঘুরে গেছে, তা খেয়ালও করেনি। আমার কথাটা শুনে ও ঘাবড়ে যাবে না, তা আমি জানতাম। আসলে অনেক অনেক দিন আগে, আমার আর নদীর মধ্যে বিবাহের জোয়ার-ভাটা খেলা শুরু করার আগে মাঝে-মাঝে এই কথাটা বলে আমি ওকে উতাত্ত করতাম। কথাটা শুনে ও রাগল না, বিরক্ত হল না, বাধ্য হল না। আমার হাতখানা ওর দুই মুঠোয় নিয়ে চুপটি করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল অনেক ক্ষণ।

আমি একটু পরে বললাম, “একটা কথা বলব নদী?” ও অন্য দিকে তাকিয়েই বলল, “প্রসঙ্গটা বদলানোর জন্য অন্য কথা বলবি তো?”



আমি হেসে বললাম, “হ্যাঁ।” নদী এ বার আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উত্তর দিল, “বল।” আমি দূরের আসল আকাশের সম্ভাবনায় শূন্যের দিকে তাকিয়ে বললাম, “জানিস তো, আমি তখন ক্লাস নাইন-টেনে পড়ি। বালকাবাসে আমার বিছানার পাশেই ছিল একটা বড় জানলা। অনেক সময় মাঝ রাত্তি ঘুম ভেঙে যেত। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্যাঁচার ডাক কানে আসত। আমি চোখ খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম, ঘুমোব না, জেগে থেকে দেখব ঠিক কখন আর কী করে রাতের অন্ধকার কেটে দিন জেগে ওঠে, কিন্তু এক দিনও সেটা দেখা হয়নি, রোজই ঘুমিয়ে পড়তাম,” তার পর একটু থেমে বললাম, “আমি আজ ঘুমিয়ে পড়ব না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, অন্ধকার কেটে এ বার ভোরের আলো ফুটবে। চল, আমরা ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করি, দিন এলেই খপ করে ধরে ফেলব।”

আমার কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নদী বলল, “তুই খুব সুন্দর কথা ঘোরাতে পারিস,” তার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক ক্ষণ থেমে থাকার পর বলল, “তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।”

কেন কে জানে, কথাটা শুনেই আমার বুকটা ধক করে উঠল। যেন বন্ধু দেশের খোলসের মধ্যে বিবাহিত দেশ এসে পায়চারি শুরু করল। আমি এক বার ওর দিকে, এক বার মাটির দিকে চোখ পেতে ওর কথা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম। এ বারও বেশ কিছুটা সময় নিয়ে নদী বলল, “আমাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে দেশ...” বলে আবার কিছুটা বিরতি দিয়ে বলল, “তোর সঙ্গে থাকছি, এখানে আসছি দেখে মার চোখ চক চক করে উঠছে। দু’দিন পর বাবা বাড়িতে গেলে তারও প্রত্যাশা নতুন করে জেগে উঠবে।”

বলে ফের থামল ও। আমার মনে পড়ল আজ হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে, ওর বাবা ননীবাবুর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। নতুন করে খারাপ কিছু না হলে দু’দিন পর বাড়িতে যেতে দেবে। আজ রাত্তি না-

থাকলেও চলবে। কিন্তু নদী সাবধানতার জন্যই থেকে গেল। প্রায় দেড়-দু’মিনিট চুপ করে থেকে নদী বলতে শুরু করল, “আমি জানি না কী সিদ্ধান্ত নেব! হয়তো আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া জীবনেও হবে না! কিন্তু এই যে তোর সঙ্গে থাকছি, ঘুরছি, সেটাও হয়তো ঠিক হচ্ছে না।”

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, “আমি তোর বন্ধু ছিলাম, বন্ধু হয়ে থাকবও। কেবল বন্ধু হয়েই তোর সঙ্গে থাকছি। আর অবশ্যই কাকুর প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য। ওঁর ঋণ আমি জন্মে শোধ করতে পারব না। এর সঙ্গে অন্য কোনও শর্ত জুড়িস না নদী।”

“আমি জুড়ব না, কিন্তু লোকে জুড়বে।”

“তা হলে আমাকে কী করতে বলছিস?”

“তোকে একা বলব না, আমি নিজেকেও বলব। দ্যাখ দেশ, আমরা সেই পুরনো বন্ধুর মতো কত সহজে কথা বলতাম, তাই না?”

“তা হলে সেটাই বেঁচে থাক নদী।”

“কিন্তু মাঝখানে যেসব ঘটনা রয়েছে তা তুই জানিস।”

“আমি এখনই সই করে দিচ্ছি, কাগজটা আছে তোর কাছে?”

“আঃ! আমি সই সাবুদের কথা বলছি না দেশ।”

“তা হলে কী বলছিস?”

“বলছি, এই বন্ধুত্বটা অক্ষয় হয়ে থাক।”

“থাক। কিন্তু কী করে? পাথর চাপা দিয়ে?”

“হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। পাথর চাপা দিয়ে।”

“আমি মানে না-বুঝে বলেছি। কোথায় চাপা দেব? কোন পাথর?”

“দেখ, আমি আর তুই খুব ভাল বন্ধু।”

“তোর পরিকল্পনাটা কী, তা খুলে বল।”

“পরিকল্পনা বলে কিছু নয়। এখনই ভাবলাম। দেখ, কালও আমি এখানে রাত্তি থাকব। তুইও থাকবি আমি জানি। আমি না-বললেও থাকবি। আমি আপত্তি করলে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবি, সেটাও আমি

জানি।”

“এ বার প্রসঙ্গ ঘোরাব! অন্য কথা বলি!”

“না। তুই আমার কথা শোন। কাল আমরা ঘুমোব না। বাবা যদি ভাল থাকে, তা হলে কাল সারা রাত আমরা কথা বলব। তোর যা প্রশ্ন আছে তুই করবি। তোর যত গল্প আছে বলবি।”

“আমার কোনও প্রশ্ন নেই।”

“আলবত আছে। চাইলে সেই প্রশ্ন করবি। না-চাইলে গল্প করবি। আমিও গল্প করব। সারা রাত। এই রকম ভোর হওয়া পর্যন্ত।”

“তার পর?”

“তার পর আর আমরা পরস্পরের মুখ দেখব না।”

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নদী তখনও বলে চলেছে, “আমি বিচ্ছেদের জন্যই এই চাইব কি না, তুই এই করবি কি না, সে সব অনেক পরের কথা। আমরা ভাল বন্ধু ছবজায় রেখে যে যার মতো দূরে চলে যাব। খুব দরকার না হলে দেখা করব না, ফোন করব না, মেসেজ লিখব না। বল, কেমন হবে?”

কথার সাহায্যে সব উত্তর দেওয়া যায় না, কথা দিয়ে সব অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। যদি যেত, তা হলে আমি নদীকে বোঝাতে পারতাম, অন্ধকার দূর হয়ে কোথা থেকে আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে আকাশ। কে যেন লাখো লাখো দরজা, জানলা খুলে দিয়েছে আলোর জোয়ার স্রোতের সামনে। সেই সব দরজা, জানলায় কোনও ছিটকিনি নেই। সেখান থেকে দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলেছে বিগত রাতের ঐষ্ট স্বপ্নদল। তাদের কোনও কক্ষপথ হয় না, তারা কক্ষচ্যুত ব্যর্থ তারা মাত্র।



কিছু কিছু মানুষ হন এমনই, যাঁরা অপর মানুষকে বিচার করেন তাদের শিকড় দিয়ে। বাড়িতে ভোজসভা আয়োজনের জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়ে বেচুবাবু প্রথমেই জানতে চেয়েছিলেন, “আপনার বাড়ি কোথায়? না এখানকার কথা জানতে চাইছি না, এখানকার সব আমার জানা, ছেলেবেলা কোথায় কেটেছে তা জানতে চাইছি।” জানিয়েছিলাম এখানকার বালকবাসের কথা। ভুরু কঁচকে জানতে চেয়েছিলেন, “অনাথ আশ্রম?” আসলে এখানকার পুরনো মানুষজন ওই নামেই ডাকতেন বালকবাসকে। বেচুবাবু বয়স্ক, রাশভারী মানুষ। সরকারি ঠিকাদার, লোকে বলে মানুষটা সং। পোড় খাওয়া ব্যবসায়ী, আমার মতো আনকোরা নন। হয়তো তাই খোঁজখবর নিয়েই আমায় খবর দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান কী, কত জন নিমন্ত্রিত, মেনু কী, ক’টার মধ্যে খাবার তৈরি করতে হবে এবং পরিবেশন কেমন ভাবে হবে সে সব নিয়ে অনেক কথা বললেন, কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে একটা বারও দরদস্তুর করলেন না। কারও কারও ব্যবহারে একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব থাকে। তাঁরা শেষ কথায় উদ্বেগ ছুঁয়ে বলেন, “দেখো বাপু, অনেক নামী দামী লোক আসবে, ডুবিয়ে না যেন!” বা দাম বাড়িয়ে বলেন, “এখানে ভাল কাজ করলে অনেক কাজ পাবে!” কিন্তু বেচুবাবু সে সব কিছু করলেন না। তাঁর ব্যবহারে অন্যের প্রতি নিরুচ্চারিত সম্মান টের পাওয়া যায় স্পষ্ট। শেষ কালে বললেন, “আমার দাদুভাইয়ের জন্মদিন, যা হলে ভাল হবে তা নিজের মনে করে করবেন।”

আড়াইশো জন নিমন্ত্রিত, মহার্ঘ সব খানা নিয়ে সেই আধা রাজকীয় অনুষ্ঠান ছিল আজ দুপুরে। ভোরবেলা হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর আর সারা দিন সে দিকে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। বার দুয়েক ফোনে কথা হল নদীর সঙ্গে। আজ ননীবাবুকে আইসিইউতে দেওয়া হয়েছে। ও গিয়ে কথাও বলেছে সকাল সাড়ে এগারোটায়। ফোনে বলল, “বাবা প্রথম কী জিজ্ঞেস করল, জানিস?”

জিজ্ঞেস করল, দেশ কোথায়? নিজের বৌ, মেয়ের খোঁজ নিল না দেখে আমি কিন্তু একটুও রাগ করিনি। বলেছি, তোমার দেশ এখানেই হতো দিয়ে পড়ে আছে রাত-দিন।” আমি জানতে চেয়েছি, “কী খেয়ে এলি রে?” ও হেসে জবাব দিয়েছে, “কিছু খাইনি। দেখি বেচুবাবুর বাড়ি থেকে পার্সেলে কী আসে!” আমি রাজুকে দিয়ে দুপুরে এক বার দুটো ভেটকি পাড়ুরি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম হাসপাতালের বাইরে। জানি, এটা ওর প্রিয়তম পছন্দ। ফেরত আসেনি সেই সুখাদ্য। বেচুবাবু সর্ব ক্ষণ ধৃতি পাঞ্জাবি পরে তদারকি করে গেলেন পরিবেশনের। মাঝখানে এক বার বললেন, “ভেটকি, পাবদা দুটোই সুপারহিট। আপনি আমার মান রেখেছেন।” দেখলাম, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউকেটারও রয়েছে।

আমি জাত ব্যবসায়ী নই। কোন কাজে কতটা লাভ হচ্ছে তা আমার নখদর্পণেও থাকে না। আমি কেবল কাজটা ভাল করে উত্তরে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার সব থেকে বিপদ হয় রগচটা লোকদের নিয়ে। নানা জায়গায় এ রকম একটা-দুটো অপোগণ্ড থাকেই। তারা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে এসে বলে, “এটা কী পরিবেশন হচ্ছে? আমি কে জানেন?” অথবা “এখনও খাবার তৈরি হয়নি? এরা তো প্রফেশনালই নয়!” তাদের আর বলতে ইচ্ছে করে না, পাটি যেমন সময়ে খাবার তৈরি করতে বা যে ভাবে পরিবেশন করতে বলে, আমরা তাই-ই করি মাত্র, সাধারণত কাজে আমাদের টিলেমি থাকে না। বলা হয়ও না। তাদের নির্বিকার ভাবে হস্তিত্ব করতে দিই। আমার কক্ষপথে বার বার এই রকম মানুষরাই ভিড় করে আসে। বলা ভাল, এসে ধাক্কা দেয়। যেমন নদী। আমাকে দেওয়া ওর তীক্ষ্ণতম হুমকির ভাষা ছিল এই রকম, “শার্প শুটার দিয়ে গুলির আগে কি সইটা করবে, না গুলিই খাবে?” কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে পাল্টা রাগ দেখাতে পারিনি আমি। মাথা ঠান্ডা হয়ে থেকেছে। মনে হয় বালকবাসের অভ্যাসটা থেকে গেছে। কে যেন বুটঝামেলার সময় কানে কানে বলে দেয়, “ওরে তোর পিছনে কেউ নেই। সামনেও না। যে চোঁচাচ্ছে তাকে আরও চোঁচাতে দে।” তাই রাগের কথা মনে গেঁথে রাখতে চাই। যেমন আজ দুপুরে ব্যস্ততার মধ্যেও রাজুকে দিয়ে সামান্য খাবার পাঠিয়ে শান্তি পেয়েছি। এই ভাল লাগাটা মনে স্থায়ী ভাবে থেকে যাবে অনেক দিন।

ভোজবাড়ির সব কাজ মিটেতে বেলা শেষ হয়ে গেল। বেচুবাবু এসে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। আমিও চেয়ার নিয়ে বসলাম। উনি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন, “আপনার কাজে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি,” তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “একটু দরদাম করব?” আমি দরাজ হেসে বললাম, “বলুন না!” উনি বললেন, “আমি কি আর একটা পান পেতে পারি না? বিনা মূল্যে!” আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। তার পর নিজেই গিয়ে প্যাকেট থেকে একটা পান এনে দিলাম। এগুলো মিঠে পাতা মিষ্টি মশলা দেওয়া পান। মুখে দিলেই গলে যায়। সমঝদার লোকের তারিফ পেলে মনটাও গলে যায়। পান চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক একটা কাগজে হিসেব লিখলেন। তার পর অবশিষ্ট টাকার পুরোটা গুনে দিলেন। চিরকুট্টা দেখে বুঝলাম, তুচ্ছ তুচ্ছ যে বিষয়গুলো কেউ ধরেই না তিনি সেটাও হিসেব করে আমার প্রাপ্তিযোগ বাড়িয়েছেন। পাওনাগড়া নিয়ে দরদস্তুর করার বদলে বাড়তি টাকা পেলে কার না ভাল লাগে! কিন্তু এমন মানুষ তো সচরাচর পাওয়া যায় না। আমায় সাত-পাঁচ ভাবতে দেখি বেচুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি কিছু বলবেন?” আমি স্নান হেসে জিজ্ঞেস করলাম, “একটু দরদাম করব?” ভদ্রলোক প্রশ্নের হাসি হেসে বললেন, “বলুন, বলুন দেশবাবু!” আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “এই ব্যবসা আমার দ্বারা হবে? কোনও আশা আছে আমার?”

ভদ্রলোককে দেখে মনে হল এই রকম একটা প্রশ্ন আদৌ আশা করেননি। সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিলেন না। ভুরুটা কঁচকে গেল। চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিল থেকে একখানা টিসু পেপার তুলে নিয়ে চুপচাপ তার কাচ মুছলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, “আমায় জিজ্ঞাসার কারণ? আমি কি জ্যোতিষী?” আমি বললাম, “জ্যোতিষী হলে জিজ্ঞেস করতাম না। মনে হল আপনার কাছে উত্তরটা আছে, তাই জানতে চাইলাম।”

এ বার বৈঠকি মেজাজে কথা শুরু করলেন বেচুবাবু, “উনুনের

আঁচ দেখেছেন? কখনও গনগনে কখনও ঢিমে তালে। ব্যবসাও সে রকম। কারও হাতে ফুলে ফেঁপে ওঠে, কারও টুক টুক করে চলে যায়। তবে আপনি লম্বা রেসের যোড়া।” বললাম, “আপনি আমার অভিভাবকের মতো। আমায় তুমি করে বলুন।” ভদ্রলোক মনে হয় খুশিই হলেন। তার পর বললেন, “তুমি যদি নদীর ওয়ূধের ব্যবসায় বাজার সরকার হয়ে থাকতে তা হলে কথাটা বলতাম না, কিন্তু সে সব ছেড়ে নিজে কিছু করার চ্যালেঞ্জটা নিয়ে ঠিকই করেছ।” আমি হাঁ হয়ে গেলাম। বললাম, “আপনি জানেন?” ভদ্রলোক হাসি মুখে বললেন, “ব্যবসা আমার নেশা, আমার জীবন, বিনোদন। আমি শুধু ব্যবসা করি না, যারা ব্যবসা করে তাদেরও খোঁজ খবর রাখি। বিশেষ করে আমার যেটা ব্যবসা সেখানকার সব খবর রাখি আর এই মহল্লার সব খবরও রাখি। এখানে আমার কয় পুরুষ হল জানো? পাঁচ পুরুষ। সেই বঙ্গভঙ্গের বছরে আমাদের পরিবার এখানে ঘাঁটি গাড়ে। এই, তোমার সময় আছে তো?”

আমি সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়লাম। বেচুবাবুর গায়ের রং ফরসা। মাথার কাঁচা-পাকা চুল পিছন দিকে পেতে আঁচড়ানো। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রখর। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে বললেন, “আমি যে রাস্তা দিয়ে যাই, যেতে যেতে গাড়ি থেকে রাস্তার দু’পাশ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি। কোন ছেলে চায়ের দোকান বা চপ ভাজার দোকান দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছে তা চোখে পড়ে।”

“কিন্তু আমার ব্যবসা তো রাস্তার ওপর নয়।”

“তাতে কী, তুমি নদীর আপনার লোক। নদী আমার বন্ধু না হলেও সমবয়সি তো বটে। সে জহুরি মানুষ, রত্ন চিনতে ভুল করে না। আসলে কী জানো দেশ, ব্যবসা হল একটা থলি। তাড়াতাড়ি অনেক অনেক পেতে গেলে থলি ফুটে হয়ে যেতে পারে। যারা লম্বা দৌড়ে নামবে তারা থলি উপড় করে যা জমছে তা নিয়ে নেয় না। একটু একটু করে থলি ভর্তি করে। মনে রেখো বাপু, যে কোনও দৌড় তারাই জেতে যাদের কোনও তাড়া নেই। তাড়া থাকলে কী হবে?”

“ফোকাস নড়ে যাবে।”

হেসে মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে বেচুবাবু উঠে পড়লেন। আমিও মোটরসাইকেল নিয়ে রওনা দিলাম ভাড়া বাড়ির দিকে। সবার আগে স্নান সারতে হবে। তার পর মাথার উপরে বন বন করে পাখা চালিয়ে টেবিলের নীচে বসে কিছু হিসেব করতে হবে। সব শেষে ছুটতে হবে হাসপাতালে। সব কিছু ঠিক থাকলে আজই নদীর সঙ্গে শেষ দিন রাতে থাকার। সব কিছু হিসেব মতো চললে আজই আমাদের শেষ নৈশযাপন।

ঘরে পৌঁছোনের পরই ফোনটা নড়ে উঠল। দেখলাম নদী ডাকাডাকি করছে। ফোনটা ঝুঁতেই কল কল করে উঠল সে,

“এই তুই রাতে আমাদের বাড়িতে খাবি।”

“তুই বাড়ি চলে গেছিস?”

“বিকেলের রাউন্ডে ডাক্তার বলল, বাবা ভাল আছে। তাই চলে এলাম। রাতে তোর সঙ্গেই যাব তো।”

“খাওয়ার ঝামেলার দরকার কী?”

“দরকার নেই, তাও বললাম। কাল কি আর বলব?”

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে একটা কথা মনে পড়ে হাসি পেয়ে গেল। আমার এই ভাড়া বাড়িতে শোওয়ার ঘরের দরজায় কোনও ছিটকিনি নেই। বাড়ির মালিককে বলতে তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, “থাকবেন তো মশাই একা। একা একা আবার কারও ছিটকিনি লাগে?” তার পর থেকে যখন একা থাকি তখন এই প্রশ্নটা জ্বালিয়ে মারে আমাকে। যারা একা, তারা ছিটকিনি দেয় না? যারা দোকা, তারা কখন ছিটকিনি দেয়? কেন দেয়? পরস্পরকে লুকোতে? তা হলে কি পাঁচিলের অন্য নাম ছিটকিনি? দূরত্বের প্রতিশব্দ? নাকি নৈকট্যের অন্যতম শর্ত? সব গুলিয়ে যায়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যুদ্ধ করতে করতে ঘোড়ার উপরে বসেই মিনিট কুড়ি ঘুমিয়ে নাকি চাপ্সা হয়ে যেতেন। অবশ্য কুড়ি মিনিটের নিদ্রাকে নিদ্রা না বলে ঝিমুনি বলাই ভাল। ভাড়া বাড়িতে আমার

শখের সোফায় এলিয়ে ঘণ্টা খানেকের ঝিমুনিতে আমি সতেজ হয়ে উঠলাম। আজ রাতে জাগতে হবে। ঝিমুনিহীন রাত। এবং নদীর সঙ্গে শেষ রাত। এটাও এক ধরনের যুদ্ধই। স্নায়ুর যুদ্ধ। ও তো বলেইছে, প্রশ্নোত্তর হয়ে উঠতে পারে রাত কাটানোর উপকরণ। সেই প্রশ্নোত্তর নিশ্চয়ই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে হবে না। হয়তো হবে অভিযোগ নিয়ে। আমি অভিযোগকে প্রশ্নের তালিকায় আসতে দেব না। কিন্তু রহস্যের নিষ্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তো করতেই পারি। আমার জীবনে রহস্য তো মাত্র দুই। একে নদী, দুইয়ে দিছু।

মোটরসাইকেল নিয়ে নদীর বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে এ সব কথাই ভাবছিলাম। দিছুর কথা মনে হতেই বুকের মধ্যে উদ্বেগের পাথরটা নড়ে চড়ে উঠল। কে জানে কেমন আছে সে। কী মনে হল, মূল রাস্তা বদলে ভিতরের পথ নিলাম। এ দিক দিয়ে গেলে দিছুর পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া যায়। গণার দোকান, যেখানে প্রায়শই দিছু বসে থাকে, সেটাও এই রাস্তাতেই। আজ অবশ্য গণার দোকান পর্যন্ত যেতে হল না। তার আগেই চোখে পড়ল, দোকান থেকে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে নিজের বাড়ির দিকে চলেছে দিছু। অবশ্য সেই হাঁটা এত ধীর গতিতে যে, তাকে হাঁটা না বলে নড়াচড়া করা বলা যেতে পারে। ওর লম্বা চেহারাটা রোগা ও আরও ক্লান্ত লাগল। আমি মোটরবাইক একটা গলির ভিতর রেখে কয়েক পা হেঁটেই ধরে ফেললাম দিছুকে। কিন্তু “দিছু” বলে ডাকার পর ও এমন ভাবে তাকাল, যেন চিনতেই পারছে না।

“কী রে, চিনতে পারছিস না আমায়?”

“আসলে দেখতে পাচ্ছি না ভাল করে।”

“রাতের বেলায় চোখে কি কম দেখছিস তুই?”

“না, না, ঠিকই দেখি। আসলে চশমায় জং পড়েছে। এ বার বুঝেছি, এই গলা দেশ ছাড়া আর কার হবে।”

“ঘরে ফিরছিস?”

“আর কোথায় যাব?”

“কোথায় যাবি বল? আমার মোটরসাইকেলে চাপিয়ে তোকে নিয়ে যাব, ঘুরে আসবি এক চক্কর।”

“আচ্ছা যাব এক দিন। তোর সঙ্গেই যাব।”

“এক দিন কোনও দিন আসে না দিছু, যদি না সেটা আজ হয়। এখনই চল।”

“রাতে ভাল দেখতে পাব না দেশ। আজ থাক।”

“তুই কত দিন এই দোকান আর বাড়ির বাইরে যাসনি দিছু?”

“না না গেছি তো, এই তো তিন বছর আগেই গেলাম।”

“কোথায় গিয়েছিলি?”

“কেন তোরাও তো ছিলি।”

“আমরা ছিলাম? কবে? কোথায় গিয়েছিলাম?”

“তোমার মনে নেই, বাবা যে দিন চলে গেল, তোরা এলি, ম্যাটাডোরে চেপে ঝাশানে...”

“এ ছাড়া আর তুই বেরোসনি, শালা ঘরকুনো!”

“পৃথিবীটা কত বড় বল তো দেশ! সেখানে রোজ দশ-বিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার ভ্রমণ করা আর একটা স্থির বিন্দুর মধ্যে বিশেষ তফাত হয় কী!”

উত্তর দিতে পারলাম না।

স্কুলে আমি টকাটক অঙ্ক করে ফেলতাম। জ্যামিতি করতে গিয়ে ধ্যাড়াতাম। দিছু সবই করত, তবে একটু ধীর-স্থির ভাবে। জ্যামিতির ছবি বা উপপাদ্য প্রমাণে কখনও ভুল করত না ও। এখনও কি সেই স্থির প্রতিজ্ঞ মানুষটা বেঁচে আছে ওর মধ্যে? নাকি সবই ভ্যানিশ? কেবল খোলসটাই মুখস্থ বিদ্যার মতো একই পথ ধরে গণার দোকান আর বাড়ির মধ্যে পাক খাচ্ছে?

আমার রহস্যকে একই তিমিরে রেখে দিছু তত ক্ষণে আবার তার স্নগ্ধ গতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে ঘরের দিকে। মোটরসাইকেলে উঠে আমি রওনা দিলাম অপর রহস্য বিন্দুর দিকে। মনে হয় এ দুটোই না-উদ্ঘাটিত শিলালিপি হয়ে থাকবে আমার কাছে।

দিছু, মল্লবীর, সজীব, সন্ধ্যাণ এরা সকলেই আমার স্কুলের বন্ধু। বালকবাসের লাগোয়া একটা নামী স্কুলে পড়েছি আমরা।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেই প্রতিষ্ঠানে বালকাবাসের সকলেই পড়ত, বাইরের ছেলেরাও পড়ত একই সঙ্গে। কোথাও কোনও তফাত হত না। এমনকি বহু ধনী পরিবারের ছেলেও অনাথ ছাত্রদের সঙ্গে একই ভাবে প্রতিপালিত হত বালকাবাসে। সেখানে একদম ছেলেবেলাতেই আমায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন উকিলকাকু। বরাবর তিনিই আমার দেখাশোনা করে এসেছেন। এখনও করেন। ছোটবেলায় জানতাম আমি পিতৃমাতৃহীন। বড়বেলায় জেনেছি এই গল্পের কাঠামোয় আরও কিছু অস্থি মজ্জা রয়েছে। সম্ভবত আমার জন্মটাই ছিল এক বিপত্তি। কারণ, আমি পৃথিবীতে আসার আগেই আমার বাবা ও মা তাঁদের ধৈর্যের শেষ বিন্দুতে পৌঁছেছিলেন। আমার জন্ম যখন হয়, তখন তাঁরা আইনত বিচ্ছিন্ন। তার পর নানান পেশাদার, অর্ধ-পেশাদার সংস্থার আদর খেয়ে শেষ পর্যন্ত আমার গতি হয় বালকাবাসে। টাকার অভাব কোনও দিনই ছিল না। বাবা বা মা বা দু'জনে মিলেই পর্যাপ্ত অঙ্কের উচ্চিষ্ট উকিলবাবুর হাত দিয়ে স্কুলে পাঠাতেন। কেবল সমস্যা হত গ্রীষ্মের, পূজোর বা বার্ষিক পরীক্ষার পরের লম্বা ছুটিছটিয়া। তখন অত বড় বালকাবাসে গুটিকয় খুদে পড়ে থাকতাম। গোটা আশ্রমবাড়িটা যেন গিলে খেতে আসত। সময় কাটাতে রাধুনি ঠাকুর মোহরদার ঘরে গিয়ে গল্প করতাম। সাত কুলে কেউ না-থাকায় সে-ও ছুটিতে কোথাও যেত না। আমার মতো গুটিকয় খুদে, কিছু শিক্ষক, সুপারও ছুটিতে থেকে যেতেন বালকাবাসে। মোহরদা আমায় রান্না শেখাত। বলত, “জামা-কাপড় পরতে হয় রং মিলিয়ে, খাবার বাছতে হয় গন্ধ মিলিয়ে।” আমি হাসতাম। মোহরদার কোনও কথাই বিশ্বাস করতাম না। এখন এত বছর পরে বুঝি লোকটা ভুল কিছু বলত না। এখন পাটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এক এক সময় চমকে যাই। মনে হয়, আমি নই, আমাকে থামিয়ে আমার মধ্যে থেকে মোহরদাই কথা বলছে। যখন বালকাবাস ছেড়ে আসি, তখন হঠাৎ এক দিন খবর আসে, মোহরদা আত্মহত্যা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলাম। খুব কষ্ট হয়েছিল। আর মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠেছিল অনেক অনেক প্রশ্ন। সেই ঘটনার পর থেকে আর কখনও বালকাবাসে যেতে পারিনি আমি।

আজকাল অবশ্য প্রায়শই কথা বলার সময় অন্য রকম লাগে। তখনও মনে হয় আমায় থামিয়ে সেই অমর মাস্টার কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। কখনও উত্তর না-দিতে পেরে মাথা নিচু করে থাকার সময় মনে হয়, দ্বিজু এসে ভর করেছে আমার অভিযুক্তিতে। হয়তো আসল আমিটাও আর নেই। অনেকে মিলে আমার খোলসের এক-এক ঘন্টার দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে। সেখানে কোনও উকিলকাকু নেই খবরদারির জন্য।

এ গলি-ও গলি করে ক্রমশ নদীদের পাড়ায় পৌঁছে যাই। ওদের বাড়িটাও দূর থেকে চোখে পড়ে। ওর বাবা বাতিঘরের আদলে বাড়িটা বানিয়েছিলেন শখ করে। আমি প্রথম আসি ওর জন্মদিনে। তখন আমি একাদশ শ্রেণির এক কিশোর ছাত্র।

লেখাপড়ার জন্য বালকাবাসের নিয়ম ছিল খুবই নমনীয়। মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুলের বিদ্যুৎ সারাই প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে এসে আমাদের লেখাপড়া করাতেন। মাধ্যমিক পেরোনোর পর আমরা তাঁদের কাছেও পড়তাম, বাইরেও পড়তে যেতাম। দরকার হলে সুপার নিজে কথা বলে বাইরের কোচিংয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। আমি শুধু অঙ্কের জন্য বাইরের কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। উকিলকাকু বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, “তুমি সব বিষয়ের জন্যই কেন বাইরের কোচিংয়ে পড়ছ না দেশ? তুমি কি জানো না, তোমার জন্য কত টাকা জমা আছে?” আমি কেবল হেসেছিলাম। সেই অঙ্কের দিদিমণির কাছে নদীও পড়ত। সাধারণত বালকাবাসের ছেলেরা হয় মুখচোরা, নতুবা প্রগলভ। আমি কোনওটাই ছিলাম না। তবে নদীর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের নিবিড় বাঁধনে বাঁধতে শুরু করেছিল অন্য কারণে। এবং কারণটা বেশ মজাদার।

অঙ্কের অবসরে আমি ওর খাতায় এক একটা নির্দোষ প্রশ্ন লিখে দিতাম। অথবা কোচিং থেকে ফেরার পথে হটতে হটতে কোনও প্রশ্ন করে বসতাম। ও গলদঘর্ম হয়ে যেত তার উত্তর খুঁজতে। যেমন, এক দিন জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা, তোর কোনও বোন আছে?” ও মাথা নাড়িয়ে বলল, “উঁহু, আমি একা।” আমি বললাম, “বোন থাকলে তার নাম কী হত জানিস?” ও কিছু বুঝতে না-পেরে দু'দিকে মাথা

দোলাল। আমি বললাম, “খুব সোজা। উপনদী। নদীর বোন উপনদী।” ও খুব একচোট হেসে বলল, “হি হি, তা হলে আমার মেয়ের নাম হবে শাখানদী।” আমি বললাম, “তার আগে বিবাহ নামের একটা অনুষ্ঠান আছে, তাকে কী বলা হবে?” ও চোখে মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকল। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, “মোহনা! নদীর সঙ্গে নদের মিলনকে মোহনাই তো বলে!” খুব হাসত নদী। এক দঙ্গল পড়ুয়ার মধ্যে তখনই হয়তো আমি আলাদা এক জন হয়ে উঠেছিলাম ওর কাছে।

বালকাবাসের কাছেই গাছপালায় ঘেরা নিরিবিলি একটা পাড়ায় থাকতেন সঙ্ঘমিত্রাদি। আমাদের অঙ্কের দিদিমণি। পড়াতে শুরু করলে সময়ের জ্ঞান থাকত না। এক এক দিন অনেক রাত হয়ে যেত ছুটি হতে। নদী বলত, “এই দেশ, তুই কি আমায় এগিয়ে দিবি?” আমি ওকে রাগানোর জন্য বলতাম, “তোর আবার কাকে ভয়? আমি তো ভাবছিলাম তোকে বলব আমায় একটু এগিয়ে দি তো।” নদী বলত, “আমি কাউকে ভয় পাই না! কিন্তু বাবা-মা চিন্তা করে। আমি তখন বলি দেশেরা এগিয়ে দিয়ে যায়, চিন্তা কোরো না।” আমি মজা করে জানতে চাইতাম, “নদীর সঙ্গে যে যায় তাকে কী বলে, মাঝি?” ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত, “খাল বলে।” আমি বলতাম, “কাজটা মোটেই ভাল করলি না।” ও জানতে চাইত, “ও মা, কোন কাজটা খারাপ করলাম?” আমি গম্ভীর মুখে বলতাম, “এই যে, খাল কেটে কুমির আনা।”

এখন মনে হয় সে দিন খেলাচ্ছলে বলা কথাটাই ফলে গেছে নদীর জীবনে।

গল্প করতে করতে রাস্তাটা কখন যে ফুরিয়ে যেত! নদীর বাবা নদীবাবুর ছিল চালু ওষুধের দোকান। যে দিন উনি আগে ফিরতেন সে দিন বাড়ির গেটের কাছে অপেক্ষা করতেন। আমাদের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতেন। হয়তো জানতে চাইতেন, “কী হল, এত হাসির কারণ কী?” নদী হেসে বলত, “দেখো বাবা, দেশ বলছে আমরা নাকি হাঁটতে হাঁটতে নদিয়া পৌঁছে গেছি।” উনি বললেন, “সে কী! কেন? নদিয়া তো এখান থেকে বহু দূর।” আমি সসঙ্কোচে বলতাম, “না, সে রকম নয়, আমি বলছিলাম, নদীর পাড়া নদিয়া।” শুনে নদীবাবু হো হো করে হেসে উঠতেন।

কোচিং ফেরত দলে আমি একা নই, অন্য ছেলেরাও থাকত। তবে আমিই সেই, যে এক দিনও বাদ যেতাম না। ক্রমশ নদীর প্রচ্ছন্ন আগ্রহে ওর বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হল আমার। আর সামান্য হলেও অন্যদের। অবশিষ্ট দলের মধ্যে আমার এখনকার বন্ধুদের মধ্যে মল্ল, সজীবরাও ছিল। মল্লকে অবশ্য সহ্য করতে পারত না নদী। বলত, “তোর মুখ অমন গোমড়া করে রাখিস কেন সব সময়? দেখে মনে হয় অল্ল হয়েছে।” মল্ল প্রত্যাঘাত করে বলত, “না হলে অল্লনাশের ওষুধ বিক্রি হবে কী করে?” নদী রেগে টং হয়ে যেত, যেহেতু ওদের ওষুধ বিক্রির ব্যবসা। তবে কৈশোরের রাগ সাময়িক। রাগ, অনুরাগ, ক্রোধ, প্রীতি সবই তা-ই।

নদী দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় জন্মদিনে ওর স্কুল, কোচিংয়ের সহপাঠীদের বৈঠকে নেমন্তন্ন করেছিল। তবে অনেকেই আসেনি অনুষ্ঠানে। কারণ, সামনে পরীক্ষা। কিন্তু আমার কাছে সেটা একটা বিপ্লব। বালকাবাসে হেদিয়ে পড়া মানুষ আমি। তখনও পর্যন্ত বিয়েবাড়ি, জন্মদিন মানে জানতাম দূর থেকে আলো দেখা আর সুখাদ্যের গন্ধ পাওয়া। সেই আমাকে কেউ নেমন্তন্ন করল। নিমন্ত্রণটা পেয়ে মনে হয়েছিল সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে পৌঁছে গেছি। বন্ধুদের কেউ, মল্লই সম্ভবত, খোঁচা দিয়েছিল, “এত নাচহিস কেন? জন্মদিনে কেবল কাটতে যেতে বলেছে, বিয়েতে যেতে বলেনি!” আমি বলেছিলাম, “তোদেরও তো নেমন্তন্ন, তোদের আনন্দ হচ্ছে না!” সেই সন্ধ্যাতেই প্রথম গোলাম ওদের চিলেকোঠায়। চিলেকোঠা বলা ভুল। কাচের জানলায় ঘেরা একটা ঘর। ছব্বছ বাতিঘরের মতো দেখতে। মনে পড়েছিল, ওদের বাড়ির নামও বাতিঘর। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মেয়ের নাম নদী আর বাড়ির নাম বাতিঘর, এক মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে? সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আজও পাইনি। মনে হয় পৃথিবীতে উচ্চারিত ধ্বনির বদলে অনুচ্চারিত কথা, সোচ্চার প্রশ্নের চেয়ে নীরব জিজ্ঞাসা এবং বিক্ষোভিত অনুযোগের তুলনায় নীরব অভিমানের পালাই ভারী।

এ ভাবেই এক দিন দুম করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে এল।

অন্যদের কাছে সেটা কলেজে ভর্তি হয়ে নতুন জীবন শুরুর রোমাঞ্চ। আমার কাছে অশনি সঙ্কেত, এ বার মানে মানে পাততাড়ি গোটাতে হবে। উকিলকাকু বললেন, “হস্টেল আছে এমন কোনও কলেজে ভর্তি হতে হবে। তোমার অন্তত টাকার অসুবিধে হবে না।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “উনি কেমন আছেন?” উকিলকাকু স্নান মুখে বললেন, “উনি কে?”

“ওই যিনি এত টাকা খরচ করছেন।”

“আছেন, ভালই আছেন। কিছু বলতে হবে?”

“হ্যাঁ, একটা ধন্যবাদ জানাবেন আমার হয়ে। আর বলবেন, আর টাকার দরকার হবে না।”

“সে কী! তুমি তো এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াওনি।” মুচকি হেসেছিলাম। নিজেকে মনে হচ্ছিল সেই রকেট, যে পাক খেতে খেতে অবশেষে লম্বা একটা লাফ দিয়ে নিজের কক্ষপথে চলতে শুরু করেছে। আমি যেন তখন সেই লাফটাই দিলাম। তাতে হয় নিজের কক্ষপথ খুঁজে পাব, নয় আছাড় খেয়ে চুরমার হয়ে যাব। বিষয়টা যে হঠাৎ বলেছি তা নয়। এই কথাটা বলতে পারব ভেবে আমি বহু দিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি কেন পৃথিবীতে এসেছিলাম, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এই রহস্যটা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না।

উচ্চ মাধ্যমিকে আমার ফল তেমন একটা হল না। নদীর অবস্থাও তথৈবচ। মল্ল ভাল ফল করে দিল্লিতে স্নাতক হতে গেল। আমি একটা সাধারণ কলেজে বি এসসি-তে ভর্তি হলাম। তখনও বালকাবাসে ছিলাম। নতুন ঠিকানা পোক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে যেতে দেওয়া হয় না। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম একটা কোনও কাজ খুঁজতে। দিনে কাজ করে রাতে ক্লাস করব। তখন উদ্যম প্রচুর, শক্তি টগবগ করছে, আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। কিন্তু কিছুই মিলছিল না। তার পর এক দিন সটান গিয়ে হাজির হলাম নদীর বাবার কাছে। বাড়িতে নয়, দোকানে। তখন দুপুরবেলা। দোকান ফাঁকা। কর্মচারী ফটিক খেতে গেছে হোটেল। আমায় দেখেই ননীবাবু চিনতে পারলেন। এক মুখ হেসে বললেন, “আরে দেশ যে! কলেজ কেমন চলছে?” আমি সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললাম, “কাকু, আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।” সম্ভাষণ শুনে কেন কে জানে, বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। উনি কি ভেবেছিলেন, আমি নদীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাড়তে গেছি? তখন আমার চিন্তার ধারেকাছেও বিয়ে, ঘর, সংসার এ সব ছিল না। ননীবাবু বললেন, “বলো!” আমি কিছুই গোপন করলাম না। আমার অতীত, বর্তমানের সবটা বলে আবদার করলাম, “আপনার দোকানে আমায় একটা কাজ দেবেন?”

তাকিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোকের মুখের গাম্ভীর্য স্মিত হাসিতে গলে গেছে। তিনি তাঁর অল্প বয়স, লড়াই করে অর্থ জমিয়ে ব্যবসা, বাড়ি, বিয়ে খার গল্প শোনালেন। তার পর বললেন, “বললে বিশ্বাস করবে না, এখন আর শরীর দেয় না। কয়েক দিন ধরে আমি ভাবছিলাম, একটা বিশ্বাসী ছেলে পেলে কাজে রাখি। আর তখনই তুমি এলে। তা কাজ না হয় এখানে করবে, কিন্তু থাকবে কোথায়?” আমি বলেছিলাম, “ছেলেদের মেস আমার দেখাই আছে।”

সে দিন বিকেল থেকেই লেগে গেলাম কাজে। আমার পূর্বপুরুষের পেশা ও নেশা কী তা জানতাম না, কিন্তু বুঝলাম ব্যবসার কাজে আমি বেশ পরিশ্রমী ও গোছানো। এ দিকে আমার এই বর্তমানের কথা নদী জানত না। দিন পাঁচ-ছয় পরে কলেজের কোনও একটা কাগজে বাবার সই করাতে ভুলে গিয়েছিল বলে ও দোকানে এসেছিল। এসে আমায় দেখে পুরো হাঁ হয়ে গেল। ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করল, “এ এখানে কী করছে?” ওর বাবা মুচকি হাসলেন। আমি এক মনে খাতায় স্টক লিস্ট চেক করতে থাকলাম। ননীবাবু বললেন, “দেশ, যাবে নাকি বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে আসতে?” আমি গেলাম না। জানতাম বন্ধু যদি মালকিন হয় তা হলে বন্ধুত্ব থাকে না।

ক্রমশ কাজে ডুবে গেলাম। কলেজ করা আর হল না, কিন্তু ফার্মাসিস্ট বিষয়ে একটা সার্টিফিকেট কোর্স করে নিলাম। কাকুর বিশ্বাস ক্রমশ আস্থায় পরিণত হতে শুরু করল। এ দিকে ব্যবসাও ছুটতে শুরু করল। আমি বললাম, “আর একটা দোকান নিন কাকু।” উনি বললেন, “তোমার জন্যই এই বয়সে ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছি না।” হ্যাঁ, তত দিনে সম্পর্ক তুইতে নেমেছে। ক্রমশ গুঁর, গুঁর স্ত্রীর চোখের

মণিতে পরিণত হলাম আমি। শুধু দোকান নয়, ননী কাকুর আমানত, বিমা থেকে ব্যাঙ্কের লকার, সবতেই আমি হয়ে উঠলাম বিশ্বস্ত অনুচর, অঘোষিত সর্বসর্বা। তখন ঘন ঘন বাড়িতে ডাক পড়ত। আমি ডাক ফেরাতাম না। কিন্তু নদীর সঙ্গে দেখা হলে সেই পুরনো উষ্ণতায় কথা চালাতাম না। কথাই বলতাম না। মৃদু হাসতাম। ও প্রথম প্রথম জড়সড় হয়ে থাকত। পারতপক্ষে সামনে আসত না। তার পর নদী সহজ হয়ে গিয়েছিল। আসলে ও কারও উপর দীর্ঘ দিন রাগ করে বা বিমুখ হয়ে থাকতে পারে না। ওর নাম হওয়া উচিত ছিল প্লাবন। অবশ্য প্লাবন তো নদীরই অঙ্গ। কিছু দিন পর থেকে ফের নদীর পুরনো কথারূপ ফিরে এল। আমি কথা না বললে ও আমায় শুনিয়ে বলত, “ইশ! আমার বাবার ব্যবসা নিজের নামে করে নিল গো!” আমি তখন হেসে ফেলতাম। টুকটাক কথা বলতাম। কিন্তু যেচে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না। বিশেষ করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনও কথাভেই যেতাম না।

পরের তিন-চার বছর ব্যবসা দারুণ চলল। পঞ্চম বছরে একটা বর্ষার দিনে এমন এক ঘটনা ঘটল, আমি যার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এর আগে এক বার জনান্তিকে ননীকাকু আমায় বলেছিল, “বুঝলি দেশ, তোকে ওষুধের ব্যবসাটা বুঝিয়ে দিয়ে ভাবছি হোটেলের ব্যবসায় ফিরে যাব।” আমি জানতাম, অল্প বয়সে পুরী, দিঘায় লিঙ্গে হোটেল নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে লাল হয়ে গিয়েছিল নদীর বাবা। বাতিঘরের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি, এই দোকান সবই সে টাকায় তৈরি। বিয়ে খার পরে ওষুধের দোকানেই থিতু হন। গুঁর কথা শুনে বললাম, “আমি বলব সেটা না-করারই ভাল।” উনি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, “আপনার তখনকার বয়স আর এখনকার বয়সের মধ্যে তুলনা করে দেখুন! ওই পরিশ্রম এখন আর পারবেন না। তার চেয়ে ভাল হবে, নদীর জন্য কিছু একটা করে দিন। চাইলে যাতে সেখানে বুটিক বা কোচিং সেন্টার বা অন্য কিছু খুলতে পারে।” সে দিন আর কথা বাড়াননি তিনি। আমি ভেবেছিলাম সেই রকমই কোনও বৈষয়িক বা ব্যবসায়িক শলা পরামর্শ করবেন। একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি চলছিল। ফটিক ছাতা মাথায় খেতে গিয়েছিল। কাকু বললেন, “দেশ, তোর সঙ্গে একটা আলোচনা ছিল।” আমি তাকালাম। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ভবিষ্যতে তোর বিয়ে করার কোনও পরিকল্পনা আছে?” আমি বিন্দু মাত্র না-ভেবে বলে দিলাম, “না।” সত্যিই আমার তেমন কোনও পরিকল্পনা ছিল না। পয়সাকড়ি জমাতে পারলে বালকাবাসকে কিছু দেওয়ার আর উকিলবাবুর হাত দিয়ে যাবতীয় ঋণ ফেরত পাঠানোর ইচ্ছা ছিল। আমার মুখে “না” শুনে ননীবাবু বললেন, “যদি সত্যি সত্যি কোনও পরিকল্পনা না-ই থাকে, তা হলে একটা কথা বলাই যায়।” আমি বললাম, “সত্যিই সত্যিই কোনও পরিকল্পনা নেই।” উনি বললেন, “তা হলে আয়, সেই পরিকল্পনাই করি। আচ্ছা, খ্যাপাটে, উডনচুটি, পাগলাটে একটা মেয়েকে বিয়ে করবি?” আমি অনুভব করছিলাম, আমার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমি দূর দূর বৃকে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “সে কে?” ননীবাবু বললেন, “সে আছে এক জন, সর্ব স্বর্ণ বাতিঘরের টঙে উঠে বসে থাকে। নদীকে তোর পছন্দ হয়?”

বালকাবাসের মার্কামারা অনাথ, চালচুলোহীন, কলেজের ড্রপ আউট এবং ওষুধের দোকানের সামান্য কর্মচারী একটা প্যাঁতপেতে ছেলেকে নদীর পাত্র নির্বাচন? ননীবাবুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? আমি স্তম্ভিত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার পর জানতে চাইলাম, “কিন্তু নদী রাজি হবে কেন?” ননীবাবু তাচ্ছিল্য সহকারে বললেন, “ও নিজের বিষয়ে কিছু জানে, না সিদ্ধান্ত নিতে পারে?” আমি বললাম, “আমার মনে হয় না যে আমি ওর উপযুক্ত। আপনি আগে ওর সঙ্গে কথা বলুন।” ননীবাবু বললেন, “সে তো বলবই। কিন্তু সে কী আর নিজের মধ্যে থাকে! কখন কোন তালে থাকে নিজেই জানে না। আমি তো তাই বলি, নদীর কথা যদি তো।”

পাহাড়ী নদী যেখানে বাঁপ দেয় অভিধানে তাকে বর্না বলে। সমতলের নদী কোথায় কখন যে বাঁক নেয় তার হদিস আগে থেকে কেউ দিতে পারে না। বাতিঘরের নদীও তা-ই, কখন যে সে কোথায় মজবে আর কবে কার উপর খাপ্পা হবে, তার কোনও ভবিষ্যদ্বাণী হয়

না।

সে দিন ননীকাকু ওই বিষয়টা নিয়ে আর কথা বলেননি। পরের কয়েক দিনেও না। সম্ভবত তখন গৃহবিপ্লব শুরু হয়েছিল। এই প্রস্তাব আমার মধ্যে তেমন কোনও প্রভাব তৈরি করেনি। কারণ, আমি নিশ্চিত ছিলাম, নদী সরাসরি খারিজ করে দেবে তা। ওর রুচি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি জানি। কেবল ননীকাকুর কথা আমাকে একটু হলেও আত্মবিশ্বাসী করেছিল। আমি মামুলি কর্মচারীর থেকে এক চুল হলেও এগিয়ে, এটা মনের মধ্যে তির তির করা ভাল লাগার জন্ম দিচ্ছিল। আর একটা স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল, নিজে কিছু করার স্বপ্ন। তবে তার জন্য পুঁজি দরকার। কাজ করার পরও পুঁজি দরকার। উকিলকাকুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। যে দরদি ভদ্রলোক আমার দায় বহন করেছেন তাঁর মুখ দেখার আগ্রহও ছিল না আমার!

কাজের অবসরে তাও মনের কোণে কল্পনার মেঘ জমত, এই প্রস্তাবটা শুনে নদী কতটা খেপে গেছে তা ভাবতাম। তখন আমি খুব সচেতন ভাবেই ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার যে কোনও সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকতাম। আমায় নানা দরকারে ওদের বাড়ি যেতে হত। কাকিমা অর্থাৎ নদীর মা (নদীর সঙ্গে ঠাট্টা করে আমি যাকে মহানদী বলতাম) খুবই স্নেহ করতেন। মাত্র বছর পাঁচকে আমি তাঁদের পরম ভরসার হয়ে উঠেছিলাম। বাড়ির ল্যান্ডলাইন ফোনে আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলেই কাকিমার বেশি সময় কাটত। এবং সে সব কথা বলার সময় আমার উপস্থিতি উনি গ্রাহ্যই করতেন না। এমনও হয়েছে, নগদ টাকা আনতে কাকু আমায় বাতিঘরে পাঠিয়েছেন। নদী টাকা গুনে আনবে, আমি বসার ঘরে অপেক্ষা করছি। সেখানেই এক কোণে ফোনে বক বক করতে করতে কাকিমা বলছেন, “বিয়ে? আমার মেয়েকে তো আমি চিনি। দু’দিনে শ্বশুরবাড়ি উল্টেপাল্টে দিয়ে ফিরে আসবে। আমার তো মনে হয় ঘরজামাই হতে রাজি কোনও শাস্ত্র, ভদ্র গোছের ছেলে পেলে তাকেই বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসি...” কে জানে, ননীবাবুও তেমনটা ভাবেন কিনা! না হলে তাঁদের কক্ষপথে আমি তুচ্ছ গ্রহণু ছাড়া তো অন্য কিছু নই।

বেশি দিন পালিয়ে বেড়াতে পারলাম না। হঠাৎ এক দিন বিকেলে আমায় পাকড়াও করল নদী। সে দিন ওষুধের দোকানে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমি দুপুরটা বালকাবাসের নানা পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলাম। নদী ওর সহস্র এক কর্মসূচির কোনও একটা সেরে ফিরছিল। আমি অবশ্য ওকে আগে দেখতে পাইনি। হঠাৎ দেখি কে পিঠে একটা চাপড় মেরে বলছে, “কী খবর?” ঘাড় ঘুরিয়ে নদীকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। বুঝেছিলাম, ভিতরে ভিতরে ঘামছি, তোতলাচ্ছি ও প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করছি। নদীই ফের জিজ্ঞেস করল, “কী বদমায়েশি শুরু করেছিস?” আমি প্রায় ততলে বলেছি, “কিসের বদমায়েশি?” নদী থেমে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, “এই যে আমার বাবাকে ভুজুভাঙ্গু দিয়ে বশ করে ফেলেছিস!” আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বলেছি, “না, না, বশ করিনি, উনিই আমার বস।” নদী জানতে চেয়েছে, “তুই বশ করিসনি তো বাবা অমন অদ্ভুত প্রস্তাব আনল কী করে?” আমি কিছু না-জানার মতো করে জিজ্ঞেস করলাম, “কোন প্রস্তাব?”

“তুই জানিস না, তা-ই না? সানাই বাজবে, মাইক বাজবে, টোপার কিনতে হবে!”

“তাই? কার জন্য নদী?”

“কার জন্য? তোর পিতৃদেবের জন্য।”

“আমি তো তাকে চিনি না।”

“চিনিস না তো ভাল কথা, বিয়ে বিয়ে করছিস কেন?”

“আমি মোটেই বিয়ে বিয়ে করিনি।”

“আমার পিতৃদেব জোর করে তোর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, না?”

আমি উত্তর না-দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়েছি। নদী একটু থেমে বলেছে, “তা অবশ্য অসম্ভব নয়। ননী চাটুজ্জ লোকটা ওই রকমই। আমার মনে হয় মা-ই বাবার মাথাই এই বুদ্ধিটা ঢুকিয়েছে।”

“খুব খারাপ বুদ্ধি, একদম জঘন্য।”

“হতচ্ছাড়া! জঘন্য প্রস্তাব তো না বলে দিসনি কেন?”

“আমি কেন না বলতে যাব? আমি তো জানতামই তুই না বলে দিবি। মাঝখান থেকে খামোকা কেউ মালিককে চটায়!”

“বাহ! চমৎকার। সব আমার ঘাড় ভেঙে হবে। এখন আমি যদি কিছুই না বলি তা হলে কী হবে?”

“আমি কী জানি! আমি কাকুকে না বলতে পারব না।”

“আমিও বাবাকে না বলতে পারব না।”

“আশ্চর্য! তুই তো কাকুর সব কথাতেই না বলে দিস।”

“দেব না কেন, অপছন্দের কথা বললে না তো বলবই।”

“তা হলে এখন কেন বলছিস না?”

“বলছি না, কারণ প্রস্তাবটা অপছন্দের নয়!”

আমি হাঁ করে হতভম্বের মতো নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কথা ভুলে গেলাম। একটা কাঁচা হলুদ রঙের কুঁড়ি পড়েছিল ও। চোখ দুটো বাধ্য। কাঁধ পর্যন্ত চুল। রোগা ছিপছিপে চেহারা। নদী অবশ্য কথা থামল না। বলে চলল, “পাত্র হিসেবে অবশ্য তুই জঘন্য। ভাল করে কথা বলতে পারিস না, মেয়েদের পটাতে পারিস না। তাও ভাললাম, অচেনা কোনও ছেলেকে বিয়ে করা আমার কন্মো নয়। সংসার করাও আমার দ্বারা হত না। এখন তোর যদি সময় হয় তো দেখ। তুই তো আবার দোকান ছাড়া কিছু বুঝিসই না!”

আমি সে দিন আবেগের কাছে হার মেনেছিলাম। অনেক ক্ষণ কথা বলতে পারিনি। ভিতরে ভিতরে ফোঁপাচ্ছিলাম। একটু পরে দেখলাম নদীরও প্রগলভতা উধাও। ও আমার হাতটা ধরল। দেখলাম, ওর চোখ ছিল ছল করছে। আবেগের মেঘ ভিড় করেছে ওর চোখেও। আমি কোনও ক্রমে গলা পরিষ্কার করে বললাম, “আমি কালই ওষুধের দোকানের কাজ ছেড়ে দেব।” নদী ভুরু কুঁচকে বলল, “কেন?” বললাম, “নিজে ব্যবসা করব। আমার জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারবি, নদী? এই ধর, মাস ছয়েক!” নদী দু’হাতের মুঠোর দশ আঙুলে আমার দশটা আঙুলকে নিষ্পেষণ করে বলল, “আমি অল্প কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারব। এক দেশের জন্য একটা নদী আস্ত একটা জীবন অপেক্ষা করবে। তাতে হবে না?”



শীতকালে টানের সময়ে নদী যখন শুকিয়ে যায়, লোকে তখন শুকনো ডাল, কাঠকুটো দিয়ে চলার উপযোগী একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাকে সেতু বা সাঁকোও হয়তো বলা যায় না, তবে নদী পারাপারের কাজ চলে যায়। আমার হঠাৎ গড়ে ওঠা কেটারিং সার্ভিসও তেমনই এটা গুটা জুড়ে কাজ চালানোর মতো করে মাথা তুলল। নদীই উৎসাহী হয়ে তার নাম ঠিক করে দিল ‘খেয়া’। আর সেই খেয়া নৌকার মাঝি হয়ে আমি শুরু করলাম অক্লান্ত পরিশ্রম।

সে যেন অসম্ভবের সঙ্গে লড়াই। ছোট থেকে চষে বেড়ানোর সুবাদে এ তল্লাটে চেনাশোনা কিছু কম ছিল না। এ বার সমস্ত চেনা লোকের কাছে গিয়ে আলাপ জুড়লাম। কাকু, আপনাদের না এ বার বিয়ের রজতজয়ন্তী? রজত নয় তো কি, কুড়ি? অনুষ্ঠান তো করবেন? অল্প কিছু লোক খাওয়াবেন কি? হ্যাঁ রে অমুক, তুই যে চাকরি পেলি, তার জন্য বন্ধুদের খাওয়াবি না? আর আত্মীয় স্বজন, তারা কি দোষ করল? হোটেল কেন যাবি, বাড়িতে ডাক, বাড়িতে, এমন মেনু কর যে লোকে ধন্য ধন্য করবে। কী গো দাদু, তোমার নাতিনি যে ডাক্তার হল তার জন্য তোমার বন্ধুদের খাওয়াবে না? লাহাবাবুর ছেলে দাঁতের ডাক্তার হয়েছে বলে, উনি তো এই এতটা কজি ডুবিয়ে খাওয়ালেন বন্ধুদের!

এ সব কথাই বিশেষ কাজ হয় না, অল্প স্বল্প হয়। সেই অল্প দিয়েই খেয়া তেলতে শুরু করলাম। বড় বড় নদ ও নদী জন্মের সময় কী থাকে? নালা হয়ে থাকে, নালা। তখনকার মতো আমার ভাড়া বাড়িটাকেই করেছিলাম হৈশেল। সাব্বুনাদিকে আমি চিনতাম। এখানকার একটা মেসে রান্না করেন। ওঁর রান্নার হাত চমৎকার।

আমাদের এক বন্ধু ওই মেসে থাকত। ওর চাকরি পাওয়ার ভোজে চেটে পুটে খেয়ে এসেছিল। সেই সান্ত্বনাদিকে ধরলাম। নতুন নতুন পদ রৈঁধে নাগরিকদের চমকে দেবে? সান্ত্বনাদি এক কথায় রাজি হল। অন্য সব জায়গার মতো আমাদের মহান্নাতেও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে খাবার পরিবেশনের কাজ করে দৈনিক কাজের চুক্তিতে। তাদের পেতে বেগ পেতে হল না। এই ভাবে ঠিক খেয়া নয়, ঠেকনা দেওয়া ভেলার মতো জলে নেমে পড়লাম আমার কেটারিং সংস্থা নিয়ে। প্রথম দু'মাসে কাজ পেয়েছিলাম মোটে পাঁচটা। এর মধ্যে কলেজ শিক্ষক বকুলদির বাড়িতে সরস্বতী পূজোর পরের দিন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পুনর্মিলন উৎসবে আমাদের কাজ সাড়া ফেলে দিল। বকুলদি আমার উপর সবটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি সাবেক কালের খাবার কলা পাতায় সাজিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে মেনুর অভিনবত্ব থেকে স্বাদ— সবাই প্রশংসা করল। তার পর কাজ অনেক বেড়ে গেল। মাস ছয়েকের মধ্যেই নতুন ঘর ভাড়া নিলাম। সেখানে সংসার পাতা হবে। নদী নিজে এসে সরেজমিনে সব দেখে গেল। আমি সামান্য খুঁত খুঁত করছিলাম ছিটকিনি নিয়ে। ভেবেছিলাম পরে তা ঠিক করে নেব কোনও ছুতোর মিস্ত্রিকে দিয়ে। ইতিমধ্যে বিয়ের দিন নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হল। কিন্তু সেই আলোচনা শুরু হতেই ননীবাবুর বৈঠকখানা থেকে আমি, নদী উঠে পড়তাম সন্ধ্যাে। ননীবাবু এর মধ্যেই এক দিন রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন ঘোষণা করে দিলেন। বাতিঘরে সে দিন অনেকে এল। সে দিন নদীর সাজ দেখে আমার চোখ বলসে গেল। সাদা আর লাল বাতির আলপনা আঁকা শাড়ি, পোড়া লাল রঙের ব্লাউজ, কপালে এন্ড বড় লাল টিপ, চোখের দু'কোলে কাজল। চোঁটে লিপস্টিকের গাঢ় প্রলেপ। আগে কখনও এ ভাবে সাজতে দেখিনি ওকে। বার বার মনে হচ্ছিল, ওর পাশে বড়ই বেমানান আমি। জানি না কেন, সে দিন প্রথম মন খারাপ হয়েছিল এই জন্য যে, আমার দিকের কোনও আত্মীয় স্বজন নেই। বন্ধুদেরকেও নিমন্ত্রণ করিনি। কারণ, এটা তো ননীবাবুর আমন্ত্রণের অনুষ্ঠান। আমি যে দিন অনুষ্ঠান করব সে দিন বন্ধুদের বলব, এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সেই শুভ দিন আর এল না।

ঝড় নিজের মতো ওড়ে, ভাসে, ভাঙে আর তাণ্ডব করে। ঝড় যখন নদীর উপর আসে তখন নদী পাগলিনী হয়। তখন সামনে যা পায় তা তখনই করে লন্ডলন্ড করে দেয়। আমার চেনা নদী অচেনা ঝড় হয়ে উঠতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় নিয়েছিল।

রেজিস্ট্রি বিয়ের আগে-পরে আমি নদীদের বাড়ি খুব দরকার বা আমন্ত্রণ ছাড়া যেতাম না। ব্যবসার চাপ বাড়ায় ফোনও কমে এসেছিল। রেজিস্ট্রির পর চতুর্থ দিনে মোটরসাইকেলে যেতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, ফুটপাথ দিয়ে নদী একা হেঁটে চলেছে। ওর স্বাভাবিক গতিতে নয়, ধীরে। বেশ ধীরে। আমি রাস্তার এক পাশে বাইক দাঁড় করিয়ে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বললাম, “এ নদী কেমন নদী?” দেখলাম, আমায় দেখে ওর মুখ আদৌ উত্তেজনা ছলবল করে উঠল না। বরং মনে হল চিনতেই পারছে না। যেন কষ্ট করে চিনতে হচ্ছে। আমি আবার বললাম, “এখন তো জোয়ারের সময় নয়, এ দিকে কোথায় যাচ্ছ?” হ্যাঁ, তুমি করেই বলেছিলাম। কারণ, রেজিস্ট্রি বিয়ের দিনই নদীর পিসি সুরঙ্গনা আমাদের তুমি তুমি করে কথা বলিয়ে নিয়েছিলেন। শর্তও করিয়েছিলেন, তুমি ছাড়া বিয়ে অসম্পূর্ণ। সে দিন তুমি করে বলতে গিয়ে আমরা খুব এক চোট হেসেছিলাম। কিন্তু রাস্তায় সেই কথার কোনও উত্তর দিল না নদী। আমি তখনও ছিলাম ঠাট্টার মেজাজে। বললাম, “ও, তোমায় কেউ বলেনি না, কালরাত্রি কেটে গেছে!” তখন নদী কর্কশ ভাবে, “না, কালরাত্রি কাটেনি!” বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সেই মুহূর্তে আমার একটুও রাগ হয়নি। আমি নিশ্চিত ছিলাম, ননীবাবু বা তার স্ত্রী, কারও উপর রাগ করে থেপে লাল হয়ে নদী শুরু করেছে তার ক্রোধ সফর। আশা করছিলাম, রাতে বা পরের দিন ও নিজেই ফোন করে প্রণালভ হবে। অথবা বলবে, “আমার সঙ্গে কিন্তু রাস্তায় তোমার দেখা হয়নি।” কিন্তু সেই ফোনটা এল না। আমিই যেচে মান ভাঙানোর জন্য ফোন করলাম। ফোন বেজে গেল। দু'ঘণ্টা পর ফের ডায়াল করলাম। ফোন ধরল না কেউ। পরের দিন ল্যান্ডলাইনে চেষ্টা করলাম। কথা হল না। দু'দিন পর ননীবাবু ফোন করলেন, “দেশ, নদী যদি কোনও পাগলামো করে তা হলে তুই পাত্তা দিবি না।” জানতে চাইলাম, “এখন বিষয় কী?” ওর বাবা

বললেন, “পাগলামোর কোনও বিষয় হয় না দেশ, কোনও ওষুধও হয় না। পাগলামোটা একটা বিষয়।” আমি হেসে ফেললাম। বললাম, “আমার ফোন তো ধরছেই না।” ননীবাবু বললেন, “এখন ফোন ধরছে না, কালই হয়তো দেখবি তোকে খুঁজতে পাতালে যেতে হলে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। তুই একদম পাত্তা দিবি না ওর কথায়, বুঝলি?”

পরের দিন, মানে ঠিক পরের দিনই যে কথাটা যে এ ভাবে ফলে যাবে তা জানতাম না।

সে দিন বড় একটা কাজ ছিল। একটা নামী সংস্থার ওষুধ বিপণনকারীদের বনভোজন। আশি জনের ব্যবস্থাপনা, কিন্তু সতেরো রকম পদ তৈরি করতে হবে দুপুরের মধ্যে। কাঁচা বাজার করাি ছিল। চড়ুইভাতির স্পটে রান্নার এক জন হেল্লারকে নিয়ে সে সব পৌঁছে দিয়েছি কী দিইনি, সান্ত্বনাদির ফোন।

“দাদাবাবু, তুমি কোথায়?”

“আমি স্পটে, কেন?”

“বৌদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।”

সান্ত্বনাদি তখন মশলাপাতি গুঁড়ো করছিল আমাদের হেঁশেলে। বুঝলাম নদী সেখানে আমায় খুঁজতে গিয়েছে। বললাম, “বলো আমি বিকেলে ওর বাড়ি গিয়ে দেখা করব।” সান্ত্বনাদিকে দ্রুত কাজ সেরে স্পটে চলে যেতে বলে আমি মাছ, মাংস কেনার জন্য বাজারে রওনা হলাম। একটু পরে স্পট থেকে আমার সেই সহকারী রাজু ফোন করল, “দাদা, আপনি কোথায়?”

“বাজার করছি। কেন? ডেকরেটার্সের মাল যায়নি?”

“সে সব এসে গেছে। দাদা, বলছি কী, বৌদিমণি এখানে এসেছে। বলছে খুব দরকার আপনার সঙ্গে।”

“আমি তো বাজার না করে যেতে পারব না। ফোনটা ওকে দাও।”

ফোন নিল না নদী। আমি ওর ফোনে ফোন করলাম। সেটা বেজে গেল। একটু পরে দেখি নদীই ফোন করছে। তখন আমি কাতলা মাছের পিসি গুলছি। তাও ফোন ধরলাম,

“বলো।”

“এখন কোথায়?”

“আমি বাজার করছি। মাছ কিনছি।”

ফোন কেটে দিল। কয়েক নিমেষের মধ্যে মাছ বাজারেই এসে উপস্থিত হল। চুল উল্লেখ্যক্কে। দেখে মনে হচ্ছে সারা রাত ঘুমোয়নি। বললাম, “এ কী চেহারা করছে?”

“আমার একটা দরকার আছে।”

“আমি বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে কথা বলব।”

“আমার এখনই দরকার।”

“আমি এখন কাজ নিয়ে যে বড্ড ব্যস্ত নদী।”

আমি মাছের বাহন্নটা টুকরো পর্যন্ত গুলে গুলে ছিলাম। তার পর দেড়শোটা পর্যন্ত গুলে ব্যাগে ভরতে বলে সরে এসে বললাম, “এত জরুরি কী কথা? বলো।”

“তুমি আমায় একটা সাহায্য করবে?”

“কী হয়েছে বলো।”

“তার আগে বলো, কেউ ভুল করলে কী হয়?”

“কী আর হবে, দুঃখ প্রকাশ করে।”

“আর ভুলটা?”

“সেটা সংশোধন করে নেওয়া গেলে তা-ই করে নেয়।”

“আমি ভুল করেছি।”

“বেশ তো, শুধরে নিয়ো। কিন্তু এখন কেন?”

“আমি সই করে ভুল করেছি। ওটা মিহিমিছি।”

“বেশ।”

“তা হলে ওর কোনও দাম নেই, ঠিক তো?”

“কিসের কথা বলছ তুমি?”

“বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের ফর্মে সই করে ভুল করেছি।”

“কিন্তু সেটা তো শুধু তোমার আর আমার সইয়ের বিষয় নয়, এখন আইনের বিষয়। সে সব নিয়ে পরে কথা বলা যায় না?”

“কথার তো দরকার নেই, সইটা ভুল করে দিয়ে ফেলেছিলাম সেটাই জানানোর ছিল।”

বলে গট গট করে ঝড়ের মতোই চলে গেল। আমি ঘড়ি দেখে

বুঝলাম, সময়ের মধ্যে খাবার পরিবেশন করতে হলে আমায় দশ হাতে কাজ করতে হবে। আমি সেই চেষ্টায় ডুব দিলাম।

তার পর থেকে আমি যেচে আর ওদের বাড়ি যাইনি, ওকে ফোনও করিনি। বরং ও-ই দফায় দফায় এসে হাজির হয়েছে। দাবি একটাই, সমঝোতা বিচ্ছেদে সম্মত হতে হবে। অন্য দিকে ওর মা ফোন করে করুণ গলায় বলেন, “দেশবাবা, তুই ওই পাগলির কথায় কান দিস না। ওর মাথা থেকে ভূত নামলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।” ননীবাবুও দু’দিন অন্তর ফোন করেন, “আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি না। ও কী ভাবে, ও-ই জানে। কিন্তু আমি ওকে আর স্বেচ্ছাচারী হতে দেব না। তুই কিন্তু অভিমান করে সহি করে দিবি না দেশ। তোর মাথা ঠান্ডা, তোর ওপর আমার অনেক ভরসা।” আমি জানি না, নদীর দুই তীরের মাঝখানে আর কত দিন পেড়লাম হয়ে ঝুলতে পারব!

পরিশেষে সেই অচলাবস্থাতেই সিলমোহর পড়তে চলেছে। নদীর প্রস্তাব মতো, আজ রাতেই বাক্য বিনিময় শেষ হবে আমাদের। তার পর শুরু হবে স্বেচ্ছা নির্বাসন পর্ব। হয়তো তা অনন্ত, নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত। হয়তো আমি জানতেও পারব না, কেন নির্বাচিত হলাম আর কেনই বা প্রত্যাখ্যাত হলাম! অবশ্য আমার জীবনের রেখাও তো সেই রকমই। জন্মের পরেই বিসর্জন। আদরের পরিবর্তে পরিত্যাগ। কে যেন বলেছিল, জন্ম বিয়ে আর মৃত্যু এক সূত্রে বাঁধা থাকে? কেউ বলেনি? তা হলে আমিই বলছি। আমার ক্ষেত্রে, অন্তত আমার ক্ষেত্রে জন্ম, বিয়ে আর মৃত্যুতে একটা বিশেষণই সর্বজনীন, ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান। বিদায় নাও। চলে যাও হে, চলে যাও। ঘ্যান ঘ্যান করো না। ভাবতে ভাবতে কখন যেন পৌঁছে গেছি বাতিঘরের দরজায়। বড় গেট, পিছনে লন। তার পর দোতলা বাড়ি। তার চিলেকোঠার ঘর কাচবাধানো, গোলাকার। ঠিক বাতিঘরের মতো। এক কালে বাতিঘরের মতো আলোও লাগানো হয়েছিল। কেন? পঞ্চদশ পথিককে দিশা দেওয়ার জন্য। এখন আর তা জ্বলে না। এখন তাই পথিক থেমে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের অন্ধকারেই হারিয়ে যাবে। কেউ তার খোঁজ করবে না।



ইশকুলে পড়ার সময় বেশ কয়েক বার আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে বার ক্লাস ফোর বা ফাইভে পড়ি। একবাস ভর্তি পড়ুয়া তখন ঘুরছি বিষ্ণুপুরে। দেখি একটা সাইকেল রিকশায় মাইক লাগিয়ে এক জন বলে চলেছেন, “অদ্য শেষ রজনী! অদ্য শেষ রজনী! আর এই বিদায় রজনীর সমাপ্তি সন্ধ্যায় আপনারা দেখবেন...” শুনে বুঝলাম, সেটা যাত্রা পালার প্রচার। কোনও এক ক্লাবের উদ্যোগে যে সব যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে তার অন্তিম বিন্দুকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য লোক ডাকা হচ্ছে। ওই প্রচারের ভাষা মনে গেঁথে গিয়েছিল। তার পর থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের শেষ দিনটা এলে মন ভারী হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় ওই কথাটা অগুরণিত হত, “অদ্য শেষ রজনী”। সেই ফিকে হয়ে যাওয়া স্মৃতি ফিরে এল নদীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। একটা দীর্ঘ সফর। আজই সেখানে দাঁড়ি টানতে হবে। আজ সারা রাত হাসপাতালে থাকার পর আমরা আলাদা হয়ে যাব। সেখানে আইন কোন ছাড়! আইন তো কাগজ। আর বিচ্ছেদ তো বাস্তব। তবে জীবন তো থেমে থাকে না। হয়তো সে খুঁজে নেবে কোনও সঞ্জীবনী।

আমি একাদশে পড়ার সময় একটা আলাদা খাতা বানিয়েছিলাম। না, কবিতার খাতা নয়, প্রেমপত্র লেখার খাতা। বালকবাসের একঘেয়ে জীবনে সেটা ছিল আমার কাছে মুক্তির আকাশ। আমি এক কাল্পনিক নারীকে উদ্দেশ্য করে লিখে যেতাম মনের অলিগলির কথামালা। ক্রমশ সেই কল্পিতা হয়ে উঠছিল বাস্তবের এক জনেরই প্রতিমূর্তি। যে দিন আবিষ্কার করলাম যে আমার সব লেখা নদীতে গিয়ে মিশছে, সে দিন

চমকে উঠলাম। বলা যায়, রে রে করে উঠলাম নিজের প্রতি। নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কে? তুই তো বালকবাসের পোকা। তোর না আছে রূপ, না আছে গুণ, না আছে বংশ পরিচয়। তখন নিজেকে পরামর্শ দিলাম, ওরে বাঁধ দে। নদী মানেই তো বাঁধের বাঁধন। তখন তা-ই করেছিলাম। সঙ্ঘমিত্রাদির কোচিংয়ে, রাস্তায় সাবলীল বন্ধুত্ব। আর নিভুতে কলমের কাছে আত্মসমর্পণ। যদিও আশ্রমিকদের জীবনে হল্লা আছে, শৃঙ্খলাও আছে, শাস্তি পাওয়া আছে, অনুগ্রহ পাওয়াও আছে, কেবল নিভুত অবকাশ নেই। তাও কখনও কখনও মনের আবেগ ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, নদীর বাঁধ ছাপিয়েও কি এক বার দু’বার ছলাৎ ছল শোনা যায় না? তখন ওই ভাবে সামলেছিলাম নিজেকে।

আজ রাত শেষ হলে পাকাপাকি নদীকে বিদায় জানাতে হবে। কী করে তা পারব? ফোন থেকে ওর নম্বর মুছে ফেলব? অন্য কোথাও গিয়ে ব্যবসা খুলে বসব? জানি না।

দরজায় এসে দাঁড়াতেই মৌর্যদা গেট খুলে দিল, হর্ন পর্যন্ত দিতে হল না। লোকটা সর্বক্ষণ এত সতর্ক থাকে কী করে জানে! সম্ভবত আমি এক মাত্র লোক যার এই দরজা পেরোতে সব থেকে বেশি সময় লাগে। মৌর্যদার সঙ্গে নানান কথা হয়। সব থেকে বেশি হয় তার বাগান পরিচর্যা নিয়ে। আজও চওড়া হাসি হাসল মৌর্যদা। এই নিয়ে পর পর তিন রাত বাতিঘরে এলাম আমি। মৌর্যদাও জানে, কাল বা পরশু বাড়ির মালিক বাড়ি ফিরবে। “বাবু এসে চমকে যাবে জানো, পঞ্চমুখী নীলকণ্ঠ ফুলের তেজ দেখলে অবাক হয়ে যাবে!” নিজের জগাখিচুড়ি ভাষায় আমায় বুঝিয়ে দিল সে। আমি শুনলাম, বুঝলাম না। বুঝলাম না কেন এই ফুলের নাম অপরাজিত। জানলাম না, এই ফুলের জন্যই ননীবাবু অপরাজিত কিনা!

নদীর মা আমায় দেখলে সব সময়ই কান ঝুঁয়ে যাওয়া হাসি উপহার দেন। নীলমাদিকে খেতে দিতে বললেন। আমার গলা শুনে নদী ওর ঘর থেকে তড়াক করে এসে হাজির হল। বলল, “দেরি করলি কেন?” ঘড়ি দেখে বুঝলাম, দেরি হয়নি। মুখে বললাম, “হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল একটু।” নদী বলল, “একটু নয় অনেকখানি,” তার পর আমার সঙ্গেই খেতে বসল। গলা নামিয়ে বলল, “মা বলছে, তোর বাবা ভাল আছে তো রাতে থাকতে হবে কেন? আমি বললাম, এটাই নিয়ম। তোকে যদি বলে তা হলে তুইও তা-ই বলিস, বুঝলি হাদারাম?” আমি শাস্ত ভাবে মাথা নাড়লাম। নদী তাড়া দিয়ে বলল, “তাড়া তাড়ি খেয়ে নে, একেই তো এলি দেরি করে!” আমি এ বার না-বলে পারলাম না, “তুই কি ট্রেন ধরবি নাকি?” নদী চটজলদি বলে দিল, “কী করে ধরব, যা দেরি করাচ্ছিস! এই জন্যই আমি ট্রেন মিস করি,” তার পর ফের তাড়া দিয়ে বলল, “তাড়া তাড়ি খা হতভাগা, কত রাত হয়ে গেল দেখছিস, আমার অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে!”

কেন জানি না, একটা অজানা আশায় দূলে উঠল মনটা। মনে হল, অসম্ভবও তো হয়। যা ভাবা যায় না তা ঘটে বলেই তো জীবন এত আকর্ষণীয়। হয়তো এই অন্তিম রজনী আমার ও আমাদের জীবনে নতুন পথ চলার সূচনা করবে। নদী হয়তো অন্য রকম কিছু ভেবেছে। কোনও নতুন পরিকল্পনা। বা জনসেবা। খুব চ্যালেঞ্জিং কিছু। সেখানে নতুন খাতে বইতে শুরু করবে নদ ও নদীর সম্মিলিত ধারা। কিন্তু তা সম্ভব কি? তার থেকেও বড় কথা, তা অসম্ভব কি?



সেই একই রকম উদ্বিগ্ন অথচ সংযত মানুষজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রয়েছেন চার পাশে। এই একই রকম না-ঠান্ডা না-গরম পরিবেশ। মনে হয় উষ্ণতার মতো এখানকার ছবিটাও সব সময় এই রকম থাকে, কেবল মুখগুলো বদলে যায়। আমরা আজ আর এই ঘরে ঢুকলামই

না। বাইরের বাগানের মাঝখানে মাঝখানে গাছ। সেই গাছের গোড়া বাঁধানো। এমন ভাবে বাঁধানো যাতে গাছও বাড়তে পারবে, আবার লোকজনও বসতে পারবে। গত দিন এখানেই ভোরের আলোয় টগর ফুটতে দেখেছিলাম। আজ সেই রকমই একখানা মঞ্চে গিয়ে বসলাম আমি আর নদী।

কোনও কোনও দিন এমন হয় যখন কথা বন্ধ করা যায় না। সারা শরীর থেকে কথা ফেটে বেরোতে থাকে, বাঁধ দেওয়া যায় না। মুখোমুখি বসার দরকারও হয় না তখন। আবার কোনও কোনও দিন সাজিয়ে গুছিয়ে বসলেও কথার ফুল ফোটে না। কথা যা হয় তা নিছক কথার কথা। আজ নদী একটু হলেও সাজগোজ করেছে। সাদা রঙের কুর্তি, ডেনিম। আমার কেন যেন মনে হয়, সাদামাটা পোশাকেই ওকে সব থেকে ভাল মানায়। কাল অথবা পরশু নদীবাবুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে, জিজ্ঞেস করে সেটা শুনলাম। সামনের সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় আসতে পারে, তা নিয়ে দু'চারটে শুকনো কথাও হল। আমি বলতে গিয়েও উচ্চারণ করতে পারলাম না যে, এই কয়েক ঘণ্টাই আমাদের যৌথ জীবনযাপনের শেষ পুঁজি। নদী এক বার জিজ্ঞেস করল, “তোর ওই ব্যাগে কী রয়েছে? পেটটা উচু হয়ে আছে।” সাধারণত আমার সঙ্গে ব্যাগ থাকে না। থাকলেও তার পেট উচু থাকে না। বললাম, “বেশি কিছু না, আমার সংসার।” নদী হেসে বলল, “এক মুঠোয় সংসার।” আমি হেসে বললাম, “হ্যাঁ, ঝুপ করে নদীতে ভাসিয়ে দেব।” ব্যস, আবার হৃদ কেটে গেল। আমার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করি, আমায় কেন ভাসিয়ে দিলি তুই? কিন্তু তার বদলে যা জিজ্ঞেস করতে পারলাম তা হল, “তোর সত্তরতম জন্মদিনে কোথায় বেড়াতে যেতে চাস?” নদীর ভুরু কঁচকে গেল, বলল, “এত কিছু থাকতে সত্তরতম জন্মদিন কেন?” বললাম, “কাগজে পড়লাম, ব্রিটেনের রানির সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে কত সব কাণ্ড হচ্ছে।” নদী বিরক্ত হয়ে বলল, “সত্তরতম জন্মদিন নয়, ঠাঁর এখন ছিয়ানব্বই বছর বয়স। যা পালন করা হচ্ছে তা হল ঠাঁর সিংহাসনে চেপে বসার সত্তরতম বছর।” আমি সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, “ইশ, খেয়াল করিনি। আমায় তো নেমস্তন্ন করিনি।” নদী অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, “তোকে আর কে নিমন্ত্রণ করে! নিজের বিয়েতেই যেতে পারলি না।” আমি সপ্রতিভ সাজার চেষ্টা করে বললাম, “যারা যোদ্ধা তারা নিজে হাজির না থাকলেও বিয়ে হয়ে যায়, জানিস তো? এই রকম একটা গল্প আছে পাহাড়ি রূপকথায়।” নদী ভুরু কঁচকে বলল, “আবার গল্প বানাতে বসলি।” হেসে ফেললাম। কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। নদী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল।

এখন আকাশে নিকষ অন্ধকার। ইতিউতি আলোর স্রোতকে ঢেকে রাখছে হাসপাতালের বড় বড় ভবনগুলো। এই তিন রাতে বুঝলাম, আলোয় আলোয় আকাশ ঢেকে দেওয়ার ঔদ্ধত্য ‘সময়’ কর্তৃপক্ষ করে না। রাতকে তারা আলোর চাদরে ঢেকে দেওয়ার অসভ্যতা করে না। এখানে রাত তাই পেলব। এই নরম অন্ধকারে কুঁড়িগুচ্ছ ফুল হয়ে উঠতে পারে। তাকিয়ে দেখলাম আমার থেকে দু’হাত দূরে কাঠটগর গাছটায় কুঁড়ি এসেছে কি না। এই কুঁড়িগুলোকে দেখতে ভোরী মাথা দেশলাই কাঠির মতো। হয়তো তাদেরকেও কেউ প্রশ্ন করে, তোমাদের মাথা ভারী কেন? তারাও হয়তো অসহায়ের মতো বলে, এতে আমার সংসার রয়েছে যে! সেই সংসারও পাপড়ি, রং, গন্ধ, পরাগ রেণু মাথার পর ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি খায়। না হয় আমারটাও খাবে। এতে আফসোসের কী আছে!

হঠাৎ হাতে চাপ পড়তে দেখি নদী ওর মুঠোয় আমার মুঠো নিয়ে জোরালো একটা চাপ দিচ্ছে। তা হলে ও কি অনেক কিছু বলতে চেয়ে পথ হারাচ্ছে! আমি ওকে সহজ করার জন্য বললাম, “আচ্ছা বল, তুই যদি তোর ইচ্ছে মতো চলিস, নিজের পছন্দের পথে এগিয়ে যাস, তা হলে ভুগোলের পরিভাষায় তাকে কী বলা হবে?” নদী মুখ ভেটকে উত্তর দিল, “নিকুচি করেছে ভুগোলের। আমার পরিভাষায় তাকে বলা হবে মজা নদী। নদীকে তার মতো করে চলতে দিস তোরা? পদে পদে বাঁধ দিয়ে রাখিস।”

আমি আবার চুপ। চার পাশে অপরাধ এক নীরবতা। ঘড়িতে অনেক ক্ষণ আগে এগারোটা বেজেছিল। যখন তখন আমাদের এই বসে থাকা নতুন একটা তারিখের ঘরে ঢুকে পড়বে। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো

যা আমাদের টুকটাক দেখাসাক্ষাৎ ও মেলামেশার শেষ দিন। এ দিকের রাস্তায় গাড়ি কমই চলে। এত রাতে তা আরও কম। হাসপাতালের চণ্ডা দেওয়াল পেরিয়ে তাই তেমন কোনও শব্দই অনুপ্রবেশ করতে পারছিল না। কয়েক নিমেষের অথও নীরবতা ভেঙে নদীই বলল, “এখন আর কথা ঘোরানোর মতো কোনও কথা বলতে পারছিস না?”

আমি কথাটা মাটিতে পড়তে দিলাম না, নদীর দিকে ফিরে বুলন্ত দু’পা তুলে বাবু হয়ে বসে আবদার করলাম, “একটা গল্প শোনাবি নদী? প্রেমের গল্প।” নদী মুখ ঝামটা দিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও গিলে নিল কথাটা। তার পর ও-ও দু’পা তুলে গুছিয়ে বসে বলল, “তুই-ই বল। কিন্তু খবরদার, বানিয়ে বলবি না। সত্যিকারের কোনও গল্প থাকলে তবে বলবি।” আমি বিনয় দেখিয়ে বললাম, “সত্যিকারের ঘটনাগুলো যে শেষ হয় না নদী। সবই আধা সমাপ্ত, আধা পরিত্যক্ত, সেদ্ধ না হওয়া রান্না। সব ধারা কি নদী হয় যে, সাগরে গিয়ে পৌঁছাবেই? তার থেকে বানানো গল্পই সুস্বাদু লাগবে, শোনা।” নদী বলল, “সেই বিয়েতে হাজির না থেকেও বিয়ে করা সৈন্যের গল্প তো! শুনব না। তার থেকে তোর নিজের দেখা, শোনা, জানা ঘটনাই বল, নুন, চিনি, মশলা আমি আমার প্রয়োজন মতো মিশিয়ে নেব।”

আর কিছু বলার থাকল না। মাথা নিচু ও চোখ বন্ধ করে কয়েক নিমেষ বসে থেকেও মাথায় নিজের জীবনের ঘটনা ছাড়া আর কিছুই এল না। তার পর একটা ছবি মনে পড়ল। ক্রমে ক্রমে ছবির পুরোটাই মনে পড়ে গেল। এক চোখ খুলে নদীকে বললাম, “একটা কাহিনি বলতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কোনও ঘটনা, গল্প বা চরিত্রকে মেলাতে পারবি না।” নদী অধৈর্য হয়ে বলল, “মেলালে মেলাব, হাজার বার মেলাব! তুই এখন গল্পটা শুরু করবি কি!”

আকাশের মাঝমধ্যখানে একটা তারা ফুটে রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন কোনও প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আমাদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, ওই একটা ফুটো দিয়ে তার একটু আধটু চোখে পড়ে। এ পারের যত অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ গল্প হয়তো সেখানে গিয়ে পরিণতি পায়। আর সেখানকার ব্যর্থ প্রেম, ভাঙা প্রেম এ দিকে এসে রাতারাতি হাসি মুখে নিজস্ব করে তোলে। কিন্তু ভাবনার অবকাশ পেলাম না। নদী তাড়া দিল, “কী হল, বল?” আমি শুরু করলাম, “তখন ইশকুলে পড়ি।” নদী গলায় কৌতূহল মিশিয়ে বলল, “দেশ, তখন থেকেই?” আমি হাসলাম, কোনও রকম ব্যঙ্গ, অর্থ, গোপন অর্থ ছাড়াই সরল সাধারণ হাসি। তার পর শুরু করলাম, “শৈশবের বালকাবাসে সত্যিই প্রেম বা বিরহ কাকে বলে জানতাম না। আমাদের জীবনে তখন ছিল খেলা, খেলা আর খেলা। যখন পিটিয়ে মাঠ থেকে এনে পড়তে বসানো হত তখনও বইয়ের পাতা খুলে বন্ধুদের সঙ্গে বুক ক্রিকেট খেলতাম। কিন্তু সেই জগৎ হঠাৎ এক দিন থেমে যেত। রেফারি বাঁশি বাজিয়ে যেমন খেলা বন্ধ করে দেয়, সেই রকম।” নদী আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, “যখন গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি পড়ত?” আমি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লাম। তার পর বললাম, “তখন দেখা যেত অত বড় বালকাবাসে মাত্র গোটা কয়েক জন রয়েছে। তখন অবশ্য ঘণ্টা মিনিট ধরে পড়ার চাপ থাকত খুবই কম। সেই পড়তি ঝড়তি ছেলেগুলো সময় কাটানোর জন্য বিচিত্র সব পদ্ধতি বের করত। আমিও একটা পদ্ধতি বের করলাম।”

নদী প্রগল্ভের মতো বলে উঠল, “ওই বয়সেই প্রেম?” আমি এ বারও হাসলাম। তার পর বলতে শুরু করলাম, “তার নাম মোহরা।” নদী চটুল হেসে বলল, “মোহর কিন্তু মেয়েদের নাম। মাথার দু’দিকে বেগি ঝোলানো আর মুখে মিষ্টি হাসি।” আমি উত্তর না-দিয়ে বলতে শুরু করলাম, “আমাদের বালকাবাসে রান্না করত মোহর। আমরা সবাই ডাকতাম মোহরদা। এমনিতে খুব খিটখিটে, ছুটিতে সে-ও বাড়ি যেত ঘর। কিন্তু তখন খুব নরম ভাবে কথা বলত। এক দিন সন্ধ্যায় তার ঘর থেকে গানের শব্দ শুনে পায়ে পায়ে হাজির হলাম। সে তখন রান্নাবাদা সেরে গাইতে বসেছে। আমায় দেখে খুশি মুখে বসতে ইঙ্গিত করল। আসলে ছেলেমেয়েরা মোহরদাকে এড়িয়ে চলত। তা আমি বসলাম। গানের ভক্ত ছিলাম না, সমঝদার তো নয়ই। কিন্তু তার সুরে, কথায় বেশ একটা বিষণ্ণ ভাব লক্ষ করলাম। বিষণ্ণতাও তো আসলে ভাল লাগাই, তা-ই না? তার পর থেকে রোজ দু’বেলা তার ঘরে যেতাম। গান শুনতাম। সে আমার কথা জানতে চাইত। আমিও

জিঞ্জেস করতাম, ‘মোহরদা, তুমি বাড়ি যাও না কেন?’ সে লাজুক ভাবে উত্তর দিত, ‘আমার তো এখনও বিয়ে হয়নি!’ আমি বললাম, ‘কবে তোমার বিয়ে?’ সে আরও লজ্জিত হয়ে বলত, ‘শিগগিরই!’ আমি জানতে চাইতাম, ‘তাকে দেখেছ?’ মোহরদা উৎসাহ দেখিয়ে বলত, ‘দেখিনি মানে? সেই ছোট থেকে তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে!’ আমি অবাক হয়ে জিঞ্জেস করতাম, ‘তা হলে বিয়ে করছ না কেন?’ মোহরদা বলত, ‘পয়সা জমাচ্ছি!’ আমি আরও প্রশ্ন করতাম, ‘ছুটিতে কেন বাড়িতে যাও না তুমি?’ মোহরদা বলত, ‘এক সঙ্গে অনেক পয়সা জমিয়ে যাব। তার পর বিয়ে করব, বুঝলে। তখন আর এখানকার কাজে ফেরত আসব না। তুমি কিন্তু কাউকে বোলাও না!’

“কাউকে বলার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এই গল্পটা ঠিক বিশ্বাস হত না। বার বার মনে হত, আসলে লোকটা একা। হয়তো তার কেউ নেই। বিয়ে করা বৌ নেই, বিয়ে ঠিক হওয়া কনে নেই। হয়তো অতীতের কোনও গল্পই নেই, এমনকি গল্পের কোনও সম্ভাবনাও নেই। আমার মনে হত আমার মতো মোহরদাও নির্ভেজাল একা। পরের বছরগুলোয় গল্প আরও পোক্ত হল, ‘ও মোহরদা, আমায় বরযাত্রী নেবে না?’ ‘ও মোহরদা, এক দিন অন্তত তোমার দেশে যাও, না হলে তোমার বিয়ের কথা এগোবে কী করে? কথা না হলে বিয়ে হবে কী করে?’ তখন উত্তর না-দিয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। পরে বুঝেছি, তার বলার মতো অনেক কথাই ছিল। নেহাত বয়সে ছোট বলে সে বলতে পারত না।

“মাধ্যমিক দেওয়ার পর এবং গোর্ফের রেখা স্পষ্ট হওয়ার পর সে এক দিন তার গল্পের বোলা উপুড় করে দিল আমার কাছে। সত্যিই তার নিষ্পাপ ছেলেবেলায় তাদের পাশের বাড়িতে এক জন ফুটফুটে মেয়েও ছিল। নরম সরম মুখ, কথা বলা চোখ, ফরসা রং, এক মাথা কোঁকড়া চুল আর থ্যাংবড়ানো একখানা নাকছাবি। বড়দের কেউ কেউ রসিকতার ছলে দু’জনের বিয়ের কথাও বলত। কে জানে, তাদের হয়তো সময় কাটানোর বিনোদন ছিল তা। কিন্তু ছোট্ট মোহর সেই ইফনটাকে ভবিতাব বলে মনে নিয়েছিল। মেয়েটাও তার ইকিড মিকিড চামচিকির খেলার দুনিয়ায় বিলাসিতা করে মোহরকেই তার বর ভাবত। কিন্তু গ্রামগঞ্জের বিষয়, পনেরোয় পড়তেই মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিল বাড়ির লোক। পাত্র তার থেকে দশ বছরের বড়। সে কাঠের কাজ করে এবং আচারে-আচরণে পালোয়ান। বিবাহিত জীবনে কয়েক বছর কাটাতে না-কাটাতেই দাপুটে বরের পাল্লায় পড়ে সে বেচারি যখন প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ করেই যোগাযোগ হল মোহরের সঙ্গে।”

“কিন্তু মোহর তো বাড়িতে যেত না।”

“যেত না-ই তো। পরে বুঝেছিলাম এই মেয়েটি, যার নাম যমুনা, তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই কাজ পেয়ে বালকাবাসের জীবনে জুড়ে গিয়েছিল মোহর। দুঃখ ও অভিমানে ছুটিতেও বাড়ি ফিরত না সে। এখানে শূন্য ঘরে বসে গান গাইত। কিন্তু যে ভাবেই হোক, নতুন করে যোগাযোগ হওয়ার পর সে হুশ করে দু’-আড়াই ঘণ্টার জন্য ডুব দিত। মোহরের বাড়ি বালিচকে। আর যমুনার বিয়ে হয়েছিল যেখানে, তা বালকাবাস থেকে আধ ঘণ্টার পথ। মোহর কোথায় যেত দেখা করতে তা আমি জানি না, কিন্তু তখন দেখতাম সে খুব খুশি। তার সেই খুশি ভাব উপচে পড়ত তার আচারে ব্যবহারে টুকরো টুকরো গানে। সে আর কচিকাঁচার সঙ্গে খিটখিট করত না।”

“তার পর?”

“তার পর এক দিন দেখলাম আমাদের চির কালের উলুরিঝুরি মোহর হয়ে উঠল সুসজ্জিত, পরিপাটি, সংসারী মোহর। বিয়ে করল সে।”

“কে বিয়ে করল ওকে?”

“সে সব কেউ জানল না। বালকাবাসে রটে গেল, মোহর গুপ্তধন পেয়েছে।”

“গুপ্তধন কেন?”

“সর্ব ক্ষণ তেলচিটে একটা গামছা পরে থাকা মোহরের যদি ফুটফুটে, ফরসা, নম্রস্বভাব কোনও বৌ জোটে তো কী বলবে লোকে!”

“এ-ই কি সেই?”

“সেই প্রশ্নটায় আমি খাবি খেলাম কিছু দিন। এ-ই কি সে? কিন্তু মোহরদাকে বাগে পাওয়া যায় না। বালকাবাসে কর্মচারীদের অনেকেই পরিবার নিয়ে বাস করত। তাই স্ত্রীকে নিয়ে ভালই সংসার পেতে বসল মোহরদা। হয় কাজ নয় ঘর, এর বাইরে তাকে তো পাওয়াই যেত না। এ সব চলতে চলতেই আবার একটা ছুটি পড়ে গেল। শীতের ছুটি। আমার তখন উচ্চ মাধ্যমিক সামনে। নিজের পড়া বাদ দিয়ে মোহরের গুপ্তধন রহস্য সমাধানের সময়ও ছিল না। হঠাৎ একটা ছুটির দিনের সকালে শুনলাম বেজায় চৈচামেচি। ছুটে গোলাম যারা ছিলাম। দেখলাম রগচটা ধরনের একটা লোক কয়েক জনকে নিয়ে এসে চোটপাট শুরু করেছে। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো, পেটানো চেহারা। আমরা দু’-এক জন সামনে গিয়ে বললাম, ‘কী ব্যাপার? হস্টেলে এসে হুজুতি করছ কোন সাহসে?’ সে রোয়াব দেখিয়ে বলল, ‘চৈচাব না মানে? গোটা পাড়া জড়ো করব। নইলে থানা-পুলিশ করব!’ জানতে চাইলাম, ‘কেন, তোমার কী চুরি হয়েছে?’ সে উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘বৌ!’ তার পর মোহরদার দিকে আঙুল তুলে বলল, ‘এ ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমায় ফাঁকি দেবে, আমায়!’”

এটুকু শুনেই নদী ফিক করে হেসে ফেলল। আমি পাত্তা দিলাম না। বললাম, “তার পর অনেক কথা কাটাকাটি, চৈচামেচি। শেষে সুপার চলে এলেন। গভীর মুখে বললেন, ‘এ সব কী মোহর! যার জিনিস তাকে ফেরত দাও!’ মোহরদা রুখে উঠে বলল, ‘জিনিস মানে? মানুষ কি একটা জিনিস? ও কি কারও মালিক? ওর এত সাহস হয় কী করে যে যমুনার গায়ে হাত তোলে!’ সুপার ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘তার আগে বলো তোমার এত সাহস হয়ে কী করে যে এ সব আবর্জনা এখানে এনে তোলা! তুমি তো বালকাবাসের নাম ডেবালে মোহর!’

“এত বড় কথার পর মোহরদা পুরো বজ্রহতের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। উদ্ধত লোকটার এক মহিলা সঙ্গী বৌটাকে ব্যাগপত্র সমেত বাইরে নিয়ে এল। তাকিয়ে দেখলাম তার ভোঁতা নাকে নাকচাবি। বুঝলাম, এ-ইই সেই।”

“গল্প শেষ?”

“প্রায় শেষ।”

“তার পর কী হল যমুনার?”

“যমুনার কী হল জানি না, সেই সন্ধেতেই ঘর থেকে মোহরদার মৃতদেহ আবিষ্কার হল।”

“অ্যাঁ!”

“কিন্তু শোক পালনের কোনও উপায় পেলাম না। অদৃশ্য কোনও উপরওয়ালার নির্দেশে খবরটা চাউরও হল না। কর্মচারীরা মুখ বন্ধ রাখল। সুপার কড়া চোখে ও হিমশীতল গলায় আমরা যে দু’-এক জন বালকাবাসে ছিলাম তাদের বললেন, ‘এটা ছাত্রাবাস। সাধনার জায়গা। কিছু আলোচনা না করাই শ্রেয়। আমরা ধরে নিচ্ছি মোহর কাজ ছেড়ে চলে গেছে। বিষয়টা এখানেই শেষ হোক।”

“মানে?”

“মানে তার পর থেকে মোহরের পরিবার বা যমুনা, কারওই কোন খবর পাইনি আমরা। এই গল্প এখানেই শেষ। তা আধ সেদ্ধ না কাঁচা, তা আমি জানি না।”

“ইশ! লোকটা কেন চলে যেতে দিল যমুনাকে? মেয়েটা মোহরকেই ভালবাসত।”

“গায়ের জোরের কাছে হেরে গেল।”

“হাল ছেড়ে দিল কেন! পালিয়ে যেতে পারত দূরে কোথাও। অনেক দূরে, যেখানে অন্তত এই লোকগুলোর গায়ের জোর দুর্বল হয়ে যাবে।”

“কিন্তু আইনের জোর! লোকটা তার বিবাহিত স্ত্রীর দাবি ছাড়বে কেন! হোক না মোটা দাগের, হোক না বদমেজাজি, আইনগত দিক থেকে সে তার বর। সে কেন দাবি ছাড়বে? আমিই কি ছেড়েছি!”

“তুই! ওফ দেশ। ওই জঘন্য লোকটার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না।”

“কেন হয় না বল! হয়তো তোর জন্যও কোনও শিল্পী মানুষ দূরে বসে বাঁশি বাজায়, অথবা কালো আকাশনদীতে তার দুঃখের গান ভাসিয়ে দেয়। তখন তাকে আমার দরজায় মাথা খুঁড়তে হয়। আমিও এতই নিষ্ঠুর যে সেই করব না বলে হাত তুলে কলম বন্ধ করে বসে থেকেছি। দ্যাখ, যমুনাও তোর মতোই নিরুপায়। যমুনাও তো একটা

নদীর নাম, বল! হাত পা বাঁধা একটা নদী!”

একটুখানি থেমেই মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল নদী, “তোর খুব অহঙ্কার জানিস তো! ভাবিস, তুই যত মহান ভাবে অন্যের দুঃখ, কষ্ট বুঝিস তেমন ভাবে তাকে কেউ বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না!”

আমি উত্তর দিলাম না। টগরকুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম চুপ করে। নদীও দূরের দিকে তাকিয়ে থাকল। বাগানে প্রতিটা গাছের কাছে, সবুজ লনে নির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসে আলো জ্বলছে। সেই মৃদু আলো রাতের অন্ধকারকে দূর করেনি, আরও মোহময় করে তুলেছে। হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবক-সেবিকারা মাঝে মাঝে একটা ব্লক থেকে অন্য ব্লকে শব্দহীন ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ কারও নির্জনতাকে ভাঙছে না। অনেক ক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে নদী বলল, “এ বার আমি একটা গল্প বলি?” আমি বললাম, “বানানো গল্প?” নদী সোজা হয়ে বসে বলল, “না, জীবনের গরম রসে ভেজানো নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ সত্য ঘটনা। বলতে পারিস, এ-ও এক প্রেমের গল্প।” আমি জানতে চাইলাম, “আস্ত প্রেম না ভাঙা প্রেম?” নদী বলল, “অর্ধ সমাপ্ত, অসম্পূর্ণ, আধ খাওয়া চাঁদের মতো এই কাহিনি। তোর মোহরদা-যমুনার মতোই একটা জুড়ির গল্প। জীবনের অলিতে গলিতে আমি কিছু কম ঘুরিনি। তোর থেকে বেশিই ঘুরেছি। তারই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। শোন।”

বলে নদী গুছিয়ে বসল। একটা বড় কাহিনি শুরুর প্রস্তুতিতে চুপ করে থাকল কয়েকটা ক্ষণ। আমি চোখ বুজলাম। মৃদু বাতাসে নদীর গায়ের গন্ধ এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমায়। আমার চট করে মনে হল ছিটকিনির কথা। মনে হল, বড় একটা ছিটকিনিওয়ালা আড়াল থাকলে মোহরদা-যমুনার ঘরকন্না হয়তো হাওয়ায় গড়াগড়ি খেত না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এ দিকে নদী শুরু করেছে ওর কথা। কথায় কথায় গড়ে উঠছে একটা জনপদ। ওর কণ্ঠস্বরই যেন নদী হয়ে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে। সেখানে মাথার ভারসাম্য বজায় রেখে গম্বু্য ঠিক করতে হয় না, স্রোতই ভাসিয়ে নিয়ে চলে তার খেয়ালে, মজিতে, ভাল লাগায়।

“মেয়েটার নাম মন্দিরা। আমার বন্ধু।”

“তোর মুখ থেকে আগে কখনও এ নাম শুনিনি।”

“না, শোনার কথাও নয়। এখন ওর সঙ্গে যোগাযোগ সে ভাবে নেই। কিন্তু একটা সময় ওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ওর জীবনের কথাই শোনাব।”

“আমার গল্পের সঙ্গে কোনও মিল...”

“মিল আছে কী নেই সে তো পরে বলবি। তবে আপাতত বলতে পারি, আমার চরিত্রের সঙ্গে কিছু অভূত মিল ছিল ওর।”

ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের করে ঢক ঢক করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে বলতে শুরু করল নদী। নক্ষত্রের আলো আর দূর প্রবাসী সাদা আলোর আবছায়ায় ওকে যতটা দেখছি তার চেয়ে বেশি শুনছি। গলা নামিয়ে বলা সেই নদীর গল্প আমি গোথ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম না। যখন সঞ্চয় নগণ্য তখন তার হিসেব করা বিলাসিতা।

“আমার সঙ্গে মন্দিরার পরিচয়, ভাব, ভালবাসা শুরু নাচের ক্লাসে।”

“তুই নাচ জানিস? আচ্ছা, নদীর নাচকে কী বলা যাবে? স্রোতস্বিনী না প্লাবন?”

“ফাজলামো বন্ধ কর। আমি ভরতনাট্যমে ভর্তি হয়েছিলাম। মন্দিরাও।”

“তার পর? বাকিটা ইতিহাস?”

“তার পর আর কী? বছর দুয়েক প্রাচণ্ড চেষ্টার পর দু’জনেই নাচ ছেড়েছিলাম।”

“তার পর?”

“আরে দূর, আমি কি নাচের গল্প শোনাচ্ছি! আমার মতো মন্দিরাও খ্যাপাটে, হঠাৎ হঠাৎ এক একটা বিষয়ে ভূত চাপে মাথায়। কিন্তু ওর মধ্যে একটা অভূত রোখ ছিল, সেটা আমায় টানত।”

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল নদী, “যত দিন নাচের ক্লাস করেছি দেখতাম, সবাই যা করবে ও করবে তার উল্টোটা। আমি তখনই ওকে নেত্রী মানলাম। ও যে দিকে, চোখ কান বুজে আমিও সে

দিকে। তার পর অনেক কথা জানলাম। ওর ওপরে দুই দাদা। ওদের পরিবারে ছেলেদের ধরো ধরো সরো সরো করা হয়, বলতে পারিস প্রায় দেবতা জ্ঞানে পূজো করা হয়। দাদাদের জন্য সাত খুন মাপ। তো, এ সব দেখেই পুরো বিগড়ে গেল মন্দিরা। বাড়ি থেকে যা করতে বলত, ও চোখ বুজে করত তার উল্টোটা।”

“আর তুইও সেটা শুরু করলি।”

“ওই এটু এটু আর কী! কেউ বলল, মেয়েরা তো নাচ গান শিখবেই, তো মন্দিরা নাচ গান ছেড়ে দিল। তার পর শুরু করল যার তার সঙ্গে প্রেম। আজ এক জন তো কাল আর এক জন। এ সব করতে গিয়ে লেখাপড়া ডকে উঠল। আমার সঙ্গে যোগাযোগও তাই কমতে শুরু করল। তাও খবরাখবর পেতাম। এক দিন এসে বিয়ের কার্ড হাতে ধরিয়ে দিল। বললাম, ‘পাত্র কেমন?’ বলল, ‘কে জানো!’ বললাম, ‘পাত্র কে তা না-দেখে না-জেনে বিয়ে করবি!’ কী বলল জানিস? বলল, ‘দেখার কী আছে? সব ছেলেই তো এক।’ আমি বললাম, ‘যাহা তা হয় নাকি!’ ও বলল, ‘অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি শোন, সব ছেলেই এক রকম বোকাসোকা, তাদের একই রকম চিন্তা ভাবনা। তাই জোর করল বাড়ি থেকে, রাজি হয়ে গেলাম। কী আর করবা! কিন্তু জানিস দেশ, ওরও এক জন পছন্দের মানুষ ছিল। নরম সরম শান্ত ভদ্র। কিন্তু তাকে বিয়ে করল না কেন? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। মন্দিরা বলল, ‘ও বড্ড ল্যাকপেকে আর ম্যাদামারা। বন্ধু হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু বর হিসেবে চলবে না। আরে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হলেও তো কিছু ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করতে হবে। কিন্তু ওর তো নিজের মতামতই নেই। সব সময় মিথিয়ে থাকে। গলাই বেরোয় না।’ আমি শুনলাম বুঝলি, ওর কথা। ভাবলাম মন্দিরাই ঠিক। কী একটা কারণে ওর বিয়েতে যেতে পারিনি, কিন্তু শুনেছিলাম ভাল ভাবে ধুমধাম করেই সে সব চুকেবুকে গেছে। কিন্তু বছর ঘুরল না, মন্দিরার অবস্থান বদলে গেল।”

আমি কোনও প্রশ্ন করলাম না। মনে হল বলি, ‘সে কী! মাঝ পথে নদী হঠাৎ করে বাঁক নিল কেন!’ কিন্তু মন্তব্য করলাম না। রাত শেষ হয়ে আসছে যে! ইতিমধ্যে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। হাওয়ায় ঠান্ডা একটা আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। নদী বলতে শুরু করল, ‘মন্দিরা দুটো কারণে আমার বাড়িতে আসত। মেজাজ খুব ভাল থাকলে নয় খুব খারাপ থাকলে। বিয়ের কিছু দিন পরই এক দিন এসে খুব হাসতে হাসতে বলল, ‘উফ! কী ঝগড়াটে হয়েছে রে আমার বরটা! আমায় মুখ খুলতেই দেয় না।’ দু’মাস পর এসে বলল, ‘লোকে জন্মের দু’বছর পর কথা বলতে শেখে, আমি বিয়ের দু’বছরের মাথায় মনে হয় বোবা হয়ে যাব।’ আরও বলল, বর বড্ড শাসন করে। খুঁটিনাটি সব কিছুতেই তার নাকটি গলিয়ে দেয়। দুঃখ করে বলল, ‘কী জানিস তো নদী, ওদের কথা-শোনা পুতুল হয়ে থাকলেই সব ভাল। না হলেই গন্ডগোল। আর তুই তো আমায় চিনিসই, ছোটখাটো খুনসুটি উপভোগ করি। কিন্তু বড়সড় ঝামেলা দেখলে লেজ গুটিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে।’ আমি বললাম, ‘তা হলে কি ম্যাদামারাই ভাল ছিল!’ মন্দিরা বলল, ‘আর বলিস না, এখনও রাস্তায় দেখা হলে এত নরম ভাবে কথা বলে যে, নিজেরই লজ্জা লাগে! ওর আশা ছিল আমায় বিয়ে করবে। সেটা হল না বলে একটুও রাগ করেনি। রাগ কি আর করেনি! কিন্তু একটু আধটু দুঃখের ফেঁসফেঁস ছাড়া আর কোনও কথাই শোনায়নি। দেখা হলে এক বার করে বলে, তোকে দেখেই বোঝা যায় তুই সুখী হয়েছিস! আমি মনে মনে বলি, আমিই জানি আমার অবস্থা।”

নদীর মুখে মন্দিরার গল্প শুনতে শুনতে কেমন যেন অশ্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গল্পটা একটা চলচ্চিত্র। আর আমার কাছে তা যেন আগেই দেখা। কিন্তু কেন তা মনে হচ্ছে ধরতে পারলাম না। ব্যাঘাত ঘটলাম না। নদী বলতে শুরু করল, “পর পর কী ভাবে ওদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে বলতে পারব না, তবে দেখা গেল দু’পাড়া দূরের সেই প্রাক্তনের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমশ পোক্ত হয়ে গেল মন্দিরার। এক দিন বেশ খুশি খুশি মেজাজে এল। জানতে চাইলাম, ‘এত হাসিখুশি লাগছে কেন?’ বলল, ‘ভাবছি বিয়ে করবা!’ বললাম, ‘এই তো করলি!’ বলল, ‘ওটা চলবে না। এ বার ঠিকঠাক বিয়ে করবা!’ আমি বললাম, ‘সেই ম্যাদামারা ল্যাগবেগেকে!’ ও বলল, ‘আমার ল্যাগবেগেই ভাল। খুব শিক্ষা হয়েছে চোকস লোক খুঁজতে গিয়ে।’ শুনলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই দেখা করছে দু’জনে। ছেলোটো খুড়ি, ল্যান্ডেসকুমার নাকি

মন্দিরা বলতে অজ্ঞান! কিন্তু দেশ, বিশ্বাস করবি না, তার পর গল্পটা যেমন হওয়ার কথা তেমন হল না।”

কথাটা সটান এসে ধাক্কা মারল আমার বুকে। গল্প যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় কি? আমার আর নদীর গল্পও কি হিসেব মেনে এগিয়েছে? নাকি মানুষের জীবনের ঘটনাক্রমও নদীর মতো খামখেয়ালি? সোজা সরল রেখায় সে চলে না। তার পথে আসবেই আচমকা বাঁক। কোথাও সে তেড়েফুঁড়ে ভেঙে নিয়ে যায় পাথরের দেওয়াল। কোথাও সে অসীম প্রশ্রয়ে গড়ে তোলে নতুন চর। আমার হঠাৎ মনে পড়ল আজই খবরের কাগজে পড়া একটা সংবাদের কথা। তামিলনাড়ুর কুড্ডানোর জেলার গেড্ডিলাম নদীতে কাল চোরাবালিতে তলিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক জন মা, তাঁর দুই শিশুসন্তান সহ সাত জন। কী আশ্চর্য ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! একটা নদী অক্টোপাসের মতো একটু একটু করে গ্রাস করে নিচ্ছে জীবন্ত, সন্তুষ্ট সাতটা মানুষকে! আবার কখনও সে উদাসীন। প্রত্যাখ্যান করছে কাউকে। যেমন আমি। আর কিছু ক্ষণ পরই আমায় পাকাপাকি ভাবে ফিরিয়ে দেবে এই নদী! গোপানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের নদীর কথায় কান পাতলাম।

“সে বার অনেক দিন পর মন্দিরা এল আমাদের বাড়ি। ওকে দেখে চমকে উঠলাম। মনে হল, বজ্রাহত একটা গাছ। এর আগে কখনও কোনও পরিস্থিতিতে ওকে ভেঙে পড়তে দেখিনি, জানতাম লড়াইটা ওর মজ্জাগত। সে দিন প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম। ওকে নিয়ে চলে গোলাম বাতিঘরের চিলেকোঠায়। বললাম, ‘কী হয়েছে, খুলে বল।’ ও বলল। শুনলাম, ল্যাদোসকুমারের সঙ্গে ওর মনের মিল হয়েছিল। ওর সঙ্গে কথা বলে শান্তি পেত ও। ওর বর তো আর কথা বলত না, আদেশ করত। নয় পরামর্শ বর্ণণ। কিন্তু ল্যাদোস শুনত। ঘটনার পর ঘণ্টা বকে যেত ও, ছেলোটা হাঁ করে শুনত।”

“ঘন্টার পর-ঘন্টা কোথায় সে তার প্রেয়সীর দিকে তাকিয়ে থাকত?”

“ছেলেটার বাড়িতে। কোনও কারখানায় কাজ করত ছেলোটা। শিফটিং ডিউটি। সেই কাজের অবসরে ছেলোটার বাড়িতে, তার ঘরে গিয়ে সৈঁধিয়ে যেত মন্দিরা। কখনও ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আসত, কখনও কথা বলা ও শোনার মহার্ঘকাজে সময় কাটত। কিন্তু মন্দিরার এই দোলাচল টের পাচ্ছিল তার দাপুটে বর। এক দিন দুপুরে প্রেমিকের ঘরের দরজা ভেজিয়ে ল্যাদোসকুমারের বকের সঙ্গে লেপ্টে ফিস ফিস করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছে মন্দিরা, এমন সময় ওই ঘরের দরজায় এসে দড়াম করে লাথি মারল মন্দিরার বর। তার পর সটান এসে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল। হতভম্ব মন্দিরা একটা কথাও বলতে পারল না। কিন্তু ল্যাদোস হঠাৎ বীর হতে চাইল। তার ল্যাকপেকে হাত তুলে বলল, ‘এ কী! চুলে হাত কেন!’ লোকটা রগচটা। সাতপাঁচ না ভেবে সেখানে ওই ল্যাদোসের বাড়িতেই দাঁড়িয়ে তার গালে সপাটে একটা খাণ্ডড় কষিয়ে দিল। মার খেয়ে চুপসে গেল ছেলোটা। বিড় বিড় করে কী বলতে গেল, তা মন্দিরা অন্তত বুঝল না। তার বর তত ক্ষণে ‘বাড়ি চলো, তোমার হচ্ছে,’ বলে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। ঘর থেকে বেরোনোর আগে আঙুল তুলে এক বার ল্যাদোসের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খবরদার। আর যদি ওর ধারেকাছে দেখি তা হলে কিন্তু তোর বডি থেকে গলাটা আলাদা থাকবে!’ তার পর থেকে মন্দিরা প্রায় বন্দি। ফাঁকি দিয়ে বড় জোর আমার বাড়িতেই আসতে পারত।”

“আর ল্যাদোসকুমার? তার কী হল?”

“এটাই খুব দুঃখের, জানিস দেশ! তার পর থেকে ছেলোটা পুরো বসে গেল!”

“বসে গেল মানে?”

“হাপিশ হয়ে গেল।”

“হাপিশ মানে খুন? ওকে কি মেরে ফেলল?”

“না খুন নয়, কিন্তু যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। মন্দিরা লড়িয়ে মেয়ে। ওই ঘটনার পর ওর ওপর নজরদারি বেড়ে গেল। কিন্তু ওর মন থেকে মানুষটাকে মুছে ফেলা তো গেল না। কিন্তু ল্যাদোস যেন মুছে গেল। আগে অফিস যাওয়ার পথে বা ফেরার সময় মন্দিরার শ্বশুরবাড়ির রাস্তায় আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা এমনি এমনি পায়চারি করত। ওখানকার কোনও চায়ের দোকানে চা নিয়ে বসে থাকত কত ক্ষণ।

ফোন খুললেই উপচে পড়ত ল্যাদোসের পাঠানো বার্তা। কিন্তু সব, সে সবই পুরো বন্ধ হয়ে গেল। নিজে জানলা থেকে চোখ পেতে রেখেও একটা বারের জন্য তাকে আর দেখতে পেল না মন্দিরা। শেষ দিন ওর বাড়িতে ওই রকম চোঁচামেচি, অসভ্যতা না হলে হয়তো সেখানেও পাড়ি দিত। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় পুরুষদের ওপর থেকেই বিশ্বাস চলে গেল ওর। পুরোপুরি ভেঙে পড়ল ও। ফোনে চেষ্টা করেও পেল না কিছুতেই।”

“তার পর?”

“তার পর আর কী? এখন ও একটা ভাঙাচোরা মানুষ। খিদে পায় না বলে খেতে চায় না, ঘুম পায় না বলে ঘুমের ওষুধ খায়। আর ভাবে, জীবন যাদের ঠকায় তাদের কী বার বারই ঠকায়।”

“আমি খুঁজে দেখব ছেলোটাকে? মাঝ রাত না হলে তোকে বলতাম, তুইও চল।”

“আমি জানি না তার বাড়ি কোথায়, তার নাম কী! আর কেউ যদি পালিয়ে যায় তা হলে তাকে ধরে বেঁধে আনাটা কি সম্মানের হবে!”

“তাও, সত্যটা তো জানা যেত।”

“এখানে আর কোন সত্য জানার আছে দেশ!”

“ওই, জীবন যাকে এক বার ঠকায়, তাকে আবার ঠকাবে কিনা!”

“তোর ভয় নেই দেশ, তুই এগিয়ে যা। জীবনে এক বার ঠকেছিস বলে কি বার বার ঠকবি! আমি তো ঠকে যাইনি দেশ। আমার তোর ওপর রাগ থাকতে পারে, অপছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস কর কোনও অভিযোগ নেই।”

“আমারও কোনও নালিশ নেই।”

“সেটা ঠিক না। তোর গুচ্ছ গুচ্ছ নালিশ থাকারই কথা।”

“যা থাকার কথা তা কি থাকে সব সময়? মন্দিরার কি নালিশ আছে?”

“না, নেই। কিন্তু চিন্তা আছে। দুর্বিসহ চিন্তা, আর অল্পস্বল্প অভিমান।”

“ছেলেটার সম্বন্ধে কিছু জানিস না? সামান্য কিছুও না? আমার মনে হচ্ছে এই গল্পের মাঝখানে আরও কোনও গল্প আছে।”

“দূর! গল্প বলে কিছু হয় না। যা হয় তা বানানো। বাস্তব পৃথিবীতে মানুষ যেটা হবে বলে ভাবে, কেবল সেটা বাদে অন্য কিছু হয়। যেটা হওয়ার শুধু সেটাই হয় না। তোর অনুমান বুধা, এখানে আর কোনও গল্প নেই। মন্দিরার জীবনে যা হতে পারত তা হল না। যা হতে পারত পেলব প্রেমের গাল ভরা গল্প সেটা হয়ে গেল আধ খাওয়া, কানা ভাঙা একটা পাত্র।”

“চল, তুই আর আমি ওদের মিল ঘটাই। তুই কোনও একটা মিথ্যে বলে মন্দিরাকে ওর ঘর থেকে বের করে আন। বিপদ, আপদ এ সবের জন্য গভীর রাতই সঠিক সময়। তার পর তিন জনে হানা দিই ছেলোটার বাড়ি।”

“দুঃখিত। এই পাগলামিতে আমার সায় নেই। মন্দিরার বর বদমেজাজি, পালায়ান আরও কী কী যেন! ও মন্দিরাকে পর্যন্ত শিশিতে ভরে ফেলেছে আমি তো কোন ছাড়া।”

“মন্দিরার বাড়ি যেতে হবে না, ছেলোটার বাড়ি চল।”

“গিয়ে কী বলব?”

“মন্দিরা কী বলত? তখন ছেলোটা কী বলত?”

“এত কথা আমি কী করে জানব? আমি কি ওর জীবনী লিখেছি নাকি!”

“তাও, এক-আধটা কথা মনে কর! আসলে আমার কী মনে হয় জানিস, ওরাই আসল দম্পতি। খাতা, কলম, কাগজপত্র অনুযায়ী হয়তো নয়, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আস্থা, ভালবাসা, আনুগত্যে ওরা খাঁটি। শুধু একটা বড় ছিটকিনি দরকার ছিল ওদের নিভৃত জীবনটাকে আড়াল করার জন্য! সেটা থাকলেই মার দিয়া কেব্লা।”

“সেটা আমারও মনে হয়, কিন্তু ওদের এক সঙ্গে করার কোনও উপায় সত্যিই নেই। ওরা এমন আলাদা দুটো বাগানের গাছ যেখানে মালি নির্দয় হাতে কাটারি দিয়ে আগাও কাটছে, গোড়াও কাটছে।”

“এটা মেনে নেওয়া কঠিন!”

“তোর শুনাই কষ্ট হচ্ছে আর মন্দিরার অবস্থাটা ভাব! যখন বর ওর ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও সেই ল্যাদোস,

ভিত্তি, পরনির্ভরশীল ছেলোটো অসহায়ের মতো বলছিল, ‘বুল্টি, কী করব বলা’ সেই কথাটা এখনও মন্দিরার কানে বাজে।”

“কী বলছিলি? নামটা কী বললি?”

“বুল্টি। মন্দিরার ডাক নাম।”

“মন্দিরার ডাক নাম বুল্টি, এটা আমায় এত ক্ষণ বলিসনি কেন!”

“ও মা! এটা বলে কী করব! তুই কি নাম শুনে ওর লোককে খুঁজে বের করবি!”

“আলবত করব। বুল্টির সব আমার জানা!”

“কী জানা?”

“বুল্টির সব খুড়ি, ওর ওই ভাল লাগার মানুষের কথা।”

“সত্যি বলছিস? কী জানিস তুই?”

“জানি যে ছেলোটো একটুও ঠাকায়নি ওকে। কিন্তু সে গত কয়েক বছরে পুরো বসে গেছে।”

“বসে গেছে মানে? নো গার্লফ্রেন্ড?”

“বসে গেছে মানে ফুরিয়ে গেছে। একদম নিঃশেষ হয়ে গেছে।”

“আমি কিছু বুঝতে পারছি না।”

“আমিও কিছু বুঝতে পারিনি যখন ওর কথা শুনেছিলাম। এখন তোর মুখ থেকে বাকি গল্পটা শুনে বুঝলাম এটা মুদ্রার পিছন দিক। দুটো দিক মেলাতেই স্পষ্ট হল ছবিটা।”

মুখে এক রাশ প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে নড়ে বসল নদী। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আমি বললাম, “নরম নয়, নরমতম মানুষ হল দ্বিজু।” শুনেই ভুরু কঁচকে নদী বলল, “দ্বিজু?” জানতে চাইলাম, “নামটা শোনা লাগছে?” নদী বলল, “অচেনা লাগছে না। হতে পারে মন্দিরা এক বার দু’বার বলে থাকবে।” আমি তখন ছোটবেলায় ক্রিকেট মাঠের ঘটনাটা বললাম, “এক জন ওর বলে ওভার বাউন্ডারি মারার পর ও শুকনো মুখে বলেছিল, ‘এত জোরে মারলি?’ ওকে দেখলেই তোর মায়া পড়ে যাবে।” নদী বলল, “মায়া হবে না হাতি। রাগ হবে। চল, মালটাকে তুলে নিয়ে আসি।” বললাম, “লাভ নেই। ও এখন মরা মানুষ।” নদী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী বললি!” আমি বললাম, “ঠিকই শুনেছিস। মরা মানুষ। জীবন্মত কথাটা আগে শুনিসনি?” নদী বলল, “কিন্তু কেন?” বললাম, “উৎস যেখানে সেখানে বাঁধ দিলে যে কারণে নদী শুকিয়ে যায়! তোর মন্দিরার ঘটনা কত দিনের?” ও বলল, “তা হবে কয়েক বছর।” আমি জানালাম, “এই কয়েক বছরে ও পাথর হয়ে আছে। কাজে যায় না, মাইনে তোলে না, চুল দাড়ি কাটে না। কেউ খেতে দিলে খায়, না-দিলে মিটিমিটি হাসে।” কথাটা শুনে নদী মৃদু আত্নানাদ করে উঠল।

অনেক ক্ষণ চুপ করে থাকল নদী। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, “তুই কিছু জানতে চাইবি না দেশ?” আমি হাসলাম। নদী জিজ্ঞেস করল, “তোর ওপর অনেক অবিচার করেছি। কেন, তা জানতে চাইবি না?” আমি আবার মৃদু হেসে বললাম, “একটা রাত কী করে ফুরিয়ে গেল দেখলি!” নদী আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোর সঙ্গে আস্ত একটা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিলাম, বলা! কিন্তু কোনও কথাই যে হল না!” আমি আবার হেসে বললাম, “এটা হওয়ার কথা ছিল।”

তর্ক করল না। নদী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তা হলে?” আমি বললাম, “তা হলে আর কী! আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমি বৃন্দবৃদের মতো মিলিয়ে যাব।” নদী অসহায়ের মতো বলে উঠল, “আমি কি খুব বড় কোন ভুল করছি দেশ?” আমি ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, “যখন রাষ্ট্রটা দু’দিকে বেঁকে যায় তখন একটা দিক তো নিতেই হয়। যেটা দেখে পছন্দ হচ্ছে সেটা নেওয়াই ভাল। ঠিক ভুল বলেও কি কিছু হয় নদী? আমার তো মনে হয় সব পথই ঠিক পথ।” এ বার নদী ছেলমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল, “তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে দেশ?” আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, “আর দেখা হবে না।” নদী কাতর কণ্ঠে বলল, “কিন্তু আমার যখন তোকে দরকার হবে?” বললাম, “দরকার হবে না। বিশ্বে কেউ অপরিহার্য নয়, এক সূর্য ছাড়া।” নদী খপ করে আমার হাতটা ধরে বলল, “আমি তোর জীবনটা তখনই করে দিলাম, না!” আমি ওর হাতের উপর হাত রেখে বললাম, “সত্যি বলব? বিশ্বাস করবি?” কথার জবাব না-দিয়ে ভীরা চোখে তাকিয়ে থাকল নদী। আমি আন্তরিক গলায় বললাম, “আমি

তো ভেসেই যেতাম। সেখান থেকে আজ যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি সেটা তোর জন্য। তোর সঙ্গে দেখা হওয়া, বন্ধুত্বটা হওয়াটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। যেখানেই থাকি, এই সত্যটা কখনও অস্বীকার করতে পারব না।”

ইতিমধ্যে আকাশে রঙের খেলা শুরু হয়েছিল। আমাদের আশপাশের গাছগুলোয় যে এত পাখিপাখালি ছিল তা জানতাম না। লক্ষ করলাম তাদের কলকাকলি আর ডানা ঝাপটানোর শব্দে। মনে পড়ল কাল ওই গভীর রাতের একটা বককে আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে দেখেছিলাম। হয়তো তার দেরি হয়েছিল। কে জানে সে কোথায় গেল। এখন আবার তেড়েফুঁড়ে উঠে দিন শুরু করতে পারবে কি না! ওই একা, দিগন্ত বকের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেলাম। আমিও কি পারব নতুন করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে? আমার বিদায় ক্ষণ আসন্ন। এ বার একা ডানা মেলে দিতে হবে অচেনা কোনও গন্তব্যের উদ্দেশে।

নদী ওঠার আগ্রহ দেখাল না। ও কি ভুলে গেল নিজের শর্তের কথা? কিঞ্চিৎ হতাশ গলায় ও বলল, “আমি এমন এক জন যে কিছুই ঠিক করতে পারি না। ছোটবেলায় পছন্দের খেলাগুলোকে নিজেই ভাঙতাম আর তার পর পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসতাম। আমি এখনও বদলাইনি, তাই না দেশ?”

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেউ কি আদৌ বদলায়? নাকি বদলটাই সময়? আমি সত্যিই জানি না। শুধু জানি, বুক ফেটে বেরোতে চাওয়া আবেগ নামক বস্তুটিকে সামলাতে হবে। যে শব্দগুলো আছাড়পিছাড়ি খাচ্ছে নদীকে বলার জন্য যে “তোকে ছাড়া বাঁচব না!” তাদের বের হতে দেওয়া যাবে না। তাদের অন্য ঘাটে ভিড়িয়ে দিতে হবে। কেন যেন মনে হচ্ছে নদীর চোখের দিকে তাকালে আমি গলে যাব। কে যেন ভিতর থেকে তাড়া দিতে থাকল, “চলুন, চলুন, চলুন।” এত কিছুই মাঝখান থেকে আমি ভাবলার মতো একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নদীও ক্রমশ সামলে নিল নিজেকে। তার পর জিজ্ঞেস করল, “তা হলে চলি?” আমি গলা ঝেড়ে “না” কথাটা বলতে পারলাম না। ওর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

নদী সোজা হয়ে বসল। সময় নিয়ে চুল ঠিক করল। বেদি থেকে নেমে বলল, “আসছি,” তার পরই মনে পড়ার ভঙ্গিতে ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে বলল, “এটা রাখা।” সেটা দেখেই আমার মনে পড়ে গেল একটা দরকারি কথা। আমি দ্রুত পেটমোটা ব্যাগের পেট খালি করে আরও মোটা একটা খাম ওর হাতে দিয়ে বললাম, “এটা তোর জন্য।” নদী খামটা হাতে নিল, কোনও প্রশ্ন করল না। আমি গত দু’দিনে আমার এক জন অ্যাডভোকেট বন্ধুকে দিয়ে ডিভোর্সের জন্য আমার যা করণীয় তা করিয়েছিলাম। বিদায় উপহার হিসেবে সেটাই তুলে দিলাম ওর হাতে। মনে মনে বললাম, এটা পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

খামটা নদীর হাতে দিয়ে আমিও তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, “কাকুকে আজ-কালের মধ্যেই ছেড়ে দেবো। আশা করি কোনও অসুবিধে হবে না।” নদী স্নান মুখে বলল, “আশা করি।” আমি এ বার সপ্রতিভ সেজে বললাম, “চলি। আর আমাদের দেখা হবে না।” কথাটা শুনে নদীর মুখটা বাতাসের এক ধাক্কায় প্রদীপ নেভার মতো অন্ধকার হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, “কে বলতে পারে?”

চলে আসার জন্য পা বাড়িয়েছি, নদী বিব্রত মুখে জিজ্ঞেস করল, “এতে কী আছে? শোন দেশ, আমি কিন্তু...” ওকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই বললাম, “আমার তরফ থেকে ছোট একটা উপহার,” বলে আর না-তাকিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে এলাম। নদী এখন ফিরবে না, সেটা জানাই ছিল। মোটরবাইক স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল আমার যা কিছু বন্ধন, যা কিছু টেনে রাখা সবই পিছনে পড়ে থাকল। আমায় দূর থেকে কেউ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অনেক বড় কিছু। দৈনন্দিন সাংসারিকতায় বেঁধে রাখে না এমন কিছু। ছোট একটা ঘর থেকে বড় দুনিয়ার দরজায় পা রাখছি আমি। এই দরজার ছিটকিনি খুলে প্রথম হাঁটতে শেখা শিশুর মতো এক পা দু’পা করে পা রাখার অনুমতি পেলাম সেই সান্ত্বাজ্যে।

আকাশে ভাসা ভাসা সাদা মেঘের ক্যানভাসে চলছে বেগুনি, খয়েরি, বাদামি, কমলা, লাল, গোলাপি আর নানান মিশ্র রঙের খামখেয়ালি চলন বলন। আমিও লক্ষ্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গিতে দু'চাকার যান ছুটিয়ে দিলাম বেলাগাম গতিতে। নিমেষের মধ্যেই শিউরে উঠলাম। বালকাবাস তো ছোট থেকে আমাদের লাগাম হাতে রাখতে অভ্যস্ত করেছে। শিখিয়েছে হেরে যেতে, পড়ে পড়ে মার খেতে, অপমান সহ্য করে অল্লস থাকতে। আমি কেন ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার দায় চাপিয়ে দেব গতির ঘাড়ে? মুহূর্তের মধ্যে গতি নিয়ন্ত্রণ করলাম। নিজের পছন্দের এই যানের সঙ্গে আমি মন খারাপের দিনে একা একাই কথা বলি। মন ভাল থাকা দিনে গান শোনাই। এর নাম দিয়েছি গোলু। আজ গোলুকে বললাম, “তোর আর কোনও পিছুটান রইল না রে,” তার পর প্রশস্ত রাজপথ ধরে অনির্দিষ্টের টানে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে দেখলাম রাস্তার পাশে সার্ভিস রোডে প্রাতঃরমণকারীদের পদচারণা শুরু হয়েছে। দু'জন বয়স্ক ব্যক্তি চোখে পড়ল। দু'জনেরই চুলে পাক ধরেছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে তাঁরা দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কী সব বকছেন। দেখে মনে হল দম্পতি। কী মনে হল, গতি কমিয়ে বললাম, “সুপ্রভাত।” ভদ্রলোক খেলাও করলেন না, ভদ্রমহিলা মাথা নুইয়ে প্রতি-অভিবাদন জানালেন। গোলুকে বললাম, “আর কী চাই রে জীবনে?” আরও একটু এগোতে চোখে পড়ল মোটরভ্যান চালিয়ে যাচ্ছে এক জন লোক। পাশে যোমটায় সর্বাপেক্ষা মুড়ে জবুথবু হয়ে বসে এক মহিলা। নিশ্চিত তার স্ত্রী। ভ্যানের চার দিক টিন দিয়ে উঁচু করা। এমন গাড়ি রোজ সকালে দেখা যায় মহানগরে ফ্ল্যাটবাড়ি বহুল শহরতলিতে। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহ করে আর তা ফেলে আসে স্থানীয় কোনও ধাপায় বা কর্পোরেশনের ভাট্টে। সার্ভিস রোডে এক জায়গায় দেখলাম সাদা শর্টস সাদা স্লিমস পরে পোষাঘরের সঙ্গে নিয়ে হাঁটছেন জনা চারেক প্রৌড়। সকলেই নিজের মতো বাঁচছে। সকালের পরিবেশ থেকে ফুসফুসে ভরে নিচ্ছে বাঁচার রসদ। আমিও নিলাম। রাস্তার সাদা দাগ ধরে চাললাম মোটর সাইকেল। মনে হল যেন রানওয়ে ধরে ছুটিছি। গোলুকে বললাম, “গোলু, রানওয়েতে তুই একা। এ বার উড়তে হবে।”

দীর্ঘ একটা পাক খেয়ে এসে পৌঁছোলাম নিজের অফিস ঘরে। খাতা খুলে দেখলাম, পরের সপ্তাহে তিনটে কাজ রয়েছে। তার পর তেমন কোনও কাজ নেই। মানে চূড়ান্ত হয়নি। জানলা থেকে মুখ বের করে বাইকখানার দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিজ্ঞেস করলাম গোলুকে, কী রে কী করবি? এখানেই আজীবন ব্যবসা করে যাবি? নাকি হাতের কাজগুলো মিটলে পালাবি? আরে না, একা একা কেন? তুই তো আছিস। নেই? দুঃখ একটাই। রাজু আর সান্ত্বনাদির কাজ যাবে। অবশ্য একটা বিকল্পও আছে। দু'জনকেই দায়িত্ব দিয়ে চলে যাওয়া যায়। যা কাজ দু'জনে সামলে নেবে, যা লাভ তা ভাগ হবে আধাআধি। খাতা-কলমে বেঁচে থাকল খেয়া। যেমন এখনও খাতাকলমে আমি আর নদী স্বামী স্ত্রী। ঠিক করলাম, আজই দু'জনকে ডেকে প্রস্তাবটা ফেলব। ওরা রাজি হলে বাকি যে কাজগুলোর কথা আধাআধি হয়ে আছে সেগুলোও বুঝিয়ে দেব দু'জনকে। এমনিতে রাজু-সান্ত্বনাদির সম্পর্ক নরমে গরমে চলে। এ ওর কাজে খুঁত ধরে নিয়ম করে। সান্ত্বনাদি বিয়ে করেনি, দাদা-ভাইয়ের সংসারে থাকে। রাজু এখনও থিতু হতে পারেনি আর্থিক ভাগে। এই খেয়ার কল্যাণে ওরা যদি ভবিষ্যতে জোট বাঁধে তো মন্দ কী! কিছু ভাল কাজ তো হল আমার দ্বারা।

চেয়ারে বসে মনে হল এই কদিনে বড় মায়া পড়ে গেছে এটার উপর। আরাম করে বসে টেবিলে হাতের চাপ দিয়ে কানে ফোন গুঁজে চোখ বন্ধ করে পাটির সঙ্গে মেনু নিয়ে কথা বলার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। একেই কি বলে গদির মায়া? এ ভাবেই কি নেতা ক্রমে ক্রমে স্বৈরাচারী হন? চেয়ার কি তা হলে সামান্য চেয়ার নয়? তা হলে সেই মোহ ত্যাগ করাটাও কম নয়। আমি সেটাই করব। মাত্র তিনটে দিন আর তিনটে রাত আমায় এই কুঠুরি থেকে একেবারে খোলা রানওয়েতে নিয়ে ফেলল। সে দিন সকালে এখানে এসেই নদী বিবাহবিচ্ছেদের কাগজ ভেবে অন্য একটা কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছিল। কথাতা মনে পড়তেই চমকে উঠলাম। খামবন্ধ কী দিয়েছিল নদী? ভাবতে ভাবতেই ব্যাগে হাত চলে গেল। খাম খুলে দেখলাম নদীর হাতে লেখা একটা চিঠি। আমাকেই লেখা। বুকটা চন চন করে উঠল।

এ রকম কেন হয় গোলু? রানওয়েতে মসৃণ গতিতে ছুটতে হয়। সেখানে এ রকম হোট খাওয়া কি ঠিক? ঠিক নয়, একদম ঠিক নয়।

আমাকে লেখা নদীর প্রথম চিঠি। শুধু তাই নয়, আমাকে লেখা কোনও মহিলার প্রথম চিঠি এটা। যতই প্রত্যাখ্যাত হই, তাও আমার অন্তত একটা আক্ষেপ দূর করে দিল নদী। যখন বালকাবাসে থাকতাম তখন কোনও পড়ুয়া কারও থেকে চিঠি পেলে মনে হত যেন শস্যক্ষেত্রে বোমা পড়েছে। শুরু হত চোর পুলিশ খেলা। যে স্নানে গেলে বা কলঘরে গেলে অন্যরা আঁতুপাতু করে খুঁজত যদি তার প্রেমসীর নামটুকু অন্তত জানা যায়। কিছু কিছু অতি কৌতূহলী ছেলে ডাকপিয়ন এলেই ভিড় করত। তাদের চিঠি আসত না। তারা জানত যে তাদের চিঠি আসবে না। তাও তারা অপেক্ষায় থাকত, কার থেকে কার কাছে চিঠি এল দেখার জন্য। প্রায়শই নিরাশ হত তারা। আমার সারা ছাত্রজীবনে উকিলকাকু ছাড়া কারও থেকে চিঠি আসেনি। আর আজ যখন আমি রানওয়েতে দাঁড়িয়ে নতুন উড়ান শুরুর আগে থর থর করে কাঁপছি, তখন এল সেই চিঠি।

হাতের লেখা দেখে মনে হল না খুব চিন্তা ভাবনা করে তা লেখা হয়েছে। বুঝলাম, ননীবাবুর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর গত কাল দুপুরে নদী বসে লিখেছে এটা। চিঠিটা এই রকম,

দেশ,

তোকে একটা কথা অনেক বার বলার চেষ্টা করে এত দিনেও বলতে পারিনি। কিন্তু কথাটা বলা জরুরি।

এটাকে জবাবদিহি মনে করতে পারিস। কিছু বিষয় জানানো আর কয়েকটা কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য আমি অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। আমার ধারণা ছিল তোর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালে হয়তো তা উগরে দিতে পারব। বাবার জন্য হাসপাতালে প্রথম রাত কাটানোর সময় অবসর মিলেছিল, তবে তখন সেই মানসিক অবস্থা ছিল না। গত রাতে পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম কথাগুলো ঠোঁটেই আটকে গেল। আমি জানি আজ রাতেও বলতে পারব না। আসলে তুই সামনে এলে আমার না-বলার মতো কথাও খই হয়ে ফুটতে শুরু করে, কিন্তু বলার মতো কথাগুলো মুখ লুকোয়। তাই খাতা কলম নিয়ে বসলাম।

দেশ, আমি জানি আমার বিভিন্ন ব্যবহারে তুই অসম্ভব কষ্ট পেয়েছিস। কিন্তু দেখ, সেই সবার জন্য কাঠগড়ায় এক মাত্র আমাকেই তুলেছে লোকে। এমনকি আমার বাবা, মাও সব দোষ সুদ আসল সহ দিয়ে গেছেন আমাকেই। তুই তাদের কাছে উজ্জ্বলতর দেবতা হয়ে উঠেছিস। কিন্তু আমার দিক থেকে ভেবে এক বার বুকে হাত দিয়ে বল তো, সব দোষই কি একা আমার? সঙ্গে সঙ্গে ভেবে বসিস না, তোকে অভিযুক্ত করব বলে এই চিঠি লিখছি। না, আমি তোর কথা, কেবল তোর কথাই বলছি না। বলছি আমার কথা। যে কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণে বলা যায় না।

আজ যদি ভাবতে বসি, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটা, তা হলে মনে হয় ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময়টাই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাবে। আরও নির্দিষ্ট করে বলি, তোর সঙ্গে কোচিং থেকে হেঁটে গল্প করতে করতে ফেরাটাই আমার সোনার যুগ। আমার কাছে সেই দেশ ফিরে এলে আমি গোটা জীবন তার সঙ্গে হাঁটতে রাজি। হ্যাঁ, গোটা জীবন। যে কথা বলে কিন্তু গায়ে পড়ে কথা বলে না। যে ঠাট্টা করে কিন্তু কৌতূহল দেখায় না। যে নিছক কথার ওয়ুখে আমার গুমরে থাকা মনকেও উজ্জ্বল করে বদলে দিতে পারে। তাই যখন বাবা এক দিন আচমকা বাড়ি এসে তোকে পাত্র নির্বাচন করার কথা বলল, তখন দারুণ আনন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বিয়ের দিনটা পরের দিন হলেই ভাল হয়। আর এইখানেই আমার প্রথম নালিশ। আর সেটা আমার বাবার বিপক্ষে।

বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন বাবা। আমি ছিলাম নয়নের মণি। আমায় চোখে হারাত মানুষটা। লোকে বলত, “ননীবাবু, আপনার তো মোটে একটা সন্তান। এত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবেন?” বাবা বলতেন, “মেয়ের বিয়ের পর এই বাড়িটা ওকে দিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।” আমি আর একটু বড় হওয়ার পর বলতেন, “আমার সব শখ আল্লাদই পূর্ণ হয়ে গেছে। এ বার একটা ভাল ঘরজামাই পেলে বেঁচে যাই!” আমি ভাবতামও না কথাতা নিয়ে। পাভাও দিতাম না। এমন

কত কথাই তো বাবা বলত। এমনকি তোর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরও মনে হয়নি যে বাবা সাজিয়ে গুছিয়ে পরিকল্পনা করে আমার জীবনের একটা বড় দিকের দিকনির্দেশ করে দিল। সব কিছু ঠিক থাকলে সেই পরিকল্পনা মতোই উৎসব অনুষ্ঠান বিবাহ বাদ্য সম্পন্ন হয়ে যেত। কিন্তু ওই যে, যা হওয়ার কথা থাকে, তা হয় না। তাই আমার মাথার পোকাগুলো একযোগে সদলবলে নড়ে উঠল। আর সেটা একটা সন্ধের ঘটনা মাত্র।

দিনটা কবে জানিস? বলল বুঝতে পারবি, তেসরা মার্চ, আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন। তুই তো দেখেইছিস, বাড়ি ভর্তি আত্মীয়-স্বজন এসেছিল। আমাদের পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য হল ন্যাড়া যজ্ঞ। কোনও শুভ কাজ হলে তার আগে পরের কয়েকটা দিন আত্মীয় স্বজন থেকে যায়। খাওয়া দাওয়া আনন্দানুষ্ঠান চলে। আমাদের বাড়িতেও হচ্ছিল। দিনহাটা, মঙ্গলকোট, বারাগসী, ময়নাগুড়ি, অম্বিকাকালনা থেকে মাসি-পিসি-মামা-কাকা-জেঠারা এল। সে এক আনন্দযজ্ঞ। সেখানে প্রথম সুর কাটল মেজো মাসি। মায়ের পিঠোপিঠি বোন। আমাদের সংসারের নাড়ি নক্ষত্র জানে। সেইসবুদের পরের দিন এক ঘর লোকের সামনে সে বলল, “হ্যাঁ রে, এ কী করল ননীদা! মেয়েকে কাছে রাখবে বলে দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করল।” মুহূর্তে আমার মনটা বিরজিত হতে গেল। জীবন শুরু সময় এমন একটা কথা! বুঝলাম, এই কাঁটাটা বাবাকে জীবন ভর সহ্য করতে হবে। এবং আমাকেও। মনে করে দেখ, ফোনে তোকে বলেছিলাম কথাটা। তখন ঘণ্টার পর-ঘণ্টা ফোনের সঙ্গে লেপ্টে থাকতাম দু’জনে। তুই গায়ে মাখিসনি। ভালই করেছিস। উদারতা তোর ধর্ম। কিন্তু আমার ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ শুরু হল।

সেজো মাসির একার প্রতি অভিযোগ নয়, অভিযোগ রয়েছে অনেকের ওপরই। আমার জেরু তেল কোম্পানির বড় চাকুরে। ভুবনেশ্বরে কর্মসূত্রে থাকেন। তিনি বিকেলে চা খাওয়ার সময় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “না ননী, তোমার এই বিয়েটা পাকা করার আগে তলিয়ে ভাবা উচিত ছিল। ছেলেটা ব্যবসা করে দাঁড়িয়ে যাবে, সে অতি সুখের। কিন্তু নাগোএগ্রহীন এক জনকে চাটুজে পরিবারে যুক্ত করে নেওয়া কি ঠিক হল? তা বলে যারা অনাথ তাদের বিয়ে থা কি হয় না? হবে, নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু চাটুজের সঙ্গে নয়।” আমি ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিলাম। মনে পড়ল, নিজের বিয়ে নিয়ে কথা বলা শোভন হবে না। দুঃখ হল, বাইরে যারা আধুনিকতার পোশাক পরে থাকে, ভিতরে তারা কী! ক্রমে দেখা গেল সেজো মাসির তোলা প্রশ্নটা সকলের মনের কথা হয়ে উঠেছে, “ঘরজামাই পাবে এই আনন্দে ননী চাটুজে রাজকন্যা সহ রাজত্ব এক হাঘরের হাতে তুলে দিচ্ছে!” এ সব আলোচনা আমার সব উৎসাহ, উচ্ছাসকে শুষে নিল। আমি ভেতরে ভেতরে ফুটতে শুরু করলাম ওদের বিপক্ষে।

আমি আশা করেছিলাম খুড়তুতো-মাসতুতো ভাইবোনদের আমাদের পাশে পাব। পেলাম। তারা ওই সব কথায় পান্ডাও না দিয়ে হইচই, হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকল। কিন্তু তার মধ্যেই আমার এক খুড়তুতো বোন, প্রায় আমারই সমবয়সি সায়ন্তনী ঠাট্টা করে বলে উঠল, “তুই-ই ঠিক করেছিস, আমিও যদি এ রকম একটা পুরাতন ভৃত্য মার্কা বর পেতাম...” বুঝলাম, এই টিকা-টিপ্পনীও আমায় শুনে যেতে হবে জীবন ভর। তাও দেখ, তুই কিন্তু তখন আমাদের কর্মচারী নোস। আসলে কী জানিস, তুই বরাবরই আমার বাবা-মার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশেছিস। হয়তো তোরও একটা পরিবার পাওয়ার টান ছিল ভেতরে ভেতরে। আত্মীয়দের কাছে তাই তুই অচেনা ছিলি না। পরবর্তী কালে আমরা তোকে আপন করে নিতে চেয়েছি, তারা দূরে ঠেলতে চেয়েছে। এই তারাই তো সমাজ তৈরি করে, তাই না? সে দিন, সেই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা নিম্নচাপের কেন্দ্র তৈরি হল। আনুষ্ঠানিক বিয়ে পিছিয়ে যাক।

সময় ফুরিয়ে আসছে। কম কথায় সারতে হবে। আমি জানি না আজকের পর আমাদের আবার কবে দেখা হবে! জানি না, ভবিষ্যৎ কী! সে দিন মনে মনে ভাবলাম, না, আমাকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু একটা করতে হবে। তার পর বিয়ে। সিদ্ধান্তটা নিয়েই তোকে ফোন করতে গেলাম। ডায়াল করেও কেটে দিলাম। ভাবলাম দেখা করে বুঝিয়ে বলব। কিন্তু তার পরই আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটে

গেল! আমার কথায়, যা হওয়ার ছিল না তা-ই হল!

আমার ছোট মামাকে তো তুই চিনিসই। শুধু সংসারটাই করেননি বাকি বিশ্বসংসারের যাবতীয় বিষয়ে তাঁর আগ্রহ! বাড়িতে নানান লোক, আমার মনে টালবাহানা, এমন সময়ে তিনি বললেন, চল ঘুরে আসি। দাঁড়া, দিনটাও বলে দিতে পারব। রেজিস্ট্রি বিয়ের পরের পরের দিন বিকেলে। আমি প্রশ্ন করলাম না। মামাই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল, আমি পাশে বসলাম। মামা এক সময় এক একটা জিনিস নিয়ে ডুব দেয়। জানতে চাইলাম, এখন কি নিয়ে খেপেছে? মামা বলল লোকগান। শুনলে জীবন সার্থক হয়ে যাবে। আমি বললাম, আর না শুনলে কী হবে? মামা বলল, কী আর হবে? বিয়ে, নুন, চাল, আলু, বাচ্চার কাঁথা বদলানো করে করে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বলে খ্যা খ্যা করে হাসতে থাকল। আমি হাসতে পারলাম না। মনে হল ঠাট্টার ছলে হক কথাই বলেছে মানুষটা। সেই প্রথম মনে হল, বেঁচে থাকার জন্য একটা বিরাট দুনিয়া আছে। তার সহস্র রকম বেচিত্র আছে। কিন্তু আমরা গাছে বাসা বাঁধা পরজীবীর মতো একটা ঠিকানায় থেকে যেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গাছের একটা ডাল থেকে অন্য ডালই আমাদের গন্তব্য। তার বেশি নয়। আমাদের লক্ষ্য বিয়ে। আমাদের সাফল্য সন্তানের জন্ম দেওয়া। ভুল বললে ক্ষমা করিস, কিন্তু আমরা, নদী আর দেশ, যৌথ জীবন শুরু নিয়ে কোনও পরিকল্পনা করেছিলাম কি? নাকি নিশ্চিত ছিলাম, গড়পড়তা জীবনই অতিবাহিত করব। ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে উঠে তুই সোনার নেকলেস পরিয়ে সাত দিনের ইউরোপ সফরে নিয়ে যাবি তোর গিলিকে! অভিযোগের এই তির অবশ্য তোর দিকে নয়, আমার নিজের দিকেও। কিন্তু বল, আমরা কি অন্য রকম হতে পারতাম না? আমি তোর হাত ধরে বলতে তো পারতাম, বিয়ের পর তুই আর আমি, নদ আর নদী মিলে দেশ দেখে বেড়াব। তুই হয়তো প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলতিস, ব্যবসার কী হবে? আমি ভালবেসে বলতাম, ছ’মাস ব্যবসা, ছ’মাস ভ্রমণ! কেমন! তুই দর কষাকষি করে বলতিস, না, আট আর চার। আমি রাজি হয়ে যেতাম। হেসে বলতাম, বছরে চার মাস করে ঘুরলে কত দিনে দেশের সব নদী দেখা শেষ হবে? তুই কি বলতে পারতিস না, দেখা শেষ করতে হবে তা-ই বা কে বলল!

কোন রাস্তা দিয়ে কত ক্ষণে পৌঁছেছিলাম মনে নেই, সে দিন মামার সঙ্গে গিয়ে পা রাখলাম একটা গ্রাম্য মেলায়। মেলায় হাজারও দোকান। গিজগিজে ভিড়। এক পাশে মঞ্চ। মঞ্চের সামনে বড় একটা মাঠে চট পাতা। সেখানে সারি সারি মাথা। তারই মধ্যে আমায় সঙ্গে নিয়ে বসে পড়ল ছোট মামা। আমিও শ্রোতাদের অংশ হয়ে গেলাম কয়েক নিমেষের মধ্যে। সকলে মিলে একটাই মূর্তি। তারা এক ছন্দে মাথা নাড়ছে, গলা মেলাচ্ছে, চোখের জল মুছছে। তা হলে কী একশত মানুষের বৃকের ভেতরের বেদনা একই রকম? যখন গায়িকা তাঁর উদাত্ত কাণ্ডে গাইলেন, “গাঙ পার হইতে ছ’আনা, ফিরে আইতে ছ’আনা, আইতে যাইতে বারো আনা উসুল হইল না,” তখন বৃকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। মনে হল কোথাও যাওয়ার কথা আছে আমরা। আছে কোথাও পৌঁছানোর! আমি সে কথা ভুলে বৃথা পুতুল খেলার মতো সংসার সংসার খেলায় নাম লেখাচ্ছি। কত কী ভাবলাম! পরে এক জন গায়কের ভারী গলায়, “আমায় ডুবাইল রে, আমায় ভাসাইল রে” শুনে সম্বিৎ ফিরল। সত্যিই ফিরল কি? আবার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল একটা ছটফটানি। অস্থির হয়ে উঠলাম ভেতরে ভেতরে। সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলাম, জীবনের মানে খুঁজতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কোনও একটা ভাল, মনের মতো কাজে যুক্ত হতে হবে আমায়। বিয়ের সিদ্ধান্ত ভুল। সেটা শুধরে নিতে হবে। সে দিন কত রাতে মামার সঙ্গে ফিরেছি খেয়াল নেই। কিন্তু ফিরে গম্ভীর মুখে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “বিয়ের জন্য তুমি আমার মতামত চাইলে না কেন?” বাবা বললেন, “তোর জন্যই তো সব।” আমি বললাম, “পাত্র পছন্দ কি না আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে?” বাবা রেগে বললেন, “তাজ্জব! পাত্র পছন্দ নয় সেটা তুই আমায় বলেছিলি?” বাবাকে বললাম, “এখন বলছি।” বাবা পান্ডা দিলেন না।

তার পর কী হয়েছে তুই জানিস। এখন খাতায় লিখে তোকে জানাচ্ছি, তুই আমার অপছন্দ। বন্ধু দেশ আমার পছন্দ, খাবারের ব্যবসায়ী, হিসেবি দেশ আমার না-পছন্দ। সহজ, সরল, পরিশ্রমী দেশ আমার বন্ধু, কিন্তু গড়পড়তা বেঁচে থেকে সংসার করতে চাওয়া দেশ

আমার বিরক্তি।

সম্ভবত তোকে বোঝাতে পারলাম না। কিছু করার নেই। তুই তো জানিস, আমি বিশ্বাস করি, যা হওয়ার কথা তা হয় না।

ভাল থাকিস। আমাদের আর কোনও দিন দেখা না হলে খুব কি ক্ষতি হবে?

নদী।

এর পর আর এগারো দিন আমি এই তল্লাটে থাকলাম। কাজ তিনটে সারলাম। ব্যাকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে সব টাকা তুলে নিলাম। ঘর ছেড়ে দিলাম। আসবাবপত্র বিলি করে দিলাম রাজু আর সান্ত্বনাদির কাছে। ফোন ত্যাগ করলাম। খেয়ার সম্পত্তি হিসেবে সেটাকে গচ্ছিত রাখলাম ওদের কাছে। সেখান থেকে কিছু দরকারি নস্বর টুকে রাখলাম। তার পর সত্যি সত্যি বাড়ী হাত পা হয়ে একটা ব্যাগ গোলুর পিঠে বসিয়ে রওনা দিলাম। এই এলাকার সঙ্গে সুতোর যোগাযোগও আর থাকল না। এক বার বালকাবাসে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। যাওয়া হল না। মোহরদার স্মৃতি পাঁচিল হয়ে দাঁড়া। দ্বিজুর সঙ্গে এক বার দেখা করে এলাম, “তোদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।” ও বলল, “তা হলে একটা বিড়ি খাইয়ে যা!” এই ক’দিনে এক বারও দেখা হয়ে যায়নি নদীর সঙ্গে। তাতে আমি স্বস্তিই পেয়েছি। কথা ভঙ্গ অন্তত হল না। শেষমেশ রওনা দিলাম। মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে ফুরফুরে মেজাজে গোলুকে বললাম, বল, কোথায় যাব? গোলু বলল, সোজা! সোজা সোজা! আমি অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলাম। মাথাটা হালকা লাগছিল। সত্যিই মনে হচ্ছিল, রানওয়ে দিয়েই ছুটে চলেছি আমি। কোনও গাছের ডালে আমার সীমানা ঐকে দেওয়া নেই। কোনও সাংসারিক দায়বদ্ধতার পিছুটা নেই। যেতে যেতে এক বার মনে পড়ল মোহরদার কথা। যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এক বার মনে হল দ্বিজুর কথা। মন্দিরাকে ভালবেসে সে-ও মৃতপ্রায় হয়ে আছে। পর ক্ষণে মনে হল নিজের কথা। গোলুকে জিজ্ঞেস করলাম, এই তিনটে গল্প কি আসলে একটাই গল্প? যে মোহরদা, যে দ্বিজু, সে-ই কি আমি? গোলু উত্তর দিল না। আজগুবি প্রশ্নকে ও পান্ডাই দেয় না। ওর ভাষা গতি। ওর প্রাণও গতি। গতির মেঘে ভাসতে ভাসতে আমি চললাম মহানগরের প্রশস্ত রাজপথ ধরে। আমার চল পাশে আলোয় উজ্জ্বল গাড়ি আর গাড়ি। একটু পরেই উঠতে হল উড়ালপুলে। মসৃণ পথে উচ্চ গতিতে রানওয়ের মতোই ছুটে চলেছি। ডান দিকে পাঁচ তারা হোটেলের ঘরগুলোয় সাদা আলো জ্বলছে। দূরে নাক বরাবর সায়েন্স সিটি ভবনও আলো বিচ্ছুরিত করছে। এত অন্ধকারের মাঝখানে এত আলো দেখে মনে হচ্ছে কোনও রূপকথার রাজ্য ফুঁড়ে চলেছি আমি। এই কঠিন জগতে বেঁচে থাকাটাই এক অলৌকিক আনন্দ। এগিয়ে চলাটাই মায়াবী জাদুকরী। সব কষ্ট, না-পাওয়ায়কে দুচ্ছাই করে মনের আনন্দে গোলুকে গান শোনাতে শোনাতে এগিয়ে চললাম আমি। কে বলেছে, নির্দিষ্ট গন্তব্য না থাকলে এগোনো যায় না? গন্তব্যই চলনকে সীমাবদ্ধ করে। ‘মা’ উড়ালপুল থেকে এক বার আকাশে তাকিয়ে উজ্জ্বল সুমহান ধ্রুবতারাকে দেখে মনে হল, সুদূর অতীতে বিশ্বপথিকরাও হয়তো এ ভাবেই আচমকা বেরিয়ে পড়ত সুদূরের নেশায় অসীমের আহ্বানে।

সাড়ে চার বছর পর

ঘরের দেওয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাদ কাঠের। কাঠের দেওয়ালে কাঠের নকশা। ক্যালেন্ডার বলছে মে মাস, প্রবল গ্রীষ্মকাল। কিন্তু এখানে গরমেই যা ঠান্ডা, তা আমার হাড় কাঁপিয়ে দেয়। শীতকালগুলোয় তো আমি প্রায় শীতঘুমেরি কাটিয়ে দিই। তখন স্নানের কথা মুখেও আনি না। সকালেই ফুল হাতা সোয়েটার, টুপি, মোজা, জুতো পরে বেরোচ্ছি দেখে হো হো করে হেসে উঠল দেওরতন রাই। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, “হাসির কী আছে? ঠান্ডা লাগলে সোয়েটার পরব না?” দেওরতনের অবশ্য মুখটাই হাসি হাসি। সব সময়ই প্রশান্ত। এই রকম মুখ নিয়ে ও ওর গিল্লির সঙ্গে কী করে ঝগড়া করে কে জানে! তা সেই হাসি হাসি মুখে আরও এক চোট হাসি মাখিয়ে ও বলল, “তুমি এখন সওদা করতে যাবে, তাই তো?” আমি পিঠের ব্যাগটা ঠিক করে বললাম, “তা তো যাবই! না হলে সাতসকালে কে বেরোয় ঘর থেকে?” দেওরতন বলল, “চড়াই ভাঙবে, উংরাই বেয়ে নামবে, তাই তো?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, তা-ই।” সে বলল, “আজ আকাশ পরিষ্কার, রোদ উঠবে বলে মনে হচ্ছে।” আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, “তা মনে হচ্ছে বটে।” এ বার সে রহস্য ফাঁস করে বলল, “তা হলেই বোঝো। হটিবে, ঘামবে, ও দিকে রোদেও গরম হবে। তা হলে কেন সোয়েটার পরেছ দাদা?” আমি হেসে ফেললাম।

দেওরতনের মুখে দাদা কথাটা বেশ মিষ্টি লাগে শুনতে। সমতলের বাঙালি পুরুষদের ওরা দাদা বলে। আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, “কাল গুন গুন করে কী গাইছিলে?” দেওরতন বলল, “ওটা আমাদের গান আছে দাদা, ওকে আমরা বলি হিয়ারি ছাম।” বললাম, “আজ সন্দের সময় গাইবে দেওরতন, তা হলে মন দিয়ে শুনবা!” অমনি সে দু’দিকে প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলল, “সে তো হবে না দাদা!” দেওরতনের প্রত্যাখ্যানও সুন্দর। জানতে চাইলাম, কেন তা হবে না। সে বলল, হিয়ারি ছাম বিয়ের গান। বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়া তা গাওয়া যাবে না। কাল তিলক কুশান রাইয়ের মেয়ের বিয়ে ছিল। সেখানে ওই গান গাওয়া হয়েছে। তিন মাইল নাচ থেকে ওই গান গাইতে গাইতে সে ফিরেছে। তবে আমি চাইলে কয়েক দিন পর সাইমা ছাম গেয়ে সে শোনাতে পারে, বলে সান্ত্বনা দিল। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেই গানের হেতু কী! ও বলল, রাই সম্প্রদায়ের কোনও পরিবারে বাচ্চা জন্ম নিলে সাইমা ছাম গাওয়া হয়। তার বোন পিয়ারী রাই দেবী সন্তানসম্ভবা। দিনকয় পরে তার ছেলেমেয়ে হলে তখন সাইমা ছাম এমনিতেই গাওয়া হবে।

আমি “বেশ বেশ,” বলে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। কোলাখামে বাজার নেই। টিমটিমে একখানা মাত্র দোকান। এখন সেখানেই যাব। বেশি কিছু দরকার হলে আট কিলোমিটার দূরে লাভায় যেতে হয়। সেখানে তাও কিছু দোকান মেলে। কাছেপিঠে শহর বলতে কালিম্পং। তাও প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার। গোলুর উপর চড়ে মাসে এক দিন অন্তত যেতেই হয় সেখানে। গোলু অবশ্য রা কাড়ে না। সমতলের দু’চাকার যান পাহাড়ের দিবিয় মানিয়ে নিয়েছে।

বেরোনোর সময় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, লম্বা ঘরে চিল চিৎকার জুড়েছে ছেলেমেয়েগুলো। কেউ বাংলা, কেউ নেপালি, কেউ ইংরেজিতে নিজের নিজের ক্লাসের পড়া পড়ছে গলা ছেড়ে। আমাদের এই শ্রীকোলাখাম-এর নিয়ম কানুন অদ্ভুত। আসলে সে অর্থে কোনও প্রথাগত নিয়ম নেই। কিন্তু সকালে প্রার্থনার পর প্রথম ক্লাসটা নিজেদের পড়ার জন্য নির্ধারিত। আমি দেখেছি, আবহাওয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল থাকলে ওরা একটু বেশি চোঁচায়। আমি সেটা দূর থেকে উপভোগ করি। আমায় কাছে পিঠে দেখলেই ওরা ছুটে এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, আজ খেলাবে না? আমি মাঝে-মাঝে ওদের নিয়ে সামান্য চড়াই ভেঙে তবসুমনা মাঠে চলে যাই। পাহাড়ের খাঁজে সবুজ ঘাসে ঢাকা এক চিলতে মাঠে ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা দল গড়ে সে দিন ফুটবল খেলিয়েছিলাম। মেয়েরা তিন গোলে জিতেছে। আবার একটা ম্যাচ খেলে সমতা না ফেরাতে পারা পর্যন্ত মেয়েদের টিটকিরি সহ্য করতে হবে বেচারী ছেলেগুলোকে!

কোলাখামের এই রাস্তায় হাঁটার অবশ্য অন্য একটা আকর্ষণ আছে। কোনও কোনও জায়গা থেকে উত্তর পশ্চিম আকাশে তাকালে মেঘশূন্য দিনে এক গুচ্ছ শ্বেতশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়। এই ক’বছরে এত বার দেখেও আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া অন্য কোনও শৃঙ্গ আলাদা করে চিনতে পারি না। কিন্তু দেওরতন আমায় কাবরু, পানডিম, সিনিওলচু শৃঙ্গ দেখিয়েছে একাধিক বার। এই ঐশ্বর্য আর কোথায় পাব! দেওরতন অবশ্য বলে, ভবিষ্যতে কোলাখামের মূল সম্পদ হয়ে উঠবে আমাদের এই ইশকুলখানা। ও-ই এর নাম দিয়েছে শ্রীকোলাখাম। ওর স্বপ্ন, আমার চেষ্টা আর বিশেষ কয়েক জনের পরিশ্রমে ইতিমধ্যেই কিছুটা অগ্রসর হয়েছি আমরা। পাহাড় বা সমতলের কোনও অনাথ শিশুর খোঁজ পেলেই বাঁপিয়ে পড়ি আমরা। প্রশাসন ও আইনের অনুমোদন মিললে তাকে নিয়ে চলে আসি শ্রীকোলাখামে। তার পর হই হই, হইচই আর ছল্লোড়ের এক স্বর্গরাজ্য। কোলাখামে লোকজন কম। রাই সম্প্রদায়ের বাষট্টি পরিবার ছিল। এখন আমরা যোগ হতেই নাকি বাষট্টি আর একে একশো হয়ে গেছে, হাসতে হাসতে বলে দেওরতন।

এই রকম একটু কিছু ছে য়েতা পারে, তা কিন্তু কেউই

ভাবিনি। এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই পরিচয় হয়েছিল দেওরতনের সঙ্গে। পরিচয় হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু যে কথা থাকে না তা যে কী ভাবে হয়ে যায়, তা এখনও বুঝলাম না। আমি তখন গোলু নামক মোটরসাইকেলে চড়ে ভূভারত ঘুরছি। দক্ষিণ ভারত ঘোরা হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পূর্ণ হচ্ছে, কিন্তু জমা পুঁজি কমছে। ঘুরতে ঘুরতে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। তামিলনাড়ুর থাকেডিতে কলা পিস পিস করে কেটে গরম গরম চিপস ভেজে বিক্রির একটা দোকানে আলাপ হল এক প্রৌঢ় তামিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথা এত জমে গেল যে তিনি বাড়িতেই আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন। দুটো দিন থাকলাম। কিন্তু তিনি আর ছাড়তে চান না। তাঁর মনে হয়েছে আমি তাঁর ছেলে। যে ছেলে প্রয়াত হয়েছে আঠারো বছর আগে। আমার মধ্যে তার হুবহু ছায়া খুঁজে পেয়েছেন তিনি। চাইলে সেখানেই থিতু হওয়া যেত। কিন্তু মহত্তর কিছু করার সুপ্ত ইচ্ছেটা ছিল! রাঁচি আসার পথে জাতীয় সড়কের ধারে একটা ধাবায় এক বেলা ছিলাম। আমার বয়সি একটা মেয়ে মহা উৎসাহে সেই ধাবা চালাচ্ছে। অনেক কথা হল তার সঙ্গে। আমি খাবারের ব্যবসা সামলেছি শুনে সে বলল, সেখানে তার ধাবার পাশে একটা দোকান দিতে। বাঙালি খাবারের দোকান। আমি বললাম, “তাতে তোমার ব্যবসা তো কমবে!” সে বলল, “না গো বাঙালি বাবু, ব্যবসা বাড়বে। কাস্টমারদের নিয়ে তুমার সঙ্গে বগড়া করব, তাতে সময়টা ভাল কাটবে। তুমার মতো লোকের সঙ্গে বগড়া করে মজা। তুমরা শেষে গিয়ে মিটমিট করে নাও। কথায় কথায় বন্দুক বের করো না। এটা তুমার ভাল দিক আছে!” আমার মাথায় হাত! আধ ঘন্টায় এ মানুষ চিনে যায়? মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি বিয়ে করেছ?” তখনই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। তার পর বলল, “আর এইটা তুমার খারাপ দিক! তখন কি জানতাম, ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই বাংলারই কোলাখামে এসে আটকে যাবা!”

পর্যটকদের মতো হোটেলে না থেকে আমি হোম স্টে বা সরকারি ডরমেটরি আর কখনও কখনও মানুষের অযাচিত আমন্ত্রণ রক্ষা করেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এক জন গাড়িচালকের সঙ্গী হয়ে সপ্তাহ খানেক কাটল ডুয়ার্সে। তার পর আবার গোলুর পিঠে চড়ে রওনা দিলাম। মালবাজার থেকে গুরুবাথান হয়ে তখন লাভায় পৌঁছেছি। এমনিতে লাভা পর্যটন স্থল, কিন্তু তখন সময়টা ছিল ঘোর বর্ষা। সাত হাজার দুশো ফিট উচ্চতার লাভাবাজারে তখন পর্যটক বিশেষ ছিল না। এখন জানি, মেরেকেটে আঠারোশো মানুষের বাস, তাই পর্যটক না থাকলে এক আশ্চর্য নীরবতা ঘিরে রাখে লাভাকে। সে দিন, প্রথম বার লাভা যাওয়ার পথে মুগ্ধ হয়েছিলাম। খাড়া উচু রাস্তা। মোড় ঘুরলেই কালচে কুয়াশার মতো দেখতে মেঘ। আমি সমতলের মানুষ। মেঘ তো আমার কাছে অবিশ্বাস্য এক স্বপ্ন। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, এই সামান্য ধোঁয়া-ধোঁয়া, হালকা, ভাসমান চাদরটাই জল বেঁধে রাখে! বেশি ক্ষণ কল্পনায় ভাসতে হল না, শুরু হল বৃষ্টি। কী তীব্র তার ফোঁটা, কী তীক্ষ্ণ তার শব্দ। রাস্তার ধারে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় পেলাম, সেখানেই দাঁড়িলাম। স্থানীয় কয়েক জন মানুষও ছিলেন সেখানে। প্রত্যেকের হাতে বেশ পোক্ত ও বড়সড় ছাতা। তাদের মধ্যে এক জনের সাজ পোশাক বেশ সুন্দর। গলা বন্ধ কোট, মাথায় নেপালি টুপি। মুখে অনিন্দ্য সুন্দর হাসি। বয়স পঞ্চাশ পঞ্চাশ হবে। পরে পরিচয় হয়েছিল, এই মানুষটিই হলেন দেওরতন রাই।

সে দিন বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। আমরা, বাকি অপেক্ষমাণ জনগণ নিরুদ্বিগ্ন চোখে বৃষ্টি দেখছিলাম। হঠাৎ একটা গাড়ি আসতে দেখে ছাতাটা খুলেই পড়িমড়ি করে সেটা থামালেন ভদ্রলোক। তার চালকের সঙ্গে কথা বলে দু’দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে ফের এসে দাঁড়ালেন আমাদের মাঝখানে। আমি যেচেই জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কোথায় যাবেন?” ভদ্রলোক হেসে বললেন, “আমি যাব কালিম্পং, কিন্তু এ ছোকরা যাবে রিশপ। আমি বললাম, কালিম্পং ঘুরে তার পর যাও, কিন্তু দেখো কাণ্ড, গালি দিয়ে চলে গেল!” তাঁর কথায় সকলে হেসে উঠল। আমি স্থানীয় না হলেও বুঝলাম, দুটো গম্ভাব্য দুই দিকে। এ বার গায়ে পড়েই জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কালিম্পং যাবেন?” তিনি আবার হেসে বললেন, “যাব না মানে? কালকের ডাকে একটা চিঠি ধরাতেই হবে। না হলে আমার মাথা কাটা যাবে।” স্থানীয় এক জন জিজ্ঞেস করল, কেন, কী দরকার

তার? সে বলল, “দাজু, জানো না, মেয়ের জন্মদিন সামনে। তাকে চিঠি না-পাঠালে চলবে? আমি তো কালিম্পং যাবই, না হলে কালিম্পংই আমার কাছে আসবে। বলো, সেটা কি ভাল হবে?” তারা তৎক্ষণাৎ দু’দিকে মাথা নাড়ল। আমি এ বার সরাসরি প্রস্তাব করলাম, “আমার সঙ্গে চলুন। রাস্তা চিনিয়ে দিতে পারবেন তো?” ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কোথায় যাবেন?” আমি হেসে বললাম, “আমার কোথাও যাওয়ার নেই। তাই আমি সব জায়গায় যেতে পারি। এখন যেমন কালিম্পং যাব। তাও যদি ডাক না ধরা যায় তা হলে সোজা আপনার কন্যার কাছে চলে যাব। জন্মদিনে তার হাতে বাবার চিঠি পৌঁছে দেব।” ভদ্রলোক থমকে গেলেন। কেন কে জানে সামনে এসে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন। আমিও বুকে হাত রেখে মাথা নোয়ালাম।

সে দিন যখন বৃষ্টি থামল, হিসেব করে দেখা গেল, গিয়ে আর সে দিনের ডাক ধরা যাবে না। ভদ্রলোক দ্বিধা ভরে বললেন, “আমার বাড়িতে থেকে যাবেন আজ?” বললাম, “সানন্দে। না হলে কাল সন্ধ্যা বেলা কী করে পৌঁছাব ডাকঘরে?” ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, “আপনার পরিচয়?” বললাম, “কোনও পরিচয় নেই, আমি অনাথা।” ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। সে হাত আজও ছাড়েননি। সে দিন বিকেলে গোলুর পিঠে দু’জনে চেপে পড়লাম। পাছাড়ি পথে একে বেকৈ সেই প্রথম আমি পা রাখলাম কোলাখামে। মেঘ, আধো আলো আধারিতে জায়গাটা কোনও অতিপ্রাকৃত নাটকের মঞ্চ বলে মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যায় বাড়ির বৈঠকখানায় বসে দেওরতন বললেন তাঁর জীবনের কথা। তিনি সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। স্ত্রী কলেজে পড়ান। দিল্লিতে। মেয়েও সেখানে লেখাপড়া করছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর মাস কয়েক হল দেওরতন কোলাখামে ফিরেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়, তাঁর শিকড় তাকে টানছিল। মাটির জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করছিলেন।

পরের দিন ডাকঘরের কাজ মিটিয়ে আমরা চা খেতে বসলাম কালিম্পংয়ের একটা কাচঘেরা দোকানে। সে দিনটা ছিল রোদ ঝলমলে। সেখানেই আমায় প্রস্তাব দিলেন দেওরতন রাই, “দাদা, তুমি থেকে যাও এখানে। আমরা চার জনে মিলে গরিব, হতাশ, অনাথ বাচ্চাদের ধরে এনে আনন্দ দেব। মানুষ করার চেষ্টা করব!” চোখ চলে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, “চার জন? বাকি দু’জন কারা?” দেওরতন বলল, “কেন, আমার স্ত্রী আর মেয়ে? দূরে আছে বলে ওরা থাকবে না?”

আমি থেকে গেলাম। এখানে জমিজমার অভাব নেই। কাঠ কিনে ঘর বানানো হল। স্কুলের পাশাপাশি হোম স্টে পর্যটনের উদ্যোগও নিচ্ছি আমরা। কলকাতায় ফোন করে জানতে পেরেছি, সান্ত্বাদি আর রাজু ভালই চালাচ্ছে কেটারিং ব্যবসা। শুধু ওরা সংস্থার নাম বদলে নতুন নাম রেখেছে, ‘দেশের খাবার’। আমি আর একটা কাজ করেছি। মল্লকে ফোন করে বলেছি, “জীবনে সুযোগ এক বারই আসে। তুই মল্লবীর হতে পারবি?” আমি লাভায় গিয়ে শের বাহাদুর দোরজির দোকানে পয়সা দিয়ে ফোন করি। ফোন পেয়ে মল্ল লাফিয়ে উঠেছিল, “তুই কোথায়? তুই কী করে উধাও হয়ে গেলি? কেন চলে গেলি দেশ?” আমি দু’চার কথায় ওকে শান্ত করে, তথ্য গোপনে রাখার মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করিয়ে বললাম, দুটো কাজ করতে হবে। এক, মন্দিরা নামের এক জনকে দার্জিলিং মেলে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খুব গোপনে। আর দুই, আমাদের দ্বিজুকেও একই দিনে একই ট্রেনে তুলে দিতে হবে। দরকারে জোর করে। যা ইচ্ছে ভুজুং ভাজুং দিয়ে। নিউ জলপাইগুড়িতে আমিই ওদের নামিয়ে নেব। টিকিট কেটে রাখব আমি। তা পাঠানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অনেক অনেক প্রশ্ন থাকলেও সব গিলে নিয়েছিল মল্ল। ছোট খাতা খুলে এর পর ফোন করেছিলাম মন্দিরাকে।

দ্বিজু, মন্দিরাও ভাবতে পারেনি যে এই দিনটা এক দিন আসবে। দেওরতন রাই আমার সব কাজে সঙ্গে থাকে। তাকে বললাম, “ওরা পালিয়ে আসছে। ওদের বিয়ের কোনও কাগজ নেই। বলো, আমাদের সমাজে ওদের ঠাই হবে না?” রাই শুনে তো হেসেই একশা। তার পর বলল, “এ তো চোরি বিহা!” আমি বুঝতে পারলাম না। সে আমায় বুঝিয়ে বলল, রাই সম্প্রদায়ে চার-পাঁচ রকম বিয়ে প্রচলিত। আমরা যাকে বলি দেখে শুনে বিয়ে বা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, রাইরা তাকে বলে

মাগি বিহা। কোনও বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলে তার নাম জারি বিহা। আর অন্যের বৌকে বিয়ে করে আনলে তাকে বলে চোরি বিহা। তার জন্য জরিমানা দিয়ে দিলেই হয়! আমি বললাম, “দেব। আমি ওদের হয়ে জরিমানা দেব। তুমি ওদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করো। আর দেখো, সে ঘরের দরজায় যেন ছিটকিনি থাকে!” রাই কী বুঝল কে জানে, বলল, “এখানে যা হাওয়া দেয় দাঙ্গ, সব ঘরের ছিটকিনিই বেশ শক্তপোক্ত। তোমার ঘরেরও।”

দ্বিজ-মন্দিরা খুব সহজে সহজ হতে পারেনি। কিন্তু দু'বছর কাটিয়ে এখন তারা সপ্রতিভ। স্কুল তো সামলাচ্ছেই, হোম স্টে চালু করার জন্য পাগল করে দিচ্ছে। দেওরতন ফোনাফুনি করে মন্দিরার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। এ বার শীতের ছুটিতে ওর মেয়ে, বৌ এলে বড় করে উৎসব হবে বলে পরিকল্পনা করছে। ওর অনেক পরিকল্পনা। আমি যখন শ্রীকোলাখামের কচিকাঁচাদের নিয়ে খেলায় মেতে উঠি, তখন দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কয়েক দিন থেকেই দেওরতন উসখুস করছে। তার পর কাল বলেই ফেলল, “দাওজি, একটা কথা বলব?” বললাম, “বলো দাদা।” সে বলল, বলছি, “ছেলেমেয়ে বাড়ছে, এখানে পড়ানোর জন্য আর এক জন থাকলে ভাল হত না?” আমি বললাম, “কী দরকার! আমাদের সঙ্গে না-মিশলে আবার সমস্যা!” তখন আর কিছু বলেনি।

ভোর থেকে তাকে ইশকুলে দেখিনি। আজ আবার একটা রোদ ঝলমল দিন। দেখি সুটবুট পরে কোথা থেকে আসছে সে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলে?” সে শুকনো মুখে বলল, “তুমি রাগ করবে না তো দাঙ্গু?” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে বলবে তো!” সে বলল, “আমার গিমি আগেই বলেছিল, আমি তোমায় বলার সাহস পাইনি।” দেখলাম দেওরতনের মুখ থেকে সব হাসি মিলিয়ে গেছে। আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, “আরে হয়েছে-টা কী, তা বলবে তো!” সে বলল, “এক জন মেম সাহেব।” বললাম, “কী হয়েছে মেমের?” বলল, “তার কেউ নেই।” জানতে চাইলাম, “তো?” দেওরতন বলল, “আমার স্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে পরিচয়। খুব ভাল মানুষ। আমরা এ রকম একটা ইশকুল চলাই শুনেই সে গিমির একেবারে হাত ধরে বলছে, এখানে থেকে বাচ্চাদের মানুষ করতে চায়। ব্যস, আর কিছু চায় না।” আমি হেসে বললাম, “তা দ্বিধা করছ কেন! সে আসুক! আমি এত ছোট মনের মানুষ নই দাদা।” তার পরও সে চুপ করে রয়েছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, “কবে আসবে তোমার মেমসাহেব?” দ্বিজ বলল, “এসে গেছে। আমি তাকে আনতেই ভোরে নিউ জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। পিছনের গাড়িতে মালপত্র নিয়ে আসছেন তিনি।”

একটু খারাপই লাগল। তার পর ভাবলাম, আমার কি? আমার পায়ে চাকা তো লাগানোই আছে। এখানকার ছেলেমেয়েগুলোর মায়া কাটাতে পারলে ফের বিশ্বসংসারই আমার সংসার। তবে এই ক'বছরে বড় ভালবেসে ফেলেছি এই ছোট পাহাড়ি গ্রামকে। গোলুকে বলি, দ্যাখ গোলু, নদীর ভাঙনে সব হারিয়ে কী সুন্দর একটা জায়গায় এসে ঘর বাঁধলাম। চার দিকে পাইন, রডোডেনড্রন।

গাছের পিঠে পরগাছা। সবুজ আর সবুজ। আলো আর আলো। প্রাণ আর প্রাণ। পড়ার ঘরে শুনতে পাচ্ছি, দ্বিজু গলা ছেড়ে গান গেয়ে গেয়ে ওদের পড়াচ্ছে। মন্দিরা কালই শোনাল, রবিবার ওদের নিয়ে চান্ডি জলপ্রপাত দেখতে যাবে। গাড়ি চলাচলের রাস্তা থেকে পাথর বাঁধানো সামান্য রাস্তা হেঁটে এলেই পর পর ঘর। এক দিকে বাগান। ঘরগুলোর কোনওটায় ক্লাস হয়, কোনওটায় রান্না। দোতলায় আমাদের, কচিকাঁচাদের থাকার জায়গা। আবহাওয়া ভাল থাকলে ঘর থেকে শেষ রাতে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় আঙুনের নাচে একটু একটু করে পৃথিবীতে নেমে আসছে দিন। আমি দেখি আর বলি, এটাই আমার রানওয়ে। বুঝলি গোলু, তাও বুকের এক পাশে একটা চিনচিনে ব্যথা কেন যে হয়, জানি না!

একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। গাড়ির চালক দেওরতনের চেনা। নেপালি ভাষায় সে মালপত্রগুলো নামিয়ে নিতে ডাকল। দেওরতন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল। আমারও কি যাওয়া উচিত? কিন্তু তার কোনও পরিচয়ই যে জানি না, কোন দেশের মানুষ তা-ও জানি না। বেশি ভাবলাম না, আমি তো অনাথ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। নাম, পরিচয়, বর্ণ, গোত্র জেনে আমি কী করব? অবশেষে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

এক পা এগোতেই চমকে গেলাম। গাড়ি থেকে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ব্যাগ নামাচ্ছে যে, সে কে? এই ভঙ্গি আমার ভীষণ চেনা। বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু একটা খেলে গেল আমার গোটা শরীরে। ব্যাগ নামিয়ে সে এ দিক ফিরতেই বুকের ভিতরে ধক করে উঠল। দু'হাতে দু'খানা ব্যাগ নিয়ে দেওরতনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে এগিয়ে আসছে, সে আর কেউ নয়, নদী।

এই পাহাড়ে নদী!

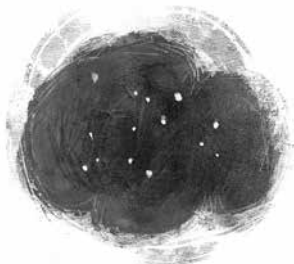
এতটা চমকে যাইনি আগে কখনও।

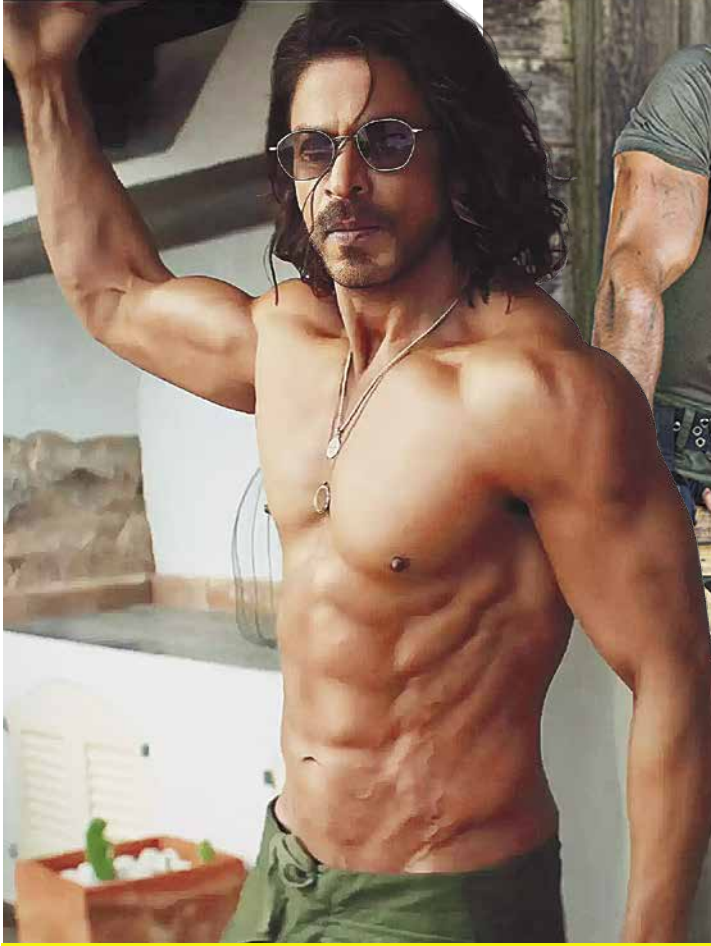
দু'পা এগিয়েই আমায় দেখেই থমকে গেল নদী। তার পরের আচরণের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দু'হাত থেকে ব্যাগ দুটো ফেলে এক ছুটে আমার সামনে চলে এল নদী। মোটা সোয়েটার পরেছে। ট্রেন বা প্লেনের যাত্রার ধকলে চেহারা য় ক্লান্তির ছাপ। ওর গায়ের চেনা গন্ধটা টের পেলাম। ও আমার কোটের কলার ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, “তুই? তুই-ই! এখানে! কী ভাবে? এখানে রয়েছিস তুই! কেন লুকিয়ে ছিলি তুই?” আমি উত্তর দিতে পারলাম না। দেওরতন হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে। সে সব পাত্তা না দিয়ে কলার ঝাঁকিয়ে নদী বলল, “এ ভাবে ডুব দিতে পারলি তুই? আমার কী হল খোঁজও নিবি না?”

আমি মাথা নামিয়ে নিলাম।

এক নিমেষ পরে মুখ তুলে দেখলাম নদীর দু'চোখে জল টল টল করছে। ও ঠোট কামড়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কান্না সামলানোর। আমি বুঝলাম গলা ধরে গেছে। কথা বলতে পারছি না। কোনও ক্রমে বললাম, “কিন্তু কথা ছিল যে...”

নদী ওর আঙুল আমার ঠোঁটে ঠেকিয়ে কথা বন্ধ করে দিল। তার পর বলল, “চুপ কর। আর একটা কথাও বলবি না তুই। বলেছিলাম না, যা হওয়ার কথা তা হয় না কখনও!”





ব্রহ্মাণ্ড-এ মজে বলিউড

ফ্র্যাঞ্চাইজ থেকে ধীরে-
ধীরে সিনেম্যাটিক
ইউনিভার্স তৈরির দিকে
ঝুঁকছে বলিউড। এবং
শুধু সিনেমায় নয়, ওটিটি
প্ল্যাটফর্মেও সেই একই
ট্রেন্ড প্রবেশ করেছে
গুটি-গুটি পায়ে। লিখছেন
অংশুমিত্রা দত্ত

হলিউড আজ যা ভাবে, তা-ই পথ
দেখায় বলিউডকে। যতই ফিল্ম
ইন্ডাস্ট্রির লোকজন ‘বলিউড’ শব্দে
রেগে যান, বলুন ‘বলিউড আবার কী!
আমরা কি হলিউডের কপি?’ আসল কথাটা
হল পশ্চিমের মুখ চেয়ে থাকে ‘হিন্দি ফিল্ম
ইন্ডাস্ট্রি’। ফলে হলিউডে যখন ফ্র্যাঞ্চাইজের
রমরমা শুরু হল, তারপরই হিন্দি ছবিতে
সিকোয়েলের স্রোত এল। তবে আগে
যেমন এই চোরাস্রোত ধীরগতিতে বইত,
এখন ইন্টারনেটের যুগে তার গতি বেড়েছে।
ফ্র্যাঞ্চাইজ বলতে ধরুন, ‘ইউনিভার্সাল
মনস্টার’ দিয়ে শুরু করি। ১৯৩১ থেকে
১৯৫১ অবধি এই ফ্র্যাঞ্চাইজে ড্রাকুলা,
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, দি ইনভিজিবল ম্যান, দ্য
উলফ ম্যান তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে ‘দ্য

ম্যাট্রিক্স’, ‘অবতার’ তো ভীষণ জনপ্রিয়
হয়। সম্প্রতি যখন পরস্পর একটি থিম
দ্বারা যুক্ত চরিত্রদের ক্রসওভার শুরু হল
ছবিগুলোতে, তখন শুরু হল সিনেম্যাটিক
ইউনিভার্সের খেলা। উদাহরণস্বরূপ বলা
যায়, ‘কনজিয়োরিং’ ইউনিভার্সের কথা।
২০১৩-তে ‘কনজিয়োরিং’ একটি একক
ছবি হিসেবে যখন সাফল্য পায় এবং
তারপর ‘অ্যানাবেল’ (২০১৪) ছবিটিও
সফল হয়, তখন নির্মাতাদের মনে হয়
‘কনজিয়োরিং’-এর সিকোয়েলগুলিতে যদি
পুতুল-ভূত অ্যানাবেলকে নিয়ে আসা যায়
এবং ‘অ্যানাবেল’-এর পরবর্তী কিস্তিগুলিতে
যদি ‘কনজিয়োরিং’-এর চরিত্রদের আনা
যায়, তা হলে মুনাফা হতে পারে দ্বিগুণ।
কারণ ইতিমধ্যে দু’টি ফ্র্যাঞ্চাইজই জনপ্রিয়।

ফলে তৈরি হল ‘দ্য নান’ (২০১৮)। সেটিতে ‘কনজিয়োরিং’ এবং ‘অ্যানাবেল’ দু’টিই প্রবেশ করল। তবে এটা গেল ছোট বাজেটের ক্রসওভার। এই মুহূর্তে হলিউডের সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয়তম ইউনিভার্স হল ‘মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স’। এই যে ভবিষ্যতে মার্ভেলের অতিমানবরা পরস্পরের ছবিতে ঢুকে পড়বে এবং একটি দৈত্যাকার ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করবে সুপারহিরোদের, এটা প্রথম বোঝা যায় ২০০৮-এ যখন ‘আয়রন ম্যান’ মুক্তি পায়। তারপর থেকে কখনও আয়রন ম্যানের ছবিতে হাল্ক, ক্যাপ্টেন আমেরিকা এল, তো কখনও থরের ফ্র্যাঞ্চাইজে চলে এল আয়রন ম্যান। এবং সবশেষে এই সুপারহিরোরা যখন ‘অ্যাভেঞ্জার’ হিসেবে ‘এন্ডগেম’-এ (২০১৯) এল, তখন মানুষের আবেগ এবং বক্সঅফিস দুই-ই বাঁধ ভেঙেছে। ফলে টনক নড়েছে সেই সব নির্মাতাদের, যাঁরা এতদিন ফ্র্যাঞ্চাইজ নিয়েই খুশি ছিলেন।



■ ‘পাঠান’ এবং ‘টাইগার’ স্পাইভার্সের দুই গুপ্তচর একসঙ্গে

মাল্টিস্টারার স্পাইভার্স

এই প্রতিবেদনের ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা। এ বছরের গোড়ায় যখন ‘পাঠান’ মুক্তি পায়, তার অনেক আগে থেকেই হাওয়া উঠেছিল,

‘টাইগার’ বিদায়কালে ‘পাঠান’-কে বলে ‘আমার কিন্তু পরের মিশনে তোরা সাহায্য লাগবে, আসবি তো?’ এবং তারও পরে বারবার উঠে আসে ‘ওয়ার’-এর এজেন্ট কবীরের প্রসঙ্গ



■ ‘ব্রহ্মাণ্ড’-র প্রথমভাগ ‘শিবা’ (উপরে)। ‘দেব’ (নীচে) মুক্তি পাবে ২০২৬-এ



শাহরুখের কামব্যাক ছবিতে সলমন খানের ক্যামিও থাকবে। দক্ষিণী হাওয়ায় আলুথালু বলিউডের ঘুরে দাঁড়ানোর পথ হতে পারে খানদের এই ‘ভাইচার’। অন্যদিকে বন্ধুর প্রতিদান হিসেবে সলমনের ‘টাইগার থ্রি’-তে শাহরুখও দেখা দেবেন অতিথি শিল্পী হিসেবে। প্রথমদিকে যা শুধু দুই খান-নায়কের পারস্পরিক সৌহার্দ্য হিসেবে ভাবা হয়েছিল, সিনেমা দেখতে গিয়ে সেই ধারণা পাল্টে গেল। সেখানে ‘পাঠান’-কে উদ্ধার করতে আসে ‘টাইগার’ ওরফে ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট অবিনাশ। ‘টাইগার’ বিদায় নেওয়ার সময় ‘পাঠান’-কে বলে, ‘আমার কিন্তু পরের মিশনে তোরা সাহায্য লাগবে, আসবি তো?’ এবং তারও পরে বারবার উঠে আসে এজেন্ট কবীরের নাম। চলে আসেন ‘ওয়ার’ ছবির চরিত্র কর্নেল লুথরা (আশুতোষ রানা)। মানে সমান্তরাল তিনটি স্পাই ফ্র্যাঞ্চাইজ ‘পাঠান’, ‘টাইগার’ এবং ‘ওয়ার’ নিয়ে একটি স্পাইভার্সের বিরাট পরিকল্পনা! তিনটি ছবিরই প্রযোজক যশ রাজ ফিল্মস। আবার এই যশ রাজই নিয়ে আসছে একটি মহিলা স্পাই ফ্র্যাঞ্চাইজ, যাঁর প্রথম মহিলা স্পাই-লিড হতে চলেছেন আলিয়া ভট্ট (ক্যাপ্টেন মার্ভেল, ওয়াডার উয়োম্যানরা কম যান নাকি!)। নিছক গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে চমক দেওয়ার ব্যাপারই নয় এটা! শাহরুখ, সলমন, হৃতিক এবং আলিয়াকে মুখ বানিয়ে একটি এজেন্ট ইউনিভার্সের লগ্না পরিকল্পনা রয়েছে এর পিছনে। রীতিমতো সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট

প্ল্যান, যার সুফল পাওয়া যাবে লং টার্মে। ব্রহ্মাণ্ড রচনা যে বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভের সবচেয়ে বড় উপায়, তা কোনওভাবে নিশ্চয়ই ইন্ডাস্ট্রির হোতাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে। না হলে, যে ছবিগুলো ইতিমধ্যে হিট এবং যাদের সিকোয়েল বা প্রিকোয়েল বানাতে রচিত হবে এক-একটি একক ফ্র্যাঞ্চাইজ, সেখানে এত বড় তারকাদের একত্রিত করার কথা ভাবছেন কেন প্রযোজকরা? এতে ঝুঁকি, বাজেট, প্রচারের ধকল সবই তো একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়! কেন এত ঝঞ্ঝাট নিচ্ছে প্রযোজনা সংস্থা? নাকি নেহাতই হলিউডি শ্রোতের ঢাল বুঝে এমনটা করছে বলিউড?

কপ থেকে কমেডি: প্রথম ব্রহ্মাণ্ড

যদি বলিউডের সিনেমাটিক ইউনিভার্সের কথা ওঠে, সর্বপ্রথমে নাম আসবে ‘কপ ইউনিভার্স’-এর। রোহিত শেট্টি ‘সিংঘম’ ছবিটি বানিয়েছিলেন তামিল ছবির রিমেক হিসেবে। কিন্তু ততদিনে মার্ভেল ইউনিভার্সের সুতো বাঁধা হয়ে গিয়েছে। রোহিতের পরের ছবি ‘সিংঘম ২’-ও সুপারহিট হল। ফলে এই ফ্র্যাঞ্চাইজের যে একটা ফ্যান বেস তৈরি হয়েছে, তা তিনি বুঝলেন। এবার তিনি নিয়ে এলেন ‘সিন্ধা’। রণবীর সিংহ অভিনীত এই কপ ড্রামাও জনপ্রিয় হল। এবার সিন্ধার সিকোয়েলের পরিবর্তে তিনি ‘সূর্যবংশী’ নিয়ে এলেন অক্ষয়কুমারকে নামভূমিকায় নিয়ে। এবং সেই ছবিতে শেষ দৃশ্যে দর্শকের পয়সা উসুল করে একত্রিত হলেন সূর্যবংশী, সিংঘম এবং সিন্ধা। রণবীরের এনট্রিতে বাজল ‘সিন্ধা’ ছবির আবহ, ‘সিংঘম’-এর টাইটেল সং বাজল অজয়ের এনট্রিতে। ছবি সুপারহিট! রোহিত ঘোষণা

■ কপ ইউনিভার্সের প্রথম মহিলা পুলিশ শিল্পী শেট্টি



■ কপ ইউনিভার্সের তিন নায়ক অজয় (সিংঘম), অক্ষয় (সূর্যবংশী), রণবীর (সিন্ধা)



■ ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স’-এর শুটে সিদ্ধার্থ মলহোত্র। পরিচালনায় রোহিত

করলেন তাঁর স্বপ্নের প্রজেক্ট ‘কপ ইউনিভার্স’-এর। এই সিনেমার ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তিনি এবার নিয়ে আসছেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মকেও। কপ ইউনিভার্সের শাখা হিসেবে তৈরি করছেন ওয়েব সিরিজ, ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স’। সেখানে নায়ক সিদ্ধার্থ মলহোত্রের সঙ্গে মহিলা পুলিশ অফিসার হিসেবে নিয়ে আসছেন শিল্পী শেট্টিকে। এবং যেহেতু সিরিজ ফরম্যাটে আনছেন কনটেন্ট, ফলে আশা

করাই যায় যে সিঙ্কনের পর সিঙ্কন আনার পরিকল্পনা করেই নিয়েছেন। কিন্তু একটি মাত্র প্রজেক্ট নয়, ‘ইউনিভার্স’ রচনার পোকা যে রোহিতের মাথায় ভালই ঢুকেছে, তার প্রমাণ তাঁর শেষ কমেডি ছবি ‘সার্কাস’। রোহিত পরিচালিত বিখ্যাত কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজ ‘গোলমাল’-এর প্রতিটি কিস্তিই হিট করেছে। প্রতিটি কিস্তি এক-একটি স্বতন্ত্র গল্প হিসেবে তৈরি করলেও এই ফ্র্যাঞ্চাইজের মূল চরিত্ররা পাল্টায় না। যেমন ‘গোপাল’, ‘মাধব’, ‘লাকি’ ইত্যাদি। এছাড়াও পার্শ্বচরিত্রে যে অভিনেতারা পরদায় আসেন, তাঁরাও কখনও পালটান না। যেমন ‘ওয়াসুলি’, ‘নাগমণি’ বা ‘পান্নি ভাই’। এবার রোহিত



■ ‘তু বুটি ম্যাং মন্কার’-এ রণবীর ও শ্রদ্ধা কপূর

শেডি যখন রণবীর সিংহকে নিয়ে ‘কমেডি অফ এররস’-এর মূল ছকে ‘সার্কাস’ বানালেন, তার মধ্যে মাঝে মাঝেই ‘গোলমাল’ ফ্যাঞ্চাইজের চরিত্রা চলে এল। অর্থাৎ কপ ইউনিভার্সের পাশাপাশি তিনি একটি কমেডি ইউনিভার্সের কথাও ভেবে নিয়েছেন। কিন্তু ‘সার্কাস’-এর গল্প এতটাই দুর্বল ছিল যে, ‘গোলমাল’-এর ক্যামিও শেষরক্ষা করতে পারেনি। ফলে শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ড রচনায় মন দিলেই দর্শক খাবে না। অতি চরিত্রে ছবি নষ্টের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই ‘সার্কাস’ ছবিটি।

ব্রহ্মাস্ত্রের নাম অস্ত্রভার্স

ছ’বছর ধরে সবে ইউনিভার্সের একটি মাত্র ছবি তৈরি করে উঠতে পেরেছেন পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম ‘ব্রহ্মাস্ত্র’। ছবিটি তৈরি হতে হতে রণবীর কপূর এবং আলিয়া ভট্ট পুরনো সম্পর্ক ভেঙে ফেললেন, পরস্পরের প্রেমে পড়লেন, সম্পর্ক গড়লেন, বিয়ে করলেন, প্রথম সন্তানের জন্ম দিলেন। ২০২২-এ ‘ব্রহ্মাস্ত্র’-র প্রথম ভাগ ‘শিবা’ মুক্তি পেল। সব ঠিক ঠাক চললে দ্বিতীয় পর্ব ‘দেব’ মুক্তি



■ ‘তু বুটি...’-তে চলে এসেছেন ‘সুইটি’

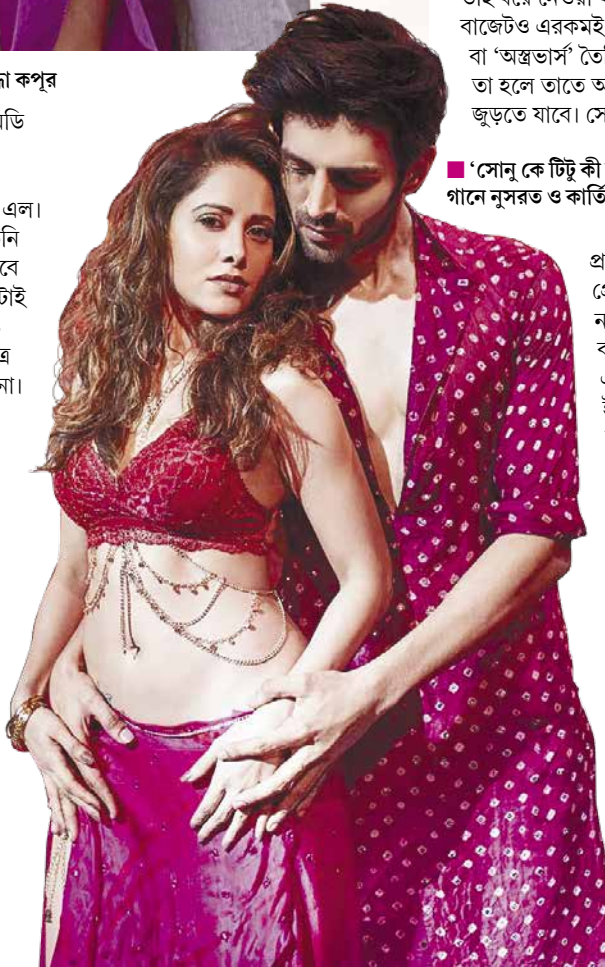
পাবে ২০২৬-এর ডিসেম্বরে এবং তৃতীয়টি ২০২৭-এ। ‘শিবা’ অর্থাৎ রণবীর কপূর তো রয়েছেই। তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে ইতিমধ্যে দুই মুখ্য চরিত্রের অবয়ব দেখানো হয়েছে, যাঁদের মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে দীপিকা পাডুকোন, যিনি কিনা শিবাব মা। অন্যজন এক পেশিবহুল পুরুষ, যিনি দেব। যেহেতু পরের কিস্তির নাম ‘দেব’, ধরে নেওয়াই যায় খুব নামি এবং দামী কোনও তারকা কেই দেখা যাবে এই ভূমিকায়। তৃতীয় কিস্তির সূত্র মিলবে দ্বিতীয় কিস্তি থেকে। ‘শিবা’র বাজেট ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকা এবং বক্সঅফিস থেকে নাকি তা ৪৩০ কোটি টাকা তুলেছে। যেহেতু ছবিটি ভীষণভাবে স্পেশ্যাল এফেক্টসের উপর নির্ভরশীল, তাই ধরে নেওয়া যায় পরবর্তী কিস্তিগুলির বাজেটও এরকমই হবে। এবং যদি ব্রহ্মাণ্ড বা ‘অস্ত্রভার্স’ তৈরির পরিকল্পনা থাকে, তা হলে তাতে আরও বড় তারকা জুড়তে-জুড়তে যাবে। সেক্ষেত্রে বাজেট কোথায়

■ ‘সোনু কে টিটু কী সুইটি’-র পোঁছবে, ভাবলেই আতঙ্কিত লাগে। তবু

প্রযোজনা সংস্থা ধর্মা প্রোডাকশনস আতঙ্কিত নয়। ‘অস্ত্রভার্স’ কাল্পনিক বক্স অফিস সাফল্য এনে দেবে, এই আশায় ইউনিভার্স রচনায় লগ্নি করছেন প্রযোজক করণ জোহর এবং সহ-প্রযোজক নায়ক রণবীর কপূর।

অল্প বাজেটের ব্রহ্মাণ্ড

বিশাল পুঁজি না থাকলেও যে প্রযোজক-পরিচালকরা ব্রহ্মাণ্ড রচনা করছেন নিজেদের মতো





■ ‘ভেড়িয়া’-র দৃশ্য কৃতি স্যানন ও বরুণ ধওয়ান



■ ‘স্ট্রী’ হরর-কমেডি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম ইন্ট

করে, তার কিছু উদাহরণ দিই এবার। দীনেশ বিজনের ম্যাডক ফিল্মস প্রযোজিত ‘স্ট্রী’ ছবিটি কম পুঁজিতে তৈরি হলেও দু’টি কাজ করেছিল। এক, ‘হরর কমেডি’ জঁরের ফ্যান বেস খুঁজে পাওয়া এবং দুই, একটি ব্রহ্মাণ্ডের পথ প্রশস্ত করা। তারপর ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারেই হার্ডিক মেহতা পরিচালিত ‘রুহি’ ছবিটি আসে। খুব বেশি ব্যবসা না করলেও ছবিটি প্রশংসিত হয়। তারপর আবার পুরনো ঘোড়া অমর কোশিকের (‘স্ট্রী’র পরিচালক) উপর ‘ভেড়িয়া’ ছবির দায়িত্ব দেন প্রযোজক দীনেশ বিজন। তবে এই তিনটি ছবি দিয়ে যে একটি ব্রহ্মাণ্ড রচিত হচ্ছে, সেটা বোঝা গেল ‘ভেড়িয়া’ ছবির শেষে। শেষ দৃশ্যে বরুণের ছবিতে চলে এলেন রাজকুমার রাও এবং অপারশক্তি খুরানা। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো ‘জনার্দন’ বা ‘জনা’ হিসেবে দু’টি ছবিতেই উপস্থিত। ‘ভেড়িয়া’-র ‘ঠুমকেশ্বরী’ গানের শেষে বরুণ ধওয়ান এবং কৃতি স্যাননের সঙ্গে কোমর দোলান শ্রদ্ধা কপূর ওরফে ‘স্ট্রী’! এবং তারপরই একটি অনুষ্ঠান করে ঘোষিত হল, ‘ভেড়িয়া ২’ এবং ‘স্ট্রী ২’ ছবির। অর্থাৎ সমান্তরালভাবে এগোবে ‘ভেড়িয়া’

এবং ‘স্ট্রী’ ফ্র্যাঞ্চাইজ এবং ভবিষ্যতে গল্প, চরিত্রের ক্রসওভারে রচিত হবে ম্যাডক ফিল্মসের ‘হরর কমেডি ব্রহ্মাণ্ড’। ঠিক এমনটাই করছেন লভ রঞ্জন। তাঁর ‘আধুনিক প্রেম’-এর ফ্র্যাঞ্চাইজ ‘পেয়ার কা পঞ্চনামা’ সুপারহিট। আবার আরও বড় হিট হয় ‘সোন্স কে টিটু কী সুইটি’, সেখানেও মূল সুর এবং মূল অভিনেতারা এক। কিন্তু এতদিন এগুলোকে একক ছবি হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। প্রথমবার কার্তিক আরিয়ান, নুসরত ভরুচার জুটি থেকে বেরিয়ে প্রযোজক-পরিচালক লভ রঞ্জন রণবীর কপূর এবং শ্রদ্ধা কপূরকে নিয়ে বানালেন ‘তু বুটি ম্যাং মক্ষার’ ছবিটি। এর মূল সুরও সেই আজকালকার হিসেবি প্রেম, ছকবাজির সম্পর্ক। এবার মূল সুর যখন এক, তখন পুরনো ছবির সাফল্য বা লভের নিজস্ব জঁরের স্বাদ দিতে ক্ষতি কী? ফলে

তিনিই ছবিতে ক্যামিও হিসেবে নিয়ে এলেন কার্তিক আরিয়ান এবং নুসরত ভরুচাকে। কার্তিকের চরিত্র ‘পেয়ার কা পঞ্চনামা’র, নুসরতের ‘সোন্স কে টিটু কী সুইটি’র। অর্থাৎ একটি ছবিতে আগের দু’টি হিট ছবির ঘাণ... লভ যে একটি মূল সুরে রচিত ছোট পুজির এক ইউনিভার্স রচনা করছেন, সে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যম যখন ওটিটি

ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পোস্টার বয় রাজ নিদিমোর এবং কৃষ্ণ ডি কে, যাঁরা একত্রে রাজ-ডিকে নামে পরিচিত, তাঁরাও নিজেদের মতো করে তৈরি করছেন একটি সিরিজ ইউনিভার্স। মাধ্যম ওটিটি। রাজ-ডিকে নির্মিত ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ সিরিজটি ভারতীয় ওটিটি কনটেন্টের মধ্যে জনপ্রিয়তম বললে অত্যুক্তি হবে না। সেখানে মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত ‘শ্রীকান্ত তিওয়ারি’ একজন নিত্যদিনের সরকারি এজেন্ট। দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ আটকাতে সে ব্যস্ত, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এক সাধারণ বাবা, স্বামী। বাড়িতে কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। দু’টি সিজনেই ভীষণ জনপ্রিয়। রাজ-ডিকে নির্মিত শেষ ওয়েব সিরিজ ‘ফরজি’-তে বিজয় সেতুপতি অভিনীত ‘মাইকেল’-ও তেমনটাই। ক্ষুরধার পুলিশ বা স্পেশাল এজেন্ট, অথচ ব্যক্তিগতজীবনে ভুলে ভরা, হেরে যাওয়া এক মানুষ। মজার বিষয় হল, ‘ফরজি’ সিরিজে কাউন্টারফিট চক্র ভাঙতে মাইকেল সাহায্য নেয় শ্রীকান্ত তিওয়ারির। সেখানে শ্রীকান্তের শরীরী উপস্থিতি নেই, শুধুমাত্র

বরুণের ছবিতে চলে এলেন রাজকুমার রাও এবং অপারশক্তি খুরানা... ‘ভেড়িয়া’-র ‘ঠুমকেশ্বরী’ গানের শেষে বরুণ ধওয়ান এবং কৃতি স্যাননের সঙ্গে কোমর দোলান ‘স্ট্রী’-র শ্রদ্ধা কপূর



■ ‘স্ট্রী ২’-এর ইঙ্গিত নিয়ে ‘ভেড়িয়া’ ছবির ‘ঠুমকেশ্বরী’ গানে বরুণ-কৃতির সঙ্গে শ্রদ্ধা



■ ‘দ্যা ফ্যামিলি ম্যান’-এর ‘এভরিডে এজেন্ট’ শ্রীকান্ত তিওয়ারির ভূমিকায় মনোজ বাজপেয়ী



■ ‘ফরজি’-র দৃশ্যে বিজয় সেতুপতি। কণ্ঠ শোনা যায় শ্রীকান্ত তিওয়ারিরও

একটি টেলিফোন কলে উপস্থিত সে। কিন্তু গল্পে তাঁর উল্লেখ হয়েছে বেশ কয়েকবার। শ্রীকান্ত তিওয়ারির অন্যতম অস্ত্র, এক গুপ্তচর ‘চেল্লাম স্যার’ উপস্থিত ‘ফরজি’-তেও। সেখানে ‘চেল্লাম স্যার’-এর ফোন এলে পরদার এপারে দর্শকও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। দু’টি সিরিজের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে। রাজ-ডিকে পরবর্তী সময়ে

জানিয়েছেন ‘এভরিডে এজেন্ট’-দের নিয়ে একটি ইউনিভার্স বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

বাজেট বড় হোক বা ছোট, নির্মাতারা বুঝতে পারছেন, বক্স অফিস বা ভিউয়ারশিপ বাড়তে হলে নিজেদের সফল কাজগুলোকে একত্রিত করতে হবে। ইগো সরিয়ে



■ ‘চেল্লাম স্যার’ উপস্থিত ‘দ্যা ফ্যামিলি ম্যান’ এবং ‘ফরজি’ সিরিজে

হাতে-হাত ধরতে হবে। অভিনেতাদের একে অন্যের ছবিতে মুখ দেখাতে হবে, নিজেদের ছবির সাফল্যের স্বার্থে। এক্ষেত্রে বলিউডের পথনির্দেশক অবশ্যই হলিউড। তবে ভারতীয় সিনেমার প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজ রচনা করেছিলেন এই বঙ্গ তথা ভারতীয় সিনেমার পথপ্রদর্শক সত্যজিৎ রায়, যার নাম ‘গুপী-বাঘা ট্রিলজি’। আবার সেই মানুষটিই ফেলুদা সিরিজ তৈরি করেছিলেন। তিনি জীবিত থাকলে হয়তো এই বঙ্গই তৈরি হত ‘গুপী-বাঘা’ এবং ‘ফেলুদা’র ক্রসওভার। রচিত হত দেশের প্রথম সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স! ভাবতে ক্ষতি কী!



কুইনস ম্যানসন

তাঁরা কেউ আইক্যান্ডি
নন। নিজেদের অভিনয়
দক্ষতা দিয়ে বলিউডে
ছাপ রেখেছেন। হিন্দি
সিনেমার তাবড়
অভিনেত্রীরা এখানে
জায়গা করে
নিয়েছেন স্বমহিমায়
বিরাজমান থেকে

দীপিকা পাডুকোন

অ্যাটিটিউড, অভিনয়,
সোয়াগ... সব
দিক থেকেই অনন্য
তিনি। দীপিকা প্রমাণ
করে দিয়েছেন, এই
পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রিতেও
তিনি আকর্ষণের কেন্দ্রেই
থাকবেন বহুকাল।

আলিয়া ভট্ট

যত দিন যাচ্ছে,
তাঁর অভিনয়
আরও ক্ষুরধার
হচ্ছে। একার
হাতে নেপোটিজম
বিতর্ককে মাঠের
বাইরে ফেলে
দিয়েছেন তিনি।

ক্যাটরিনা কাইফ

বিয়ে করার পর
ফের বড় পরদায়
আত্মপ্রকাশ করছেন
তিনি। শ্রীরাম রাঘবনের
'মেরি ক্রিসমাস' দিয়ে।
এর পরে আছে স্পাই
থ্রিলার। ক্যাটরিনার
সামনে এখন ভরা
পৌষ মাস।



প্রিয়ঙ্কা চোপড়া জোনাস

হলিউডে তাঁকে দুর্দান্ত
ভারতীয় অভিনেত্রী
বলে মনে করা হয়।
পরপর প্রোজেক্টে
সই করে চলেছেন।
বলিউড তাঁর মর্ম
বুঝছে কি?

বিদ্যা বালন

এখন তিনি
তুলনামূলকভাবে
কম সিনেমা করেন।
কিন্তু ছবি বাছার
ক্ষেত্রে তাঁর 'নিয়ত'
এখনও একই আছে।
সকলকে ছাপিয়ে
সব আলো শুধে
নিতে চান।



করিনা কপূর খান

সুজয় ঘোষের
পরিচালনায় থ্রিলার দিয়ে
কামব্যাক করছেন তিনি।
আর তা নিয়ে মুখিয়ে
রয়েছে দর্শককুল। কারণ
করিনা এখনও
এই সময়ের অন্যতম
সেরা অভিনেত্রী।



অনুষ্কা শর্মা

ঝুলন গোস্বামীর
বায়োপিক দিয়ে
পরদায় ফিরছেন বটে,
কিন্তু অনুষ্কা জানিয়ে
দিয়েছেন, মেয়েকে
মানুষ করাই এখন
তাঁর মূল লক্ষ্য। সুপার
অ্যাকট্রেসরা সুপারমমও
হতে পারেন, প্রমাণ
করবেন তিনি।

তাপসী পন্নু

মুখের স্মিত হাসিটি
দেখছেন? ওটা
তৃপ্তির হাসি।
তাপসী অভিনয়
দিয়ে প্রমাণ
করেছেন, বলিউডে
এখন তিনি আর
আউটসাইডার নন।



কিয়ারা আডবাণী

কথায় বলে, বিয়ের
পর নাকি নায়িকাদের
জনপ্রিয়তা আর আগের
মতো থাকে না। কিন্তু
কিয়ারার ব্র্যান্ডভালু
বিয়ের পর আরও
বেড়েছে। এখন তাঁর
প্রেম নিয়ে চর্চা হয় না,
চর্চা হয় অভিনয় নিয়ে।
আর তাতে কিয়ারা
ভীষণ খুশি।

ভূমি পেডনেকর

তাঁর আগের লুক
এবং এখনকার
লুকের মধ্যে
আকাশপাতাল
তফাত। কিন্তু যেটা
পরিবর্তন হয়নি, তা
হল ভূমির অভিনয়
দক্ষতার। তাতে তিনি
দশে দশ।





শ্রদ্ধা কপূর

তিনি একবার দুঃখ
করেছিলেন, করণ
জোহরের মতো
পরিচালক তাঁকে
কাজ দেন না বলে।
তবে এখন শ্রদ্ধার
দুঃখ পাওয়ার কথা
নয়। তিনি নিজের
অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ
করেই দিয়েছেন।



জাহ্নবী কপূর

এখন আর কেউ
তাকৈ তাঁর মা
শ্রীদেবীর পরিচয়ে
চেনেন না। জাহ্নবী
স্বল্প সময়েই
ইভাঙ্গিতে নিজের
পরিচয় তৈরি
করে নিয়েছেন।

অনন্যা পাণ্ডে

‘গেহরাইয়াঁ’র পরেও
কেউ তাঁকে তেমন
সিরিয়াস চরিত্রে
কেন ভাবল না, কে
জানে! অনন্যার
মধ্যে কিন্তু
অভিনেত্রী-ফ্যাশনিস্তা
হওয়ার যথেষ্ট
সম্ভাবনা রয়েছে।



সারা আলি খান

তিনি কি ভারতীয় ক্রিকেট
তারকা শুভমন গিলের
সঙ্গে প্রেম করছেন? সারা
কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন,
এখনও তিনি মনের
মানুষকে খুঁজে পাননি,
ঠিক যেমন পাননি
মনের মতো চরিত্র।

কৃতি স্যানন

প্রভাসের সঙ্গে
'আদিপুরুষ'-এ
'সীতা' হওয়ার পর
থেকেই কৃতির জীবনে
পরিবর্তন এসেছে।
এখন গভীরতা ছাড়া
কোনও পুরুষ বা
চরিত্র, কিছুই পছন্দ
হচ্ছে না তাঁর।

দিশা পটানী

প্লিপিং বিউটিরা
ঘুমন্ত অবস্থাতেও
হাসেন তা
হলে? আসলে
দিশা নিজেকে
মোহময়তার এমন
পর্যায়ে নিয়ে
গিয়েছেন যে, তাঁকে
দেখে রূপকথার
চরিত্রই মনে হয়।



সোনাকী সিনহা

এখন টেলিফোন
নিয়ে মিষ্টি
সাজছেন বটে,
কিন্তু 'দহাড়'
দেখলে বোঝা
যায়, 'দবং'-এর
কতটা প্রভাব
এখনও তাঁর
উপর আছে।

পরিণীতি চোপড়া

দীর্ঘদিনের সিঙ্গেলহুড
কাটিয়ে বাগদান সেরে
ফেললেন তিনি।

এখন জল্পনা
হচ্ছে, পরিণীতি
কি রাজনীতির
ময়দানে নামবেন?



■ এখনও দিনের বেশিরভাগ সময় গান গেয়ে কাটান আরতি মুখোপাধ্যায়

আরতি সমীপে

একটা সময় ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গানের জন্য মুম্বই- কলকাতা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। কিন্তু হঠাৎ চলে গেলেন অন্তরালে! কেন?

আরতি মুখোপাধ্যায়-এর কাছ থেকে জানতে চাইলেন সায়ক বসু

এই বঙ্গের তো বটেই, দেশের আপামর বাঙালি তাকে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই চেনেন। কিন্তু সবকিছু ঠিক থাকলে কি আদতে অভিনেত্রী হতেন আরতি মুখোপাধ্যায়? ঋত্বিক ঘটক তো তাঁকে অভিনয় করতে ডেকেছিলেন নিজের ছবিতে। “সুবর্ণরেখা” ছবিতে আরতির গাওয়া একটি রাগ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সঙ্গে জনপ্রিয় ছিল তাঁর সুন্দর মুখশ্রীও। তা জেনেই ঋত্বিক তাঁকে অভিনয় করতে বলেছিলেন।

কিন্তু আরতি রাজি হননি। বললেন, “ওই বয়সে সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু তখন মাথায় ছিল না। সারাদিনই প্রায় গান গাইতাম। গুনগুন করে বা চিৎকার করে, ওটাই ছিল আমার রেওয়াজ। বুঝতে পেরেছিলাম, গানই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বাকি জীবনটা। যদি জনপ্রিয়তা পাই, মানুষের ভালবাসা পাই, সেটা গানই দেবে, অভিনয় নয়!” শুধু ঋত্বিক নয়, এই গানের জেরে বহু বিখ্যাত মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন আরতি। ছোট্ট বয়সে



■ তপন সিংহর সঙ্গে গানের রেকর্ডিংয়ে

“ঠাকুরমা বুঝতে পারেন নাতনির গান হবে। দিদিমাও খুব সাহায্য করেছিলেন। তখনকার দিনে তিনশো টাকা দিয়ে আমাকে একটা তানপুরা কিনে দিয়েছিলেন দিদিমা।”

লতা মঙ্গেশকরের আশীর্বাদ পেয়েছেন। গান শুনে তাঁকে চকোলেট দিয়েছিলেন লতা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মামা দে, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদাররা মাথায় বুলিয়ে দিয়েছেন স্নেহের হাত। স্বয়ং উত্তমকুমার পর্যন্ত ‘দেয়া নেয়া’ ছবিতে তার গাওয়া গান ‘মাধবী মধুপে’ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মা-ঠাকুরমার প্রভাব

আরতি বললেন, “সঙ্গীত আমার বংশে ছিল বলেই বোধহয় খুব সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছি। আমার বাবা মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দারুণ ভাল অর্গান বাজাতেন। মা প্রভাদেবী এসরাজ বাজাতেন। আমার ভাইবোনেরাও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পোকা ছিলেন। আমাদের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান মানেই ছিল গানবাজনা। বাবা হয়তো পিয়ানোতে সুর তুলছেন, মা এসরাজ বাজিয়ে গান ধরছেন। আর ঠাকুরমা দারুণ সব নিরামিষ রান্না করছেন। আমার গানের প্রতি যে ন্যাক, সেটা কিন্তু প্রথম আবিষ্কার করেন দিদিমা-ঠাকুরমা। বাবার পিয়ানো বাজানো দেখে, আমি ওইভাবে দু’হাতে হারমোনিয়াম বাজানোর চেষ্টা করতাম। এটা দেখে ঠাকুরমা বুঝতে পারেন নাতনির গান হবে। তখনকার দিনে তিনশো টাকা দিয়ে আমাকে একটা তানপুরা কিনে দিয়েছিলেন দিদিমা! কিন্তু বাবা চলে গেলেন অকালেই। আমি তখন খুব ছোট। কিন্তু ভাবুন, বাড়ির মহিলারা কী প্রগতিশীল ছিলেন... তাঁরা আমার গান বন্ধ হতে দেননি। প্রথমে মা-ই আমাকে

গান শিখিয়েছেন। হাত ধরে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, গান শেখাতে এবং কম্পিটিশনে।” আরতি খুব কম বয়স থেকেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। গুরুদেবের মধ্যে ছিলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ সাগিরউদ্দিন খান, পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ী প্রমুখ। ১৯৫৭ সালে ‘অল ইন্ডিয়া মিউজিক ট্যালেন্ট’ নামে একটি প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে ১৪ বছর বয়সের আরতির গান শুনে বিচারক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, পরে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন, আরতির সঙ্গে তিনি ডুয়েট গাইতে চান ‘মামলার ফল’ নামে একটা ছবিতে! আরতি বললেন, “ওটাই আমার প্রথম প্লেব্যাক। তখন কি আর অত সব বুঝি? কেউ গাইতে বললেই মনের আনন্দে গেয়ে দিতাম। ওই আনন্দ থেকে গাওয়ার ফলেই ‘মেট্রো-মরফি কনটেন্ট’ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে যাই। যেখানে বিচারকদের মধ্যে ছিলেন অনিল বিশ্বাস, নওশাদ, বসন্ত দেসাই এবং সি রামচন্দ্রের মতো সঙ্গীত পরিচালক।” সেই জয়ের সুবাদেই আসে আরতির প্রথম হিন্দি প্লেব্যাক-এর সুযোগ।



■ গানের মহড়ায় শ্যামল মিত্র, কিশোরকুমার এবং আরতি



■ নির্মলা মিশ্র, লোপামুদ্রা মিত্র, ইন্দ্রাণী সেন ও হৈমন্তী শুরুর সঙ্গে



■ একটি শুটিংয়ে সকলের সঙ্গে



■ বাড়ির কাজ সামলান নিজের হাতে

প্রথম হিন্দি প্লেব্যাক এবং...

১৯৫৮ সালে মীনাকুমারী অভিনীত হিন্দি

ছবি ‘সাহারা’-তে শিশু কণ্ঠশিল্পী হিসেবে প্রথম সুযোগ পান তিনি। আরতির কথায়, “আমার সঙ্গে লতাদিদিও গেয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে মীনাকুমারীর অভিনীত হিন্দি ছবি ‘সাহারা’-তে শিশু কণ্ঠশিল্পী হিসাবে প্রথম সুযোগ পান তিনি। সঙ্গী ছিলেন...

হেমসুন্দার সুর ছিল। কিন্তু সিনেমাটা অতটা হিট করল না।” তবে প্রথম দু’-তিনটে হিন্দি সিনেমায় জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় ভেঙে পড়েননি আরতি। তিনি জানতেন, সাফল্য আসবেই। শুধু শিখে যেতে হবে। বাংলায় আরতির প্রথম বড় ব্রেক ১৯৬২ সালে ‘কামা’ নামে একটি ছবিতে। একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন তিনি, ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার’। উত্তমকুমার অভিনীত ওই ছবিতে গান গেয়ে সকলের নজরে আসেন আরতি। এবং তারপর উত্তম-তনুজার ‘দেয়া নেয়া’ ছবিতে গাওয়া গান তাঁকে সাফল্যের অন্য শিখরে পৌঁছে দেয়। স্বাক্ষিকের ‘সুবর্ণরেখা’-তে আরতির গান শুনে স্বয়ং রবিশঙ্কর বলেছিলেন, আরতিকে মুম্বই যেতেই হবে। কলকাতায় থাকা চলবে না। সেটাই হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই ‘গীত গাতা চল’ নামে একটি ছবিতে গান গাওয়ার জন্য আরতিকে মুম্বই যেতে হয়। এবং সেখানে তিনি প্রবল জনপ্রিয় হন। পুরনো কথা মনে করে আরতি বলেন, “তখন এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে, আমাকে কলকাতা এবং মুম্বই প্রায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হত। যখন ওখানে ‘গীত গাতা চল’-এর গান রেকর্ডিং চলছে, তখন এখানে চলছে ‘হংসরাজ’-এর



■ অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর সঙ্গে একটি আড্ডায়

“গুজরাতি-মরাঠি-ওড়িয়া-কন্নড়-অহমিয়া-রাজস্থানী-ভোজপুরী-পাঞ্জাবি-মণিপুরী... কোন ভাষায় গাইনি! সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলো তো বোধহয় গেয়েছি গুজরাতি ভাষায়।”



■ সঙ্গী ইন্দ্রাণী দত্ত এবং ইন্দ্রনীল সেন

গান। প্রায় সব গানই আমি গাইতাম।” “ও দিদিমণি গানের রানি, দাও গাইতে আমায় রেডিয়ো ইস্টিশনে...” গানটার কথা মনে আছে? গানটা আরতির জীবনে সত্যি হয়ে গিয়েছিল। রেডিয়োতে নিয়মিত গান গাইতেন তিনি। গলা দিয়েছিলেন মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’তেও।

গুজরাতের মন্দিরে

আরতির গান

যাই হোক, হিন্দিতে তখন আরতির জনপ্রিয়তা ছুঁ করে বাড়ছে। পরপর ছবিতে গান, একটি ছবিতে একাধিক গান গেয়ে যাচ্ছেন তিনি। শঙ্কর-জয়কিষণ অবধি তাঁকে বলেছেন, কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে মুম্বইতে এসে থাকতে। কিন্তু আরতি বললেন, “ওরকম বললেই হয় নাকি?

বালিগঞ্জে তখন আমাদের যৌথ পরিবার। অত আত্মীয়-স্বজন, বাংলা সিনেমায় গান... সবকিছু ছেড়ে আসা যায়? এখানে তখন ‘একটুকু বাসা’, ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’, ‘দাদার কীর্তি’র গানের কাজ চলছে। তপন সিংহের পরের পর ছবিতে গান গাইছি। সময় বের করা অসম্ভব হত। কিন্তু তাও ওখানে যেতে হত। কারণ হিন্দি ছাড়াও বহু আঞ্চলিক ভাষায় আমাকে গাইতে হত। গুজরাতি-মরাঠি-ওড়িয়া-কন্নড়-অহমিয়া-রাজস্থানী-ভোজপুরী-পাঞ্জাবি-মণিপুরী... কোন ভাষায় গাইনি! সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলো তো বোধহয় গেয়েছি গুজরাতি ভাষায়। আপনি এখনও যদি ওখানকার মন্দিরে যান, দেখবেন আমার গাওয়া গান বাজছে। তখন যা হয়, বহু সংগীত পরিচালকের সঙ্গেই কাজ করতে হত। আমি যে যে ছবিতে গান গাইতাম, সেইসব ছবিতে লতাদিদি, আশারাও গান গাইতেন।” মুম্বইতে ছড়িয়ে পড়েছিল খবর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের দাপটে চলা বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আরতিও বেশ বড় নক্ষত্র। শচীন দেব বর্মণ খুব ভালবাসতেন আরতিকে। একটি সিনেমায় গান গাওয়ানেন বলে ঠিকও করে



■ এখন যোগ ব্যায়াম করেন নিয়মিত

ফেলেছিলেন। পরে আরতি শোনে, গানটি বাদ গিয়েছে! যদিও তার কিছুদিন পরে আবিষ্কার করেন, গানটি আশা ভোঁসলেকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছে। তবে আরতি বললেন, মঙ্গেশকর পরিবারের কাছ থেকে তিনি কোনওদিন কোনও বৈরিতা পাননি। বরং যখনই লতাদিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন বাড়িতে, তাঁকে অতীব আদর করে ঘরে বসানো হয়েছে, গল্প করা হয়েছে।

সরে যাওয়ার নেপথ্যে

কিন্তু যা হয়, কিছু কথা তো রটেই ইন্ডাস্ট্রিতে। আরতির সঙ্গে মঙ্গেশকর পরিবারের সম্পর্ক এরকমই কিছু রটনার



■ আজীবন গানের শিষ্য

শিকার। তাঁদের প্রভাবেই নাকি আরতিকে যড়যন্ত্র করে বেশ কিছু গান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কথাটা শুনে বেশ হাসলেন আরতি। হাসির মধ্যেই বেদনা লুকিয়ে ছিল কি? বললেন, “আপনি বের করুন তো, কেন এরকম হল? আমার হাতে পরপর এত কাজ, এত প্রশংসা, এত হিট গান... সব কমে গেল কী করে? আসলে কী জানেন তো, বিভিন্ন সময় আমার মুখে কথা বসিয়ে সেগুলো রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি কোনওদিনই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতাম না। সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছিলাম। আমি কোনওদিনই নিজের প্রচার করে উঠতে পারিনি। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ নাটকের জন্য একদিনে ৩৫টা গান রেকর্ড করেছিলাম। সে কথা ক’জন জানেন?” আসলে বাংলা গানের আরাধিকা আরতি সত্যিই কোনওদিন ভাবেননি, মুম্বইতে এসে বসবাস করবেন। কলকাতায় থাকাকালীন বিয়ে করেছিলেন তিনি। জনপ্রিয় গীতিকার স্বামী সুবীর হাজারার লেখা গান গাইতেন তিনি। “তখন তোমার একুশ বছর বোধহয়”, ‘এই চারুকেশে’ এই জুটির জনপ্রিয় গান। কিন্তু গান হিট হলেই যে জুটি হিট করবে, তার তো কোনও মানে নেই! আরতির কথায়, “আমি ঊর গুণের প্রেমে পড়েছিলাম। বিয়েও করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, উনি আমাকে একটুও স্পেস দিতে চাইছেন না। আমি কী শাড়ি পরব, কোন সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কতটা কথা বলব, কোথায় শো করব, কোন গান গাইব, সেটা উনি বলে দিতেন। আমার গানেও তার ছাপ পড়তে লাগল। তাই কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। অনেক মনের জোর লেগেছিল, জানেন। সুধীনদা (দাশগুপ্ত), নচিকেতা ঘোষ বলেছিলেন, ‘তুই বম্বে চলে যা।’”

আজীবন গানের ভক্ত

কিন্তু তারপরেও আরতি দেখলেন, তার উন্নতি অনেকের চক্ষুশূল হয়ে যাচ্ছে।

পন্ডিচেরিতে গিয়েই থাকা হবে। ওটাই নাকি আমার স্বশ্রববাড়ির নিয়ম।” ফলে সেই সময় কাজ ছেড়ে সংসারেই মন দেন তিনি, স্বেচ্ছায়। কিন্তু যা হয়, এই কথা যদি একবার ইন্ডাস্ট্রিতে রটে যায়, তাহলে কি কাজ পাওয়া সহজ? কথা তো ডালপালা মেলতে থাকে। আরতি যেন এই জল্পনার শিকার হয়েই আড়ালে চলে গেলেন! তবে

“‘পদ্মানদীর মাঝি’ নাটকে একদিনে ৩৫টা গান রেকর্ড করেছিলাম। সে কথা ক’জন জানেন? মুশকিল কী জানেন তো, আমি কোনওদিন...”



■ একটি অনুষ্ঠানে কোয়েল, চান্দ্রেয়ী, দেবলীনার সঙ্গে

যিনি ‘আমি মিস ক্যালকাটা’ গেয়েছেন, ‘গল্প হলেও সত্যি’, ‘ছুটির ফাঁদে’ ছবিতে গান গেয়ে বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছেন, সুচিত্রা সেনের ‘ফরিয়াদ’ ছবিতে মহানায়িকাকে কণ্ঠ দিয়েছেন, ‘আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান’ গেয়ে গোটা বাংলাকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন... তিনি হঠাৎ করে চলে গেলেন অন্তরালে! এর পিছনে অবশ্য আরতির দ্বিতীয় বিয়ের নেপথ্যগল্প বলা যেতে পারে। আসলে প্রথম বিয়ের ডিভোর্সের পর পাঁচ বছর একাই ছিলেন আরতি। কিন্তু তাঁর মা চাননি তিনি একা থাকুন। তাই এক গুজরাতি পরিবারে বিয়ে হয় আরতির। বললেন, “আমার স্বামী শ্রেয়াস খুব বড় আইনজীবী। পন্ডিচেরিতে আমার স্বশ্রবের একটা বাড়ি আছে। আমার যখন সন্তান হয়, তখন ঠিক হয়

আরতির এখন কোনও আফ্রোপ নেই এসব নিয়ে। তিনি যে ভালোবাসা পেয়েছেন মানুষের কাছ থেকে, তাতে খুব খুশি। বললেন, “আমি এই সন্তরোধর বয়সে এখনও রোজ রেওয়াজে বসি। এখনও নতুন গান বানাই। আর একটা যদি সুযোগ পেতাম, তাহলে সেই নিম্নকদের শুনিয়ে দিতাম আরতি মুখোপাধ্যায় এখনও কেমন গান গাইতে পারেন। কারও প্রতি বিদ্বেষ থেকে বলছি না। কিন্তু এটা ঠিক, আরতি সারাজীবন গানই গেয়েছে এবং গানকেই ভালবেসে গিয়েছে। আশা করি, এই গান আমৃত্যু আমার সঙ্গে থাকবে।” আমরাও তো তা-ই চাই।

মুঠোয় ধরা চাঁদ

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম না থাকলে
কত অভিনেতার স্টারডম
যে অধরাই থেকে যেত!
তবে এখন দর্শক চাইলেই
মুঠোবন্দি করতে পারেন
নবপ্রজন্মের এই তারকাদের

রাশি খন্না

তামিল, তেলুগু,
মলয়ালম ছবির
দক্ষিণাবর্তে ঘুরঘুর
করছিলেন তিনি।
'ফরজি' সিরিজটি
ভাগ্যিস সারা ভারত
দেখতে পেল! না হলে
'রাশি' নামের রত্নটিকে
আমরা পেতাম না।

বিজয় ভর্মা

রণে বনে জলে জঙ্গলে
যে ওটিটি চ্যানেলই
খুলবেন, বিজয় ভর্মাকে
দেখতে পাবেন। এই
মুহুর্তে ওটিটি-নির্মাতাদের
নয়নের মণি এই
অভিনেতা। তবে ফ্যাশন
সেসে তিনি খলনায়ক
নন, নায়কই বটে।



অপারশক্তি খুরানা

শুরু করেছিলেন
হাস্যরসিক হিসেবে।
তবে তাঁর অপার
অভিনয়-শক্তির প্রমাণ
মিলেছে কখনও
'ধোখা'-র খলচরিত্রে,
কখনও 'মদন কুমার'-
এর স্টারডমে।

করিশমা তন্না

টেলিডুনিয়া থেকে
সিরিজ জগতে এসেই
লাইমলাইটে তিনি।
'স্কুপ' নামের সিরিজটি
না এলে তাঁকে এখনও
'নাগিন' নৃত্য করতে
হত। এবার অভিনয়ে
জাত চেনালেন।

A full-page photograph of a woman with dark hair in a bun, wearing a maroon dress and a white blazer, running down a set of stairs. She is smiling and looking to her right. The background is a blurred, warm-toned interior space.

ওয়ামিকা গাব্বি

লকডাউন রিলসই
তাঁর অডিশন ছিল!
ভাবা যায়? সেই
মেয়ে কিনা এখন
বিশাল ভরদ্বাজের
'ফুরসত'-এর
'দিয়া', 'জুবিলি'র
'নীলোফার' হয়ে
দর্শকের মন জয়
করছেন।

সিদ্ধান্ত গুপ্ত

২০১২ থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে
স্ট্রাগল করছিলেন জন্মুর
ছেলে সিদ্ধান্ত। 'জুবিলি'
সিরিজটি সকলকে
বোঝাল, আরে এত সুপুরুষ
এক অভিনেতাকে এতদিন
আমরা পাত্তা দিইনি।



জিম সর্ভ

বুদ্ধিমত্তা এবং অভিনয়
যে একটা মানুষের যৌন
আবেদন এতটা বাড়িয়ে
দিতে পারে, তার
হাতেগল্পম প্রমাণ এই
ভদ্রলোক। মহিলাদের
হৃদয় হরণ করতে
জিম সর্ভ যথার্থই
রকেট বয়।



রাধিকা মদন

কখনও 'কচে
লিশু'-তে ক্রিকেট
খেলছেন, কখনও
'সাস বহু অওর
ফ্লেমিংগো'-তে মাদক
বানাচ্ছেন। এবছরটা
যেন অভিনয়ের
মাধ্যমে অনেক
জীবন বেঁচে নিলেন
রাধিকা মদন।



ট্রোল সাম্রাজ্য ও তারকারা

বলিউড থেকে টলিউড, সর্বত্র বিস্তৃত ট্রোল-সাম্রাজ্য। ছোট-বড়-মাঝারি কোনও তারকাই রেহাই পাননি ট্রোলার হাত থেকে। কীভাবে সামলান তাঁরা নেটমাধ্যমের টক্সিসিটিকে? খোঁজ নিলেন মধুরিমা সিংহ রায়

সে লেবদের সঙ্গে সমাজমাধ্যমের সম্পর্ক অনেকটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের, মানে যাকে বলে ‘সিদ্ধাযোচিক রিলেশনশিপ’। কত তারকা তো পরদার বাইরেও তারকা হয়ে উঠেছেন, শুধুমাত্র সমাজমাধ্যমের কল্যাণে। কাজের বাইরে তাঁদের দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত ফেসবুক-ইনস্টায় প্রকাশিত। তা-ই দিনে-রাতে হাঁ করে গিলছে

আমজনতা। তাদেরই বা দোষ কী! কোভিডের সময় থেকেই মোবাইল-ল্যাপটপের প্রতি আমাদের আসক্তি বেড়েছে। আর সেই আসক্তির অন্যতম অংশ অবশ্যই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা টুইটার। এক গবেষণা অনুযায়ী, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সারাদিনে গড়ে আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বলাই বাহুল্য, এর মধ্যে সিংহভাগই হয়তো মুখরোচক কোনও খবর বা প্রিয়



■ কন্যাকে চুম্বন ঐশ্বর্যর, তা নিয়ে শুরু হয় বাঁকা কথার ঝড়

ট্রোল-সাম্রাজ্য এমনই জাঁকিয়ে বসেছে যে, এর হাত থেকে প্রায় কেউই রেহাই পাননি। তা সে দীপিকা পাডুকোনই হোন বা এই বাংলার দেব। সমাজমাধ্যমে আছেন মানে ট্রোলও থাকবে।



■ দিলীপকুমারের মৃত্যুর পর সায়রা বানুর সঙ্গে সানগ্লাস চোখে শাহরুখ খান, তা নিয়ে শুরু হয় ট্রোলিং

তারকার কেছা দেখে কেটে যায়! ভার্চুয়াল বিনোদনের অন্যতম রসদ এখন অনেকের কাছেই এই জিনিসগুলো। সেখানে কার প্রেম

ভাঙল, কে কোন পোশাক পরল, কে কার সঙ্গে ডিনার ডেটে গেল, কোন তারকা তার অন্য সহকর্মীর নামে নিন্দে করল, কে কখন

হাসল, কে কাঁদল... সব আপনার চোখের সামনে অষ্টপ্রহর সমাজমাধ্যমের প্ল্যাটারে পরিবেশিত। আপনিই বা চোখ বন্ধ করে থাকেন কী করে! কিন্তু সমস্যা হল, আপনি দেখলেন, মনে মনে কিছু ভাবলেন বা ইগনোর করে চলে গেলেন, এই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু যেই সে তারকার কোনও ছবি বা পোস্টে বা কোনও তারকা সম্পর্কিত কোনও পোস্টে নেগেটিভ বা কুরাচিকর কমেন্ট দিলেন, তখন তা অবশ্যই শালীনতার গণ্ডি পেরিয়ে যায়। তখন তা আর নিছক মুচমুচে বিনোদনের রসদ জোগায় না, বরং আপনার নিম্ন মানসিকতারও পরিচয় দেয়। ঠিক কেন কেউ 'ট্রোল' করেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। কেউ কেউ ভাবেন, বড় তারকার পোস্টের নীচে কমেন্ট করলে তিনিও একজন কেউকেটা হয়ে গেলেন... কেউ আবার কোনও ব্যক্তিগত ফ্রাষ্ট্রেশনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান সমাজমাধ্যমে করা কমেন্টের মধ্যে দিয়ে। আবার হ্যাঁ, কেউ হয়তো নিছক মজার বশেই ট্রোল করে ফেলেন (যদিও এটি ঠিক ট্রোল না, হালকা সমালোচনা বলা যেতে পারে)। তারকারা কীভাবে নেন এই পুরো বিষয়টাকে? বলিউড থেকে টলিউড, গত কয়েক বছরে ট্রোল-



■ আলিয়া ভট্ট ও দীপিকা পাডুকোন

সাম্রাজ্য এমনই জাঁকিয়ে বসেছে যে, এর হাত থেকে প্রায় কেউই রেহাই পাননি। তা সে দীপিকা পাডুকোনই হোন বা এ বাংলার দেব। আপনি সমাজমাধ্যমে আছেন মানে ট্রোলও আপনার সঙ্গেই হাত ধরে সহাবস্থান

করবে। তাই, বেশিরভাগ তারকাও এখন ট্রোলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি পোস্ট করেন। তবে ট্রোল যে একেবারে তাঁদের বিরক্ত করে না, তা তো আর নয়!

বলেন, “ট্রোলের ব্যাপারে আমার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। একদল কাপুরুষ কম্পিউটারের সামনে বসে যা খুশি লেখে, নিজেদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে...

মলাইকা আরোরা প্রতিদিন ট্রোলড হন। এয়ারপোর্টে তাঁর হাঁটার ধরন থেকে জিমের বাইরে ছবি তোলা...সোশ্যাল মিডিয়ায় এসবই মিম-যোগ্য। যদিও মলাইকা এসব নিয়ে চিন্তিত নন

■ রাজনীতিতে পা রাখার পর থেকেই মিমিকে নিয়ে শুরু হয়েছে ট্রোল



নিরন্তর অ্যাভিউসিভ মন্তব্য বা চেহারা-ধর্মীয় আচরণ-ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে কটাক্ষ...এগুলো ‘সাইবার বুলিং’য়েরই নানা দিক। কেউ চুপ থেকে তা ইগনোর করেন, কেউ আবার মাঝে মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল হন।

ট্রোলকে আমল নয়

যখন থেকে সমাজমাধ্যমের উপর সেলেবদের নির্ভরশীলতা বেড়েছে, তখন থেকে ট্রোলও তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু বেশিরভাগ তারকাই ট্রোলকে বিশেষ আমল দেন না। একাধিক সাক্ষাৎকারে, তাঁরা এই নামহীন-পরিচয়হীন (অনেকেই ফেক প্রোফাইল থেকে ট্রোল করেন) মন্তব্যকারীদের একহাত নিতেও ছাড়েননি। অনুষ্কা শর্মা এক সাক্ষাৎকারে

তারা নিজেদের এত নিচু চোখে দেখে যে, তাদের মনে হয় অন্যের সম্মান টেনে নীচে নামালে বোধহয় তাদের সম্মান বাড়বে! এদের নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া দেব?” বিরাট কোহলির ব্যর্থতা নিয়ে অনুষ্কাকে কু-মন্তব্য, সোনাকী বা হুমা কুরেশির মতো অভিনেত্রীদের ফ্যাট শেমিং, রণবীর সিংহের পোশাক নির্বাচন নিয়ে আপত্তি, বয়সে ছোট প্রেমিককে বিয়ে করায় প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার সমালোচনা, করণ জোহরের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন নিয়ে মন্তব্য...প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়ায় সেলেবরা যা-ই পোস্ট করুন না কেন, হেট কমেন্টস আসাটাই যেন নিয়ম। “ট্রোলিং আমার জন্য কোনও খবরই না! এগুলো নিছক কারওর মতামত, তাই এসবকে গুরুত্ব

দেওয়ারও কোনও মানে নেই,” জানিয়েছিলেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। মোটামুটি একই সুর সিদ্ধার্থ মলহোত্র, বরুণ ধাওয়ান থেকে আলিয়া ভট্ট, সকলেরই। কেউ কেউ খুবই অদ্ভুত কারণে ট্রোলড হন। যেমন, মলাইকা আরোরা। এয়ারপোর্টে তাঁর হাঁটার ধরন থেকে জিমের বাইরে ছবি তোলা...সোশ্যাল মিডিয়ায় এসবই ‘মিম-যোগ্য’। “প্রতিনিয়ত দু-তিনটে করে মিম ভিডিও আসে আমার কাছে, আমার হাঁটার,” মলাইকা কিন্তু মজার ছলেই দেখেন মিমগুলো। অভিষেক বচ্চন কেন এখনও পরিবারের সঙ্গে থাকেন, তা নিয়ে ট্রোলড হলে তিনি সেই ব্যক্তিকে বলেন, ‘আমার কাছে খুবই গর্বের ব্যাপার এটা। আপনিও মাঝে-মাঝে চেষ্টা করতে পারেন।’ তবে সব ট্রোল যে মজাদার, তা নয়। যেমন রণবীর কপূর ও আলিয়া ভট্ট তাঁদের মেয়ের নামকরণের পরে অত্যন্ত অসংবেদনশীল ভাবে ট্রোলড হতে থাকেন। একইরকম ভাবে

■ মলাইকা আরোরা



ঐশ্বর্য রাই বচ্চন মেয়ে আরাধ্যার ঠোঁটে চুমু খেতেই, সেই ছবি নিয়ে নেটিজেনরা তাঁর ‘সংস্কার’ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও মিথ্যাচারও কাজ করে ট্রোলের পিছনে। লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণের পরে শাহরুখ খান তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে যান। হঠাৎই এক নেটিজেন মন্তব্য করে বসেন, শাহরুখ নাকি লতার নশ্বর দেহে থুতু ফেলছেন! নিমেষে ভাইরাল হয় সে পোস্ট। আসলে শাহরুখ ধর্মীয় রীতি মেনে ‘দোয়া’ করছিলেন। ঠিক একইভাবে দিলীপকুমারের প্রয়াণের পরে সায়ারা বানুর পাশে সানগ্লাস পরিহিত শাহরুখকে দেখে নিম্নের বাড় ওঠে। আবার, মন্দিরা বেদী তাঁর স্বামীর শেষকৃত্যে কেন ডেনিম পরেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা। কে কখন কী পরবেন, তা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং, পোশাক নির্বাচনের স্বাধীনতার সঙ্গে শোকপালনের কোনও যোগ নেই। সারা আলি খান কেন হিন্দু মন্দিরে পূজো দিতে গেলেন, পুরো বিষয়টাই লোক দেখানো কিনা, তা নিয়েও তো কত কথা! সাধারণত, এসব বিষয়ে তারকারা চুপ করেই থাকেন। অনেকে তো সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব পুরোপুরি ম্যানেজারদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, নিজেরা কमेंট পড়েও দেখেন না। তবে



■ লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে দোয়া করছেন শাহরুখ। তা নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি

নিরন্তর ‘অসংবেদনশীল’ কারণে ট্রোলড হতে থাকলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়ে বই কী!

ট্রোল ও মানসিক চাপ

যদিও তারকারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রোলকে পাত্তা না দেওয়ার থিয়োরিতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁরাও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাই নিরন্তর কুরুচিপূর্ণ আক্রমণে মাঝেমাঝে তাঁরাও প্রতিক্রিয়াশীল হন। যেমন, কয়েক বছর আগে নেপোটিজম নিয়ে বিতর্কের মাঝে সবচেয়ে বেশি ট্রোলড হয়েছিলেন করণ

জোহর। অবশ্য করণের কাছে ট্রোল কোনও নতুন বিষয় নয়, সে কথা তিনি বরাবরই খোলাখুলি জানিয়েছেন। তবে নেপোটিজম বিতর্কের পর সমাজমাধ্যমের নেগেটিভিটি থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টটি ডিলিট করে দিতে বাধ্য হন করণ। প্রায় একই কারণে ২০২০ নাগাদ নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট ডি-অ্যাক্টিভেট করে দেন সোনাক্ষী সিনহা। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পর নেপোটিজম নিয়ে নেটিজেনরা বিদ্রূপ করছিলেন প্রায় সব তারকা-সন্তানদেরই। সোনাক্ষীও ব্যতিক্রম ছিলেন না। একাধিকবার বিভিন্ন কারণে ট্রোলড হয়েছেন দীপিকা পাডুকোন। ‘গেহরাইয়া’র প্রমোশনের জন্য দীপিকার পোশাক-নির্বাচন থেকে অশালীন ভাষায় মেসেজ পাওয়া... সবই সামলেছেন তিনি। এক নেটিজেন তাঁকে অশালীন ভাষায় মেসেজ পাঠালে দীপিকা সেই মেসেজের স্ক্রিনশট নিয়ে লেখেন ‘বাহ! আপনার



■ করণ জোহর

ট্রোল নিয়ে তারকারা চুপ করেই থাকেন। অনেকে তো সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব পুরোপুরি ম্যানেজারদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, নিজেরা কमेंট পড়েও দেখেন না।

পরিবার ও বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করবে।’ মেট গালায় আলিয়া ভট্টের ডেবিউয়ের আগে কিছু নেটিজেন বলেন, দীপিকা নাকি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন! সেই ট্রোলকেও সপাটে মার্চের বাইরে পাঠিয়ে দীপিকা জানান, তিনি আলিয়ার আন্তর্জাতিক সাফল্যে খুশি। একবার এক সাক্ষাৎকারে রবীনা টান্ডন ট্রোল প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, “সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তারকারা এখন সহজলভ্য। তাঁদের সঙ্গে কথাও বলতে পারেন দর্শকরা। এর খারাপ দিকও আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ধরনের নেগেটিভ ট্রোলিং হয়, তার সঙ্গে যুঝতে তরুণদের মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্ত হতে হবে। নয়তো, তা যে কারওর মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলবে। মারে মারে ট্রোলা ভুলে যান, আমরাও রক্তমাংসের মানুষ!” সিনিয়র অভিনেতারা তো সামলে নিতে পারেন, কিন্তু এধরনের সাইবার বুলিংয়ে উঠতি অনেক শিল্পীরই যে মানসিক চাপ বাড়ে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

টলিউড ও ট্রোল

টলিউড তারকাদেরও প্রায় কেউই ট্রোলের হাত থেকে নিস্তার পাননি। দেবের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে মিম আর ট্রোলের সংখ্যা যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। তবে তিনি এক অদ্ভুত বর্ম তৈরি করেছেন নিজের চারপাশে, ট্রোলকে আমল না দেওয়ার। তাঁর মতে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্রোলের পরিমাণও বাড়বে। একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, “এখন তারকাদের নাগাল পাওয়া অনেক সহজ। আমি দেখেছি অনেক



■ দেবকে ট্রোলররা একটু বেশিই ভালবাসেন!

তারকা ছুটি কাটাতে গিয়ে তাঁদের রুম ও ওয়াশরুমের ছবি দেন। এরকমভাবে নিজেদের জীবনে অ্যাকসেস দিলে, লোকে তো কমেণ্ট করবেনই। সোশ্যাল মিডিয়া নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের অঙ্গ হোক, কিন্তু সবকিছু নয়।” ২০১৭-তে নুসরত জাহান দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানানোয় সমালোচিত হন। গণেশ চতুর্থীতে গণেশ মূর্তির সামনে টি শার্ট ও শার্টস পরে পোজ দেওয়ার জন্য মিমি চক্রবর্তীর ছবিকে হেট কমেণ্টসে ভরিয়ে দেন ট্রোলাররা। মীর ক্রিসমাস পালনের ছবি পোস্ট করলেও একইরকম নেগেটিভ মন্তব্যের শিকার হন। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় থেকে রাজ চক্রবর্তী, জয়া আহসান থেকে পাওলি দাম... টলিউডের প্রায় কোনও শিল্পীই নেটমাধ্যমে ট্রোলার হাত থেকে রক্ষা পাননি। এমনকি, বিয়ের পর অনিবার্ণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে বডি শেমিং করতেও ছাড়েননি লোকজন। উত্তরে অনিবার্ণ জানান, “আমি এতটাই ব্যস্ত এখন যে, এসব দেখার কোনও সময় নেই। অনেক পরিশ্রমের পর এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। তাই এরকম মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া দেওয়ারই কোনও অর্থ নেই! অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে ধরি না এসব



■ অনিবার্ণ এবং মধুরিমা, বিয়ের দিন। এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পর শুরু হয় বডি শেমিং

জিনিসগুলোকে।” বিভিন্ন কারণে প্রায়ই নেট-মাধ্যমে রসিকতার খোরাক হন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। “ট্রোলারদের কথা ভাবা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। তার চেয়ে বরং আমি প্রোডাক্টিভ কিছু করব ওই সময়ে। ট্রোলারস আর জবলেস,” মত পরিচালকের। তবে নিজেও নিজের ছবি নিয়ে তৈরি নানা মিম নিজের টাইমলাইনে মাঝমাঝেই রি-পোস্ট করেন সৃজিত। বোধহয়, এভাবেই ট্রোলারদের পরোক্ষে উত্তর দিয়ে দেন তিনি।

সমাজমাধ্যমের খারাপ দিক যেমন আছে, ভাল দিকও আছে। না হলে তারকারা কি আর সমাজমাধ্যমে নিজেদের জীবনযাপনের ছবি এভাবে তুলে ধরতেন! তবে আপনি



■ বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা এড়িয়ে চলেন ট্রোলারদের

২০১৭-তে নুসরত জাহান দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানানোয় সমালোচিত হন। গণেশ চতুর্থীতে গণেশ মূর্তির সামনে টি শার্ট ও শার্টস পরায় মিমি চক্রবর্তীর ছবি হেট কমেণ্টসে ভরে যায়।

যদি তারকা বা পাবলিক ফিগার হন এবং সমাজমাধ্যমে নিয়মিত ছবি বা পোস্ট দেন, তাহলে প্রশংসার পাশাপাশি ট্রোলার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এবার তা আপনি মজার

ছলে উড়িয়ে দেবেন, না চুপচাপ ইগনোর করবেন বা তাদের একহাত নেবেন, তা আপনার ব্যাপার।



অলংকরণ: সৌমেন দাস

দ্বীপান্তরের দিনলিপি

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোনের গোঁ-গোঁ শব্দে ঘুম ভাঙল শৈলেনের।

রাতে শোওয়ার সময় ফোন ভাইব্রেশন মোডে রাখে সে, নইলে রাতদুপুরে রিংটোনের শব্দে পাশের ঘরে বাবা মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। জড়তা কাটিয়ে লেপ থেকে হাত বের করার আগেই থেমে গেল ফোন। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ ধরেই কাঁপছিল ফোনটা। কান, মাথা লেপের আড়ালে থাকায় বুঝতে পারেনি শৈলেন।

গতকাল রাতে মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে শুতে এসেছিল। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে-করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

টাইমারে দুটো দশ। নম্বরও অচেনা। এত রাতে কে ফোন করল? যেই করুক, এই সময়ে আসা কোনও ফোনই ঠিক স্বাভাবিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনও অনর্থের বার্তা বয়ে আনে। দুরূহ বুদ্ধি ফোনের স্ক্রিন আনলক করল শৈলেন। যারা তার সঙ্গে প্রয়োজনে অথবা নিতান্ত মামুলি কারণে কথা বলে, তাদের সকলের নম্বর ফোনের যান্ত্রিক মগজে লিপিবদ্ধ করা আছে। আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীরা ফোন করলে, তাদের পরিচিতি ফুটে ওঠে পরদায়। অঙ্কিতা বাইরে থাকলে মাঝে-মাঝে দুটু মিনি করে। গলা পালটে বন্ধুদের ফোন থেকে কথা বলে শৈলেনকে বেকুব বানায়। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গেলেও এমন দুটু বুদ্ধি ভর করে তাকে। কিন্তু আজ বাড়িতেই রয়েছে অঙ্কিতা। ঘটনাতমক আগেই কথা হয়েছে তার সঙ্গে।

অচেনা নম্বরে কলব্যাক করা ঠিক হবে কি না ভাবতে-ভাবতেই আবার কঁপে উঠল ফোন। এবারও সেই অচেনা নম্বর থেকে। একটু ইতস্তত করে কল রিসিভ করল শৈলেন। ওদিক থেকে উত্তেজিত কণ্ঠের প্রশ্ন, “শৈলেন দাস বলছ তে?”

অচেনা পুরুষ কণ্ঠ। বয়স মনে হয় তিরিশের নীচেই। শৈলেনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছেলোটো তড়িঘড়ি বলে উঠল, “কল্লোল মিত্র বোপান্তা হয়েছেন, শিগগির পালাও!”

এমন একটা আশঙ্কার কথা ক’দিন ধরেই চালাচালি হচ্ছিল অফিসে। শুধু শৈলেন নয়, রেনবোর অনেকেই এমন কিছু ঘটতে পারে ভেবে আশঙ্কা করছিলেন। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছিল, তাতে কল্লোল মিত্রের গা ঢাকা দেওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা, তবে সেটা এত তাড়াতড়ি ঘটে যাবে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি কেউ!

কথাটা বিশ্বাস করার আগে ফোন যে করেছে, তাকে একবার বাজিয়ে নেওয়া প্রয়োজন!

শৈলেন জানতে চাইল, “কে আপনি? আমার কনটাক্ট নম্বর কে দিল আপনাকে?”

অচেনা কণ্ঠস্বর তুমি করে বললেও, তাকে আপনিই বলল শৈলেন। অপরিচিত কাউকে তুমি বলতে বাধে তার। ছেলোটো চাপা গলায় উত্তর দিল, “আমি তাপস। মনোজদা হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাল, তোমাকে খবরটা দিতে।”

হ্যাঁ, তাপসকে চেনে শৈলেন। মনোজদার সবচেয়ে প্রিয় সাব এজেন্ট। অফিসে মাঝে মাঝে দেখা হত। গাঁট্রাগোঁট্রা চেহারা, উচ্চতায় প্রায় মারাদানো। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথায় সবসময় একটা বেসবল ক্যাপ। তবে চেহারা চাকচিক্য না থাকলেও ছেলোটোর পারফরম্যান্স চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। বছরে অনেক টাকার ব্যবসা দেয়। বসেরা সর্দাদা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একটা কম্পিউশনে ফার্স্ট হয়ে গত বছর পুজোর আগে আন্দামানে গিয়েছিল তাপস। সেই সফরে বিনোদনের তালিকা ছিল লম্বা। জঙ্গলের কাছে বিলাসবহুল রিসোর্ট রাত কাটানো থেকে শুরু করে ক্রুজ শিপে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে বেরানো, সবই ছিল সপ্তাহব্যাপী সেই মোচ্চবের তালিকায়। আর মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা তুলতে পারলে শৈলেনও সেবার চড়ে বসতে পারত পোর্ট ব্লোরগামী বিমানে! কিন্তু কপাল মন্দ। একজন শেষ মুহূর্তে কথার খেলাপ করায় শৈলেনের কপালে জটল মুকুটমণিপুর। কোথায় সোনালি সাগরতটে আছড়ে পড়া ফেনিল ডেট, রহস্য মোড়া আদিম অরণ্যের হাতছানি, আর কোথায় ঘরের পাশের মুকুটমণিপুর! কম্পিউশনের ফলাফল ঘোষণা করে মনোজদার বসের বস শৈলেনের পিঠ চাপড়ে সাঙ্ঘনা দিয়েছিল, “ডোন্ট বি আপসেট মাই বয়, ট্রাই ইট। নেস্ট টাইম ফর শিওর।” সে যাই হোক, ফোনে তাপসের গলা এমন খ্যানখেনে শোনায়, সেটা জানা ছিল না শৈলেনের!

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মনোজদা নিজে ফোন না করে দায়িত্বটা তাপসকে দিল কেন! আধশোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে শৈলেন জিজ্ঞেস করল, “মনোজদা এখন কোথায়? বিকাশ, শ্যামল, কিঙ্করদের খবর কিছু জানো?”

আগের মতোই চাপা গলায় তাপস বলল, “মনোজদা কোথায় আমি জানি না। একটু আগে দাদার হোয়াটসঅ্যাপ পেলাম। তারপর থেকেই

ফোন সুইচড অফ। তোমাকে প্রথম খবরটা জানাচ্ছি, এবার বাকিদের ফোন করব। ও হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপারে দাদা সাবধান করেছে। যাওয়ার সময় তোমার ফোন সঙ্গে নেবে না। আপাতত কিছুদিন বাড়ির লোকের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে না। আমাদের সকলেরই নম্বর ট্রাক করা হতে পারে। সব থিতিয়ে যাওয়ার পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা রাখছি।”

একগাদা প্রশ্ন ছিল শৈলেনের। ঠিক কখন নিরুদ্দেশ হলেন কল্লোল মিত্র? এজেন্ট, সাব এজেন্ট, এমপ্লয়ীদের জন্য কোনও বার্তা কি তিনি রেখে গেছেন? যাদের পলিসি ম্যাচিওর করেছে, তাদের টাকা ফেরতের কী হবে? তিন মাস ধরে এজেন্টরা কমিশনের টাকা পাচ্ছে না, তারই বা কতদূর! কিন্তু শৈলেনকে আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই তড়িঘড়ি ফোন কেটে দিল তাপস। যদিও শৈলেন জানে প্রশ্নগুলোর সদুত্তর তাপসের কাছেও নেই। কিন্তু ডুবন্ত মানুষ হাতের সামনে খড়কটো পেলেও আঁকড়ে ধরে!

জল বরফ-ঠান্ডা। তবু বাথরুমে গিয়ে সেই জলেই চোখমুখ ধুল শৈলেন। মাথাব্যথা আর পেট-গুড়গুড় ভাব কমল না তাতে একটুও। মাঝপথে ঘুম ভাঙার ক্রেশ এবং বজ্রপাতের মতো দুঃসংবাদ... দুইয়ের মিলিত আক্রমণ পেড়ে ফেলেছে তাকে।

ঘরে এসে জানলার কপাট খুলে দিল শৈলেন। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ধেয়ে আসছে হারানদের সর্ব্বোচ্চ পেরিয়ে। মেঘমুক্ত আকাশে তারাগুলো সব হিরের কুচির মতো জ্বলজ্বল করছে। ঘুম না আসা রাতে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এমন উজাড় করা রূপ দেখতে ভালবাসে শৈলেন। কিন্তু এখন এসব উপভোগ করার মন নেই তার। তাপসের কথা সত্যি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। আজকাল স্মার্টফোন, ইন্টারনেটের দৌলতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও যে-কোনও খবর পৌঁছে যায় মুহূর্তে। কল্লোল মিত্র নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর চাউর হয়ে গেলে গাঁ ছেড়ে বেরনো মুশকিল হবে তার!

ব্যাগ গোছানোই ছিল। কখনও এমন দিন আসতে পারে ভেবে ক’দিন আগে একটা ব্যাকপ্যাকের মধ্যে কয়েকটা জামাপ্যান্ট ঢুকিয়ে রেখেছিল শৈলেন। চিরুনি, শেভিং কিট, মানিবাগের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এই ঘরেই থাকে। অর্থাৎ বাবা মায়ের ঘুম না ভাঙিয়ে, এখনই সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে। তবে যাওয়ার আগে অঙ্কিতাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। কাল সকালে অঙ্কিতা এখানে এসে বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলবে তার বাড়ি ছাড়ার কারণ!

এত রাতে বাস পাওয়ার প্রশ্ন নেই। টোটো বা রিকশা চালু হতেও ঢের দেরি। সাইকেলে করে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রশ্ন হল সাইকেলটা বাড়িতে ফেরত আনবে কে! রাতটুকু গেলেই তার শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকবে হু-হু করে!

শৈলেন ঠিক করল হেঁটেই যাবে। জোর কদমে ঘটনাক্রমে হাঁটতে পারলেই স্টেশন। এই ঠান্ডায় এক ঘণ্টা হাঁটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। তাছাড়া কপাল ভাল থাকলে রাস্তায় কিছু জুটেও যেতে পারে। অনেক সময় হাত দেখালে সবজির ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে। বিশ-তিরিশ টাকায় তারা পৌঁছে দেয় স্টেশনে। ট্রাক ড্রাইভার যদি পঞ্জাবি হয়, তবে তো কথাই নেই। বেশিরভাগ পঞ্জাবি ড্রাইভারের মন খুব ভাল, রাতবিরেতে পথচারীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওরা টাকা নেয় না।

গ্রিলের দরজায় তাল দিতে গিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল শৈলেনের। কোনও দোষ না করেই তাকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে চোরের মতো। জানা নেই কতদিন সময় লাগবে সব স্বাভাবিক হতে, কবে মাথা উঁচু করে ফিরতে পারবে নিজের প্রিয় গাঁয়ে!

রাস্তা শুনশান, মানুষজনের দেখা নেই। দুটো কুকুর চায়ের দোকানের উনুনের পাশে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে ছিল। শৈলেনকে দেখে নিস্তেজ গলায় বারকয়েক ডেকে থেমে গেল। যখন পুরোদমে কাজ চলত, তখন প্রায়ই বাড়ি ফিরতে রাত হত শৈলেনের। রাস্তার সারমেয়কুলের কাছে রাতচরা শৈলেন তাই অচেনা আগন্তুক নয়!

শীতটা জবর পড়েছে। জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে হুড়িটা মাথায় চাপিয়ে নিল শৈলেন। মেলার মাঠ পেরনোর সময় আরও একবার বুকটা হু-হু করে উঠল তার। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে বাঁশ পড়েছে।

আজ-কালের মধ্যেই শামিয়ানা টাঙানোর কাজ শুরু হবে। প্রতিবছর শীতকালে এখানে সাত দিন ধরে যাত্রা উৎসব হয়। মেলা বসে, বাউল আসে। সেই সময় বাহারি আলায় সেজে ওঠে গ্রাম। গাঁ ভর্তি লোক মেতে ওঠে আনন্দে। গত দু'বছর করোনার জেরে বন্ধ ছিল উৎসব। এবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। মেলায় পরিচালন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়েও কালকের পর থেকে সকলের কাছে সে হয়ে যাবে ব্রাত্য!

এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আর কী ঘটবে জানে না শৈলেন। তার পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে কেমন হবে গ্রামের মানুষের প্রতিক্রিয়া? দল বেঁধে বাড়িতে চড়াও হবে? যাচ্ছেতাই অপমান করবে বাবা মাকে? মা অনেকদিন ধরে অসুস্থ। সন্তানের গৃহত্যাগের যন্ত্রণার সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের লাঞ্ছনা—রোগা, ক্লান্ত শরীরে এমন জোড়া আঘাত সামলাতে পারবে মা? কিছু যদি ঘটে যায়!

মায়ের এমন অবস্থায় কোনও সন্তানই তাকে ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু শৈলেন নিরুপায়। গত কয়েক মাসে পরিচিত মানুষগুলোকে একটু-একটু করে ভোল পালটাতে দেখেছে সে। কল্লোল মিত্র নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর চাউর হলে, তাদের আক্কেশ কোন পর্যায়ে পৌঁছেবে, তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। হয়তো তার তীব্রতায় শৈলেনের প্রাণসংশয়ও হতে পারে! সে আঘাত সহ্য করা আরও কঠিন হবে মায়ের পক্ষে!

বড় রাস্তায় উঠে কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই পিছন থেকে ট্রাকের আলো। কাছাকাছি আসতে, হাত দেখাতেই থেমে গেল ট্রাক। শৈলেন স্টেশন রোডের মুখে নামবে শুনে ড্রাইভার রাজি, কিন্তু সামনের কেবিনে জায়গা নেই। হেল্লার ঘুমোচ্ছে। যেতে চাইলে শৈলেনকে লরির পিছনে ঝুলে-ঝুলে যেতে হবে। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা।

শৈলেনকে ইতস্তত করতে দেখে তাড়া দিল ড্রাইভার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই।

হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় ওভাবে ঝুঁকি নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না শৈলেনের। কিন্তু কেবিনে জায়গা হবে না, তা গাড়ি থামামাত্রই নারীকণ্ঠের খিলখিল শুনে বুঝে গিয়েছে সে। এই পথে সস্তার রূপোপজীবিনী সহজলভ্য। সারা রাত ধরে পালা করে ড্রাইভার এবং হেল্লারদের মনোরঞ্জন করা তাদের পেশা। এখন হেল্লার মজা লুটছে, এর পর ড্রাইভারের পালা!

নিমরাজি হয়ে লরির পিছনে উঠে পড়ল শৈলেন। বাড়তি চাকা রাখার লোহার খাঁচায় দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে যাওয়া কষ্টকর, কিন্তু রাতদুপুরে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার চেয়ে এ ঢের ভাল। একটু কষ্ট করে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই স্টেশন রোড।

কিন্তু গাড়ির চাকা গড়াতেই শৈলেন টের পেল যতটা ভেবেছিল, ঝুঁকির পরিমাণ তার তুলনায় অনেক বেশি। খানাপান বোঝাই রাস্তা পার হওয়ার সময় ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি দিচ্ছে গাড়িটা। কুয়াশায় ভেজা নাইলন দড়ি মুঠোয় ধরে রাখতে যথেষ্ট মেহনত করতে হচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে দড়িতে জড়িয়ে নিতে পারলে সুবিধে হত। কিন্তু এক হাতে দড়ি ধরে অন্য হাতে পকেট হাতডানো বোকামো হয়ে যাবে। হাত ফসকে যেতে পারে যে-কোনও মুহুর্তে!

রাস্তা ফাঁকা। বেশ তাড়াতাড়িই স্টেশন রোডের মুখে পৌঁছে গেল ট্রাক। কিন্তু শৈলেনের মনে হল, সময়টা লম্বা ছিল। গাড়ি থামামাত্রই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে। ঠান্ডায় সমস্ত শরীর অসাড়। শক্ত নাইলন দড়ি আঙুলে কেটে বসেছে। কোনও মতে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শৈলেন কেবিনের দিকে পা বাড়াতোই চলতে শুরু করল গাড়ি। ট্রাকের পিছন-পিছন কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শৈলেন। বোঝাই যাচ্ছে আজ ট্রাক ড্রাইভারের মেজাজ শরিফ আছে। ভাড়ার জন্য প্রথমে খানিক দরাদরি করলেও, শেষ পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় পৌঁছে দিল গন্তব্যে। অজানা রূপোপজীবিনীর উদ্দেশ্যে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্টেশন রোড ধরে হাঁটতে শুরু করল শৈলেন।

কুয়াশাঘেরা পাথ জনহীন। মাঝে-মাঝে দু'-একটা মালভর্তি ভ্যানরিকশা চলে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। মাঝারি গতিতে হেঁটে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল শৈলেন। বহুবার দেখা স্টেশন চত্বর শীতের ভাৱে বেশ অন্যরকম। ঘন কুয়াশায় বাতিস্তম্ভের আলোগুলো বুজে

এসেছে প্রায়। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা আর আলো-আঁধারি মায়ায় অনেক দিনের চেনা জায়গাটা যেন ভৌতিক ছবির পটভূমি!

একটা চায়ের গুমটি ছাড়া সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। দোকানদার উনুনে বড় কেটলি বসিয়েছে। গলগল করে খোঁয়া বেরচ্ছে কেটলির মুখ দিয়ে। এই ঠান্ডায় এক কাপ গরম চা পেলে ভারী আরাম হত। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে আয়েস করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গেলে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

ডজনখানেক চওড়া সিঁড়ি ভেঙে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম। সময় বলছে, হাওড়া যাওয়ার প্রথম ট্রেন একটু পরেই। ট্রাক ড্রাইভারের বদান্যতায় বেঁচে যাওয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল শৈলেন। বুকিং ক্লার্কের ঘুম-ঘুম চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

সিঁড়ির মুখে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে এক ভবঘুরে। ওটাই ওর স্থায়ী ঠিকানা। প্রতিবার বেশি রাতে বাড়ি ফেরার সময়, ওকে ওখানে শুয়ে থাকতে দেখে শৈলেন। কোল্যাপসিবল গেটের গা ঘেঁষে মায়ের কোলের মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে চারটে কুকুরছানা।

ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে তার উপরে নজরদারি করার জন্য কেউ ওত পেতে নেই, তবু নিচু স্বরে শৈলেন উচ্চারণ করল, “নালিকুল... একটা নালিকুল।”



বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে গিটার সবচেয়ে প্রিয় বিপাশার। সেতার, এশ্রাজ, পিয়ানোও তার পছন্দের। বিশেষ করে গভীর রাতে অথবা নির্জন দুপুরে পিয়ানোর মিষ্টি সুরে ডুব দিতে ভাল লাগে তার। কিন্তু গিটারের প্যাশন অন্য কিছুতে পায় না সে। বিপাশার বিশ্বাস, একজন মাস্টার গিটারিস্ট স্ট্রিংয়ে স্ট্রাম করার পর সাউন্ডহোল থেকে যে স্বর্গীয় ঝংকার উঠে আসে, জগৎ সংসারের মধুরতম শব্দ সেটাই। সেই সুর শোনার জন্য হাঁটা যায় মাইলের পর মাইল, পেরনো যায় দুর্লভ গিরি, ঝাঁপ দেওয়া যায় উত্তাল সমুদ্রে!

গিটারের প্রতি এমনই দুর্বীর তার আকর্ষণ যে, নিজের সাধের নখগুলো বিসর্জন দেওয়ার আগে দু'বার ভাবেনি সে!

কলেজ ফেস্টে একবার এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরার পারফরম্যান্স দেখার পরেই গিটার নিয়ে পাগলামি দানা বেঁধেছিল বিপাশার মগজে। পিটার গোমস্ নামে সেই ছেলের বাজানোর হাত দুদান্ত। বাজাত নাকি পার্ক স্ট্রিটের কোনও এক রেস্টুরায়। সেই কথা শুনে দিনের পর দিন পার্ক স্ট্রিটের নামী অনামী স্বপ্নানামী রেস্টুরায় টু মেরেও ছেলের দোখা পায়নি বিপাশা। হয়তো যে সময় বিপাশা রেস্টুরায় বসে চিকেন স্টুটে অলস চুমুক দিচ্ছে, তখন পিটার গোমসের সেখানে বাজানোর সময় নয়। অথবা আদৌ সে পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্টুরায় বাজায় না, বিপাশাকে এমন তথ্য যে জুগিয়েছিল, সে ভুল জানত। কারণ কোনও-কোনও রেস্টুরায় ওয়েটার পিটার গোমস্ নামটা শুনে থাকলেও, ওই নামে কোনও গিটারিস্ট আছে কিনা মনে করতে পারেনি। একজন ওয়েটার অবশ্য বলেছিল, পিটার গোমস্কে সে চেনে। পার্ক স্ট্রিটের এক মাঝারি মানের রেস্টুরায় বাজিয়েছিল কিছুদিন। কিন্তু কলকাতার গরম বরদাস্ত না হওয়ায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পাড়ি দিয়েছে পাহাড়ে। সেখানে এক ছোট পানশালায় এখন বাজায়। তবে জায়গাটা ঠিক কোথায়, সেই খবর জানা নেই তার। হতে পারে সেটা দার্জিলিং বা গ্যাংটক। দুটোর কোনওটা না হলে নিশ্চিত ভাবেই শিমলা!

বলা বাহুল্য, এমন অগোছালো তথ্য পাওয়ার পরে ‘পিটার অন্বেষণ’ পর্বে তখনকার মতো ইতি টেনেছিল বিপাশা। তার বন্ধু চিত্রা পুলিশে জয়েন করার পরে নিজের সোর্স কাজে লাগিয়ে

পিটারের হৃদয় পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল কিছুদিন। কিন্তু সেও হাত তুলে নেওয়ার পর আর সময় নষ্ট করেনি। গিটারিস্টকে খুঁজে বের করার শেষ চেষ্টা হিসেবে হাতে তুলে নিয়েছিল গিটার। তার বিশ্বাস ছিল, সুরের মাজাজাল বিস্তার করেই কাছে টেনে আনা যাবে সুরের রাজকুমারকে। ল' ফার্মের চাকরির বাইরের সময়টুকু তাই এখন বিপাশার কাঁটে ছয় তারের সাত সুরে।

ফাইনাল ইয়ারে কলেজ ফাংশানের দিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে বিপাশার। রক্তে দোলা দেওয়া সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গিটারের হেডস্টক থেকে ঠিকরে আসা আলো, ফ্রেটবোর্ডে শৈল্পিক ক্রততায় পিটারের আঙুলের ওঠানামা দেখতে দেখতে সেদিন জাস্ট হিপনোটাইজড হয়ে পড়েছিল সে। আজও কাঁটেনি সেই ঘোর। কিন্তু পিটারকে দেখার আশায় পানশালা থেকে পানশালায় টু মারার ফাঁকে চিকেন স্টু কবে কীভাবে রেড ওয়াইন হয়ে উঠল, এখন আর সেই কথা মনে করতে পারে না ওর।

চার নম্বর পেগ শেষ করে পানপাত্র ভরে দেওয়ার জন্য ওয়েটারকে ইশারা করল বিপাশা। চিত্রা সঙ্গে থাকলে এই সময় আপত্তি করত। ও জানে, তৃতীয় পেগটাই বিপদ সীমার শেষ ধাপ, তার উপরে উঠলে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে বিপাশা। তখন কারও সাহায্য ছাড়া নিজের ডেরায় পৌঁছনো তার পক্ষে কঠিন।

আজ তো তিন পেরিয়ে চার হয়ে গিয়েছে। পাঁচের পরে বাড়ি ফেরার কাজটা খুব সহজ হবে না। তবে আরও অনেক সুরারসিকের মতো পার্ক স্ট্রিটের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের উপরে অগাধ ভরসা বিপাশার। বাড়ির ঠিকানা লেখা কার্ড বা অ্যাপে ঠিকানাটা ঠিকঠাক দিয়ে দিলে তারা আরোহীকে পৌঁছে দেবে আবাসনের গেট পর্যন্ত। সেখান থেকে নিজের ঘরে যাওয়ার দায়িত্ব সুরাপায়ীর। যদিও গত চার বছর পার্ক স্ট্রিটের পানশালায় যাতায়াত করলেও, অতটা শোচনীয় অবস্থা কখনও হয়নি বিপাশার।

আজ বিপাশা যেখানে এসেছে, সেই বার কাম রেস্তুরার একটা নিয়ম আছে। দুই পেগের বেশি পানীয় নিতে গেলে ক্রেতাকে আগাম দাম মেটাতে হয়। বার মালিকদের কাছে রসালো খন্দের কাম্য হলেও, রসাসক্ত ক্রেতা নয়। সোমরসের প্রভাবে সুরারসিকরা জগৎ সংসার বিস্মৃত হতেই পারে, সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার! কিন্তু মালিকদেরও হক আছে সময় থাকতে নিজের লাভের কড়ি বুঝে নেওয়ার।

কার্ড সোয়াইপ মেশিন এবং বিল এনে টেবিলে রাখল ওয়েটার। হাতব্যাগ থেকে ডেবিট কার্ডটা বের করল বিপাশা। পিন দিতে গিয়ে একটুও কঁপল না আঙুল। খসখস শব্দে রিসিট বেরিয়ে আসতেই মুদু হাসি ফুটল ওয়েটারের মুখে। বিপাশাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে গেল কাউন্টারে। সামান্য পরে ফিরে এল পূর্ণ পানপাত্র নিয়ে।

যে গান গাইছে, এই রেস্তুরায় তাকে আগেও দেখেছে বিপাশা। গলা মন্দ নয় ছেলেটার। নতুন-পুরনো সব ধরনের গান আয়ত্তে থাকলেও, আর ডি-র ফুট ট্যাপিং কম্পোজিশনেই বেশি সাবলীল ছেলেটা। ভরা পানপাত্র ছোট চুমুক দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল বিপাশা। গায়কের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে একটা মেয়ে। খানিকটা নাচের মতো লাগলেও ওটাকে নাচ বলা যাবে না। যেহেতু এখন পানশালায় নর্তকীদের নাচার নিয়ম নেই, তাই আইন বাঁচিয়ে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনর জন্য অঙ্গভঙ্গিগুলো আয়ত্ত করতে হয়েছে মেয়েটাকে। বয়স বেশি নয় মেয়েটার, সম্ভবত কুড়ি-একুশ। তার উপর খাটো খুলের আঁটসাঁটো ব্রক পরায় বয়স গোঁড়া খেয়ে নেমে গিয়েছে কৈশোরের কোঠায়।

পানপাত্র আরও কয়েকটা চুমুক দিয়ে আশপাশের টেবিলে চোখ বুলিয়ে নিল বিপাশা। আজ শনিবার হওয়ায় ভিড় একটু বেশিই। ক্রেতাদের অধিকাংশই পুরুষ। সাধারণ সেলস এজিকিউটিভ থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পায়ালারী ম্যানেজার, সব ধরনের মানুষের সমাগম হয়েছে সপ্তাহের শেষ সন্ধ্যার মেহফিলে। পানশালা এমন একটা জায়গা, যেখানে পদের মহিমা লুপ্ত হয়ে যায়। সারাদিন ঠান্ডা ঘরে কাটিয়ে আসা ম্যানেজারের পাশের টেবিলে বসে মেজাজে পানীয়ের অর্ডার দিতে পারে নিচুতলার কর্মীরা। বড়-বড়

ধর্মস্থানেও এমন সাম্যবাদী আচরণ নেই।

তবে বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক কিছু মতো এই ভাবনাটাও সংশোধন করে নিয়েছে বিপাশা। মোদা কথা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা নাম-যশ-অর্থের অধিকারী, ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। মন্দিরের লাইনে দাঁড়ানো অথবা না-দাঁড়ানোর উপরে তাদের অনুগ্রহপ্রাপ্তি নির্ভর করে না!

ল' ফার্মে কাজ করার সুবাদে বিপাশা জানে, যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী, মানুষ হিসেবে তারা সবাই মহৎ নয়। কিন্তু ভগবান কেন তাদের প্রতি সদয় হলেন, সেটাই প্রশ্ন। অফিসের বিজনদার কাছে এই ধাঁধার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। তিনি বলেন, “আরে ভাই, এসব জন্ম-জন্মান্তরের খেলা। আগের জন্মে ওরা দেদার পুণ্য কামিয়েছিল, এই জন্মে তারই সুফল ভোগ করছে। তবে তুমি নিশ্চিত থাকো, কাঠ খেলে অঙ্গার উগরোতে হয়! কর্মফল বলে তো একটা কথা আছে, এই জন্মে না হোক পরের জন্মে ঠিক টাইট হয়ে যাবে ব্যাটারা!”

চিত্রা আসবে বলে আজ একটা টেবিল বুক করেছিল বিপাশা। ইচ্ছে ছিল পানীয় চুমুক দিতে-দিতে নিশ্চিন্তে গল্প করবে দু'জনে। প্রায় মাসখানেক পরে আবার একসঙ্গে বসার সুযোগ হয়েছিল তাদের। অনেক না বলা কথা জমে আছে দু' তরফেই। ফোনে আর ক'টা কথা হয়!

ঘাড়ের কাছে অচেনা মানুষ থাকলে প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না, তাই গোটা টেবিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিশেষ কাজ পড়ে যাওয়ায় আসতে পারেনি চিত্রা। টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারটা এত ক্ষণ ফাঁকাই পড়ে ছিল। আচমকা হুড়মুড়িয়ে একটা ছেলে এসে বসে পড়ল সেখানে।

ছেলেটার আগমন এমনই সহসা যে মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিল বিপাশা। চিত্রা না আসায় টেবিলের ‘রিজার্ভড’ লেখা বোর্ডটা আগেই সরিয়ে নিয়েছে ওয়েটার, বিপাশার অনুমতি নিয়েই অবশ্য। পানশালায় ভিড় বেড়ে চলেছে। এই সময় কোনও টেবিল ফাঁকা পড়ে থাকলে কেউ সেখানে বসতেই পারে, তাতে বিপাশার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তার একা থাকতে ইচ্ছে করছে, চোখের সামনে অপরচিত কারও উপস্থিতি ভাল লাগছে না। যদিও নিজের বেডরুম অথবা ড্রয়িংরুমের পরিবর্তে পানশালায় বসে একা হওয়ার ইচ্ছে খুব যুক্তিসঙ্গত নয়।

অসম্ভব চোখে ছেলেটার দিকে তাকাল বিপাশা। যদিও সেই দৃকপাত প্রভাব ফেলল না তার উপরে। মন দিয়ে মেনুকার্ড দেখছে সে। বিপাশা একবার ভাবল, ওয়েটারকে ডেকে বলে ছেলেটাকে তুলে দিতো কিন্তু পর ক্ষণেই মনে হল, এমন বেয়াড়া আবদারে সায় দেবে না পানশালা কর্তৃপক্ষ, উলটে মুখ পুড়বে তার। তাছাড়া আর কত ক্ষণই বা সে থাকবে এখানে। পানপাত্রের তলানিটুকু শেষ করে এবার বাড়ির দিকে রওনা দিলেই হয়।

অবশিষ্ট পানীয় দুই চুমুকে খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বিপাশা, কিন্তু এগোতে গিয়ে শরীরটা টলে গেল প্রবলভাবে। টেবিল ধরে কোনওমতে টাল সামলাল। মেনু কার্ড থেকে মুখ তুলে ছেলেটা বলল, “এনি প্রবলেম ম্যাম, নিড হেল্প?”

ছেলেটার কণ্ঠে আন্তরিকতা। অর্থাৎ বেললোপনা ওর উদ্দেশ্য নয়। ছেলেটার আগমনে বিপাশা যতটা বিরক্ত হয়েছিল, আসলে তার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে মানুষ। ঠাঁটের কোণে মৃদু হাসি বুলিয়ে বিপাশা বলল, “নো, নট অ্যাট অল। থ্যাংকস।”

“আর ইউ শিওর?”

“ইয়েস, অফ কোর্স।”

কথাটা যথেষ্ট প্রত্যয় নিয়েই উচ্চারণ করল বিপাশা, কিন্তু সামনে এগোতে গিয়ে সেই পরিমাণ আত্মবিশ্বাস পেল না। শরীর কাঁপছে, আশপাশের সব কিছু দুলছে। টেবিলের ঠেকনাটা হাতের নাগাল থেকে সরে যেতেই বিপাশা অনুভব করল, আনাড়ির মতো কাজ হয়ে গিয়েছে। চিত্রা সঙ্গে নেই, সে কথা মাথায় রেখে আজ দু' পেগে কোটা কমপ্লিট করা উচিত ছিল। বরং স্কচের একটা বোতল কিনে বাড়ি ফিরে

ছিপি খোলা যেত। ফ্রিজে সোডা ওয়াটার, বরফ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আকর্ষণ গিলে নিজের সোফায় সারা রাত বেইশ হয়ে পড়ে থাকলেই বা কার কী বলার ছিল! এখন নিজের হঠকারিতার জন্য ভরা পানশালায় সবার কৌতূহলের খোরাক হতে হবে!

ছেলেটা প্রস্তুত ছিল। বিপাশা হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগেই লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলল তাকে। তারপর ধীরে-ধীরে বসিয়ে দিল চেয়ারে। আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বিপাশা। যে যার পানীয়ে মশগুল। তার হোঁচট খাওয়ার দৃশ্য দু’-একজনের চোখে পড়লেও সেটাকে তেমন আমল দেয়নি কেউ। পানশালায় এমন ঘটনা বিরল নয়। বিপাশা বেশ কয়েক সেকেন্ড ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “থ্যাংকস এগেনা!”

প্রতিক্রিয়ায় সামান্য কাঁধ বাঁকাল ছেলেটা। তারপরেও ওর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল না বিপাশা। সামান্য সময় চুপ থাকার পরে বলল, “ইফ ইউ ডেন্ট মাইন্ড, আমাকে একটা ট্যান্সিতে তুলে দিতে পারেন? মনে হচ্ছে আমার একার পক্ষে রাস্তা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়।”

ছেলেটা ভুরু কঁচকে কয়েক সেকেন্ড কিছু ভেবে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাবেন?”

“লেক টাউন।”

“বেশ, আমি কাছাকাছিই থাকি। নাগেরবাজার। আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। আপনার আপত্তি না থাকলে লেক টাউনে পৌঁছে দিতে পারি।”

“না-না আপত্তি কিসের... কিন্তু আপনি তো সবে এলেন। এখানে কিছুক্ষণ থাকবেন নিশ্চয়ই?”

ছেলেটা ভুরু কঁচকে আবার কিছু ভাবল। তারপর বলল, “একটু সময় দিতে পারেন আমাকে, এই ধরুন দশ মিনিট?”

“হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। টেক ইয়ার টাইম।”

বিপাশা ভেবেছিল ছেলেটা ওয়েটারকে ডেকে খাদ্য এবং পানীয়ের অর্ডার দেবে। বটপট পানাহার সাজ করে তাকে পৌঁছে দেবে আবাসনে। কিন্তু তার বদলে ফোন বের করে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল।

দ্বিধায় পড়ল বিপাশা। ঝোঁকের মাধ্যম রাতের বেলায় অচেনা একজনের গাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাবে সায় দিয়ে সে কি ভুল করল? এমন পরিস্থিতিতে অঘটনের নজির শহরে কম নেই! কিন্তু মন বলছে ছেলেটার সঙ্গে গেলে ক্ষতি হবে না। কাজে বেরিয়ে বাস-ট্রেন-অটো-মেট্রোয় চড়তে হয় তাকে। ভিড়ের মাঝে আনওয়ার্টেড টাচের অভিজ্ঞতা হয় প্রায় প্রতিদিনই। কিন্তু সে পড়ে যাওয়ার সময় ছেলেটা তাকে ধরেছিল, সেই স্পর্শের মধ্যে কোনও কলুষতা ছিল না। মনে কুমতলব থাকলে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল ছেলেটার দিক থেকে!

একটু পরে ফোন বেজে উঠতেই মুখে হাসি ফুটল ছেলেটার। বলল, “চলুন ম্যাডাম, গাড়ি এসে গিয়েছে।” হাতব্যাগটা কাঁধে বুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বিপাশা। ছেলেটা হাত ধরে উঠতে সাহায্য করল তাকে। ছেলেটার কাঁধে ভর দিয়েই বিপাশা এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

বাইরে বেরিয়ে বিপাশা দেখল হাল মডেলের একটা বিদেশি গাড়ি অপেক্ষা করছে পানশালার দোরগোড়ায়। চারপাশের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে যন্ত্রশকটের ধাতব শরীর। বিপাশা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতাই মৃদু হেসে মাথা দোলাল ছেলেটা। অর্থাৎ এই গাড়িতেই উঠতে হবে তাকে।

অভ্যাসবশত গাড়ির পিছনের দরজার দিকে এগোতেই বিপাশাকে থামিয়ে ছেলেটা বলল, “পিছনে নয় ম্যাডাম, আপনাকে সামনে বসতে হবে।”

ব্যাপারটা ভাল লাগল না বিপাশার। আগ বাড়িয়ে লিফট দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে কোনও ভদ্রলোক একজন মহিলাকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে নিয়ে যায় নাকি! কিন্তু এই মুহূর্তে ওসব ছোট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থায় নেই সে। একটু একটু গা গুলোচ্ছে তার, ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা। আর কিছু ক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো বেইশ হয়ে লুটিয়ে পড়বে রাস্তায়!

ছেলেটা এক হাত দিয়ে বিপাশাকে ধরে গাড়ির দরজা খুলল। কোনওমতে শরীরটা ভিতরে গলিয়ে সিটে এলিয়ে পড়ল বিপাশা। গাড়ির ভিতরে ঝুঁকে এসে সিটবেল্ট বেঁধে দিল ছেলেটা।

শীতটা আজ হঠাৎ জাঁকিয়ে পড়েছে। সকালে অফিসে আসার সময় তেমন গরম পোশাক পরেনি বিপাশা, ভেবেছিল প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পানশালা থেকে বেরিয়ে ফুটপাথটুকু পেরোতেই টের পাওয়া গিয়েছে ঠান্ডার কামড়। তবে বাইরে দাঁতকপাটি লাগার জো হলেও গাড়ির ভিতরটা বেশ গরম। সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল বিপাশা। দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়ে গাড়ির পিছনে উঠে বসেছে ছেলেটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েই আতঙ্কের ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল বিপাশার শিরদাঁড়া দিয়ে। কাচের জানলা ভেদ করে আসা সবজে আলোয় সে দেখল, ছেলেটা একা নয়, পিছনের সিটে আরও দু’জন রয়েছে তার সঙ্গে!

বিপাশার মনে হল তখনই নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। কিন্তু মসৃণ রাস্তায় গতি নিয়েছে গাড়ি। দ্রুত পিছলে যাচ্ছে দু’পাশের দোকান-ফুটপাথ-মানুষজন। প্রাণপণে গা বাড়া দিয়ে উঠতে গিয়েও পারল না বিপাশা, শরীরের সঙ্গে এঁটে বসেছে সিটবেল্ট!



গোধূলির আলোয় গা ভাসিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে ভাল লাগে বিপাশার। কিন্তু সেই শখ মেটানোর সুযোগ বড় একটা হয় না তার। অফিস থেকে বেরোতে সাতটা-সাতটা বাজে। বিবাদী বাগ থেকে লেক টাউন আরও এক-দেড় ঘণ্টার ধাক্কা। ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিপাশা যখন ঘরে ফেরে, সময় তখন ঢলে পড়েছে রাতের কোলে। অন্ধকার ঘরে বসে অগুস্তি হাইরাইজের আলো-ছায়া চৌখুপি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায় আরও একটা দিন।

ঘুম ভাঙার পরেও কিছু ক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা বিপাশার বরাবরের সুখবিলাস। এরপর পাশবালিশ আঁকড়ে কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে সে। তারপর উঠে বসে চোখ কচলিয়ে। আজ সকালেও সবক’টা ধাপ পেরিয়ে আড়মোড়া ভাঙার পর প্রথমে তার চোখ পড়ল ওয়ার্ডরোবের উপরে। ওখানে একটা শান্তিনিকেতনী ধাঁচের টেবিল ক্যালেন্ডার। সেটার কয়েকটা খোপে লাল অথবা সবুজ দাগ দেওয়া। মাসের প্রথমেই খুব মন দিয়ে এই কাজটা সেরে ফেলে বিপাশা। সবুজ দিনগুলো নিজের ইচ্ছেমতো কাটানোর স্বাধীনতা আছে তার। চিত্রার সঙ্গে শপিং-পার-রেস্তুরা অথবা নিছক আউটিং, গিটারের ক্লাস... এইসব মন ভাল করে কাজ সবুজের আওতায়। ক্যালেন্ডারে লাল দাগের অর্থ অফিসের রুটিন কাজের বাইরে বিশেষ কিছু। ওদিন বিপাশাকে যেতে হয় কলকাতার বাইরে। নিলামে উঠবে এমন কোনও সম্পত্তি বর্তমানে ঠিক কেমন অবস্থায় আছে, ছবিসহ তার রিপোর্ট তৈরি করা, বিগড়ে যাওয়া ক্লায়েন্টের মুখোমুখি বসে শেষবারের মতো তাকে বোঝানো, এই সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিশ্রমের কাজগুলোর জন্য বরাদ্দ থাকে লাল চৌকো মার্কা ডেট। তবে দিনটা লাল-সবুজ-সাদা যাই হোক না কেন, বিপাশার কাছে সকালের আলস্য থেকে কেজো দিনে ঢুকে পড়ার ওয়ার্ম আপ টুল ওই ক্যালেন্ডার। আজকাল মোবাইল ফোনেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভরে রাখা যায়। যান্ত্রিক মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট সময়ে মনে করে দেয় সেই দিনের গুরুত্ব। তবে এই বিষয়ে বিপাশা সাবেক পদ্ধতিতেই ভরসা রাখে। যন্ত্র বিগড়ে যেতে পারে, কাগজ-কালির আশ্বাসে সেই আশঙ্কা নেই!

আজকের দিনটা সবুজ চৌখুপির ঘেরাটোপে। অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই, কাজের মেয়েটাও ছুটি নিয়েছে। কিন্তু ঘড়ির দিকে চোখ

পাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আফসোসের শব্দ বেরিয়ে এল বিপাশার মুখ থেকে। বেলা একটায় তার নন্দনে পৌঁছানোর কথা। গত পরশু রিলিজ করেছে ব্যোমকেশের নতুন ছবি। টিকিট কাটা আছে, চিত্রা এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। মাত্র দেড় ঘণ্টায় স্নান-খাওয়ার পাট চুকিয়ে, মেকআপ করে লেক টাউন থেকে রবীন্দ্রসদনে যাওয়া চাপের ব্যাপার!

বিপাশা ঠিক করল, ব্রেকফাস্ট নিয়ে মাথা ঘামাবে না। নন্দনে পৌঁছে হাতে সময় থাকলে একটা এগরোল খেয়ে নেবে। এখন যত তাড়াহাড়ি সম্ভব স্নান সেরে যেতে হবে বেলগাছিয়ায়। সময়মতো মেট্রোটা পেয়ে গেলে শো শুরুর আগে নন্দনে পৌঁছানো সম্ভব।

তড়িঘড়ি ডিভান থেকে নেমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে গেল বিপাশা। নাইটির বদলে তার পরনে অফিসের পোশাক! গতকাল এই জিন্স আর টপ পরেই অফিসে গিয়েছিল সে। এমন তো হওয়ার কথা নয়! অফিস থেকে ফিরে প্রথমেই স্নানঘরে যাওয়া তার বরাবরের অভ্যাস। শীতকালে গিজারের জল গরম করে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। গ্রীষ্মে মাথা বাঁচিয়ে অনেক ক্ষণ শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে থাকার পরে মেলে স্বস্তি। কিন্তু সেসব না করে বাইরের পোশাকে সটান বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার আগে ঘটেনি! ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পাতলা পুলওভারটা খুলতে-খুলতেই গতকাল রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল তার!

মনে পড়ল, পানশালায় সাক্ষাৎ হওয়া ছেলেটার গাড়িতে উঠেই বেইশ হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তারপর? তারপরের ঘটনা কিছুই মনে নেই। পানশালায় বসে সে ছেলেটাকে শুধু বলেছিল তার বাড়ি লেক টাউনে। নেহাত ছোট জায়গা নয় লেক টাউন। অত বড় জায়গার কোথায় বিপাশা থাকে, সেটা ছেলেটা জানল কেমন করে! তাছাড়া শুধু বাড়ি নয়, একতলার গেট থেকে তিনতলার বেডরুম পর্যন্তই বা সে পৌঁছল কেমন করে! পুলওভারটা ডিভানের উপরে ঝুঁড়ে ফেলে দ্রুত ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল বিপাশা। কান্ডাক্ত জিনিসটা কোথাও দেখতে না পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বেডরুম থেকে।

ড্রিংরুমে ঢুকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। হাতব্যাগটা রয়েছে টি-টেবিলের উপরে। পাশেই পড়ে রয়েছে তার ভিজিটিং কার্ড। অর্থাৎ বিপাশা বেইশ হয়ে যাওয়ার পরে ছেলেটা তার হাতব্যাগ হাতড়ে ভিজিটিং কার্ড বের করেছে। ওটা হাতে পেলে নির্দিষ্ট বিল্ডিং খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

ভিজিটিং কার্ড ছাড়াও হাতব্যাগে থাকে ডেবিট কার্ড, ঘরের চাবি, টুকটাক মেয়েলি জিনিস। ব্যাগ খুলে খোপগুলোয় চোখ বুলিয়ে আশ্চর্য হল বিপাশা। সবকিছু জায়গামতোই আছে। গল্পটা এবার পরিষ্কার হচ্ছে। সে বেইশ হয়ে যাওয়ার পরে ছেলেটা ভিজিটিং কার্ড থেকে ঠিকানা পেয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তারপর পৌঁছে দিয়েছে অ্যাপার্টমেন্টে। চাবি ব্যাগেই থাকে। সুতরাং দরজা খুলে বিপাশার বেডরুমে ঢুকতেও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ছেলেটা কি তিনতলায় একাই এসেছিল, নাকি তার সান্নাধ্যাপকরাও সঙ্গে ছিল? বিপাশার স্পষ্ট মনে আছে গাড়িতে ড্রাইভার এবং সেই ছেলেটা ছাড়াও আরও দু'জন ছিল। ছিপছিপে হলেও বিপাশার ওজন নেহাত কম নয়। দিন দশ-বারো আগে মেট্রো স্টেশনে ওজন পেপেছে সে। বাহাম কেজি ঝুঁই-ঝুঁই। লিফট বিহীন বিল্ডিংয়ে একজনের পক্ষে তিনতলায় তাকে পাঁজকোলা করে তোলা যত না রোম্যান্টিক, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিশ্রমের!

তবে ওই ব্যাপারটা এই মুহূর্তে ভাবাচ্ছে না বিপাশাকে। এক বা একাধিক অচেনা পুরুষ তাকে বেইশ অবস্থায় ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দা ব্যাপারটা কেমন ভাবে নেবে, সেটাই চিন্তার। একে তো একা থাকে বলে তাকে নিয়ে ফিসফাস, গুঞ্জনোর অন্ত নেই। তার উপরে এমন ঘটনা!

মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্ন কিলবিল করলেও আপাতত সেগুলো নিয়ে খুব বেশি ভাবার সুযোগ নেই বিপাশার। ঘড়ির কাঁটা যেন অলিম্পিকের একশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার ফাইনালে নেমেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেলগাছিয়া থেকে মেট্রো ধরতে না পারলে চিত্রার গালাগালি নাচছে কপালে! পুলিশের গুলি এবং গালি দুটোই সমান ভয়ানক! চুলে চিরনি বুলোতে-বুলোতে দ্রুত পায়ে বাথরুমে গিয়ে গিজার অন করল বিপাশা।

দোতলার সিঁড়ির মুখে পৌঁছে আর একবার অবাক হওয়ার পালা। সাত বছর হল এখানে রয়েছে সে, অভিজ্ঞতা বলছে দণ্ডগিম্বই আবাসনের

সবচেয়ে ছিদ্রাশ্রমী মহিলা। নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। বিপাশাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে মেশিনগানের মতো ছুড়ে দিলেন একঝাঁক প্রশ্ন এবং গোটা কতক মন্তব্য। “শরীর কেমন এখন? হঠাৎ সুগার ফল করল কেন? বাস থেকে পড়ে যাওয়ার সময় শরীরে কোনও চোট লাগেনি তো? এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে? একা যেতে পারবে নাকি সঙ্গিতাকে বলব তোমার সঙ্গে যেতে? ও আজ বাড়িতেই আছে। সকালে একবার ভেবেছিলাম তোমার কাছে যাই, কিন্তু ঘুমোচ্ছ ভেবে আর গেলাম না। পুলিশ বলল তোমাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, ঘুম ভাঙার আগে যেন ডিস্টার্ব না করা হয়।”

গল্পটা তাহলে এরকম! গতকাল রাতে বিপাশার সুগার ফল করেছিল! গাড়ি ধরার সময় জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল সে। তারপর যেমন হয় আর কী! কিছু সহস্রয় মানুষ তাকে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে, সেখান থেকে খবর যায় থানায়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরে পুলিশ তাকে পৌঁছে দিয়েছে আবাসনে। লাঠি না ভেঙে সাপ মারার চেনা গল্প! কিন্তু পানশালায় সেই ছেলেটা কি সত্যিই পুলিশ ছিল? মনে হয়, না। চিত্রাকে অনেকদিন দেখছে বিপাশা। ওকে দেখে পুলিশদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, কথা বলার ধরন মুখস্থ হয়ে গিয়েছে তার। কাল রাতের ছেলেটাকে দেখে একবারও পুলিশ মনে হয়নি। তবে পুলিশ হোক বা না হোক, ছেলেটা গল্প ফেঁদেছে দারুণ! আবাসনের সকলের কাছে বিপাশার টিপ্পনি শোনার আশঙ্কা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে!

কোথাকার কোন অপরিচিত ছেলে তার জন্য এত হ্যাপা পোহাতে গেল কেন? সম্ভবত ছেলেটার সঙ্গে বিপাশার আর কোনও দিন দেখা হবে না। আজকের দিনে একজন অপরিচিত মানুষের জন্য এতখানি ভাবে কেউ!

ইতিমধ্যেই বারদু'য়েক হোয়াটসঅ্যাপ করেছে চিত্রা। ঘড়ির আচরণও শত্রুসুলভ। কণ্ঠস্বরে কয়েক ছটাক বিষণ্ণতা মিশিয়ে বিপাশা বলল, “বুঝতে পারছি না কাকিমা, হঠাৎ করে কী হয়ে গেল। যাই ডাক্তারের কাছে, গিয়ে দেখি কী বলে। একটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সেই গড়িয়াহাটে ক্লিনিক। সময় কম, এগোই কেমন? সঙ্গিতাকে বিরক্ত করার দরকার নেই। ওকেও তো সপ্তাহে ছ'দিন দশটা-পাঁচটা করতে হয়। আমি একাই যেতে পারব। ফিরে এসে আপনাকে জানাব ডাক্তার কী বলল।”

আর একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল দণ্ডকাকিমার। কিন্তু বিপাশার হাতে নষ্ট করার মতো এক সেকেন্ড সময় নেই। ঝটপট কথাগুলো বলেই সে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। পিছন থেকে সাবধানবাণী ভেসে এল, “সাবধানে যেয়ো, শুধু কাজ আর গিটার নিয়ে পড়ে থাকলে হয়, নিজের শরীরের দিকেও...”

আবাসনের গেট থেকে বেরিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল বিপাশা। অনেক সময় রাস্তার ধারে খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। আজ কপাল মন্দ, একটাও চোখে পড়ল না। ছুটির দিনে রাস্তায় গাড়িঘোড়া কম। এখন ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে সময় নষ্ট হবে। শো শুরুর আগে নন্দনে পৌঁছানো যাবে না। ঘুমটা অত দেরিতে ভেঙেই সমস্যা হল।

আশা করা যায় এত বেলায় অটোর লাইন লম্বা হবে না। তবে আজ ছুটির দিন, তার উপর দু'দিন মেঘ-বৃষ্টির পরে রোদ উঠেছে চমৎকার। ডিসেম্বরের এমন ছুটির দিনে বাড়িতে মানুষের মন থাকে না, ইচ্ছে করে প্রিয়জনের হাত ধরে বেরিয়ে পড়তে।

গত রাতের হ্যাংওভার পুরোপুরি কাটেনি বিপাশার। সকাল থেকে দুটো বিস্কুট ছাড়া পেটেও কিছু পড়েনি। বেরিয়ে একটা বাস পেল সে। কয়েক পা দৌড়ে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল।



অফিসের সামনের চাতালে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলেন

তারক গুহ। অফিসে তিনি কারও তারকবাবু, কারও বা তারকদা। কিন্তু অফিসের বাইরে সকলে তাকে চেনে তারকটাবাবু বলে।

যেদিন কাজের চাপ থাকে না, চা খেয়ে কাগজ পড়ার পরে ভীষণ ঘুম পায় তাঁর। তখন চেয়ারটা ঘরের বাইরে এনে রোদে পিঠ পেতে বসেন তিনি। অবশ্য সেটা শীতকালীন ব্যবস্থা। চাঁদিকাটা গরমে নিতান্ত বাধ্য না হলে অফিসের বাইরে পা রাখার কথা কল্পনাও করতে পারেন না তারক গুহ। তখন ঘরের টেবিলটাই শান্তির আশ্রয়। এই অফিসে শুধু হেড ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ঘরে এসি আছে। বাকি ঘরগুলোয় কর্মীদের মাথার উপরে মাক্কাতা আমলের ঢিকিস-ঢিকিস ফ্যান। তবে তার জন্য তারকবাবুর কোনও আক্ষেপ নেই। পুরনো আমলের এই বাড়ির নীচের তলা যথেষ্ট ঠাণ্ডা। বাইরের বিয়াল্লিশ ডিগ্রির আঁচ নেতাজিনগর ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের এই ঘরগুলোয় পৌঁছয় না।

ঋতু শীত হোক বা গ্রীষ্ম, বসার জায়গা উঠোন বা চেয়ার টেবিল, কাগজটা কখনও কাছছাড়া করেন না তারক গুহ। অনেক বছরের অনুশীলনে একটা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন তিনি। টেবিলে বসে কনুইয়ে ভর রেখে তিনি যখন কাগজের উপরে ঝুঁকে থাকেন, দেখে বোঝার উপায় থাকে না চোখদুটো তাঁর খোলা না বন্ধ! উঠোনেও একই ব্যাপার। জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় কাগজখানা তাঁর হাতে ধরা থাকে যথাযথ ভাবে। বাইরে থেকে যারা দেখা করতে আসে, দূর থেকে দেখে তারা ভাবে তারকটাবাবু কাগজ পড়ছে। এই পোড়া দেশে ডিউটির সময় সরকারি কর্মচারীদের ঘুমিয়ে পড়া জনগণের চোখে গুনাই হতে পারে, কিন্তু কাগজ পড়া নয়! তবে তারক গুহর ঘুম অত্যন্ত পাতলা। কাছাকাছি পদচারণার সামান্য শব্দেই জেগে ওঠেন তিনি। আজও পায়ের খসখস এবং অন্তিম জনান দেওয়া ‘খুক-খুক’ কাশির শব্দে জেগে উঠে, কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি প্রশ্ন করলেন, “কী চাই?”

“আজ্ঞে স্যর প্রলয় দাস। উত্তরপাড়া।”

সামঞ্জস্যহীন উত্তর থেকেই যা বোঝার বুঝে নিলেন তারক গুহ। গতকালই উত্তরপাড়া, স্বরূপনগর, সপ্তপল্লি মিলিয়ে মোট এগারোটা কানেকশন কেটেছেন তিনি। এই শর্মা সেই ডিফন্টারদের একজন। ‘উত্তরপাড়া’ শুনে গলার স্বর আর একটু ভারি করবেন বলে মনস্থ করলেন তারক গুহ। যতদূর মনে পড়ছে, ওই এগারো জনের মধ্যে কেউকেটা গোছের কেউ ছিল না। মাসে পাঁচশো থেকে হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করা পাবলিক সব। ওদের না আছে টাঁকের জোর, না খুঁটির। দরকার পড়লে খানিক ধমকধামকও দেওয়া চলে লোকগুলোকে।

কণ্ঠস্বরে আধিকারিকসুলভ গাভীর্ষ সংযোজন করে তারক গুহ প্রশ্ন করলেন, “তা আমার সঙ্গে কী দরকার?”

“আজ্ঞে স্যর কাল আপনারা যখন গেছিলেন আমি বাড়ি ছিলাম না। আমার কানেকশন...” এই পর্যন্ত বলে চূপ করে থাকল লোকটা। কিছুকিছু মানুষের এই একটা বদ অভ্যাস, অর্ধেক কথা বলে আধখানা পেটের ভিতরে রেখে দেয়। যেন বাকিটা সবাই তার মুখ দেখে জেনে ফেলবে। বেশ কড়া একটা ধমক দেওয়ার জন্য কাগজ থেকে মুখ তুলেও নিজেকে সামলে নিলেন তারক গুহ। গলা শুনে প্রলয় দাসকে মাঝবয়সি মনে হলেও লোকটার বয়স যাটের উপরে। মুখভর্তি দাড়ি। আধময়লা ধূতির উপরে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি। তুষের চাদরটা মোটামুটি নতুন হলেও তাতে অযত্নের ছাপ। মাথা ঢাকা হনুমান টুপি চিবুকের নীচে নামানো।

লোকটাকে দেখে রাগের দদলে মায়া হল তারক গুহর। ফ্যাসাদে পড়লে তবেই মানুষ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সবাই গোবেচার। টাইপের নয় অবশ্য। দু’চারটে তৈলসিক্ত বাক্য খরচ করার পরেই কারও গলার আঁচ চড়তে থাকে। কেউ ততটুকু সবুর করতেও রাজি নয়। শুরু থেকেই তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, কণ্ঠ ক্ষিপ্ত সারমেয়সম। ঘটনা ঘটান সময় পুলিশের সামনে এদের টিকির দেখা পাওয়া যায় না, যত চোপা এখানে এসে!

তবে সব ধরনের পাবলিককেই হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা তারক গুহর আছে। যে যেমন মেজাজেই এখানে আসুক না কেন, ফেরার

সময় তাদের সবার একটাই রূপ। অবনত মস্তক, স্তিমিত কণ্ঠস্বর, ছলছল আঁখি! নিজস্ব ‘নরম-গরম-শরম’ সূত্রের সাহায্যে কাজ হাসিল করতে সিদ্ধহস্ত তারক গুহ। সূত্রের তিনটি দাওয়াইয়ের মধ্যে যার যেটা প্রাপ্য, নিজস্ব মেপে তাকে সেটা মিটিয়ে দেন তিনি!

লোকটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে তারক গুহ বুঝে ফেললেন এক্ষেত্রে নরম এবং শরমেই কাজ মিটবে, অনর্থক গরম হওয়ার দরকার নেই। গলাটাকে আবার ব্যাক গিয়ায়ে ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, “ও আচ্ছা। তা বলুন দাসবাবু আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?”

অভয় পেয়ে লোকটা আরও দু’পা এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে স্যর আমার লাইনটা কালকে কাটা গেছে। ঘরে অসুস্থ বউ, আমি একা বুড়ো মানুষ। জোয়ান ছেলে বেশ কিছুদিন হল বেপান্তা...”

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল প্রলয় দাস। কিন্তু তার আগেই একদলা কান্না এসে চেপে ধরল তার গলা। কেসটা এবার পুরোপুরি মনে পড়ল তারক গুহর। গতকাল তিনি উত্তরপাড়ায় প্রলয় দাস নামে এক উপভোক্তার বিদ্যুৎ সংযোগ কেটেছেন। নোটিস পাওয়ার পরেও বিদ্যুৎ অফিসের পাওনা পরিশোধ করেনি লোকটা।

তারক গুহ তড়িঘড়ি চেয়ার ছেড়ে তার সামনে এসে বললেন, “আহা কান্নাকাটি করবেন না। এখানে কান্নাকাটি করে কোনও লাভ নেই, সরকারের নিয়মকানুন তো জানেন। ভিতরে চলুন। কেন এমন হল আমাকে বলুন। রেকর্ড চেক করে দেখি আপনার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।”

অফিসঘরের দিকে এগোতে-এগোতে তারক গুহ ঠিক করে ফেললেন, শুধু নরমেই কাজ সারতে হবে। লোকটা এমনিই শরমে মরে আছে, একে নতুন করে লজ্জায় ফেলার দরকার নেই। এমন মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে খুব বেশি মেহনত করতে হয় না, দু’চারটে মিষ্টি কথার সঙ্গে খানিক সেন্টিমেন্টাল সিরাপাই যথেষ্ট!

কাজ না থাকলে তারক গুহর খালি ঘুম পায়। কিন্তু কাজ করার সময় তাঁর অন্য রূপ। তখন তিনি দারুণ চনমনে। অফিসের কেরানি থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার সকলেই তাঁর এই গুণ সম্পর্কে অবগত। তাই তাঁর থেকে থেকে বিমিয়ে পড়ার অভ্যাস নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ।

নিজের চেয়ারে বসে বায়োমেট্রিক ডিভাইসে আঙুল ঝুঁইয়ে কম্পিউটার আনলক করলেন তারক গুহ। তারপর প্রলয় দাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, “দিন, লাস্ট যে নোটিসটা আপনি পেয়েছেন সেটা দিন।” চাদরের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে প্রলয় দাস বের করে আনল যত্নে রাখা কাগজটা।

কম্পিউটারের পরদায় চোখ রেখে তারক গুহ বললেন, “পেমেন্ট তো আপনি দেখছি ঠিকঠাকই করে এসেছেন বরাবর, হঠাৎ এমন হল কেন?”

দু’বার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে প্রলয় দাস বলল, “আজ্ঞে স্যর আমি হাটে হাটে কাপড় বেচতাম। চাষবাসও ছিল। তাতে পরিবারের সবার ডালভাতের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু ওই কাজে খাটনি বেশি। করোনার পর থেকে ব্যবসায় মার খাচ্ছিল। ছেলে গত বছর চাকরি পেয়ে বলল খাটনির কাজ আমাকে আর করতে দেবে না। ছেলের রাজগারপাতি মন্দ হচ্ছিল না। পুজোর আগে টিনের চাল ফেলে ঘরটায় ছাদ দিল। ছেলের বিয়ের কথাবার্তাও একরকম পাকা হয়ে গেছিল। কিন্তু তারপর কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল! ছেলের কোম্পানিতে গোলমাল শুরু হল। মালিক পালাল, কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে ছেলেও বেপান্তা।”

পেজ ডাউন বোতামে আঙুলের টোকা দিতে দিতে তারক গুহ প্রশ্ন করলেন, “ওহ আচ্ছা, তা কোন কোম্পানিতে কাজ করত আপনার ছেলে?”

উত্তর না পেয়ে কম্পিউটারের পরদা থেকে মাথা তুললেন তারক গুহ। বুকের উপরে মাথা ঝুঁকে পড়েছে প্রলয় দাসের। চোখমুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখুনি আবার কেঁদে ফেলবে! তারক গুহ

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, “কী হল আপনার দাসবাবু, শরীর খারাপ লাগছে? জল খাবেন?”

হাঁ করে কয়েকবার শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলে নিল প্রলয় দাস। তারপর কোনওমতে মুখ তুলে নেতিয়ে পড়া গলায় বলল, “আজ্ঞে ছেলে কাজ করত রেনবোতে। রেনবো ফিনান্স কোম্পানি...”

আঙুল খেমে গেল তারক গুহর। কিছুদিন আগেও বাংলার বহুল চর্চিত নাম ছিল ‘রেনবো ফিনানশিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড’। সংক্ষেপে রেনবো। আজ বাসে-ট্রেনে, চায়ের দোকানের জমায়েতে একটুকরো দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয় শব্দটা। বৃষ্টিভেজা আকাশে রামধনু উঠলে তার রূপে মোহিত হয়ে পড়ে মানুষ। তেমনিই কয়েক মাস আগে ‘রেনবো ফিনানশিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড’ের বর্ণিল ছটায় মজে ছিল বাংলার আম আদমি। আকাশের রামধনু স্থায়ী হয় না, রূপের ছটায় অল্প কিছু ক্ষণ মানুষকে সম্মোহিত করে ফিকে হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায়। বাংলার রামধনুও স্থায়ী হয়নি। অজস্র মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে, অশুভ্তি পরিবারকে পথে বসিয়ে উবে গিয়েছে কর্পুরের মতো। বাংলায় এমন মহল্লা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে কেউ না কেউ সাড়া দেয়নি রামধনুর রঙিন হাতছানিতে। বিব্রত করার মতো তথ্য হচ্ছে তারক গুহ নিজেও বড় শ্যালকের ছেলের কথায় ভুলে খানিক লোভ করে ফেলেছেন। তিনি একা নন, এই অফিসের অনেকেই ঝাড়ের বাঁশ ঘরে নিয়েছে। তবে তারক গুহর সান্ত্বনা একটাই, মাত্র পঞ্চাশ হাজারের উপর দিয়ে ফাঁড়া কেটেছে তাঁর। চণ্ডীতলার সুব্রত পেতুক সূত্রে প্রাপ্ত পাঁচ বিঘে তিনফসলি জমি বিক্রি করে সেই টাকা ঢেলেছে রেনবোর গহ্বরে। নবীন ঘোষ তো নিজের বসতবাড়িটাই বন্ধক দিয়ে বসল। বউয়ের গয়না বিক্রি করে আর এফ এস এলের সার্টিফিকেট কিনে মুরগি হওয়া মানুষের সংখ্যা এই অফিসে কম নয়। যথারীতি চোর পালানোর পরে বুদ্ধি বেড়েছে সবার। কিন্তু এজেন্টদের চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন দিয়ে মাত্র তিন বছরে ক্রেতাদের দ্বিগুণ টাকা ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তা বিশ্বের কোনও সংস্থার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়, সেই সহজ কথাটা আগে কারও মাথায় আসেনি!

উত্তর দিয়েই মুখ নামিয়ে নিয়েছে প্রলয় দাস। লোকটার মিইয়ে থাকার কারণ আছে। এই মুহূর্তে রেনবোর এম ডি-কে হাতে পাওয়ার উপায় নেই। যাদের মারফত রেনবো টাকা তুলেছে, তাদের উপরেই তাই রাগ বর্তেছে ঠেকে যাওয়া মানুষের। এজেন্টদের বাড়ি ভাঙচুর, আত্মহত্যা, নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পুরনো হয়ে গিয়েছে। রেনবো এজেন্টদের পরিবারের লোকেরাও এখন সাধারণ মানুষের চক্ষুশূল! মনের মধ্যে একরাশ বিরক্তি জমা হলেও মুখে বা ব্যবহারে তা প্রকাশ করলেন না তারক গুহ। চাকরি না পেলে, ব্যবসার মূলধন জোগাড় করতে না পারলে শিক্ষিত ছেলেমেয়ের মনের অবস্থা কেমন হয় তা তাঁর জানা আছে বিলক্ষণ। তিনি নিজেও শেষবয়সে পৌঁছে চাকরি পেয়েছিলেন। প্রলয় দাসের ছেলে পরিস্থিতির শিকার। তবে সস্তায় বাজিমাত করতে গিয়ে গাড্ডায় পড়লেও ছেলের মনে বাবা মায়ের জন্য ভালবাসা আছে। নিজের আয়ের পথ খুলতেই বাবাকে হাড়ভাঙা খাটুনির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, আর দশটা ছেলের মতো বিয়ে করে বউ নিয়ে কেটে পড়েনি!

প্রলয় দাসকে নতুন পেমেন্ট শিডিউল ধরিয়ে তারক গুহ বললেন, “আপনার ডিউ তিন কিস্তিতে মেটানোর ব্যবস্থা করে দিলাম। সময়মতো টাকাটা দিয়ে দেবেন। এবার দিতে না পারলে লাইন পার্মানেন্টলি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, তখন হেড অফিসে ছুটোছুটি করতে-করতে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাবে।”

বিলের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ আমসি হয়ে গেল প্রলয় দাসের। শুকনো গলায় বলল, “আজকের মধ্যে দুশো বিয়াল্লিশ টাকা তো জোগাড় করতে পারব না স্যর, দয়া করে আমাকে অন্তত সাতটা দিন সময় দিন।”

তারক গুহর বলতে ইচ্ছে করল, ‘তাহলে ইলেকট্রিক লাইনও সাত দিন পরেই জোড়া লাগবে। কিন্তু প্রলয় দাসের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে সেই কথা বলতে পারলেন না তিনি। কেন কে জানে,

লোকটার জন্য মায়া হচ্ছে তার। যে বয়সে নাতি নাতনি নিয়ে নিরুপদ্রব জীবন কাটানোর কথা, সেই বয়সে ছেলের কৃতকর্মের দায় ভুগতে হচ্ছে ওকে। পাওনাদারের দল নিশ্চয়ই ছেলেকে না পেয়ে বাপের উপর চোটপাট করছে। রোজগারহীন, সহায়হীন বুড়ো মানুষ বাড়িতে অসুস্থ বউকে নিয়ে কেমন ভাবে দিনের পর দিন সবকিছু সামাল দিচ্ছে কে জানে!

“আপনার বউয়ের কী হয়েছে দাসবাবু, চিকিৎসা কোথায় করাচ্ছেন? কাগজপত্র কিছু সঙ্গে আছে?” সামনে পড়ে থাকা ফাইলটা অকারণেই টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলেন তারক গুহ।

“আজ্ঞে গ্যাস্ট্রিক আলসার। কলকাতার পিজি-তে দেখাচ্ছি। গত মাসে নিয়ে গেছিলাম, আবার দু’মাস পরে যেতে হবে।” চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে আর একটা কাগজ বের করে আনল প্রলয় দাস। তারক গুহ দেখে বুঝলেন, সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট সেটা। লেখা দেখে রোগ বোঝার ক্ষমতা তাঁর নেই, তবে এতে সম্ভবত কাজ হয়ে যাবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে একটা দরখাস্ত লিখবে প্রলয় দাস। তার সঙ্গে এই টিকিটের একটা কপি অ্যাটাচ করে দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভাল মানুষ, গরিবদের জন্যে মনে মায়াদয়া আছে। দেনা পরিশোধ করার জন্য নিশ্চয়ই প্রলয় দাসকে আরও কিছু দিন সময় বরাদ্দ করবেন।

“দরখাস্ত লিখতে পারেন দাসবাবু?”

তারক গুহর প্রশ্নে শুকনো হেসে প্রলয় দাস জানতে চাইল, “আজ্ঞে স্যর বাংলায় না ইংরিজিতে?”

“বাংলায়।”

“বলে দিলে পারব। এমনিতে কোথায় কী লিখতে হয় তা তো জানি না।”

গলার ভিতরে ‘হুম’ শব্দ করলেন তারক গুহ। প্রায়ই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। ‘নরম-গরম-শরম’ সূত্রের বাইরেও কিছু মানুষ থাকে যাদের প্রতি নির্মম হতে মন সায় দেয় না। প্রলয় দাস সেই শ্রেণির মানুষ। নামটা মারকাটারি হলেও লোকটাকে দেখে রাগ বা বিরক্তির বদলে মায়া হয়!

“বেশ। এই টিকিট আর নোটিসটা জেরক্স করে আনুন। অফিসের গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিক বরাবর এগিয়ে গেলে জেরক্সের দোকান। দুটো সেট করাবেন। একটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে পাঠাতে হবে, অন্যটা আমি জমা রাখব। দেখি আপনার জন্যে কতটা কী করতে পারি।”

কৃতজ্ঞতা উপুড় করা একটুকরো হাসি হেসে বেরিয়ে গেল প্রলয় দাস। ওয়ার্ড ফাইল খুলে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করতে শুরু করলেন তারক গুহ।



দরজায় মৃদু ঠকঠক।

এমন নরম আওয়াজে সচরাচর কারও ঘুম ভাঙে না কিন্তু শৈলেন চোখ মেলল। অ্যাসবেস্টসের ছাদের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো টুইয়ে পড়ছে ঘরে। ইতিউতি কাঠের দেয়ালের জোড়াতাল্পিতে আলোর আঁকিবুকি। দূরে একটা মোরগ ডেকে চলেছে একনাগাড়ে।

গা থেকে কন্ডল সরিয়ে উঠে বসল শৈলেন। শীতটা আক্ষরিক অর্থেই হাড় কাঁপানো। বিছানাপাত্র সারা দিন রোদ্দুরের ফেলে রাখলে ভাল ওম হয়, রাতে শুতে আরাম লাগে। কিন্তু দু’দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি। লেপ বালিশ তোষক দু’রের কথা, সোয়েটার মাফলারও এক ফোঁটা রোদ পায়নি গত দু’দিনে। সব যেন বরফ হয়ে রয়েছে।

দুর্যোগটা শুধু বৃষ্টির উপর দিয়ে গেলে খানিক যুঝতে পারা যেত, কিন্তু এবারে বৃষ্টির দোসর ছিল কনকনে বাতাস। চোত-বোশেখের রোদ, আষাঢ়ে বৃষ্টির দাপট রুখে দিতে পারলেও প্রবল ঝঞ্ঝার সামনে এই মাঠকোঠার পুরনো কাঠের দেয়াল নিতান্তই অসহায়। অজস্র ফাটল গলে শয়নকক্ষে ঠান্ডা বাতাসের অনায়াস আগমন। গরমে শরীর জুড়োলেও শীতকালে পবনদেবের এমন মাইডিয়ারি আচরণ ঘরের বাসিন্দার পক্ষে মাথাব্যথার কারণ।

কম্বলটা গা থেকে সরতেই তীব্র ঠান্ডা জাপটে ধরল শৈলেনকে। কেঁপে উঠল ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের আঙুল। বিছানায় বসে দ্রুত সোয়েটার মাফলার পরে নিল সে। তত্ত্বপোশ থেকে নেমে বারমুড়ার উপরে চাপিয়ে নিল মোটা ট্রাকশুট। বালিশের নীচে ভাঁজ করে রাখা ছিল পোশাকগুলো, তাতে সামান্য হলেও ওম হয়েছিল। রোদ না ওঠা পর্যন্ত কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই চালাতে এগুলোই ভরসা।

দরজায় আবার ঠকঠক, এবার রীতিমতো ধৈর্যচ্যুতির আভাস! শৈলেন গলা তুলে বলল, “আসছি রে মা আসছি, একটু সবুর কর! ঠান্ডায় পুরো জমে গেছি, হাতে-পায়ে সাড় নেই, পোশাকগুলো গায়ে গলাতে সময় লাগছে।”

চটি পরে দরজার কাছে গিয়ে ছড়কো সরাল শৈলেন। পাল্লা খুলতেই ঘরে ঢুকে পড়ল অনেকটা আলো। সঙ্গে ভিজে মাটির গন্ধ মাথা একঝলক তাজা বাতাস। আজ আকাশ একদম পরিষ্কার। পূর্ব আকাশে ইতিমধ্যেই উদয় হয়েছেন দিনমণি। মাঠের শেষ প্রান্তের লম্বা লম্বা গাছের আগায় তার সোনারলি পরশ।

পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে থেকে ঝটপটিয়ে সরে গেল একঝাঁক বুলবুলি। সংখ্যায় প্রায় দশ-বারোটা। শৈলেন হেসে বলল, “আজ আমিই ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছি রে মা। একটু অপেক্ষা কর, এখনই আসছি।”

পাখির ঝাঁকে সবক’টাই মেয়ে কিনা জানা নেই শৈলেনের। তবে প্রথম থেকেই সে “মা” বলে ডেকে আসছে তাদের। পাখিগুলো দু’চার হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে দেখতে থাকল শৈলেনকে। একটা উড়ে গিয়ে আকন্দ গাছের শাখায় বসে ক্যাঁচরম্যাচার জুড়ল। ঝাঁকে পাখিটা নতুন। শৈলেন তার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুই আবার অভিমান করে ওখানে ফিরে বসলি কেন, আয় নেমে আয় বলছি!”

ঘরের ভিতরে কাঠের দেয়াল ঘেষে দড়িতে বাঁধা তক্তা ঝুলছে। চওড়ায় ছ’ইঞ্চি, লম্বায় ফুট পাঁচেক। ওটাই ঘরের একমাত্র তাক। নানা মাপের প্লাস্টিকের কৌটো, ছোট হাত আয়না, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, কোন্ড ক্রিম, একটা বাতিল এল ই ডি ল্যাম্প, স্টিলের থালা গ্লাস বাটি এবং কিছু টুকটাক জিনিসে ঠাসা তাকটা। পিঁপড়ে আর পোকামাকড় ঠেকানোর জন্য তাক লাগোয়া দেয়ালে কীটনাশক চক দিয়ে গণ্ডি কাটা।

তাক থেকে একটা কৌটো আর থালা নিয়ে ঘরের বাইরে এল শৈলেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বুলবুলিগুলো ঘন হল। ঝাঁকে নতুন পাখিটা নেমে এসেছিল উঠানে কিন্তু শৈলেন ফিরতেই সে আবার গিয়ে বসেছে আকন্দের ডালে। মানুষকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না পাখিটা।

কৌটো উপড় করে থালায় নকুলদানা ঢেলে দিল শৈলেন। বুলবুলিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল থালার উপরে। শৈলেন একটু সরে দাঁড়াতেই আকন্দ শাখা থেকে নেমে এল সন্দিহান পাখিটা। ঘাড় ঘুরিয়ে কয়েক বার আশপাশ দেখে নেওয়ার পর আশ্বস্ত হয়ে যোগ দিল সকলের সঙ্গে।

কৌটোয় অল্প কয়েকটা নকুলদানা পড়ে আছে। আজ সন্ধ্যাবেলা বাজারে না গেলে কাল সকালে টান পড়বে পাখিদের বরাদ্দে। প্রতিবার ফুরোনোর আগেই বাজার থেকে নকুলদানা নিয়ে আসে শৈলেন। এবার বৃষ্টির জন্য দু’দিন বেরনো সম্ভব হয়নি। এখানে আসার পরদিন সকালে দরজায় ‘খটখট’ শব্দে ঘুম ভেঙেছিল শৈলেনের। চোখ মেলে দেখেছিল রাতের অন্ধকার কাটছে। ঘরের বাইরে পাখির কিচিরমিচির, দূরে ডিপ টিউবওয়েলের একঘেয়ে ডিকিচ ডিকিচ শব্দ।

এত সকালে এমন পাগুবর্জিত জায়গায় দরজা ঠকঠকায় কে! কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শব্দটা শুনল শৈলেন।

ঠকঠকানিতে ব্যস্ততার ভাব নেই। মনে হচ্ছে কেউ খেলাচ্ছিলে দরজা খটখট করছে অথবা কোনও শিশু বন্ধ দরজার পাল্লায় ইকির মিকির খেলছে! এটা খোকনদা নয়। খোকনদা এলে দরজার কড়া নাড়ত বা তার নাম ধরে ডাকত।

ভেড়িতে ছিটকে চোরের উপদ্রব সম্পর্কে গতকালই সাবধান করে দিয়েছে খোকনদা। কিন্তু তাদের কারবার তো রাতে। ভোরবেলা গৃহকর্তাকে সজাগ করে কাজ সারতে আশা চোরের কথা কখনও শোনেনি শৈলেন।

বিছানা থেকেই হাঁক পাড়ল শৈলেন, “কে, কে ওখানে, কী চাই?”

উত্তর নেই। সামান্য বিরতি দিয়ে আবার শুরু হল খটখটানি। এবার চোখ রগড়ে উঠে বসল শৈলেন। গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

পাল্লা খুলতেই এক ঝাঁক বুলবুলি দরজার সামনে থেকে উড়ে গিয়ে বসল উঠানের আকন্দ গাছটায়। আশপাশে গরু কুকুর অথবা ছাগলজাতীয় কোনও চতুষ্পদ নেই। চোখে পড়ছে না দু’পেয়ে কাউকেই। অর্থাৎ দরজায় নক করার দায়িত্ব বর্তায় বুলবুলিগুলোর উপরেই। কয়েকটা নিরীহ পাখির এ হেন আচরণের কারণ কী! তাহলে পাখিদের দরজায় টোকা মারার অর্থ একটাই, ঘরের ভিতরে যে আছে তার ঘুম ভাঙানো। শৈলেনের আগে এই ঘরে যিনি থাকতেন সেই ভদ্রলোক দু’দিন আগে চলে গেছেন ডায়মন্ড হারবারে। সেখানে মালিকের আরও দুটো ভেড়ি আছে। তারই একটায় কাজে বহাল হয়েছেন তিনি। আন্দাজ করা যায়, এখানে থাকার সময় প্রতিদিন সকালে পাখিদের খাবার দিতেন ভদ্রলোক। মাঠকোঠার মালিক পরিবর্তনের খবর না পেয়ে অভ্যাসবশত ব্রেকফাস্টের আশায় হাজির হয়েছে বুলবুলিরা!

ঘর থেকে একমুঠো মুড়ি এনে উঠানে ছড়িয়ে দিল শৈলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখিরা। কিন্তু পর মুহূর্তেই তাদের বডি ল্যাস্টোয়েজে পরিষ্কার হয়ে গেল, খাবার তাদের পছন্দ হয়নি। একটা মুড়িও দাঁতে, মানে ঠোঁটে না কেটে বেশির ভাগ বুলবুলি ফিরে গেল আকন্দের ডালে। বাকিরা অবশ্য তেমন নির্বিবাদী নয়, তারা চোখ কুঁচকে, ঝুঁটি বাগিয়ে ধমকাতে লাগল শৈলেনকে!

মুড়ির উপরে অবশ্য প্রথম থেকেই তেমন ভরসা ছিল না শৈলেনের। তার জানা ছিল বুলবুলির প্রধান খাদ্য ফল এবং ফুলের মধু। সময়ের-সময়ে মুখ পালটানোর জন্য ছোটখাট পোকামাকড় ধরে খায়। সাতসকালে মুড়ি আপ্যায়নে তাই সিপাই পাখির মটকা গরম হওয়াই স্বাভাবিক! কিন্তু নতুন জায়গায় শৈলেন ওদের পছন্দসই খাবার জোগাড় করবে কেমন করে! মাত্র গতকাল বিকেলেই ভেড়িতে এসেছে সে। জায়গাটা সম্পর্কে সড়গড় হতে কিছু দিন সময় লাগবে শৈলেনের সেদিনের প্রভাতী অভিজ্ঞতা শুনে প্রথমে একচোট হেসেছিল খোকনদা। তারপর লঘু গলায় বলেছিল, “ওসব মুড়ি বিস্কুটের কাজ নয় ভায়া। পাখিদের সন্তুষ্ট করতে চাইলে প্রতি মাসে তোমাকে পকেট থেকে কিছু খসাতে হবে!”

“সেকি তাই নাকি! কীরকম? একটু খুলে বলুন!” আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছিল শৈলেন।

“সুবীরদা, মানে তোমার আগে যিনি ওই ভেড়ির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি প্রতিদিন সকালে বুলবুলিগুলোকে নকুল দানা খাওয়াতেন, পাখিরাও গুঁর দারুণ নেওটা হয়ে গিয়েছিল।”

“নকুল দানা!”

খোকনদার কথায় ভারি অবাক হয়েছিল শৈলেন। পাখিদের খাদ্য তালিকায় নকুল দানা থাকতে পারে এমন তথ্য অভিনব তার কাছে!

খোকনদা বলেছিল, “হ্যাঁ নকুল দানা। তিনকুলে সুবীরদার কেউ নেই। পাখিদের সঙ্গে একটা অভূত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল মানুষটার। এখান থেকে চলে যেতে হবে শুনে প্রথমে খুব ভেঙে পড়েছিল। চাইত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে কাটাতে। মালিককে জানিয়েছিল নিজের আর্জি, কিন্তু মালিক রাজি হয়নি। সুবীরদার বয়স হয়েছে, এত বড় ভেড়ির কাজ তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। আমি যতটা সম্ভব ম্যানেজ করতাম। কিন্তু আমি একা আর কত করব? কয়েকমাস ধরেই মার খাচ্ছিল প্রোডাকশন। অন্য কেউ হলে সরাসরি

ছাঁটাই করে দিত, কিন্তু আমাদের মালিকের দয়ার শরীর। তাই ডায়মন্ড হারবারে ছোট ভেড়িতে পাঠিয়ে দিল। অ্যাটলিস্ট বুড়া বয়সে লোকটা কাজকর্ম হারিয়ে না খেয়ে মরবে না।”

সব শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল শৈলেন। অযাচিত ভাবে তার কোলে এসে পড়েছে একফালি অনাথ স্নেহের উত্তরাধিকার। সেটা লালন করতে হবে তাকে। হলই বা তাতে কিছু পয়সা খরচ! সারাদিন খোকনদার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে ভেড়ির কাজ বুঝে নেওয়ার পর সেদিন বিকেলেই শৈলেন শিয়াখালা বাজারে গিয়ে কিনে ফেলেছিল এক কেজি নকুল দানা।

গতকাল কৌটোর ঢাকনাটা বোধ হয় ঠিকঠাক বন্ধ করা হয়নি। তলার দিকের নকুল দানাগুলো রসে গিয়েছে। কাল পর্যন্ত এভাবে থাকলে ওগুলো পুরোপুরি গলে যাবে। কৌটোর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আধগলা নকুল দানা চেষ্টে বের করে খালায় রাখল শৈলেন। খালা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বুলবুলির ঝাঁকটা ঘরের চালে, আকন্দের ডালে বসে কিচিরমিচির শব্দে সাজিয়ে নিচ্ছিল সারাদিনের পরিকল্পনা। আরও একপ্রস্থ খাবার পেয়ে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল খালায়।



মাঝবয়সি, খাটো চেহারার যে লোকটা গার্ডেন চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন, গেস্টহাউসের সবাই তাকে চেনে মোহন দত্ত নামে। লোকটার বাড়ি পঞ্জাবের অমৃতসরে। মানে গেস্টহাউসে ঘর নেওয়ার আগে লোকটা যে পরিচয়পত্র জমা দিয়েছে তাতে ওই তথ্যই আছে। যদিও কথা শুনে বা চেহারা দেখে লোকটাকে পঞ্চনদের তীরের বাসিন্দা মনে হয় না। বিশেষ করে লোকটার মৎস্যপ্রীতি এবং মিষ্টির প্রতি দুর্বলতা ভ্রমণপ্রিয় এক জাতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু ওসব তুচ্ছতাই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে গেস্টহাউসের মালিকদের চলে না। অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এই পাহাড়ি শৈলশহরে ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে গোটা বারো রিসর্ট এবং গেস্টহাউস আছে। কাগজপত্র দেখে সন্দেহ না হলে কাউকে রাস্তা দেখানোর অধিকার প্রতিটা মালিকের আছে। কিন্তু করোনা-পর্ব পেরিয়ে বছর খানেক হল টুরিস্টরা পাহাড়ে আনাগোনা শুরু করেছে। হোটেল-লজ-রিসর্টের ব্যবসাও জমে উঠছে ধীরে ধীরে। গত দু’তিন বছরের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার এই তো সময়, এখন কাগজপত্র নিয়ে খুঁতখুতানি দেখাতে গেলে পার্মানেন্টলি গণেশ উলটে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা!

মোহন দত্তের কাগজপত্র দেখে সন্দেহ না হতে না পারলেও এই গেস্টহাউসের মালিক-কাম-ম্যানেজার পরেশ আগরওয়াল তাই ব্যাপারটা নিয়ে ওজর-আপত্তি করেনি। গত সপ্তাহে একটা বড় ধস নামায় ইদানীং এই শৈলশহরে টুরিস্টের সংখ্যা একটু কম। সারি-সারি রিসর্ট, গেস্টহাউস ফাঁকা পড়ে আছে। এক জায়গায় না হলে অন্য কোথাও ঠিকই আশ্রয় জুটে যাবে টুরিস্টদের। তাই পরিচয়পত্র হিসেবে যা পাওয়া গিয়েছে সেটা নিয়েই সতীক মোহন দত্তকে ঘর দিয়েছে পরেশ। পরে কোনও ঝামেলা হলে কাগজপত্রের কপি লোকাল পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। ওখানকার অফিসার-ইন-চার্জ কৈলাশ ত্রিপাঠী সহৃদয় লোক, সব কিছু সামলে নেবেন তিনি।

অজস্তা, মানে মোহন দত্ত যাকে বউ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর পরিচয়পত্রে চোখ বুলিয়েও বিস্তর প্রশ্ন জেগেছিল পরেশের মনে। সাধারণত মধ্য বৃদ্ধির পুঞ্জিবি মেয়েদের ফিগার হয় চাবুকের মতো। তাঁদের দেহের উপত্যকায়, সমতলে, আঁকে-বাঁকে অফুরন্ত লচক-মচক! কিন্তু অজস্তা দত্তের চেহারাটা একটু গুলুপুচু ধরনের। তাঁকে প্রথমবার দেখে পরেশের ওই... মাছ, মিষ্টি এবং টেগোরের গানের

কথা মনে পড়েছিল!

একটু যারা পুরনো, প্রথমেই ঘরের ভাড়া নিয়ে একপ্রস্থ দর কষাকষি চালায়। চেক ইন করার আগে দেখে নেয় গিজার, টিভি, রুম হিটার কেমন কাজ করছে কিংবা বিছানা-চাদর-বালিশে দাগ লেগে আছে কি না। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ অথবা ডিনারের বিল হাতে পেয়েই স্মার্টফোনের ক্যালকুলেটর খুলে জিএসটি-র হিসেব মেলাতে বসে। এইসব যুগলের ক্ষেত্রে শপিংয়ের দিকটা মূলত গিম্মি সামলায়। দু’জনে একসঙ্গে ঘুরতে বেরলেও বাছলগা গিম্মির পরিবর্তে গলায় ঝোলানো ডিএসএলআর ক্যামেরার দিকেই মন পড়ে থাকে কর্তার!

দম্পতি সেজে আসা যুগলের ক্ষেত্রে ঝামেলা সবচেয়ে কম। যে ক’দিন তারা পাহাড়ে থাকে, বেশিরভাগ সময় রুমের ভিতরেই কাটিয়ে দেয়। খাবারের দাম অথবা মান নিয়ে কখনই মাথা ঘামায় না। শপিংয়েও তেমন আগ্রহ থাকে না তাদের। এই ধরনের কাপল রিসর্ট বা গেস্টহাউসের মালিকদের কাছে সম্পদ এবং নিউলি ম্যারেড কাপলের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়। কোনওমতে একটা ঘর জোগাড় করে সেখানে সৈঁধিয়ে যাওয়ার জন্যই উদগ্রীব তারা। দত্ত দম্পতির ক্ষেত্রেও মওকা বুঝে দাঁও মেরেছিল পরেশ। সন্দেহ করার ভরপুর কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের আলাদা কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি এবং প্রায় দ্বিগুণ ভাড়ায় গছিয়ে দিয়েছিল গেস্টহাউসের সবচেয়ে দামি ঘরটা।

হিসেবে ভুল করেনি পরেশ। এখানে আসার পর মাত্র তিন সপ্তাহে দত্ত দম্পতি খরচের যা নজির রেখেছেন, তাতে পরেশের গত কয়েক মাসের লোকসান উসূল হওয়ার মুখে। শপিং, ফুডিং এবং সাইট সিয়িংয়ের জন্য যে পরিমাণ টাকা তাঁরা ওড়ান, তা দেখে চোখ ছানাবড়া হতে বাধ্য! প্রতিদিন লাঞ্ছের পরে ডাবের জল পান করা দত্ত দম্পতির অভ্যাস। তাও যেমন তেমন ডাব হলে চলবে না, ডাব হওয়া চাই কচি এবং গড়নে নিটোল। দুপুরে খাওয়ার পরে কচি ডাবের জল পান না করলে তাঁদের চোঁয়া ঢেকুর ওঠে!

মরুভূমির মাঝে বরফের চাণ্ড জোগাড় করার চেয়েও কঠিন কাজ পাহাড়ে প্রতিদিন কচি ডাবের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু দত্তজি সে কথা মানবেন কেন! তাঁর মতে পৃথিবীতে এমন কোনও জিনিস নেই যা পয়সা খরচ করলে মেলে না। দাম যাই লাগুক, দুপুরে খেয়ে উঠে একজোড়া কচি ডাব তাদের চাই-ই। অগত্যা বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে পাহাড়ের নীচ থেকে ডাব আনার ব্যবস্থা করেছে পরেশ। তাতে যাতায়াত খরচ বাবদ ডাবপ্রতি যে টাকা গুনতে হচ্ছে, শুনলে টাটা-আদানি-অস্থানিদেরও ভুরু কঁচকে উঠত! কিন্তু মজার কথা ডাবের অমন অস্বাভাবিক দাম শুনে দত্তজি আপত্তি তো করেনইনি বরং খুশি হয়েছেন পরেশের এলেম দেখে। না-চাইতেই পরেশের হাতে তুলে দিয়েছেন পরবর্তী পনেরো দিনের ডাবের দাম।

দুই দশকের ম্যানেজারি জীবনে এমন শাঁসালো বোর্ডার কখনও পায়নি পরেশ। সবচেয়ে বড় কথা দত্তজির সব লেনদেনই ক্যাশে। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড অথবা মোবাইল ওয়ালেটের ধার ধারেন না তিনি। বিলের টাকা মিটিয়ে রসিদ চাওয়ার ছাঁচডামোও নেই তাঁর! তাতে মস্ত সুবিধা হচ্ছে পরেশের। ট্যাক্স বাবদ যে টাকা সরকারের প্রাপ্য, তার পুরোটাই ঢুকে যাচ্ছে লাভের খাতে।

তিন সপ্তাহ বড় কম সময় নয়। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ আছে বেশিদিন কোনও বোর্ডার রুম অকুপাই করে রাখলে সেই তথ্য পুলিশকে জানাতে হবে। কিন্তু উনিশ বছরের কর্মজীবনে কখনই ওই ধরনের নির্দেশে কান দেয়নি পরেশ। একদা এক কমিউনিস্ট নেতা বলেছিলেন, বেড়াল সাদা না কালো তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, দেখার বিষয় হল সেই বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে কিনা! কলেজে পড়ার সময় কথাটা কানে গিয়েছিল পরেশের। পৈতৃক কারবার সামলানোর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বাণীটা জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছে সে। তাতে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটান পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের একটা অংশের সঙ্গেও দারুণ সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিয়মিত উপরি রোজগারের সুযোগ থাকলে চোখ বন্ধ করে থাকা মানুষের সংখ্যা এই দেশে কম নয়! কমিউনিজম ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে গুটিয়ে যেতে বসেছে অথচ একজন কমিউনিস্ট নেতার চিন্তাধারা কত ভাবেই না সমৃদ্ধ করে চলেছে মানুষকে!

গত তিন সপ্তাহে দত্তদের পছন্দ-অপছন্দের খুঁটিনাটি মুখস্ত হয়ে গিয়েছে গেস্টহাউসের ওয়েটারদের। তাই অজন্তা ম্যাডাম মোহন স্যরের পাশের চেয়ারে এসে বসার দু' মিনিটের মধ্যে নানক হাজির হল কফি নিয়ে। সঙ্গে রোস্টেড কাজু, বেকড চিকেন স্যান্ডউইচ এবং কাজু বরফি। সাইট সিয়িংয়ের দিনগুলোয় এমন হালকা ব্রেকফাস্টই পছন্দ দত্ত দম্পতির।

কফি এবং খাবারের প্লেট টেবিলে সাজিয়ে নানক জানতে চাইল, “আর কিছু প্রয়োজন হলে বলবেন অনুগ্রহ করে। গাড়িতে লাঞ্চ নেবেন? দশ মিনিট আগে বললে হট কেসে প্যাক করে দেব।”

দত্তরা বহু বছর বিদেশে কাটিয়েছেন। হিন্দির চেয়ে ইংরেজিতে বেশি সাবলীল তাঁরা। অজন্তা পিছন ফিরে চোখ ইংরেজিতে জবাব দিলেন, “দরকার নেই। আজ আমরা ‘সিন্দু’ দিয়ে লাঞ্চ সারব। সেদিন দেখলাম পথে একটা ফুড স্টলে খাবারটা বড় ভাল বানায়। আজ ওখান থেকেই লাঞ্চ করব। তুমি খেয়াল রেখো, গাড়ি যেন ঠিক সময়ে আসে।”

“নিশ্চয়ই ম্যাডাম, গাড়ি ঠিক সময়ে চলে আসবে। আর কিছু?”

“নো...নাথিং এলস। ইফ সো আই উইল কল ইউ।”

অভিধানে মাত্র একটা অর্থ লেখা থাকলেও অভিজ্ঞরা আলাদা-আলাদা ভঙ্গিতে উচ্চারিত ‘নাথিং এলস’ কথার নিহিতার্থ ধরতে জানে। স্থান এবং পরিস্থিতি বিশেষে শব্দ যুগলের অর্থ বদলে যায়। প্রেমিকা যখন গোমড়া বোঝে প্রেমিককে কথটা বলে তখন ধরে নিতে হবে ব্যাপার গুরুতর। যেচারা প্রেমিকের কপালে দুঃখ আছে। বউ শপিং সেরে উদাস কণ্ঠে বরকে কথটা শোনাতে জানতে হবে ডাল মে জরুর কিছু কালা হায়া! আগামী দু’তিন রাত বর বাবাজীবনকে নিরামিষ কাটাতে হবে!

অজন্তার কথা বলার ধরনে নানক বুঝল, আর একটিও শব্দ খরচ না করে তাকে লন ভাগ করতে হবে, কিন্তু, দত্ত দম্পতিকে চোখের আড়াল করা চলবে না। দূর থেকে খেয়াল রাখতে হবে তাঁদের কিছু প্রয়োজন হয় কিনা। যেদিন সকাল থেকে দত্তজির গলা খুসখুস করে সেদিন ব্রেকফাস্টের পরে এক কাপ কালো আদার রস মেশানো চা পান করেন তিনি। আজ এখনও পর্যন্ত নানক জানতে পারেনি, সকাল থেকে একবারও দত্তজির গলা খুসখুস করেছে কিনা!

অজন্তা ম্যাডামকে লম্বা কুর্নিশ ঠুকে কিচেনের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল নানক। পয়সাওলা বোর্ডারদের নিয়ে সচরাচর টেনশনে থাকতে হয় ওয়েটারদের। পান থেকে চুন খসলেই তাদের গোঁসা! কিন্তু দত্ত দম্পতি অন্য সব পয়সাওলা মানুষের থেকে আলাদা। আজ পর্যন্ত একবারও তাদের মাথা গরম করতে দেখেনি নানক। সব সময় তৃপ্তির হাসি লেগে আছে দু’জনের মুখে। পৃথিবীটা যে আসলে একটা পরিপূর্ণ শান্তির জায়গা তা এদের না দেখলে অজানা থেকে যেত নানকের কাছে। তবে হ্যাঁ একটা খুঁতখুঁতানি আছে দত্ত দম্পতির। যখন যেটা মজি হবে, ঠিক তখনই সেটা তাদের চাই-ই চাই। তার জন্য পয়সা যা লাগে লাগুক! সামান্য একটা ডাবের জন্য কেউ সাতশো টাকা খরচ করছে এমনটা তার আটশ বছরের জীবনে কখনও দেখেনি নানক। পয়সা তো লাইফে অনেকেই কামায়, কিন্তু তা খরচ করার মতো এমন দরাজ মন ক’জনের থাকে! এভাবে কেতায় বাঁচতেই বা পারে ক’জন! নানকের ইচ্ছে, সে একদিন মোহন দত্তের মতো বড় মনের ধনী মানুষ হবে।

না, আজ গলা খুসখুস, মাসল পুল কিংবা পায়ে ঝি-ঝি লাগার মতো কোনও সমস্যা হয়নি মোহনজির। প্রায় আধঘণ্টা পরে ব্রেকফাস্ট শেষ হলে তিনি বউয়ের সঙ্গে চললেন নিজের রুমে। অজন্তা ম্যাডাম লনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে রুম সার্ভিসের ছেলে পাঠিয়ে তাদের ঘরটা সাফসুতরো করিয়ে রেখেছে নানক।

দত্তজিরা চোখের আড়াল হতেই দ্রুত পায়ে নানক এগিয়ে গেল পরিত্যক্ত টেবিলের দিকে। কয়েকটা কাজু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্লেটে। স্যান্ডউইচ দুটোই আধ-খাওয়া, তবে বরফির কণামাত্র পড়ে নেই। দত্তজিরা দু’জনেই মিষ্টির ভারী ভক্ত!

এঁটো খাবারগুলো একটা প্লেটে জড়ো করে কফির ট্রে সরাতেই নানক পেয়ে গেল কাজিফত বস্তুটা। একটা চকচকে দুশো টাকার নোট!

প্রথম দিন দত্তজিরা ব্রেকফাস্ট করে রুমে চলে যাওয়ার পরে টেবিল পরিষ্কার করতে এসে নানক এমন একটা নোট আবিষ্কার করেছিল। ভেবেছিল ভুল করে মোহনজি নোটটা ফেলে গিয়েছেন। ভুল ভাঙল টাকাটা ফেরত দিতে গিয়ে। মিষ্টি হেসে অজন্তা ম্যাডাম বলেছিলেন, টাকাটা মোটেই ভুল করে ওখানে ফেলে রেখে আসা হয়নি, ওটা নানকের বকশিস!

অজন্তা ম্যাডামের কথা শুনে বেশ কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে ছিল নানক। গত চার বছর এই গেস্টহাউসে রয়েছে সে। এর আগে এক মাঝারি মানের হোটেল তিন বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার। কিন্তু এমন দিলখোলা বোর্ডার আগে কখনও পায়নি সে। পাহাড়ে বেড়াতে এসে ফুটি করার জন্য কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ওড়ায় সবাই কিন্তু চেক আউটের সময় বকশিস দিতে গেলে বড্ড গরিব হয়ে যায় তারা। আজ পর্যন্ত নানকের পাওয়া সর্বোচ্চ বকশিস তিনশো টাকা। নানক শুনেছে আমেরিকা অথবা সুইজারল্যান্ডের মতো দেশে ওয়েটারদের রোজগার যথেষ্ট বেশি। করোনার আগে একটা আটকেলে সে পড়েছিল, দু’হাজার সতেরো সালে আমেরিকার রেস্টুরার কর্মীদের বকশিস বাবদ আয় হয়েছিল বিয়াল্লিশ মিলিয়ন ডলার। অঙ্কটা এই ক’বছরে বেড়েছে নিশ্চয়ই! সুইজারল্যান্ডে একজন দক্ষ ওয়েটারের মাসিক বেতন ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা! ওইসব দেশে হোটেল বা রেস্টুরার কাজ করে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন অলীক নয়, কিন্তু ইন্ডিয়ার ব্যাপার স্যাপার অন্যরকম। এখানে একজন ওয়েটারের পক্ষে স্বচ্ছল ভাবে সংসার চালানো ভীষণ কঠিন। নিয়মিত বকশিস পেলে কিছুটা সুরাহা হয়, কিন্তু হোটেল বা রিসর্টে থাকতে আসা মানুষদের ক’জন বোঝে সেই কথা!

নানককে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে অজন্তা ম্যাডাম হেসে বলেছিলেন, “এতে অবাধ হওয়ার কিছু নেই। মোহনজি খুবই দয়ালু মানুষ। তিনি যখন যেখানে থাকেন, আশপাশের মানুষদের সাহায্য করেন।”

সেই থেকে প্রতিদিন দত্তজিদের ব্রেকফাস্টের টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়ে প্লেটের তলায় একটা করে আনকোরা নোট আবিষ্কার করেছে নানক। কোনও কোনও দিন লাঞ্চ অথবা ডিনারের পরেও ঘটেছে প্রাপ্তিযোগ্য। দত্তজিদের আরও একটা গুণ, বাইরে থেকে কিছু আনতে দিলে কখনই খরচের হিসেব চান না তারা। ফেরত নেন না বেঁচে যাওয়া টাকা। একবার দু’হাজার টাকার নোট দিয়ে নানককে কিছু ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিলেন অজন্তা ম্যাডাম। সেদিন নানকের লাভ হয়েছিল প্রায় সাড়ে আটশো টাকা!

মোহনজির এমন বাদশাহি মেজাজের খবর গেস্টহাউসের অন্য কর্মীদের কাছে গোপন থাকেনি। তাদের সবার খাঁ মিটিয়েও এই মুহূর্তে নানকের পকেটে যা রয়েছে তাতে স্বচ্ছন্দে তার গার্লফ্রেন্ডের জন্য একটা ব্র্যান্ড নিউ স্মার্টফোন হয়ে যায়!

এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে ব্যালকনিতে ফিরে নানক দেখল, দেয়াল ঘড়িতে দশটা পর্যন্ত্রিশ। এগারোটার সময় দত্তজিদের রওনা হওয়ার কথা। গাড়ি এখনও আসেনি। ওয়াশরুমে ঢুকে সবার নজর বাঁচিয়ে অভ্যস্ত হাতে কাজুর টুকরোগুলো একটা পলিথিনের প্যাকেটে পুরে সেটা জামার ভিতরে চালান করল নানক। তারপর হাত ধুয়ে ফোনে ডায়াল করল ড্রাইভারের নম্বর। ঠিক সময়ে গাড়িটা গেস্টহাউসের গেটে হাজির থাকা চাই।



“দাদা, এক কাপ চা পাওয়া যাবে?”

কথার ধরন শুনে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল ভজন। চায়ের দোকানে

এসে সাধারণত এমন সুরে কথা বলে না কেউ। অফিসের বাবু, যারা এই দোকানের নিয়মিত খন্দের তারা এসেই হুকুম চালায়, “আই ভজা, শিগগির তিনটে চা।” পথচলতি কাস্টমার কেজো সুরে চা বিস্কুট লাড্ডু মাখন-টোস্ট, যার যেমন প্রয়োজন চেয়ে নেয়। জিনিস কিনে প্রত্যেকেই দাম দেয়। এখানে কেউ কাউকে অনুগ্রহ করছে না। ভজন যেমন ব্যস্ত অফিসপাড়ায় পথচলতি মানুষের খিদে-তেষ্টা মেটায়, তেমনই তারা এই দোকান থেকে কেনাকাটা করে বলেই ভজনের সংসার চলে। কিন্তু এই মানুষটার কথার সুর অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো!

কিছু তরল রসিকতা গজিয়ে উঠেছিল ভজনের মগজে। বলতে ইচ্ছে করছিল, “আজ্ঞে পাওয়া যাবে বলেই তো দোকান খুলে বসে আছি। সারাদিন ধরে চা চিনি দুধের শ্রাদ্ধ করে যে বস্তুটা বানাই সেটা যদি আপনাদের সেবায় না লাগে, তবে আমার পেট চলবে কেমন করে!” কিন্তু প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবে ফেলা কথাগুলো গিলে নিল ভজন। প্রশ্ন যে করেছে তাকে লোক না বলে ছেলে বলাই সম্ভব। বালক, তরুণ, যুবক এবং বৃদ্ধের বয়সভিত্তিক বিভাজন আছে। কিন্তু ছেলে এবং লোকের মধ্যে তেমন কিছু সীমারেখা টানা নেই। একটা ছেলে ঠিক কখন থেকে লোক হয়ে ওঠে তার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা বোধহয় এখনও তৈরি হয়নি। তবে ভজনের মতে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে দুনিয়াতে অন্তত চারটে দশক পার না করলে এবং শরীরের মধ্যপ্রদেশে কিঞ্চিৎ মেদবাহুল্য না ঘটলে একজন মানুষ ঠিকঠাক লোক হয়ে উঠতে পারে না!

চেহারে দেখে বয়স তিরিশের আশপাশে মনে হলেও ছেলোটর চোখের দিকে তাকালে সেই ধারণা ধাক্কা খেতে বাধ্য। মরা মাছের মতো চোখ ছেলোটর, প্রাণের ছিটেফোঁটা স্পন্দন সেখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর!

ছেলোটাকে দেখে মায়া হল ভজনের। নরম গলায় বলল, “কেন পাওয়া যাবে না ভাই, তোমাদের তেঁস্তা মেটাব বলেই তো শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথায় নিয়ে বারো মাস এই ফুটপাতে বসে থাকি। বসো তুমি, আমি চা দিচ্ছি।” হাতের টাউস ব্যাগটা পাশে রেখে বেঞ্চিতে ধপাস করে বসে পড়ল ছেলোট।

ছেলোটর পোশাকআসাক ভদ্রগোছের। জিনস, জ্যাকেটটা নামী ব্র্যান্ডের, তবে ডান হাতের অনামিকার আংটিটা যে মেকি, সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। আংটির পাথরটা ঝলমল করলেও ধাতব অংশ জৌলুস হারিয়েছে। শখ করে এই ধরনের আংটি কেউ পরে না বড় একটা। সাধারণত ফুটপাতের জ্যোতিষীরা ভাগ্য ফেরানোর ইন্সট্যান্ট দাওয়াই হিসেবে এই সব পাথর গছিয়ে থাকে। পোশাক দেখে ছেলোটাকে দুঃস্থ মনে না হলেও হয়তো সম্প্রতি ওর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। তাই জ্যোতিষীর দেওয়া পাথর হাতে গুঁজে ক্ষত মেরামতের চেষ্টা চালাচ্ছে।

ছেলোটর হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে ভজন প্রশ্ন করল, “সঙ্গে আর কিছু লাগবে? ডিম টোস্ট, মাখন টোস্ট, কেক, লাড্ডু?”

নেতিবাচক মাথা দুলিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল ছেলোট। এবার ছেলোটাকে আর একটু খুঁটিয়ে দেখল ভজন। তেলবিহীন চুলে চিরুনির এলোমেলো আঁচড়া মুখে বেশ কয়েক দিনের না কাঁমানো দাড়ি। কপালের ভাঁজে, চোখের কোণে নৈরাশ্যের প্রলেপ। এক তরতাজা তরুণের কাঁধের উপর জীবন সম্পর্কে তিত্তিরিক্ত কোনও বৃদ্ধের মস্তক যেন বসিয়ে দিয়েছে কেউ!

আদা হেঁচতে-হেঁচতে ভজন আন্তরিক গলায় প্রশ্ন করল, “ভাইটি কি এদিকে নতুন? আগে তো কখনও দেখিনি।”

চায়ের কাপে ছোট চুমুক দিয়ে ছেলোট বলল, “হুঁ।” উত্তর দেওয়ার ধরন শুনেই বোঝা যায় কথা বলার ইচ্ছে নেই তার। এমন পাথুরে মানুষকে বরদাস্ত করতে পারে না ভজন। হাড়ভাঙা খাটুনি সত্ত্বেও সে নিজে হাসিমুখে থাকে সারা ক্ষণ। চেষ্টা করে আশপাশের মানুষদের খুশিতে রাখতে। হাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারাদিন তার মুখ চলে অনর্গল। পলিটিক্স, খেলাধুলো থেকে শুরু করে টলি-বলির নতুন-পুরনো গসিপ তার নখদর্পণে। যারা নিয়মিত এই দোকানে গলা ভেজাতে আসে, রসনা তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাজের একঘেয়েমি কাটানোর রসদও প্রচুর পরিমাণে পেয়ে যায় তারা। ভজন বুক ঠুকে

বলতে পারে, তার কাস্টমারদের মধ্যে একটাও রামগরুড়ের ছানা নেই!

“এখানে কী কাজে এসেছ? কোন অফিস? আমার দোকানে সব অফিসের বাবুরাই চা খেতে আসে। যদি কোনও সমস্যা হয় বলতে পারো। আমি ঠিক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।”

মরা মাছের মতো চোখদুটো মেলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলোট। উত্তর দেওয়ার স্বাভাবিক সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর ভজন যখন ধরে নিয়েছে জবাব আসবে না, তখনই মুখ খুলল ছেলোট। কিছুটা কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল, “অফিস-টপিস সব শুরু হবে কখন, ক’টা নাগাদ ঢোকে বাবুরা?”

দোকানের এককোণে টাঙানো সস্তার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভজন উত্তর দিল, “তা সময় তো হয়েই গিয়েছে। কিন্তু সরকারি অফিসের ব্যাপার স্যাপার তো বোঝোই! বাবুরা আসবে, রেস্ট নেবে তারপর কাজকর্ম স্টার্ট করবে। তুমি যাবে কোন অফিসে?”

এই প্রশ্নেরও উত্তর এল না। ছোট-ছোট চুমুকে অবশিষ্ট চা শেষ করে ছেলোট বলল, “আমি কিছু ক্ষণ এখানে বসতে পারি? চিন্তা নেই, ফাউ বসে সিট গরম করব না, আরও দুয়েকবার চা কিনব।”

না, বেঞ্চির এককোণে একজন বসে থাকলে কোনও ক্ষতি নেই ভজনের। সারাদিনে অগুস্তি মানুষ চা খেতে আসে তার দোকানে। ছোট বেঞ্চে ক’জনেরই বা বসার জায়গা হয়। বসে-বসে আয়েস করে চা পানের প্রত্যাশায় কেউ আসে না এখানে। ছেলোট সারাদিন বেঞ্চ্যে বসে থাকলেও বিক্রিবাটায় টান পড়বে না ভজনের, কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। ফুটপাতের এই চায়ের দোকান ভজনের কাছে মন্দিরের মতো। এই দোকান খাইয়ে পরিষেবা বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। এই দোকানের আয় থেকেই তার অসুস্থ বউয়ের চিকিৎসা হয়, মেয়ের পড়াশোনার খরচ চলে। তেলোহাড়ির মতো মুখ নিয়ে কেউ এখানে বসে থাকলে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয় ভজনের। ছেলোটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে অজস্র বিষাদরেখা বুলিয়ে দিয়েছে ওর মুখে। ওই অভিব্যক্তি সহজে মোছার নয়! এমন একজন মানুষ এখানে না বসলেই খুশি হত ভজন কিন্তু কী আর করা যাবে। যে কোনও ব্যবসার গোড়ার কথাই হচ্ছে “খন্দের লক্ষ্মী”। থোবড়া দেখে বেচাকেনা করতে গেলে ব্যবসা লাটে উঠতে সময় লাগবে না। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভজন বলল, “কেন নয় ভাইটি, তোমার যত ক্ষণ প্রয়োজন বসতে পারো, তার জন্য চা কিনতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। কিন্তু তোমার সমস্যা কী, তা তো বললে না। বিশ্বাস করে একবার বলে দেখলেও পারতে। হয়তো এই দাদাটা তোমার কোনও কাজে আসত। সিংহ আর হুঁদরের গল্পটা ছোটবেলায় পড়েছি নিশ্চয়ই!”

নিভে আসা চোখ নিয়ে ছেলোট সামান্য সময় তাকিয়ে থাকল ভজনের দিকে। তারপর সন্দিগ্ধ গলার প্রশ্ন করল, “আমি সমস্যায় আছি সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে? আমি তো কিছু বলিনি আপনাকে!”

আকর্ণ হেসে ভজন বলল, “তিরিশ বছর ধরে ফুটপাতে দোকান চালাচ্ছি ভাইটি। মুখ দেখে যদি মানুষের মনের অবস্থা বুঝতে নাই পারলাম তবে এতগুলো বছর করলাম কী! তোমাকে প্রথমবার দেখেই বুঝেছি কিছু সমস্যা আছে। আমি কোনও হেল্প করতে পারি? সরকারি অফিসের পাতি কেরানি থেকে শুরু করে লালবাজারের কেঁটবিষ্ট, সবার সঙ্গেই এই অধর্মের একটু আধটু পরিচয় আছে।”

ম্লান হেসে ছেলোট বলল, “হ্যাঁ সমস্যা একটা আছে বটে, তবে সে অতি জটিল। স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।”

ছোট এলাচের কৌটোটা শিলের উপরে উপড় করে ভজন বলল, “এই কথাটা তুমি একরকম ঠিকই বলেছ। গুঁদের অনেক বড়-বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।”

হাঁ করে কিছু ক্ষণ ভজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলোট বলল, “আশ্চর্য, এত পড়াশোনা শিখেও আপনি চায়ের দোকান চালাচ্ছেন! আপনার তো টিচার হওয়া উচিত ছিল।”

বিগলিত হেসে ভজন বলল, “তুমিও মলাট দেখে বই জাজ করার ভুল করে বসলে ভাইটি! আমার পেটে বোম মারলেও অ আ ক খ

আর এ বি সি ডির বেশি কিছু বেরোবে না। কিন্তু অফিসবাবুদের সঙ্গে তিরিশ বছর ধরে গা ঘষাঘষির একটা সাইড এফেক্ট তো আছে।”

গায়ের জ্যাকেটটা খুলে রেখে ছেলোটো বলল, “তাই বলুন। তবে লেখাপড়া যাই করুন, আপনি একজন ভাল মানুষ। দুনিয়ার টেন পারসেন্ট মানুষও যদি আপনার মতো ভাল হত তবে পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে উঠত।”

দোকানে ভিডি বাড়ছে। একজন দু’জন করে হাজির হচ্ছে অফিসের বাবুরা। ভজন প্যাকেট থেকে গামলায় দুধ ঢালতে-ঢালতে বলল, “তুমি বোসো ভাইটি। আমি হাতের কাজগুলো মিটিয়ে তোমার কথা শুনছি।”

ছেলেটার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো কাপটা ধোয়ার জায়গায় রেখে দোকান থেকে বেরিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। ভজন মন দিল নিজের কাজে। লোহার লম্বা শিক দিয়ে একবার খুঁটিয়ে দিল উনুনটা। আচমকা পিছন দিকে বেমক্কা হল্লা শুনে চমকে উঠল ভজন। চা ভর্তি সসপ্যানটা হাত থেকে নামিয়ে সেদিকে ফিরতেই আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেল সে। ট্রাম লাইনের মাঝখানে শুয়ে আগুনে পুড়ছে একটা জলজ্যন্ত মানুষ! থমকে গিয়েছে ব্যস্ত রাস্তার ছোট-বড় যানবাহন। হঠাৎ চারদিকের আত্নানাদ-কোলাহল ছাপিয়ে শুরু হল এক মহিলা কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি!

হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নামতেই মাথায় বজ্রপাত হল ভজনের। এইমাত্র তার দোকানে চা খাওয়া ছেলোটাই পুড়ছে রাস্তায় পড়ে!

তিরিশ বছর ফুটপাথে চায়ের দোকান চালাচ্ছে ভজন। ছোট-বড় অগুস্তি দুর্ঘটনা চাক্ষুষ করতে হয়েছে তাকে। এমন সময়ে কী করণীয় খুব জানা আছে তার। এক লাফে দোকানে ফিরে জলভর্তি বিশ লিটারের জ্যারিকেনটা তুলে নিয়েই ছুটল ছেলেটার দিকে। আশপাশ থেকে অনেকেই ছুটে আসছে জলের পাত্র নিয়ে।

সমবেত বারিধারায় বশ মানলেন অগ্নিদেব।



মন দিয়ে ফাইল দেখছিলেন ডেপুটি কমিশনার সত্যব্রত রায়চৌধুরী। পুলক ঘরে ঢুকতে তিনি হাতের ইশারায় সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন। একটু পরে ফাইল থেকে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন, “এখন কেমন আছে ছেলোটো?”

“নট সো ওয়েল বাট হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার নাও। ডক্টর বলছিলেন শরীরের পঁচিশ শতাংশের মতো পুড়ে গেছে তবে হার্ট স্ট্রং, রিকভারিং ফাস্ট।”

“স্টেটমেন্ট কবে নেওয়া যাবে?”

“টুমরো অর দ্য ডে আফটার, ইফ দ্য ফিজিক্যাল কন্ডিশন ডাঙ্গ নট ওরসেন। তবে আজ ওর বাবার স্টেটমেন্ট নিয়েছি। কল্লোল মিস্ত্রির নিরুদ্দেশ হওয়ায় আপসেট ছিল ছেলোটো। লাস্ট মানডে লোকজন বাড়িতে গিয়ে হল্লা করার পর থেকেই ভয়ঙ্কর ডিপ্রেশনে ভুগছিল। অবশেষে আজ এই কাণ্ড।”

ডি সি আরও কিছু ক্ষণ ভুরু কঁচকে তাকিয়ে থাকলেন ফাইলটার দিকে। তারপর সেটা সরিয়ে রেখে মুখ তুলে বললেন, “স্টেটমেন্ট অফ এনি আই উইটনেস?”

“ইয়েস স্যার, পাঁচজনের স্টেটমেন্ট নিয়েছি। ছেলোটো গায়ে আগুন লাগানোর আগে ফুটপাথের এক দোকানে বসে চা খেয়েছিল। ভজন রায় নামে সেই শপকিপার তিরিশ বছর ধরে ওখানে দোকান চালাচ্ছে। ছেলোটাকে দেখে ভজন রায়ের একটু অন্যরকম মনে হলেও সে যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে তা ঘুণাঙ্করেও আঁচ করতে পারেনি।

কাজে ব্যস্ত ছিল বলে ভজন রায় নিজের চোখে ছেলোটাকে গায়ে আগুন লাগাতে দেখেনি তবে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটা জোড়া লাগানো গেছে। ভজন রায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ছেলোটো স্নোক করছিল। তারপর পকেট থেকে পারফিউম বের করে নিজের সারা গায়ে স্প্রে করে। অ্যান্ড দেন সিগন্যাল লাল হতেই মাঝরাস্তায় এসে সেট হিমসেলফ অন ফায়ার। ওখানকার আরও চারজন শপকিপার একই স্টেটমেন্ট দিয়েছে।”

একটু ইতস্তত করে পুলক বলল, “আমরা কালপ্রিটটাকে খুঁজে বের করে জেলে পুরছি না কেন স্যার, বাংলার অজস্র মানুষ ওর কথায় ভরসা করে সর্বশ্ব খুইয়েছে। এখন মাঝখান থেকে বিপদে পড়েছে এজেন্টরা। ওকে ধরতে পারলে কয়েক হাজার কোটি টাকার হদিস মিলত। পাবলিক টাকা ফেরত পাওয়ার আশ্বাস পেলে যে ছেলেমেয়েরা টাকা তুলেছে তারা অন্তত জনরোষের হাত থেকে বাঁচত। ওদের কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, কেউ গায়ে আগুন লাগাচ্ছে, এভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না!”

ডি সি আশ্বাসের ভঙ্গিমায়ে হাত তুলে বললেন, “চলবে না। আজ হোম মিনিস্টার আমাকে ডেকেছিলেন। তিনিও ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত এবং বিব্রত। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজ সুন আজ পসিবল কালপ্রিটটাকে হাজতে পুরতে। সম্ভব হলে উইদিন আ উইক। খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, যাদের উপরে তদন্তের ভার ছিল, তারা এখনও পর্যন্ত নিজেদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। তাই দায়িত্বটা আমাদের উপরে বর্তেছে।”

“কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা কেমন ভাবে সম্ভব স্যার? প্রায় একমাস হতে চলল কল্লোল মিস্ত্রির হদিস নেই। একটা জলজ্যন্ত মানুষ এভাবে উবে যেতে পারে না, কোথাও না কোথাও সে লুকিয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জায়গাটা কোথায়? বাংলার বাইরে গা ঢাকা দেওয়াই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। আমার স্পেকুলেশন বলছে, উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের এমন কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোকটা লুকিয়ে আছে যেখানে এই কেলেকারির ঢেউ পৌঁছবে না। অসম, ত্রিপুরাতেও জাল বিছিয়েছিল রেনবো, তাই ওদিকে লুকিয়ে থাকার ঝুঁকি নেবে না মিস্ত্রি।”

ডি সি খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, “আই এগ্রি উইথ ইউ। তবে লোকটা সাংঘাতিক ধুরন্ধর। পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মোবাইল ফোন, ডেবিট কার্ড কিছুই ইউজ করছে না। ফর দ্যাট রিজন্ ওর অবস্থান চিহ্নিত করা তদন্তকারী অফিসারদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে...”

“তবে?” উৎসুক হয়ে টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ল পুলক, “তবে কি কোনও ক্লু পাওয়া গিয়েছে?”

“ঠিক ক্লু নয়, একটা ইনফরমেশন। সেটা আমাদের কাজে লাগার মতো কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে আপাতত ওটা ছাড়া আমাদের হাতে এগোনোর মতো কিছু নেই।”

“কী ইনফরমেশন স্যার, ক্যান ইউ শেয়ার ইট উইথ মি?”

“ডেফিনিটলি। ইন ফ্যাক্ট, কল্লোল মিস্ত্রিকে পাকড়াও করার জন্য হোম মিনিস্টার আমাকে একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করার পরামর্শ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। ইউ উইল লিড দ্য টিম।”

“থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংকস আ লট। আই উইল ডু মাই বেস্ট টু আপহোল্ড দ্য ডিগনিটি অফ ইয়োর ফেথ।”

হাতের ফাইলটা পুলকের দিকে এগিয়ে দিয়ে ডি সি বললেন, “ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট বলছে, কল্লোল মিস্ত্রি ঊষাও হওয়ার চার মাস আগে রেনবো কোম্পানির ডেপুটি ডিরেক্টর পদ থেকে রিজাইন করেছিলেন সঙ্গীতা সাহা। ব্যাপারটায় রেনবো কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত সবাই খুব অবাক হয়েছিল। কারণ কল্লোল মিস্ত্রির সঙ্গে সঙ্গীতা সাহার সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। নতুন এক স্কিম লঞ্চ করা নিয়ে তাদের মধ্যে মতান্তর শুরু হয়। তার পর থেকেই দু’জনের মনোমালিন্য এবং সঙ্গীতার পদত্যাগ। বাট আওয়ার অফিসারস ফাউন্ড আউট ভেরি রিসেস্টিবল, কল্লোল মিস্ত্রি নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে সঙ্গীতারও হদিস নেই। সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, সঙ্গীতা সাহা আদতে উত্তরবঙ্গের



মানুষ হলেও গত বারো বছর কলকাতার বাসিন্দা। আলিপুরদুয়ারে তার পুরনো ঠিকানায় খোঁজ করে আত্মীয়স্বজন কাউকে পাওয়া যায়নি। যাকে বলে একদম রুটলেস উণ্ডম্যান। অফিসাররা জানতে পেরেছেন, পদত্যাগ করার পর সঙ্গীতা সাহা ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কেরল, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ হয়ে তিন সপ্তাহ পরে ফিরেছিলেন কলকাতায়। এখানে ফিরে বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে সি ভি জমা দিলেও শেষ পর্যন্ত কোথাও জয়েন করেননি। এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। কাজের চাপ সামলাতে-সামলাতে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন মনে হয়, কিছুদিনের জন্য কোনও নির্জন জায়গা থেকে ঘুরে আসি। হয়তো সঙ্গীতাও সেই কারণেই চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে অফিসারদের একটু খটকা লেগেছে।”

“কোন বিষয়ে স্যর?”

সরাসরি পুলকের কথার উত্তর না দিয়ে ডি সি পালটা প্রশ্ন করলেন, “সাপোজ ইউ হ্যাভ আ লট অফ মনি। তোমার ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। অগস্টের ভ্যাপসা গরমে ভারতের এমাতা থেকে ওমাতা ঘোরার জন্য তুমি কোনটা বেছে নেবে, ট্রেন নাকি প্লেন? বিশেষ করে তোমার শেষ পাঁচ বছরের রেকর্ড বলছে, যখনই তুমি বাংলার বাইরে গিয়েছ, ইউ ট্রাভেলড বাই প্লেন।”

“নিশ্চয়ই আকাশপথ স্যর। পকেট পারমিট করলে খামোখা গরমের মধ্যে ট্রেনে চড়ার ঝুঁকি নেব কেন? তাছাড়া ফ্লাইটে গেলে অনেকটা সময় বাঁচবে।”

“দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশেন। সঙ্গীতা সাহা কলকাতা থেকে তিরুঅনন্তপুরমে গিয়েছে ফ্লাইটে, মানালি থেকে কলকাতায় ফিরেছে ফ্লাইটে। মাঝের রাস্তাটুকু, মানে তিরুঅনন্তপুরম থেকে সুরাত, সেখান থেকে চণ্ডীগড় হয়ে মানালি কখনও ট্রেনে কখনও বাসে কখনও

প্রাইভেট করে। এই রুটের বেশ কিছু অংশে অফিসাররা ট্রেন বা প্লেনের যাত্রী তালিকায় সঙ্গীতা সাহার নাম খুঁজে পায়নি। হোটেল বা রিসর্টে থাকার সময় তিনি কার্ডে পেমেন্ট করেছিলেন, তাই তিনি কখন কোথায় ছিলেন তা আমাদের কাছে পরিক্ষার। কিন্তু...”

“কেন তিনি ট্রেন বা প্লেনের বদলে মাঝেমাঝেই বাস বা অন্য বাহন পছন্দ করলেন সেখানেই ধোঁয়াশা তো স্যর?”

“ইয়েস পুলক, এই পয়েন্টটা ভাবাচ্ছে অফিসারদের।”

“চেয়ারে টানটান হয়ে বসে পুলক বলল, “আমরা কী এইভাবে ভাবতে পারি স্যর, আদৌ কল্লোল মিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতা সাহার কোনও ঝামেলাই হয়নি, সবটাই লোক দেখানো? কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে অনেক আগে থেকেই কল্লোল মিত্র পালাবার ফিকির খুঁজছিলেন। ইন ফ্যাক্ট, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, শেষ অর্টিন’ মাস রেনবোর ব্যবসা পড়তির দিকে যাচ্ছিল। ইনভেস্টর কমছিল, যাদের পলিসি ম্যাচিওর করেছে তারা টাকা ফেরত পাচ্ছিল না। আমার মনে হয় সঙ্গীতার রেজিগনেশন একটা সাজানো ঘটনা। আসল কথা চাকরি ছেড়ে সঙ্গীতা ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নিজের এবং কল্লোল মিত্রের জন্য একটা নিরাপদ ডেরার খোঁজে। তিরুঅনন্তপুরম থেকে মানালির মাঝে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে তিনি মিট করেছিলেন, যারা তাঁদের শেলটার দিতে পারে। সেখানে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর পরিস্থিতি বুঝে বিদেশে পালাবেন। অনেকেই তো হাজার হাজার কোটি টাকা ঘাপলা করে বিদেশে গিয়ে বসে আছে। সরকার তাদের দেশে ফেরাতে পারছে না। সেসব দেখে কল্লোল মিত্রের হয়তো অনুপ্রাণিত হয়েছেন।”

মাথা নেড়ে ডি সি বললেন, “ভেরি লজিক্যাল থিঙ্কিং! বাট ইয়ংম্যান আমি যতদূর জানি, তিরুঅনন্তপুরম থেকে মানালির দূরত্ব মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার। এই বিশাল জায়গার ঠিক



কোথায় কল্লোল মিত্র তার বান্ধবীকে নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে, তা কীভাবে জানা সম্ভব? বিশেষ করে তাদের কেউই যখন সেলফোন, কার্ড অথবা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছে না যা দিয়ে তাদের লোকেশন ক্যান বি ট্রেসড!”

“ওইসব স্টেটের হোম ডিপার্টমেন্টে আমরা কল্লোল মিত্র এবং সঙ্গীতা সাহার ছবি পাঠাতে পারি...”

ক্রিকেট খেলার অস্পায়ার যেমন তর্জনী উচিয়ে ব্যাটারকে আউটের সিদ্ধান্ত জানান, তেমনভাবে আঙুল তুলে পুলককে থামিয়ে দিলেন ডি সি। “উহু, ওই পথে এগোনোর একটা বড় বাধা আছে। ওইসব স্টেটে যারা রুলিং পার্টি, আমাদের রাজ্যে তারা বিরোধী দল। একটা দল তো আবার সেন্ট্রালে ক্ষমতায়। সামনে ইলেকশন। সমস্যা হতে পারে। উই মাস্ট কনডাক্ট আওয়ার ইনভেস্টিগেশন ইন দ্য আটমোস্ট সিক্রেসি। যারা নিজের পরিচয় গোপন করে, লোকজনের সঙ্গে মিশে তদন্ত চালাতে দক্ষ, পিক আ ফিউ সাচ অফিসারস ফ্রম ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। আমার দশ দিনের মধ্যে রিজাল্ট চাই। সব দিক বিবেচনা করে একটা রিয়ালিস্টিক ডেডলাইন তোমাকে দিলাম। হোম মিনিস্টারকে আমি সামলে নেব, ক’জন অফিসার চাই তোমার?”

সামান্য চিন্তা করে পুলক বলল, “কুড়িজন স্যার।” ভুরু কুঁচকে পুলকের দিকে তাকিয়ে ডি সি বললেন, “উহু, সামনে ভোট। এই সময় অত জন অফিসার আমি ছাড়তে পারব না। তোমাকে আট জন নিয়ে কাজ করতে হবে। রিমেমবার, ইনফর্ম দ্য লোকাল পুলিশ ওনলি আফটার কনফার্মিং দ্য আইডেনটিটি অফ কল্লোল মিত্র। আনটিল দেন, ইউ আর অ্যান অর্ডিনারি টুরিস্ট। বেস্ট অফ লাক।”

“কিন্তু মাত্র ন’জনে...” একটু গুঁইগাই করতে যাচ্ছিল পুলক, কিন্তু ডি সি চশমার ফাঁক দিয়ে এমন ভাবে তার দিকে তাকালেন, যে চাহনির পরে আর কোনও কথা চলে না। ঢোক গিলে এক লহমায় ট্রাক চেঞ্জ

করল পুলক, “...কাজটা আমরা করে দেখাব স্যার। আগামী কাল সকাল দশটার আগেই অফিসারদের নাম জানিয়ে আপনাকে রিপোর্ট করছি।”

খুশি হয়ে মাথা দোললেন ডি সি।

ঘরে ফিরে পাঁচ মিনিট গুম হয়ে নিজের চেয়ারে বসে থাকল পুলক। মাত্র ন’জন মিলে এমন এক ক্রিমিন্যালকে খুঁজে বের করতে হবে যে কিনা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মধ্যে যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে। সেই মহাপুরুষটি ফোন অথবা কার্ড ব্যবহার করে না এবং তাকে খোঁজার কাজে লোকাল পুলিশের সাহায্য নেওয়া যাবে না! সব থেকে বড় কথা এই সমস্ত কাজ করে ফেলতে হবে মাত্র দশ দিনের মধ্যে। রিয়ালিস্টিক ডেডলাইন! যে অফিসাররা ফিল্ডে কাজ করে তাদের হাতে কী জাদুদণ্ড আছে যে সেটা দুলিয়ে চোখের পলকে অপরাধীদের খুঁজে বের করবে! উচুতলার কর্মকর্তারা কী ভাবে কে জানে!

বাজার মুখে ফাইল পড়তে শুরু করল পুলক। শেষ পাতায় পৌঁছানোর আগেই মেঘ কাটতে শুরু করল তার মুখ থেকে। একটু যেন আলোর রেখা সুড়ঙ্গের শেষে! কল্লোল মিত্র কোথায় থাকতে পারে তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে অফিসারদের রিপোর্ট থেকে। শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও এখনও পর্যন্ত খুব খারাপ কাজ করেননি তারা। ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। শোনা যায় এক হাজার বার চেষ্টা করার পরে ইলেকট্রিক ল্যাম্প উদ্ভাবন করতে সফল হয়েছিলেন টমাস আলভা এডিসন। নশো নিরানব্বইতম ব্যর্থতার পর হতাশ হয়ে হাত তুলে নিলে বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কারক হিসেবে মানুষ হয়তো অন্য কাউকে চিনত।

ফাইল শেষ করে ল্যাপটপ টেনে নিল পুলক। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা নয়, আজ রাতেই সিলেক্ট করে ফেলতে হবে টিম মেম্বারদের নাম। টেকনিক্যাল কাজকর্ম দু’-একদিনের মধ্যে গুছিয়ে নেমে পড়তে

হবে ময়দানে!



রবীন্দ্রসদন মেট্রো থেকে বেরিয়ে ছিপছিপে চেহারার মেয়েটা হাঁটতে শুরু করল নন্দনের ফুটপাথ ধরে। ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় পারদ ঘোরাক্ষর করছে দশ ডিগ্রির আশপাশে কিন্তু তরুণীর পোশাক দেখে সে কথা বোঝার উপায় নেই। হট প্যান্টের সঙ্গে সে পরেছে স্লিভলেস টপ। টপের হুস্ততা চোখে পড়ার মতো। উদ্ভত কুচ্যুগল সামলে রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে, কটিদেশের দিকে ইঞ্চিদুয়েক অগ্রসর হয়েই তার দৌড় শেষ! বলমলে পাথর বসানো নীল রঙের পেনডেন্টের উপরে দায়িত্ব বর্তেছে তরুণীর সমোহনী বিভাজিকার দৌবারিক হওয়ার। বলা বাহুল্য, নিজের দায়িত্ব পালনে শোচনীয় ব্যর্থ বস্তুটা!

পোশাকের মতোই নির্ভর তরুণীর পদযুগলও। পায়ে ধবধবে সাদা হাল ফ্যাশনের স্নিকার। মোজা নেই। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মোজা পরার চল আজকাল উঠেই গিয়েছে প্রায়। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা সচরাচর জিন্স এবং স্নিকারেই কাজ চালিয়ে নেয়।

একবলক দেখলেই বোঝা যায়, তরুণীর হাতের সেলফোনটা অত্যন্ত দামি। এই প্রজন্মের প্রতিনিধিদের মতোই তরুণীর ডান কানে গোঁজা ব্লু টুথ ইয়ারপ্লাগ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেটার গায়ে জোনাকির মতো এককণা সবুজ আলো ফুটে উঠছে।

নিজেকে নজরকাড়া করে তোলার জন্য খুব বেশি সাজগোজ করতে হয়নি তরুণীকে। ঘোড়ার ল্যাজের মতো করে বাঁধা মাঝারি মাপের রেশমি কালো চুলের অগ্রভাগ আলতো ভাবে হুড়িয়ে রয়েছে পিঠের অনাবৃত অংশে। সামান্য কাজলের ছোঁয়াতেই নয়ন যুগলের মদিরতা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। তরুণীর কিছুটা মঙ্গোলীয় ধাঁচের চোখমুখে এমন একটা চটক আছে যে একবার তার দিকে তাকালে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না।

তরুণী ফুটপাথে পা দেওয়া মাত্রই অজস্র বুতুক্ষু চাহনি চুষকের মতো আটকে গেল তার শরীরে। পিছন থেকে ভেসে এল শিসের শব্দ। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটা চ্যাঁড়া ছেলে তরুণীকে শুনিয়ে নিজেদের মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ কথার আদানপ্রদান করল। কিন্তু সে সব খুচরো ঘটনায় পান্ডা না দিয়ে এগিয়ে চলল মেয়েটা। জড়তাহীন হাবভাব, সাবলীল হাঁটাচলা দেখলে বোঝা যায়, আধুনিক পোশাকের মতো এমন চিরন্তন উপদ্রবগুলোও ক্যারি করতে অভ্যস্ত সে।

জোর কদমে হেঁটে রবীন্দ্রসদন পেরিয়ে একটু থামল মেয়েটা। সেখানে বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসের প্রতীক্ষায়। পোশাক এবং হাতের পটুলি দেখে আন্দাজ করা যায়, ওরা এসেছিল পিজি-তে। হয়তো ওদের প্রিয়জন ভর্তি আছে হাসপাতালে। উদ্বেগ-আশা-স্বস্তি ভরা দিনের শেষে এখন তারা বাড়ির পথে। ডান হাতের চিকন হাতঘড়িটার উপর নজর বুলিয়ে মেয়েটা বাঁক নিল ক্যাথিড্রাল রোডের দিকে। এখন ছুটির মরশুম। মফসসল বা গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে বেড়াতে আসা ভিড়টা হালকা হচ্ছে ক্রমশ। নাগরিক আড্ডাগুলো জমাট বাঁধছে অ্যাকাডেমি, নন্দন, রবীন্দ্রসদন চত্বরে। বাতিস্তত্ত্বের আলোয় বলমল করছে ক্যাথিড্রাল রোড। গাড়িগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে শীতের রাতপথ। অনেকটা হেঁটে এসে ফুটপাথের জনবিরল জায়গায় থামল মেয়েটা। একটা বুপড়ি গাছের কল্যাণে এখানে আলো কম।

রাস্তার উলটোদিকে মোহর কুঞ্জের পাশ দিয়ে পরস্পরের গায়ে লেপটে হেঁটে চলেছে দুটো ছেলেমেয়ে। তাদের দিকে একদৃষ্টি কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের

করল মেয়েটা। তারপর ফিল্মি কায়দায় সিগারেট জ্বালিয়ে বাতাসে উগড়ে দিল একরাশ ধোঁয়া। কিছু ক্ষণ অলস ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকার পর সিগারেটে আবার একটা লম্বা টান দিয়ে আলতো ভাবে বাঁ দিকে চোখ ফেরাল মেয়েটা। শিশির মঞ্চের সামনে থেকেই তার পিছু নিয়েছে ছেলেদুটো। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ওদের মুখাবয়ব স্পষ্ট নয়, তবে দুটো ছেলেরই উচ্চতা, পোশাক একইরকম। স্কিন-টাইট জিন্সের উপরে লেদার জ্যাকেট। একজনের হুডি মাথার উপরে তোলা।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার সিগারেটে মন দিল মেয়েটা। হুডি ছেলেটা পায়ে পায়ে তার কাছে এসে জিঙ্গেস করল, “লুকিং ফর বিজনেস?”

অনেকটা ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে নেতিবাচক মাথা নাড়ল তরুণী। স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পরেও চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না ফণাধারীর মধ্যে। তরুণীর থেকে কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে সে নিজেও একটা সিগারেট ধরাল। দ্বিতীয় ছেলেটা এগিয়ে এসে তাকে ধূমপানে সঙ্গ দিতে শুরু করল।

আরও কয়েকটা আয়েসি টানে সিগারেট শেষ করে আঙুলের টোকায় সেটা ছুঁড়ে ফেলে থিয়েটার রোডের দিকে এগোতে শুরু করল তরুণী। সামনে বিড়লা তারামণ্ডল। তরুণী সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের সামনের রাস্তায় পা রাখা মাত্রই একটা কালো রঙের বিদেশি গাড়ি ব্রেক কষল তার পাশে। খুলে গেল পিছনের দরজা। হতচকিত তরুণী কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যাকেট পরা ছেলে দুটো পিছন থেকে দৌড়ে এসে তাকে জাপটে ধরে ঢুকে পড়ল গাড়ির ভিতরে। দরজা বন্ধ হয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি!

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। রাস্তায় উপস্থিত অল্প দু'চারজন দৃশ্যটা দেখে চোঁচিয়ে উঠল। একজন চেষ্টা করল পিছন থেকে আসা গাড়িগুলোকে হাত দেখিয়ে থামাতে। আবেদনে সাড়া দিল না কেউ। একটা মেয়ে চোঁচাতে-চোঁচাতে ছুটে গেল থিয়েটার রোডের দিকে। সম্ভবত কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের খোঁজে। রাস্তার ধারে বসে ভেলপুরি বিক্রি করা মাঝবয়সি মানুষটা ফোন বের করলেন। সময়মতো পুলিশকে খবর দিতে পারলে, মেয়েটার কোনও বিপদ হওয়ার আগেই গাড়িটাকে আটকানো সম্ভব। কিন্তু সকলকে অবাক করে সামান্য কিছুটা এগিয়েই থমকে গেল গাড়ি!

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে রাস্তায় নেমে ফুটপাথে বসে পড়ল হুডি এবং তার সঙ্গী। স্ট্রিট ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট, দু'জনের উরুই ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ইতিমধ্যে সামনের দরজা খুলে নেমে এসেছে ড্রাইভার। তার পিছনে পিস্তল হাতে তরুণী। মাথার পিছনদিকে হাত বুলোতে বুলোতে ড্রাইভারও বসে পড়ল ছেলেদুটোর পাশে। কয়েকজন অত্যাশঙ্কিত এগোতে যাচ্ছিল গাড়ির দিকে। তরুণী হাত তুলে থামিয়ে দিল তাদের। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একটা গাড়ি গতি কমিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল কী চলছে। এক বাইক আরোহী রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলফোন তাক করেছিল ঘটনাটা ক্যামেরাবন্দি করার জন্য। তরুণীর পিস্তলধরা হাতের ইশারায় দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করল তারা!

মিনিট কয়েকের মধ্যেই পুলিশ জিপ পৌঁছে গেল ঘটনাস্থলে। জিপ থেকে চারজন কনস্টবল নেমে ড্রাইভার এবং ছেলে দুটোকে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরালো। তারপর তাদের টেনে-হিঁচড়ে তুলল জিপের পিছনদিকে। মহিলা কনস্টেবলের আনা ট্র্যাকশন এবং জ্যাকেটের খোলসে দ্রুত নিজেকে ঢেকে নিয়ে তরুণী গিয়ে বসল কালো গাড়ির ড্রাইভারের সিটে। গাড়ি এগিয়ে চলল পিজি-র দিকে। পুলিশের জিপ অনুসরণ করল সেটাকে।

আতঙ্কের পথ-নাটিকার এমন অভাবনীয় সমাপ্তি দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল জটলাগুলো। মাঝবয়সি ভেলপুরি বিক্রেতা পসরা গোটাতে শুরু করলেন।

সিয়ারিং ধরার আগেই নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করেছিল তরুণী। ওই প্রাপ্ত সাড়া দিতেই সে বলল, “অপারেশন সাকসেসফুল স্যার, তিনটে কালপ্রিটকেই তুলে নিয়েছি। ওদের গাড়িটা সিজ করেছি। আই ওয়াজ

ফোর্সড টু শাউট, তবে সিরিয়াস কিছু নয়। আই শাউট বোথ অফ দেম ইন দ্য লেগ। এখন পিজি-তে নিয়ে যাচ্ছি, মনে হয় অ্যাডমিট করতে হবে।”

“এক্সপ্লেন্ট জব চিত্রা, উই আর প্রাউড অফ ইউ! বাস্টার্ডগুলোকে অ্যাডমিট করিয়ে ঝটপট অফিসে চলে এসো। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট এসেছে, ইউ হ্যাভ টু গো অন আ স্পেশাল মিশন! এদিকের ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করে আজ রাতেই তোমাকে একবার লালবাজারে যেতে হবে। এ সি পি পুলক মুখোপাধ্যায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।”

ড্যাশবোর্ডের টাইমপিসের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল চিত্রা। বিপাশাকে সময় দেওয়া আছে ন’টায়। এখানেই বেজে গেল আটটা দশ। আজ কপালে মদিরা-সুখ নেই। এমনটা প্রায়ই হয়। অনেক হিসেবনিকেশ করে প্রোগ্রাম তৈরি করার পরে হুট করে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে যায়। তখন বিনোদন দূরের কথা সামান্য নাওয়াখাওয়ার সময়টুকু মেলে না। পুলিশের চাকরিই এমন, দায়িত্ব পালনের তাগিদে ব্যক্তিগত পরিসর হারিয়ে যায় প্রায়শই।

আজ নিয়ে মোট চারদিন মোহময়ী সাজে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা-সাতটা পর্যন্ত ময়দান এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চিত্রা। কিছুদিন ধরেই পুলিশের কাছে খবর আসছিল, কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলে সন্দের পর রবীন্দ্রসদন, ভিক্টোরিয়া, মোহর কুঞ্জের আশপাশে মেয়েদের বিরক্ত করছে। জনবিরল এলাকায় একলা মেয়ের হাত ধরে টানার একাধিক অভিযোগও দায়ের হয়েছিল ময়দান থানায়। কয়েক দিন ওইসব এলাকায় তীক্ষ্ণ নজরদারি চালিয়েও যখন কাউকে ধরা গেল না, তখন লালবাজারের গুণ্ডামন শাখা সিদ্ধান্ত নিল ‘হানি ট্র্যাপ’ ব্যবহারের। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই চিত্রার এই নিশি সফর। গত তিনদিন নির্বিঘ্নে কেটেছে। কিছু বখাটে ছোকরা আশপাশে ঘুরঘুর করলেও কাছে ঝেঁষতে সাহস পায়নি কেউ। চিত্রা ভেবেছিল আজকের দিনটাও নিরামিষ যাবে। ঘন্টাখানেক ডিউটি করে ছুটি পাবে। তারপর অফিসে গিয়ে পোশাক পালটে সোজা পানশালা। সেখানে অপেক্ষা করবে বিপাশা। কিন্তু মোক্ষম সময়ে শয়তানগুলো হাজির হয়ে ভেঙে দিল সমস্ত প্ল্যান। তবে এটা একদিক থেকে ভালই হল। প্রতিদিন স্বল্প পোশাকে, অজস্র লোলুপ চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছিল না তার। তবে হতে পারে এই স্বস্তি সাময়িক। আবার কখনও কোনও মিষ্টি ফাঁদ পাতার প্রয়োজন হলে ডাক পড়বে চিত্রা বর্মণের। ডিপার্টমেন্টের মহিলা অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী এবং স্মার্ট হিসেবে পরিচিতি আছে তার। এই যে ডি সি সাহেব বললেন তাকে স্পেশাল মিশনে যেতে হবে, হয়তো সেখানেও কোনও হানি ট্র্যাপের ব্যাপার আছে!

সিগন্যাল সবুজ হয়েছে। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে চিত্রা বলল, “হোয়াট কাইন্ড অফ মিশন স্যার, কুড ইউ টেল মি আ লিটল?”

“নো মাই উটার, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। যা বলার পুলক মুখোপাধ্যায়ই বলবেন। তুমি ঝটপট হাসপাতালের কাজ মিটিয়ে একবার অফিস হয়ে লালবাজারে পৌঁছে যাও।”

“অল রাইট স্যার, আয়াম কামিং অ্যান্ড সুন অ্যান্ড পসিবল।”

গাড়ির ভিতরটা গুমোট। বাতাসে তামাকের সঙ্গে উৎকট গন্ধ মিশে রয়েছে। আপাতত এ সি চালু করে লাভ নেই। ভিতরের আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ার আগেই গাড়ি পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। ছেলেগুলো বোধহয় গাঁজা চরস বা ওই ধরনের শুকনো জিনিসের নেশা করে। মেডিক্যাল টেস্টে সেটা ধরা পড়লে ভালই হয়। অ্যাসল্ট অ্যান্ড মাল্টিসিংয়ের সঙ্গে ইললিগ্যাল ড্রাগ স্মাগলিংয়ের সেকশন জুড়ে দেওয়া যাবে। সাধারণত পয়সাওলা বাপের বিগড়ে যাওয়া ছেলেগুলো এই ধরনের খুচরো ক্রাইম করে থাকে। আট্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে পারলে বেশ কয়েক বছরের হাজতবাস নিশ্চিত।

ডি সি ফোন রাখার পর উইন্ডো বাটন টিপে চারটে জানলার কাচই নামিয়ে দিল চিত্রা। অনেক ক্ষণ খোলা জায়গায় কাটানোর পরে এমন গুমোট পরিস্থিতি অসহনীয়। কাচের বাধা সরতেই একঝলক তাজা বাতাস রাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির ভিতরে।

সিগন্যাল আবার লাল। গাড়ি থামিয়ে ফোনটা তুলে নিল চিত্রা। বিপাশাকে অপেক্ষা করতে বলার কোনও মানে হয় না। স্পেশাল

মিশনের মিটিং সাধারণত লম্বা হয়। আজ নিশ্চিতভাবেই মিটিংয়ের পরে পাবে যাওয়ার মতো সময় থাকবে না। খানাপিনা সেরে বিপাশা বরং ঝটপট বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ুক। কাল রবিবার হলেও ছুটি নেই ওর, ভোরবেলা উঠে কলকাতার বাইরে ছুটতে হবে অফিসের কাজে।



বছরের এই সময়ে বাজার করে কিছুটা শান্তি। আলু সস্তা হয়। কপি, কড়াইশুঁটি, পালংশাক, মুলো, গাজর, শসা, ধনেপাতার মতো শাকসবজি নাগালের মধ্যে থাকে। বাজার সেরে বেরিয়ে প্রলয় দাস দেখল তিনশো টাকার মধ্যে পড়ে আছে মাত্র সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা। মানে শাকসবজি আর মাছ মিলিয়ে দুশোর বেশি গলে গিয়েছে। খরচটা দেড়শোর মধ্যে রাখতে পারলে ভাল হত। এখন বাকি টাকায় চা, চিনি, নুন, সরষের তেল...এই চারটে জিনিস ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। আসল কথা দশ-বারো দিন পরে বাজার করার সুযোগ পেয়ে একটু বেহিসেবি হয়ে পড়েছিল সে। মাছটাও ছিল টাটকা, জলের মধ্যে লাফাচ্ছিল! দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি। গোটা চারকেই ওজন হয়ে গেল পাঁচশো। এককালে তার নিজের পুকুরেই এমন মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু পরিচর্যার অভাবে পুকুরটা আর মাছ চাষের উপযোগী নেই, কচুরিপানা, আগাছায় ছেয়ে গিয়েছে। আজ সব ঠিকঠাক চললে মাছ কেনার জন্য অতগুলো টাকা খরচ করতে হত না তাকে। এই টানাটানির সময়ে প্রায় একশো টাকা খরচ করে মাছ কেনা তার পক্ষে বাড়াবাড়ি বটে!

তবে নিজের জন্যে নয়, প্রলয় দাস খরচটা করেছে কল্যাণীর কথা ভেবে। গ্যাস্ট্রিক আলসার ধরা পরার পর ডাক্তার বলেছিল কল্যাণীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। প্রতিদিন সকালে একটা করে ডিমসিদ্ধ, কলা, পাতলা সূজি। দুপুরে বা রাতে মুরগির মাংসের সুপ। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন মশলা ছাড়া মাছের ঝোল। শৈলেনের কাজকর্ম যতদিন ঠিকঠাক চলছিল পথ্য জোগাড় করতে সমস্যা হয়নি, কিন্তু কোম্পানি বন্ধ হওয়ার পর থেকেই সব গোলমাল হয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাতে ছেলেটা ঘরছাড়া হল। তার পর থেকে উপযুক্ত পথ্য দূরের কথা, প্রয়োজনীয় ওষুধটুকুই জোগাড় হয় না সময়মতো। তবে আজ খরচ বেশি হলেও চিন্তা নেই। মাছ, শাকসবজি যা কেনা হয়েছে তা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে হুণ্ডাখানেক চালিয়ে নেওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন বাকি জিনিসগুলো নিয়ে। কোনটা ছেড়ে কোনটা কেনা যায়! নুন-তেল না হলে রান্না হবে না। একটু চা লাগবে। টাকাগুলো যত্ন করে পকেটে পুরে বাজার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল প্রলয় দাস। বাজারের থলেটা বেশ ভারী, হাত টনটন করছে। এখান থেকে হেঁটে না গিয়ে টোটো নিলে ভাল হত। কিন্তু টোটোর ভাড়া পনেরো টাকা। এই দুর্দিনে অতগুলো টাকা খরচ করা বিলাসিতা। বরং ওই টাকায় সস্তার চা পাতা কিনলে শীতের সকালগুলো একটু আরামদায়ক ঠেকবে।

স্কুল রোডে ঢুকে পোস্ট অফিস পর্যন্ত গিয়েই থামতে হল প্রলয় দাসকে। উলটোদিক থেকে সাইকেলে করে আসছিল নীলমণি বিশ্বাস। প্রলয় দাসকে আসতে দেখে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল সে। সাতসকালে নীলমণির মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে ছিল না প্রলয় দাসের। বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছোকরার। তাছাড়া উন্মানিমূলক কথাবার্তা বলে লোক খ্যাপাতেও ওস্তাদ সে।

বাজারের থলেটা ডানহাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল প্রলয় দাস। শীতের সকালে রাস্তায় এখন মানুষের সংখ্যা কম। তবে আস্তে-আস্তে ভিড় বাড়বে। ছেলেরা ব্যাট-বল নিয়ে হাজির হবে পোস্ট অফিসের সামনের মাঠে। সেলুনের সামনে ঠাসাঠাসি করে বসে সব কাগজ পড়বে। নীলমণি অধ্যায় সেই

পর্যন্ত যেন না গড়ায়!

সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে প্রলয় দাসের সামনে দাঁড়িয়ে নীলমণি বলল, “কাকা কি বাজার করতে গিয়েছিলেন?”

শুকনো হেসে প্রলয় দাস বলল, “মানে ওই আর কী! তোমার কাকিমার শরীর তো ভাল না, গেছলাম একটু টাটকা সবজি যদি পাই!”

কোনও ভদ্রলোক কখনও যা করবে না সেটাই করে বসল নীলমণি। ঝুঁকে পড়ে বাজারের থলেটা হাতড়াতে শুরু করল। পালংশাকের আঁটিটা তুলতেই বেরিয়ে পড়ল মাছের প্যাকেট। ব্যঙ্গের হাসি হেসে নীলমণি বলল, “মাছও তো কিনেছেন দেখছি। সবই ঠিকঠাক চলছে শুধু গরিবের পয়সাগুলো ফেরত দেওয়ার বেলায় মুখ শুকনো!”

গলা শুকিয়ে কাঠ প্রলয় দাসের। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেও কোনও শব্দ বেরল না তার মুখ থেকে। নিরুপায় হয়ে দু’একবার ঢোক গিলল সে। বিড়ি ধরিয়ে একমুখ খোঁয়া ছেড়ে নীলমণি বলল, “ছেলের কোনও খোঁজ পেলেন, অনেক দিন তো হতে চলল, এখনও কোনও খবর পাননি বলতে চান?”

কোনও রকমে প্রলয় দাস বলতে পারল, “বিশ্বাস করো বাবা, শৈলেন কোথায় আমি জানি না। থানায় গেছলাম, ও সি ডায়রি নিতে চাইল না। তোমরা সবাই পঞ্চায়েতে বলে কয়ে একটু যদি থানায় ফোন করতে পারতে!”

“চুউউউপ হারামজাদা! নাটক হচ্ছে? সাতসকালে নাটক হচ্ছে? বাপ-বোটা মিলে নাটক করে সবার টাকা হাপিস করে এখন পঞ্চায়েত দেখিয়ে ঢং মারানো হচ্ছে! আপনি ঠিক জানেন শৈলেন কোথায় আছে! রোজ প্যাকেট-প্যাকেট বাজার হচ্ছে, দু’বেলা মাছ মাংস সাঁটানো হচ্ছে আর টাকার কথা বললেই চোখ উলটানো! এসব চালাকি আমরা বুঝি না ভেবেছেন! আপনাকে এক সপ্তাহ সময় দিলাম। ছেলেকে ফোন করে বলে দিন সামনের রবিবারের মধ্যে যেন ফিরে এসে সবার টাকা মিটিয়ে দেয়!”

একটু আগেও রাস্তায় লোকজন বিশেষ ছিল না, এখন উলটো ছবি। বাজার করতে যাওয়া মানুষজন ছুটির সকালে বিনি পয়সার রগড় দেখার আশায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাছতলার সেলুনওলা হাতের কাজ থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। শরমে মরে যেতে-যেতে একবার জমায়েতের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল প্রলয় দাস। ভিড়ের মধ্যে ভানু রয়েছে। প্রতুল মাস্টারের বউকেও যেন দেখা গেল একঝলক! ওরা উত্তরপাড়াতেই থাকে। তার এই হেনস্থার খবর গাঁয়ে রটতে সময় লাগবে না। কথা গড়াতে-গড়াতে একসময় কল্যাণীর কানেও উঠবে। রুগণ মানুষ এই খবর শুনে আরও ভেঙে পড়বে। খুচরো অশান্তির খবরগুলো এতদিন নিজের মধ্যেই চেপে রেখেছিল প্রলয় দাস। আর বোধহয় সেটা সম্ভব হল না!

ভিড়ের মধ্যে আরও কয়েকটা পরিচিত মুখ দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করল প্রলয় দাস। কয়েকবার রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তাগাদা দিলেও এমন কর্দ্য ভাষায় আগে কখনও আক্রমণ করেনি নীলমণি। সবচেয়ে আশ্চর্যের, রাস্তার মাঝে একজন বয়স্ক মানুষকে হেনস্থা হতে দেখেও কেউ ব্যাপারটা মিটমাট করতে এগিয়ে আসছে না!

কথাগুলো বলে সাইকেলে উঠে চলেই যাচ্ছিল নীলমণি। কিন্তু জমায়েতের আকার-আয়তন দেখে বোধহয় উৎসাহ বাড়ল তার। বিড়িতে ফুকফুক করে কয়েকটা টান মেরে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, “সবাই ভাল করে চিনে নিন এই চিটিংবাজটাকে! রেনবো নামে ফেরেবাজ কোম্পানিটার দালালি করত ওর ছেলে। সবাইকে টুপি পরিয়ে, ঢপের পলিসি গছিয়ে মার্কেট থেকে লাখ-লাখ টাকা তুলেছে। ক’দিন আগে রেনবোর মালিকের সঙ্গে ওর ছেলেও পালিয়েছে। এখন এই বাবু বলছে ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই!”

জনমত নিজের দিকে নিয়ে আসার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে নীলমণির। ভিড় থেকে আওয়াজ উঠল-

“শালা বজ্জাং! মাথা ন্যাড়া করে মুখে চুনকালি মাখিয়ে গাঁয়ে ঘোরানো উচিত!”

“দাদুর ধুতি খুলে ল্যাংটো করে বাড়ি পাঠাও!”

“গরিবের রক্ত চোষা! আমার এক কাকা তিন বিঘে জমি বেচে এর ছেলেকে টাকা দিয়েছিল। সব মায়ের ভোগে!”

গুঞ্জন অবিলম্বে কলরবের চেহারা নিল। কোনও উচ্চকিত কণ্ঠ বলে উঠল তার মাসতুতো ভাই অনেক টাকার পলিসি করে ফেরত পায়নি। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্যে জমা রাখা টাকা রেনবোর গর্ভে ঢেলেছে!

বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে সাইকেল থেকে নেমে নীলমণি বলতে শুরু করল, “তাহলেই বুঝুন অবস্থা! আমাদের বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না এদিকে এনার রোজ-রোজ মণ্ডা-মিঠাই! আজও বাবু পাঁঠার মাংস কিনে বাড়ি যাচ্ছেন! বুড়োবুড়ি মিলে রোববার দুপুরে গরম ভাত, চর্বির বড়া আর কচি পাঁঠার মাংস খাবে। কী কাকা, ঠিক বলছি তো!”

কথার শেষে প্রলয় দাসের দিকে এগিয়ে এসে আঙুল দিয়ে তার পেটে আলতো খোঁচা মারল নীলমণি! ভিড়ে থেকে কেউ চোঁচিয়ে উঠল, “মার শালাকে!”

লজ্জায় আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করেছে প্রলয় দাস। বাজারের থলেটা খসে পড়ল হাত থেকে। সতাইই এরা মারধর করবে নাকি তাকে! বয়স্ক মানুষের জন্য একটু সম্মান, এক ছটাক সহানুভূতি নেই কারও মনে!

হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ বলে উঠল, “আপনারা পেয়েছেন কী! একটা বুড়ো মানুষকে রাস্তার মাঝে একলা পেয়ে হয়রান করছেন! জানেন এটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স! পুলিশ জানতে পারলে আপনারদের সবাইকে জেলে পুরবে!”

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল। নীলমণি রাস্তায় একদলা থুথু ফেলে বলল, “আপনি কোথাকার কোন জজ ম্যাজিস্ট্রেট এসে গেলেন দিদিভাই, চোরের বাপের হয়ে ওকালতি করছেন! দেখে তো মনে হয় কলেজে পড়েন। যান নিজের কাজ করুন গিয়ে। আর তা না হলে ওর ছেলে যে টাকা মেরেছে সেটা ফেরত দিয়ে তারপর জ্ঞান ঝাড়া! ছঃ চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই!”

স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড নীলমণির দিকে তাকিয়ে থেকে মেয়েটা বলল, “সেকশন নম্বর থ্রি ফিফটি ফোর অফ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড!”

চোখমুখ কুঁচকে নীলমণি বলল, “মানেটা কী! সাতসকালে কী সব ভাট বকছেন?”

“ছএভার অ্যাসল্টস অর ইউজেস ক্রিমিন্যাল ফোর্স টু এনি উয়োম্যান ইন্সট্যান্ডিং টু আউটরেজ অর নোয়িং ইট টু বি লাইকলি দ্যাট হি উইল দেয়ার বাই আউটরেজ হার মডেস্টি, শ্যাল বি পানিশড উইথ ইন্সপ্রিজনমেন্ট অফ আইদার ডেসক্রিপশন ফর আ টার্ম হুইচ মে নট বি লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার বাট হুইচ মে এক্সটেন্ড টু ফাইভ ইয়ারস অর উইথ ফাইন অর বোথ!”

সিস্কের মতো মসৃণ ইংরেজিতে কথাগুলো উচ্চারণ করে জ্যাকেটের পকেট থেকে মুঠোফোন বের করল মেয়েটা। তারপর নীলমণির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, “আমার এই কথাগুলোও যদি ভাটের বুকনি মনে হয় তবে কাইন্ডলি অল্প কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন। স্বরাপনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ সমরেশ পাল এখানে এসে আপনাকে কথাগুলোর মানে বুঝিয়ে দেবেন!”

নেলপালিশ চর্চিত আঙুল খেলা করতে লাগল মুঠোফোনের পরদাজুড়ে। মুখ শুকিয়ে আগেই আমসি হয়ে গিয়েছিল নীলমণির। কোনওমতে লাফিয়ে সাইকেলে উঠে প্রাণপণে প্যাডেলে চাপ দিল। করুণার চোখে অপসূয়মাণ সাইকেল আরোহীকে কিছু ক্ষণ জরিপ করে ভিড়ের দিকে তর্জনী বুলিয়ে উচু গলায় মেয়েটা বলল, আপনারদের মধ্যে যাদের বাড়ি ফেরার তাড়া নেই তারা একটু দাঁড়িয়ে যাবেন প্লিজ। এখনই পুলিশ আসবে। এই বয়স্ক মানুষটাকে রাস্তার মাঝে হারাসমেন্ট করা হয়েছে সেই ঘটনার কয়েকজন সাক্ষী চাই!”

যত তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধেছিল তার চেয়েও দ্রুত উবে গেল জমায়েত। চায়ের কাপ হাতে যারা মজা দেখছিল, বাকি চা-টুকু শেষ করে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল দাম মেটাতে। হঠাৎ নিজের কাজে ভীষণ মনযোগী হয়ে পড়ল নাপিতভাই!

কান থেকে ফোন নামিয়ে বাজারের থলেটা তুলে মেয়েটা বলল, “চলুন কাকাবাবু, আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই। কত দূরে আপনার

বাড়ি, হেঁটে যাওয়া যাবে নাকি একটা টোটে নেব?”

চোখ বাপসা হয়ে গিয়েছিল প্রলয় দাসের। পাঞ্জাবির হাতায় জল মুছে বলল, “তুমি কে মা, আগে তো কোনওদিন দেখিনি তোমাকে!”

“না দেখারই কথা। আমি বিপাশা। থাকি কলকাতায়। কাছাকাছি এসেছিলাম একটা কাজে। যার সঙ্গে মিট করব তিনি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আমাকে দশটার আগে সময় দিতে পারবেন না। তাই আপনাদের গ্রামটা একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। এমন অফুরন্ত এলোমেলো সবুজ আমার ভাল লাগে। আমাদের কলকাতায় তো এমন হয় না, সেখানে সব আর্টিফিশিয়াল ব্যাপার...আপনার বাড়ি টোটে না হাঁটাপথ?”

অর্ধেকের কাছাকাছি রাস্তা চলে এসেছিল প্রলয় দাস। বাকি রাস্তাটুকু অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যায় কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গাটা ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে সে। আশপাশের কৌতূহলী নজরগুলো কাঁটার মতো বিধছে তাকে। বলল, “টোটে। টোটে করেই যাওয়া যাক। তুমি শহরের মানুষ, অতটা রাস্তা হাঁটতে পারবে না। কিন্তু মা, টোটে ধরতে গেলে ওই স্কুল বাড়িটার সামনে যেতে হবে। এই রাস্তায় টোটে আসে না।”

“বেশ তো তাই চলুন।”

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে টোটে স্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়াল বিপাশা। একটু ইতস্তত করে প্রলয় দাস বলল, “কিন্তু মা, তুমি যে বললে পুলিশ আসছে, আমরা এখান থেকে চলে গেলে যদি...”

ঘুরে দাঁড়াল বিপাশা। দুটু হাসি ঝিলিক দিল তার চোখের তারায়। পিছিয়ে এসে প্রলয় দাসের পিঠে হাত রেখে সে বলল, “আগে বাড়ি চলুন। বাকি কথা সেখানে গিয়ে হবে।”



“না হে, এ শুধু আগুন, তরল আগুন কিংবা লেপ কাঁথার কন্ম নয়, এই হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে লড়াই করার সবচেয়ে ভাল দাওয়াই অন্য আগুন।”

গ্লাস ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল শৈলেনের। ভরতে-ভরতে আগ্রহী গলায় প্রশ্ন করল, “অন্য আগুন? সেটা কীরকম?”

এই কথার সরাসরি উত্তর দিল না খোকনদা। রহস্যময় হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণায়। গায়ের চাদরটা একটু হালকা করে প্রশ্ন করল, “বয়স কত হল তোমার?”

গ্লাসে ছোট চুমুক দিয়ে শৈলেন বলল, “থার্টী গ্লাস। সামনের জুলাইয়ে একত্রিশ পূর্ণ হবে।” বিজ্ঞের মতো ঠোঁট চেপে হেসে, সামনে পিছনে মাথা দুলিয়ে খোকনদা বলল, “তবেই বোঝা! জীবনের অর্ধেক খতম হতে চলল, অথচ কত কিছু অজানা থেকে গেল। এই খোকনদা না থাকলে বোধহয় আজও তরল আগুনের স্বাদ অজানা থেকে যেত তোমার।”

কথাটা সত্যি। অনেক সাধাসাধি করেও বন্ধুরা কখনও তাদের মদের আসরে বসাতে পারেনি শৈলেনকে। আসল কথা শৈলেনের ছোটবেলায় পাড়ায় এক মাতাল ছিল। প্রতিদিন রাতে বেসুরো গান গাইতে-গাইতে বাড়ি ফিরত সে। কোনও কোনও দিন পড়ে গিয়ে নাক-মুখ ফাটিয়ে রক্তাক্ত কলবরে। ওই সময় তাকে দেখে শৈলেনের মনে হত, ওসব অখাদ্য কুখাদ্য মানুষ খায় কেন! মদের প্রতি বিতৃষ্ণাটা তখন থেকেই গোঁয়ে গিয়েছিল মনে। পরে অফিস পাটি অথবা বনভোজনে মদের গোঁয়ারা ছোট্টার সময় হলে টুক করে সেরে পড়ত সে।

গল্পটা পালটে গেল এখানে আসার পর এক বৃষ্টিভেজা রাতে। সেদিন সন্ধে থেকে মুঘলধারে বৃষ্টি, উঠোনে বসে আরাম করে হাত-পা সঁকার সুযোগ নেই। কোনওমতে ভেড়ির কাজ শেষ করে এসে নিজের

তক্তপোষে শুয়ে কাঁপছিল শৈলেন। বালিশ-বিছানা-লেপ-কন্মল বরফ ঠান্ডা। সোয়েটার, মাফলারও তৈখবচা সবকিছু গায়ে চাপিয়েও শীত ঠেকানো যাচ্ছে না, বৃষ্টির দাপটও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। সঙ্গে, থেকে-থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি, তুমুল শব্দে বজ্রপাত।

ছোটবেলায় এমন ঝড়বৃষ্টির রাতে শৈলেনের মনে হত, দুর্ঘোণ বোধহয় কোনওদিন থামার নয়। এই ভাবে ঝড় বৃষ্টি, বাজ পড়া চলতে চলতেই একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। গ্রাম-শহর-দেশ-বিশেষ যেখানে যত মানুষ আছে সবাই মারা পড়বে। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে জনলার সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বময়ের সীমা থাকত না তার। উঠোনের সজনে গাছের একটা বড় ডাল ভেঙেছে, গোয়ালঘরের সামনের চালাটা হেলে পড়েছে, কিন্তু বাকি সব ঠিকঠাক। গোপালজ্যাঠাদের বাড়ি থেকে তেলে আসছে কীর্তনগান। নারানের মা ঝুড়ি ভর্তি হাঁস-মুরগির ডিম নিয়ে বেচতে চলেছে বাজারে। ইদ্রিসকাকা ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত ঘঁষছে। তাদের গাইটা বাছুরসহ মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। মানে প্রতিদিন যা-যা হয়, আজ সকালেও নিয়ম করে ঘটছে সবকিছু! তাহলে গত রাতের ঝড়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়নি! শৈলেন, তার মা-বাবা এবং গ্রামের সবাই বেঁচে আছে।

আনন্দে লাফাতে-লাফাতে কাজে হাত লাগাত শৈলেন। ঝুঁয়োপোকাকার ছোঁয়া বাঁচিয়ে ভেঙে পড়া সজনের ডাল থেকে ডাঁটা তোলা, চালা ঠিক করার কাজে বাবাকে সাহায্য করা, হাফ প্যাডেলে সাইকেল চালিয়ে টালিখোলা থেকে টালি কিনে আনা, এমনই কত কাজ তখন তার সারাদিনে!

সেই রাতে মুহুমুহু বজ্রপাতের সময় শৈলেনের মনে হচ্ছিল, গোটা পৃথিবী ধ্বংস না হোক, ভেড়ির পাশের এই ছোট ঘরটা মাটিতে মিশে গেলে বেশ হয়। নিদেনপক্ষে ঘরের ফাঁকফোকর গলে একটা লকলকে বিদ্যুৎ শিখা নেমে এসে তাকে ঝলসে দিলেও চলবে! নিজের বাড়িতে থেকে বয়স্ক বাবা-মায়ের দেখভাল করার হিম্মৎ যার নেই, প্রেমিকার সামনে অন্তহীন অপেক্ষার প্রাচীর তুলে দেয় যে প্রেমিক, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার তার নেই! বরং একটা বজ্রপাত মুছে দিক সমস্ত যন্ত্রণা!

তবে, নিজের অমন আন্তরিক মৃত্যুকামনার মাঝেও দরজায় দমাদম শব্দ শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল তার। কে এল এই দুর্ঘোণের রাতে? সামনের দিকে দু'দুটা বিশাল ভেড়ি, অগুস্তি আলপথ পেরিয়ে লোকালয় প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। পিছনে ইঁটভাটার বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল। দুয়ারে খিল এঁটে শুয়ে থাকার রাতে এমন পাগুববর্জিত জায়গায় হানা দিল কে!

দরজা খুলে খোকনদাকে দেখে খুব অবাক হয়েছিল শৈলেন। বলেছিল, “এ কী আপনি! ঘন-ঘন বাজ পড়ছে, আর আপনি খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে এতটা পথ হেঁটে এলেন!”

বর্ষাতিটা দেয়ালের ছকে ঝুলিয়ে খোকনদা বলেছিল, “সেই শুরু সময় থেকে এই ভেড়িতে আছি। বাইশ বছর হয়ে গেল প্রায়। কতবার কাজ করার সময় বাজ পড়েছে আমার আশপাশে। এতদিনেও যখন আকাশের বুক চিরে মৃত্যুদূত ধেয়ে আসেনি, তখন ধরে নিতে হবে দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি সদয়। বজ্রপাতে মৃত্যু আমার নয়। বরং সাবধান থাকতে হবে কালাচের ছোবল থেকে। তার জন্য এই ব্যবস্থা!”

চাউস গামবুটের দিকে ইঙ্গিত করে ঘরের এককোণে সেগুলো খুলে রাখল খোকনদা। শোয়ার সময় শৈলেন নাইট ল্যাম্প জ্বালালেও সেদিন ইচ্ছে করেই এলইডি-টা জ্বেলে রেখেছিল। অন্ধকারে শীত লাগে বেশি। শুকনো গামছাটা খোকনদার দিকে এগিয়ে দিয়ে শৈলেন বলল, “মুছে নিন। হাত আর মুখ একদম ভিজ্জে গেছে। মাথার সামনের দিকেও জলের ঝাপটা লেগেছে। এই এলোপাথাড়ি বৃষ্টি কি আর বর্ষাতিতে বাগ মানে! একটু আগুন জ্বালাতে পারলে ভাল হত, হাত-পা খানিক সঁকে নিতে পারতেন। কিন্তু বৃষ্টিতে আগুন জ্বালব কেনম করো!”

জবাবে রহস্যময় হাসি হেসে খোকনদা বলেছিল, “আগুন না পাই তরল আগুন তো রয়েছে, তাই দিয়ে শরীর সঁকব আজ!”

“তরল আগুন?”

শৈলেনের কথার উত্তর না দিয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা

চ্যাপ্টা কাচের বোতল বের করেছিল খোকনদা। শৈলেনের মুখের সামনে বোতলটা পেঁজুলামের মতো দোলাতে-দোলাতে বলেছিল, “এসব একা বসে খেলে তেমন মেজাজ আসে না। ঘরে কাচের গ্লাস আছে? না থাকলে চিনামাটির কাপ হলেও চলবে।”

অল্প ক’দিনে খোকনদা মানুষটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল শৈলেনের কিন্তু তার এই অভ্যাস আছে জানা ছিল না। জানলে মানুষটাকে হয়তো এত ভাল লাগত না। যারা মদ খায় তাদের জন্য মনের মধ্যে একছটাক বিতৃষ্ণা লালন করে শৈলেন!

গামছা দিয়ে ভাল করে গা মুছে একফালি হাত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করল খোকনদা। তারপর তক্তাপোষে আরাম করে বসে বলল, “একি তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? গ্লাস, কাপ যা হোক কিছু নিয়ে চলে এসো।”

একটু রুচ গলায় শৈলেন বলেছিল, “মদ আমি খাই না খোকনদা, আপনি একাই খান।”

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল খোকনদা। বোতলটার গায়ে সম্মেহে হাত বুলাতে-বুলাতে বলেছিল, “কে বলেছে এটা মদ, এ হল ব্র্যান্ডি। পিওর ফলের রস দিয়ে তৈরি। শরীর দুর্বল লাগলে ডাক্তাররা পেশেন্টকে ব্র্যান্ডি খেতে দেয়। তোমার ওই লোকাল ঢোলাই মদ আর এই জিনিসের আকাশ পাতাল ফারাক। এমন ক্লাস জিনিস আমার কাছে এক পিসই ছিল। বৃষ্টি-বাদলায় খাব ভেবে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। একটু আগে বোতল খুলতে গিয়ে মনে হল, আমার ব্রাদারটা একা আছে। তাই ঝড়বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে চলে এলাম তোমার কাছে। দু’তিন পেগ খেলেই শরীর চাঙ্গা হয়ে যাবে, শীতটিত সব পালানোর পথ পাবে না! এসো, গ্লাস নিয়ে বসে পড়ো। সঙ্গে জলের জাগটাও রাখো। আমি এমনিই খাই, কিন্তু প্রথমদিন তোমার মিশিয়ে খাওয়াই ভাল। অভ্যাস হয়ে গেলে তখন না হয়...”

তরল আগুনের মাহাত্ম্য সেদিনই প্রথম টের পেয়েছিল শৈলেন। নেহাত খারাপ ছিল না প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। দু’পেগ পেটে পড়তেই কাজ হয়েছিল ম্যাজিকের মতো। হাত পায়ের অসাড় ভাব দূর হয়ে এক অদ্ভুত তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শরীর জুড়ে। সেদিন রাতে ঘুম হয়েছিল চমৎকার। পরদিন উঠতে একটু বেলা হয়েছিল। বুলবুলিরা ফিরে গিয়েছিল খাবার না পেয়ে। তার পর থেকে শীতের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আগুন না জ্বেলে মাঝেমাঝেই তরল আগুনকে হাতিয়ার করে শৈলেন। কিন্তু এই দুই আগুনের বাইরে অন্য আগুনও আছে নাকি! কেমন সে আগুন!

শৈলেন জানতে চাইতেই আবার রহস্যময় হাসি হেসে খোকনদা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, “বলি বিয়ে-খা তো করোনি জানি, কিন্তু একটা গার্লফ্রেন্ডও কি জোটাতে পারোনি এতদিনে? তোমার মতো সুস্থ সবল একটা ছেলে এই বয়সেও নারীর আগুনের আঁচে শরীর-মন সঁকেনি একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়!”

শুধু খোকনদা কেন, চেনা পরিচিত সকলেরই কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। দশ বছর ধরে যে ছেলের স্টেডি গার্লফ্রেন্ড রয়েছে, সে কখনও নারী শরীরের স্বাদ পায়নি, একথা বিশ্বাস করা যায়? অথচ সেটাই সত্যি! উত্তরপাড়ায় শৈলেনদের বাড়ির কাছেই চক্কোভিদের ঘাট। সেই ঘাট পেরিয়ে এক কিলোমিটার মতো এগোলে নদীর পারে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাঁশঝাড়। সারা বছর নতুন বউয়ের ঘোমটার মতো বাঁশগুলো বুলে থাকে নদীর বুকে। সেখানে তীরে বসে নদী-নৌকা-মানুষ-পানকৌড়ি দেখতে-দেখতে গড়িয়ে যায় বেলা। নির্জন বিকেলে বহুবার অক্ষিতাকে নিয়ে সেখানে গিয়েছে শৈলেন। হাতে হাত রেখে বসে থেকেছে অনেক ক্ষণ। অন্য কিছু করার কথা কখনও মনে আসেনি। নিজের মুঠির ভিতরে অক্ষিতার নরম হাতটা পেলেই শৈলেনের মনে হত, স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছে সে!

খোকনদা বলে চলল, “একবার চেখে দেখো সেই আগুন। গ্যারান্টি দিচ্ছি, তরল আগুনের চেয়ে কোনও অংশে কম এনজয়েবল হবে না সেই অভিজ্ঞতা! একবার সেই নেশার স্বাদ পেলে তোমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট জীবনটা কালারফুল হয়ে উঠবে! এই যে আমি, আমাকেই দেখো না, পকেটে একটা ব্যাচেলর অফ কমার্স ডিগ্রি আছে। তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে কালারের ছোবল, রাতবিরেতে ডাকাতের গুলি খাওয়ার

ভরপুর আশঙ্কা নিয়ে এখানে পড়ে আছি কিসের মোহে? টাকা? নাহঃ, আমার যা এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন, তাতে ভাল জায়গায় একটা কাজ জুটিয়ে নিতেই পারি। স্যালারিও সেখানে বেশি পাব। কিন্তু যতদিন খাটাখাটনির ক্ষমতা থাকবে, এই শর্মা এই ভেড়ি ছেড়ে কোথাও নড়বে না! কেন নড়বে? এখানে কথায়-কথায় বউয়ের দাঁতখিচুনি নেই, বাচ্চা মানুষ করার হ্যাপা নেই, ঘড়ির কাঁটা মেনে সব কাজ সারার দায় নেই। মাসে একবার মালিক আসে হিসেব বুঝে নিতে। সকালে এসে দুপুরে মাছভাত খেয়ে সঙ্গে নামার আগেই কেটে পড়ে। শত অনুরোধেও রাতে থাকতে রাজি হয় না এখানে। কেন থাকবে! পয়সাওলা মানুষ সে। সাপের ছোবল, ডাকাতের গুলিতে খরচ করার মতো সস্তা নাকি তার প্রাণ! ওই একটা দিনের কয়েক ঘণ্টা আমাকে একটু সামলে থাকতে হয়, মাসের বাকি দিনগুলোয় অপার স্বাধীনতা! কে যাবে এমন সোনার জায়গা ছেড়ে!

খানিক ক্ষণ জিরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিয়ে খোকনদা বলল, “তোমারও তো আমার মতোই পের্চোয় ধরা লাইফ। যা তাল বাঁধিয়েছ তাতে সারা জীবনে নিজের গ্রামে ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই বলি, তরল আগুনের মত অন্য আগুনকেও আপন করে নাও। এই তেপান্তরের মাঠটাই তখন স্বর্গ মনে হবে! কাজে উৎসাহ পাবে, জীবনের একটা মানে খুঁজে পাবে। শুধু বুলবুলি পুষে কি আর দিন কাটে!”

“কিন্তু এখানে কোথায় পাব অন্য আগুন!” স্বভাববিরুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে ফেলল শৈলেন। যেন সে নয়, তার ভিতর থেকে কথাগুলো বলে উঠল অন্য কেউ!

খুশিতে শিস দিয়ে উঠল খোকনদা। বলল, “এই তো বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছে ব্রাদার, তুমি রাজি থাকলে আজ রাতেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে! শ’তিনেক টাকা কনট্রিবিউট করতে পারবে? তাহলে আমার পকেটের উপর চাপ কমবে! বাই ওয়ান গেট ওয়ান পলিসির কথা তো শুনেছ, ওই স্কিম এখন এই লাইনেও চালু হয়ে গিয়েছে!

“আজ রাতেই! সম্ভব?”

প্রশ্ন করতে গিয়ে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল শৈলেনের গলা। মোবাইলে দু’বার টাকা দিয়ে খোকনদা বলল, “হ্যাঁ সম্ভব। আজ রাত এগারোটো থেকে সাড়ে এগারোটোর মধ্যে। সজাগ থেকো!”

শৈলেন ভেবে রেখেছিল এক, বাস্তবে ঘটল অন্যরকম। শৈলেন মনে-মনে ছবি ঝঁকেছিল, যে আসবে তার পরনে থাকবে ডুরে শাড়ি কিংবা চুড়িদার। সময়টা যখন শীতকাল তখন গায়ে শাল থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাত পৌনে বারোটো নাগাদ দরজায় ঠকঠক শুনে পাল্লা খুলতেই ভারি অবাক হল সে।

জিপের সঙ্গে মেয়েটা পরেছে লেদার জ্যাকেট। মাথায় টুপি মাফলার স্কার্ফ কিছুই নেই। চুলগুলো নকল পাথর বসানো বলমলে হেয়ারব্যান্ডের শাসন অগ্রাহ্য করে কপালে মুখে ঝাপটা মারছে। হাতে উলের দস্তানা। রাস্তার পাশের সস্তা রূপোপজীবীদের চাইতে ঢের অন্যরকম সাজ!

এই মেয়ের এক রাতের চার্জ মাত্র তিনশো টাকা! নাকি তরল আগুন এপিসোডের মতো এটাও খোকনদার চালাকি! শৈলেন ভাবতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা মুখ ভেসে ওঠে তার মনে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় সে।



টুপুরকে পড়ানোর সময়েই ডুগডুগির শব্দ পেয়েছিল অক্ষিতা। শুনে মনে হয়েছিল, কাছাকাছিই বসেছে মাদারিস আসর। বাড়ি ফেরার সময় অক্ষিতা দেখল তার ভাবনাই ঠিক। পোস্ট অফিসের সামনের

ফাঁকা জায়গায় একজোড়া শূঁটকো চেহারার বান্দর নিয়ে হাজির তাদের মনিব। একটা পুরনো অ্যালুমিনিয়ামের থালা থেকে খুঁটে-খুঁটে কিছু খাচ্ছে বান্দরগুলো। তাল্পি দেওয়া ফতুয়া আর লুঙ্গি পরা মাদারি তাদের পিছনে বসে জোরকদমে ডুগডুগি বাজাচ্ছে। সকালবেলা রগড় দেখার আশায় বেশ কিছু লোক হাজির হয়েছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগের চেহারা আর শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছে, বিনা পয়সায় মজা লোটেই তাদের উদ্দেশ্য। খেলার শেষে বকশিস দেওয়ার মতো উদারতা তাদের নেই।

মাদারিকে অনেক জায়গায় ঘুরে খেলা দেখাতে হয়। কোনও জমায়েতে পয়সা মেলে, কোথায় ঠকতে হয়, জানা আছে তার। সেজন্যই দর্শকদের তাগাদা সত্ত্বেও খেলা শুরু না করে একটানা ডুগডুগি বাজিয়ে আরও লোক টানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু কাজের দিন সকাল ন'টায় ক'জন আর বান্দরনাচ দেখতে হাজির হবে!

ইদানিং মাদারির খেলা দেখতে ভিড় করে না ছোটরা। বান্দরের কসরতের চেয়ে মোবাইল কিংবা ল্যাপটপের রকমারি গেমেই তাদের যাবতীয় আগ্রহ। কখনও কখনও সেই আগ্রহ আসক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আজ একটু আগেই তার হাতে গরম প্রমাণ পেয়েছে অঙ্কিতা। পড়ানোর শেষে সে টুপুরকে বলেছিল, “মনে হচ্ছে মাদারির খেলা এসেছে। চল দু'জনে মিলে দেখি গিয়ে।”

আট বছরের মেয়েটা বই গোছাতে-গোছাতে উত্তর দিয়েছিল, “বাবা-মার সঙ্গে রথের মেলায় গিয়ে দেখেছিলাম একবার। ভীষণ বোরিং। ওর থেকে ‘স্নেল বব’ অনেক ভাল!”

শহর দূরের কথা, উত্তরপাড়া এখন পুরোদস্তুর মফসসলও হয়ে উঠতে পারেনি। ইতিউতি কংক্রিটের খাঁচা মাথা তুললেও সবুজের তুলনায় সেই উপস্থিতি নগণ্য। কিন্তু শহর-মফসসলের মতো এখানেও প্রযুক্তি-বিনোদন দ্রুত দখল নিচ্ছে ছোটদের মনোজগতের। কিতকিত-ছোঁয়াছুঁয়ি-কুমিরডাঙার মতো খেলা এখন আর টানে না বাচ্চাদের। এই মোবাইল আগ্রাসন ঠেকাতে না পারলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে গ্রামগঞ্জ থেকেও হারিয়ে যাবে প্রকৃতিঘোঁষা নির্মল শৈশব।

বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল অঙ্কিতার। মাদারির পয়সার থালায় একটা দশ টাকার নোট রেখে সাইকেলে উঠল। দিন কুড়ি হল এখানকার কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে বিক্রয়কর্মীর কাজ জুটেছে তার। গ্রামের মহিলাদের তৈরি নাইটি, চুড়িদার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, পাঁপড়, ধূপকাঠি, আচার বিক্রি হয় সেখানে। কাজটা অস্থায়ী, বেতনও বলার মতো কিছু নয়। তবু কাউন্টারে বসে দশটা-পাঁচটা ডিউটি করে কিছু পয়সা রোজগার হলে মন্দ কী। ওই সময়টা ঘরে বসে থাকলে তো খেয়ে-ঘুমিয়ে মোটা হওয়াই ভবিষ্যৎ!

বাড়ি থেকে কাজের জায়গায় যেতে সাইকেলে অঙ্কিতার সময় লাগে দশ থেকে বারো মিনিট। টোটে কিংবা অটোয় গেলে আরও কম। বাড়ি ফিরে অঙ্কিতা দেখল ন'টা দশ। স্নান সেরে রওনা হওয়ার জন্য হাতে রয়েছে চল্লিশ মিনিট। এই সময়টুকু ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে সে। কোনওদিন কুটনো কেটে মায়ের রান্নার কাজ এগিয়ে রাখে, কখনও বাবার স্নানার সমস্যা বাড়লে উঠোনে দু'বালতি জল রেখে দেয়। রোদে গরম হওয়া জলে স্নান করলে আরাম পায় বাবা।

আজ কুটনো কোটা নেই, দুপুরে দালিয়া হবে। বাবার শরীরও ফিট। খবরের কাগজটা নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল অঙ্কিতা। কিছুদিন যাবত তন্ন তন্ন করে কাগজে একটাই খবর খোঁজে সে। সেই খবরের উপরে নির্ভর করছে তার ভাল থাকা-খারাপ থাকা, তার ভবিষ্যৎ! কিন্তু দেশ-দশের হাজরো খবরের মাঝে কাজিফত সংবাদ কিছুতেই মেলে না। রাতে বাড়ি ফিরে ডিভি দেখতে বসেও বারবার খবরের চ্যানেলে চলে যায়। বিরক্ত হয় মা। বলে, “কী সর্বদা নিউজ চ্যানেল খুলে বসে থাকিস বল তো! দেখগে যা কল্লোল মিত্র টাকা মেরে বিদেশে পালিয়েছে। একবার টাকা মেরে বিদেশে পালিয়ে গেলে কাউকে ফিরিয়ে আনা যায় না। সরকার হাজার চেষ্টা করলেও না। বিজয় মাল্য, নীরব মৌদীর ঘটনা দেখে বুঝতে পারিস না! এবার ওই তালিকায় মিত্রও যোগ হল! দেশসুদ্ধ লোক নিজদের টাকার শোক ভুলে বাস্তবটা মেনে নিয়েছে, এবার তুইও নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু কর। এভাবে অতীত আঁকড়ে পড়ে থেকে নিজেকে তিলে-তিলে শেষ করিস না!”

বাস্তবটা বোঝে অঙ্কিতা। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত

করতে-করতে এগিয়ে চলেছে সে। পথের শেষ কোথায় জানা নেই। আলোর রেশটুকু পর্যন্ত চোখে পড়ছে না এখনও। শৈলেন বাড়ি ফিরলে নতুনভাবে বাঁচার অক্সিজেন পাবে সে, কিন্তু অনেকগুলো শর্তের উপরে নির্ভর করছে তার বাড়ি ফেরা। ধরা যাক পুলিশের হাতে ধরা পড়ল কল্লোল মিত্র। কিন্তু তাতে মানুষের খোয়া যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে? ক্ষমতার বৃত্তে থাকা লোলুপ হাতের নাগাল এড়িয়ে সেই বিপুল সম্পদের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে? গত এক-দেড় বছরে আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধুদের কাছ থেকে রেনবোর হয়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছে শৈলেন। সেই বিপুল টাকা শোধ করতে হলে ভিটে-মাটি চাঁট হয়ে যাবে প্রলয় দাসের!

পাঁচের পাতায় এসে ছোট একটা খবরে চোখ আটকে গেল অঙ্কিতার। রেনবোর কর্ণধার কল্লোল মিত্রকে খুঁজে বার করার জন্য স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ‘সিট’ ইতিমধ্যেই তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়িই কল্লোল মিত্র সহ মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

খবরের সারকথা এটুকুই। পরপর তিনবার খবরটা পড়ল অঙ্কিতা। শৈলেন কি দেখেছে খবরটা? ও যখানে আছে, সেখানে নিয়মিত কাগজ পড়ার সুযোগ আছে? নিরুদ্দেশ হওয়ার রাতে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল শৈলেন। সেই শেষ। তারপর আর তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে, কেমন আছে জানে না অঙ্কিতা। শৈলেনের বাবা-মা এখনও পর্যন্ত ছেলের খোঁজ পায়নি।

চোখের কোণ দিয়ে মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে দ্রুত পাতা ওলটাল অঙ্কিতা। শেষ কয়েকবার শৈলেনের প্রসঙ্গ উঠলেই তিক্ততার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে মা-মেয়ের বাক্যলাপ। সকালবেলা কাজে বেরনোর আগে মায়ের সঙ্গে কোনওরকম অশান্তি করতে ইচ্ছে করছে না অঙ্কিতার। খবরটার দিকে চোখ পড়লেই আবার শুরু হবে মায়ের খিঁচখিঁচানি!

কী আশ্চর্য, আজ অপ্রিয় প্রসঙ্গের ধারকাছ দিয়ে গেল না মা। কাছে এসে অঙ্কিতার মাথায় হাত রেখে মোলায়েম গলায় জানতে চাইল, “কী খেয়ে যাবি আজ, ভাত না রুটি?”

টুপুরদের বাড়িতে জলখাবারটা বরাবরই ভাল দেয়। আজ ছিল লুচি, আলুর দম, পায়ের। পেট ভরে খেয়েছে অঙ্কিতা। দুপুরের আগে খিদে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাগজ থেকে মুখ না তুলে সে উত্তর দিল, “আজ আর কিছু খাব না। টুপুরদের বাড়িতে লুচি হয়েছিল। তুমি বরং টিফিন কৌটো করে দুটো রুটি দিয়ে দিয়ো, খিদে পেলে খেয়ে নেব। আমি চান করে একটা বাতাসা মুখে দিয়ে রওনা হব।”

উত্তর পেয়েও চলে গেল না মা, দাঁড়িয়ে থাকল অঙ্কিতার পিঠে হাত দিয়ে। এবার মুখ তুলে অঙ্কিতা জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলবে?”

একটু ইতস্তত করে মা বলল, “শ্যামবাজার থেকে তোর বাবাকে ফোন করেছিল। ওরা আর অপেক্ষা করতে রাজি হচ্ছে না। দুয়েক দিনের মধ্যেই হ্যাঁ বা না জানাতে বলেছে।

‘ওরা’ অর্থাৎ পাত্রপক্ষ! ছেলেটা সব দিক থেকেই ভাল। বাবা-মায়ের এক ছেলে, সরকারি চাকরি করে। বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পুরনো হলেও শ্যামবাজারের মতো জায়গায় নিজস্ব বাড়ি। শরিকি সম্পত্তি বলে কিছু সমস্যা রয়েছে, সেসব মিটে গেলে বাড়িটা ওরা প্রোমোটরকে দিয়ে দেবে। এক একজন শরিক একটা করে ফ্ল্যাট ছাড়াও মোটা টাকা পাবে। সাধারণ ঘরের ‘কন্যাদায়গ্রস্ত’ বাবা-মায়ের কাছে এমন পাত্র যথেষ্ট লোভনীয়। ছেলের বাড়ি থেকে দু'দফায় এসে দেখে গিয়েছে অঙ্কিতাকে। ওদের সবার অঙ্কিতাকে খুব পছন্দ, এখন ফোন করে মতামত জানতে চাইছে।

মায়ের রকমসকম দেখে এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে সোটা আন্দাজ করেছিল অঙ্কিতা। সকালবেলা কাজের সময় ভাত বা রুটির মতো মামুলি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেনি মা!

একটু রুক্ষ গলায় অঙ্কিতা বলল, “তোমাকে তো আগেই বলেছি, অন্য কোথাও বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!”

গলা চড়ল মায়েরও। খাটের পাশ থেকে সরে এসে অঙ্কিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, “শোন, নিজের ভাল পাগলেও বোঝো! একটা

চিটিংবাজ ছেলে, ততোধিক চিটিংবাজ কোম্পানির হয়ে পাবলিকের থেকে টাকা তোলার পর বিপদে পড়ে পালিয়ে গেছে। একবার নিজের বড়ো বাপ, অসুস্থ মায়ের খবর পর্যন্ত যে নেয় না, বিয়ের পর বউকে সে কতটা সুখে রাখবে বোঝাই যাচ্ছে। লেখাপড়া শিখলে মানুষের বুদ্ধি পাকে। কিন্তু অন্যাস নিয়ে বিএ পাশ করার পরেও কেউ এতটা গাড়ল হয়ে যায় সেটা তোকে না দেখলে বিশ্বাস হত না!”

সময় সর্বোত্তম শিক্ষক। কয়েক মাস আগে এই মা-কেই শৈলেন সম্পর্কে গদগদ হতে দেখেছে অক্ষিতা। যখন শৈলেনদের ছাদ পাকা হচ্ছিল, তখন ওই চিটিংবাজ ছেলেটাই ছিল তল্লাটের সেরা পাত্র। “আজকালকার দিনে শৈলেনের মতো নম্র, ভদ্র ছেলে আর হয় না! পড়াশোনায় তেমন আহামরি না হলেও ছেলের বিষয়বুদ্ধি ভাল। চাকরি পাওয়ার বছর না ঘুরতেই কুঁড়েঘরের জায়গায় কেমন পাকা বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলল। পড়াশোনা করে কে কবে বড়লোক হতে পেরেছে। ওই তো ভট্টাচার্য বাড়ির পল্লব, তিনটে বিষয়ে এমএ। তা এত পড়াশোনা শিখে ছেলে কী করছে? না, গাদাগুচ্ছের টিউশন। ওরম পড়াশোনা করার থেকে না করা ভাল। ছেলেদের আসল গুণ হচ্ছে রোজগার করার ক্ষমতা। শৈলেনের সেই গুণ আছে, ওর উন্নতি ঠেকায় কে! অক্ষিতা মা আমার কপাল করে এসেছিল।” আত্মীয়, পড়শিদের কাছে হবু জামাই সম্পর্কে মাকে এমন জাঁক করতে অনেকবার শুনেছে অক্ষিতা। খারাপ সময় শুরু হতেই হিরের টুকরো ছেলেটা রাতারাতি চোর-চোঁটা-চিটিংবাজ!

বেশ কিছু ঝাঁঝালো উত্তর এসে গিয়েছিল অক্ষিতার জিভের ডগায়, কিন্তু সকালবেলা তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না তার। মেজাজ বিগড়ে থাকলে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রভাব পড়ে। তাছাড়া এই বিষয়ে আগে বহুবাব মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভালবাসা, প্রতিশ্রুতি—এসবের বিশেষ মূল্য নেই মায়ের কাছে। মা বরাবর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাই প্রতিবার একরাস্তা তিক্ততায় শেষ হয়েছে তাদের তর্কযুদ্ধ। কথা না বাড়িয়ে ভাঁজ করা কাগজটা বালিশের তলায় গুঁজে অক্ষিতা এগিয়ে গেল চানঘরের দিকে।



ফোনটা এসেছিল রাত সাড়ে এগারোটো নাগাদ।

ঘুম তখন সবে জমাট বাঁধছিল বিপাশার চোখের পাতায়। সাধারণত রাত এগারোটোর পরে বিপাশার কাছে ক্লায়েন্টদের ফোন বড় একটা আসে না। অবশ্য কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা তেমন দরকার না থাকলেও রাত এগারোটোর পরের সময়টাই বেছে নেয় কথা বলার জন্য। তাদের দ্রুত ডজ দিয়ে অফিস আওয়ারের সময় সারগিতে ছিটকে দেওয়ার টেকনিক জানা আছে বিপাশার।

রাতে মুঠোফোনকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে ঘুমনোর বিলাসিতা সম্ভব নয় বিপাশার পক্ষে। তাদের কোম্পানির অনেক ক্লায়েন্ট বিদেশে থাকে। তারা কখনও কখনও ফোন করে গভীর রাতে। সকালে ঘুম ভাঙার পরে ফোন অন করে আমিরি চালে কর্মদিবস শুরু করতে গেলে কোম্পানির ব্যবসা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা। তাতে যেমন ইনসেন্টিভে বাড়ি অনিবার্য, তেমনিই চাকরিটিও খোয়া যাওয়ার ভরপুর আশঙ্কা!

অচেনা নম্বর থেকে ফোন। বিপাশা রিসিভ করে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে ‘হ্যালো’ বলতেই ও প্রান্তে চিত্রার তাড়া, “পাহাড়ে যেতে চাস কিনা বল শিগগির!”

পাহাড় বরাবরই টানে বিপাশাকে। পাহাড়ের শান্ত, সবুজ বিশালতায় হারিয়ে যাওয়ার মতো সুখ খুব কম বিষয়ের মধ্যেই

খুঁজে পায় বিপাশা। তার উপর পিটার গেমস ফ্যাক্টর তো আছেই! বিপাশার একটা প্রিয় স্বপ্ন আছে। পাথরের খাঁজে গিটার কোলে বসে আছে সে। তার থেকে তারে খেলে বেড়াচ্ছে আঙুল, পাইন বনের আনাচ কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে সূরের মায়াজাল। বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়ি জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝেই অচেনা গন্ধমেশা বাতাস এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে তাকে।

অনেক ক্ষণ বাজানোর পরে কোলের উপর গিটার নামিয়ে রেখে চোখ খুলল বিপাশা। কিন্তু এ কী, তার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে! জ্যাকেট, জিন্স, মাথায় বেসবল ক্যাপ... এ যে স্বয়ং পিটার গেমস!

ঠান্ডার দাপটে পিটারের ফর্সা গালের ত্বক ঈষৎ রক্ষ। হাতদুটো প্যান্টের পকেটে। বিপাশা তার দিকে চাইতেই নিখুঁত ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে পিটার বলে উঠল, “ইনক্রেডিবল! আই হ্যাভ নেভার হার্ড এনিওয়ান প্লে লাইক দিস বেফোর! মে আই টাচ ইয়োর ফিঙ্গারস ম্যাম?”

বিপাশার আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। কলেজ ফেস্টে পিটারকে বাজাতে দেখার পর থেকেই তো মনে-মনে এমন ইচ্ছে পোষণ করে এসেছে সে! পিটার এগিয়ে এসে দুই হাতের মুঠোয় পুরে নিল বিপাশার করপল্লব। সামান্য সময় পরে আগে থরোথরো কণ্ঠে পিটার বলে উঠল, সে হাতে একবার চুষন করতে চায়।

মাত্র একবার? বিপাশা তো চায় অজস্র চুষনে পিটার ভরিয়ে দিক তার সর্বাস্ত! স্টাফ নোটেশনের নিম্প্রাণ আঁকিবুকি প্রাণ পায় যার আঙুলের ছোঁয়ায়, মেয়েদের চোখের ভাষা বুঝবে না সে!

বিপাশার চোখের ভাষা নাকি পিটার গেমসের মেয়েদের মন বোঝার ক্ষমতা, কোনটার জেরে বেশি তার নিম্প্রতির জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। পিটারের উষ্ণ ঠোঁট ছুঁয়ে ফেলল বিপাশার তৃষিত গুণ্ডবুগল!

মেঘলা দিনে পাহাড়ি জঙ্গলে আলো ফুরায় তাড়াতাড়ি। তার উপরে শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছোট ছাতার তলায় কোনওমতে মাথা বাঁচিয়ে সরু পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল বিপাশা আর পিটার। বেশ কিছুটা হাঁটার পরে চোখে পড়ল একটা কটেজ। পিটার এগিয়ে গিয়ে আলতো টোকা দিতেই খুলে গেল কটেজের দরজা। যেন তাদের স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় ছিল ঘরটা।

ব্যারিটোন ভয়েসে, কাব্যিক ঢঙে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পিটার জানতে চাইল, “ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার?”

বৃষ্টির দাপট বেড়েই চলেছে। সঙ্গে কনকনে বাতাসের ঝাপটা। কটেজের সরু একফালি ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না দু’জন। দাঁত-ঠকঠকি লাগছে বিপাশার, পিটারের অবস্থাও করুণ। আরও কয়েকবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি এবং অপেক্ষার পরেও কেউ বেরিয়ে এল না। অগত্যা গৃহকর্তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভিতরে ঢোকা মনস্থ করল তারা। এমন পরিস্থিতিতে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বনবীথি বিলীন হয়েছে অন্ধকারের জঠরে।

ঘরের এককোণে ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের ঠিক পাশেই ছোট টি-টেবিলের দু’পাশে দুটো চেয়ার। উলটোদিকে মনের মতো সব বইয়ে সাজানো বুকশেলফ। কাঠের দেয়ালে বতিচেল্লির ভেনাসের প্রতিকৃতি।

এগিয়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের নিবে আসা আগুন উষ্ণে দিল পিটার। চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের একদম পাশে সরিয়ে নিয়ে বসল বিপাশা। ভিজে জ্যাকেটটা হ্যান্ডারে ঝুলিয়ে এঘর ওঘর ঘুরে এল পিটার। তারা দু’জন ছাড়া কটেজে কেউ নেই!

বুকশেলফের পাশেই ওয়াইন সেলার। সেখান থেকে বিপাশার প্রিয় ব্র্যান্ডটাই বের করে আনল পিটার। তৃতীয় পেগ শেষ করে কিছুটা সুস্থ বোধ করল বিপাশা। পানপাত্রটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ফায়ারপ্লেসের দিকে বুকুে চোখ বুজে পড়ে থাকল সে। কড়া পানীয় এবং গনগনে আগুনের যুগপৎ প্রতিক্রিয়ায় দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে শরীর। মোটা উলের কার্ডিগানটা এবার খুলতে পারলে আরাম হত। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কার্ডিগানের বোতামে হাত রাখল বিপাশা। কিন্তু এ কী, আঙুলগুলো যে তার বশে নেই, বারবার পিছলে যাচ্ছে

বোতাম থেকে। মাত্র তিন পেগেই এই অবস্থা!

উলটোদিকে বসে ঘোর লাগা চোখে বিপাশাকে দেখছিল পিটার।
উঠে এসে গাঢ় গলায় বলল, “প্লিজ অ্যালাও মি টু হেল্প ইউ!”

হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিতে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল বিপাশা।
অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিপাশাকে কার্ডিগানমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করল পিটার।

স্বপ্নটা বারবার ফুরোয় এখানে এসে। ঘুম ভেঙে উঠে কল্লনার তুলি বুলিয়ে বাকিটা পূরণ করে বিপাশা। কিন্তু সে তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। না পাওয়ার ক্ষতে স্বপ্ন যেমন প্রলেপ দিতে পারে, কল্লনা তেমনটা নয়।

বিপাশার উত্তর না পেয়ে তাড়া লাগাল চিত্রা, “ঝটপট বল ইয়ার, কাল আলি মনিং ফ্লাইট। আমি বুক করার পরে আর মাত্র দুটো সিট পড়ে আছে। যেতে চাইলে এখনই উঠে বুক করে ফেল! অফিসের কাজে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে হপ্তাখানেক থাকতে হবে ওখানে। চব্বিশ ঘণ্টা তো কাজ করব না, বাকি সময় একা-একা বোর হব। তুই থাকলে দু’জনে মিলে দারুণ এনজয় করা যাবে!”

এমন আচমকা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নাকি! সবথেকে বড় কথা ফিনানশিয়াল ইয়ার ফুরতে চলল, এই সময় অফিস থেকে ছুটি পাওয়া কঠিন। কিন্তু পাহাড়? বিপাশার কাছে পাহাড় কোনও ডেস্টিনেশন নয়, একটা অবসেশন! চিত্রা সেটা জানে বলেই রাতদুপুরে ফোন করেছে!

খুব প্রয়োজন না থাকলে অফিস থেকে ছুটি নেয় না বিপাশা। বছরের অন্য সময় হলে সমস্যা হত না কিন্তু এখন তার ছুটি পাওয়ার চান্স ফিফটি-ফিফটি। তবে পাহাড়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে মন সায় দিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত বস রাজি না হলে অন্য পস্থা আছে। পাঁচটা মেডিক্যাল লিভ, তিনটে সিএল ছাড়াও তার ছুটির পুঁজিতে জমা আছে আরও ক’টা দিন।

“যাবি কোথায়?” অজস্র চিন্তার জট ঠেলে মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল বিপাশা।

“হিমাচল প্রদেশ। প্রথমে সিমলা। সেখান থেকে কোথায় যেতে হবে জানি না। সিক্রেট মিশনে যাচ্ছি, এর বেশি কিছু বলব না... ইসসস দেখ, আরও একটা সিট বুক হয়ে গেল। এসব ফ্লাইটের টিকিট বেশি ক্ষণ পরে থাকে না। কী করবি ঝটপট ডিসিশন নো!”

তড়াং করে উঠে বসল বিপাশা। চোখ কচলাতে-কচলাতে বলল, “তুই ফোনটা ধরে রাখ, আমি ল্যাপটপ অন করছি।”

সেদিন ভাগ্যক্রমে শেষ টিকিটটা জুটেছিল বিপাশার কপালে। বাকি সময়টুকু আর ঘুমোতে পারেনি সে। লাগেজ গুছিয়ে রেডি হতেই সাড়ে বারোটা। ভোর চারটে দশে ফ্লাইট। ওই সময় ঘরের সোফায় বসে বিমুনিকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে, এয়ারপোর্ট রওনা হওয়াই নিরাপদ মনে হয়েছিল তার। চিত্রার অফিসের গাড়ি আছে, ও ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু বিপাশার ভরসা অনলাইন ক্যাব। যদিও লোক টাউন থেকে এয়ারপোর্টের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু ওই অসময়ে বাহন জোগাড় করা একটা চ্যালেঞ্জ বটে!

কিন্তু চিত্রা যেমন বলেছিল পাহাড়ে এসে তেমন ঘটছে না মোটেই। এখানে আসার পর দু’দিন হয়ে গেল মেয়েটা ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে যায় সকালবেলা, ফেরে সন্দের পর হা-ক্লাস্ত হয়ে। এসেই ফোনওমতে চ্যাট নাকেমুখে গুঁজে কিছু ক্ষণ ল্যাপটপে কাজ। তারপর স্টান বিছানায়।

একই লজে থাকলেও দু’জনের ঘর আলাদা। সিক্রেট মিশনে গিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে ঘর শেয়ার করা চিত্রার অফিসের কোড-অফ-কনডাক্ট অ্যালাও করে না, তাই আলাদা রুম নিতে হয়েছে বিপাশাকে। যদিও সেই রুমের ভাড়ার অর্ধেক দেবে চিত্রা। তার নিজের তো কোনও পয়সা খরচ হচ্ছে না, সবটাই দেবে অফিস। কিন্তু প্রবাসে বন্ধু সঙ্গ লাভ করার জন্য এটুকু করতে সে সানন্দেই রাজি। আগেও এমন বোঝাপড়া হয়েছে দুই বন্ধুর মধ্যে।

চিত্রা এখানে কী কাজ নিয়ে এসেছে জানে না বিপাশা। অফিসের

দায়িত্ব আর বন্ধুত্বের মাঝের সীমারেখাটুকু নিষ্ঠুর সঙ্গে মেনে চলে চিত্রা। তাই এখানে আসার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও চিত্রার সিক্রেট মিশন, সিক্রেটই রয়ে গেছে বিপাশার কাছে। চিত্রা কাজে ব্যস্ত থাকলেও সারাদিন খারাপ কাটে না বিপাশার। ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলায় পাহাড়। এই ঝলমলে আকাশ, তো পরক্ষণেই মেঘ বৃষ্টি বজ্রপাত। লজের বারান্দায় বসে এসব দেখতে-দেখতে বেশ সময় কেটে যায়। গতকাল চিত্রা চলে যাওয়ার পর গিটার হাতে বেরিয়ে পড়েছিল বিপাশাও। পছন্দসই জায়গা বেছে শুরু করেছিল বাজাতে।



খেতে বসতে প্রায় চারটে বাজল অক্ষিতার। এমন দেরি মাঝেমধ্যেই হয়। সমবায়ের কর্মীদের লাঞ্চ করার জন্য বরাদ্দ সময় দুটো থেকে আড়াইটে। তবে খন্দের থাকলে আলাদা কথা। যারা এখানে কেনাকাটা করতে আসে তাদের বেশির ভাগই ঘরের বউ। বাড়ির সব কাজ সামলে দুপুরে তারা আসার সময় পায়। তাই খিদেতে পেট টুইটুই করলেও সেদিন টিফিন কৌটো খোলার অবকাশ পায় না অক্ষিতা।

আজ দুটো বাজার সামান্য আগে কাউন্টার ফাঁকা হতেই অক্ষিতা ভেবেছিল ঝটপট লাঞ্চ সেরে নেবে। ঠিক তখনই হাজির হলেন গার্লস স্কুলের দিদিমণিরা। তাদের দেখে টিফিন কৌটো আবার ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে রাখল অক্ষিতা। দিদিমণিরা সাধারণত মাসে একবার সমবাসে আসেন, কেনাকাটা করেন মোটা টাকার। এখানে কাজ করে স্যালারি হিসেবে যেটা পাওয়ার কথা সেটা আহামরি কিছু নয় কিন্তু বিক্রির উপরে ইনসেন্টিভ আছে। বিক্রিবাটা ভাল হলে স্যালারি এবং কমিশন বাবদ মাসের শেষে একটা ভদ্রগোছের টাকা হাতে পাওয়া যায়। তাই ঠিক দুটোর সময় কোনও কাস্টমার এলে তাকে বসিয়ে রেখে লাঞ্চ সারার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

তবে লাঞ্চ করতে অনেকটা দেরি হলেও খিদের কষ্ট আজ বিলকুল গায়েব অক্ষিতার। প্রায় বিশ হাজার টাকার কেনাকাটা করেছে দিদিমণিরা। কমিশন বাবদ এই মাসে প্রাপ্য টাকার অঙ্ক ছাপিয়ে যাবে স্যালারিকে। সংপথে পয়সা উপার্জন করে নিজের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে অন্যরকম আনন্দ আছে। জীবনের বেশ কিছু অপূর্ণ শখ-আল্লাদের আক্ষেপ, সেই তৃপ্তির তুলনায় কিছুই নয়। কিছু মানুষ এই সহজ কথাটা বুঝতে না পেরে অনর্থক জটিল করে তোলে জীবনটা!

টিফিন কৌটোর সঙ্গে ব্যাকপ্যাক থেকে ফোনটাও বের করল অক্ষিতা। এখানে কাজের সময় ফোন ব্যবহার করা বারণ। সবাইকে বলা আছে সমবায়ের ল্যান্ডফোন নম্বর বাড়িতে জানিয়ে রাখতে। তেমন জরুরি দরকার হলে বাড়ির লোক সেই নম্বরে যোগাযোগ করবে। পুরনো মেয়েদের দুয়েকজনকে কাজের সময় লুকিয়ে চুরিয়ে ফোন ব্যবহার করতে দেখেছে অক্ষিতা। কিন্তু সে নিজে কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না। এখানে এসেই ফোনটা সাইলেন্ট মোডে রেখে পুরে দেয় ব্যাগে। লাঞ্চের সময় দেখে কোনও কল বা মেসেজ এসেছে কিনা।

আজ মা ফোন করেছে পাঁচবার!

বাবার ফোন এসেছে তিনবার।

একটা অচেনা নম্বর থেকে সাতবার!

সকালে বেরনোর আগে মায়ের সঙ্গে খানিকটা ঝামেলা হয়েছে অক্ষিতার। টপিক সেই এক, এবার শ্যামবাজারের পরিবর্তে পাত্রপক্ষ কাকদ্বীপের। ঝগড়া করে অক্ষিতা না খেয়ে চলে আসায় পরে নিশ্চয়ই মন খারাপ হয়েছে মায়ের। তাই এতবার ফোন। ইচ্ছে করেই বাড়িতে

সমবায়ের নম্বরটা জানায়নি অন্ধিতা। মায়ের বোধ-টোথ একটু কম, কোথায় কী বলতে হয় জানে না! হয়তো সমবায়ের লোকজনকে ফোন করে বোঝাতে শুরু করল, তার কন্যাটির জেদ কত অযৌক্তিক! একের পর এক ভাল পাত্র হাতছাড়া করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে সে। এখনও নিজের ভাবনাচিন্তা না বদলালে ভবিষ্যৎ অন্ধকার! শৈলেন বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকেই পরিচিত, আধা পরিচিত সবার কাছে ওই একটাই গাউনি গেয়ে চলেছে মা।

মা হাল ছাড়ার বিশ মিনিট পরে ফোন করেছে বাবা। মোট তিনবার। সবসময় এই ব্যাপারটাই ঘটে। মা-মায়ের মন কষাকষি দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত বাবাকেই মাঠে নামতে হয়। তবে মায়ের চেয়ে বাবা অনেক প্র্যাকটিক্যাল। জানে কাউন্টারে বসে ফোন ধরা সম্ভব নয়, তাই দুটো বাজার পাঁচ মিনিট পরে প্রথমবার ফোন করেছে বাবা। পরে আরও দু'বার। মন বিক্ষিপ্ত থাকলেও বাবার ফোন কখনও উপেক্ষা করে না অন্ধিতা। কিন্তু আজ দুটোর পরেও কাজে ব্যস্ত ছিল সে।

তিন নম্বর ফোনটা অচেনা নম্বর থেকে। আজকাল অ্যাপের দৌলতে নম্বর অচেনা হলেও কলারের নাম জেনে নেওয়া যায়। বাবার সঙ্গে কথা বলে অচেনা নম্বরটা অ্যাপে টাইপ করল অন্ধিতা। পরদায় ভেসে উঠল, খোকন প্রামাণিক, ইন্ডিয়া।

এই নামের কাউকে চেনে না অন্ধিতা। কখনও কারও মুখে নামটা শুনেছে বলেও মনে পড়ছে না।

বারো মিনিটের মধ্যে সাতবার ফোন করেছে খোকন প্রামাণিক, অর্থাৎ ভুল নম্বরে ডায়াল করেনি লোকটা। নিশ্চয়ই অন্ধিতার সঙ্গে কোনও দরকার আছে। সৌজন্যের খাতিরে অন্ধিতারও এখন উচিত তাকে কল করা। খোকন প্রামাণিকের নম্বরে ডায়াল করেই অন্ধিতার মনে হল, এটা কোনও নতুন পাত্রপক্ষ নয়তো! হয়তো বাড়ির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে নিজেরাই নম্বর জোগাড় করে অন্ধিতাকে পটানোর ধান্দা করছে! অথবা এমনও হতে পারে, মা নিজেই নম্বরটা তাদের দিয়েছে। যদি সম্ভাব্য জামাই মেয়ের মজাখোলাই করতে পারে!

ভাবনাটা মাথায় আসতেই ফোন কেটে দিল অন্ধিতা। এই মুহূর্তে কোনও পাণিপ্রার্থীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডার মুড তার নেই! কিন্তু খোকন প্রামাণিক নাছোড়, পরমুহূর্তেই অন্ধিতার ফোনের পরদায় আছড়ে পড়ল তার আহ্বান! লোকটা বোধহয় ফোন হাতে নিয়েই বসেছিল। অন্ধিতার মিসড কল দেখে তিলেক সময় নষ্ট না করে কল ব্যাক করেছে!

বাবা মা বা বিশেষ পরিচিত কারও সঙ্গে খেতে-খেতে কথা বললে সমস্যা নেই, কিন্তু অচেনা কারও সঙ্গে তেননটা করা সৌজন্যের পরিচয় নয়। রুটির টুকরোটা মুখে পুরতে গিয়েও থামল অন্ধিতা। স্ক্রিন সোয়াইপ করে গম্ভীর গলায় বলল, “কে বলছেন?”

“কেমন আছ?”

হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল অন্ধিতার! নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে শৈলেনের প্রথম ফোন!

সামনের টেবিলে বসে ক্যাশ মেলাচ্ছে রিতা। দুনিয়ার সব বিষয়েই বড্ড কৌতূহল মেয়েটার। এই মুহূর্তে রিতার আঙুল এবং চোখ ক্যালকুলেটরে ব্যস্ত থাকলেও কান পড়ে রয়েছে এদিকে! অন্ধিতা ভাবল ফোন নিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, কিন্তু সমবায় জায়গা কম। খাওয়ার জন্য আলাদা ঘর নেই, শেলফের পিছনে একটা বেঞ্চে বসে কাজ সারতে হয়। অফিসের বাইরে একটা বাঁধানো চাতাল আছে। খাবার জলের নলকূপটা চাতালের পাশেই। অনেকেই ওখানে বসে টিফিন করে। কিন্তু ওদিকে সারাদিন গোড়াউনের মুটে-মজুরদের আনাগোনা। ওভাবে সবার সামনে বসে খেতে অস্বস্তি হয় অন্ধিতার।

যথাসম্ভব রিতার কান বাঁচিয়ে অন্ধিতা জবাব দিল, “ভাল! তুমি কেমন আছ? এখন কোথায়? কবে ফিরবে? এটা কার ফোন?”

ওপ্রান্তে লম্বা শ্বাস! অর্থাৎ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অপারগ শৈলেন! এই মুহূর্তে অজস্র প্রশ্ন হানা দিচ্ছে অন্ধিতার মনে। সম্ভবত সেগুলোর একটারও সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয় শৈলেনের পক্ষে! পরিস্থিতি বুঝে প্রসঙ্গ পালটাল অন্ধিতা। বলল, “জানো আমি একটা চাকরি পেয়েছি। সেলসের কাজ, কো-অপারেটিভে। মাইনে তেমন বেশি নয়, তবে ঠিকমতো কাজ করতে পারলে ভাল ইনকামের সুযোগ

আছে। আমি কাউন্টারে বসি। যারা ডোর-টু-ডোর সেলসে আছে তাদের কমিশন অনেক বেশি। মাইনেও। এখানে ভ্যাক্যান্সি আছে, তুমি ফিরে এলে কাজটা করতে পারতে। দু'জনে মিলে কাজ করলে মাস গেলে ভালই রোজগার হবে!”

কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর শৈলেন বলল, “বাড়ির খবর কী, মা বাবা কেমন আছে?”

ভাল নেই। একেবারেই ভাল নেই কাকিমা। ডাক্তার এখন আর ভরসারটুকুও দিচ্ছে না। গত সপ্তাহে বাড়িবাড়ি হওয়ায় হাসপাতাল থেকে ওষুধ পালটে দিয়েছে কিন্তু তাতে অবস্থার উন্নতি হয়নি। রোগের সঙ্গে শোক মিলে শেষ করে দিচ্ছে মানুষটাকে। সেদিন অন্ধিতা যখন শৈলেনদের বাড়িতে গিয়েছিল তখন কাকিমার আড়ালে দুঃখ করছিল কাকা। বলছিল, ছেলেকে দেখার জন্য ছুটফুট করছে মায়ের প্রাণ!

কিন্তু এসব কথা শৈলেনকে জানানো ঠিক হবে না। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান সে। মায়ের অবস্থা শুনলে যে ভাবে হোক বাড়িতে আসতে চাইবে। এই মুহূর্তে তার গ্রামে ফেরা অত্যন্ত বিপদজনক। রেনবোর পলিসি কিনে যারা ঠকেছে, ভয়ঙ্কর ক্ষেপে রয়েছে তারা। শৈলেনকে হাতের সামনে পেলে ছিড়ে খাবে! কিন্তু সব জেনেও কেমনভাবে মিথ্যে বলবে অন্ধিতা! কাকিমার ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে শৈলেন কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না তাকে!

কাজের ছুতোয় একবার এদিক থেকে ঘুরে গিয়েছে রিতা। অন্ধিতার মতো শান্ত, গম্ভীর স্বভাবের মেয়ে চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বলছে তা জানার জন্যে ছুটফুট করছে সে! গলাটা আর এক ধাপ নামিয়ে অন্ধিতা বলল, “কাকা মোটামুটি আছে, কিন্তু তুমি যেমন দেখে গিয়েছিলে কাকিমার শরীর তার থেকে খারাপ হয়েছে। ডাক্তাররা ওষুধ পালটে দিয়েছে।”

আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৈলেন জানতে চাইল, “গ্রামের পরিস্থিতি কী? লোকজন কিছু বলাবলি করে? তোমার বাবা মা কী চিন্তাভাবনা করছে আমাকে নিয়ে?”

অন্ধিতা জানে, সব খুলে বললে দীর্ঘশ্বাসের সংখ্যা বাড়বে ওপ্রান্তে। কাকাকে রাস্তায় ধরে পাওনাদাররা অপমান করেছে, থানায় চারশো কুড়ি ধারায় বেশ কয়েকটা নালিশ জমা পড়েছে তার নামে, পঞ্চায়েতের মিটিংয়েও ব্যাপারটা উঠব-উঠব করছে... এই সব কথা জানলে আরও ভেঙে পড়বে শৈলেন।

এ তো গেল গ্রামের অবস্থা। অন্ধিতাদের বাড়িতেও শৈলেনের জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। একসময়ের হবু জামাইকে গালাগালি না করে একটা দিনও জলস্পর্শ করে না মা। বাবা এখনও কিছু বলেনি বটে, তবে পাত্র হিসেবে শৈলেন যে আর তার গুডবুকে নেই তা ভালই বুঝতে পারে অন্ধিতা!

প্রসঙ্গটা পাশ কাটানোর জন্য অন্ধিতা বলল, “গ্রামের লোক আর কী বলবে, তপন মাস্টারের মেয়ে গত সপ্তাহে গোবিন্দ মাতালের সঙ্গে পালিয়েছে, সেই টপিক নিয়েই ব্যস্ত সকলে, অন্য দিকে মন দেওয়ার ফুরসত কই!”

“আ্যাং, শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ মাতালের সঙ্গে! সখ্যগরীকে তো বুদ্ধিমতী বলে জানতাম!”

“আর বলো কেন! তপন মাস্টার তো বলেই দিয়েছে, ও মেয়ে ফিরে এলেও আর ঘরে তুলবে না, বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে!”

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস! অন্ধিতা বুঝল, সতর্ক থাকা সত্ত্বেও হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছে। শৈলেনের পরের কথাতেই সত্যি হল তার আশঙ্কা। “চুনকালি কী আমিও কম মাখিয়েছি বংশের মুখে! লোভে পড়ে বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী সবার শত্রু হলো। বাপমাকে বুড়ো বয়সে কোথায় একটু শান্তিতে রাখব তা নয়... জানি না এই জাল কেটে জীবনে কখনও বেরোতে পারব কিনা!”

অন্ধিতার জানা নেই, এই মুহূর্তে ঠিক কোন শব্দগুলো পরপর আউড়ে গেলে তা যথার্থ সান্ধুনাবাঁকা হয়ে উঠবে! অনেক ভেবে খড়কুটোর মতো সে আঁকড়ে ধরল ক’দিন আগে কাগজে পড়া খবরটা। বলল, “শোনো না, সেদিন কাগজে দেখলাম এক উঁচু পদের মন্ত্রী বলেছেন কল্লোল মিত্র খুব তাড়াতাড়িই ধরা পড়বে! পুলিশ নিশ্চয়ই লোকটাকে জেরা করে টাকার হদিস পেয়ে যাবে! লোকে টাকা ফেরত

পেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে! তুমি-আমি দু'জনে মিলে কাজ করলে সংসার চালাতে অসুবিধা হবে না! তাছাড়া তুমি নিজে তো কোনও দোষ করেনি, পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে একটা লোক দিনের পর দিন সবাইকে খোঁকা দিয়েছে। যারা পলিসি কিনেছে তারা যেমন ঠকেছে, তেমনি তোমার মতো অনেককে বোকা বানিয়েছে লোকটা। মানুষ সেটা তো বুঝবে। এই তুমি খবরটা দেখেছ?”

“না, আমি যেখানে থাকি সেখানে কাগজ আসে না। না টিভি না রেডিও। বাইরের পৃথিবী থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন...লিটারেলি পাণ্ডববর্জিত এলাকা। কবে ফিরতে পারব জানি না। তুমি কি আর আমার জন্য অপেক্ষা করবে?”

অন্ধিতার কাউন্টারের সামনে দু'জন ভদ্রমহিলা। সমবায় বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে আসছে। এই সময়ে যারা আসে তারা সত্যিকারের প্রয়োজনেই আসে, উইন্ডো শপিং সেরে কেটে পড়ার মানুষ তারা নয়। শেষবেলায় আরও কিছু বিক্রিবারটার সম্ভাবনা আছে। টিফিন কৌটো বন্ধ করে অন্ধিতা বলল, “এই আমার কাস্টমার এসেছে। হাতের কাজটা মিটিয়ে এসে তোমাকে ফোন করি?”

হতাশ গলায় শৈলেন বলল, “না-না একদম নয়। এটা আমার একমাত্র কলিগের ফোন, আমার ডেরা থেকে অনেকটা দূরে তার থাকার জায়গা। কদাচিত তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আজ মনটা বড় চঞ্চল হয়েছিল। বাড়িতে ফোন করতে ভরসা হল না, হয়তো পুলিশ আড়ি পেতেছে। তাই তোমাকে ফোন করলাম। আবার যখন একা থাকটা অসহনীয় হয়ে উঠবে, ফোন করব। তুমি নিজে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করো না!”

হাত ধুয়ে কাউন্টারে ফিরল অন্ধিতা। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভদ্রমহিলা একটা লিস্ট এগিয়ে দিল তার দিকে।



“সিপি কবে প্রেস কনফারেন্স ডাকতে পারবেন?”

ফোন রিসিভ করতেই উলটোদিক থেকে সত্যব্রত রায়চৌধুরীর প্রথম প্রশ্ন। মনে মনে রাগ হলেও না হেসে থাকতে পারল না পুলক। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে জয়েন করার পর থেকেই সে দেখে আসছে প্রতিটা কেসে এমন ফাস্ট ফরওয়ার্ড মোডে থাকতেই পছন্দ করেন ডিসি। ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার আগে কতগুলো গেরো পেরতে হবে সেটা তাঁর না জানার কথা নয়। প্রথমে আসমুদ্রহিমাচল ছানবিন চালিয়ে ঠিক সেখানে পৌঁছতে হবে, যেখানে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে কল্লোল মিত্র। তারপর তাকে খুঁজে বের করে লোকাল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অতঃপর মহাপ্রভুর ডেরায় হানা দিয়ে হাতকড়া পরাতে হবে তার পবিত্র পাণিযুগলে। তারও পরে হাজারটা আইনি ঝঞ্জাট পেরিয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে কমিশনার অফ পুলিশ চাঁদমুখ করে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে নিজেদের সাফল্যের গল্প শোনাবেন! ডেপুটি কমিশনার মাঝের অনেকগুলো পর্যায় উপকে সরাসরি সিপি-র প্রেস কনফারেন্সের তারিখ জানতে চাইছেন!

পুলক হেসে বলল, “ডেটটা তো এখনি কনফার্ম করতে পারছি না স্যর তবে হোপফুলি দ্যাট অস্পিসাস মোমেন্ট উইল কাম নেক্সট উইক। ইতিমধ্যে জাল অনেকটা গুটিয়ে এনেছি, মাছ ডাঙায় তুলতে বেশি সময় লাগবে না!”

একটু অসন্তুষ্ট গলায় ডিসি বললেন, “হেসো না। এই সপ্তাহ শেষ হতে এখনও তিন দিন। যদি ধরে নিই আগামী সপ্তাহের পুরোটাই লেগে যাবে তবে আরও দশ-দশটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। উই হ্যাভ অলরেডি স্পেস্ট সিগ্ন প্রেশাস ডেজ অ্যান্ড আলট অফ মানি

অন দিস মিশন। ইতিমধ্যে আরও দু'জন এজেন্ট সুইসাইড করেছে। নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিংয়ের সামনে লাগাতার ধরনা চলছে পাবলিকের। পুলিশ থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের তুলোখোনা করছে মিডিয়া। কলকাতা থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে বসেও নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছ কী পরিমাণ প্রেশার আমাদের ফেস করতে হচ্ছে প্রতিদিন!”

ডিসি-র কথায় অতিরঞ্জন নেই। দিল্লিতে থাকলেও কলকাতার খবরের চ্যানেলগুলোয় নিয়মিত চোখ রাখছে পুলক। সাধারণ মানুষের মনে কী পরিমাণ ক্ষোভ জমেছে তা বিভিন্ন জমায়েত থেকেই পরিষ্কার। অবরোধ, ভাঙচুর, মিছিল এখন বাংলার রোজনামা। একমাত্র কল্লোল মিত্রকে জেলে পুরতে পারলে এই ক্ষোভের আগুনে জল ঢালা সম্ভব। এখনই টাকা ফেরত না পেলেও অন্তত তাদের দুর্গতির জন্য যে দায়ী তাকে গারদের পিছনে দেখলে মানুষ কিছুটা শান্ত হবে। কিন্তু যত ক্ষণ সেটা সম্ভব না-হচ্ছে, এই আগুন জ্বলতে থাকবে।

“আই অ্যাম সরি স্যর, আমরা আশ্রয় চেষ্টা করছি কল্লোল মিত্রকে খুঁজে বের করার। হাতে নতুন কোনও তথ্য নেই। পুরনো ইনফরমেশনের ভিত্তিতে এগোতে হচ্ছে অনুমানের উপরে ভিত্তি করে। তাই রেজাল্ট পেতে দেরি হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, কল্লোল মিত্র এখনও ইন্ডিয়াতেই আছে। হয়তো প্ল্যান করছে বর্ডার ক্রস করার। তেমন হলে আমাদের সুবিধে। দেশ ছাড়ার জন্য লোকটা খানিকটা বেপরোয়া হলে ওকে ফাঁদে ফেলার সুযোগ বাড়বে। যে সমস্ত পয়েন্ট দিয়ে লোকটার পক্ষে দেশ থেকে এগজিট করা সম্ভব সেই সব জায়গায় আমাদের অফিসারেরা কাজ করছে। আপনি তো জানেন, পয়সার বিনিময়ে যেসব দালাল বর্ডার ক্রস করিয়ে দেয় তারা আসলে দু'মুখো সাপ। লোভনীয় অফার পেলে পার্টির কাছ থেকে টাকা খাওয়ার পরেও তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারো।” একটু থেমে পুলক বলল, “অনেকগুলো লিমিটেশনের মধ্যে থেকে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। এত বাধা না থাকলে হয়তো এত দিনে লোকটাকে জেলের ভাত খাইয়ে দিতাম।”

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন ডিসি সত্যব্রত। “পুলিশি স্বাধীনতা” কথাটা মাঝে-মাঝে কত ঠুনকো হয়ে পড়ে তা তাঁর থেকে বেশি আর কে জানবে! রাজনৈতিক চাপ, হিউম্যান রাইটস কমিশনের চোখরাঙানি, লিগাল কন্সট্রেনটসের মতো বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কাজ করতে হয় পুলিশকে। একটু এদিক ওদিক হলেই শো কজ, কম্পালসরি ওয়েটিং, সাসপেনশনের খাঁড়া! তবু সব কিছু সামলেও পুলিশ যে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ একটা সামাজিক অবস্থা বজায় রাখতে পেরেছে, সে এক অলৌকিক ঘটনা বলতে হবে!

“ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর সিচুয়েশন। কিন্তু মনে রেখো, এটা নতুন কিছু নয়। এসব সামলেই চিরকাল কাজ করতে হয়েছে আমাদের। ইভেন আফটার দিস, উই হ্যাভ কাম আপ উইথ ডিক্লারার্ড রেজাল্ট। ডু ইয়োর ওয়ার্ক প্রপারলি। অ্যাক্স সুন অ্যাক্স পসিবল কল্লোল মিত্রকে আমার চাই। গুড নাইট।”

আবেগহীন কণ্ঠে কথাগুলো আউড়ে গেলেন ডেপুটি কমিশনার। ফোন রেখে আবার ল্যাপটপে মন দিল পুলক। সারাদিন ধরে কাজ করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একে একে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে অফিসারেরা। সব মেলের সারকথা মোটামুটি এক। আশ্রয় চেষ্টা করেও কল্লোল মিত্র সম্পর্কে নতুন তথ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। চেন্নাই, কেরল, গুজরাত, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ-আশার আলো নেই কোথাও। সময় ফুরিয়ে আসছে, টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো অথচ কল্লোল মিত্রের টিকির হদিস নেই। একশো তিরিশ কোটির দেশে আদৌ এভাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? যা হচ্ছে সবটাই অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। হয়তো যেসব জায়গায় অফিসারেরা অনুসন্ধান চালাচ্ছে, সেখানে কল্লোল মিত্র নেই!

কলকাতা পুলিশের ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক যথেষ্ট শক্তিশালী। দু'দিন হল সেখান থেকেও কোনও ফিডব্যাক নেই। আসল কথা হল নগদ টাকার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু পৃথিবীতে আর একটাও নেই। কল্লোল মিত্রের হাতে এখন প্রচুর টাকা। সেই টাকার জোরে নিজের পরিচয় গোপন করা থেকে শুরু করে দিনের পর দিন পুলিশকে ঘোল

খাওয়ানোর মতো যাবতীয় অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

প্রতিটা মেল খুঁটিয়ে পড়ে টানটান হয়ে ডিভানে শুয়ে পড়ল পুলক। নতুন কিছু ভাবতে হবে। এখন পর্যন্ত অফিসারেরা যেসব জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছে, সেখানে টুরিস্টদের আনাগোনা বেশি। জনবহুল জায়গায় গা ঢাকা দেওয়ার সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও তেমনই। হাজার মানুষের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সহজ হলেও পরিচিত কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। অবশ্য যে লুকিয়ে থাকতে চায় সে ছদ্মবেশ নিলে সমস্যা। ছদ্মবেশে থাকলে খুব চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হয়। স্কুলে পড়ার সময় পুলক একবার প্রিয়া সিনেমায় বন্ধুদের সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিল। সেখানে চশমা-টুপি পরা লম্বাচওড়া এক মানুষকে একঝলক দেখে খুব চেনা মনে হয়েছিল তার। মানুষটার চেহারা, হাটচালার ধরন যেন ভীষণ পরিচিত! ছবি শুরু হওয়ার পর মানুষটাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ পায়নি পুলক, ডুবে গিয়েছিল সেলুলয়েডের জগতে। অনেক পরে বিখ্যাত ক্রিকেট লিখিয়ার কলাম পড়ে জানতে পেরেছিল, সেদিনের ছদ্মবেশী মানুষটা ছিলেন একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার, তার শৈশবের হিরো! ভবিষ্যতের এসিপি পুলক মুখোপাধ্যায় তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয় ক্রিকেটারকে চিনতে পারেনি সেদিন!

সেই ঘটনার কয়েক বছর আগে টিভিতে ‘সন্ন্যাসী রাজা’ দেখার সময় দাড়িগোঁফ লাগানো উত্তমকুমারকেও, উত্তমকুমার বলে চিনতে পারেনি পুলক। ছদ্মবেশের সামনে হবু পুলিশ অফিসারের যদি এই অবস্থা হয়, তবে ছাপোষা সাধারণ মানুষ কী করবে!

কল্লোল মিত্রের চোরাটা সাদামাটা। তার উপর ছদ্মবেশ নিলে তাকে চিনতে পারা অসম্ভব। অবশ্য সঙ্গীতা সাহা তার সঙ্গে থাকলে একটা উপায় হতে পারে। ছেলেরা নকল গোঁফদাড়ির আড়ালে নিজেদের গোপন করতে পারে কিন্তু মেয়েদের সেই সুবিধাটা নেই। অফিসারদের কাছে সঙ্গীতা সাহার নতুন-পুরনো সবরকম ছবিই আছে। কিন্তু নিজের পুলিশি অভিজ্ঞতা দিয়ে পুলক বোঝে, এই মুহূর্তে তাদের টার্গেট বোর্ডের ব্লস আই, শুধুই কল্লোল মিত্র। পাগলের মতো ওই একটা মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। এবার এই মাইন্ডসেট থাকে বেরিয়ে আসতে হবে তাদের। কল্লোল মিত্রের সঙ্গে সমানতালে খোঁজ চালাতে হবে সঙ্গীতা সাহারও।

আরও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে অফিসারদের। তাদের অনুসন্ধানের পরিধি ছড়িয়ে দিতে হবে টুরিস্ট স্পটের আশপাশে থাকা গ্রামেও। গা ঢাকা দেওয়ার জন্য জনবিরল জায়গা বেছে নিতেই পারে কল্লোল মিত্র। সেখানে লুকিয়ে থাকা সুবিধা কিন্তু দেশ থেকে পালানোই যদি লক্ষ্য হয়, তবে বেশিদিন রিমোট এরিয়াতে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল পুলক। পয়েন্টগুলো শেয়ার করতে হবে অফিসারদের সঙ্গে। ওদের বলে দিতে হবে শহরের পাশাপাশি মফস্সলের দিকেও নজর ঘোরাতে। ছোট্ট ছুটির পরিমাণ বাড়তে হবে সবাইকে। অন্য অফিসারদের ক্ষেত্রে ঘুরে-ঘুরে কাজ করার অসুবিধে নেই। চৈত্র-বৈশাখে রাস্তার পিচ গলা গরমে কলকাতায় যাদের ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হয়, দক্ষিণ, পশ্চিম অথবা মধ্য ভারত এখন তাদের কাছে সুইজারল্যান্ড। কিন্তু ভুগতে হচ্ছে চিত্রাকে। দিল্লিতেই যেখানে পারদ শূন্যের কাছাকাছি নেমে গেছে, সেখানে পাহাড়ের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ওয়েদার বুলেটিন বলছে, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা নর্থ ইন্ডিয়ায় কোল্ড ওয়েভের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে তুষারপাত। চিত্রার ছোটবেলা কেটেছে পাহাড়ে। এমন প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাস তার আছে, ইন ফ্যাক্ট, ওর পাহাড়ি ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা মাথায় রেখেই তাকে হিমাচল প্রদেশে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে পুলক। কিন্তু ঘর থেকে বেরনোর পরিস্থিতি না থাকলে মেয়েটা কাজ করবে কী করে!

বিপাশা খেয়াল করে দেখেছে, ঘরে আলো না ঢুকলেও সূর্য ওঠার পরে নাইট ল্যাম্প লাভণ্য হারায়। কেন এমন হয় জানে না সে। হয়তো এর পিছনে বিজ্ঞানের কোনও যুক্তি আছে, অথবা সবটাই তার মনের বিভ্রম!

চোখ মেলে বিপাশা দেখল, সবুজ রঙের রাত-বাতিটা কিঞ্চিৎ ফিকে। অর্থাৎ ভোর হয়েছে। এই ঘরের দরজা জানলা এয়ারটাইট। জানলার শার্শি কাচের বটে, কিন্তু সেখানে ভারী পরদা ঝুলছে। ঘরের মানুষের মর্জি না হলে সেই পথ দিয়ে আলোর প্রবেশ সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় বেলা কত হল জানার জন্য বালিশের পাশে রাখা সেলফোনই একমাত্র ভরসা, কারণ নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় দেয়ালঘড়িটা অস্পষ্ট।

বিছানা থেকে নেমে জানলার পরদা সরিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল বিপাশা। এই ক’দিনে সে বৃষ্টি দেখেছে বারবার। দেখেছে রোদ ঝলমলে পাহাড়চূড়া, গহীন অরণ্য, স্ফটিক নীল আকাশ। কিন্তু তুষারপাত এই প্রথম! লজের সামনের চত্বর থেকে শুরু করে গাড়ির রাস্তা, দূরের পাহাড়, যদিকেই চোখ যায়, শুধুই ধবধবে সাদা! মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোয় সবুজের ছিটেফোঁটা নেই, সবই ঢাকা পড়ছে বরফের চাদরে।

চাউস ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে করিডরে এল বিপাশা। কলকাতা থেকে কোটা নিয়ে আসতে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। লাগেজের অনেকটা জায়গা দখল করেছিল বস্তুটা। বিপাশা একবার ভেবেছিল ওটা রেখে আসবে। হুইস্কি আর লেদার জ্যাকেটের জোড়া ফলার সামনে পাহাড়ি ঠান্ডা খাপ খুলতে পারবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চিত্রার পরামর্শে বাতিল করেছিল সেই পরিকল্পনা। ভাগ্যিস করেছিল! ফারের ওভারকোট পরে, ঝিরি-ঝিরি তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে হটিতে পারলে নিজেকে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের নায়িকা মনে হয় বিপাশার। ওভারকোটটা রেখে এলে অমন স্বর্ণীয় অনুভূতির স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হত সে!

চিত্রার ঘরে তালা ঝুলছে, অর্থাৎ এই দুর্যোগের মধ্যেও কাজে বেরিয়েছে মেয়েটা। এমন জায়গায় এসে ধোঁয়া ঝাঁপ কফির মগে চুমুক দিয়ে দিন শুরু করার মজাই আলাদা। কিন্তু এই ক’দিনে একবারও চিত্রাকে অমন আয়েশি মেজাজে দেখেনি বিপাশা। নিজের কাজের প্রতি এতটা দায়িত্ববোধ খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এইভাবে চালিয়ে গেলে ওর চাকরিতে উন্নতি ঠেকায় কে!

বিপাশা এখনও জানে না, কেন চিত্রাকে হঠাৎ পাহাড়ে আসতে হয়েছে। জানলে নিজের ওকালতি মেধা কাজে লাগিয়ে হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারত।

সংগ্রহে রাখার মতো বেশ কিছু দৃশ্য চোখের সামনে। কিন্তু ঘরে গিয়ে ডিএসএলআর ক্যামেরাটা আনার আগেই উলটে যাবে নৈসর্গিক শোভার এমন অনবদ্য পৃষ্ঠাটি! ওভারকোটের পকেট থেকে মুঠোফোন বের করে বেশ কয়েকটা ছবি তুলল বিপাশা। এবারের পাহাড় ভ্রমণের স্মৃতি হিসেবে থাকবে এগুলো। কাজ সেরে ফিরলে চিত্রাকেও দেখানো যাবে। বেচারি এখানে আসার পর থেকেই চাপে আছে। আজ পর্যন্ত একবারও সুযোগ হয়নি বিপাশার সঙ্গে নিছক ঘুরতে বেরনোর।

এখানে আসার জন্য বারো দিনের লম্বা ছুটি ছিনিয়ে নিতে পেরেছে বিপাশা। তার ইচ্ছে, চিত্রার কাজ মিলে কোনও পাহাড়ি গায়ে অন্তত একটা রাত কাটাতে। পাহাড়ে এসে পাহাড়ের আত্মাকে স্পর্শ করতে চাইলে থাকতে হবে শহুরে আড়ম্বরহীন কোনও কুঠিয়াতে। রক্ষ শীতল বাতাস, বৃকের মধ্যে কাঁপন ধরানো বৃষ্টি, তুষারপাতের অপার্থিব ছন্দ, পাইন বনের ‘সর-সর’ শব্দ... এই সমস্ত কিছু নিয়েই তো পাহাড়। অত্যাধুনিক লজ-গেস্টহাউস-রিসর্টের পরিকল্পিত শৌখিনতায় সেই প্রাণ কোথায়! একবার দরজা-জানলা আঁটা চার দেয়ালের ঘেরাটোপে ঢুকে পড়লে পাহাড়-মরুভূমি-সমুদ্র সবই সমান।

তুষারপাতের পরে পাহাড়ে এখন রোদের আড়ম্বর। দেরিতে ঘুম ভাঙার জন্য এখন ভারি আফসোস হচ্ছে বিপাশার। চারদিকে বরফের আস্তরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকটা সময় ধরে চলেছে তুষারপাত। বিপাশা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওই ওয়েব সিরিজটাই যত নষ্টের গোড়া। আজ সকালে তুষার পড়বে জানলে কাল অত ক্ষণ জেগে থাকত না বিপাশা। মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখত। অনেকবার পাহাড়ে টু মারার পরেও মো ফল দেখার সুযোগ খুব কম ভ্রমণপিপাসুর কপালেই জোটে। আজ নিজের ভুলে সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে সে, এ আক্ষেপ সহজে মেটার নয়!

তুষারপাত থামতেই রাস্তায় শুরু হয়েছে পথচারীদের আনাগোনা। এই লজের আশপাশের এলাকা যথেষ্ট জমজমাট। কাছাকাছি কয়েকটা গেস্টহাউস। রয়েছে ছোটখাটো মার্কেটও। সারাদিন তাই লোকজনের চলাচল। তুষারপাতের দাপটে সকাল-সকাল কাজে বেরনো মানুষগুলো ছাউনির তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। এখন রোদ উঠতেই রওনা হয়েছে গন্তব্যে। রাস্তায় নরম বরফের আন্তরণ। পথচারীদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে বরফে। লাল রঙের একটা এসইউভি দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। বরফের স্তূপ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সেটার এগোনো দুল্লভ।

পালটে যাওয়া দৃশ্যপট কিছু ক্ষণ ভিডিওবন্দি করে ঘরে এল বিপাশা। বেশ খিদে পেয়েছে। বারো ঘণ্টার উপর হয়ে গেল পেটে কিছু পড়েনি। নীচে ডাইনিং হল সকাল ছটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সারা ক্ষণ সেখানে গরম সুস্বাদু খাবার মেলে। ওখানে গিয়ে পছন্দসই কিছু খেয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু তার আগে স্নান করা আবশ্যিক। গতকাল আলসেমি করে স্নান হয়নি, আজ ফাঁকি দিলে চলবে না।

আজ আর গিটার নয়, সঙ্গে ডিএসএলআর ক্যামেরাটা নেবে বিপাশা। যতক্ষণ আলো থাকবে ঘুরে-ঘুরে ছবি তুলবে। এই ক’দিন যেখানে সুযোগ পেয়েছে গিটার নিয়ে বসে পড়েছে সে। বাজিয়েছে প্রিয় সুরগুলো। বাজাতে-বাজাতে এমনই মগ্ন হয়ে পড়েছে যে খেয়াল করেনি কখন আঁধার ঘনিয়েছে। লজে ফিরে তাকে দেখতে না পেয়ে ফোন করেছে চিত্রা। কিন্তু গিটার হাতে বিপাশার অমন মগ্নতার পরেও পাহাড় ফুঁড়ে উদয় হয়নি পিটার গেমস নামে কোনও দেবদূত। মাঝে-মাঝে বিপাশার মনে হয়, পিটার নামে পৃথিবীতে কেউ কোনওদিন ছিল না। শেষ না হওয়া স্বপ্নের মতোই কলেজ ফেস্টের সেই দিনটাও তার অবচেতন মনের রূপকল্প।

ওভারকোটটা আগেই খুলে ফেলেছিল বিপাশা। গিজার অন করে ঘরে এসে একে একে ছেড়ে ফেলল বাকি পোশাকগুলো। বাইরে পারদ শূন্যের নীচে নেমে গেলেও রুম হিটারের কল্যাণে ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক উনিশ-কুড়ি। নিরাবরণ হয়েছে বিপাশার খেয়াল হল, দোতলায় তার এবং চিত্রার ঘর ছাড়াও আরও একটা রুম আছে। এই ক’দিন ফাঁকা থাকলেও কাল রাতে সেই ঘরে বোর্ডার এসেছে। জানলার পরদা সরানো। করিডরে কেউ এলে কাচের শার্শি ভেদ করে ঘরের ভিতরে তার চোখ পড়া স্বাভাবিক। তড়িঘড়ি ডিভান থেকে কন্সলটা তুলে গায়ে জড়িয়ে নিল বিপাশা। জানলার পরদা টেনে জ্বলে দিল বড় আলোটা।

স্নান সেরে জিপ্সের প্যান্ট আর পুলওভারের সঙ্গে ওভারকোটটাও চাপিয়ে নিল বিপাশা। হাতদুটো পুরে ফেলল থার্মাল লাইনার লাগানো গ্লাভসের উষ্ণ আশ্রয়ে। আজ ঠান্ডার সঙ্গে যুঝতে গেলে এমন এক্সিমো-পোশাক ছাড়া গতি নেই। একটু ভেবে ছোট ব্র্যান্ডির বোতলটাও পুরে নিল পকেটে। ওটা ব্যাক আপ হিসেবে থাক। এই ওয়েদারে ব্র্যান্ডি হচ্ছে রোনাল্ডো-মেসি-এমবাপের মিশেল। শীতের বিরুদ্ধে কোনওমতেই এঁটে উঠতে না পারলে তাকে মাঠে নামাতে হবে!

ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে দরজা খুলতেই তীব্র আওয়াজে কান-মাথা ঝালাপালা হওয়ার অবস্থা হল বিপাশার। কাজ শুরু করেছে বরফ কাটার গাড়ি। হলিউডের সিনেমায় অনেকবার দেখলেও স্লো-মো-রোয়ার মেশিন এই প্রথম চাক্ষুষ করল বিপাশা। দেখতে খানিকটা মাটি কাটার জেসিবি মেশিনের মতোই। সামনে স্ট্রুটের বদলে ইম্পাতের কাঁটা লাগানো চাকা। প্রথমে ঘুরন্ত চাকার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জমাট বাঁধা বরফ। তারপর কৌণিক চাপে সেগুলো গিয়ে জমা হচ্ছে রাস্তার পাশে। প্রায় মাঝ আকাশে পৌঁছে যাওয়া সূর্যের আলোয় বাকবাক করছে রাস্তার পাশে জমা হওয়া বরফকুচি।

স্লো-মো-রোয়ার মেশিনের খানিকটা পিছনেই কয়েকটা বাইক। তুষারপাতের পরে পাহাড়ি রাস্তা গাড়ি চালানোর অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। নরম বরফ ঠেলে সামনে এগোনো যেমন দুর্ভহ, তেমনি বরফ জমাট বাঁধলে তার উপর দিয়ে চলাচল করা বিপদজনক। ভ্রমসাম্যে সামান্য গোলমাল হলেই হার্ড আইসে চাকা স্ক্রিড করে সোজা খাদে!

তুষারপাতে আটকে পড়েছিল বাইকগুলো। এখন রাস্তা খুলতেই এগিয়ে চলেছে গন্তব্যে। লাল এসইউভির ড্রাইভার এত ক্ষণ বসে ছিল ভিতরে। বরফ কাটার মেশিন আসতে দেখে সে বাইরে বেরিয়ে উইন্ডস্ক্রিন পরিষ্কার করতে শুরু করল। পাহাড়ি মানুষদের কাছে

এসব মামুলি দৃশ্য হলেও বছরে আট মাস যেমেনেয়ে একশা হওয়া কলকাতাবাসীর কাছে অভিনব বটে!

কালবিলম্ব না করে ক্যামেরা চালু করল বিপাশা।



“কী রে অমন স্ট্যাচু বনে গেলি কেন, ছবিগুলো কেমন তুলেছি বল!”

ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লেও আজ খুব বেশি ক্ষণ বাইরে থাকা সম্ভব হয়নি বিপাশার পক্ষে। সে লজ থেকে বেরনোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার শুরু হল তুষারপাত। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। অমন পরিস্থিতিতে ছবি তোলা দূরের কথা, দু’পা হাঁটাও সম্ভব নয়। অগত্যা এক স্কুলঘরের বারান্দায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর বিপাশা ফিরে এসেছে লজে।

সন্দের অনেক আগেই ফিরে এসেছিল চিত্রা। এমন দুর্ঘোণে ঘুরে-ঘুরে কাজ করা অসম্ভব। পরিস্থিতি এমনই জটিল যে স্থানীয় মানুষেরাও ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে পা রাখার সাহস পাচ্ছে না। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে রাতে আরও ভারী তুষারপাত হবে। এমন শীতল, ঝঞ্ঝাপূর্ণ সন্দের দুই পুরনো বন্ধু আড্ডা মারতে বসলে শেরির বোতল কি সুটকেসবন্দি থাকতে পারে!

পানপাত্রে চুমুক দিয়ে চিত্রা বলল, “ছবিগুলো তুলেছিস দারুণ, কিন্তু এমন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার খেয়াল করিসনি দেখে অবাক হচ্ছি। পুলিশ না হতে পারিস, কিন্তু তুই তো উকিল, আর দশটা সাধারণ মানুষের তুলনায় তোর অবজারভেশন পাওয়ার স্ট্রং হওয়ার কথা!”

দুপুরবেলা ঘরে ফিরে বোর হচ্ছিল বিপাশা। সদ্য রাস্তায় তুষারপাতের ধকল সামলে এসে স্নো ফলও ততটা রোম্যান্টিক মনে হচ্ছিল না! লম্বা একটা ঘুম দেওয়ার পক্ষে দুপুরটা আদর্শ হতে পারত, কিন্তু দিবানিদ্রায় কোনওদিনই রুচি নেই তার। নতুন ওয়েব সিরিজটাও গত রাতের মতো আকর্ষণীয় নয়। অগত্যা নেই কাজ তো খই ভাজ। যে কাজটা কলকাতায় ফিরে করার ইচ্ছে ছিল সেটা সেরে ফেলল তখনই। মোবাইল এবং ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো ইমপোর্ট করল ল্যাপটপে।

ডিভানে আধশোওয়া হয়ে সেগুলোই দেখছিল চিত্রা। তার কাঁধের উপর দিয়ে উকি মারল বিপাশা। ল্যাপটপের মনিটরে রাস্তায় বরফ সরানোর দৃশ্য। স্লো-মো-রোয়ার মেশিন রাস্তার বরফ সাফ করতে-করতে এগিয়ে চলছে। পিছনে তিরিশ ফুট মতো ব্যবধান রেখে কয়েকটা বাইক। একদম সামনের বাইকটার হাতলে আটকানো স্ট্যান্ড ক্যামেরা। আজকাল এই ব্যাপারটা খুব চলছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষেরা বাইক বা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কোনও দুর্গম জায়গার উদ্দেশ্যে। ঘুরতে ঘুরতে নিজের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে। সেই প্লগ ভিউয়ার্সদের পছন্দ হলে পয়সা থেকে খ্যাতি, জুটে যায় সবই।

বিপাশা বলল, “সামনের ছেলোটা ভিডিয়ো করছে। এতে অস্বাভাবিক কী আছে, অনেকেই কাজটা করে আজকাল। নিউ অ্যান্ড বিউটিফুল ওয়ে অফ ইনকাম। রথ দেখতে এসে কলা বেচাও হচ্ছে। ওর পিছনে বসে থাকা মেয়েটা বউ অথবা বান্ধবী হতে পারে। দুজনে মিলে বেরিয়েছে অ্যাডভেঞ্চারে। এমন তো কতই আছে, এর মধ্যে তুই আনইউজুয়াল কী পেলি!”

ভিডিওটা পজ করে চিত্রা বলল, “উফফ! হঠাৎ এমন ব্লাস্ট হয়ে গেলি কেন তুই! আমি প্রথমটা নয়, বলছি একদম পিছনের বাইকটার কথা। এটার মধ্যে তুই অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না!”

ছবি তোলা বা ইমপোর্ট করার সময় স্লো-মো-রোয়ার মেশিনের দিকেই চোখ ছিল বিপাশার, আশপাশের দৃশ্যগুলো খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ হয়নি। সামনে থাকা অনেকগুলো অবজেক্টের মধ্যে আগে না দেখা

জিনিসটাই মানুষের মন এবং চোখ টেনে রাখে। এটা হিউম্যান সাইকোলজি, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। চিত্রার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে পাহাড়ে। ওর কাছে স্নো-ব্লোয়ার মেশিন নতুন কিছু নয়, তাই সবকিছু পেরিয়ে পিছনের বাইকটাই প্রথমে নজর কেড়েছে ওর।

আর একটা ব্যাপার আছে। লেক টাউনে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক গ্রীষ্মের দুপুরে বাইকে করে ডাব বিক্রি করতে আসেন। ছুটির দিনে বাড়িতে থাকলে বিপাশা মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে ডাব কেনে। পিছনের ক্যারিয়ারে ডাব বহন করে চলা বাইক তার স্মৃতিপটে অভিনব কিছু নয়। সেই কারণেই ছবি তোলার সময় ওই বাইক তার চোখে পড়লেও মনে রেখাপাত করেনি। যদিও একটু তলিয়ে ভাবলে ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেত সেও!

“হুঁ তাই তো, এটা আমি খেয়াল করিনি, রিয়েলি অনিউজ্যুয়াল!”

“শুধু অনিউজ্যুয়াল নয় ডালিং, প্রিটি মিস্টিরিয়াস”, বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল চিত্রা, “প্রথম প্রশ্ন এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় ডাব খাওয়ার শখ হল কার! সেকেন্ডলি, এটা কেরল বা চেন্নাইয়ের সি-বিচ নয়, ইটস আ ফারিং হিল স্টেশন, লোকেটেড অ্যাট অ্যান অলটিচিউড অফ অ্যাবাউট সিন্স থাউজ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফিট অ্যাবাউ সি লেভেল! এখানে এক কাঁদি ডাব জোগাড় করা মুখের কথা নয়! অ্যান্ড অ্যাবাউ অল...”

“অ্যান্ড অ্যাবাউ অল?”

বিপাশার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ল্যাপটপের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল চিত্রা। ফ্রেমের আড়ালে বাইকের অদৃশ্য হওয়ার মুহূর্তটা জুম করে হতাশায় ভেঙে পড়ল, “ইসস কাদায় নম্বরপ্লেটটা একদম ঢেকে গেছে! ওকে খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হাতছাড়া হল!”

“হঠাৎ ওই বাইকটা নিয়ে এমন এক্সাইটেড হয়ে পড়লি কেন তুই, ডাব খাবি নাকি?”

বিপাশার প্রশ্ন শেষ হতে না হতে দরজায় টোকা পড়ল। সঙ্গে পালিশ করা ইংরেজিতে তরুণ কণ্ঠের আর্জি, “ইয়োর ম্যাক্স আর রেডি ম্যাম, লেট মি সার্ভ দেম।”

চোখে দুটুমির ঝিলিক তুলে ফিসফিস করে চিত্রা বলল, “ধরে নে তাই! আপাতত তুই টয়লেটে আত্মগোপন কর। আমি ঘরে ওর সঙ্গে কয়েক মিনিট একা কাটাতে চাই! ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান অবজার্ব অস! নো প্রবলেম!”

গলা তুলে, “ওয়েট আ মিনিট, অ্যায়াম কামিং” বলে হতচকিত বিপাশাকে একরকম ঠেলে ওয়াশরুম ঢুকিয়ে দিল চিত্রা। টি-টেবিল থেকে বিপাশার পানীয়ের গ্লাসটা তুলে রেখে দিল আড়ালে। তারপর হাতখোঁপায় আটকে রাখা চুল উন্মুক্ত করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওয়াশরুমের দরজার একচিলতে ফাঁক দিয়ে বিপাশা দেখতে থাকল তার কীর্তিকলাপ।

ছিটকিনি খুলে দরজা থেকে সরে এসে ডিভানে আধশোয়া হল চিত্রা। রুম সার্ভিসের ছেলেটার বয়স বাইশ-তেইশ। ঝকঝকে চেহারা, চোখদুটো সদাচঞ্চল। একটা বড় ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে সে ভেজিয়ে দিল দরজা।

রুম হিটারটা চলছে অনেক ক্ষণ। ঘরে ভালই গরম ছিল কিন্তু ওয়াশরুমে এসে ঠান্ডা টের পেল বিপাশা। সামান্য একটা উলের চাদরে এই ঠান্ডা বাগ মানার নয়। চিত্রা তাড়াতাড়ি নাটকটা শেষ না করলে জমে যেতে হবে!

ডিভানে উঠেই গায়ের চাদরটা খুলে ফেলেছে চিত্রা। স্লিডলেস নাইটির বদান্যতায় তার গ্রীবাদেশের প্রায় পুরোটাই উন্মুক্ত, বিভাজিকা সুস্পষ্ট। প্লেট সাজাতে-সাজাতে আগড়ম-বাগড়ম কথা বলার আছিলায় ছেলেটা বারবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে চিত্রার শরীরে।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে ছেলেটা বলল, “ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং এলস ম্যাম?”

শরীরে হিলোল তুলে চিত্রা জবাব দিল, “চাই তো অনেক কিছুই, কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা খুব পেতে ইচ্ছে করছে সেটা পাচ্ছি কই!”

“কী চাই বলুন না ম্যাডাম, আপনার কোনও ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখব না!”

ভরপুর উত্তেজনা ছেলেটার গলায়। চিত্রা এই মুহূর্তে আকাশের চাঁদের জন্য বায়না জুড়লেও সেই আবদার মেটানোর জন্য জান লড়িয়ে দেবে ছেলেটা!

“তেমন কিছু নয়, আমার চাই এক কাঁদি ডাব।”

“এক কাঁদি ডাব!” চিত্রার উত্তর শুনে প্রায় হাহাকার করে উঠল ছেলেটা।

অভিমानी কণ্ঠে চিত্রা বলল, “কেন পাওয়া যাবে না? আমার জন্যে এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবে না!”

নিম্পৃহ গলায় ছেলেটা বলল, “বেশ, আমি এখনই গিয়ে ম্যানেজারকে বলছি। আসল কথা এসব জিনিস পাহাড়ে পাওয়া পাওয়া কঠিন। উনি আমাদের ফুড সান্স্‌য়ারের সঙ্গে কথা বলে যদি জোগাড় করতে পারেন।”

ঝটকা মেরে উঠে বসে চিত্রা বলল, “না-না, তোমার-আমার পার্সোনাল ম্যাটারে আবার ম্যানেজার কেন! এই ব্যাপারটা ম্যানেজারকে জানানোর দরকার নেই। তুমি লোকাল ফুড সেলারদের কনটাক্ট নম্বর আমাকে দাও। আমি পার্সোনালি কারও কাছ থেকে কিছু কিনতে চাইলে তোমার ম্যানেজারকে তো সেটা জানানোর প্রয়োজন নেই! এই বিষয়ে তুমি আমাকে হেল্প করো, আমিও তোমাকে খুশি করে দেব!”

বিভ্রান্তের মতো কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। পয়সাওলা সুন্দরীদের কত রকম খেয়ালই যে হয়! এই ঠান্ডায়, যখন জল পর্যন্ত গরম করে খেতে হয়, তখন ম্যাডামের ডাব খাওয়ার শখ হয়েছে! মিয়ানো গলায় সে বলল, “ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি আপনার জন্যে এখানকার সবক’টা ফুড সান্স্‌য়ারের নম্বর জোগাড় করে দেব।”

“দ্যাটস গুড”, খুশির গলায় চিত্রা বলল, “তবে হ্যাঁ, বড় সান্স্‌য়ারের নম্বর আমায় দরকার নেই, সে তো নেটেই পেয়ে যাব। তুমি বরং ছোট ভেভার... মানে ওই যারা ঠেলা গাড়ি অথবা বাইকে করে ফল বেচে বেড়ায় তাদের কনটাক্ট নাম্বার দিও, সম্ভব হলে ঠিকানাও।”

ঝাঁকুনি মেরে উঠে বসার জন্য চিত্রার নাইটির ফিতেটা ডান কাঁধ থেকে পিছলে পড়েছে। স্তনের উপরিভাগের তিলটা ঘরের মনোরম আলোয় স্পষ্ট!

জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছেলেটা বলল, “তাই হবে ম্যাডাম, লিস্ট আপনি পেয়ে যাবেন। আমাকে একটু সময় দিন।”

মহার্ঘ হাসির সঙ্গে একটা মন্দির কটাক্ষ ছেলেটাকে উপহার দিয়ে চিত্রা বলল, “শিওর, টেক ইয়োর টাইম। কালকের দিনটা তোমাকে সময় দিলাম। কাল রাতে ডিনারের সঙ্গে লিস্টটা নিয়ে এসো, আমি অপেক্ষা করব।”

হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ঘর থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ছেলেটার। কিন্তু আঙুলের আলতো টোকায় গায়ে বসা পোকামাকড় কেমনভাবে ঝেড়ে ফেলতে হয় জানে চিত্রা। টেবিলে সাজানো খাবারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “ইস, এমন গন্ধ ছড়িয়েছে, খিদেটা চনমন করে উঠল। তোমাদের এখানের খাবার...সত্যি দারুণ! এবার এগুলোর সদ্যবহার করি, কেমন?”

অনিচ্ছুক পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। চিত্রা দরজায় ছিটকিনি তুলতেই ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিপাশা বলল, “উফ, প্যারিস বটে তুই! ওদিকে আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিলাম।”

প্লেট থেকে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে চিত্রা বলল, “মালটা চাল পেলোই আড়চোখে চাটে আমাকে। আজ আশ মিটিয়ে দিলাম। দেখা যাক, কাজ উদ্ধার হয় কিনা। ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে, অথচ নিজেকে পুলিশ বলে পরিচয় দিতে পারব না, এমন পরিস্থিতিতে অনেক কায়দা করে স্টাটেজি ঠিক করতে হয়। নে শুরু কর, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।”

স্যান্ডউইচ হাতে তুলে বিপাশা বলল, “কিসের ইনভেস্টিগেশন সেটাই তো এখনও জানলাম না। ডাব নিয়েই বা হঠাৎ এমন খেপে উঠলি কেন তুই!”

স্যান্ডউইচে একটা বড় কামড় বসিয়ে চিত্রা বলল, “রেনবোর মালিক কল্লোল মিত্রের নাম শুনেছিস তো, তার পিছনে খাওয়া করছি আমি। যদি মালটাকে এখানে খুঁজে পাই, তাহলে সেই সাফল্যে তোর

মস্ত অবদান থাকবে!”

অবশ্যই রেনবো এবং কল্লোল মিত্রের নাম শুনেছে বিপাশা। বাংলায় রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিয়েছে লোকটা। বেশ কিছুদিন ধরে কাগজ-টিভির ব্রেকিং নিউজ ছিল কল্লোল মিত্র এবং রেনবো এপিসোড। কিন্তু তার বন্ধু যে অমন হাই প্রোফাইল কেসের তদন্ত করছে তা ঘূর্ণাক্ষরেও টের পায়নি বিপাশা।

“ওহ মাই গড, তুই কল্লোল মিত্রকে খুঁজতে পাহাড়ে এসেছিস! কিন্তু আমি তোকে কীভাবে হেল্প করলাম! আমি তো এসে থেকে গিটার বাজাচ্ছি আর ক্যামেরা বাগিয়ে ছবি তুলছি। তোর ইনভেস্টিগেশনে ডাব কি কোনও ইমপার্ট্যান্ট ফ্যাক্টর?”

“মে বি। মে নট বি। আমাদের গোপন রিপোর্ট বলছে কল্লোল মিত্রের বেশ কিছু হ্যাবিট আছে। প্রতিদিন ডাবের জল পান করা তারই একটা। ইচ্ছেপুরণের জন্য লোকটা অনেক দূর যেতে পারে। একবার গভীর রাতে নর্থ বেঙ্গলের এক হোটেলে পৌঁছে ভদ্রলোকের ইচ্ছে হল পাতিলেবুর শরবত খাওয়ার। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন রাতেই ফুরিয়েছে হোটেলের পাতিলেবুর স্টক। মিত্রবাবুকে সেকথা জানাতেই রেগে কাঁই তিনি। সেক্রেটারিকে ডেকে হুকুম দিলেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হোটেলটা কিনে ফেলতে, যাতে পরেরবার সেখানে উঠে তিনি লেবুর শরবত পান!”

“আরিবাস! শেষ পর্যন্ত লোকটা কিনেছিল হোটেলটা?”

হতাশভাবে মাথা নেড়ে চিত্রা বলল, “নাহ। কিনলে আমাদের কিছুটা সুবিধা হত। ওর আর একটা ইমমুভেল প্রপার্টি আমাদের হাতে আসত। সেটা লিকুইডেট করে পাবলিকের খোয়া যাওয়া টাকার কিছুটা উদ্ধার করা যেত। ভগবান জানে, কয়েক হাজার কোটি টাকা কোথায় কীভাবে সাইজ করেছে লোকটা! অত টাকা তো পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়! যাই হোক আমার মন বলছে এবার কিছু একটা ঘটবে। সবার প্রথমে ডাবের উৎস এবং অভিমুখ আমাদের জানতে হবে। আমি এখানে আসার আগেই নেট থেকে লোকাল ফুড সাপ্লাইয়ারদের নাম, কনটাক্ট নম্বর জোগাড় করে নিয়েছিলাম। ফোনও করেছিলাম সবাইকে। কিন্তু ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এই সময়ে ডাব সাপ্লাই করতে পারবে না। একথা শুনে আমি কোকোনাট ফর্মুলা বাদ দিয়েই কল্লোল মিত্রকে খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ এই ভিডিওটা দেখে দারুণ ধাক্কা খেলাম। অনেক সময় বড়-বড় দোকানে যেটা পাওয়া যায় না, ফুটপাথে সেটা মিলে যায়। একবার চাঁদনি মার্কেটে এক ধরনের কনসোল জ্যাক কিনতে গিয়ে আমার তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কাল লিস্টটা হাতে পাই, তারপর দেখি কতদূর কী করতে পারি। প্রচুর মানুষকে চোখের জলে নাকের জলে করেছে লোকটা। অত মানুষের অভিষাপের একটা মূল্য নেই! আশা করি তোর ছবি, আমার নাটক বিফলে যাবে না।

স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল চিত্রা।



শিয়াখালা থেকে একটু রাত করেই ট্রেকারে উঠেছিল শৈলেন। নালিকুল স্টেশনে পৌঁছতে নটা বেজেছিল প্রায়। ইচ্ছে ছিল শেষ ট্রেনে আসার। রাস্তাঘাটে তখন মানুষজন কম থাকে। দু'য়েকটা চায়ের গুমটি আর সাইকেল গ্যারেজ ছাড়া অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপ পড়ে যায়।

আশপাশের গাঁয়ের অনেকেই হাওড়া থেকে শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরে। তাদের মধ্যে শৈলেনের পরিচিত কেউ থাকা আশ্চর্যের নয়, তবে রবিবার সেই ঝুঁকি অনেক কম। তাই সবদিক বিবেচনা করে আজকের রাতটাই বাড়ি ফেরার জন্য বেছে নিয়েছিল শৈলেন।

বুদ্ধিটা অবশ্য খোকনদাই দিয়েছিল। বলেছিল, “রোববার দেখে যাও ভায়া। যারা কলকাতায় বিভিন্ন কাজে যায় অ্যাটলিস্ট তাদের ভিড়টা তুমি অ্যাভয়েড করতে পারবে। রবিবার অফিস-কাছারি, সরকারি হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকে। বউ-বাচ্চা নিয়ে কলকাতায় যারা ঘুরতে যায়, লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফেরার রিস্ক তারা নেবে না। রইল বাকি দু'চারজন পরিচিত হকার। তোমার মাস্ক-টুপি-সোয়েটার তাদের চোখে খুলো দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঘুমের ভান করে জানলার ধারে বসে থাকবে আর মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে দেখে নেবে কোন স্টেশন এল। মাকে দেখার জন্য তোমার মন কাঁদছে সেটা খুবই স্বাভাবিক, তুমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মায়ের মুমূর্ষু সময়ে আমি তোমাকে বাড়ি ফিরতে নিষেধ করব না। কিন্তু নিজের জান-প্রাণের ব্যাপারটাও তো মাথায় রাখতে হবে। টাকা না পেয়ে লোকজন খেপে আছে, তোমাকে সামনে পেলে প্রথমেই তারা হাতের সুখ করে নেবে। গণধোলাইয়ের হালকা, মাঝারি ডোজ বলে কিছু হয় না সে তো তুমি জানোই! সন্তানের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি প্রাণটাই খুঁয়ে বসে তাহলে কী হবে বুঝতেই পারছ! শোকটা তোমার মায়ের জন্য প্রাণঘাতীও হতে পারে। তাই যা করবে ভেবেচিন্তে করো!”

বিবেচক মানুষ খোকনদা। তার কথা মেনেই শুক্রবারের বদলে দু'দিন দেরি করে বাড়ি ফিরছে শৈলেন।

রওনা হওয়ার আগে খোকনদা পইপই করে বুঝিয়েছে, “একবারের জন্যও মাস্ক, টুপি খুলবে না। ট্রেন থেকে নেমে কোনওরকম চনমনে ভাব বা আড়ম্বল না। অনেকদিন পরে বাড়ি ফেরার আনন্দ, অথবা পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা, দুটোর কোনওটাই যেন তোমার শরীরী ভাষায় ফুটে না ওঠে। মোদা কথা আর দশজন ক্লাস্ত, বাড়ি ফিরতে উন্মুখ যাত্রীর থেকে তোমাকে যেন আলাদা করা না যায়!”

এখনও পর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে খোকনদার নির্দেশ মেনে চলেছে শৈলেন। আসার আগে নিজের জ্যাকেটের বদলে খোকনদার সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে। শিয়াখালা মার্কেট থেকে কিনেছে টুপি-মাস্ক, ট্রেনের অপরিচিত হকারের থেকে মায়ের জন্য আপেল।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে অটো বা টোটোয় না উঠে হাঁটতে শুরু করেছে। এলাকায় যারা অটো বা টোটো চালায় তারা সবাই চেনে তাকে। টুপি-মাস্কের আড়াল থাকলেও পরিচিত মানুষের কাছে শরীরী ভাষা এবং কণ্ঠস্বর গোপন রাখা কঠিন।

স্টেশন চত্বরের বাইরে রাস্তায় আলো কম। রেললাইনের ওপারটা মিউনিসিপ্যালিটি এদিকটা পঞ্চায়েত। পুর এলাকা সুলভ চাকচিক্য, রক্ষণাবেক্ষণ এদিকে নেই। বছর তিনেক আগে এদিকের রাস্তায় সৌরবাতি লাগানো হলেও এখন সেগুলোর অধিকাংশই খারাপ। ফলে স্টেশন রোডের অনেকটাই নিকষ অন্ধকারে।

রাস্তায় নেমে ছোট শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে টটটা বের করে নিয়েছে শৈলেন। সঙ্গে জামাকাপড়, জিনিসপত্র কিছুই আনেনি সে। এখানে একটা দিন থেকে পরশু ভোরবেলাই সে ফিরবে শিয়াখালায়। অস্ফিটার সঙ্গে কথা বলে মনে হল গ্রামের পরিস্থিতি তেমন সুবিধাজনক নয়। রেনবোর ব্যাপারটা খিতিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গ্রাম তার পক্ষে বিপদজনক।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় টোটো-অটো হর্ন বাজাচ্ছে। শেষ ট্রিপে অনেক সময় প্যাসেঞ্জার কম হয়, বিশেষ করে রবিবারে। পথচলতি দু'য়েকজন মানুষ গাড়িতে উঠলে তাদের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে যাবে। শৈলেন প্রতিবার হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে গাড়িতে যাবে না।

হাঁটতে-হাঁটতে নির্বিঘ্নেই মেলার মাঠটা পেরিয়ে এল শৈলেন। কিন্তু মোড় ঘুরে দাঁ বাড়ির সামনে পৌঁছেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। পার্টি অফিসের সামনের বেঞ্চে বসে রয়েছে বেশ কয়েকটা ছেলে। সবাই মোটামুটি তারই বয়সি। হাতে তাদের পাকা বাঁশের লাঠি আর টো। স্থানীয় ভাষায় ওরা আরজোপি, মানে রাত জাগা পাটি। ছিঁচকে চোরের উপদ্রব হলে গ্রামের রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে টহল দেয় আরজোপি। অনেক সময় সম্পন্ন চাষিরা ফসল কাটার মরসুমে নিয়োগ করে তাদের। পঞ্চায়েত থেকেও কিছু সুযোগ-সুবিধা পায় রাত জাগা পাটি। ওদের টর্চ-বাঁশি-টুপি পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত

জ্যাকেটগুলোও। সবকটা জ্যাকেটের রং, ডিজাইন এক।

বাবা মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও রেনবোতে জয়েন করার আগে বহুবার রাত জাগা পাটিতে কাজ করেছে শৈলেন। এই মুহূর্তে পাটি অফিসের সামনে বসে থাকা ছেলেগুলো কিছুদিন আগেও তার ইয়ার-দোস্ত ছিল। শৈলেনের কথায় ভরসা করে তাদের অনেকেই রেনবোর পলিসি কিনেছে। কিন্তু আজ ওদের কাউকেই বন্ধু ভেবে নিশ্চিত্তে থাকতে পারবে না শৈলেন। পরিস্থিতি পাঁচিল তুলে দিয়েছে তাদের বন্ধুত্বের মাঝে।

শিয়াখালা থেকে রওনা হওয়ার সময় রাত জাগা পাটির বিষয়টা মাথায় ছিল না শৈলেনের। এখন ফসল কাটার মরসুম নয়, তবে ছিঁচকে চোরাদের কাজে বেরনোর নির্দিষ্ট সিজন নেই। যখন যে এলাকায় তাদের রুচি হয় তখন সেটাই তাদের কর্মক্ষেত্র। হয়তো গ্রামে এখন ছিঁচকে চোরের উপদ্রব চলছে, তাই তৎপর রাত জাগা পাটি।

শৈলেন একবার ভাবল আর না এগিয়ে স্টেশনে ফিরে যাবে। ঘণ্টাদুয়েক প্ল্যাটফর্মের বেষ্টিতে কাটিয়ে প্রথম ট্রেনে ফের নালিকুল। কিন্তু সেই কাজেও বিপদ আছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শৈলেন জানে, গাঁয়ের পথে রাত জাগা পাটিকে দেখে উলটোদিকে হাটা মানুষেরা সন্দেহের তালিকায় সবার উপরে থাকে। কাউকে তেমন করতে দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে লাঠিসোঁটা নিয়ে পিছু ধাওয়া করবে ছেলেরা। তাই এই মুহূর্তে স্টেশনে ফেরার চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং মাথা ঠান্ডা রেখে পাটি অফিসের সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শৈলেন নিশ্চিত ছিল তার হাঁটাচলার মধ্যে কোনওরকম ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়নি। নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল ছেলেগুলোকে প্রায় পেরিয়েই এসেছিল সে কিন্তু টুপি-মাস্কের অত্যধিক আড়ালই বোধহয় কৌতুহল উসকে দিল নৈশপ্রহরীদের। রাতের নিশ্চলতা চিরে ধেয়ে এল প্রশ্ন, “কে যায়!”

উত্তরটা হতেই পারত, ‘গব্বর সিং, মোগাষো, রঘু ডাকাত, ছোট চেন’!

রসিকতা করে রাত জাগা পাটির প্রশ্নের জবাবে এমন সব মজার উত্তরই ছুঁড়ে দেয় পরিচিতরা। কয়েক মাস আগেও শৈলেন রাত করে বাড়ি ফেরার সময় রাত জাগা পাটির মুখোমুখি হয়েছে। তখন এমন রসিকতার মোড়কেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে ভাগ করা বিড়িতে সুখটান দিতে-দিতে খোশগল্প করেছে কতবার। কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন।

গলা শুনে চিনতে পেরেছে শৈলেন, প্রশ্নটা করেছে সুখেন। একই বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছিল তারা। শৈলেন কলেজে ভর্তি হলেও সুখেন আর পড়াশোনা চালায়নি, বলা ভাল চালাতে পারেনি। বাপ মরা অভাবের সংসারে, পরিবারের বড় ছেলের কলেজে পড়ার বিলাসিতা মানায় না!

গত বছর এপ্রিলে শৈলেনের অনুরোধে রেনবো থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার পলিসি কিনেছিল সুখেন। মাসিক আয় প্রকল্পে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে যা দেয় তার তুলনায় অনেকটাই বেশি রেনবোর সুদের হার। প্রথম ছ’মাস সব ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু তার পর থেকে সুদ বাবদ আর কোনও টাকা পায়নি সুখেন। টোটোর আয় থেকে তিলে-তিলে জমানো টাকা সুখেনের। শৈলেন নিজে তাকে নিয়ে কলকাতার অফিসে গেছে বারতিনেক। চেনা-আধাচেনা-অচেনা ম্যানেজারদের অনুরোধ করেছে তার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। লাভ হয়নি কিছু। প্রতিবার দুই বন্ধুকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। সুখেনের যাতায়াত ভাড়া, খাওয়ার খরচ, সবই নিজের পকেট থেকে দিয়েছে শৈলেন। আজ মাঝরাতের অনভিপ্রেত মোলাকাতে সেইসব দিনগুলোর কথা মনে থাকবে সুখেনের?

“আমি... আমি শৈলেন। সুখেন নাকি?”

কয়েক মুহূর্তের নিশ্চলতা। তারপর প্রায় একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল ছায়া-ছায়া চেহারাগুলো। প্রশ্নকর্তা শৈলেনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে তার মুখে টর্চের আলো ফেলে বলে উঠল, “ওহঃ তুমি ফিরে এসেছ চাঁদু, ইংল্যান্ড-আমেরিকার ভাত পেটে সইল না!”

প্রশ্নকর্তা আর যেই হোক সুখেন নয়! চেহারা বা কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র অমিল না থাকলেও, গ্রাম ছাড়ার আগে যে সুখেনকে শৈলেন চিনত, টর্চ আর লাঠি হাতে পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তি সে নয়! স্কুলে যার সাথে শৈলেন বহুবার পাঁচ টাকার আলুকাবলি ভাগ করে খেয়েছে, নিজের সাইকেল বন্ধক রেখে যার বোনের চিকিৎসার টাকা জুগিয়েছে, আগুন চোখে চেয়ে থাকা এই ছেলে সে হতেই পারে না! শৈলেনের সঙ্গে তো নয়ই, এমন সুরে এবং স্বরে সুখেন কোনওদিন কথা বলেনি গ্রামের কারও সঙ্গেই!

ছায়ামূর্তিগুলো ঘিরে ধরেছে শৈলেনকে। পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, দৌড়াপে কোনওকালেই পটু নয় সে। তাছাড়া এতগুলো জোয়ান ছেলের সঙ্গে দৌড়ে এঁটে ওঠাও সম্ভব নয়। বরং এরা যা বলতে চায় চুপচাপ শুনে যাওয়াই ভাল। শুধু একটাই আক্ষেপ, ঘটনাটা আরও কিছু ক্ষণ আগে ঘটল না কেন! মেলার মাঠে কিংবা পোস্ট অফিসের সামনেও তো ওরা বসে থাকতে পারত! ঠিক এইখানে এমন পরিস্থিতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না শৈলেন!

সুখেন এগিয়ে এসে শৈলেনের মুখ থেকে হ্যাঁচকা টানে মাস্ক খুলে নিল। পিছন থেকে কুৎসিত গালাগালি করে কেউ তুলে নিল টুপি। একজন বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল তার চুলের মুঠি। শৈলেন শান্ত গলায় বলল, “আমি অসুস্থ মাকে দেখার জন্য এসেছি। কাল সকালে পঞ্চায়েত অফিসে আসব, তখন তোদের যা বলার আছে বলিস। এখন আমাকে যেতে দো!”

একটা খিঁচি দিয়ে কথা শুরু করল সুখেন, “...তোকে ছেড়ে দিই তারপর তুই আবার ভেগে যা আরকি! আমাদের সবাইকে কী গাভু পেয়েছিস নাকি, যে বারবার টুপি পরাবি আর আমরাও পরব! আজ এখানেই যা ফয়সালা হওয়ার হয়ে যাক!”

কথার শেষ সুখেন সজোরে চড় মারল শৈলেনের গালে!

খুলে গেল স্নাইস গোট। শুরু হল এলোপাথাড়ি কিল-চড়-লাথি। চলল গালাগালি!

বিনা প্রতিবাদে সব সহ্য করতে লাগল শৈলেন। দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়া এই মানুষগুলোকে চেনে সে। গাঁয়েই বাস ওদের। আশপাশের গ্রামেরও আছে কয়েকজন। পঞ্চমীর রাতে কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা আনতে যাওয়া, একসঙ্গে মড়া পোড়ানোর মতো অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে সবার সঙ্গে।

মার শুরু হতেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল শৈলেন। কারও দিকে তাকাতো ইচ্ছে করছিল না তার। কিল-চড়-লাথির চেয়েও এক লহমায় এতগুলো সম্পর্কের অপমৃত্যুর সাক্ষী হওয়া বেশি যন্ত্রণাদায়ক!

একটু পরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শৈলেন। ভাটা পড়ল কিল-চড়-লাথিতে। আধা অচেতন অবস্থায় শৈলেন টের পেল, কয়েকজন তাকে টানতে-টানতে নিয়ে চলেছে পাটি অফিসের দিকে।



হল্লাটা বেশ কিছু ক্ষণ ধরেই কানে আসছিল অন্ধিতার। আরজে পাটির পাহারা দেওয়ার রাতে গ্রামের মানুষ এমন হইচই শুনতে অভ্যস্ত। তেমন কিছু না ঘটলেও ছুতোয়-নাটায় চোঁচামেচি করা ছেলেগুলোর স্বভাব। এই হল্লাড়পনার দুটো কারণ আছে। সারাদিনের ক্লান্তি ঘুম হয়ে চোখে নেমে আসতে পারে না, আবার চোর বাবাজীবনও হল্লা শুনে গ্রামের ত্রিসীমানায় ঢোকার আগেই সটকে পড়ে। হয়তো মনে-মনে ভাবে, ‘উরিবাস, ও গাঁয়ে আজ বিরাট হুজুত, ধরা পড়লে কপালে দুঃখ আছে’!

বিশেষ কারণ না থাকলে প্রতিটা হল্লায় মেয়াদ গড়ে দশ-বারো

মিনিট। কোনও-কোনওটা পনেরো মিনিট পর্যন্তও গড়াতে পারে তবে তার আয়ু কখনই বিশ মিনিটের বেশি হয় না। কিন্তু আজকের হইচই স্বাভাবিক সময়সীমা অতিক্রম করেছে। রাতের নিস্তর্রতা খানখান করা কোলাহলে বন্য উত্তেজনার আঁচ!

চোরটা বোধহয় ধরা পড়েছে!

গত কয়েক দিন ধরেই গ্রামের এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে গায়েব হচ্ছিল টিউবওয়েলের মাথা, হাঁস-মুরগি, পাটের বস্তা। ছিঁচকে চোরটাকে আজ বোধহয় পাকড়াও করেছে রাত জাগা পাটি। গ্রামের একজন হিসেবে চোর ধরা পড়লে স্বস্তি পাওয়ার কথা অন্ধিতার। কিছুদিন আগে চোরের কৃপাদৃষ্টি তাদের বাড়িতেও পড়েছিল। দুটো এলইডি ল্যাম্প, ছাদে লটকানো ডিশ অ্যান্টেনা উধাও হয়েছিল সেই রাতে। তার পর দিন সকালে উঠে খুব রাগ হলেও এখন চোর ধরা পড়েছে ভেবে একটুও খুশি হতে পারল না অন্ধিতা। ধরা পড়ার পরে প্রথমে বেদম মার জুটবে চোরের কপালে। রাত জাগা পাটির সঙ্গে হাত লাগাবে গ্রামের লোকেরা। মারধরের পর সারারাত চোরকে ফেলে রাখা হবে ক্লাবঘরে। হয়তো একফোঁটা জলও জুটবে না তার কপালে। পরদিন সকালে মাথা নেড়া করে, দাড়ি-গোঁফ-ভুরু কামিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে চোরকে ঘোঁরানো হবে গ্রামের রাস্তায়। সব শেষে মুখে কালি মাখিয়ে তাকে তুলে দেওয়া হবে পুলিশের হাতে।

অন্ধিতা দেখেছে, বরাবরের শাস্ত নিরীহ মানুষগুলোও চোর ধরা পড়লে কেমন যেন পালটে যায়। সবার সঙ্গে হই-চই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোর পেঁচাতে। অপরাধী হলেও কারও সঙ্গে এমন অমানবিক ব্যবহার মেনে নিতে পারে না অন্ধিতা। তাই চোর ধরা পড়েছে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল তার।

শীত বিদায় নেওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। এখন লেপ নয়, পাতলা কাঁথাতেই দিব্যি চলে যায়। কোনও-কোনও দিন ভোরের দিকে লেপ খুলতে হয়।

আজ প্রয়োজন না থাকলেও কাঁথা সরিয়ে লেপটা টেনে নিল অন্ধিতা। ঢেকে নিল কান-মাথা। দরজা জানলা বন্ধই আছে। এভাবে শুলে আর কোনও আওয়াজ কানে আসবে না। পৈশাচিক উল্লাস অথবা কাতর আর্তনাদ, কোনটাই তার প্রিয় নয়।

কিন্তু লেপের আড়ালে গিয়েও হইহল্লা থেকে রেহাই মিলল কই! আজ যেন রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে আর জে পাটির হুঙ্কার! হঠাৎ হল্লাকে নেপথ্যে রেখে বারান্দায় শুরু হল উত্তেজিত নারী-পুরুষ কণ্ঠের অগ্ন্যুৎপাত! লেপ সরিয়ে বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করল অন্ধিতা। বাবার সঙ্গে মায়ের তর্ক বেঁধেছে যেন!

শুয়ে থাকা আর সম্ভব হল না অন্ধিতার পক্ষে। খাট থেকে নেমে বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলে দেখল তার অনুমানই ঠিক, তুমুল কথা কথাকাটি চলছে বাবা মায়ের মধ্যে! অন্ধিতাকে দেখে থেমে গেল দু'জনেই। বিরক্ত গলায় অন্ধিতা বলল, “ব্যাপার কী, এই রাতদুপুরে কী শুরু করলে তোমরা!”

ভ্যাবাচাকা খাওয়া গলায় মা বলল, “তুই আবার উঠে এলি কেন! যা গিয়ে শুয়ে পড়!”

বাগড়ার মাঝে এমন নির্বিষ আচরণ মায়ের চরিত্রসুলভ নয়! চিন্তা করার মতো কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই! রাত জাগা পাটির হল্লার আঁচও বেড়ে চলেছে ক্রমশ! বাবার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় অন্ধিতা প্রশ্ন করল, “কী হয়েছে বাবা, চোরটা ধরা পড়েছে? আর জে পি মারধর করছে খুব?”

হঠাৎ যাবতীয় তেজ-বাল-বিদ্বেষ ফিরে এল মায়ের গলায়। ঝাঁচিয়ে উঠে বলল, “হ্যাঁ চোরই ধরা পড়েছে! একটা কুলাঙ্গারের যা প্রাপ্য, সেটাই মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে! তোমাকে আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না! যাও ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো গো!”

সামনের রাস্তা দিয়ে একজন ছুটে গেল পাটি অফিসের দিকে। তার টর্চের আলোয় কয়েক মুহূর্তের জন্য ফালাফালা হল বারান্দার অন্ধকার।

অন্ধিতা আসার পর থেকেই গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

বাবা। অন্ধিতা কাছে গিয়ে বাবার পিঠে হাত রেখে বলল, “কী হয়েছে বাবা, পাটি অফিসের সামনে অত হইচই কিসের?”

“শৈলেন,” বিড়বিড় করে উঠল বাবা, “শৈলেন বাড়ি ফিরছিল। রাত জাগা পাটির ছেলেরা ধরেছে তাকে!”

মুহূর্তে শরীর অবশ হয়ে গেল অন্ধিতার। মনে হল এফুনি সে লুটিয়ে পড়বে মেঝেতে!

সেদিন কথা বলার সময় গ্রামে ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল শৈলেন। নিষেধ করেছিল অন্ধিতা। বোঝাই যাচ্ছে, সাবধানবাণী কানে তোলেনি সে। এই সময় গ্রামে ফেরা তার পক্ষে কতটা বিপদজনক আন্দাজ করতে পারেনি বোধহয়! মানুষ খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে আছে, বাগে পেলে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, এসব কথা সেদিন বলতে পারেনি অন্ধিতা। একটু রেখেটেকেই বলেছিল সব। ভেবেছিল তার সঙ্গে আলোচনা না করে বাড়িতে ফেরার ভুল করবে না শৈলেন। কিন্তু হঠকারীর মতো সেই কাজটাই করে বসল ও!

আতঙ্কিত গলায় অন্ধিতা বলল, “এখন কী হবে! ওরা যে ওকে মেরে ফেলবে!”

বড় শ্বাস ফেলে বাবা বলল, “যাই দেখি, কতদূর কী করতে পারি! দরজাটা বন্ধ করে দে।”

মা দৌড়ে এসে বাবার পথ আগলে বলল, “কোথাও যাবে না তুমি। একটা চোর চিটিংবাজকে বাঁচাতে রাতদুপুরে চ্যাংড়া ছেলেপুলেদের মধ্যে যেতে চাইছ! তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল!”

বাবা শাস্ত গলায় বলল, “আমাকে বাধা দিয়ো না। ছেলেরা কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। পথ ছাড়ো।”

বাবার কণ্ঠস্বরে বিশেষ কিছু ছিল। মা আর বাধা না দিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। বাবা টর্চ জ্বেলে গেটের তালা খুলতে লাগল। অন্ধিতা দ্রুত ঘর থেকে চাদর গায়ে দিয়ে এসে বলল, “চলো বাবা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।”

বাবা বিস্মিত হয়ে বলল, “এত রাতে তুই কেন! আমিই যা করার করছি, তাকে যেতে হবে না!”

“না, আমি তোমার সঙ্গে যাব। বারণ করো না।”

কয়েক সেকেন্ড অন্ধিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বাবা বলল, “চল তবে!”

“থাকল তোমাদের বাপ-মেয়ের সংসার! আমি যদি কবে দু'চোখ যায় চলে যাচ্ছি!” গনগনে গলায় কথাগুলো বলে ঘরে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করল মা। বাবার পিছু-পিছু বারান্দা থেকে নেমে গ্রিলের গেটটা ভেজিয়ে অন্ধিতা বলল, “তালা দেবে না?”

“দিবি দে, রাত জাগা পাটি ওদিকে ব্যস্ত, চোর এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। তবে নিশ্চিন্ত থাক, তোর মা কোথাও যাবে না।”

সেই বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিন্ত অন্ধিতা। সে জানে, মায়ের যাবতীয় তর্জন-গর্জন মুখেই। তিলে তিলে গড়ে তোলা সংসার ফেলে মা কোথাও যাবে না। সারাক্ষণ পরিবারের বাকি দু'জনকে ভাল রাখার চিন্তায় মা অস্থির। অন্ধিতাও তো চায় নিজের ভাল থাকতে, বাবা মাকে সুখী করতে। কিন্তু অথও সুখ বলে কিছু আছে নাকি দুনিয়ায়! দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার ভাঁজে-ভাঁজে খুঁজে নিতে হয় সুখের পরশ। শৈলেনের সঙ্গে তার অনেকদিনের সম্পর্ক। আজ তার বিপদের দিন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুখী হতে পারবে সে!

অন্ধিতার মনে আছে, ছোটবেলায় মাঝেমাঝে না খেয়ে স্কুলে যেতে হত তাকে। বাবার কাজকর্ম না থাকায় নিয়মিত হাঁড়ি চড়ত না ঘরে। জুটমিলে বাবা চাকরি পাওয়ার পরে সংসারে এসেছে সচ্ছলতা। এককালে অভাবের তুঙ্গ রূপ দেখেছে বলেই বোধহয় রোজগারহীন মানুষদের প্রতি এমন তীব্র বিতৃষ্ণা মায়ের।

বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিল বাবা। অন্ধিতা জোরে পা চালিয়ে তার পাশে গিয়ে জিপ্সেস করল, “ওরা শৈলেনকে ধরেছে তুমি জানলে কেমন করে?”

“হইচই শুনে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। টিপুদা ফিরছিল।”

বনানীদের বাড়ির পিছনে একটা পুকুর। তারপর ধুতরোর ঝোপ

পেরিয়ে বাঁক নিলেই পাটি অফিস।

হইচই আরও স্পষ্ট। বৃকের ভিতরে হাতুড়ি পেটার শব্দও দ্রুত হচ্ছিল অকিতার। না জানি রাতদুপুরে কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্য অপেক্ষা করছে তার জন্য!



পরেশ আগরওয়ালকে ভারি পছন্দ হয়েছে মোহন দত্তের। এই সময় এমন একজন দক্ষ মানুষকে খুঁজছিলেন তিনি। পরেশ সত্যিই খুব কাজের। আজ পর্যন্ত মোহন দত্ত যখন যেমন চেয়েছেন, হাজার ছুজুত পুইয়ে হাজির করেছে সেটা। তবে পরেশ আগরওয়ালকে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে প্রথমে একটু দ্বিধায় ছিলেন মোহন দত্ত। বুঝতে পারছিলেন না, একজন মানুষ, যাকে কিছুদিন আগেও তিনি চিনতেন না, তাকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়। তবে জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছেন তিনি। লোভীরা টাকার জন্য কী করতে পারে সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে তার!

গত এক মাসে পরেশ আগরওয়ালের চরিত্রের একটা দিক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মোহন দত্তের কাছে। অসম্ভব টাকার খিদে লোকটার। সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কোনও কাজ নেই, টাকার বিনিময়ে যেটা করতে রাজি হবে না পরেশ আগরওয়াল। এখানে আসার পর থেকে খুব সচেতনভাবেই মোহন দত্ত পরেশের কাছে নিজেকে টাকা কামানোর স্কোপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। খরচ করেছেন দেদার টাকা। যে জিনিস একশো টাকায় পাওয়া যায় তার জন্য, হাসতে হাসতে গুনেছেন দশ গুণ টাকা। পরেশ আগরওয়াল নোশাওস্ত হয়ে পড়েছে টাকার এমন সহজ প্রবাহে। এখন ইজি মানির হাতছানি উপেক্ষা করা কঠিন তার পক্ষে! প্রস্তাবটা এবার দেওয়াই যায় তাকে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চার পর রুম সার্ভিসের ছেলেকে দিয়ে পরেশ আগরওয়ালকে ডেকে পাঠালেন মোহন দত্ত। অজান্তা ঘরে নেই, দুপুরে খাওয়ার পরে হিটতে বেরিয়েছে। পরেশ হস্তদস্ত হয়ে হাজির হতেই মোহন দত্ত তাকে বললেন, “আপনার এখানে কয়েকটা দিন খুব ভাল কেটেছে মিস্টার আগরওয়াল, কিন্তু এবার যে গুড বাই বলার সময় এসেছে।”

“সে কী! চলে যাবেন স্যর! আর কিছুদিন আপনাকে সেবা করার সুযোগ পাব না আমরা! আমাদের কাজে কোনও ত্রুটি হয়নি তো?”

দুঃখের ছায়া পরেশের মুখে। দুঃখটা যে নির্ভেজাল সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এমন নির্বিবাদী, রসালো বোর্ডার দশ বছরে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। গেস্টহাউসে কিছু রেনোভেশনের প্রয়োজন ছিল। আর হপ্তাদুয়েক মোহনজি থাকলে কাজটা স্বছন্দে হয়ে যেত।

“না-না, কোনও ত্রুটি হয়নি। আপনার ব্যবস্থাপনায় আমি মুগ্ধ। তাই তো চলে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা বড় কাজের ভার দিতে চাই। তাতে লাভ আপনার, লাভ আমাদের। বলুন করবেন কিনা।”

কী কাজ না শুনেই ইতিবাচক ভঙ্গিমায মাথা ঝুঁকে দিল পরেশ। টাকা ভর্তি স্টুকেসটা বিছানার উপরে খোলা অবস্থাতেই পড়ে ছিল, ঘরে ঢুকেই সেটা চোখে পড়েছে তার!

স্টুকেসে একবার হাত বুলিয়ে মোহন দত্ত বললেন, “গুড, আমি জানতাম কাজটা আপনি পারবেন। তাই তো এটা আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। এতে পঁচিশ লাখ আছে!”

“বলুন স্যর কী করতে হবে, আপনি চাইলে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়োটা কেটে আপনার বাড়ির বাগানে বসিয়ে দিতে পারি!” খুশিতে গলা প্রায় বুজে এসেছে পরেশের!

হো-হো করে হেসে উঠে মোহন দত্ত বললেন, “অত কঠিন কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেব না মিস্টার আগরওয়াল, আমি একজন বিশেষ মানুষকে খুঁজছি। আপনার কাজ, ঠিক লোকটাকে খুঁজে এনে আমার সামনে হাজির করা। তাহলেই টাকা সহ স্টুকেস আপনার।”

হাত কচলাতে-কচলাতে দু’পা এগিয়ে এসে পরেশ বলল, “বলুন কে সেই লোক স্যর, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে আপনার সামনে হাজির করব।”

স্টুকেসের ডালাটা বন্ধ করে মোহন দত্ত বললেন, “না-না, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আরও দু’চার দিন আপনার এখানে থাকার ইচ্ছে আমার। তারপর যাব নেপালে। আপনি এমন একজন মানুষকে নিয়ে আসুন, যে আমাদের নিরাপদে নেপাল বর্ডার পার করিয়ে দেবে। মনে রাখবেন, মানুষটা বিশ্বস্ত এবং দক্ষ হওয়া চাই। ঠিক আপনারই মতো!”

এই সামান্য কাজের জন্য পঁচিশ লাখ! হাজারটা ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে জানাশোনা আছে পরেশের। একটা ফোন করলেই তারা নির্দিষ্ট দিনে এয়ার টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেবে। গাড়ি করে দত্ত দম্পতিকে গেস্টহাউস থেকে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাওয়া সহ নেপালে হোটেল বুকিং, সবই সামলে দেবে পেশাদারি দক্ষতায়। কিন্তু তার জন্য পঁচিশ লাখ! সবকিছু গুছিয়ে করার জন্য কয়েক হাজার টাকাই তো যথেষ্ট!

আমতা আমতা করে পরেশ বলল, “আপনি অনুমতি দিলে আমিই ফ্লাইটের টিকিট করে দিতে পারি। গাড়িতে এখান থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব সময়মতো। কাঠমাডুর ভাল ভাল হোটেলে জানাশোনা আছে আমার। কথা বলব তাদের সঙ্গে।”

মুদু হেসে মোহন দত্ত বললেন, “এসব কাজ তো একজন সাধারণ ট্রাভেল এজেন্টই করতে পারে মিস্টার আগরওয়াল। একটা ফোনেই সব হয়ে যাবে। তাহলে আপনাকে খামোখা এতগুলো টাকা কেন দিতে যাব!”

কথাটায় যুক্তি আছে। পঁচিশ লাখ টাকা মোহন দত্তের হাতের ময়লা হতে পারে, কিন্তু তিনি তো দানছত্র খুলে বসেননি! এতগুলো টাকা তিনি খরচ করবেন অথচ তার পিছনে কোনও মিস্ত্রি থাকবে না তা কী করে হয়! মাথা চুলকে পরেশ বলল, “সে তো বটেই স্যর, আপনি এমনি-এমনি এতগুলো টাকা কেন খরচ করবেন! আমাকে আর কিছু করতে হবে, মানে বিশেষ কোনও কাজ?”

“এই তো সমঝদারের মতো কথা বলছেন পরেশজি”, অমায়িক হাসি ছড়িয়ে পড়ল মোহন দত্তের মুখে, “ফ্লাইট নয়, এখান থেকে বাই রোড আমি নেপালে যাব। চেকপোস্টের হাপা আমার পোষাবে না। আমি এমন একটা রাস্তা দিয়ে নেপালে ঢুকতে চাই, যেখানে সীমান্তসুলভ কড়াকড়ি নেই। নেই সিআইএসএফের ছুজুত, কাস্টমসের খুঁতখুঁতানি। নদীর প্রবাহ, বাতাস, সূর্যকিরণ যেমন বিনা বাধায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে পারে, আমিও তেমনই দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে চাই। আছে আপনার জানাশোনা এমন কোনও লোক, যে এই কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারবে?”

অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল, মোহন দত্ত নামের লোকটা তার সাজানো বউ অজন্তাকে নিয়ে বেআইনিভাবে বর্ডার পেরোতে চায়! আগে কাউকে এমন কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা করেনি পরেশ। তবে আগে করেনি বলে ভবিষ্যতে করা যাবে না এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে! পঁচিশ লাখ বড় কম টাকা নয়। সোজা পথে ওই টাকা রোজগার করতে সারা জীবন কেটে যায়। কোকসার গ্রামের সাহির এই ধরনের গোলমালে কাজ করে বলে শুনেছে পরেশ। সেবার কেলংয়ে গিয়ে রবি খের নামে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কথায়-কথায় রবি বলেছিল, কখনও নকল আধার কার্ড, প্যান কার্ড অথবা পাসপোর্টের প্রয়োজন হলে তাকে জানাতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজ্জিত জিনিসটা পৌঁছে যাবে হাতে! খরচপাতি যুক্তিসঙ্গত! রবি কিংবা সাহিরের কাউকেই সুবিধেজনক মনে না হলেও তাদের ফোন নম্বর সেভ করে রেখেছে পরেশ। জীবনে কখন কে কীভাবে কাজে লেগে যায় আগাম বলা যায় না। আজ হয়তো ওদের দৌলতেই পঁচিশ লাখ টাকা পকেটে পুরবে সে! আত্মবিশ্বাসী গলায় পরেশ বলল, “নিশ্চয়ই আছে স্যর। আমার জানাশোনা দু’য়েকজন আছে যারা কাজটা সুন্দরভাবে করতে

পারবে। তাদের মধ্যে সেরা লোককেই ডেকে পাঠাচ্ছি।”

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মোহন দত্তের মুখ। সূটকেস খুলে দুটো বাস্তিল বের করে পরেশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “চার আছে। বাকিটা সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পরে।”

কুতকুতে চোখে বাস্তিলদুটো জরিপ করে সেগুলো পকেটে পুরে পরেশ বলল, “নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার, আপনি যেমন চাইছেন সেভাবেই সব হয়ে যাবে। কেউ কিছু টের পাবে না!”



হঠাৎ অস্বস্তিটা গাঢ় হয়ে চেপে বসল অজন্তার মনে।

দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য অস্ত গেছে একটু আগে। আঁধার এখনও ঘন হয়নি তবে দ্রুত ফিকে হয়ে আসা কমলা আকাশ বার্তা দিচ্ছে পাহাড়ের বুকে দিনের মেয়াদ ফুরোতে চলল।

একটু আগে একটা ছোট ঘটনায় ভারী বিরক্ত হয়েছিল অজন্তা। একটা বাইক বিকট শব্দ করতে-করতে ছুটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। জঙ্গলের প্রান্তে, নির্জন পাহাড়ি পথে অমন আওয়াজ বেমানান। আগেও কয়েকবার বাইকটাকে যাতায়াত করতে দেখেছে অজন্তা। সমতলের মতো না হলেও আজকাল পাহাড়ি পথে বাইকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অজন্তা দ্বিচক্রযানের মধ্যে আলাদা করে একটা বাইককে চিনে রাখা অসম্ভব, কিন্তু অমন বিদঘুটে আওয়াজের জন্যই বাইকটাকে ভুলতে পারেনি অজন্তা। পাহাড়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বেশ কড়া। তা সত্ত্বেও বিগড়ানো সাইলেন্সার পাইপ নিয়ে, বিকট শব্দ উগড়ে দিনের পর দিন একটা বাইক যাতায়াত করে কেমনভাবে!

বাইকটা চলে গিয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। তার পর থেকে বেমানান কিছু না ঘটলেও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি দানা বাঁধছিল অজন্তার। কিন্তু অনেক ভেবেও এমন অনুভূতির উৎস খুঁজে পেল না সে। বাইক পর্ব বাদ দিলে এই পাহাড়ি পথের বাঁকে এমন কিছুই ঘটেনি যা তার অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

অজন্তা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কংক্রিটের বেষ্টির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য। সামনের পাহাড়ে একজন দেহাতি মানুষ দ্রুত পাকদণ্ডী বেয়ে উঠছে। ভূমিপুত্র না হলে অমন খাড়া রাস্তায় দড়ি বা লাঠির সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে চলা সম্ভব নয়। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে এক সারি কুঠিয়া দেখা যাচ্ছে। তারই একটা সম্ভবত লোকটার গন্তব্য। অন্ধকার নামার আগেই সে পৌঁছতে চায় চার দেয়ালের আশ্রয়ে। বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল অজন্তা। তারপর চোখ নামাতেই দৃষ্টি আটকে গেল নীচের পাহাড়ি পথের ধাপে। শহুরে পোশাক পরা দুটো ছেলেমেয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে অলসভাবে হেঁটে চলেছে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, বুপ করে আঁধার নামলে খুশিই হবে তারা।

অজন্তা বিশ্বাস করে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে। সিন্ধুথ সেপ অনেকবার ঘটে চলা ঘটনার আগাম আভাস দিয়েছে তাকে। এই মুহূর্তে এক শান্ত সবুজ নিরুপদ্রব পাহাড়ের কোলে বসে থাকলেও তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলতে চাইছে, ‘সাবধান! বিপদ ঘনি়ে আসছে!’

পাথির ডাকে মুখরিত পাইনবন পেরিয়ে ভেসে আসছে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ। বেশ কিছু ক্ষণ কান পেতে সেই আওয়াজ শুনল অজন্তা। আওয়াজের উৎস অনেক দূরে। এখান থেকে আন্দাজ করা কঠিন শব্দটা কিসের। তবে ওই আওয়াজ অত্যন্ত মৃদু, সাইলেন্সার পাইপ বিগড়ানো বাইকের মতো মনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না!

চারদিকে এমন পরিপূর্ণ শান্তির আবহে কোন বিপদ ওত

পেতে আছে?

কোনও দিক থেকে বিপদের ন্যূনতম সম্ভাবনা না থাকলেও অজন্তা ঠিক করল গেস্টহাউসে ফিরে যাবে। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে একটা অদ্ভুত নিরাপত্তাবোধ কাজ করে। বন্ধ ঘরে হাঁপিয়ে উঠে মানুষ যেমন প্রকৃতির কোলে ছুটে যায়, তেমনি উলটোটাও ঘটে মাঝেমাঝে।

গেস্টহাউসের দিকে সরে পা বাড়িয়েছে অজন্তা, এমন সময় সামনে উদয় হল এক ভিথিরি। স্থানীয় ভাষায় কিছু বলে বাড়িয়ে দিল হাত।

গত চার সপ্তাহে একটাও ভিথিরি চোখে পড়েনি অজন্তার। এখানে খাবারের দাম স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বেশি। সুভেনির শপে বিশ টাকার জিনিস তিনশো টাকায় বিক্রি হয়। এ ছাড়াও পর্যটকদের পকেট কাটার হাজার রকম প্রলোভন ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। প্রথমবার বেড়াতে আসা আনাড়ি ফ্রেতার ঠকতে বাধ্য। তবে একটা কথা মানতে হবে, এখানে সকলেই গায়ে গতরে খেটে পয়সা উপার্জন করে। বেঁচে থাকার জন্য অন্যের করুণার উপর নির্ভর করে না। ভিথিরিটা তাই এই সুন্দর শৈলশহরের বুকে বড়ই বেমানান!

ভিথিরিটার পোশাক এবং চেহারা ভিথিরির মতোই। নোংরা, বিবর্ণ, জীর্ণ। তবে কাঁধের উপর ভাঁজ করা কঞ্চলটা নতুন। হয়তো কোনও দয়ালু মানুষ কঞ্চলটা দান করেছে ওকে।

পার্স থেকে একটা দু'হাজার টাকার নোট বের করে ভিথিরিটার দিকে এগিয়ে দিল অজন্তা। নোটটা হাতে নিয়ে ভিথিরি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। ভিক্ষে হিসেবে কেউ এত টাকা দিতে পার এ তার কল্পনার অতীত।

টাকাটা দিয়ে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না অজন্তা, হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। দিনের আলো ফুরিয়েছে আগেই। সরু পাহাড়ি পথে মায়াজাল বিস্তার করেছে বাতিস্তত্তের সৌর আলো।



একেই বলে ‘কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ’!

বাড়ির সামনে প্রমাণ সাইজের উঠোন। সেটা পেরিয়ে বিঘে তিনেক ফাঁকা জমি। বহুদিন ওখানে ফসল ফলেনি। তারক গুহ ঠিক করে ফেলেছেন ওই জমিতে তিনি মরসুমি শাক-সবজি লাগাবেন। লাউ-কুমড়া-উচ্ছে-ঢাড়া-পালংশাক এইসব। বাজারের হাইব্রিড সবজিতে আজকাল কোনও স্বাদ পাওয়া যায় না। নিজের হাতে লাগানো দেশি সবজি নিশ্চয়ই সুস্বাদু হবে!

গাছ লাগানোর পর সকাল-সন্ধ্যে তিনি নিজে সেগুলোর পরিচর্যা করবেন। দেবেন পরিমাণমতো জল, প্রয়োজনমত ফিক সাঁর। সার বলতে অবশ্যই জৈব সার। তারক গুহর জমিতে কোনও কেমিক্যাল সারের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সিকিমের মতো একটা গোটা রাজ্য যদি অর্গানিক ফার্মিংয়ের উপরে টিকে থাকতে পারে, তবে মাত্র তিন বিঘা জমিতে সেটা করে দেখানো সম্ভব নয় কেন! তারক গুহ নিজের খামারের তৈরি করবেন কম্পোজড সার, কেঁচো সার। চাষের আগে মাটি তৈরি থেকে শুরু করে চাষের প্রতিটা পর্যায় ব্যবহার করা হবে রাসায়নিক বিষবিহীন সেই সার।

বাড়ির পিছন দিকের পুকুরটা নিয়েও পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন তারক গুহ। একটা মিশ্র খামার গড়ে তুলবেন তিনি। পুকুরে থাকবে মাছ, পাড়ে হাঁস-মুরগির খাঁচা। তেমন সুবিধা হলে কোয়েলও রাখা যেতে পারে কয়েক পিস। একবার দেওঘরে গিয়ে কোয়েলের মাংস খেয়েছিলেন তিনি। আহা কী তার স্বাদ, আজও মনে পড়লে জিভে জল আসে!

একসঙ্গে হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষের অনেক সুবিধা। পাখিদের

বর্জ্য মাছের ভাল খাবার। পুকুরে থাকবে ট্যাংরা, শোল, শিঙি, খয়রা। পাড় থেকে গড়িয়ে পড়া খাবার খেয়ে তরতর করে বেড়ে উঠবে মাছগুলো। দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে ট্যাংরা মাছের ঝাল, সরষে বাটা দিয়ে খয়রা মাছ! ভাবতে ভাবতে আরও একবার জিভে জল এসে গেল তাঁর।

মাঝারি চুমুকে কাপের বাকি চা শেষ করে তারক গুহ বললেন, “তাহলে ওটাই আপনার ফাইনাল দাম দাসবাবু, বিশ লাখের নীচে আপনি নামতে পারবেন না। তাই তো?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। ওই দামে জমি-বাড়ি বেচতে পারলে আমি সব দায় থেকে মুক্ত হতে পারব। এই বুড়োবয়সে একটু শান্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না। গিমির তো এখন-তখন অবস্থা। পরশু রাতে কপালজীরে বেঁচে গিয়েছে ছেলোট। সঞ্জয়বাবু আর তাঁর মেয়ে ঠিক সময়ে পার্টি অফিসে না পৌঁছলে ওরা পিটিয়েই মেরে ফেলত জলজ্যান্ত ছেলোটাকে! গরমেন্ট কী করবে জানি না, আসল লোক আদৌ ধরা পড়বে কিনা তাও জানি না, তবে চোখ বোজার আগে ওই দেনার বিষ আমি মিটিয়ে দিয়ে যাব। ছেলোট যাকে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে, বাবা হিসেবে সেটা দেখা আমার কর্তব্য।”

আড়চোখে একবার ঘরের দিকে তাকালেন তারক গুহ। শরীরে অনেকগুলো ব্যান্ডেজ নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে প্রলয় দাসের ছেলে। রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ার ফাঁকে-ফাঁকে তার কপালের ফেট্রি পালটে দিয়ে যাচ্ছে বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটা মেয়ে। এই মাঘে ওই মেয়েটার সঙ্গেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল প্রলয় দাসের ছেলের। দেখতে মন্দ নয় মেয়েটা। কথাবার্তা শুনে মনে হয় পেটে কালির আঁচড়ও আছে। একটা দাগি ছেলেকে বেড়ে ফেলে নির্বাঙ্কট জীবন বেছে নিতে পারত মেয়েটা। অথচ গ্রামের লোকের গঞ্জন মাথায় নিয়ে হাজির হয়েছে গণপ্রহারে আধমরা হবু বর আর তার মুমূর্ষু মায়ের সেবা করার জন্য। কে বলে সত্যিকারের ভালবাসা আজকাল উবে গিয়েছে পৃথিবী থেকে! এই তো আজ পাড়াগাঁয়ের তথাকথিত গৈঁয়ো একটা মেয়ে লিখে চলেছে প্রেমের নবতম উপাখ্যান! আপাতত ভগ্নস্তূপের মতো বিছানায় পড়ে থাকলেও প্রলয় দাসের ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এমন একটা মেয়েকে পাশে পেলে জীবনের লড়াইগুলো অনেক সহজ, সুন্দর হয়ে ওঠে!

চোখ বুজে কিছু ক্ষণ চিন্তা করলেন তারক গুহ। উত্তরপাড়ার এই এলাকায় জমির দাম চলছে বিঘাপ্রতি কমবেশি পাঁচ লাখ। মানে তিন বিঘা চাষের জমির দাম পনেরো লাখ। সঙ্গে দশ কাঠার পুকুর, দুটো আম গাছ, একটা ভাঙাচোরা গোলা আর জমি লাগোয়া পাকা বাড়ির জন্যে প্রলয় দাস দাম চাইছে বিশ লাখ। এমন লাভজনক প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই যায়। এই টাকার উপরে আরও লাখদুয়েক খরচ করলে খামারবাড়িটা মনের মতো করে সাজিয়ে নেওয়া যাবে। সব ঠিকঠাক চললে এমন সম্পত্তি কুড়ি লাখ টাকার বিনিময়ে কিছুতেই হাতছাড়া করতে না প্রলয় দাস, কিন্তু এখন আতান্তরে পড়েছে সে, যত তাড়াতড়ি সম্ভব টাকটা চাই তার।

যতদিন বেঁচে থাকবেন আজকের দিনটা ভুলতে পারবেন না তারক গুহ। আজ অফিসের কাজে এদিকে এসে প্রলয় দাসের বাড়িতে টু মারার ইচ্ছেটা যে তার স্বপ্নপুরণের চাবিকাঠি হয়ে উঠবে তা ঘৃণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি তিনি। ভাগ্যিস বিপদে পরেছিল প্রলয় দাস, তাই তো অবসর জীবন ফার্মহাউসে কাটানোর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে তাঁর! একেই বলে ‘কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ’! মানতেই হবে, এক একটা বাংলা প্রবচন অনেক প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার ফসল!

“বেশ তবে ওই কথাই থাকল দাসবাবু। দামটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে বটে, তবে আপনার পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওতেই রাজি হলাম। যত তাড়াতড়ি সম্ভব দলিলপত্রের কপি আমার অফিসে পৌঁছে দেবেন। উকিলকে দিয়ে সার্চ করাব। সব ঠিকঠাক থাকলে ফাল্গুনের প্রথমেই রেজিস্ট্রি।”

আনন্দে বুজে গেল প্রলয় দাস। ভেজা গলায় বলল, “কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব স্যর, আপনি মানুষ নন, দেবদূত! আমাদের উদ্ধার করার জন্যেই ভগবান পাঠিয়েছেন আপনাকে।

দুর্ঘটনা ঘটল পরশু রাতে আর আজ সকালেই আপনার পায়ের ধুলো পড়ল গরিবের ঘরে। একে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কী বলব!”

একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে টান দিয়ে তারক গুহ শুধোলেন, “কোথায় যাবেন ঠিক করলেন?”

চাদরের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে প্রলয় দাস বলল, “এখনও ঠিক করিনি স্যর, তবে দীনবন্ধুপল্লির দিকে সস্তায় জমি পাওয়া যায়। দেনা শুধতে পনেরো লাখ মতো লাগবে। বাকি টাকায় দু’কাঠা জমি আর একটা টালির ছাবরা ঠিক হয়ে যাবে। এই বয়েসে যে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হবে না, সেও তো ঈশ্বরের কৃপা!”

দীনবন্ধুপল্লি জায়গাটা চেনেন তারক গুহ। বছরে পাঁচ মাস ওখানে বর্ষার জল জমে থাকে। সস্তা দেখে প্রথমে ওখানেই ফার্মহাউসের জন্য পাঁচ বিঘা জমি কিনবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সব জেনে পিছিয়ে এসেছেন। কপালের ফেরে এমন সুন্দর জমি-বাড়ি ছেড়ে ওই এঁদো জায়গায় চলে যেতে হবে প্রলয় দাসকে!

“ঠিক আছে চলি। কাগজপত্র নিয়ে কাল-পরশু অফিসে আসুন” বলে রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন তারক গুহ। থামলেন তরুণী কণ্ঠে।

“দুপুরবেলা না খেয়ে চলে যাবেন স্যর, ভাত হয়ে গেছে, দুটো খেয়ে যান।”

প্রলয় দাসের হবু বৌমা এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। তারক গুহ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, “আজ থাক মা, অফিসে অনেক কাজ পড়ে আছে। ভাত খেতে গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তবে কথা দিচ্ছি, একদিন এসে পাত পেড়ে খাব তোমার হাতের রান্না। আজ চা খাইয়ে লোভ ধরিয়ে দিয়েছি!”

কথাগুলো বলে চলে আসার ইচ্ছে ছিল তারক গুহর। কিন্তু অনেক সময় কেজো হিসেব নিকেশের বাইরে কিছু কাজ করে ফেলে মানুষ। অঙ্কিতার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, “সুখী হও মা, সুখী হও!”



একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল মোহন দত্তের। কাল সারারাত উত্তেজনায় ঘুম হয়নি, আজ খুব ভোরে রওনা হতে হয়েছে। ব্রেকফাস্ট করার পরে তাই চোখটা বুজে এসেছিল। চোখ মেলে তিনি বললেন, “কী হল নীতীশ, গাড়ি থামালে কেন?”

বয়স অল্প হলেও নীতীশের গাড়ি চালানোর হাত দুর্দান্ত। পাহাড়ি পথে এমন একজনের হাতে স্টিয়ারিং হুইল থাকলে আরোহীরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। চিউইংগাম চিবোতে-চিবোতে ঝকঝকে ইংরেজিতে নীতীশ জবাব দিল, “ঠিক বুঝতে পারছি না স্যর, সামনে গাড়ির লম্বা লাইন। বোধহয় রাস্তা খারাপ, ধস নেমেছে।”

চিন্তার ভাঁজ ফুটল মোহন দত্তের কপালে। সব ঠিকঠাক চললে নেপালে পৌঁছতে কমবেশি বিয়াল্লিশ ঘণ্টা লাগবে। রাতে বিশ্রামের জন্য থামতে না হলে তিরিশ ঘণ্টাতেই পাড়ি দেওয়া যেত এই পথ। মোহন দত্তেরও সেরকমই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুটো কারণে সেটা সম্ভব নয়। ঘন কুয়াশার কারণে ক’দিন ধরেই সন্দের পর এই পথে দৃশ্যমানতা শূন্যের কাছাকাছি নেমে যাচ্ছে। এমন রাস্তায় রাতে গাড়ি চালানো বিপদজনক। তাছাড়া কোনও ড্রাইভারের পক্ষেই একটানা চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ি চালানো উচিত নয়, তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। বিরক্ত গলায় মোহন দত্ত বললেন, “ধস নেমেছে! কী আশ্চর্য, ধস

নামার আর সময় পেল না।”

মোহন দত্তের কথায় আশঙ্কার সূরটা ধরতে পেলে সামনের সিট থেকে সাহির বলল, “আপনি আর ম্যাডাম গাড়িতেই থাকুন স্যর, আমি একটু এগিয়ে দেখি কী পরিস্থিতি।”

এই সাহির নামের লোকটাকেও ভারী পছন্দ হয়েছে মোহন দত্তের। লোকটার হাতের কাজ প্রশংসা করার মতো। গতকাল গেস্টহাউসে পৌঁছে এক বেলার মধ্যেই প্রয়োজনীয় পারমিট তৈরি করে ফেলেছে। ইন্ডিয়া বা নেপালের বাঘা-বাঘা অফিসারদের অনায়াসে ধোঁকা দেওয়ার মতো নিখুঁত সেসব কাগজ। তাছাড়া গোটা উত্তর ভারত নিজের হাতের তালুর মতো চেনে সাহির। কোন পথে গেলে সবচেয়ে কম হুজুতে দেশের বাইরে পা রাখা সম্ভব, সেটা খুব ভাল জানা আছে তার। মনে-মনে এমন একজনকেই চাইছিলেন মোহন দত্ত। মানতেই হবে পরেশ আগরওয়ালের এলেম আছে, বেছে-বেছে সেরা লোককেই হাজির করেছে!

পরেশ আগরওয়াল সাহিরকে পই-পই করে বুঝিয়ে দিয়েছে, মোহন দত্ত এবং অজন্তা ম্যাডামকে সীমান্ত পার করিয়েই দায়িত্ব শেষ হবে না তার। পোখরায় আছপতির বাংলায় মালপত্রসহ দু’জনকে পৌঁছে দিয়ে তবে তার ছুটি। মনের মতো পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সাহির সানন্দেই রাজি হয়েছে সেই দায়িত্ব পালনে।

একটানা এই গাড়িতেই পোখরা যেতে পারলেই খুশি হতেন মোহন দত্ত, কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। নীতীশকে ছেড়ে দিতে হবে আগেই। গাড়ি নিয়ে নেপালে ঢুকবে না সে। সীমান্তের ওপার থেকে পোখরা যাওয়ার জন্য অন্য গাড়ি ভাড়া করতে হবে। তবে ওইসব ছোটখাটো ঝুটঝামেলা নিয়ে ভাবছেন না মোহন দত্ত, সাহির যতক্ষণ সঙ্গে আছে, সব সামলে দেবে। কিন্তু মাঝপথের এই ধস তাঁর হিসেবের মধ্যে ছিল না। রাস্তা ঠিক হয়ে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হতে কত সময় লাগবে কে জানে! রাস্তার ঝুটঝামেলা সাহির ম্যানেজ করতে পারলেও, প্রকৃতির খেয়ালিনার কাছে সে নাচার। ব্যাজার মুখে মোহন দত্ত বললেন, “যাবে যাও, তবে বেশি দেরি কোরো না।”

গাড়ি থেকে নামতে নামতে সাহির বলল, “ডেস্ট গরি স্যর, আমি যাব আর আসব।”

পাশ থেকে আড়মোড়া ভেঙে অজন্তা বলল, “আমিও নেমে কিছু ফ্রগ পায়চারি করি নই। সেই কখন থেকে বসে আছি, হাতে-পায়ে খিল ধরে গেল। ভাল রোদ উঠেছে। মনে হচ্ছে বাঁধিয়ে রাখার মতো কিছু ছবি পেয়ে যাব।”

“চোখের আড়ালে যেয়ো না, কফি খাবে?”

“না।”

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল অজন্তা। মোহন দত্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, অল্প সময়েই পিছনদিকে কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাস্তাটা ব্যস্ত। আধঘণ্টা বন্ধ থাকলে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যাবে।

নেপালে যাওয়ার জন্য মনে-মনে এমন একটা পথ মোহন দত্ত চেয়েছিলেন যেখানে সারাদিনে একটাও গাড়ি অথবা মানুষজন চোখে পড়বে না। থাকবে না কোনও দোকানপাট-বসতবাড়ি-বাজারহাট। যদিও তিনি জানেন তেমন ইচ্ছে-পথ বিশ্বের কোথাও থাকা সম্ভব নয়। তবে সাহির আশ্বাস দিয়েছে, পাহাড়ি এই পথ পেরিয়ে একটা নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছতে পারলেই কেলাফতে। সেখান থেকে নেপালে পা রাখা নিজের বাড়ির ড্রয়িংরুম থেকে বেডরুমে যাওয়ার মতোই অনায়াস!

ফ্লাস্ক থেকে কাগজের কাপে কফি ঢেলে মোহন দত্ত এগিয়ে দিলেন ডাইভারের দিকে। স্টিয়ারিং হাতে যেমন দক্ষ, ম্যানার্সও তেমন জানা আছে নীতীশের। কোনওরকম ভগিতা না করে কফিটা নিয়ে সে ধন্যবাদ জানাল মোহন দত্তকে। নিজের জন্য কফি নিয়ে ফ্লাস্কটা মুখ ঐটে পাশে রাখলেন মোহন দত্ত।

গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে তাকিয়ে অজন্তা অশ্রুতে বলল, “ওয়াও!”

একটু আগে মেঘ থাকলেও আকাশ এখন পরিষ্কার। বৃষ্টিধোয়া পাহাড়ি জঙ্গল সকালের আলোয় বলমল করেছে। সবুজ বরাবরই ভাল লাগে অজন্তার। এমন অফুরন্ত সবুজের মাঝে চোখ-মনের ভারি আরাম হয়।

দূর পাহাড়ের নীল আর আকাশের নীলিমা মিলেমিশে একাকার। মনে হচ্ছে যেন একটাই ক্যানভাসে কোনও শিল্পী হালকা-ঘন-আকাশি নীল রঙের তুলি বলিয়ে অপার্থিব ছবি ঐকে রেখেছে।

গলায় ঝোলানো ডিএসএলআর ক্যামেরাটা অন করল অজন্তা। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত গাড়ির লাইন, দেখে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এই স্থবিরতা থেকে মুক্তি নেই। এই অবসরে মনের মতো কিছু দৃশ্য ক্যামেরার স্মৃতিকোষে পুরে নেওয়া যাবে। এমন ঝকঝক আলোয় ছবি আসে ভাল।

প্রথমেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা এক ঝোঁরার দিকে ক্যামেরা তাক করল অজন্তা। কিন্তু কিছুটা নেমে বাঁক নেওয়ায়, ঝোঁরার পুরোটা ফ্রেমে আসছে না, নীচের অংশ আড়াল হয়েছে পাহাড়ি পথের বাঁকে। ঠিকঠাক ছবি পেতে গেলে আরও পিছনে সরতে হবে।

গাড়ির দিকে তাকিয়ে অজন্তা ইঙ্গিতে বলল, ‘কাছাকাছিই আছি’। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সামান্য মাথা হেলানেন মোহন দত্ত। ইতিমধ্যেই পিছনদিকে হাজির দশ-বারোটা গাড়ি। একজন দু’জন করে নেমে আসছে আরোহীরা। কেউ আয়েস করে সিগারেট ধরাচ্ছে, কারও হাতে অজন্তার মতোই ডিএসএলআর ক্যামেরা। প্রকৃত সৌন্দর্যরসিকের পক্ষে চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কঠিন। রাস্তা বন্ধ থাকায় সম্ভবত খুশিই হয়েছে তারা!

অবশ্য খুশি হওয়ার দলে সামিল নয় সবাই। আঁটোসাঁটো পোশাক পড়া একটা মেয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে জরিপ করছে গাড়ির সংখ্যা। বোঝাই যাচ্ছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার চেয়ে বটপট গন্তব্যে পৌঁছতেই আগ্রহী সে।

সময় যত গড়াবে রাস্তায় বাড়বে গাড়ির সংখ্যা, বাড়বে মানুষজন। তেমন হলে খুশি না হওয়ার দলে নাম লেখাবে অজন্তাও। পাহাড়ের বুকে এমন শহুরে খিঞ্জিনা ভাল লাগে না তার। এখানকার আসল ইউএসপি হচ্ছে স্যালিটিউড, নির্জনতা। সেটাই যদি হারিয়ে যায় তবে পাহাড়ের আকর্ষণ ফিকে হতে বাধ্য।

দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশ কাটিয়ে হাঁটতে শুরু করল অজন্তা। কয়েক মিনিট হেঁটে বাঁক পেরিয়ে মুখোমুখি হল ঝোঁরার। সবুজের বুক চিরে নেমে আসা ঝোঁরটা মিশেছে ছটপটে এক নদীতে। মনের মতো অ্যাঙ্গেল বেছে নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল অজন্তা।

“ভারি সুন্দর, তাই না!”

খুব কাছ থেকে কেউ বলে উঠল কথাটা। ছবি তুলতে তুলতেই মাথা দুলিয়ে সায় দিল অজন্তা। পরমুহুর্তেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ঠান্ডা স্রোত। আঁটোসাঁটো পোশাকের বাইনোকুলার মেয়েটা প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আশপাশে দ্বিতীয় কোনও মেয়ে নেই, সূত্রাং প্রশংসা সে-ই করেছে!

ভূভারতে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে বাঙালি পর্যটকের দেখা মেলে না। বেড়ানোর মরসুমে এই পাহাড়েও প্রচুর বাঙালি এসেছে। হতেই পারে মেয়েটা তেমন কেউ। কিন্তু বাংলার বাইরে অপরিচিত কারও সঙ্গে প্রথম আলাপের ভাষা তো হিন্দি বা ইংরেজি হওয়াই স্বাভাবিক। আজ অজন্তার পরনে স্থানীয় পোশাক। চেহারা দেখেও তাকে বাঙালি মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে কেন বাংলায় বলল মেয়েটা!

নিজেকে সামলে নিয়ে মিষ্টি হেসে অজন্তা বলল, “দ্যাটস হোয়াই আই কাম টু দ্য মাউন্টেনস এগেন অ্যান্ড এগেন। দ্য সি ইজ শুড। দ্য ফরেস্ট টু। বাট দেয়ার ইজ নো কমপ্যারিজন টু দ্য মাউন্টেন ফরেস্ট!”

উড়ে যাওয়া পাখির বাঁক দেখতে-দেখতে মেয়েটা বলল, “ইংরেজি আমিও নেহাত মন্দ বলি না, কিন্তু দু’জন বাঙালির মধ্যে

বাংলায় কথা হওয়াই ভাল ম্যাডাম! আমিও আপনার মতোই বাঙালি, নাম চিত্রা বর্মণ। ইনস্পেকটর অফ পুলিশ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা।”

পায়ের তলার মাটি দুলে উঠল অজন্তার! ফোটো তোলার ঝোঁকে গাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে সে, দৌড়ে ফেরা সম্ভব নয়। আর তেমন চেষ্টা করে খুব লাভ হবে বলেও মনে হচ্ছে না। মেয়েটাকে দেখলেই বোঝা যায়, হাত-পায়ের ব্যবহারে যথেষ্ট পটু সে!

হতাশ চোখে চারপাশে তাকাল অজন্তা। রাস্তার ডানদিকে উঁচু পাথুরে দেওয়াল, বাঁ দিকে সুগভীর খাদ। ইতিমধ্যে পিছনের এসইউভি থেকে গাট্টাগোটা চেহারার চারজন লোক নেমে এসে ঘিরে ধরেছে তাকে। পালানো অসম্ভব!

অজন্তার কাঁধে হাত রেখে চিত্রা বর্মণ ঠাণ্ডা গলায় নির্দেশ দিল, “কোনও আনাড়ির মতো কাজ নয় মিস সঙ্গীতা সাহা, শান্তভাবে ওই গাড়িটায় উঠে বসুন।”



দ্বিতীয় কফিটা শেষ করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল মোহন দত্তের। বিরক্ত গলায় বললেন, “তোমার সাহির কি একেবারে রাস্তা সারিয়ে ফিরবে নাকি হে! দেখ আর একবার ফোনটা, টাওয়ার এল কিনা!”

বেশ কিছু ক্ষণ ধরেই ফোনে টাওয়ার নেই। নিয়মিত এই রাস্তায় যাতায়াতের সুবাদে নীতীশ জানে আরও আধ কিলোমিটার এমনই থাকবে। লক্ষ্মণপ্রসাদের চায়ের গুমটি পেরিয়ে তিরিশ-চল্লিশ গজ এগোলেই টাওয়ারের দেখা মিলবে। কিন্তু কিছু মানুষ দিনের আলোর মতো সহজ বিষয়ও বুঝতে চায় না। অবশ্য হাজার অববৃথনা করলেও প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে কখনও তর্কে যায় না নীতীশ। তার কাছে প্যাসেঞ্জার ভগবান, কারণ সে অল্পদাতা। যার দৌলতে রুটি-রুজি-বিবি তার সঙ্গে কী তর্ক চলে! তাই ফোনের দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় সে বলল, “এখনও টাওয়ার আসনি স্যার, আপনি অনুমতি দিলে একবার নেমে দেখে আসতাম।”

“না-না তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। রাস্তা খুললেই পিছনের গাড়িগুলো হর্ন দিয়ে মাথা খারাপ করে দেবে। সাহির সময়মতো না পৌঁছেলে ওকে সামনে থেকে তুলে নিও। তুমি বরং এক কাজ করো, ওদিকে গিয়ে দেখো ম্যাডামের ছবি তোলা হল কিনা। হলে তাঁকে বলো গাড়িতে এসে বসতে।”

বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল নীতীশ। গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক চাইল। অনেকেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে কিন্তু তাদের মধ্যে অজন্তা ম্যাডাম নেই। বোধহয় ছবি তোলার জন্য অনেকটা এগিয়ে গেছে। ছবি যারা তোলে তারা এমনই হয়। স্থান, কাল ভুলে হারিয়ে যায় সৌন্দর্যের মায়ায়। সতর্ক দৃষ্টি রেখে বাকের দিকে এগিয়ে চলল নীতীশ। হঠাৎ একটা এসইউভি থেকে এক মিষ্টি-সুরেলা নারীকণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকল!

জানলার কাছে টোকা পড়ল।

তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মোহন দত্ত। রাস্তার পরিস্থিতি দেখার জন্য সাহির গিয়েছে প্রায় কুড়ি মিনিট হতে চলল। ছবি তোলার সময় অজন্তার সময়জ্ঞান থাকে না তা তিনি জানেন, কিন্তু নীতীশ? ওর তো উচিত ছিল অজন্তাকে নিয়ে ঝটপট ফিরে

আসা! অথচ দশ মিনিট হতে চলল তারও পান্ডা নেই! সঙ্গে একটা ফোন থাকলে এই সময় তিনি গাড়িতে বসেই সবার খোঁজ নিতে পারতেন। জল ছাড়া মানুষ একটা দিন কষ্ট করে কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু মোবাইল ফোন ছাড়া আজকাল এক মিনিটও চলার উপায় নেই, অথচ ফাঁপরে পড়ে গত এক মাস সেই কাজটাই করে যেতে হচ্ছে তাকে!

উত্তেজনায় ছটফট করতে-করতে মোহন দত্ত ভাবছিলেন, গাড়ি থেকে নেমে নিজেই খুঁজতে যাবেন অজন্তাকে। ইদানীং একা থাকলে এক অজানা আতঙ্ক গ্রাস করে তাকে। আগে তিনি ভাবতেন হাতে অফুরন্ত টাকা থাকলে বিশ্বের সমস্ত সুখ কিনে ফেলা যায়। নারী-গাড়ি-অট্টালিকা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ধারণা ভুল। সুখের সংজ্ঞা ঠিকঠাক অনুধাবন করতে পারেননি তিনি। স্বস্তি না থাকলে অস্তহীন বিলাসের মধ্যে ডুব দিয়েও সুখ মেলে না!

মোহন দত্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন গাড়ি থেকে নামার জন্য, ঠিক তখনই জানলায় টোকা।

জ্যাকেট-টুপি পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। মোহন দত্ত তার দিকে চাইতেই লোকটা ইঙ্গিত করল কাচ নামাতে। গাড়ির ভিতর থেকে বাইরের সব দৃশ্যই স্পষ্ট। অথচ লোকটাকে হেঁটে গাড়ির কাছে আসতে দেখেননি মোহন দত্ত। যেন মাটি ফুঁড়ে আচমকা উদয় হল সে!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাচ নামালেন মোহন দত্ত। দু’চোখে বিরক্তি ফুটিয়ে তাকালেন আগন্তকের দিকে। এই সময় অপরিচিত মানুষের সান্নিধ্য কাম্য নয় তার। লোকটা গাড়ি ছাদে মাথা ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকল মোহন দত্তের দিকে। তাকে নিশ্চূপ দেখে মোহন দত্ত অসহিষ্ণু গলায় বললেন, “আপনার কী দরকার অনুগ্রহ করে বলুন। আমি এখন ব্যস্ত আছি।”

চোখমুখ দেখে মনে হয় লোকটা শিক্ষিত। তাই ইংরেজিতেই বললেন তিনি। কিন্তু তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র হেলদোল দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। কোনও কথা না বলে সে নিষ্পলক চেয়ে রইল মোহন দত্তের দিকে।

লোকটার দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে বিরক্তির মাত্রা আর এক পরদা চড়িয়ে মোহন দত্ত অপটু হিন্দিতে বলে উঠলেন, “আপ কো কেয়া চাহিয়ে? হটো ইহাসে, মুঝে তং মাত করো!”

লোকটা এবার এমন একটা কাজ করল যার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মোহন দত্ত। গাড়ির দরজা খুলে বসে পড়ল তার পাশে!

এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় হকচকিয়ে গেলেন মোহন দত্ত। চেহারা বা পোশাক দেখে লোকটাকে পাগল মনে হয় না। চৌঁটের কোণে একটুকরো হাসিও বুলে রয়েছে যেন! কয়েক সেকেন্ড পরে সম্বিত ফিরতে তিনি চৌঁটয়ে উঠলেন, “অজন্তা! নীতীশ, সাহির! কোথায় তোমরা? তাড়াতাড়ি এসো এদিকে!”

এবারও হিন্দিতেই বললেন তিনি।

লোকটা আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিমায়ে মোহন দত্তের পিঠে হাত রেখে পরিস্কার বাংলায় বলে উঠল, “ওদের নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। যাদের নাম করলেন তারা এবং পরেশ আগরওয়াল এখন ঠিক সেখানেই আছে যেখানে তাদের থাকা উচিত। তবে ওই অজন্তা নামটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন থেকে আপনি আবার স্বচ্ছন্দে সঙ্গীতা নামেই ডাকতে পারেন তাকে। যেমন আপনাকে আমরা মোহন দত্ত নয়, ডাকব কল্লোল মিত্র নামে।”

চার-পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও যেহে উঠলেন কল্লোল মিত্র। টুপি পরা লোকটা বলে চলল, “দশ মিনিট! আর মাত্র দশ মিনিট আগে আমরা পরেশ আগরওয়ালের গেস্টহাউসে পৌঁছতে পারলে আপনাকে এতটা রাস্তা পাড়ি দেওয়ার হ্যাপা পোহাতে হত না মিস্টার মিত্র। এই সময় আপনি আমাদের মেহমান হয়ে এয়ারপোর্টে বসে থাকতেন। হোয়াটএভার, বেটার লেট দ্যান নেভার। চেষ্টা করছি আজ বিকেলের ফ্লাইট বুক করার। সব ঠিকঠাক চললে ক্যালেন্ডারের তারিখ পালটানোর আগেই আমরা পা রাখব কলকাতায়।”

যশ্ণমার্কী চেহারার তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ির পাশে।

বাকবাকি রোদে ধুয়ে যাচ্ছে পাহাড়, বনানী। সেসব ফিকে হতে-হতে
অন্ধকারের পরদা নেমে এল কল্লোল মিশ্রের চোখের সামনে!

সারাদিন পশলা-পশলা বৃষ্টি। এখনও আকাশে ঘন মেঘ, হয়তো
একটু পরেই নামবে অব্যর্থ ধারায়।

আকাশের মুখভার সত্ত্বেও লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়েছে বিপাশা।
শুধু আজকের বিকেলটাই আছে তার হাতে, আগামী কাল ভোরের
উড়ানে সে ফিরবে কলকাতায়।

লাগেজ গুছিয়ে একটু আগেই এয়ারপোর্টে রওনা দিয়েছে চিত্রা।
সন্ধে সাড়ে ছাঁটায় ওদের ফ্লাইট। মিশন অ্যাকমপ্লিশড! গত কয়েক
দিন অফিসারদের খাওয়া ঘুম মাথায় উঠেছিল যার জন্য, আজ
সকালে ধরা পড়েছে সেই কল্লোল মিশ্র, রেনবোর মালিক-কাম-
এম ডি। চিত্রা ভীষণ খুশি ফোটোগ্রাফার বিপাশার উপরে। সেদিন
লজে বিপাশার বরফ কাটার ভিডিয়োই শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দিল
কালপ্রিটকে। তার আগে সবটাই ছিল অন্ধকারে হাতড়ানো।

চিত্রা চেষ্টা করেছিল ওদের ফ্লাইটে বিপাশার জন্য একটা টিকিট
জোগাড় করার, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ভ্রমণ-মরসুমে এত কম
সময়ে অতগুলো টিকিট পাওয়া মুশকিল। চিত্রার বস সরকারের
উপর মহলে তদ্বির করে নিজেদের টিকিটটা জোগাড় করতে
পেরেছে।

অবশ্য আজ কলকাতায় ফিরতে না পেরে একটুও অখুশি নয়
বিপাশা। টিকিট মেলেনি বলেই মেঘ-বৃষ্টি-জঙ্গলের মায়াবী জগতে
আরও একটা বিকেল কাটানোর সুযোগ পেয়েছে সে। কে জানে,
আবার কবে অফিসের হাপা সামলে এমন স্বপ্নের জায়গায় আসার
ফুরসত মিলবে!

এই কটা দিন ইচ্ছেমতো পাহাড়যাপন করেছে বিপাশা।
সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়িয়েছে পাহাড়ি গাঁয়ের আনাচকানাচে।

হাঁটতে-হাঁটতে মনের মতো জায়গা পেলে বসে পড়েছে গিটার
হাতে। সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রাকার থেকে প্রাকারে। পথচলতি
মানুষ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছে আশ্চর্য সূন্দর মেয়েটার দিকে,
মুগ্ধ হয়ে শুনেছে তাকে। বাজানো শেষ হলে বিপাশার উৎসুক
নয়ন ভিড়ের মাঝে খুঁজেছে বিশেষ একজনকে। কিন্তু হতাশা ছাড়া
মেলেনি কিছুই।

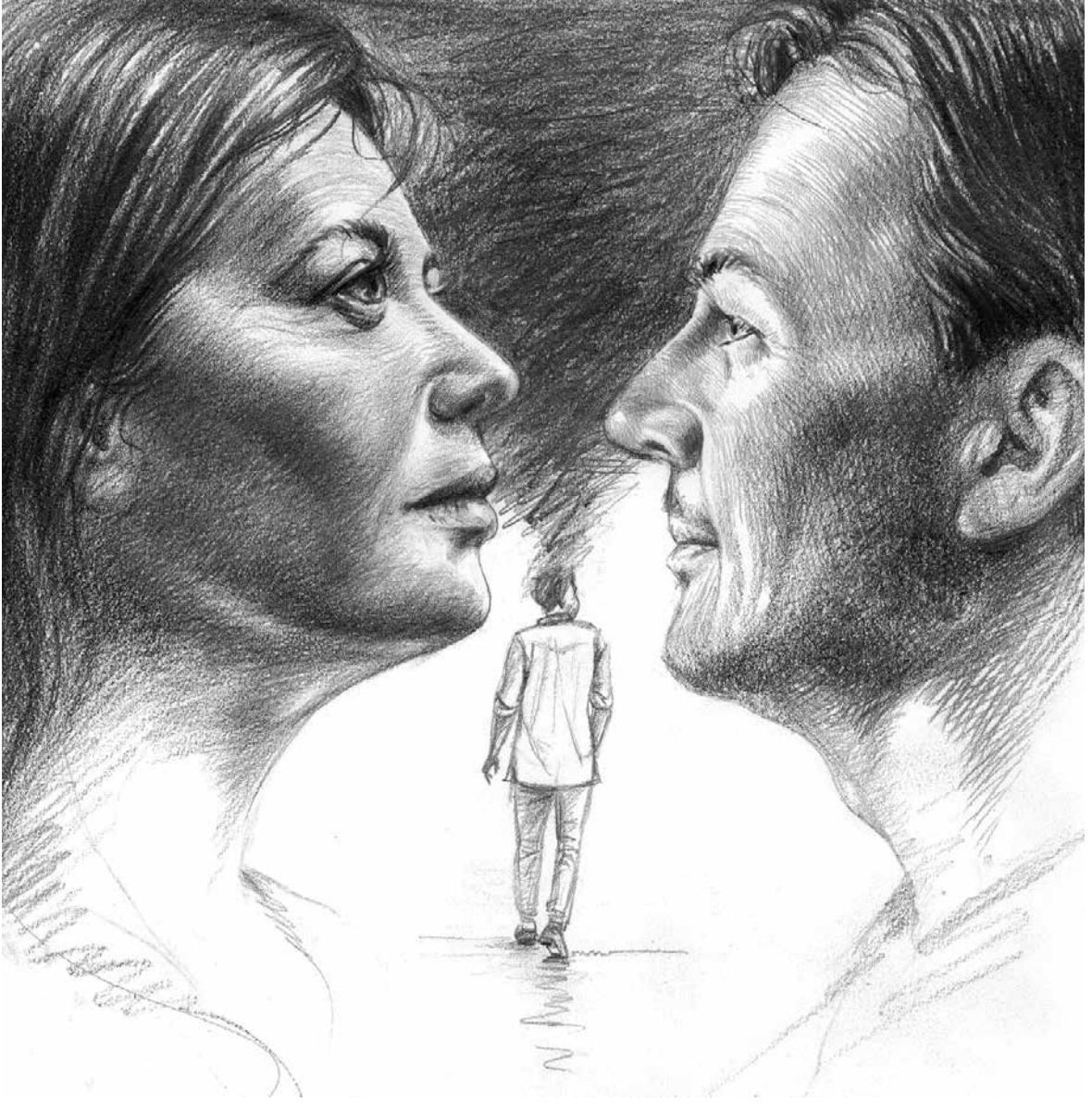
সময়ে যার নাগাল মেলেনা, সে বোধহয় হারিয়ে যায় চিরতরেই!
হাঁটতে-হাঁটতে এক নির্জন জায়গায় এসে থামল বিপাশা। পাইন
বনের বুক চিরে সরু রাস্তা চলে গিয়েছে দূরে। এমনই গভীর সেই
পথ, যেন অনন্তকাল চললেও অধরা থেকে যাবে তার সমাপ্তি-বিন্দু।
পথের ধারে একটা কংক্রিটের বেঞ্চ। অবিরল বৃষ্টিধারায় শ্যাওলা
জমেছে তার গায়ে।

বেঞ্চে বসে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল বিপাশা। এই পথে
মানুষের চলাচল কম, হয়তো আগামী দু’তিন ঘন্টায় কেউ আসবে
না।

আজ এমন নির্জন জায়গায় বাজাবে সে। অলীক মানুষের
অন্বেষণ বিজনে হওয়াই কাম্য। মানুষের ভিড়ে পিটার গোমসকে
খুঁজতে গিয়ে ভুল করেছে সে। সুর যখন একান্তে নিজের মায়াজাল
বিস্তার করে, শিল্পীর কাছে আপনিই এসে ধরা দেয় স্রষ্টা। কবি তো
কবেই বলে গেছেন, ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে’।

ওয়াটারপ্রুফ গিটার কেস থেকে প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটা বের করল
বিপাশা। গাছে পাতা থেকে টুপ-টুপ বরে পড়ছে জমে থাকা বৃষ্টি-
ফোঁটা। ঘড়ির হিসেবে সূর্য ডোবার এখনও ঢের দেরি, কিন্তু প্রকৃতি
রং পালটাচ্ছে দ্রুত। কালো মেঘ ঘিরে ধরেছে পাইন বনের আকাশ।
বৃষ্টি নামবে যে কোনও মুহূর্তে, হাতে সময় অল্পই!
চোখ বুজে গিটারের তারে আঙুল ছোঁয়াল বিপাশা।





অলংকরণ: মহেশ্বর মণ্ডল

প্রহর শেষের আলোয়

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

শিঞ্জিনী

সকালের দিকে জ্বরটা কমে এসেছিল, কিন্তু শরীরটা খুব দুর্বল লাগছিল আর গা গোলানো ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। গোন্ডি এসে তিনবার আমার গা শুঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। আমি জানি ও এখন রান্নাঘরে গিয়ে মালতীকে বিরক্ত করছে। ওর এখন বাইরে বেরোবার সময়। ছোট্টাছুটি করবে, পটি করবে, পার্কের অন্য কুকুরদের সঙ্গে আলাপ করবে, মুক্ত হাওয়ায় অন্তত আধ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে ফ্রেশ

হয়ে লেজ নাড়তে-নাড়তে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করতে চলে যাবে ব্যালকনিতে ওর নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। কিন্তু আমি যে পড়ে আছি জ্বর নিয়ে, সেটা ওকে কে বোঝাবে?

একটু পরে মালতী এল আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে। ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর দুধ-চা, যাতে কোনও জল মেশানো হয়নি। আমিই বলেছিলাম ওকে দুধে চা ফুটিয়ে নিতে, যেমনটা রূপক আমাকে বলে গিয়েছিল কাল রাতে স্নেনে ওঠার আগেই। মালতীর পিছন-পিছন চলে এল গোন্ডি, ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে।

“আমাকে বকে কী হবে, নিজে ঘুরে আয় না বাবা,” মালতী বলল বিছানার কাছে ছোট টেবিলটাতে ব্রেকফাস্টের ট্রে-টা নামিয়ে রেখে, “তোকে ঘোরাবার সময় কোথায় আমার?”

আমি ক্লিষ্ট হেসে বললাম, “একবার তো বের করতে হবে ওকে। ওর পটি করার সময় হয়ে গিয়েছে। তুই বরং এখনই ওকে নিয়ে ঘুরে আয়। আমি খেয়ে নেব।”

কিন্তু বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে আমার গা-গুলোনোটা এত বেড়ে গেল যে, আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

“আবার গা গুলোচ্ছে?” মালতী বলল। “বমি করবে আবার?”

আমি মাথা নাড়লাম।

“খালি পেট তো, কচলাবেই। একটু কিছু মুখে দিয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, আগে তোমাকে ধরে বসিয়ে দিই,” মালতী একটু মোটার দিকে হলেও গায়ে বেশ শক্তি আছে। দরকার হলে আমাকে পাঁজা-কোলা করে ও বাথরুমে নিয়ে যেতে পারে, যেমনটা করেছিল ও, কাল রাতে প্রথমবার বমি করার সময়। তিনখানা বালিশে আমাকে ঠেকা দিয়ে ট্রে-টা আমার কোলে বসিয়ে দিল ও। গোন্ডি এবার আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করল। ‘উঠেই যখন বসেছ তখন আমাকে নিয়ে বেরেছ না কেন?’ এটাই বোধ হয় ও সোচ্চারে বলতে চায় আমাকে।

আমি চামচ দিয়ে কেটে এক টুকরো ডিম মুখে দিলাম, একটা টোস্ট থেকে একটু ছিঁড়ে খেলাম কিন্তু কোনওটারই কোনও স্বাদ গন্ধ পেলাম না। মনে হল জ্বরটা আবার বাড়ছে। গরম গরম দুধ-চা প্রথমে ভাল লাগল কিন্তু দুই চুমুক গলা দিয়ে নামতেই আবার গা গুলিয়ে উঠল। আমি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হাতের ইশারায় মালতীকে জানালাম আমি বমি করব। মালতী চট করে ট্রে-টা আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে ছোট টেবিলটায় রাখল।

“ওমা আবার! মুখ বন্ধ করে রাখো, আমি আনছি।” মালতী ছুটে গিয়ে বাথরুম থেকে নিয়ে এল সেই প্লাস্টিকের কানা উঁচু ডেকচিটা আর আমি হড় হড় করে উগরে দিলাম আমার রাতের খাওয়া দুধ-রুটি। আমার কান্ড-কারখানা দেখে গোন্ডি কী বুঝল কে জানে, ও এবার ঘেউ-ঘেউ না করে কুঁ-কুঁ করে করুণ গলায় এক আঙুত আওয়াজ করতে শুরু করল।

মালতী জল দিয়ে আমার মুখটা ধুয়ে, টাওয়েল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল, “পেট তো খালি করে দিলে বৌদিমণি, এবার একটু দাঁতে কাটবে কিছু?”

“আমি শুধু প্যারাসিটামল খাব,” বালিশের নীচ থেকে স্ট্রিপটা নিয়ে আমি একটা ৬৫০ এমজি ট্যাবলেট বের করলাম। “জলের গ্লাস দে আমাকে।”

প্যারাসিটামল জল দিয়ে গিলে আমি আবার বিছানায় নেতিয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করেই বললাম, “যা, ওকে একটু শিমুলতলার মাঠটা ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।”

“ওমা ওই দেখো, তোমার কথা শুনে আমার কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে!” মালতী হেসে উঠল। আমি চোখ খুলে দেখলাম, গোন্ডি মালতীর কাপড় কামড়ে ওকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ও কি সত্যিই আমার কথা বোঝে? গত বছর রিয়া উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে বেঙ্গালুরু ইউনিভার্সিটিতে জুলজি নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলে রূপক এই গোন্ডেন রিট্রিভারটা দক্ষিণ কলকাতার কেনেল ক্লাব থেকে নিয়ে এসেছিল আমার জন্য। বলেছিল, ‘রিয়াকে যখন কাছে পাবে না, তখন এটাকে নিয়েই সময় কাটাও তুমি। ডগ লাভাররা বলেন, দিস

ইজ দ্য বেস্ট ডগ ফর ফার্স্ট টাইম ওনারস।’ গোন্ডির তখন ছ’মাস বয়স। রূপক ঠিকই বলেছিল। রিয়ার জন্য আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলাম, রাতে প্রায়ই ঘুম হত না। দোতলার ব্যালকনিতে গিয়ে তারা শুনে রাত কাটত আমার। রোববার ভিডিয়ো কলে আধঘণ্টা রিয়ার সঙ্গে কথা বলে মন ভরত না আমার। গোন্ডি এসে অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে আপন করে নিল। শুধু আমাকে নয়, মালতীও ওকে পছন্দ করে। সকালে কাজ করতে আসার পথে বাজার থেকে মাংসের ছাঁট ও-ই নিয়ে আসে। সেগুলো হলুদ নুন দিয়ে সেদ্ধ করে গোন্ডিকে খাওয়ানোর দায়িত্বটাও মালতীই নিয়ে নিয়েছে। মালতী এখন হাতে একটা লাঠি নিয়ে গোন্ডিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেড়ি কুকুরগুলো অনেক সময় গোন্ডিকে দেখে তেড়ে আসে, ওদের ঠোঁটেরে রাখতেই লাঠির দরকার। ওরা বেরিয়ে যেতে আমি নিশ্চিত্তে চোখ বুজলাম। যাক, গোন্ডি অন্তত ওর মর্নিং ওয়াক সেরে খুশি হয়ে ফিরুক, না হলে মালতীকে সারাদিন ওর গালাগালি শুনতে হবে।

গতকাল নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টে রূপককে সি-অফ করতে যাওয়ার সময় আমার গায়ে একটু জ্বর ছিল, নিরানব্বই হবে। তিন মাস আগেই বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপিটাল থেকে ওকে সিলেক্ট করা হয়েছিল লন্ডনের সেন্ট জন অ্যান্ড সেন্ট এলিজাবেথ হাসপিটালে রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের উপর সাত দিনের এই স্পেশ্যাল ওয়র্কশপে অংশগ্রহণ করার জন্য। তবু বাড়ি থেকে বেরোবার আগে আমার মাথায় হাত রেখে রূপক স্বগতোক্তি করেছিল, ‘সাত দিন আগে তোমার জ্বরটা এলে আমি ঠিক ক্যানসেল করে দিতাম এই ট্রিপটা। রোবটিক রিপ্লেসমেন্ট এখন দিল্লির এইমসে গিয়েও শেখা যায়।’

রূপক আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু লন্ডন তো আমার দু’বার ঘোরা আর এসব কেজো ট্রিপে যা হয়... আমাকে সারাদিন পড়ে থাকতে হবে হোটেলে। সপ্তের দিকে আর কতটুকু ঘোরা যায়! এরকম কতবার হয়েছে... চেনাই, বেঙ্গালুরু আর দিল্লি গিয়ে! তাই এখন আর আমি সেমিনার বা কনফারেন্সে ওর সঙ্গে যাই না। তবু ডিপার্চারে ঢোকান মুখে আমার চোখে জল দেখে ও ফিরে এসে চুমু খেয়েছিল আলতো করে। তাই দেখে গোন্ডিরও শখ হল ওর চুমু পাওয়ার! তাই ওকেও কোলে তুলে নিয়ে ওর নাকে একটা চুমু খেয়েছিল রূপক। আমি জানি, হিথরোতে নেমে ও ফোন করবে আমাকে। ওখানের ভোর সাড়ে পাঁচটা মানে, এখানে তখন বেলা দশটা।

জ্বরটা আবার বাড়ছে বুঝতে পারছি। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে, তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছি, যেটা আগে ছিল না। বুঝতে পারছি এটা সাধারণ জ্বর নয়, ফ্লু হবে। বিছানায় পড়ে থাকতে হবে বেশ কয়েকটা দিন। ছোটবেলা থেকেই আমি খুব জ্বরে ভুগতাম, হঠাৎ হঠাৎ জ্বর এসে যেত আমার। আমাকে বইয়ের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেই মা এসে আমার মাথায় হাত দিতেন। ‘কী রে, আবার জ্বর বাখালি নাকি টুকি?’ আমি বলতাম, ‘গা-টা একটু ম্যাজ-ম্যাজ করছে মা, ঠিক হয়ে যাবে।’ ‘আজ স্কুলে না-ই বা গেলি মা, ওষুধ এনে দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে থাক।’ আমি বলতাম, ‘না মা, আমি প্যারাসিটামল খেয়ে স্কুলে যাব। আজ হিষ্ট্রির ক্লাস টেস্ট আছে, অ্যাবসেন্ট হলে বন্দনা দিদিমণি কথা শোনাবেন।’ মা জোর করতেন না। তিন মাস পর পর এরকম জ্বর উঠলে মেয়ের লেখাপড়া যে লাটে উঠবে, সেটা মা বুঝতেন। মা তো একসময় দেশবন্ধু প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন। ১৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন মা। তখন আমার ঠান্মাই আমার দিদি লিপিকে সামলাতেন। আমি আমার বাবা-মায়ের শেষ বয়সের সন্তান। আমি যখন এলাম, তখন মায়ের বয়স ছত্রিশ, ঠান্মা দু’বছর আগেই মারা গিয়েছেন। খুব সম্ভবত আমার বাবার পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেই মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ বয়সে গর্ভধারণ। দিদির বয়স তখন চোদ্দ, লন্ডায় তখনই ও মায়ের থেকে তিন ইঞ্চি বড়। আমার বাবা ছ’ফুট, দিদি বাবার হাইট পেয়েছে। বাবা তখন হুগলির একটা স্পিনিং মিলে

ডেপুটি ম্যানেজার। মোটামুটি ভাল মাইনে পান। কাজেই আমাকে ঠিকভাবে লালনপালন করার জন্যই মাকে স্কুল ছাড়তে হল। দু'বছরেই টুক টুক করে হেঁটে বেড়াতাম আমি, তাই মা আমাকে 'টুকি' বলে ডাকতেন। পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমার নাচে প্রবল উৎসাহ দেখে বাবা দিলেন আমার ভাল নামটা — শিজিনী। প্রাইমারিতে অনুপমাদি প্রথম দিনই রোল কল করার সময় নামের মানে জিজ্ঞেস করলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে জবাব দিয়েছিলাম, 'শিজিনী মানে নুপুর।' বাবা তো আমাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই কোনও অসুবিধে হল না।

অনুপমাদি বললেন, 'আরেকটা অর্থও আছে শিজিনীর, জানো তুমি সেটা?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। দিদি বললেন, 'ধনুকের ছিলা।' ক্লাসের সব মেয়েগুলো একসঙ্গে চোঁচিয়ে উঠল 'ছি-লা! ছি-লা!' কিন্তু বেশিদিন ওরা আমাকে 'ছিলা' বলে খেপায়নি। নাচের দিদিমণি আমাকে 'শানু' বলে ডাকতে শুরু করলে ওটাই আমার স্কুলের নাম হয়ে গেল। দিদিমণিরাও 'শানু' বলেই ডাকতে শুরু করলেন আমাকে। শুধু মা, বাবা আর দিদিই আমাকে ডাকত 'টুকি' বলে।

বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে এসব কথাই ভাবছিলাম আমি। গোল্ডির ডাক শুনে চোখ খুলে দেখলাম মালতী ফিরেছে ওকে নিয়ে। গোল্ডি যে প্রাতঃভ্রমণ ভালভাবেই সেরে এসেছে, সেটা বুঝলাম ওর ঘন ঘন লেজ নাড়ানো দেখে।

"পাটি করেছে ও?" জিজ্ঞেস করলাম মালতীকে।

"দু'বার," বলল মালতী। "তাপস বাবুর অ্যালসেশিয়ানটার সঙ্গে একটু পিরিত করতে গিয়েছিল, সেটা আর হয়ে উঠল না বেচারার।"

"কেন? গোল্ডিকে পছন্দ হয়নি ওর?"

মালতী এক গাল হেসে বলল, "তাপসবাবু জানিয়ে দিলেন, একমাস আগেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে আরেকটা অ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে। তাই এখন আর ওসব করতে দেবেন না উনি।"

দেড় বছরের গোল্ডি যৌবনে পড়ল। বুঝতে পারছি, ওরও সঙ্গী দরকার। রূপক ফিরলে বলতে হবে, ওকে একবার কেনেল ক্লাবে নিয়ে গোল্ডির পার্টনার খুঁজতে।

মালতী বলল, "কী খাবে আজ বৌদিমণি?"

"মুখে তো কোনও স্বাদ নেই রে। লেবু জল দে আমাকে এক গ্লাস।"

"তা দেব'খনে কিন্তু দুপুরে তো কিছু খাবে তুমি। পাতলা করে খিচুড়ি করে দিই?"

"নাঃ খিচুড়ি আর গিলতে হচ্ছে করছে না। তুই বরং গলা ভাত করে দে। উপর দিয়ে একটু ঘি ছড়িয়ে দিস আর নুন গোলমরিচ দিয়ে আলু মেখে দিস।"

"তাই দেব, নাও এবার তোমার কুকুর সামলাও। দুপুরের দিকে একবার বাড়ি ঘুরে আসতে হবে আমাকে।"

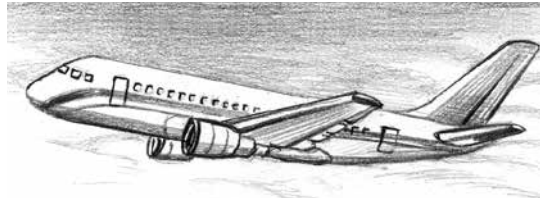
"কেন? শিবু আবার কোনও ঝামেলা পাকাল নাকি?"

"না গো, নাটিকে একটু আদর করে আসব। আমাকে না দেখলে খুব কান্নাকাটি করে পুচুকু।"

মালতীর বর শিবু টোটো চালায়। গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জ। এসব ট্রিপের মধ্যেই ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে এক বোতল ধেনো চড়িয়ে নেয় শিবু। বার দু'য়েক ছোটবড় অ্যাকসিডেন্টও করেছে ও। একবার তো লরির সঙ্গে টঙ্কর লাগিয়ে হাত ভেঙে বসল, তখন বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে রূপককে দিয়েই চিকিৎসা করাতে হয়েছিল শিবুর। হাড় জোড়া লাগতে পুরো ছ'মাস কেটে গিয়েছিল। কিন্তু মদ ছাড়ানো যায়নি ওকে। মালতীর দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে শম্পার বিয়েটা টেকেনি বছর দু'য়েকের বেশি। ছেলে বিকাশকে রূপকই পিয়নের কাজ জুটিয়ে দিয়েছে ওর হাসপাতালে। মালতী শুরুর থেকে শুধু আমার ঘর দোর সাফ করতে আর সেই সঙ্গে আরও তিনটে বাড়িতে কাজ করত। রান্না করতে আসত বিনু মাসি। মাসির বয়স হয়েছিল, দুর্গাপুরে ছেলের চাকরি হলে ওখানে চলে গেল মাসি। তখন আমি মালতীকে পুরো বারো ঘণ্টার জন্য রেখে দিলাম। আমার তো সকালে জিম আছে, তা ছাড়া মাঝে

মাঝে এখানে ওখানে নাচের সুযোগ পাই। রিয়া চলে যাওয়ার পর কুকুরও পুষেছি। একা হাতে এত সামলানো যায় না, তাই মালতীই এখন বাড়ি সামলায়। বাইপাসের ধারে 'গ্রিন মিডোজ' আবাসনের তিন নম্বর টাওয়ারের আট তলায় এই বিশাল আঠেরোশো স্কোয়ার ফিটের চার কামরার ফ্ল্যাটে গিয়ে জ্বর নিয়ে গোল্ডিকে সামলে একা থাকতে পারব না আমি। তাই রূপক যে ক'দিন বাইরে থাকবে, মালতীকে রাতেও থাকতে বলেছি। ও থাকে বাইপাসের ওপারে মা দুর্গা বসতিতে।

মালতী রান্নাঘরে চলে গেলে গোল্ডি এসে আমার খাটের কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করল। পেট খালি করে এসেছে বেচারী। ওর এখন খাবার চাই। একটু পরে মালতী ওকে ব্যালকনিতে নিয়ে ওর খাবার দেবে। গোল্ডি সকালে দুধ রুটি খেয়ে নেয়, সঙ্গে দু'খানা ডগি বিস্কিট। খাবার খেয়ে ও কিছু ক্ষণ ঝিমুবে তারপর ফ্ল্যাটের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কাক, চড়ুই, কাঠবেড়ালি আর পায়রা এসে বসলে তাড়া করবে। আমি এখন ওকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ও আরেকবার আমার হাত চেটে দিল। আর ঠিক তক্ষুণি ফোনটা বেজে উঠল। যাক, এতক্ষণে রূপক বিলেতের মটিতে পা রাখল। কিন্তু মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ওমা! এ তো নবারুণ! ওরও তো লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল গত সপ্তাহেই। জানিয়েছিল, ওর চতুর্থ উপন্যাস বেরোচ্ছে সামনের রোববার, নেহরু সেন্টারে। সেখানে উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ পেয়েছে ও।



নবারুণ

শিজিনীকে ঠিক এই সময় ফোন করার একেবারেই হচ্ছে ছিল না আমার। কারণ এখন ওর জিমে থাকার কথা। তবু করলাম ফোনটা। কারণ ওর বর রূপক ওরফে মি. কারপেন্টার যে এই সময় লন্ডনে আসবে সেট জন হাসপাতালে ওয়র্কশপ করতে, সেটা ও জানিয়েছিল কয়েকদিন আগেই। একটু পরেই আমাকে রওনা দিতে হবে গোল্ডহক রোড-এ আমার লিটোরারি এজেন্ট ল্যাভিনিয়া ট্রেভারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে। নেহরু সেন্টারে আমার নতুন উপন্যাস 'Amanda's Choice'-এর মোড়ক উন্মোচন হবে তিনদিন পরে, সে ব্যাপারেই কথা হবে আমাদের। কিন্তু কাল সন্দের দিকে (ওখানে তখন রাত এগারোটো) ও যে মেসেজটা পাঠিয়েছিল, তাতে জানিয়েছিল ওর আবার জ্বর এসেছে। তাই আজ ওর জিমে না যাওয়ারই কথা। ও ফোন তুলে বলল, "জ্বরটা বাজে দিকে টার্ন নিচ্ছে মনে হচ্ছে বিউ।" আমিই শিখিয়েছিলাম শিজিনীকে 'বিউ' ডাকতে, যাতে ফোনে কথা বলার সময় কেউ শুনে ফেললে চট করে বুঝতে পারবে না ও কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। ইংরেজিতে 'beau' বলতে কোনও মহিলার পুরুষ বন্ধু কিংবা প্রেমিক দুই-ই বোঝাতে পারে। সেটাও ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

"কেন কী হল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "প্যারাসিটামল নিয়েছ?"

"ওটাই তো এখন আমার ডায়ট, বাকি যা খাচ্ছি তা হড়হড় করে বমি হয়ে যাচ্ছে। তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা।"

"ইউ হ্যাভ টু কনসাল্ট আ ডক্টর শানু। জ্বর কিন্তু অনেক দিকে টার্ন নিতে পারে – ডেঙ্গি, টাইফয়েড, চিকুনগুনিয়া আরও অনেক কিছু।"

"ঘরেই তো ডাক্তার আছে, দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে। আমি তো ভেবেছিলাম হিথরো থেকে মিস্টার কারপেন্টার ফোন

করল আমাকে।”

শিজিনী ওর অর্থোপেডিশিয়ান স্বামীকে যে মিস্টার কারপেন্টার বলে ও হাড় জোড়া দেবার কাজ করে বলে, সেটা জানিয়েছিল অনেকদিন আগেই।

“ব্লাড টেস্ট করিয়ে নাও চটপট, তবেই জানা যাবে...”

“থাক, তোমাকে আর ডাক্তারি করতে হবে না। এখন কোথা থেকে ফোন করছ তুমি?”

“আমি এখন ট্রেনে, থর্নটন হিথ থেকে একটু আগেই উঠেছি। ক্রয়ডন লাইনের ট্রেন, যাবে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত। ওখান থেকে ক্যাব নিয়ে যাব গোল্ড হক রোড, আমার এজেন্টের অফিসে। সেখানে...”

“কার্টিজি, মি. কারপেন্টারের ফোন। পরে মেসেজ করো।”

“ওকে,” বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে লাল বোতাম ঝুলাম আমি।

হঠাৎ আমার মনে হল, শিজিনীর বর রূপকের সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়? ও তো এখন লন্ডনে। শিজিনীর ফেসবুক ফ্রেন্ড হিসেবেই না হয় পরিচয় দেব নিজের। ও কি সন্দেহ করবে আমাকে? করুক না, কী এসে যায় তাতে। সুন্দরী বৌ-এর সঙ্গে বিশ বছর কাটিয়েছে ও, এখন যদি এই মাঝ বয়সে এসে শিজিনী একজন প্রেমিক খুঁজে পায়, কী এসে যায় ওর তাতে?

কলকাতা বই মেলায় গত বছর ডাক পেয়েছিলাম একটা সেমিনারে যোগ দেওয়ার জন্য। ওটা ছিল, যে-সব ভারতীয় লেখকরা ইংরেজিতে লেখেন, তাঁদের নিয়ে আলোচনা। আমি আর. কে. নারায়ণ-এর উপর দশ মিনিট বলার সুযোগ পেয়েছিলাম এই সেমিনারে। দর্শক সংখ্যা ভালই ছিল, অন্তত শ’দুয়েক তো হবেই। কলকাতা সত্যিই বই-প্রেমীদের জায়গা। যদিও শিজিনী আমাকে পরে বলেছিল, ছেলে-মেয়েরা ওখানে প্রেম করতে আর ফুড কোর্টে ফুচকা, ফিশফ্রাই, কাটলেট খেতে যায়। দর্শক-শ্রোতাদের শেষের দিকে একটি সুন্দরী মহিলা বসে আছেন সেটা আমার নজরে পড়েছিল। নারায়ণের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা শেষ করে ওঁর ‘মালগুডি ডেজ’ এর ছোটগল্পগুলো নিয়ে কথা বলার সময়। কী করে জানি না ওঁর চোখে চোখ পড়ল আর আমার স্নায়ুতে একটা কম্পন জাগল অনেক কাল পরো। উনি কি একটু হাসলেন? না ওটা আমার মনের ভুল ছিল? আলোচনা শেষ হলে প্রথম প্রশ্নটা এল ওই মহিলার কাছ থেকেই। উনি হাত তুলে দিয়েছিলেন শ্রোতাদের প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই। বললেন, “আই হ্যাভ নট রেড নারায়ণ স্যার, বাট আই হ্যাভ সিন ‘মালগুডি ডেজ’ অন টিভি অ্যান্ড লাইকড ইট ভেরি মাচ। প্লিজ টেল মি দ্য নেম অফ জাস্ট ওয়ান অর টু স্টোরিজ অফ মিস্টার নারায়ণ, দ্যাট আই মে রিড অ্যান্ড এনজয়।”

আমি হেসে জবাব দিলাম, “মাই পারসোনাল ফেভারিটস আর ‘টু গোট অ্যান্ড আ হর্স’ অ্যান্ড ‘নাগা।’”

“থ্যাংক ইউ স্যার।”

আমার পরে অন্য একটি বুক-জয়ী উপন্যাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক দীনেশ ত্রিবেদী। আমি সিগারেট খাওয়ার বাহানায় মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর জনা-তিনেক শ্রোতা আমার বই কোথায় পাওয়া যেতে পারে, জিজ্ঞেস করলেন। আমি দূরে পাবলিশারের স্টলের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম। যদিও আমি জানি আমার প্রথম দুটি উপন্যাসের কোনও ভারতীয় সংস্করণ না থাকায় ওগুলো ওখানে পাওয়া যাবে না। এবার আমি ওই সুন্দরী মহিলার দিকে চোখ ফেরালাম। উনি হাসলেন, আমিও একটু হাসলাম।

“আমার একটা কবিতার বই বেরোল আজ, স্যার,” বললেন মহিলা। “আপনাকে একটা কপি দিতে চাই।”

“কিন্তু আমি তো আমার কোনও বই নিয়ে আসিনি এখানে।”

“তাতে কী? আপনি কি বাংলা পড়েন?”

“পড়ি মাঝে মাঝে।”

ওই মহিলা তখন হাতের ব্যাগ থেকে ওঁর কবিতার বইটি বের

করে প্রথম পাতায় সবুজ কালি দিয়ে লিখলেন, ‘শ্রদ্ধা ও শুভকামনা জানিয়ে— শিজিনী মিত্র।’

“থ্যাংক ইউ।”

“পড়বেন কিন্তু,” বললেন শিজিনী।

“নিশ্চয়ই।” কবিতার বইয়ের নাম ‘অমলতাস’। আমি কবিতা বড় একটা পড়ি না কারণ আধুনিক কবিতার ভাষা। তা বাংলায় হোক কিংবা ইংরেজিতে, আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগে। কিন্তু শিজিনীর বইটা খুলে দেখলাম, কবিতাগুলো ছোট এবং বোধগম্য। প্রতিটি পাতায় কবিতার সঙ্গে একটি সুন্দর ছবি আছে, যা কোনও দক্ষ শিল্পীর কাজ বলেই মনে হল।

“আপনি কবি?” আমি বললাম।

“ওই টুকটাক যখন ইচ্ছে হয় লিখে ফেলি আর কী! দু’একটা এখানে ওখানে ছাপাও হয়ে যায়।”

“বাহ্ বেশ,” এরপর কথা বলার মতো কিছু খুঁজে না পাওয়ায় বললাম, “চা-কফি খাবেন একটু আমার সঙ্গে?”

“খাব। সঙ্গে আরও কিছু খাব, আমার খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে।”

“চলুন, যেখানে খাবার আর চা, দুটোই পাওয়া যায়।”

শিজিনী আমাকে নিয়ে গেলেন বই-এর স্টলগুলোর পিছনে ফুড কোর্টে। বইয়ের দোকানের থেকে এখানে ভিড় অনেক বেশি। দোকানের সংখ্যাও অজস্র। আমি বললাম, “কী খাবেন? আমি কিন্তু পে করব।”

“ফিশ ফিঙ্গার। দাঁড়ান আমি আনছি, আপনি ভিড় ঠেলে কাউন্টারে পৌঁছতে পারবেন না।”

আমি চট করে ওয়াল্ট বের করে ওর হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট ধরিয়ে দিলাম। ‘সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র’ এরকম একটা কথা আছে শুনেছিলাম কখনও। সম্ভবত আমার মায়ের মুখেই। সুন্দরী শিজিনী বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়ে, যারা ভিড় করেছিল কাউন্টারের সামনে, তাদের আমাকে দেখিয়ে কী যেন বললেন আর ওরাও আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে ওকে এগিয়ে যেতে দিল। আমার সন্দেহ হল, উনি নিশ্চয়ই আমাকে কোনও বড়, নামী লেখক বলে চালিয়ে দিয়েছেন! পাঁচ মিনিট পরে দুটো প্লেটে চারটে করে ফিশ ফিঙ্গার নিয়ে হাজির হলেন উনি। সঙ্গে আম-কাসুন্দি।

“আপনি তো ইংরেজিতে লেখেন। বাংলা বই-টাই পড়েন কখনও?”

মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কোনও লাভ নেই, তাই আমি বলেই ফেললাম, “পনের বছর আগে সমরেশ বসুর একটা উপন্যাস পড়েছিলাম মনে পড়ে, তারপর আর... আপনার কবিতা পড়ব আজ রাতে হোটеле ফিরে।”

শিজিনী কাটলেট খেতে খেতেই বললেন, “আমি আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট। আমাকে আর ‘আপনি’ বলবেন না, নাম ধরেই ডাকবেন। আমি আপনাকে ‘দাদা’ বললে কিছু মনে করবেন না তো?”

“না না, তা কেন করব!” আমি এবার ভাল ভাবে তাকালাম শিজিনীর আনত মুখের দিকে। গোল বা ডিম্বাকৃতি মুখ নয় ওর, কিন্তু ওর সৌন্দর্য যে-কোনও পুরুষকেই আকৃষ্ট করবে। গালের ডান দিকে বিউটি স্পটের মতো তিলটির জন্য আরও সুন্দর লাগছে। টানা চোখ যাকে আমন্দ আইজ বা বাংলায় পটলচেরা চোখ বলে, আর ইষৎ কোঁকড়ানো চুলা। ভাল ভাবে না দেখলে চুলের ডগায় সিঁদুরের ছোট্ট দাগটি নজর এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। চেহারা স্লিম নয় আবার ভারীও নয়, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন বা চার হবে। আমার প্রাক্তন স্ত্রী সম্ভবীর সঙ্গে ওর চেহারার কোনও মিল নেই। সম্ভবী ছিল পাতলা, ছিপছিপে, লম্বা আর ওর মুখটা ছিল একটু লম্বাটে। সাংবাদিকতার ব্যস্ত জীবনে সাজগোজ করার কোনও সময় পেত না ও। তিন বছরের বিবাহিত জীবন খুব একটা সুখের ছিল না আমাদের। যার মূলে ছিল ঔপন্যাসিক হিসেবে আমার ব্যর্থতা। ও আশা করেছিল, আমার প্রথম ইংরাজি উপন্যাস Kiss And Tell যেমন সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল, পাঠক সমাজে সমাদর পেয়েছিল এবং ছ’মাসে দশ হাজার কপি বিক্রি

হওয়ায় ভাল রয়্যালটি এনেছিল আমার অ্যাকাউন্টে, সেটা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আমার দ্বিতীয় উপন্যাস ‘Sisters And Lovers’ বাজারে মার খেয়ে গেল, দু’হাজার কপিও বিক্রি হল না আর সেই সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাও দ্রুত খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে গেল। মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স নিলাম আমরা। পরে জেনেছিলাম, ও একটা নামী নিউজ চ্যানেলে যোগ দিয়েছে আর ওই চ্যানেলেরই একজন প্রডিউসরের সঙ্গে লিভ টুগেদার করছে।

“কী দেখছেন এত?” আমাকে চমকে দিয়ে শিজিনী জিজ্ঞেস করল।

“আপনি... মানে তুমি সত্যিই খুব সুন্দর। তা তোমার বর কী করে?”

“ও ডাক্তার। অর্থোপেডিক সার্জন, বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে কাজ করে।”

“বাহ ডাক্তার গিম্মি! মাদাম বোভারি পড়েছ?”

“না। কেন? ওই বইতে কী আছে?”

“এক মফস্সলের ডাক্তার আর তার সুন্দরী বৌকে নিয়ে গুস্তভ ফ্লবের এই অসামান্য, কালজয়ী উপন্যাস।”

“পড়ব। আর কী কী বিদেশি বই পড়তে হবে আমাকে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে বলুন তো?”

ওর কথার মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল কিন্তু সেটা গায়ে না মেখে আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, “আর ইউ রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু কিপ ইন টাচ উইথ মি?”

“সার্টেনলি— ইফ ইউ অ্যালাও মি টু ডু সো। আপনি কি ফেসবুকে আছেন?”

“একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম গত বছর। নতুন বই বেরোলে ওখানে প্রচার করি। সব মিলে শ’পাঁচেক ফ্রেন্ড আছে আমার।”

“আমি আজই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাব আপনাকে, অ্যাকসেপ্ট করতে ভুলে যাবেন না যেন।” পেপার ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে ও হাসল আমার দিকে চেয়ে। আমি বললাম, “আর কিছু খাবে?”

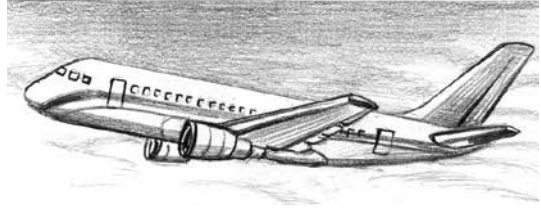
“না না, আমি কি রান্সস নাকি? আপনি তো এখনও শেষ করেননি। ওটা খেয়ে চলুন, ও পাশে লেবু চা খাব।”

শিজিনীর সহজ, স্বচ্ছ ব্যবহার আমাকে ততটাই আকৃষ্ট করল যতটা করল ওর মুখশ্রী। কলকাতার বাঙালি বিবাহিত মহিলারা কি সচরাচর এতটা স্বচ্ছ, সহজ এবং খোলামেলাভাবে কোনও অপরিচিত লেখকের সঙ্গে কথা বলে, যার লেখা একটা লাইনও সে পড়েনি? আমার জন্ম-কর্ম সব দিল্লিতে, ছোটবেলায় মার সঙ্গে মামাবাড়ি চন্দন নগরে এসেছি কয়েকবার। বাবা ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন তাঁর ছোটবেলায়। কাজেই তাঁর কোনও বাড়ি ছিল না এই বাংলায়। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে বাবা দিল্লি চলে এসেছিলেন ছ’য়ের দশকের শুরুতেই। এখন বাবা-মা দু’জনই মৃত আর আমার কলকাতায় আসা শুধু বইমেলা বা ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে কিংবা অক্সফোর্ড বুক স্টোরের সৌজন্যে।

শিজিনীর সঙ্গে লেবু চা খেতে খেতে টুকটাক কথা হল। জানাল, ওর নাচতে খুব ভাল লাগে। ওটা ওর প্যাশন। স্কুলে কথক আর ওডিসি শিখেছিল, এখনও পাড়ার কিংবা স্কুলের ফাংশনে, পূজো প্যাডালে বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে ডাক পেলে ও নাচে। এক সময় ট্রেকিং করতে একটা গ্রুপের সঙ্গে আর বাইরে ঘোরার নেশাও আছে। গত বছর লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ঘুরে এসেছে ওর বর আর মেয়ের সঙ্গে। ওর মেয়ের নাম রিয়া, পড়াশোনায় খুব ভাল, উচ্চমাধ্যমিক দেবে সে বছরই। গড়গড় করে ও বলে গেল ওর নিজের সব কথা কিন্তু আমার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানতে চাইল না! হয়তো লজ্জা বশত, ভাবলাম আমি। অবশেষে বিদায় নেওয়ার সময় উপস্থিত হল। শিজিনী বলল, “ওই কথাই রইল, আপনি আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড হবেন।”

আমি ঘাড় নাড়লাম। আমাকে ফিরে যেতে হবে মধ্যে। অনুষ্ঠানের শেষে সকলের সঙ্গে দেখা করে, আরেকবার চা খেয়ে ফিরে যেতে হবে হোটেল। পরের দিন ভোরেই আমার

দিল্লির ফ্লাইট।



রূপক

আমি অর্থোপেডিক সার্জন, হাড়ের ডাক্তার, ভাঙা হাড় জোড়া দিই। তাই শিজিনী আমাকে সেই বিয়ের রাত থেকেই ‘মিস্টার কারপেন্টার’ বলে ডাকতে শুরু করেছে। বাংলায় ছুতোরমশাই বললে আমার গায়ে লাগতে পারে, তাই ইংরেজি নামটা দিয়েছে। প্রথম দিকে একটু গায়ে লেগেছিল। আমি কি চেয়ার টেবিল, সোফা, খাট-পালঙ্ক তৈরি করি, নাকি মেরামত করি! যে ওই নাম দেওয়া হল আমাকে? কিন্তু সুন্দরী বৌ-এর ঠাট্টা তো সহ্য করতেই হবে, যদিও আমাদের বিয়েটা একরকম সম্বন্ধ করেই হয়েছিল। ‘একরকম’ বলছি এই কারণে যে, ওর সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছে থাকলেও আমার সে সুযোগ ছিল না। শিজিনী আর ওর দিদি লিপি ওদের মা বেলা দেবীকে নিয়ে এসেছিল বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে। রান্নাঘরে ভারী নোড়া পায়ের উপর পড়ে ওঁর দুটো আঙুলে হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার হয়েছিল। আমি তখন নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে সবে এমএস করে বিধানচন্দ্র মেমোরিয়ালে অর্থোপেডিক সার্জন-এর কাজে যোগ দিয়েছি। দুই বোনই দেখতে খুব ভাল, তবে ওই মহিলার পায়ের ব্যান্ডেজ করতে-করতে আমার মনে হল, ছোট বোনকে আমার সঙ্গে মানাবে। কারণ আমার হাইট পাঁচ সাত আর লিপির পাঁচ ছয়, প্রায় কাঁধে কাঁধে। একটু সময় নিয়েই ক্যাজুয়ালিটিতে পায়ের ব্যান্ডেজটা করলাম যাতে ছোট মেয়েটিকে একটু বেশি সময় ধরে দেখতে পারি। দু’একবার আমাদের যে চোখাচোখি হল না তা নয়, তবে বেলা দেবীর উহ্ আহ শুনে, ‘একটু সহ্য করো মা, সব ঠিক হয়ে যাবে!’ এসব আপ্ত বাক্য শোনাতে ও এত বেশি ব্যস্ত ছিল যে, আমার চোখের ভাষা বোঝার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না ওর। চেক আপের জন্য এক সপ্তাহ পরে আসতে বলেছিলাম ওদের, কিন্তু আমার কপাল খারাপ। মেয়েদের না পাঠিয়ে সেবার ওদের বাবা তমাল বাবু নিজেই এসে হাজির হয়েছিলেন। আসলে অঘটনটা যখন ঘটেছিল তখন তো ভদ্রলোক অফিসে ছিলেন, তাই মেয়েরাই মাকে নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে। শেষবার চেক আপ করতে এলে আমার হবু শ্বশুরমশাইকে সোজাসুজি বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম আমি। যদিও আমার মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর ছোটবেলার সেই মমতা মাসির মেয়ে ফুলটুসির সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার। তমাল বাবু ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকালে শিজিনীর মা বেলা দেবী বললেন, ‘আমাদের টুকি কিন্তু খুব জেদি মেয়ে বাবা, ওর মতামত না নিয়ে কোনও কথা দিতে পারব না। ও রাজি হলে, তোমার মা-বাবাকে নিয়ে এস আমাদের বাড়িতে, পাকা কথা বলতে।’

তা পুরো ছ’মাস আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল টুকি ওরফে শানু। ফোন করলে ফোন ধরে না, আর টেক্সট মেসেজ (তখনও হোয়াটসঅ্যাপ চালু হয়নি) পাঠালে তার উলটো সিধে জবাব দেয়। মা বলেছিল, ‘ও মেয়েকে ঘরে এনে কাজ নেই তোর, তোকে এমন নাচান নাচাবে যে তুই-ই আর হাড় জোড়া দিতে পারবি না ঠিক ভাবে। বরং ফুলটুসিকে নিয়ে আসি। লেখাপড়ায় তত সুবিধের নয় কিন্তু ঘরের কাজে...’ কিন্তু আমি তখন ওই সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পাগল, কী করে ওকে ছেড়ে দিই! দু’বার ওর জন্য সিনেমা, থিয়েটারের টিকিট কেটে ওর দেখা না পেয়ে এক সময় রণে ভঙ্গ দিয়ে যখন ফুলটুসিকেই ঘরে আনব একরকম ঠিক করে ফেলেছি,

তখনই বেলা দেবী আর তমালবাবু পুরাতন সহ এক সন্ধ্যায় এসে বিয়ের দিন লগ্ন সব ঠিক করে আমার ধড়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন।

দেখতে-দেখতে আমাদের বিয়ের বিশ বছর পার করে আরও ছয় মাস কেটে গেল। ওর এখন বিয়াল্লিশ, আমার আটচল্লিশ, তবু শানুর প্রতি আমার আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। আমার মনে হয় এর একটাই কারণ যে, ও নিজেকে কখনও পুরনো হতে দেয় না। নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপনা করতে ও জানে। শিক্যান রি-ইনভেন্ট হারসেলফ অ্যান্ড মেক হারসেলফ অ্যাট্রাক্টিভ। অলওয়েজ। যতদিন মা-বাবা বেঁচেছিলেন ততদিন ও ঘরে শাড়ি পড়ত, শুধু বাইরে ঘুরতে গেলে সালোয়ার কামিজ আর রাতে ম্যাক্সি। দু'বছরের ব্যবধানে বাবা-মা দু'জনই চলে গেলে ও জিনস-টপ, স্কাট, হারেম প্যান্ট আর বিশেষ অনুষ্ঠানে লেহঙ্গা-চোলি পরে আমাকে, আমার ডাক্তার বন্ধুদের এবং বিশেষত ওদের বৌদের চমকে দিল। রিয়া-ই ওর মাকে উৎসাহ দিত এসব ব্যাপারে। বলত, 'মাম্মি, তুমি এত সুন্দর, তুমি সব সময় ফ্রেশ থাকবে, ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরবে আর স্লিম থাকবে।' কাজেই মধ্য ক্রিশে একটু মোটা হয়ে যাওয়ার আগেই, রিয়ার চাপে পড়ে ও জিমে যেতে শুরু করল আর বিয়ের প্রথম দশ বছরে যে নাচটাকে ও শিকেয় তুলে রেখেছিল, সেটা আবার শুরু করল। প্রথম দিকে রিয়া-ই ওর নাচের ভিডিয়ো তুলত। এখন রিয়া বেঙ্গালুরু চলে যাওয়ার পর, পাড়ার এক স্টুডিয়ো থেকে শুভম নামের একটি ছেলেকে দিয়ে ও ভিডিয়ো তুলে ফেসবুকে দেয়। ফেসবুকে এখন ওর বন্ধুর সংখ্যা এক হাজারের উপরে। আর শুধু নাচই নয়, এখন ও টুকটাক কবিতা লিখে এখানে-ওখানে দেয়, বেশির ভাগই ছাপা হয়ে যায় কোনও না কোনও পত্রিকায়। গত বছর এক ছোটখাট প্রকাশকের সৌজন্যে 'অমলতাস' নামে একটা কবিতার বইও বের করে ফেলল শানু।

কিন্তু শানুকে আমি এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। সারাদিন হাসপাতালে কাটিয়ে কোনও কোনওদিন বাড়ি ফিরে দেখি, ও মুখ গোমড়া করে ব্যালকনিতে রকিং চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আর গোল্ডি লেজ নাড়িয়ে নানারকম আওয়াজ করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মালতীকে চা করতে বলে, ওর পাশে বসে হাতটা ধরতে গেলে ও হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, ক্লিষ্ট হেসে বলে, 'যাই, তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি।' আমি দু'একবার চেষ্টা করেছি ওর মনের গভীরে ডুব দিতে, কিন্তু পারিনি। বেশি চাপাচাপি করলে ও বলে, 'সব কথা সবাইকে বলা যায় না। আমি তো ভালই আছি।' তারপর কথা বোরানোর জন্য বলে, 'চলো, উইকএন্ডে মণিমুকুটপুর ঘুরে আসি আরেকবার।'

বাইরে গিয়ে হৈ-ছল্লোড় করে দুটো দিন ভালই কেটে যায় আমাদের। মাঝে মাঝে ওকে খুশি করতে আমি বড় হোটলে পার্টিতে নিয়ে যাই। বিয়ের রিসেপশন, কারও ছেলে-মেয়ের জন্মদিন কিংবা কোনও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির তরফ থেকে দেওয়া পার্টি। যেখানে মদের ফোয়ারা ছোটো। প্রথম দিকে ও ড্রিংক নিতে চাইত না, কিন্তু আমার কলিগ কার্ডিয়োলজিস্ট আশিস সান্যালের বৌ মন্দিরা আর আনাসথেসিস্ট সুমন খাস্তগিরের বৌ মেঘনা ওকে একবার জোরাজুরি করে ওয়াইন খাইয়ে দিল। একটু টিপসি হলে, আমার জুনিয়র অর্থোপেডিশিয়ান ব্রিদিব চৌধুরীর বৌ রুমার অনুরোধে ও ইউটিউবে একটা পুরনো হিন্দি গান চালিয়ে তার সঙ্গে বেশ খানিকটা নেচেও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। সেদিন রাতে অনেক দিন পরে ও আমাকে ওর শরীরের গভীরে প্রবেশ করতে দিল পর পর দু'বার! আর আমাকে মিস্টার কারপেন্টার নয়, 'রূপক, ডালিং' বলে চুমু খেতে দিল ওর স্তনে, সারা শরীরের আনাচে কানাচে... যে-সব জায়গায় আগে কখনও ও আমাকে মুখ নিয়ে যেতে দেখনি আমাদের বিয়ের দীর্ঘ আঠেরো বছরে। পরে আমাকে বলেছিল, ও নিজের ওয়াইন খাওয়ার কথা রিয়াকে জানালে মেয়ে বলেছিল, 'এনজয় ইউরসেলফ মম। দ্যাটস লাইফ।' রিয়া তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ে কিন্তু নেটের দৌলতে ও জেনে গিয়েছিল, মেয়েদের একটু আধটু ড্রিংক করা শরীর এবং

মন দু'দিক থেকেই উপকারী। এরপর পার্টিতে গেলে ওয়াইন, জিন, এমনকি স্কচের ছোট পেগ হাতে ধরিয়ে দিলেও ও চুক চুক করে খেয়ে নিত! আর সে রাতটা ওকে আমি পুরোপুরি নিজের মতো করে পেতাম। এমনকি ওরাল সেক্স, যেটা আগে ও একেবারেই অ্যালাও করত না, সেটাতেও আমাকে কোনও বাধা দিত না। শুধু সব সারা হয়ে গেলে বলত, 'বাধরুম থেকে ভাল করে মুখটা ধুয়ে এস।' নতুন পাওয়া এই আনন্দ যাতে ফিকে না হয়ে যায়, তার জন্য এই প্রথম আমি সিংগল মল্ট স্কচ বাড়িতে নিয়ে এলাম। যখন শনি-রবিবার কোনও পার্টি থাকত না, তখন রিয়া ওর কামরায় শুতে চলে গেলে রাত এগারোটা নাগাদ আমরা বসতাম স্কচ নিয়ে। ও সোডার সঙ্গেই খেত আর আমি নিতাম বরফের টুকরো—অন দ্য রকস। সঙ্গে স্যালাড আর নোনাতা কাজু। বিয়ের পরে হানিমুনে সিমলা গিয়ে তিনদিন তিনরাত যে আনন্দ উপভোগ করেছিলাম আমরা, সেটা আবার ফিরে এল এই মধ্য বয়সে স্কচ-এর মহিমায়!

কিন্তু সব আনন্দই ক্ষণস্থায়ী। করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে শানু আক্রান্ত হল, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। পনের দিন আইসোলেশন ওয়ার্ডে থেকে, অক্সিজেন মাস্ক মুখে নিয়ে ও ফিরে এল বাড়িতে। আর্থরাইটিসের পুরনো ব্যাথাটাও বেড়ে গেল আর রিয়া করোনার শেষ দিকে বেঙ্গালুরু চলে গেলে শানু খুব মুষড়ে পড়ল। ও আর আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখতে চাইল না। রাতে প্রায়ই উঠে বসে কান্নাকাটি করত। আমার অনুরোধে আমার কলিগদের বৌ-রা— মন্দিরা, রুমা আর মেঘনা এসে ওকে বোঝাল, সান্ত্বনা দিল। তারপর একদিন ওরা আমাকে বলল, 'দাদা, ও খুব ভেঙে পড়েছে, মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। সমাধান দুটো, নয় মেয়েকে ফেরত নিয়ে আসুন অথবা ওকে এমন কিছু মध्ये ইনভলভ করুন যা নিয়ে ও ভাল ভাবে সময় কাটাতে পারে।'

আমি শেষ পর্যন্ত আমার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসমেট সঙ্গীতা সেনগুপ্তর শরণাপন্ন হলাম। ও পিজিতে সাইকিয়াট্রিস্ট। সব শুনে বলল, "দেখ রূপক, যাদের তোর মতো একটা বাচ্চা, তাদের বৌ-দের এটা কমন প্রবলেম। তুই একটা কাজ কর, বাড়িতে একটা কুকুর নিয়ে আয়। অ্যালসেসিয়ান বা জার্মান শেপার্ড আনবি না, ওরা খুব বেশি প্রটেক্টিভ হয়। তখন তোর সুন্দরী বৌ-কে কেউ কিছু বললে ঝাঁপিয়ে পড়বে, রক্তারক্তি কাঁদা ঘটনিয়ে ফেলবে। তুই ক্যালকাটা কেনেল ক্লাবে গিয়ে একটা গোল্ডেন রিট্রিভার নিয়ে আয়।"

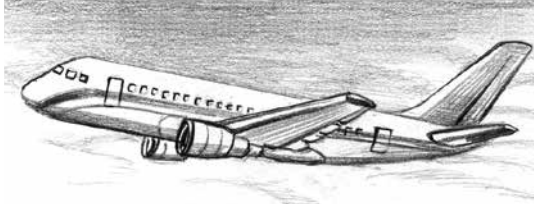
"কিন্তু শানু যদি ওটাকে মেনে না নেয়?" আমি বললাম। "ও তো গুম মেরে বসে আছে, ভাল ভাবে কথাও বলে না আমার সঙ্গে, খেতে চায় না, রাতে উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তারা গুনে রাত কাটায়।"

সঙ্গীতা হেসে বলল, "গোল্ডেন রিট্রিভার খুব পিপুল ফ্রেডলি ডগ, খুব সহজেই মানুষকে এমন কি বাড়ির অন্য পোষা জীব-জন্তুকেও আপন করে নিতে পারে। প্রথমদিকে শানু ওকে একটু দূরে রাখতে চেষ্টা করলেও কিছুদিনের মধ্যেই ওকে ভালবেসে ফেলবে। শুধু ওকে সকালে বিকেলে একটু লগ্না ওয়াকে নিয়ে যেতে হবে। রিট্রিভার কান্দি ডগ, গাছপালা, পশুপাখি, জল কাদা এসব খুব পছন্দ করে। হ্যাঁ, ওকে সপ্তাহে একবার চান করাতে হবে। বড় বড় লোম হয় গায়ে, সেটা আঁচড়ে দিতে হবে। এসব নিয়েও সময় ভাল কাটবে শানুর।"

সঙ্গীতা ঠিকই বলেছিল। গোল্ডি-ই তিন মাসের মধ্যে শানুকে ফিরিয়ে আনল স্বাভাবিক জীবনে। এখন ও রবিবার সকালে রিয়ার সঙ্গে ভিডিয়ো কল করে আধ ঘণ্টা কথা বলে। মালতীকে বারো ঘণ্টার জন্য রেখে দেওয়ার পরে জিম, নাচ, কবিতা লেখা আবার শুরু করেছে। যদিও করোনার পর হুইস্কি খাওয়াটা ছেড়ে দিয়েছে, কারণ ওটা আর ওর ভাল লাগে না। ও এখন পার্টিতে মন্দিরা, রুমা আর মেঘনাকে খুশি করতে একটু ওয়াইন নেয়। কিন্তু সেটা এতই কম যে ওতে কারও কোনও নেশা হয় না। আর তার ফলে রাতে ওর শরীর আর আগের মতো সহজলভ্য হয়ে ওঠে না আমার কাছে।

বিধানচন্দ্র মেমোরিয়ালের সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট ময়ালী

সামস্ত্য যে ইদানীং আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার পিছনে শানুর যৌন মিলনে অনীহা অস্বীকার করা যায় না।



শিজিনী

একটু আগে আমার ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে গেল বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল-এর ল্যাবরেটরি থেকে শুভাশিস নামের একটি ছেলে। ওই হাসপাতালে মূলত হাড়ের চিকিৎসা হয়। তবে ওখানেও মেডিসিন স্পেশ্যালিস্ট আছেন একজন, ডক্টর অমূল্য শিকদার। এবং বিশেষ প্রয়োজনে অপারেশনের আগে সুগার বা অন্য কোনও প্রবলেম থাকলে তার চিকিৎসার জন্য দশটা বেড আছে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায়। অপারেশন থিয়েটার তৃতীয় তলায় আর ওরই লাগোয়া রয়েছে আইসিইউ। রিসেপশন, ওপিডি নীচের তলায় আর বেসমেন্টে রয়েছে স্টোর রুম আর ফিজিওথেরাপি সেন্টার। যার ইন চার্জ এখন ময়ালী সামস্ত। রূপকের সঙ্গে ওর যে একটা সম্পর্ক শুরু হয়েছে সেটা টের পেয়েছি গত বছর শীতের শুরুতে ওর ব্রাউন টুইডের কোটটা ব্রাশ করার সময়। যে তিনটে লম্বা চুল ওর কোটের ল্যাপেলে আটকে ছিল, তার একটাও আমার নয়। আমার চুল কোঁকড়ানো আর এটা সোজা, মনে হচ্ছে কোনও জেল মেখেছে চুলে। এটা নিঃসন্দেহে অন্য কোনও মহিলা। আমাকে একটু গোয়েন্দাগিরি করতে হল, কার চুল সেটা জানতে। হাসপাতালের রিসেপশনিস্ট মহুয়া দাসকে চিনতাম, আমাকে বোদি বলেই ডাকে। তাই ওকেই কাজে লাগলাম। পাঁচ দিনের মধ্যে খবর পেলাম, মিস্টার কারপেন্টার অসময়ে এবং অকারণে বেসমেন্টে যান পেশেন্ট দেখবার বাহানায় এবং ওখানে অনেকটা সময় ময়ালীর চেম্বারে বসে হা হা হি হি করেন, চা-কফি খান। সেই সঙ্গে চুমুও খান কিনা সেটা মহুয়া কনফার্ম করতে না। পারলেও আমি অনুমান করতে পারলাম, দশ বাই ছয় চেম্বারে অন্য দু'জন থেরাপিস্ট সুবল রক্ষিত আর তৃপ্তি সাহার অনুপস্থিতিতে যতটুকু ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব, ততটুকু হতেই পারেন ছুতোমশাই। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। আমার তো এখনও মেনোপজ হয়নি আর এখনই আমাকে এত অবহেলা! এটা আমি কখনও মেনে নেব না। সন্দের দিকে বড়সড় একটা লড়াইয়ের জন্য আমি কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে নিলাম। একবার ভাবলাম রিয়াকেও জানিয়ে দিই 'তোরা বাপি আমাকে চিট করছে।' উনিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে তো আমার এখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সব কিছুই খুলে বলি ওকে আমি। এমন কী আমি যে ফেসবুকে নবারুণের বন্ধু হয়েছি, সে কথাও ওকে জানিয়ে দিয়েছি। ও শুধু বলেছে, 'টেক কেয়ার মম। ফ্রেন্ডশিপ ইজ ওকে বাট ডোন্ট গো টু ফার... বুঝতেই পারছ আমি কী বলতে চাইছি?'

কিন্তু রিয়া পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, ওকে ডিস্টার্ব করতে মন চাইল না। তাই শেষ পর্যন্ত ভর দূপুরে টয়লেটে গিয়ে নবারুণকেই ফোন করে বসলাম। আমি জানি, ও তখন ল্যাপটপে ওর চতুর্থ উপন্যাস, যেটা করোনার উপর আধারিত, তা লিখতে ব্যস্ত। তবু এই ক্রাইসিসে বন্ধুর পরামর্শ না নিলে কী করে চলবে? আমি গড় গড় করে এক নিঃশ্বাসে মিস্টার কারপেন্টারের কোটে চুল পাওয়া থেকে মহুয়ার কাছ থেকে পাওয়া ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট, সব ওকে বলে দিলাম। নবারুণ হেসে বলল, "এত একসাইটেড কেন তুমি? মাঝ বয়সে পুরুষ মানুষ একটু নতুনত্বের সন্ধানে অন্য মেয়েদের দিকে ঝোঁকে। এটা মেনে নেওয়াই ভাল।"

"কী বলছ তুমি? আমার এতদিনের গোছানো সংসার এভাবে ভেঙে যেতে দেব?" আমি চোঁচিয়ে উঠেছিলাম।

"বেশ, ওকে কনফ্রন্ট করো। প্রমাণ দিতে পারবে? তিনটে চুল তো কোনও পেশেন্টেরও হতে পারে। এত তাড়াহুড়ো কীসের তোমার? আরেকটু এগোতে দাও না ওদের। শার্টির কলারে লিপস্টিকের দাগ, গায়ে অচেনা পারফিউমের গন্ধ, অকারণে খুশি মুখে শিস দিতে দিতে রাত করে বাড়ি ফেরা... আরে ওকে আর একটি এগতে দাও ময়ালীর সঙ্গে। আই লাইক দ্যাট নেম, সো সুইট..."

আমি একটু খেপে গিয়ে বললাম, "এটা তোমার ইংরেজি উপন্যাস নয় বিউ যে, যে যখন খুশি অন্যের বিছানায় চলে যাবে! তোমরা যাকে বল বেড হপিং। আমি এটা কিছুতেই মেনে নেব না।" "দ্য বেস্ট থিং টু ডু ইন ইয়ারের কেস ইজ টু পে হিম ব্যাক ইন হিজ ওন কয়েন।"

"কী বলতে চাও তুমি? সাদা বাংলায় বলো, তোমার অত ইংরেজি আমি বুঝি না বাপু।"

"ও যা করছে ময়ালীর সঙ্গে, তুমিও সেটাই করো আমার সঙ্গে। তুমি আমার বন্ধু থেকে প্রেমিকা হয়ে যাও চটপট।"

আমি থ মেরে গেলাম। নবারুণ আমাকে পছন্দ করে জানি, কখনও আমার 'গুড মর্নিং' মেসেজের জবাবে 'গুড মর্নিং সুইটহার্ট' বা 'গুড মর্নিং ডিয়ারেস্ট' লিখে পাঠায়। কিন্তু ওগুলো আমি ঠাট্টা হিসেবেই মেনে নিয়েছি। ও তো বয়সে রূপকের চেয়েও এক বছরের বড়, ও নিজেই বলেছিল, 'আই অ্যাম গোয়িং টু রিচ মাই হাফ সেন্টিমিটার সুন।'

"আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে শুভে পারব না," আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম। কারণ ওরকম ইচ্ছেটা আমার মনের মধ্য থেকে একেবারে উবে গিয়েছে করোনায় ভুগে ওঠার পর। কে জানে, রূপক হয়তো সেই কারণেই ঝুঁকছে ময়ালীর দিকে। বাংলায় যাকে বলে ঢিলের জবাব পাটকেল, ইংরেজিতে টিট ফর ট্যাট, সেটাই করতে বলছে নবারুণ।

"চুমু তো খেতে দেবে আমাকে, নাকি তা-ও দেবে না?"

"সেটা দেখা যাবে। তুমি কবে আসবে?"

"এত তাড়াহুড়ো কেন? আমার বইটার মাঝামাঝি এসে গেছি, ক্লাইমাক্স সিন আসছে নেক্সট চ্যাপ্টারে, তারপর..."

"না না অত দেরি আমার সহিবে না, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। রবিবার আসবে না, ও ঘরে থাকে। আমি তোমার প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেব। বলো কবে আসবে?" নবারুণের নিয়মিত কোনও রোজগার নেই। বইয়ের রয়্যালটি আসে বছরে দু'বার, ও জানিয়েছিল আমাকে। জানুয়ারিতে আর জুলাইতে। অন্য সময় টুকটাক ইংরেজি পত্র-পত্রিকার রবিবারের সাপ্তাহিক ফিচার লিখে পাঁচ দশ হাজার টাকা কামায় ও। কপাল ভাল যে ওর দু'চারজন বন্ধু বান্ধব আছে, যারা ওকে থাকার জায়গা দিয়ে, অর্থ সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। দু'বছর হল এক বড়লোক বন্ধু ওকে থ্রেটার কৈলাশে তার তিন তলা বাড়ির চিলে কোঠাটা ছেড়ে দিয়েছে। যাতে ও নিশ্চিন্তে বসে কাজ করতে পারে। আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওকে আমি আমার বাড়িতে এনে রাখি। রিয়ার কামরাটা তো খালিই পড়ে আছে। মি. কারপেন্টারকে রাজি করিয়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু নবারুণ আমার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিল। বলেছিল, "তুমি যেরকম বক বক করো তাতে আমার লেখা মাথায় উঠবে আর তোমারও বদনাম হবে।"

শেষ পর্যন্ত আমার খোঁচাখুঁচিতে এক বুধবার নবারুণ চলে এল কলকাতা, আমার সঙ্গে প্রেম করতে। সকালের ফ্লাইটে এল আর সন্দের ফ্লাইটে ফিরে গেল দিল্লি। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা, মাত্র আট ঘণ্টা। কিন্তু এই আট ঘণ্টায় ও আমার জীবনে এমন একটা বড় ঝাঁকি দিয়ে চলে গেল যে, আমি ওকে জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। সোজা কথায়, আমি নবারুণের প্রেমে পড়ে গেলাম!

ময়ালী

ডক্টর রূপক মিত্র প্রথম যেদিন আমাকে চুমু খেল, সেটা ছিল জুলাই মাসের একটা বৃষ্টির দিন। মাত্র তিনজন পেশেন্ট

এসেছিল সেদিন ফিজিওথেরাপি করাতে। তার মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা, যাঁর বাথরুমে পড়ে গিয়ে কোমরে হেয়ারলাইন ফ্র্যাকচার হয়েছিল। একমাস বিছানায় শুয়ে ক্যালসিয়ামের জোরেই উঠে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু ভাল ভাবে হাঁটতে পারছিলেন না। তাই ফিজিওথেরাপি করতে এসেছিলেন পনের দিনের জন্য। অন্য দু'জন মাঝবয়সি ভদ্রলোক। যাদের পুরনো আরথ্রাইটিসে একটা বা দুটো পা-ই প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। ওঁরা তিন পা-ওয়ালা অর্থোপেডিক স্টিক নিয়ে হাঁটাচলা করেন। কিন্তু ডক্টর মিত্র বহুবীর ওঁদের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে বলার পরেও রাজি হননি। কারণ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই ওঁদের। ব্যথা অসহ্য হলে বছরে বার তিনেক ফিজিওথেরাপি করিয়ে যান আমাদের এখান থেকে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট হিট প্যাড, আল্ট্রাসাউন্ড আর মাসাজ করা হয় ওঁদের।

ঝামঝামে বৃষ্টি চলছিল সকাল থেকে। কাজেই আমি একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম, সকালে তিনটে ইন-হাউস পেশেন্টকে ফিজিও করার পর মোটামুটি ফ্রি থাকব বিকেলের দিকটা।

কিন্তু সাড়ে বারোটা নাগাদ এই তিনজন পেশেন্ট এসে হাজির হল বেসমেন্টে। আমি ওঁদের তিনজনের সঙ্গে হাই হ্যালো করে, কে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করে, আমার রেজিস্টারে ওঁদের নামের পাশে যে ছোট ছোট চৌখুনি বসানো আছে এক একটি দিনের জন্য, তাতে টিক মেরে নিলাম। তারপর আমার জুনিয়র তৃপ্তি সাহাকে বললাম, “ম্যাডামকে নয় নম্বরে নিয়ে গিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড শুরু করে দাও।” সুবল রক্শিত আমার হেল্লার, কিন্তু ও এখন প্যারায়ফিন বাথ দিতে পারে, হিট প্যাড লাগাতে পারে আর মাসাজও করতে পারে। তাই ওকে বললাম, অন্য দুই বৃদ্ধকে তিন আর সাত নম্বরে নিয়ে যেতে। কারণ মাঝখানের বেডের প্যানেলের সুইচবোর্ডে কিছু প্রবলেম আছে, যেটা ধরা পড়েছে আগের দিন বিকেলে। ইলেকট্রিশিয়ান মাধবকে খবর দিয়েছি কিন্তু ও এখন আইসিইউ-তে একটা কাজে ব্যস্ত। তাই ওই বেডগুলো খালি রাখতে হবে আমাকে। ওঁদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে নিজের কামরায় এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম আমার চেয়ারে।

আমি সেদিন টিফিন আনিনি। তাই রিসেপশনিস্ট মহুয়াকে বললাম বাইরে থেকে আমার জন্য মুড়ি আর পেঁয়াজি আনিয়ে দিতে। বৃষ্টির দিনে এ দুটোই আমার প্রিয় খাদ্য। বিকাশ একটু পরেই নিয়ে এল আমার খাবার। কিন্তু টেবিলে পেপার বিছিয়ে মুড়ি ঢালতেই ওপাশ থেকে উঁচু গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দু'জন বৃদ্ধের মধ্যে একজন বেশ চোঁচিয়ে কিছু বলছেন আর সুবল তাকে শাস্ত করার চেষ্টা করছে। আমি বেরিয়ে এলাম। “কী হয়েছে, সুবল?”

“সাত নম্বর বেডের পেশেন্ট ডক্টর মিত্রের সঙ্গে এখনই কথা বলতে চাইছেন,” বলল সুবল, মুখ ব্যাজার করে।

আমি এগিয়ে এসে সাত নম্বর বেডের পর্দা একটু সরিয়ে গলায় যতটা মধু ঢালা যায় ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার কী প্রবলেম জেঠু, বলুন আমাকে।”

জেঠু মানে মি. হালদার কঁকাতে কঁকাতে বললেন, “ডক্টর মিত্রকে ডাকুন এক্ষুণি, যা বলার ওঁকেই বলব। আপনারা শুধু ফাঁকি দিয়ে পয়সা লুটছেন আমার।”

“ডক্টর মিত্র তো এখন আইসিইউ-তে রাউন্ডে আছেন, কী করে উনি...”

“পাঁচ মিনিটের জন্য ডাকুন ওঁকে। দশদিন এখানে আসছি, কোনও ইমপ্রুভমেন্ট নেই! এ কি ছেলে খেলা করছ তোমরা আমার সঙ্গে? আই ওয়ান্ট অ্যান এক্সপ্লানেশন অ্যান্ড অ্যাপোলজি অ্যাড্জ ওয়েল।”

এরকম ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হ্যান্ডল করা আমার কাজ নয়, কাজেই আমার চেম্বারে গিয়ে আইসিইউ-এর চিফ নার্স বন্দনাদিকে ফোন করে বললাম, “এমার্জেন্সি দিদি, পাঁচ মিনিটের জন্য ডক্টর মিত্রকে নীচে পাঠান। না হলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে।”

ডক্টর রূপক মিত্র দশ মিনিট পরে নীচে নামলেন। আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে সাত নম্বর বেডের সামনে দাঁড়িলাম। মি. হালদার গড় গড় করে তাঁর অভিযোগ বলে গেলেন। ছ’মাস আগে তিনদিন ফিজিও করে উনি যে উপকার পেয়েছিলেন, এবার দশদিনেও কেন তার সিকিভাগ রিলিফ পাওয়া গেল না, জানতে চাইলেন উনি। ডক্টর মিত্র লিগামেন্ট, টেন্ডন, নার্ভ কীভাবে বয়সের সঙ্গে ঢিলে হয়ে যায়, স্পন্ডিলোআর্থরাইটিস আর ফাইব্রোমায়ালজিয়া কীভাবে স্পাইনাল কর্ড থেকে নীচে নেমে পুরো পা-কে অকেজো করে দেয়, তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মি. হালদার ওসব শুনতে রাজি নন। “স্টপ ইয়োর অর্থোপেডিক মাসো-জাসো। আই ওয়ান্ট কুইক ইমপ্রুভমেন্ট অর আই উইল লজ আ কমপ্লেন উইথ ইয়োর ডাইরেক্টর মি. ঘাটানি।”

ডক্টর মিত্র একটু শ্রাগ করে বললেন, “ঠিক আছে মি. হালদার, আমি আপনাকে ইমিডিয়েট রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। কাল সকাল দশটায় ইমার্জেন্সিতে আসুন। একটা ইঞ্জেকশন দেব আপনার দু'পায়ের হাড়ে। বেশি নয়, দশ হাজার টাকা খরচ পড়বে আপনার।”

“কতদিন কাজ করবে আপনার ওই ইঞ্জেকশন?”

“এক বছরের পরে ওটার এফেক্ট একটু কমে আসবে, তবে কষ্ট অনেক কম থাকবে।”

“দেখি ছেলের সঙ্গে কথা বলে,” বললেন মি. হালদার। এখন তিনি অনেকটা শান্ত। “নাও বাবা, এই চাকতিগুলো তুলে নাও আমার পা থেকে আর জেলটো ভাল ভাবে মুছে দাও।”

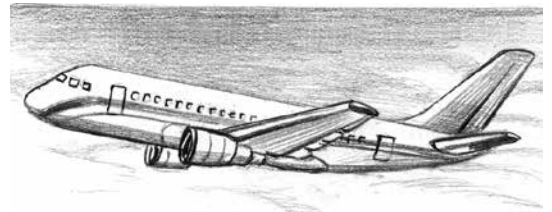
মি. হালদারকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমার চেম্বারে এসে হাঁফ ছাড়লেন ডক্টর মিত্র। উনি আমার কামরার বাইরে দাঁড়িয়েই সাধারণত কথা বলেন আমার সঙ্গে। কিন্তু আজ ঝামেলা কাটিয়ে একটু স্বস্তি নিয়েই ঢুকলেন আমার কামরায়। সামনে টেবিলে খবরের কাগজের উপর মুড়ি আর পেঁয়াজি দেখে বললেন, “বাঃ বৃষ্টির দিনে ভাল খাবার আনিয়েছ দেখছি।”

“খান না দু'মুঠো মুড়ি আমার সঙ্গে। বড় ঝামেলা থেকে আমাকে আজ বাঁচালেন স্যর। চা আনাই?”

“তা আনাতে পার। আধঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছি আইসিইউ থেকে। সো...”

মহুয়াকে জানালাম ডক্টর মিত্র আমার চেম্বারে, চা খাবেন। ভাল দার্জিলিং চা পাঠাতে আমাদের জন্য।

আমরা দু'জন মুড়ি আর পেঁয়াজি খেতে শুরু করলাম। কখন আমার চোঁটে পেঁয়াজির টুকরো আটকে গিয়েছে খেয়াল করিনি। হঠাৎ ডক্টর মিত্র টেবিলের ওপাশ থেকে সামনে ঝুঁকে আমার চোঁট থেকে আঙুল দিয়ে পেঁয়াজির টুকরোটা মুছে দিলেন। চোঁটে ওঁর আঙুলের স্পর্শ আমার এত ভাল লাগল যে, আমি আবেশে চোখ বুজে ফেললাম। আর ঠিক তক্ষুনি ডক্টর রূপক মিত্র চেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে প্রথম চুমুটি খেলেন।



নবরূপ

রেচেল উইলিয়মসকে সুন্দরী বলা ঠিক হবে না। কিন্তু ও সুশ্রী। ওর বয়স এখন ছেচল্লিশ। নীল চোখ, সোনালি বা গোম্বেন ইয়েলো চুল, চোয়াল উঁচু, মুখ একটু চ্যাপ্টা ধরনের, চোঁট পাতলা এবং প্রশস্ত। একটি নামী, বনেদি লিটোরারি এজেন্সিতে কাজ করত রেচেল। এখন ও নিজের এজেন্সি খুলে বসেছে গোম্বহক রোডে, যার নাম ‘লরা লিটোরারি এজেন্সি’। লরা ওর মায়ের নাম। আমার প্রথম উপন্যাস ‘Kiss And Tell’ লন্ডনের একটি প্রথম

সারির প্রকাশক Secker & Warburg থেকে বেরিয়েছিল ওরই প্রচেষ্টায়। ও আমাকে পরে বলেছিল, আমার টাইপ করা পাণ্ডুলিপি ওই প্রকাশনার কমিশনিং এডিটর মার্ক শেফার্স-এর টেবিলে রেখে একটু মুচকি হেসে ও বলেছিল “মার্ক, ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড ইন ব্ল্যাক হিউমর, হিয়ার ইজ দ্য রাইট স্টাফ ফর ইউ।” এজেন্টরা খোঁজ রাখে প্রকাশনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ব্যক্তিগত রুটিন। তাই মার্ক যে ইভলিন ওয়াউ এবং কিংসলে অ্যামিস-এর একনিষ্ঠ পাঠক, সে খবর জেনেই আমার কমিক উপন্যাসটি নিজের হাতে ওকে দিয়ে আসে পড়তে। ভারতীয় পাঁচ পাঁচটি প্রকাশক এবং লন্ডনের দশটি এজেন্টের কাছ ‘না’ শুনে আমি যখন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, রেচেলই আমাকে উদ্ধার করেছিল।

আমার চতুর্থ উপন্যাস ‘Amanda’s Choice’ করোনাকালের কাহিনি। চেল্টেনহামের বাসিন্দা, সাঁইত্রিশ বছর বয়সি আমান্ডা জোনস ওর এগারো বছরের মেয়ে ইসলামকে নিয়ে ভারত দর্শনে বেরিয়েছিল। দক্ষিণ ভারত, গোয়া ঘুরে দিল্লি এসে লক ডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় ওরা দেশে ফিরতে পারল না। বাড়ি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস সময় কাটাতে হল ওদের দিল্লিতে আর এই সময়ই ওর পরিচয় হল আকাশ মলহোত্র এবং বিশাল মিশ্র নামক দু’জন মানুষের সঙ্গে। যারা ওকে নানা ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে, ওর ভারতে বসবাস করা কঠিন হয়ে উঠত। ওরা দু’জনই একসময় আমান্ডাকে ভালবাসতে শুরু করলে আমান্ডা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। প্রশ্নটা হল, ও ওর তিন জন প্রেমিকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কাকে বেছে নেবে জীবনসঙ্গী হিসেবে? কারণ আমান্ডা ডিভোর্সি আর চেল্টেনহামে ওর এক প্রেমিক, যার নাম রায়ান, সে অপেক্ষা করছে ওর দেশে ফিরে আসার। করোনার ধাক্কায় সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় এসেছে, তার থেকে প্রকাশনার জগতও অব্যাহতি পায়নি। তাই দশটি প্রকাশকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ‘রাইটার্স ইন্স’ নামের একটি ছোট প্রকাশনার শরণাপন্ন হতে হয়েছে রেচেলকে, আমার বইটি বাজারে আনার জন্য। আমার আসা-যাওয়ার এবং সাত দিন লন্ডনে থাকার খরচ দিতেও রাজি হয়নি এই প্রকাশক। কাজেই সামান্য পুঁজি ভাঙিয়েই এখানে আসতে হল আমাকে। থর্টন হিথের মিসেস ব্রেমন্ড ব্রাউনের বাড়িতে বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছে রেচেল। যার জন্য আমাকে একটি পাউন্ডও খরচ করতে হচ্ছে না।

গোল্ডহক রোডের কাছেই ছোট একটি ইটালিয়ান রেস্টুরায় আমরা স্প্যাগেটি বোলোতিনিজ খেতে খেতে কথা বলছিলাম Amanda’s Choice উপন্যাসটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান নিয়ে। রেচেল চিঁজ একটু বেশিই পছন্দ করে, তাই একজন পরিচারিকা এসে মিষ্টি হেসে কাঠের একটি ছোট যন্ত্রে হাতল ঘুরিয়ে ওর স্প্যাগেটিতে চিঁজ স্প্রে করে গিয়েছে একটু আগে। স্পুন দিয়ে এক চামচ স্প্যাগেটি মুখে তুলে রেচেল বলল, “নেহরু সেন্টারে আমার আগেই কথা হয়ে গিয়েছে। রোববার সঙ্গে ঠিক সাড়ে ছটায় সেন্টারের ডিরেক্টর মি. সুনীল চৌধুরী বইটা রিলিজ করবেন ওদের অডিটোরিয়ামে। অডিটোরিয়ামের ক্যাপাসিটি ১১০ জন, কাজেই খুব বেশি লোক ডাকা যাবে না।” তার পর প্রশ্ন করল, “তুমি তো কাল ইন্ডিয়ান হাইকমিশনারকে ইনভাইট করতে গিয়েছিলে, রাজি হলেন আসতে?”

আমি হতাশ গলায় বললাম, “ওঁর থার্ড সেক্রেটারি মি. গোমেজের সঙ্গে দেখা করে ইনভিটেশন লেটার দিলাম। উনি নাকি খুব বিজ্ঞি থাকেন, তাই আমাকে পাকা কথা দিলেন না মি. গোমেজ। যা বুঝলাম, আমার মতো ছোট লেখকের বই রিলিজ করতে উনি হাজির হবেন না।”

“হুইচ মিনস, দ্য ফার্স্ট সেক্রেটারি উইল গ্রেস দ্য অকেশন।”

আমি মাথা দোললাম। “বিক্রম শেঠ বা অমিতাভ ঘোষ হলে উনি আসতেন। আমি ছোট মাপের লেখক, তায় আবার কমিক উপন্যাস লিখি, বাজারে তেমন নাম নেই...”

রেচেল আমার কাঁধে হাত রাখল। “ডোন্ট ওরি ন্যাশ্রন,

হোয়াটএভার পাবলিসিটি ইউ গेट, উইল বি গুড ফর ইউ। ইউ হ্যাভ চোজেন আ জঁর দ্যাট সেলস লেস বাট গेटস মোর অ্যাট্রিসিয়েশন দ্যান দোজ ব্লক বাস্টার ক্রাইম নভেলস।”

আমি শ্রাগ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। রেচেল এখন আর আমার শুধু এজেন্ট নয়, ও আমার বন্ধুও। চেলসির কাছেই বোভিংডন রোডে ওর ছোট দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটে কয়েকবার আমাকে নেমস্তন্ন করে বিফ রোস্ট, শেপার্ডস পাই খাইয়েছে। একবার তো ওর এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত লেখকদের একটা পার্টি সেরে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গিয়ে থর্টন হিথের শেষ ট্রেনটা মিস করলে, ও রাতের আশ্রয় দিয়েছিল আমাকে। ওর মেজেনাইন ফ্লোরের ছোট গেস্ট রুমটাতে। আমি ওর হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বললাম, “অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর উইথ মি, রেচেল, আই উইল বি ফাইন।”

“তুমি আবার বিয়ে করছ না কেন ন্যাশ্রন?” রেচেল জিজ্ঞেস করল মিষ্টি হেসে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেলাম, কারণ আমি জেনে গেছি রেচেল নতুন একজন বয়ফ্রেন্ড পেয়েছে। দশ বছর আগেই ওর ডিভোর্সি হয়ে গিয়েছিল, মাঝখানে বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু কোনটাই বেশি দিন টেকেনি। পল সাইমনসের বয়স যাটের উপরে, একটা ছোট পাবলিশিং হাউজে নন ফিকশন এডিটর। একটা পার্টিতে আমার সঙ্গে পলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রেচেল।

“আই অ্যাম ইন লভ উইথ আ ম্যারেড ওম্যান,” পাউরটির টুকরো দিয়ে আমার প্লেটের সসটা মুছে নিতে নিতে আমি বললাম, “সারপ্রাইজড, আরন’ট ইউ?”

“নট অ্যাট অল, মাই ডিয়ার।” রেচেল এবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আমার দিকে। “তুমি যে প্রেমে পড়েছ সেটা তোমার মুখের দিকে ভাল ভাবে তাকালে বোঝা যায়।”

“ইটস হোপলেস, আই নো, বাট আই কুড’নট হেল্প ইউ।”

“প্রেম সব সময়ই, সব অবস্থাতেই ভাল। ইটস আ রিয়েল অ্যান্টিডোট টু এজিং। আর কিছু না হোক, তুমি অন্তত একটা রোম্যান্স লেখার মেটেরিয়াল পাবে। অ্যান্ড হু ইজ দ্যাট লাকি ওম্যান, মে আই নো? এখানে না দিল্লিতে?”

“কলকাতায়। এক ডাক্তারের বৌ।”

“ওয়াও! সাউন্ডস সো ফ্যান্সিনেটিং!”

“সেই ডাক্তার এখন এখানে, লন্ডনে একটা ওয়র্কশপ অ্যাটেন্ড করতে এসেছে সেন্ট জন অ্যান্ড সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে।”

“তোমার লেডিলাভকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ডাক্তার?”

“না, ও একাই এসেছে। ভাবছি একবার ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এলে কেমন হয়?”

রেচেল চোখ বড় করল। “আর ইউ সিরিয়াস?”

আমি হাসলাম। “ও তো অর্থোপেডিক সার্জন, পিটিয়ে আমার হাড় ভাঙলে ও-ই আবার জোড়া দেওয়ার কাজটা করে দেবে।”

রেচেল চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে দু’গালে চকম চকম করে দু’টো চুমু খেল। “ইউ হ্যাভ আ রিয়েল গুড সেন্স অফ হিউমর, ন্যাশ্রন। কমিক নভেল তুমি লিখবে না তো কে লিখবে? কিন্তু ডার্লিং, রোববারের আগে ওখানে যেও না, প্লিজ। তুমি ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকলে তোমার বই রিলিজ কী করে করব আমি?”

“ও নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ক্রাচে ভর দিয়ে নেহরু সেন্টারে বই রিলিজ করতে এলে পাবলিসিটি ভাল হবে, আমার বইটা দশ বিশ কপি বেশি বিক্রি হবে।”

“নট আ ব্যাড আইডিয়া। লেটস হ্যাভ ওয়ান মোর ড্রিংক, ন্যাশ্রন।”

বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে শাওয়ার নিয়ে মিসেস ব্রাউনের সঙ্গে বসে চা আর ঘরে বানানো মারফিন খেতে খেতেই শানুর একটা মেসেজ এসে গেল আমার ফোনে। “একটু আগে হাসপাতাল

থেকে ব্লাড রিপোর্ট দিয়ে গেল শুভাশিস। ডেঙ্গু হয়েছে আমার। প্লেটলেট কমে নব্বই হাজার। বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে মেডিসিনের অমূল্য শিকদার একগাদা প্যারাসিটামল আর ভিটামিন ট্যাবলেট পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফুট জুস আর সুপ খেতে বলেছেন আর জানিয়েছেন অল্টারনেট ডে-তে ব্লাড টেস্ট করতে হবে আমাকে। কী ভোগান্তি বাবা! আর পারি না বিউ, মরলে বেঁচে যাই!”

আমি এক টুকরো মাফিন মুখে ফেলে জনতে চাইলাম, “মি. কারপেন্টারকে জানিয়েছ?”

উত্তর এল, “হুম! ও খুব বিজ্ঞি আছে ওর ওয়র্কশপ নিয়ে। মেসেজ দিল ‘ওষুধগুলো খেয়ে যাও। অ্যাম অ’ফুলি বিজ্ঞি, উইল টক লেটার।’”

“আমি ভাবছি, ওর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে আসব। তুমি কী বলো?”

কিছুক্ষণ ওদিক থেকে কোনও জবাব পেলাম না। শানু নিশ্চয়ই শক পেয়েছে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মিসেস ব্রাউন, যাঁর বয়স এখন আশি ঠুই ঠুই, বললেন, “এনিথিং সিরিয়াস, ন্যাক্সন?”

“ইন্ডিয়াতে আমার গার্লফ্রেন্ডের ডেঙ্গি হয়েছে, মিসেস ব্রাউন। ও একটু কাহিল হয়ে পড়েছে।”

“ও মাই গড!”

টুং করে আওয়াজ এলে হোয়াটস অ্যাপ খুলে দেখলাম, শানু মেসেজ পাঠিয়েছে, “ইউ আর রিয়েলি ম্যাড! হাও ডেয়ার ইউ?”

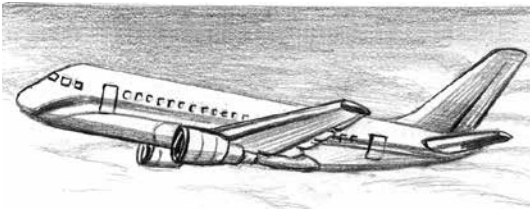
“তোমার এত চিন্তা কীসের? পিটিয়ে হাড় ভাঙলে ও-ই জোড়া লাগিয়ে দেবে! ভাবছি, কাল সন্দের দিকে সেন্ট জন হাসপাতালে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব।”

“প্লি-জ় বিউ! প্লি-জ় এটা করো না। আমার দিকটাও ভেবে দেখো।”

“আমি সব সামলে নেব, তুমি কোনও চিন্তা করো না সুইটহার্ট। আমি ফিরে এসে তোমাকে সব রিপোর্ট করব। ওষুধ পথ্য ঠিক ভাবে খেয়ে যেও। বাই!”

মিসেস ব্রাউন আমার দিকে মাফিনের বাস্কেটটা ঠেলে দিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, “ইন্ডিয়াতে শুনেছি ডেঙ্গিতে প্রত্যেক বছর অনেক লোক মারা যায়! আমার বেস্ট ফ্রেন্ড প্রিসিলা কয়েক বছর আগে সাউথ ইন্ডিয়া ভিজিট করেছিল। ওখানে তখন ডেঙ্গি মহামারির রূপ নিয়েছে...”

মিসেস ব্রাউন একটু টকেটিভ, আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু আমার মুড ছিল না। তা ছাড়া লন্ডনে আমার কয়েকজন লেখক বন্ধু এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত জার্নালিস্টদের রবিবার নেহরু সেন্টারে আসার জন্য অনুরোধ করার কাজ বাকি ছিল। তাই উঠে দাঁড়িলাম, “সরি মিসেস ব্রাউন, আমাকে এখন কয়েকটা ফোন কল করতে হবে। পরে শুনব আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড প্রিসিলার ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।”



রূপক

‘সেন্ট জন অ্যান্ড সেন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল’ লন্ডনের তিনটি নামী হাসপাতালের মধ্যে একটি। এখানে আসার প্রথম দিনই কনফারেন্স রুমে আমাদের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পনেরো জন অর্থোপেডিক সার্জনের সঙ্গে যে ইন্ট্রোডাক্টরি মিটিং হল, তাতেই নর্থ ওয়েস্ট লন্ডনের সেন্ট জন্স উড এলাকায় অবস্থিত এই বিখ্যাত হাসপাতাল সম্পর্কে অনেক কথা জানানো হল আমাদের। আমার বাঁ পাশে বসেছিলেন ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে আসা ডক্টর মোতিউর

রহমান। সিনিয়র কনসালটেন্ট ডক্টর জেমস ল্যাংডনের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে ছোট্ট একটা হাই তুলে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে মোতিউর বলল আমাকে, “হগল কথা একদিনেই কইয়া ফ্যালবে নাকি ল্যাংডন সাহেব?”

আমি বললাম, “না না রহমান সাহেব, কাল থেকে তো ওয়র্কশপ শুরু হবে। কাজের কথাই হবে তখন।”

“বৈকালে আপনার লগে এটু রিজেন্ট পার্ক ঘুইরা দেখুন। ছনছি ওহানে অনেক পশুপাখি আসে।”

“তাই হবে ডক্টর রহমান।”

“ওই সব ডক্টর মস্তর ছাড়েন। আমাদের মোতিউর কইয়া ডাকবেন, আমি আপনার দাদাভাই কমু।”

আমি হেসে বললাম, “তাই হবে।”

আমাদের গুজগুজ ফুসফুস চলছে দেখতে পেয়ে ডক্টর ল্যাংডন জিজ্ঞেস করলেন, “এনি কোয়েশ্চন ডক্টর মিট্রা?”

আমি হেসে বললাম, “নো স্যার। মাই বাংলাদেশি ফ্রেন্ড ডক্টর রহমান ইজ ইন্টারেস্টেড ইন ভিজিটিং রিজেন্টস পার্ক ছইচ ইজ নিয়ার টু দিস প্লেস।”

দীর্ঘসূত্রী ডক্টর ল্যাংডন এবার রিজেন্টস পার্কে বন্য পশুপাখি, বিশেষত হেজহগ কখন গেলে দেখতে পাব তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন! দৈর্ঘ্যে ৫.৯ কিমি এই পার্কটি ঘুরে দেখতে যে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে, সেটাও জানালেন ডক্টর ল্যাংডন। লক্ষ করলাম, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা থেকে আসা ডাক্তাররাও বেশ মনোযোগ দিয়ে ডক্টর ল্যাংডনের রিজেন্ট পার্কের প্রশস্তি শুনলেন। রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট টেকনিক শেখার সঙ্গে লন্ডনের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখার আগ্রহ যে সবার মনেই আছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না আমার।

রিজেন্ট পার্কের কাছেই লন্ডন ম্যারিয়ট হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল সেন্ট জন হাসপাতাল। আমার কামরার পর দুটো কামরা ছেড়েই মোতিউরের কামরা আর আমি যেহেতু ওর থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড়, কাজেই খাওয়া দাওয়া, ঘোরাফেরা সব ব্যাপারেই আমরা জুড়ি বেঁধে নিলাম। আমার ঠাকুরদা যে ময়মনসিংহ থেকে কলকাতা আসেন স্বাধীনতার সময়, সে খবরটা জেনে মোতিউর আমাকে ঢাকা আসার দাওয়াত দিয়ে দিল, ওয়র্কশপে রোবটিক সার্জারির টেকনিক ভাল ভাবে দেখে নেওয়ার ফাঁকেই। ওয়র্কশপে ডক্টর ল্যাংডনের সঙ্গে যোগ দিলেন ডক্টর পিটার ডোমোস আর ডক্টর ভিকি লি, যাকে দেখে বোঝা যায় এই মহিলা চিনা বংশোদ্ভূত। ডক্টর লি আমাদের বোঝালেন যে, রোবটিক সার্জারির আগে সিটি স্ক্যান করার দরকার হয় না। রোবট সার্জারি করে না, কিন্তু সার্জনকে সাহায্য করে ভাঙা চোরা হাড় আর কার্টিলেজ নিখুঁতভাবে তুলে নিয়ে কৃত্রিম হাড় যথাস্থানে লাগিয়ে দিতে। ‘রোবট প্রভাইডস রিয়েল টাইম ইনফো ইন দি অপারেটিং রুম’, বললেন ডক্টর ল্যাংডন। এবং তারপর বিশদভাবে বোঝাতে শুরু করলেন, অস্টিও আর্থ্রাইটিস, রিউমোটয়েড আর্থ্রাইটিস, লুপাস, স্পান্ডিলোআর্থ্রাইটিস আর ফাইব্রোমায়ালজিয়া চিকিৎসার আধুনিকতম কী ব্যবস্থা আছে সেন্ট জন হাসপাতালে। মোতিউর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, “এনার বক্তৃতা শুইন্যা ঘুম পাইতেনে দাদা, চা খাওন লাগে।” আমি ওকে আশ্বাস দিলাম যে, এগারোটা টি ব্রেক হবে।

ওয়র্কশপের দ্বিতীয় দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ রিজেন্ট পার্ক যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, ঠিক সেই সময় রিসেপশন থেকে ফোন এল, আমার একজন ইন্ডিয়ান ভিজিটর এসেছে। যার নাম ন্যাক্সন চ্যাটার্জি। অপরিচিত নাম কিন্তু বাঙালি টাইটেল, খুব সম্ভবত লন্ডনের ট্যাঁশ বঙ্গ সন্তান, ‘নবাকরণ’ নামটাকে দুমড়ে মুচড়ে ‘ন্যাক্সন’ করে নিয়েছে সাহেব হওয়ার বাসনা। কিন্তু কীভাবে ও আমার খোঁজ পেল? তবে কি ও হাসপাতালের কোনও কর্মচারী? মোতিউরকে ইন্টারকমে জানিয়ে দিলাম, আমি নীচে লবিতে যাচ্ছি কারও সঙ্গে দেখা করতে, মিনিট দশেকের জন্য।

লবিত্রে যে লোকটা আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে ‘গুড আফটারনুন, ডক্টর মিত্র’ বলে হাত বাড়াল আমার দিকে, তাকে আগে কখনও দেখিনি। লম্বা, ছিপছিপে দোহারা চেহারা। একটু লম্বাটে মুখ, কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা। একটু আঁতেল টাইপের চেহারা।

“আপনাকে ঠিক চিনলাম না তো,” বলে আমি হাতে হাত মেলালাম।

“আমি আপনার ওয়াইফ শিজিনীর ফেসবুক ফ্রেন্ড। ওর কাছেই শুনলাম, আপনি এখানে ওয়াকশপ করতে এসেছেন।”

“ও, তাই নাকি!”

শিজিনী ফেসবুক নিয়ে দিনে ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটায় জানি। ওর ফেসবুকে এখন সাতশোর উপরে বন্ধু। ওটা একসময় হাজার পেরিয়ে গিয়েছিল, ও বলেছিল। কিন্তু মেসেঞ্জারে প্রেম নিবেদন করে অজস্র মেসেজ আসতে শুরু করলে ও একটু ভয় পেয়েই অনেক হবু প্রেমিককে ব্লক করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এইসব প্রেমিকদের মধ্যে নরখাদকও ছিল দু’একজন। একজন তো ওকে লিখে বসেছিল ‘ইউ লুক সো ডেলিশিয়াস, ইয়াম্মি। আমি তোমাকে নুন আর গোলমরিচ মাখিয়ে খেয়ে নেব!’ কী ভয়ানক ভালবাসা! ন্যাক্কনকে দেখে সেরকম নরখাদক মনে হল না আমার। “আপনি কি এখানেই থাকেন?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“না না, আমি দিল্লিতে থাকি। এখানে এসেছি আমার একটা বই লঞ্চ করতে। রোববার নেহরু সেন্টারে বইটা রিলিজ করা হবে। তাই আপনাকে ইনভাইট করতে এসেছি।”

আমি একটু অবাক হলাম। দিল্লি থেকে এতদূর এসেছে লোকটা বই লঞ্চ করতে! নিশ্চয়ই একাডেমিক লাইনের হবে। “কী বই লঞ্চ করবেন আপনি?”

“একটা ইংরেজি উপন্যাস। নাম ‘আমাস চয়েস’।”

“আই সি, আপনি তাহলে নভেলিস্ট!” শিজিনী কবিতা লেখে, কাজেই সাহিত্যিকদের সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ করতে ও আগ্রহী। কিন্তু আমি তো গল্পো উপন্যাস পড়ি না, ওতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। দু’একবার শানুর টেবিল থেকে কোনও পত্রিকা তুলে নিয়ে পাটা উলটে দেখেছি, আমার একেবারেই ভাল লাগেনি। কবিতায় যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ উদ্ধার করতে হলে ডিকশনারি খুলতে হবে আর গল্পের কাহিনি এত আজগুবি ধরনের যে, ছোটবেলায় ঠাকুরমার মুখে শোনা রূপকথাকে হার মানায়। কিন্তু শিজিনীর এই ফেসবুক বন্ধুকে সরাসরি ‘না’ বলা ঠিক হবে না। এমনিতেই ও ডেস্কিতে ভুগছে, মন খারাপ, একটু আগে যখন ফোন করলাম তখন কেঁদেই ফেলল। বলল, “আর আমার খোঁজ নিয়ে কী হবে! ফিরে এসে আমার শ্রাদ্ধটা ভাল করে করো মি. কারপেন্টার।” আমি কিছু বলার আগেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শানু আর কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ‘তোমার হাসপাতালের সবাইকে ভাল ভাবে খাইয়ে দেবে কিন্তু, আমার মাথার দিবা — মন্দিরা, রুমা, মেঘনা আর ওদের বর তোমার কোলিগদের। তারপর যাকে খুশি তাকে নিয়ে থাকবে তুমি।’

‘কী সব যা-তা বলছ তুমি!’ আমি চোঁচিয়ে উঠেছিলাম কিন্তু শানু কেটে দিয়েছিল ফোনটা। আমি ফোন করলে আর ফোনটা তুললই না ও। আমি বুঝতে পারলাম, ময়ালীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার খবরটা ও জেনে গিয়েছে কোনওভাবে আর তাই খোঁটাটা দিল। বাড়ি গিয়ে ওকে সামলাতে হবে। শিজিনীর ফেসবুক বন্ধুকে মুখের উপর বলে দেওয়া যাবে না যে আমি ওর বই লঞ্চ করার অনুষ্ঠানে হাজির থাকব না। কারণ তাতে শিজিনীর কাছে পরে কথা শুনতে হবে আমাকে।

“আমি খুব চেষ্টা করব নেহরু সেন্টারে উপস্থিত থাকতে। তবে ইট অল ডিপেন্ডস অন মাই অনগোয়িং ওয়াকশপ ইন দ্য হসপিটাল মি. ন্যাক্কন চ্যারজি।”

“আমার নাম নবারণ, এখানে এলে এদের মুখে আমি ন্যাক্কন হয়ে যাই। ক্যান উই হ্যাভ আ ড্রিংক টুগেদার ডক্টর মিত্র?”

বুঝতে পারলাম, আমার সৌজন্যে এক মাগ বিয়ার না খেয়ে নড়বে না শিজিনীর এই লেখক বন্ধু। কিন্তু মোতিউর যে বসে আছে

আমার সঙ্গে রিজেন্ট পার্কে যাওয়ার জন্য। এদিকে একে ভাগিয়ে দিলে পরে শিজিনীর খোঁচা খেতে হবে বাড়ি ফিরে। আমি উঠে গিয়ে রিসেপশন থেকে মোতিউরকে জানিয়ে দিলাম যে, আমার মিসেসের এক দূর সম্পর্কের তুতো ভাই এসেছে। কাজেই আজ আর রিজেন্ট পার্ক যাওয়া হবে না আমাদের।

বারে গিয়ে কাউন্টার থেকে দুই মাগ ড্রট বিয়ার নিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম একটা ছোট টেবিলে। নবারণ মাগে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, “শানু... মানে শিজিনীর ডেস্ক হয়েছে শুনলাম।”

“হুম,” বিয়ারের মাগে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললাম আমি। ওর ‘শানু’ বলায় বুঝতে পারলাম, ওদের সম্পর্কটা একেবারে নতুন নয়। নিজের অজান্তেই আমার ক্র-তে ভাঁজ পড়ল। সম্ভবত সেটা লক্ষ করেছে ও বলল, “গত বছর কলকাতা বই মেলাতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।”

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝলাম, শানুর সেই চটি কবিতার বই ‘অমলতাস’, যার থেকে দুটো কবিতা ও আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল, তার সূত্র ধরেই এই লোকটার সঙ্গে শানুর আলাপ। তবে কি এই লেখকের প্রেমে পড়েই শানু গত ছ’মাসে ওর শরীরের কাছে ঝেঁসতে দিচ্ছে না আমাকে? নাকি ময়ালীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার আঁচ পেয়ে ও আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। নবারণের দিকে এবার আমি একটু ভাল ভাবে তাকালাম। ওর চোঁটের কোণে সূক্ষ হাসিটা কি ওর শিজিনীকে জয় করার আনন্দে, নাকি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছে ও?

“ওর অমলতাস বইটার কবিতাগুলো আমার বেশ ভাল লেগেছে। খুব ফ্রেশ আর বেশ নতুন ধরনের, আধুনিক কবিতার মতো দুর্বোধ্য লাগে না।”

আমি একটু শ্রাগ করে বলি, “ইটস নট মাই কাপ অফ টি। এনিওয়ে, শুনে খুশি হলাম যে আমার মিসেসের কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক আপনি। ‘আ ফিস্টফুল অফ ডিজায়ার’ নামে একটা নতুন ইংরেজি বই দেখলাম সেদিন ওর বইয়ের র্যাকে। ওটা কি আপনার?”

এবার মাথা নাড়ল নবারণ। “আমার তৃতীয় উপন্যাস। খুব বেশি বিক্রি হয়নি বইটা, মাত্র দেড় হাজার কপি সেল হয়েছে।”

‘আর সেজন্যই ওই গুঁচা বিক্রি-না-হওয়া বই আমার বোকে উপহার দিয়েছ তুমি’, বলতে গিয়েও বললাম না। আফটার অল, হি ইজ মাই গেস্ট অ্যাট দ্য মোমেন্ট। “তা আপনার সংসার চলে কীভাবে?” জিজ্ঞেস করে বসলাম আমি, আরেকটা চুমুক দিয়ে বিয়ারের মাগে।

“আমার আপাতত কোনও সংসার নেই। বই থেকে তেমন টাকা রোজগার হয় না তাই ফ্রিল্যান্সিং করি। খবরের কাগজের সানডে ম্যাগাজিনে ফিচার লিখি কখনও সখনও। বই রিভিউও করি।”

আমার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। গরিব লেখকের সঙ্গে দূর থেকে প্রেমলাপ করলেও, শানু কখনও আমাকে ছেড়ে ওর গলায় ঝুলে পড়বে না। কারণ শানুকে আমি যে আদর-যত্ন-আয়াসে রেখেছি, তা জোগাবার ক্ষমতা নেই নবারণের। ও দিল্লিতে থাকে সেটাও আমার পক্ষে কিছুটা স্বস্তিদায়ক। কারণ প্রেম করতে বারবার কলকাতা ছুটে আসার মুরোদ নেই এই বাবাজীবনের। নাঃ মালতীকে কিছু টাকা দিয়ে হাত করতে হবে আমাকে, যাতে শানুর গতিবিধির উপর নজর রাখতে পারে ও। আর সুযোগ মতো ওর ফোনটাও আমাকে মাঝে মাঝে চেক করে দেখতে হবে। ময়ালীকে আমি ফোন করতে একদম বারণ করেছি। লাঞ্চ আওয়ারে ওর চেষ্টারে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে আমি ওকে চুমু খাই আর ওর জুনিয়র সুবল রক্ষিত বা তৃপ্তি সাহা যদি বাইরে চা খেতে যায়, তখন ময়ালীর ব্লাউজ খুলে ওর বিশাল, ভারী ফুটবলের মত গোল আটব্রিশ ইঞ্চি স্তনদুটিকে ভালভাবে মাসাজ করে দিয়ে ওর বোটা মুখে নিয়ে চুষি। যতক্ষণ না ও দুটো নারকেল কুলের মত পুরুষ্টু আর শক্ত হয়ে ওঠে। শানুর বুকের মাপ প্রথম দিকে বত্রিশ ছিল, রিয়ার জন্মের পর চৌত্রিশ হল কিন্তু আমার চিরকালই একটু বড় গোলাকার বুকের দিকে নজর ছিল আর সেকারণেই ময়ালীর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। শানুর সঙ্গে এই মক্কেলের সম্পর্কটা কতদূর এগিয়েছে জানার ইচ্ছে হল আমার। কিন্তু সরাসরি প্রশ্নটা করা ঠিক

হবে না। তাই আমি একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “বছরে এক দু’বার নিশ্চয়ই আপনাকে কলকাতা আসতে হয় বইয়ের জন্য? কলকাতায় আত্মীয়-স্বজনও আছে নিশ্চয়ই আপনার?”

নবাবু মাথা ঝাঁকাল। “এক মামা ছিল চন্দননগরে, দু’বছর আগে মারা গিয়েছেন। এখন বইমেলায় ডাকলে যাই কিংবা অক্সফোর্ড বুক স্টোরে বুক প্রমোশন করার জন্য যাই। কোনও কোনও বছরে একবারও যাওয়া হয় না। আসলে ইংরেজি বইয়ের তেমন কাটতি নেই পশ্চিম বাংলায় আর ইংরেজি বইয়ের বড় পাবলিশারগুলো নয় ডা বা গুরুগ্রাম থেকেই অপারেট করে।”

“আই সি!” আর কোনও বলার বা জিজ্ঞেস করার মতো কথা খুঁজে পেলাম না আমি। বিয়ারের মাগ প্রায় শেষ, আরেকটা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াব। এবার আমাকে চমকে দিয়ে নবাবু বলল, “শানু মানে শিজিনীকে আমার খুব ভাল লাগে।”

চোখ কপালে উঠে গেল আমার! হাতের মাগ টেবিলে রেখে বললাম, “রিয়েলি?”

নবাবু মাথা নাড়ল। “প্লিজ ডেন্ট ফিল জেলাস অফ মি, মি. মিত্র। আই জাস্ট কান্ট হেল্প অ্যাডোরিং হার। শুধু দেখতেই সুন্দরী নয় ও, ওর মনটাও খুব খোলামেলা। শি ইজ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, নাথিং ওপেক ইন হার। খুব সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে ও, যেটা আমাকে ইম্প্রেশন করেছিল ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার দিনই। অ্যান্ড শি হ্যাঙ্গ আ স্ট্রং সেন্স অফ হিউমর, যেটা কমিক নর্ভেলিটি হিসেবে আমি খুব অ্যাট্রিশিয়েট করতে পারি।”

“ও কিন্তু ভাল নাচতেও পারে,” আমি বলে দিলাম নবাবুকে উস্কে দিতে। এবার হয়তো শোনা যাবে ওদের গোপন অভিনয়ের বৃত্তান্ত।

“ও বলেছে আমাকে। গোটা দু’য়েক ভিডিয়ো পাঠিয়েছিল আমাকে। কোয়াইট চারমিং।”

আমাকে একটু আশ্চর্য করে দিয়ে মাগে শেষ চুমুক দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। “একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার সাড়ে ছ’টায়। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম, আসবেন কিন্তু আমার বুক লঞ্চ-এ। সানডে সিন্ধু থাটি। নেহরু সেন্টার, ৮ নম্বর সাউথ অউডলে স্ট্রিট।”

“কথা দিতে পারছি না, বাট আই উইল ট্রাই টু মেক ইট, মি. চ্যার্লি।”

আমরা হাত মেলালাম আরেকবার, তারপর ও বেরিয়ে গেল। আমার কামরায় ফিরে এসে ফোন করলাম শানুকে। খবরটা ওকে দেওয়া দরকার। বোঝা দরকার, শানুর ইচ্ছেতেই নবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না। কিন্তু ফোন ওঠাল না শানু। ওর কি জ্বরটা আবার বেড়ে গেল? ডা. শিকদারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম দুপুরের দিকে। উনি তো আশ্বস্ত করলেন আমাকে যে, রক্ত বমি না করলে কিংবা নাক বা দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ না হলে ওকে হাসপাতলাইজ করার দরকার পড়বে না। হাই ফিভার আর প্লেটলেট ফল ডেস্গির কমন সিম্পটম আর ওতে ঘাবড়াবার মতো কিছু নেই। ওষুধ খেয়ে গেলে পাঁচ দিন পরে ওগুলো নর্মালের দিকে যাবে, যদিও উইকনেস থাকবে বেশ কিছুদিন। কী জানি, হঠাৎ শানুর জন্য আমার মনটা আনচান করে উঠল। ওকে তো আমি এখনও খুব ভালবাসি, ময়ালী তো আমার টেম্পোরারি ডাইভারশন। শুধু মনে পুষে রাখা বহুদিনের একটু শখ মিটিয়ে নেওয়া। আমি ফোন রেখে বাথরুমে গেলে ফোনটা বেজে উঠল। আমি ছুটে এসে ফোন তুললাম।

“কেমন আছ এখন?” জিজ্ঞেস করলাম অধীর আগ্রহে।

“একটু বোটার,” ও বলল হাঁপাতে হাঁপাতে।

“বমি হয়নি তো আর?”

“না। ডা. শিকদার একটা ওষুধ দিয়েছেন, ওটা চুষলে আর বমি আসে না।”

“এখন জ্বর কত?”

“একশো দুই চলছে। খুব উইক ফিল করছি।”

“খেয়েছ কিছু?”

“এই তো খেলাম খিচুড়ি। বেশি খেতে পারি না।”

“আস্তে আস্তে পারবে। শোনো, তোমার ফেসবুকের বন্ধু নবাবু চ্যাটার্জি এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে, একটু আগে।”

ওপাশে শানু নীরব রইল। বোধ হয় ও একটু অবাক হয়েছে, ভাবছে আমি কী ভাবে নিয়েছি এই অদ্ভুত, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটাকে। ওকে খুশি করতেই বললাম, “ওকে আমি বিয়ার খাওয়ালাম। হি ইজ আ নাইস গাই। আমাকে ইনভাইট করল ওর বুক লঞ্চে যাওয়ার জন্য।”

“তাই?”

“হ্যাঁ। তোমার খুব প্রশংসা করল ও।”

শানুর গলা থেকে একটা আওয়াজ বেরোল, যা হাসিও হতে পারে আবার কান্নার পূর্বাভাসও হতে পারে। এ ব্যাপারে আর না এগোনোই ভাল। ওর যে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তা তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি।

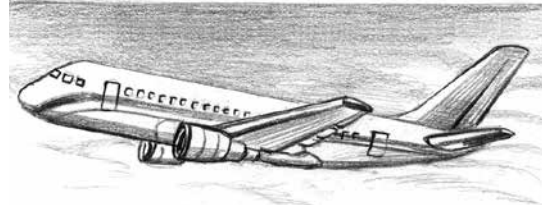
“রাখছি শানু। টেক কেয়ার।”

“তুমিও খেয়াল রেখ নিজের।”

“আই লাভ ইউ।”

“থ্যাংক ইউ।”

আমি কি আশা করেছিলাম ‘আই লাভ ইউ টু’ আসবে ওদিকে থেকে? কিন্তু ময়ালীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জানার পরেও যে ‘থ্যাংক ইউ’টুকু পেলাম, সেটাই অনেক বলতে হবে। কী জানি কেন, আমার চোখে জল এসে গেল। ওদিকে শানুর চোখ শুকনো রইল কিনা সেটা বোঝা গেল না।



শিজিনী

ডা. শিকদারের ওষুধ খেয়ে জ্বরটা এখন একশো আর একশো একের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। লিটমাস পেপারের মতো একটা ওষুধ দিয়েছেন উনি, যা বমি পেলে চুষি, বমির ভাবটা চলে যায়। তবু শরীরটা একেবারেই ভাল লাগছে না। কী রকম অস্থির লাগছে, গলা শুকিয়ে কাঠ আর কেন জানি না খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কাল রাতে রিয়া ফোন করেছিল আমার ডেস্কির হাল জানতে। ওদের ফ্রেয়ারসদের জন্য একটা পার্টি ছিল কাল সন্ধ্যায়। সেখানে নাচ গান আর খাওয়া-দাওয়া ছিল। রিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে অনেক হাততালি পেয়েছে। পার্টিতে দেবজ্যোতি নামে বাঁকুড়ার একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর। দেবজ্যোতি ফিজিক্স অনার্স সেকেন্ড ইয়ার। রিয়ার কথা শুনে মনে হল, অল্পদিনের মধ্যেই দেবজ্যোতি ওর বয়ফ্রেন্ড হয়ে যাবে। “হি’জ কোয়াইট হ্যান্ডসাম অ্যান্ড টল, মম,” ও বলল প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায়। “সেতারও শিখছে ও, সন্দের দিকে কিছুক্ষণ হস্টেলের রুমে বসে পিড়িং পিড়িং করে, এক গুরুর কাছে রোববার গিয়ে শিখে আসে বাজনা।”

“খুব ভাল। পড়াশোনাটা ঠিকভাবে করে যাস মা, নইলে তোর বাপির কাছে বকুনি খেতে হবে আমাকে, অতদূরে পাঠানোর জন্য।”

“ওহ মম, তুমি কী ভাব বল দেখি? আমি কি ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? মোটেই না। বাঙালি ছেলে বলেই তো...”

আমার তখন গা গুলোচ্ছিল, জ্বরটাও বাড়ছিল। বললাম, “তুই এখন অ্যাডাল্ট, যা খুশি কর, নিজের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নো।”

“তুমি কি রেগে আছ আমার উপর মম?”

“না রে, শরীরটা একদম ভাল লাগছে না। কীরকম অস্থির অস্থির করছে, আর কথা বলতে পারছি না।”

“ওষুধ ঠিকমতো খাচ্ছ তো?”



আমি বললাম, “খাচ্ছি। ছাড়ছি।”
 ক্রিশ্ণে নবাবুণের নাম ফ্ল্যাশ করতেই কেটে দিলাম রিয়ার ফোন। সবুজ বাটনে আঙুল ছুঁয়ে বললাম, “কথা বলতে পারব না, মেসেজ করো।”
 ও মেসেজ করল, “দেখা করলাম তোমার কারপেন্টারের সঙ্গে। নাইস গাই।”
 “ঝগড়া করেনি তো?” কাঁপা আঙুলে টাইপ করলাম।
 “একদম নয়। ইট ওয়েন্ট ভেরি স্মুদ। বারে বসে বিয়ার খেলাম দু’জনে।”
 “ওয়াও!”
 “আমি তোমার অনেক প্রশংসা করলাম, ও মন দিয়ে শুনল।”
 “যাঃ আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছ।”
 “একদম নয়। ওকে জিজ্ঞেস করো। রোববারে বুক লঞ্চে ইনভাইট করলাম মি. কারপেন্টারকে।”
 “ওর বই-পুঁথিতে ইন্টারেস্ট নেই। বই হাতে নিলে ঘুম আসে।”
 “আমার তো মনে হল ও তোমাকে এখনও খুব ভালবাসে। আর ইউ শিয়ার হি ইজ হাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ দ্যাট ওম্যান...”
 “ময়ালী। অজগর সাপ, আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। গিলে খাবে ওকে।”
 “আই হ্যাভ মাই ডাউটস। আমার মনে হয় ইটস জাস্ট ফ্লার্টিং, মে বি আ ফ্লিং দ্যাট ওন্ট লাস্ট টু লং।”
 আমার কেমন রাগ হল নবাবুণের উপর। ও কী করে রূপকের

হয়ে কথা বলছে! ও কি চাইছে আমাকে ভোলাতে?
 “বিয়ারটা ও-ই খাইয়েছে তোমায়, তাই না?”
 “ঠিক ধরেছ।”
 “তোমার নেশা হয়েছিল বুঝতে পারছি। তুমি বুঝতে পারছ না ও তোমাকে ল্যাজে খেলাচ্ছে। তুমি শুধু কমিক লিখতে পারো, মানুষ বুঝতে শেখনি বিউ।”
 “তোমার কাছ থেকে শিখে নেব। ছাড়ো এসব কথা, কেমন আছ?”
 “ভাল না। আমার অস্থির লাগছে... আর খুব কান্না পাচ্ছে।”
 “ও মাই গড! আই অ্যাম সরি আই হাট ইউ।”
 “না না তা নয়। এমনিই কান্না পাচ্ছে।”
 “আমি তোমাকে একটা চুমু খাব?”
 “খাও।”
 নবাবুণ বেড়ালের দুধ চেটে খাবার মতো চুক চুক আওয়াজ করে আমাকে চুমু খেল তিনবার। এবার আমার হাসি পেল। মুড সুইং। তবে কি আমার মেনোপজ এগিয়ে এল?
 “এখন কী রকম লাগছে?”
 “হাসি পাচ্ছে... না না হাসি আর কান্না দুটোই পাচ্ছে।”
 “সিলি গার্ল। এবার ঘুমোও। গুড নাইট, মাই সুইটহার্ট। সুইট ড্রিমস।”
 আমি চোখের জল মুছলাম, তারপর ফিক করে একটু হেসেও নিলাম। মালতী ঢুকল খাবার বাসন তুলে নিতে, পিছনে গোন্ডি।



“কার সঙ্গে কথা বলছিলে একটু আগে বৌদিমণি?”

“তোর দাদাবাবুর সঙ্গে। ওকে খাইয়েছিস?”

“ওর আজ উপোস,” মালতী বলল গোল্ডির মাথায় চাঁচি মেরে।

“যা দিই গন্ধ শুঁকে চলে যায়। তোমার জন্য ওরও মন খারাপ।”

“যা, ওর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে আয়, দেখি আমি খাওয়াতে পারি কিনা।”

যে প্লেটে একটু আগে খিচুড়ি খেয়েছিলাম, মালতী সেটা তুলে নিয়ে গেল। আমি ‘গোল্ডি সোনা আমার কাছে এস,’ বলে ডাক দিতেই ও বিছানায় উঠে কোলের কাছে শুয়ে আমার গা শুঁকতে লাগল। মালতী দুটো ভগি বিস্কিট এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, “নাও, এবার তোমার ছেলেকে আদর করে খাওয়াও, আমি বাসন ধুতে গেলাম।”

“শোয়ার আগে আমার এখান হয়ে যাস। একবার বাথরুমে যাব।”

“বলো তো তোমার ঘরেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ব...”

“না না, তোকে মেঝেতে শুতে হবে না, ঠান্ডা লেগে যাবে।”

মালতী চলে গেলে আমি গোল্ডিকে বিস্কিট খাওয়ালাম। বিস্কিট খাওয়ার থেকেও আমার হাত চটায় ওর বেশি আনন্দ। গোল্ডি সত্যিই আমাকে ভালবাসে আর আমিও ওকে ভালবাসি ছেলের মতো। রিয়ার খালি জায়গাটা ও পুরো না হলেও কিছুটা ভরে রেখেছে। কিন্তু রূপকের ময়ালীর প্রতি আকর্ষণ আমার মনে যে অশান্তি এনে দিয়েছে, তা কে দূর করবে? নবারণ তো বলেই খালাস

যে ও ফ্লাট করছে, বেশিদিন টিকবে না ওদের প্রেম। কী আছে ওই কালো মোটা মেয়েটার মধ্যে যা আমার নেই? হ্যাঁ ওর বুক আছে দুটো ফুটবলের মতো, আর পাছটাও ওর বিরাট, যা আমার নেই। নবারণ তো ওকে দেখেনি তাই বুঝতে পারছে না ওই বিশাল থলথলে শরীরের কী তীব্র আকর্ষণ পুরুষ মানুষের কাছে। বিয়ার খেয়ে রূপকের গালভরা প্রশংসা করতে ওর অসুবিধাটা কোথায়? আচ্ছা আমাকে কি নবারণ সত্যিই ভালবাসে, না কি শুধু আমার রূপের আকর্ষণে এগিয়ে এসেছে আমার সঙ্গে ফ্লাট করতে? আমার আবার কান্না পেয়ে গেল। আমি গোল্ডিকে বুকুর মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটু কঁদে নিলাম আর ও আমার চোখের জল চেটে দিতে লাগল।

ফোন বেজে উঠল। বালিশের পাশে রাখা মোবাইল তুলে দেখলাম, কার্ডিয়োলজিস্ট আশিস সান্যালের বৌ মন্দিরা ফোন করেছে। ও-ই প্রথম পার্টিতে আমাকে ওয়াইনের গ্লাসটা হাতে তুলে দিয়েছিল। আর যেবার আমাদের ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আমরা গোয়ায় গিয়েছিলাম পাঁচ দিনের জন্য, তখন কালানুগুটে বিচে বসে এক রাতে সিগারেটে গাঁজা পুরে ও-ই আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। একটু দূরে ওর বর আশিস, রূপক আর অ্যানায়েসিস্ট সুমন খাস্তগির বিয়ারের ক্যান হাতে নিয়ে বেসুরো গলায় একটা ইংরেজি গান গাইছিল।

“কেমন আছ বৌদি?” জিজ্ঞেস করল মন্দিরা।

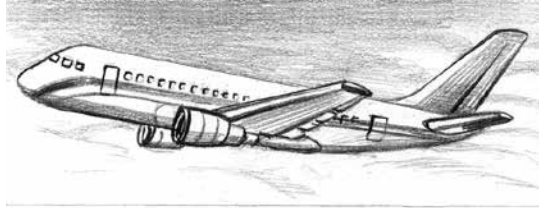
ভাল নেই বললে হাজার প্রশ্ন করবে ও, তাই বললাম, “মোটামুটি ভালই আছি রে।”

“কী করছ এখন?”
 “গোল্ডিকে নিয়ে শুয়ে আছি। তুই কী করছিস?”
 “টিভিতে একটা বস্তাপচা সিরিয়াল দেখছি। হাতে মদের গ্লাস তাই খারাপ লাগছে না।”
 “হুইস্কি না জিন?”
 “ভদকা।”
 “একা?”
 “দোকা হব কী ভাবে? আশিস তো সিসিইউ-তে, নাইট ডিউটি।”
 “নেশা চড়েছে?”
 “ভালই চড়েছে। তোমাকে মনে পড়ল, তাই ফোন করছি।”
 “আমাকে কেন মনে পড়ল রে?”
 “একটা ভাল খবর দিতে ফোনটা করলাম। আজ সন্ধ্যায় যখন সাউথ সিটি মল থেকে শাড়ি আর পারফিউম কিনে ফিরছি, ময়ালীকে দেখলাম একটা ইয়ং ছেলের সঙ্গে কফিশপ থেকে বেরোতে।”
 “ওর ছেলে হবে।” মনের মধ্যে কি একটু আনন্দের শিহরণ অনুভব করলাম?
 “ছেলে হবে কেন? ছেলেটার হাত তো ওর কোমর জড়িয়ে ছিল।”
 “ভুল দেখিসনি তো?” অকারণেই কেমন বুকের মধ্যে উথাল পাথাল শুরু হয়ে গেল।
 “ওমা ভুল দেখব কেন? পঞ্চাশ গজ দূরে প্রেমিক-প্রেমিকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল কফিশপ থেকে... আমার চোখে তো ছানি পড়ার সময় হয়নি এখনও।”
 “তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক মন্দিরা।”
 “ফুল চন্দন নয়, আমার মুখে গ্লেনফিডিচের গ্লাস তুলে দিও তুমি... একটু সুস্থ হয়ে নাও আগো।”
 “তোকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে আমার, মন্দিরা।”
 “ঠোটে নয় আমার বুকে চুমু খেও তুমি, ওখানে তো আশিস চুমু খায় না অনেকদিন।”
 “কেন রে? ওরও কি কোনও...”
 “জানি না বাপু, ব্যাটাছেলেদের বিশ্বাস নেই। কখন কার সঙ্গে চিপকে যায় আঠার মতো! কোনও নার্স-টার্স থাকলেও থাকতে পারে। আমি আর ঘাঁটাই না। কী দরকার? বুবাই দুন স্কুলে ভাল রেজাল্ট করছে, এটাই আমার বড় সাহুনা। একটু আগে ফোন করেছিল ও, পিয়ানো শিখছে, ভাল গলফ খেলতে শিখেছে, জানাল ও। রিয়ার খবর কী?”
 “ও-ও একটু আগে ফোন করেছিল। ফ্রেয়ার্স পার্টি ছিল আজ, রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে তালি পেয়েছে।”
 “আমার ছেলেটা ওর থেকে তিন বছরের ছোট না হলে, রিয়ার সঙ্গে ভাল ম্যাচ হয়ে যেত।”
 রিয়ার হবু বয়ফ্রেন্ড দেবজ্যোতির কথা মনে হল, তাই আমি আর ওই নিয়ে কথা তুললাম না। ময়ালীর নতুন প্রেমিক জুটেছে এই খবরটাই আমাকে এত অভিভূত করে ফেলেছে যে, মন্দিরার সঙ্গে আর বক বক করতে ইচ্ছে করছিল না আমার। আমি একটা ছোট্ট হাই তুললাম, গোল্ডি কী মনে করে কুঁই কুঁই করে উঠল।
 “হাই তুলছ তুমি। নাও এবার শুয়ে পড়ো।”
 “থ্যাংকস মন্দিরা। খবরটা কিন্তু ছড়াস না এখনই। রুমা আর মেঘনাকে বলিসনি তো?”
 “না, তোমাকেই প্রথম বললাম।”
 “ওদের বললে পুরো হাসপাতালে ছড়িয়ে যাবে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।”
 “তুমি নিশ্চিত থেকে। গুড নাইট। সুইট ড্রিমস।”
 আমি গোল্ডিকে আরেকবার বুকে জড়িয়ে ধরে ওর নাকে মুখে চুমু খেললাম আর বাচ্চা মেয়ের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলাম। মালতী আমার হাসির আওয়াজ পেয়ে ঘরে ঢুকে বলল, “কী হল তোমার, এত হাসছ যে?”
 “এই মাত্র একটা ভাল খবর পেলাম,” বললাম আমি। “তোর

দাদাবাবুর প্রমোশন হবে।”

“ওমা! তাই নাকি? দাদাবাবুর পেরমোশন হলে আমাকে একখানা ভাল সিল্কের শাড়ি দেবে কিন্তু। নাও ওঠ, বাথরুম করিয়ে আনি তোমাকে।”

নিজেকেই অবাক করে দিয়ে দুর্বল শরীর নিয়েও উঠে বসলাম আমি, মালতীর সাহায্য ছাড়াই। মন্দিরা যে টনিক দিয়েছে আমাকে, তাতে জ্বরটাও দু’ডিগ্রি কমে গেল মনে হচ্ছে। জয় মা কালী!



নবারণ

বন্ধুবান্ধব এবং সাংবাদিকরা নতুন বই বেরোবার পরে সচরাচর যে প্রশ্নটি করে থাকেন তা হল, ‘আপনি কমিক উপন্যাস কেন লেখেন?’ প্রথমদিকে আমি এর উত্তরে বলতাম, ‘ওরকম লিখতেই ভালবাসি। জীবনকে নানা ভাবে দেখা যায়। আমি জীবনে কমেডি খুঁজে পাই, তাই ওভাবেই লিখি।’ তারপরও এই নিয়ে খোঁচালে আমি একটি জাপানি প্রবাদ আউড়ে দিই, ‘Everyone to his taste; some prefer nettles.’ সবার পছন্দ আলাদা; কেউ কেউ কাঁটাও পছন্দ করেন। প্রখ্যাত জাপানি ঔপন্যাসিক জুনিচিরো তানাজিকির একটি উপন্যাসের নাম তাই ‘Some Prefer Nettles’. Amanda’s Choice করোনাকালের উপন্যাস হলেও এটি শেষ পর্যন্ত আমান্ডা এবং ওর তিনজন প্রেমিকের কাহিনি, কাজেই কমেডির সুযোগ এই উপন্যাসে যতটা ছিল তার সদ্ব্যবহার করেছি আমি।

নেহরু সেন্টারের অডিটোরিয়ামে জন পঞ্চাশেক ভারতীয় এবং ইংরেজ অতিথির উপস্থিতিতে আমার চতুর্থ উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন করলেন সেন্টারের ডিরেক্টর সুনীল চৌধুরী। গুঁর একপাশে দাঁড়িয়ে আমি আর অন্যপাশে রাইটার্স ইংক পাবলিসিং হাউজের কর্ণধার ড্যান ফ্রাঙ্কলিন। সকলে মিলে বইয়ের মোড়ক খুললাম হাততালির মধ্যে। রেচেলকে আমি সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও ভারতীয় কায়দায় দুই হাত জোড় করে বলে দিয়েছিল, ‘স্পেসয়ার মি ডার্লিং। লিটেরারি এজেন্টস আর নট সাপোজড টু কাম ফরোয়ার্ড অন সাচ অকেশনস।’ নাক উঁচু ব্রিটিশ টেলিভিশন আমার মতো ছোট ভারতীয় লেখককে পাভা দেয় না। কাজেই কোনও চ্যানেল থেকেই কেউ আসেনি এই অনুষ্ঠানে। তবে দুটো সাদ্য পত্রিকা ‘ইভনিং নিউজ’ আর ‘টি টাইম’ থেকে দুই সুন্দরী তরুণী এসেছিল ক্যামেরাপার্সন সহ। কাজেই ফ্ল্যাশ জ্বলল কয়েকবার। ভারতীয় দূতাবাস থেকে হাজির হয়েছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি প্রকাশ ওয়াগলেকর। ডিরেক্টর চৌধুরীর পকেটে রেচেল আমার পরিচিতি এবং নতুন বইটির সারাংশ টাইপ করা একটি কাগজ গুঁজে দিয়েছিল। কাজেই উনি তাই দেখে আমার বইটি সম্পর্কে দু’চার কথা বলে দিলেন। আমার প্রকাশক ড্যান ফ্রাঙ্কলিনকে ভালভাবেই ব্রিফ করেছিল রেচেল। কাজেই আমার প্রথম উপন্যাসের যে রিভিউ বেরিয়েছিল দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায়, তা থেকে কোট করলেন উনি— ‘Chatterjee is a witty and irreverent writer who squeezes comedy from pathos, yet is never less than fiercely serious.’ আরেকবার হাততালি পড়ল।

এরপর সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক আর হাই হ্যালো করার পালা। দেখলাম রেচেল পিআর-এর কাজ করে যাচ্ছে সুন্দর ভাবে। অডিটোরিয়ামের বাইরে দরজার কাছে একটি টেবিলে রাখা আমার বইগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে অতিথিদের। ইশারায় আমাকে

গিয়ে ওখানে দাঁড়াতে বলল রেচেল, যাতে আমি সহ করে দিতে পারি বইগুলোতে। কিন্তু সচরাচর যা হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে, ঠিক তাই হল—বৈশিষ্ট্যবাহী অতিথি সোজা চলে গেলেন অন্য প্রান্তে, যেখানে চিহ্ন স্যান্ডউইচ আর ওয়াইনের গ্লাসগুলো রাখা ছিল। তবু পাঁচজন ভারতীয় এবং সাতজন ইংরেজ দশ পাউন্ড খরচ করে আমার পেপারব্যাক উপন্যাসটি কিনলেন। আধঘণ্টার মধ্যে হল খালি হয়ে গেল, সুনীল চৌধুরী আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রকাশ ওয়াগলেকার এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, “আপনাকে সামনের সপ্তাহে একটা ডিনারে ইনভাইট করলে আসতে পারবেন তো হাইকমিশনে?” আমি বললাম, “দুঃখিত মি. ওয়াগলেকার, আমি বুধবার ফিরে যাচ্ছি ইন্ডিয়ায়। মে বি নেস্ট টাইম...” ড্যান চলে যাওয়ার সময় বলল, “ইটস সেলেকশন টাইম ন্যাক্সন। কাম টু আওয়ার অফিস টুমরো বিফোর লাঞ্চ আওয়ার উইথ রেচেল। উই উইল গো টু অ্যান ইন্ডিয়ান রেস্টোরাঁ ফর লাঞ্চ।” রেচেল আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, ও আমাকে চোখ টিপে বলল, “ন্যাক্সন প্রেফারস ইতালিয়ান কুইজিন ড্যান, সো উই ক্যান গো টু আ ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট।”

“ওকে রেচেল, হি ইজ ইওর বেবি, সো উই উইল গো ইতালিয়ান।” ড্যান রেচেলের দুই গালে চুমু খেল, যেমনটা আমি খেয়ে থাকি।

“সো উই হ্যাভ টু ওয়াইন্ড আপ আওয়ার শো, ন্যাক্সন। সোফি, স্টার্ট প্যাকিং আপ।” ফড়িং এর মতো পাতলা, টিংটিঙে লম্বা স্কাট পরা রেচেলের অ্যাসিস্টেন্ট সোফি একটা বড় ক্যানভাসের ব্যাগ হাতে এগিয়ে এল টেবিলে যে গোটা বিশেক বই পড়েছিল, তা তুলে নিতে।

আর ঠিক সেই সময়েই আমাকে অবাক করে দিয়ে হলে ঢুকল ডক্টর রূপক মিত্র, শিঞ্জিনীর হাবি।

“আই ওয়ান্ট টু বাই আ বুক,” বলল রূপক, সোফির দিকে এগিয়ে গিয়ে। রেচেল হেসে বলল, “ওয়েলকাম স্যার। উই ওয়ার জাস্ট গোলিং টু ওয়াইন্ড আপ আওয়ার শো।”

আমি এগিয়ে গিয়ে রূপকের সঙ্গে হাত মেলালাম, “আপনার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম ডক্টর মিত্র। খুব খুশি হলাম আপনি এসেছেন।” একটা বই হাতে তুলে, প্রথম পাতায় সহ করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, “আপনি তো বই পড়েন না, শানুকে এটা দেবেন।”

“এবার পড়ব আপনার বই,” বলল রূপক, তারপর পকেটে হাত ঢোকাল ওয়ালেট বের করতে।

আমি বললাম, “প্লি-জ, ডক্টর মিত্র, এটা কমপ্লিমেন্টারি কপি, আপনাকে কিছু দিতে হবে না।”

“না না, তা হয় না। লেখাই আপনার জীবিকা অ্যান্ড আই নো ইটস আ প্রিকেরিয়াস প্রফেশন দ্যাট ডাজন্ট আর্ন মাচ।” বইয়ের পিছনে দামটা দেখে ওয়ালেট থেকে একটা কড়কড়ে দশ পাউন্ডের নোট বের করে আমার নীল ব্লেকারের পকেটে ঢুকিয়ে দিল রূপক। রেচেল একটু অবাক হয়ে বলল, “সিম্‌স ইউ আর অলরেডি নোন টু ইউচ আদার।”

আমি বললাম, “ইয়াহ, হি ইজ দ্য গাই আই টোল্ড ইউ আই ওয়াজ গোলিং টু মিট দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে।”

রেচেল চোখ কপালে তুলে বলল, “আই সি। কাম অন, স্যার, হ্যাভ আ লিটল ড্রিংক উইথ আস। উই হ্যাভ অ্যারেঞ্জড স্যান্ডউইচ অ্যান্ড ওয়াইন ফর দ্য অকেশন।”

রূপক আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, ওয়াইন খাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। সারাদিনের ধকলের পর আমারও ইচ্ছে করছিল একটু হার্ড ড্রিংক নেওয়ার। তাই আমি বললাম, “লেটস গো টু দ্য নিয়ারেস্ট পাব রেচেল উইথ আওয়ার গেস্ট।”

রেচেল এক কথায় রাজি। আমার চেয়ে ওর উপরই ধকলটা বেশি গিয়েছে। সোফিয়াকে ও বলল বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে ওর গাড়িতে করে অফিসে পৌঁছে দিতে। আমরা তিনজন আউডলি রোড থেকে বেরিয়ে একটু হেঁটে শেপার্ড মার্কেটে কিংস আর্মস পাবে গিয়ে ঢুকলাম। সন্দের সময় যথারীতি পাবে খুব ভিড়। কোনও

টেবিলই খালি নেই। তাই বারটেন্ডারের কাউন্টারের সামনে রাখা উঁচু স্টুলেই আমরা তিনজন বসে পড়লাম। “স্কচ অন দ্য রকস,” কথটা প্রায় একই সঙ্গে আমার আর রূপকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। রেচেল বলল, “আমি এক পাইন্ট সাইডার নিচ্ছি।”

আমি এবার রূপক আর রেচেলকে পরস্পরের কাছে ইনট্রোডিস করিয়ে দিলাম। পেটমোটা, ভারী চেহারা আর ঝাঁটার মতো গৌফওয়ালা বারটেন্ডার বেশ চটপট আমাদের সামনে গ্লাসগুলো সাজিয়ে দিল। সঙ্গে রাখল একটা ছোট বোলে সল্টেড চিনেবাদাম। যেটার জন্য ওরা কোনও দাম নেয় না।

সৌজন্যের খাতিরেই রেচেল রূপককে জিজ্ঞেস করল ওর কাজের কথা। রূপক রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের উপর সেন্ট জন হাসপাতালে যে ওয়কশপ করতে এসেছে, তার বিবরণ দিল। রেচেল স্বভাবতই জিজ্ঞেস করল, রোবট মানুষের মতোই অপারেশন করে কিনা। রূপক ডাক্তারসুলভ গম্ভীর নিয়ে গড় গড় করে বলতে শুরু করে দিল, “রোবট ডাজন্ট পারফর্ম সার্জারি, ইট অনলি প্রোভাইডস রিয়েল টাইম ইনফো ইন দ্য অপারেটিং রুম অ্যান্ড দিস হেল্পস দ্য সার্জন টু মেক অ্যাডজাস্টমেন্টস অ্যান্ড ইম্প্রুভ দ্য ফিট অফ ইওর নিউ জয়েন্ট। ইন ফ্যাক্ট...”

রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে এই কচকচি যাতে আর বেশি দূর না এগোয়, তাই আমি বিষয় পরিবর্তন করতে রেচেলকে বললাম, “তোমার পা-তো বেশ শক্তপোক্ত, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?”

রেচেল টেবিলের নীচে আমার পায়ের কিক মারল, তারপর এক গাল হেসে বলল, “ডাক্তার দেখলেই আমার শরীরে নানা রোগের আবির্ভাব হয়।”

আমি ‘ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়’ এই বাংলা আশুবাণ্যটির ইংরেজি করে বললাম, “হোয়েন ইউ সি আ হর্স, ইউ স্টার্ট লিম্পিং। দ্যাটস অ্যান ওল্ড বেঙ্গলি সেয়িং।”

রূপক এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে বলল, “স্টিল, ওয়ান শুডন্ট ইগনোর ওয়ানস লেগস।”

এবার আমি টেবিলের নীচে রেচেলের পায়ের খোঁচা মারলাম শুধু এটাই বোঝাতে যে, এভাবে কথা চললে আমরা দু’জনেই বোর হয়ে যাব। রেচেল আমার ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে হঠাৎ রূপককে জিজ্ঞেস করে বলল, “ন্যাক্সনের কোন উপন্যাসটা আপনার বেশি ভাল লাগে মি. মিত্র?”

হায় ভগবান! যে আমার বই এই প্রথমবার ছুঁয়ে দেখল, তা-ও ওর সুন্দরী বৌকে খুশি করতে, তাকে এই প্রশ্ন! টেবিলের নীচে কি আমি ফুটবল খেলব? আমি চোখ বুজে হুইস্কির গ্লাস শেষ করে বারটেন্ডারকে বললাম, “অ্যানাদার শট প্লিজ।”

রূপক একটু অবস্থিতে পড়ল। কাঁচুমাচু মুখ করে রেচেলকে জানাল যে, ও তেমন বই পড়ে না কিন্তু ওর ওয়াইফ খুব ভাল রিডার। কবিতা লেখে আর ওর জন্যই বইটা কিনল রূপক। এখানে থামলেই বোধ হয় ভাল হত, কিন্তু রূপক সোনালি চুলের সুশ্রী রেচেলকে ইম্প্রেস করতেই বোধ হয় বলে ফেলল, “ন্যাক্সন হ্যাপেনেন্স টু বি আ ফেসবুক ফ্রেন্ড অফ মাই ওয়াইফ।”

“ওয়াভারফুল!” বলল রেচেল আর রূপকের গ্লাস মুখে তোলার ফাঁকে চোখ টিপল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমাকে এই বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতেই বোধ হয় ফোন এল রূপকের। ও ফোন তুলে বলল, “আমি আসছি মোতিউর। জাস্ট ফিনিশিং মাই ড্রিংক উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন আ পাব।” তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে রূপক বলল, “সরি আমাকে যেতে হচ্ছে। আমার একজন বাংলাদেশি বন্ধু ওয়েট করছে এভরিম্যান সিনেমা হলের সামনে। আমি তো সিনেমা তেমন দেখি না কিন্তু ওর জোরাজুরিতে যেতে হচ্ছে একটা অ্যাডভেঞ্চার টাইপের ছবি দেখতে।”

রূপক উঠে দাঁড়িয়ে ওয়ালেট বের করতে গেলে আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। “ইটস মাই ডে রূপক, ডোন্ট ফরগেট।”

রেচেল সাইডারের মাগে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, “লেট হিম

পে, ডক। ওর অ্যাডভান্স রয়্যালটির দ্বিতীয় কিস্তিটা যাতে কালই হাতে এসে যায় তার ব্যবস্থা করব আমি। হি উইল বি আ রিচ গাই টুমরো, গড ব্লেস হিম।”

রূপক রেচেলের কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারল না কিন্তু হেসে বলল, “আই অ্যাম হ্যাপি টু নো দ্যাট।” তারপর আমাদের দু’জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ও দ্রুত বেরিয়ে গেল পাব থেকে।

রেচেল একটা বড় শ্বাস নিয়ে বলল, “নাইস গাই। আচ্ছা ও কি জানে তুমি ওর বৌকে ভালবাস?”

“পরশু ওর সঙ্গে কথা বলে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে আমি যেভাবে ওর বৌ-এর প্রশংসা করেছি, তাতে না বোঝার কোনও কারণ নেই।”

“আমি ভয় পাচ্ছিলাম তোমাদের মধ্যে এখানেই একটা লড়াই না লেগে যায়। বাট হি সিমস টু বি আ পারফেক্ট জেন্টলম্যান।”

“ওই অ্যাডভান্স রয়্যালটির কথাটা ওকে না বললেই পারতে। আমার মনে হয় ও তোমার ঠাট্টাটা বুঝতে পারেনি। ভেবেছে, আমি সত্যিই বড়লোক হয়ে যাব কাল!”

“তা আড়াই হাজার পাউন্ড খারাপ কি? তোমার ধার দেনা কিছু তো শোধ হয়ে যাবে ওতে।”

আমি শ্রাগ করলাম। সত্যি বলতে কি, আমার মতো ছোট মাপের লেখকদের বই বিক্রি কম হয় বলে রয়্যালটি কিছুই আসে না। বইটা কোনও পাবলিশার অ্যাকসেপ্ট করলে ‘অ্যাডভান্স টুওয়ার্ডস রয়্যালটি’ বাদে একটা অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় (এই বইটার রাইটস বিক্রি হয়েছিল পাঁচ হাজার পাউন্ডে), যার জন্য আমাকে কন্ট্রাক্টে সই করতে হয়। ওই কন্ট্রাক্টেই লেখা থাকে অ্যাডভান্সের অর্ধেকটা লেখককে দেওয়া হবে পাভুলিপি জমা দেওয়ার পরে আর বাকি অর্ধেকটা বই প্রকাশিত হওয়ার পর। আমার এজেন্ট হিসেবে রেচেল পাবে আমার পাওনার দশ শতাংশ, যার জন্য ওর সঙ্গেও আমার কন্ট্রাক্ট সই করা আছে। পাবলিশার পেমেন্ট করে এজেন্টকে, লেখককে নয়। কাজেই আগামীকাল রেচেল আড়াই হাজার পাউন্ড রাইটার্স ইংক-এর খাজানা থেকে বের করে আনলে আমি পাব দু’হাজার দু’শো পঁচিশ পাউন্ড। দিল্লিতে বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার এখন ধার রয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, সেটা মেটাবার পরে আমার হাতে থাকবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো। যা দিয়ে আমার মাস দু’য়েক কোনও মতে চলে যাবে। ইন্ডিয়াতে দিন মজুরি করলে এর থেকে যে আমি বেশি রোজগার করতে পারি, সেটা রেচেলও বোঝে। তাই টাকা পয়সার কথা পারতপক্ষে ও তোলে না। আজ তুলল হয়তো রূপককে ইমপ্রেস করতে।

আমরা একটু পরেই পাব থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি পকেট থেকে প্যাকেট বের করে লাইটার দিয়ে একটা সিগারেট ধরলাম। রেচেল ক্যাজুয়াল স্মোকার, তবু বলল, “আমাকেও একটা দাও।”

আমরা দু’জন এবার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কালো ট্যাক্সির প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।



ময়ালী

দক্ষিণ কলকাতার এই বড় শপিং মলটায় যে রামাশ্রয় পান্ডের সঙ্গে এভাবে আচমকা দেখা হয়ে যাবে, ভাবিনি আমি। একসঙ্গে যাদবপুরের একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউটে আরও তিরিশটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ফিজিওথেরাপির ট্রেনিং নিয়েছিলাম আমরা। আমাদের

বাচাে ও-ই একমাত্র বিহারী। বাকি আমরা সবাই কলকাতা বা আশপাশের অঞ্চল থেকে এসেছিলাম। দ্বারভাঙার মৈথিলী ব্রাহ্মণ যে দেখতে এত সুন্দর হয়, আমার জানা ছিল না। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং, একটু লম্বাটে নায়েকচিত সুন্দর মুখ, সরু গোর্ফ, মুখে সব সময় মিষ্টি হাসি। ক্লাসে আমরা পাঁচটি মেয়ে ওর পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। ও একসঙ্গে সকলকে নিয়ে এবং আলাদাভাবেও আমাদের সিনেমা, রেস্টোরাঁ, মল ঘুরিয়ে এনেছে কিন্তু কারও সঙ্গেই মাখামাখি করেনি বা প্রেম নিবেদন করেনি। তিন মাসের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর, ফেয়ারওয়েল পার্টিতে ও আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, ওর মা-বাবা ছোটবেলাই ওর বিয়ে দিয়ে রেখেছে গ্রামের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পুরোহিত ব্রিনাথ মিশ্রর বড় মেয়ে সুগন্ধার সঙ্গে। পার্স খুলে ও সুগন্ধার ছবিও দেখিয়ে দিয়েছিল আমাদের। কোমল, ছিপছিপে, সূত্রী সুগন্ধা এখনও বাবা-মার সঙ্গে থাকে, ওদের নিয়ম অনুযায়ী ওই বছরের শেষে গওনা হলে ও চলে আসবে শ্বশুরালয়ে।

শপিং মলে শাড়ি কিনতে গিয়ে ওর গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম আমি। একটা ডেনিম আর শার্ট কিনে বেরিয়ে আসছিল ও।

“তুম?” প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম দু’জনে।

“কিউ, ম্যাঁয় নহি আ সকতা হুঁ ইহা?” ও জিজ্ঞেস করল ওর সুন্দর গালে টোল ফেলে। আমার ইচ্ছে করছিল ওর বুকে বাঁপিয়ে পড়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরি। প্রত্যেকবার আমার চেম্বারে এসে রূপক যখন আমাকে চুমু খায় আর আমার ব্রা-ব্লাউজ খুলে আদর করে, তখন যে মুখটা আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, সেটা তো রামাশ্রয়েরই মুখ।

“আমি এখন কলকাতায় ফ্রিল্যান্সিং ফিজিও করি,” রাম বলল একগাল হেসে। “পাটনার নার্সিংহোমে পোষাল না আমার। মাইনে খুব কম দিত, আর কাজ অনেক বেশি। কখনও কখনও আঠেরো ঘন্টাও খাটতে হত! তুমি কোথায় আছ?”

আমি জানালাম যে, বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে আছি।

“চল চা-কফি খাওয়া যাক কিছু,” বলল ও।

আমি তো এটাই চাইছিলাম। হোক না রাম বিবাহিত, সীতার সঙ্গে সহবাস করুক ও মনের আনন্দে। আমি তো শুধু আধঘণ্টার জন্য ওকে কাছে পেতে চাই মাঝে মাঝে—মাসে অন্তত একবার, সম্ভব হলে দু’বার বা তিনবার। আমার বৃকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছিল কেউ, বুক ওঠা নামা করছিল, মনে হচ্ছিল রাউজের বোতাম ফেটে যাবে ফটাস ফটাস শব্দে আর আমার বুক দুটো বেরিয়ে পড়বে ওর চোখের সামনে ওকে অবাক করে দিয়ে। ছত্রিশ ইঞ্চির এই বিশাল মাংস পিন্ড দু’টি যদি একটা সুন্দর পুরুষকে কাছে না এনে দিতে পারে, তবে এই দু’টো আমাকে কেন দিলেন ভগবান?

এক্সপ্রেসো কফির অর্ডার দিয়ে রাম বলল, “একটা ভাল খবর শোনাই তোমাকে। আমার বৌ সুগন্ধা গাঁয়ের একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে ওর গওনা হবার দু’দিন আগেই! ওরা গিয়েছে দক্ষিণে, বেঙ্গালুরুতে।”

আমি এত অবাক হলাম যে, আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল! কোনও কথা বলতে পারলাম না। বিহারের অজ পাড়াগাঁয়েও যে বিবাহিত মেয়ে স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগেই অন্য কারও সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে, এটা আমার কল্পনাতেও আসেনি কখনও।

“সচ?”

“মুচ। ছেলেটার সঙ্গে আগে থেকেই ওর ভাব-ভালবাসা ছিল। দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বড় সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করে। পুরুষের বাড়ির কাছেই ওদের বাড়ি, ছুটি-ছাটায় আসা যাওয়া করত ছেলেটা। প্রথমে চোখাচোখি, তারপর ফোনাফুনি... আমি ফ্রি হয়ে গেলাম।”

কফি আর ডোনাট অর্ডার দিয়েছিল রাম, আমি চট করে একটা ডোনাট তুলে নিয়ে কামড় বসিয়ে দিলাম। কোনওরকমে মুখের খাবার গিলে বললাম, “ইনক্রেডিবল!”

“কিছুই অসম্ভব নয় এখন আমাদের গাঁয়ে,” কফিতে চুমুক

দিয়ে বলল রাম। “এই সেদিনই তো আমার ছোটবেলার এক বন্ধু ফোন করে বলল, ‘আমাদের ইন্সকুলের সেই গবেট ছাত্র তীর্থ সাঁই কী করেছে জানিস রাম? পাশের গাঁয়ে বিয়ে করতে গিয়ে বৌকে ফেলে রেখে শাশুড়িকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে!’ আমাদের পুরুত, সুগন্ধার বাবা ত্রিনাথ মিশ্রজি ওদের বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় ওরা পাটনা ভেগে গিয়েছে রেজিস্ট্রি করতে।”

“দুনিয়াটা এখন সত্যিই খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। তা থাকো কোথায় তুমি?”

“নেতাজিনগরে একটা ঘর ভাড়া করেছি। আমার ক্লায়েন্ট সব সাউথে— নিউ আলিপুর, বালিগঞ্জ, যোধপুর পার্ক, ভবানীপুর... হাজার তিরিশেক হয়ে যায় মাসে। তোমার?”

আমি ওকে খুশি দেখতেই আমার মাইনে থেকে পাঁচ হাজার টাকা কমিয়ে বললাম, “পঁচিশ পাই আমি... তবে হ্যাঁ, হাসপাতালে ফিল্ড ওয়র্কিং আওয়ার্স। দশটা থেকে রাত আটটা।”

কফি খেতে খেতে টুক টাক কথা চলল আমাদের মধ্যে আর কী আশ্চর্য, রাম যে মনে মনে আমাকে পছন্দ করে রেখেছে সেই ট্রেনিংয়ের সময় থেকে, সেটাও বলে দিল।

“মজাক কর রহে হো তুম মেরে সাথ,” ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম আমি, অভিমাত্রী মেয়ের মত। “তুমহারা সাথ তো বৈশালীকা পেয়ার থা উস দিনো মৌ।”

রাম হঠাৎ আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, “কসম খাতা হুঁ। মা কালীর দিবি। ম্যায় তুমকো বহোত পসন্দ করতা থা।”

আমি আনন্দে ফিট হয়ে পড়বার জোগাড়! বলে কী রাম? ফর্সা, সুন্দরী বৈশালীকে না ভালবেসে আমাকে?

“যাঃ! ঠাট্টা করছ তুমি রাম,” আমি বললাম হাতটা ছাড়াবার কোনও চেষ্টা না করেই। “আমি কালো মোটা, আমাকে কেন পছন্দ করবে তুমি?”

“আমার ফর্সাতে ঘেমা ধরে গিয়েছে,” বলল রাম, আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে। “মা ফর্সা, বাবা ফর্সা, চাচি-মামি সব ফর্সা, এমনকি সুগন্ধাও ফর্সা। আমার তো ছোটবেলা থেকেই কালো রং ভাল লাগে। শাদি-শুদা থা, ইস লিয়ে তুম লোগোকা জ্রদা কারিব আনে কা ইচ্ছা কুচল দিয়া মন মৌ হি।”

আমি কফির কাপে শব্দ করে একটা লম্বা চুমুক দিলাম, তারপর বললাম, “আমি তোমাকে সব সব সময়ই চেয়েছি রাম, বলার সাহস পাইনি। আমি বাঁশদ্রোণীতে একটা পিজিতে থাকি, না হলে তোমাকে এক্সকিউজ করে নিয়ে যেতাম।”

“সানডে চলো লঞ্চ মৌ, সুন্দরবন ঘুমকে আঠে হ্যায়,” বলল রাম। “রোববার আমি কাজ করি না।”

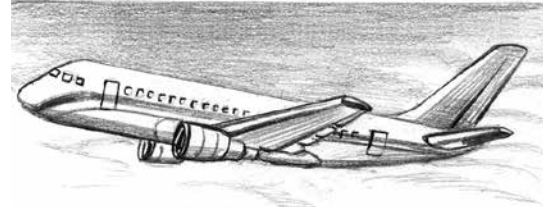
“খুব ভাল হবে। বাঘ না দেখলেও কুমির তো দেখাই যাবে।”

রূপক এখন লন্ডনে গিয়েছে সেন্ট জন হাসপাতালে ওয়র্কশপ অ্যাটেন্ড করতে। কাজেই রবিবার বিকেলে কাজের বাহানায় আমাকে ডেকে নিয়ে চুমু খাওয়া, আদর করার কোনও বিপদ নেই। সত্যি বলতে কী, এখন আর আমার একটা মাঝ বয়সি লোকের কাছে আদর খেতে ভাল লাগে না। হাসপাতালে আমার চাকরির ইন্টারভিউতে রূপক আমাকে খুব সাহায্য করেছিল আর সে কারণেই ওকে আমি না করতে পারিনি। এখন রাম এসে গিয়েছে আমার জীবনে, আমি দরকার হলে বিধান মেমোরিয়ালের চাকরি ছেড়ে অন্য হাসপাতালে যাব কিংবা রামের সঙ্গে মিলে একটা ছোটখাট ফিজিওথেরাপি সেন্টার খুলে বসব। অনলাইনে অ্যাড দিয়ে ক্লায়েন্ট জোগাড় করব আমরা। কিন্তু তার আগেই রামকে বিয়ে করে নিতে হবে আমাকে, এত সুন্দর ছেলেকে ফেলে রাখলে আবার বৈশালী, রোমিলা বা অনন্যা এসে ওকে ছিনিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে। আমার একটা ছেলে... না না, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হবে তিন বছরের মধ্যে।

“কেয়া সোচ রহে হো পেয়ারে?” রাম তুড়ি বাজাল আমার চোখের সামনে। “চলো চলতে হ্যায়।” বাইরে বেরোবার সময় দেখলাম তিনজোড়া টোনাটুনি হাত ধরাধরি করে ঘুরছে মলের সামনে। আমি ওদের দেখিয়ে রামকে বললাম, “ওদের টেকা মারব

আমরা। আমার কোমর জড়িয়ে ধরো তুমি, দেখুক ওরা হাঁ করে।”

রাম হেসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল আর আমরা দু’জনে হাসতে-হাসতে সদ্য বিবাহিত দম্পতির মতো বেরিয়ে এলাম মল থেকে।



রূপক

পাঁচ দিন ডক্টর জেমস ল্যাংডন-এর নির্দেশে এবং ডক্টর পিটার ডোমস ও ডক্টর ভিকি লি-এর সহযোগিতায় সেন্ট জেমস অ্যান্ড সেন্ট থমাস হসপিটালের ওয়র্কশপে রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পুরো টেকনিক আয়ত্ত্ব করে আমরা এবার দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ওয়র্কশপের শেষ দিন সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের বড় কনফারেন্স রুমে আবার আমরা মিলিত হয়েছি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে এবং সেই সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা, আমরা দেশে গিয়ে এই শিক্ষা কতটা কাজে লাগাতে পারব তা আলোচনা করতে। জেমস ল্যাংডন ওঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমাদের আগ্রহ, উৎসাহ এবং কর্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করে আশা প্রকাশ করলেন যে, আমরা আমাদের শিক্ষাকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে পেশেন্টদের মধ্যে যে ভয় ও আশঙ্কা বিরাজ করে, তা দূরীভূত করতে সক্ষম হব। পেশেন্টকে যখন জানানো হবে যে, সে অপারেশনের দিন কিংবা তার পরের দিনই বাড়ি চলে যেতে পারবে, তখন অপারেশন টেবিলে যাওয়ার সময় তার ভয়টা অনেকটাই কেটে যাবে। ডক্টর ভিকি লি আমাদের জ্ঞান না দিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে হাত মেলালেন আর একটু হাসি ঠাট্টা করলেন। ভিকির পেট যে একটু ফোলা ফোলা লাগছিল আমাদের এবং তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ওয়র্কশপে যে কানাঘুষো চলছিল তা দূরীভূত করতেই ভিকি নিজের পেটে একটু হাত বুলিয়ে একগাল হেসে বললেন, “গাইজ, আই অ্যাম গায়িং অন মোটারনিটি লিভ। লাকি টু হ্যাভ মেট ইউ অল ফর ফাইভ গ্লোরিয়াস ডেজ। থ্যাংক ইউ।” আমরা সকলে হাত তালি দিয়ে ওঁর এই শুভ সংবাদটিকে গ্রহণ করলাম। তারপর সকলে আমরা হলের পিছনের বড় টেবিলের দিকে এগোলাম ওয়াইন আর স্যান্ডউইচ খেতে। ডক্টর ল্যাংডন আর ডক্টর ডোমসও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে মোতিউর রহমান বলল, “অ্যাগো কোনও লজ্জা-শরম নাই দাদা। প্যাটের বাচ্চা এইরকম কইরা হগলের কাছে দেখাইল মাইয়াডা। ছি-ছি-ছি, আমাগো দ্যাশে...”

আমি ওর হাত চিমটি কেটে বললাম, “এসব কথা সকলের সামনে না বলাই ভাল, মোতিউর। কে কী মনে করবে... নাও হোয়াইট ওয়াইন খাও।”

স্যান্ডউইচ শেষ করে ওয়াইনের গ্লাসটা তুলে নিতেই শানুর ফোনটা পেলাম আমি। একটু দূরে সরে গিয়ে বললাম, “আমার এখানের কাজ শেষ। পরশুর ফেরার টিকিট ক্যানসেল করেছি তোমার জন্য। কাল দুপুরে ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ধরব, দিল্লিতে চেক করে পরশু দুপুর অর্ধি ঘরে পৌঁছে যাব। কেমন আছ তুমি? প্লেটলেট কত বেরোল?”

“এক লাখ বাইশ হাজার। জ্বরও একশোর মধ্যে এসে গিয়েছে। শোনো, আমার জন্য যে-সব জিনিস আনবে বলেছিলো... সে-সব ভুলে যাওনি তো?”

আমি একটা সিপ নিয়ে বললাম, “না না, আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। এই তো ফেয়ারওয়েল হল আমাদের। কালকের দিনটা হাতে রেখেছিলাম কেনাকাটার জন্য। তোমার জন্য একদিন

আগে ফিরছি।”

“তাহলে আমার জিনিস?” শানুর গলায় আতঙ্কের আভাস।

“এখানে দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। কাল একটু তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়ে ওখানকার দোকান থেকে সস্তায় কিনে নেব সব।”

“আমার কিন্তু প্যারিস হিলটন রোজ রাশ আর মিস ডিয়র পারফিউম চাই, মনে থাকে যেন। লিপস্টিকটা তো মনে আছে নিশ্চয়ই। একটা ভাল ব্ল্যাক স্ট্রাইপ ফুল লেংথ স্কার্ট, লেমন ইয়েলো টপ আর উইন্টার জ্যাকেট আনবে আমার জন্য।”

“ব্রা আর প্যান্টিও তিন সেট নিয়ে আসব তোমার জন্য,” আমি বললাম শানুকে খুশি করতে।

“ব্রা লেমন ইয়েলো। প্যান্টি ব্ল্যাক কিংবা পিংক। মনে থাকবে?”

“নিশ্চয়ই থাকবে।” মনে হচ্ছে এবার ওকে বিছানায় কাছে পাব। ময়ালীর সঙ্গে আর ওর চেম্বারে ফষ্টি-নষ্টি করব না। হাসপাতালের বাইরে কোনও হোটেল নিয়ে গিয়ে না হয়... ময়ালীর দুই জুনিয়র ফিজিও সুবল এবং তৃপ্তি ওর চেম্বার থেকে বেরোলে যেভাবে টারা চোখে আমার দিকে তাকায়, তাতে মনে হয় ওরা কিছু অনুমান করে ফেলেছে। না, আমাকে সাবধান হতে হবে এই পরকীয়া প্রেমে।

“আমার মাপটা মনে আছে তো তোমার?” শানু জিজ্ঞেস করল।

“একদম। ব্রা ৩৪ সি কাপ আর প্যান্টি ৩৬ ইঞ্চি।”

“গুড, মনে রেখেছ দেখছি। সেবার তাইল্যান্ড থেকে ৩৬ ব্রা আর ৩৮ প্যান্টি নিয়ে হাজির হয়েছিল। ওগুলো শেষে মালতীকে দিয়ে দিতে হল,” শানু খিল খিল করে হাসল।

“আই লাভ ইউ শানু,” আমি বললাম।

“সো ডু আই।”

না! লেখক নবাকরণ এখনও ওর মনের নাগাল পায়নি। বেচারি লেখকের কী সাধ্য আছে শানুকে এসব জিনিস কিনে দেওয়ার? শুধু মেসেজ চালাচালি করে কি প্রেম বাঁচিয়ে রাখা যায়? তবু ওর উপন্যাসটা কিনে নিলাম শানুকে খুশি করতে। প্লেনে বসে দু’চার পাতা পড়ার চেষ্টা করব।

“কাল নবাকরণের বুক লঞ্চে গিয়েছিলাম আমি। ওর বই কিনে আনলাম, কথাও হল।”

“বাহ, তোমার সঙ্গে দেখি বন্ধু হয়ে গিয়েছে ওরা!”

“তা বলতে পার। কাল বুক লঞ্চার পর একটা পাবে গিয়ে ও আমাকে হুইস্কি খাওয়া। সঙ্গে ওর এজেন্ট এক মহিলা ছিলেন।”

“রেচেল। কী রকম হল অনুষ্ঠানটা? আমাকে এখনও কোন মেসেজ করেনি ও।”

“ঠিক বলতে পারব না। আমি শেষ দিকে গিয়েছিলাম, তখন ওরা প্যাক আপ করছিল।”

“ও কবে ফিরবে, জান কিছ?”

“বোধ হয় পরশু, সেরকমই কিছু বলল মনে হল।” একবার ভাবলাম ওর আর্থিক অবস্থা যে কতটা সঙ্গীন তার একটা আভাস দিই শানুকে, তারপর মনে হল কী দরকার? ও হয়তো শানুর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশাতেই ওর সঙ্গে ভাব করেছে আর তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। শানুর সঙ্গে ও বিছানায় না গেলেই হল।

আমি দেখলাম, মোতিউর ওয়াইন হাতে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে আমার দিকে কারণ আফ্রিকান আর লাতিন আমেরিকান গ্রুপ দু’টির সঙ্গে ও ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না।

“ছাড়ছি। কাল এয়ারপোর্ট থেকে কথা বলব। বাই।”

“বাই।”

মোতিউর বলল, “দাদা, এহানের পাট তো শ্যাম আইল, চলেন আইজ রাইতে আরেকখান সিনেমা দেখা আই। মন চায় এটু খোলামেলা ছবি দেখনের। ডাগর ডাগর থলা রঙের মাইয়ারা বুক পাছা উদলা কইরা নাচে গায়... বোঝেনই তো। হা হা হা দ্যাশে তো এইসব দেহন যাইবে না। বিবি, পোলা-মাইয়া লইয়া ঘর করি, ট্যার পাইলে বিবি পিছা মারব।”

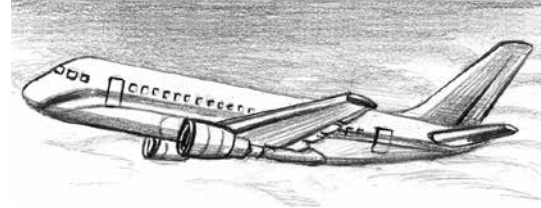
মোতিউর ন্যাংটো ছবি দেখতে চায়। শানুর সঙ্গে কথা বলার

পরে আমার মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল। আমি হেসে বললাম, “চলো মিয়াভাই, তোমার লগে এটু ফুর্তি কইরা আসি।”

“টিকিটের ট্যাগ আমি দিমু কিন্তু।”

“ঠিক আছে, রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ট্যাগ দিমু আমি।”

আমরা দু’জনেই হা হা করে হাসলাম আর গ্লাস ঠোকাঠুকি করলাম। হলের ওপাশ থেকে লাতিন আমেরিকান গ্রুপ আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু না বুঝেও থাঙ্গস আপ দেখাল।



শিজিনী

রিয়া আমাকে দিনে দু’বার ফোন করে, আমার হাল হকিকত জানতে। আজ সকালে ফোন করে বলল, “মম, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। আজ দুপুরের ফ্লাইট ধরে চলে আসি? কাল-পরশু দু’দিন তো আমার ছুটি। পরশু বাপির সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে।”

আমি বললাম, “মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর? আমি তো ঠিক আছি, জ্বর একশোতে নেমে গিয়েছে। ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের ছুটিতে এসে পুরো এক সপ্তাহ কাটিয়ে যাবি।”

“কিন্তু তোমাকে যে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। আই মিস ইউ সো মাচ।”

“ভিডিয়ো কল করে আমাকে দেখে নে। ওখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?”

“না না, আমার তেমন কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।”

কিন্তু আমার মনে হল ও কিছু বলতে চাইছে, বলতে পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “দেবজ্যোতির সঙ্গে ঝগড়া-টগরা করিসনি তো?” দেবজ্যোতি যে এখন ওর বয়ফ্রেন্ড, সেটা ও আমাকে জানিয়ে না দিলেও আমি বেশ বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম।

“তেমন কিছু নয়। আসলে ওর ওখানে গেলে শুধু সেতারের পিড়িং পিড়িং শুনতে হয় আর রাগ-রাগিনী আলাপ, তোড়, গত, বালার গল্পো করে। আমি গিটার শিখতে চাই শুনে সেদিন আমাকে দু’কথা শুনিয়ে দিল। বলল ‘ওটা কোনও ভাল বাজনা নয়, তার থেকে একতারা বাজাও।’ আমি রেগে গিয়ে বলে দিয়েছি ‘আমি আর তোমার কাছে আসব না, আমার সেতারের পিড়িং পিড়িং শুনতে ভাল লাগে না।’”

বুঝতে পারলাম, রিয়া ওর প্রেমে পড়েছে আর মন খারাপ করে এখানে আসতে চাইছে আমার সঙ্গে ওই নিয়ে বক বক করতে। আমি বললাম, “তুই এলে তোর বাপি আমাকে বকবে, আমি এতটা নিতে পারব না। ও যদি তোকে ভালবাসে, তবে দু’দিন পরে দেখবি ঠিক চলে আসবে তোর কাছে, সেতার ছাড়াই।” রিয়া এবার ভিডিয়ো কল করে আমার সঙ্গে আরও দশ মিনিট বক বক করল। মালতী তখন গোস্তিকে নিয়ে বেরোচ্ছিল। আমি ওদের দু’জনকে ডেকে নিয়ে ওদেরও দেখিয়ে দিলাম রিয়াকে। গোস্তি রিয়াকে চিনতে পেরে ওর নিজের ভাষায় ষেউ ষেউ করে, লেজ নাড়িয়ে ওর আনন্দ জানিয়ে দিল আর রিয়া ওকে হাতে চুমু খেয়ে ফ্লাইং কিস দিয়ে দিল তিনখানা। কী আশ্চর্য! গোস্তির সঙ্গে এই বাতীলাপের পর রিয়া আর কলকাতা আসার কথা তুলল না। পশু আর প্রকৃতি মানুষকে যে-ভাবে সাবুনা দিতে পারে, এরকম আর কেউ পারে না।

দুপুরের খিচুড়ি খেয়ে একটা ছোট্ট হোয়াটসঅপ মেসেজ পাঠালাম নবাকরণকে। “কী রকম হল তোমার বই লঞ্চে?”

“কেন, তোমার কারপেন্টার জানায়নি কিছ?”

“জানিয়েছে তো। ও গিয়ে তোমার বই কিনে এনেছে, তুমি

ওকে পাবে নিয়ে গিয়ে ভুইক্ষি খাইয়েছ। মনে হচ্ছে তোমাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে।”

“ওসব কিছু নয়। ও তোমাকে খুশি করতেই আমার বই কিনতে অনুষ্ঠানের শেষে এসে হাজির হয়েছিল। ও আগের দিন আমাকে বিয়ার খাইয়েছিল, তাই আমি ওকে ভুইক্ষি খাইয়ে দিলাম। যাই হোক, এখন আর ও আমার পা ভাঙতে আসবে না।”

“জেনে খুশি হলাম। কী করছ এখন?”

“আমার ল্যান্ডলেডির সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছি। আজ আমার শেষ দিন তাই পুরো ইংলিশ ব্রেকফাস্ট— বেকন, গ্রিলড সসেজ যাকে এরা বলে ব্যাংগারস, দুটো ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর কফি।”

“দারুণ! আমারও বেকন আর সসেজ খেতে খুব ইচ্ছে করছে।”
আমি মুখে সুড়ুং করে একটা শব্দ করলাম, তারপর বললাম,
“তোমার কামরায় গিয়ে ফোন কোরো। একটা ভাল খবর দেব তোমাকে।”

আধ ঘণ্টা পরে নবাবুণ ফোন করল আমাকে। আমি উঠে সোজা বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে টয়লেটের ঢাকনা বন্ধ করে তার উপর বসে পড়লাম। কারণ দাঁড়িয়ে কথা বলার মত শক্তি ছিল না আমার।

“তুমি কবে ফিরছ?”

“কাল দুপুরে আমার ফ্লাইট। এয়ার ইন্ডিয়া।”

“ওমা তুমিও তাহলে একদিন আগে ফিরছ? মি. কারপেন্টারও তো কাল ফিরছে ওই ফ্লাইটে। তোমাদের দেখা হয়ে যাবে আরেকবার। ওর অবশ্য বিজনেস ক্লাস।”

“আমার ইকোনমি, দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওদের তো আগে ঢুকিয়ে দেয়।”

“ও কি জানে তুমি ওর সঙ্গে ফিরছ?”

“না, আমার তো পরের দিন বুকিং ছিল। রেচেল, আমার এজেন্ট পাবলিশারকে ধরে আমার রয়্যালটির পেমেন্ট করে নিয়েছে তাই আমি একদিন আগে ফিরছি।”

“আর আমার কারপেন্টার সাহেব ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লায়ারের রিওয়ার্ড পয়েন্ট ভাঙিয়ে ইকোনমি থেকে বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড করে নিল।”

“তুমি কিছু বলবে বলছিলে?”

“এই দেখো কান্ড! আজকাল কিছুই মনে থাকে না আমার। করোনার পর আমার অ্যালবাইমার্স শুরু হয়ে গিয়েছে। যাক শোনো সুখবরটা—ময়ালীর এক নতুন প্রেমিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এতদিনে। কয়েকদিন আগে শপিং মল থেকে ওরা দু'জন বেরোচ্ছিল, ছেলোটা ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছিল।”

“দ্যাটস ব্যাড নিউজ ফর মি, শানু।”

“কেন? আমার গুড নিউজ তোমার ব্যাড নিউজ হতে পারে কেন?”

“গত বার কলকাতায় তোমার সঙ্গে প্রেম করতে এসেছিলাম যখন, তখন কী কথা বলেছিলাম তোমার সঙ্গে ভুলে গেছ?”

“কী কথা? আমার তো অ্যালবাইমার্স। কী কথা বলেছিলে তুমি?”

“আমি তোমাকে বলেছিলাম, রূপক যেদিন ময়ালীকে ছেড়ে দেবে, সেদিন থেকে আমরা আবার প্রেমিক থেকে বন্ধু হয়ে যাব।”

“ওগুলো তো ঠাট্টার কথা। সম্পর্ক কি দাবার গুটি যে যখন যেভাবে সাজাবে সেরকম থাকবে? আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি বিউ আর তুমিও আমাকে ভালবাসো। এখন আর ফেরা যায় না। তা ছাড়া রূপক ময়ালীকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে কিনা বা ময়ালী রূপককে টা টা করে দেবে কিনা, তা জানা যাবে আরও ছ'মাস পরে।”

ও পাশে কঠিন নিস্তব্ধতা। আমার বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। কান্নাও পেল। আমার কি মনোপজ্ঞ এসে গেল? এরকম হচ্ছে কেন আমার?

“কী হল? চুপ করে গেলে কেন?”

“ভাবছি।”

“কী ভাবছ?”

“মি. কারপেন্টারকে সব খুলে বলব কিনা। ওকে আর অন্ধকারে রাখতে চাই না আমি।”

“কী আবোল তাবোল বকছো তুমি? হঠাৎ ওর প্রতি তোমার এত ভালবাসা উথলে উঠল কেন? কমিক নভেল লিখতে-লিখতে তুমিও না একটা কমিক ক্যারেক্টার হয়ে গেছ! কী বলবে তুমি ওকে?”

“বলব, আমি শানুকে ভালবাসি আর শানুও আমাকে ভালবাসে। আমরা কতদূর এগিয়েছি তা-ও বলে দেব ওকে। টোটাল কনফেশন। আফটার অল উই আর নাও ইন আ ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ।”

“একবার ও তোমাকে মদ খাইয়েছে আর তুমি একবার ওকে মদ খাইয়েছ, এতেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল? ও শুধু তোমার পা-ই ভাঙবে না, আমারও হাত-পা ভাঙবে। রেগে গেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না, আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দেবে, তখন?”

“দিল্লিতে আমার বর্ষান্তিতে এসে উঠবে। কয়েকদিন পরে ও নিজেই এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।”

“তোমাদের এই মরদ জাতটাকে সত্যিই আমি কোনও দিন বুঝলাম না। এরকম করবে জানলে আমি কোনও দিন তোমার কাছে আসতাম না।” এবার আমি ফুঁপিয়ে, গাল ফুলিয়ে পুতুল হারানো বাচ্চার মতো কাঁদতে আরম্ভ করলাম। ওপাশ থেকে কোনও সান্দ্রনার বাণী এল না, কোনও ‘লক্ষ্মী সোনা আমার, কেঁদে না’ এসব মন ভেজানো কথা এল না। আমি যখন ফোন বন্ধ করে দেব ভাবছি, ঠিক তখন ওপাশ থেকে নবাবুণ বলল, “আমি কলকাতা আসছি রূপকের সঙ্গে। ডোন্ট ওরি, উই উইল স্ট ইট আউট অ্যামং আস।”

আমি জোরে “না” বলে চেষ্টা করে ওঠার আগেই ও ফোন কেটে দিল।

বাইরে মালতীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। “বৌদিমণি শিগগির দরজা খোলো। কাঁদছ কেন তুমি?”

আমি দরজা খুলে মালতীকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরলাম। গোস্তি সামনে থাকলে ওকেই জড়িয়ে ধরতাম। বললাম, “আমাকে একটু বিষ এনে দিবি তুই মালতী? আমি তোকে পাঁচশো টাকা দেব।”

মালতী আমাকে শব্দ করে জড়িয়ে ধরে বলল, “আনছি বিষ। একটু বেশি করেই আনব, আমাকেও খেতে হবে তো।”

রূপক বাড়ি ফিরছে আমার পছন্দসই কাপড়চোপড় আর প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে। আমি কি স্বার্থপর হয়ে গেলাম নাকি যে ওর নিজের জন্য কিছু কিনে নেওয়ার কথা বলতে ভুলে গেলাম? অ্যালবাইমার্স না ডিমেনশিয়া? ডাক্তারের সঙ্গে ঘর করলে এরকম দু'চারটে গালভরা শব্দ শিখে নিতে হয়। একটা পাটিতে আমাদের বিধান মোমোরিয়ালের মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডক্টর অমূল্য শিকদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “আমি কি শেষ পর্যন্ত অ্যালবাইমারের পেশেন্ট হয়ে গেলাম দাদা?” আমার হাতে তখন হোয়াইট ওয়াইন, গুঁর হাতে স্ল্যাপ ফ্রস্ট ভদকা। মুচকি হেসে বলেছিলেন ডক্টর শিকদার, “করোনা সম্পর্কে আমরা এখনও সব কিছু জেনে উঠতে পারিনি। কারও কারও ব্লাড ক্লটিং হচ্ছে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। আপাতত যেটা খাচ্ছে ওটা খেয়ে যাও, ওটা ব্লাড থিনারের কাজ করবে, অন্তত হার্ট অ্যাটাকে মারা যাবে না তুমি।”

আমি খিল খিল করে হেসে উঠেছিলাম আর উনি হো হো করে। সবাই ভাবল দারুণ জোক চলছে আমাদের মধ্যে! এগিয়ে এল রূপক এবং ওর অন্যান্য কোলিগরা আর ওদের বৌ-রা। মরণ নিয়ে আমাদের মধ্যে যে ঠাট্টা-মস্করা চলছিল, তার ভাগ নিতে।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল রূপকের কথা। আমি স্বার্থপরতার মতো শুধু নিজের কাপড়-চোপড় আর কসমেটিকসের লিস্ট ধরিয়ে দিলাম ওকে। ওর টুইডের কোটটা

পুরনো হয়ে গিয়েছে, ওটা পালটানো দরকার। সত্যি বলতে কী, ওই কোর্টের ল্যাপেলে ময়ালীর চুল আবিষ্কার করার পর থেকেই ওটাকে নষ্ট করার তালে ছিলাম আমি। সুযোগ পেলেই কোর্টের ভিতর থেকে দু'চারটে সুতো নখ দিয়ে উপড়ে নিই। কখনও আমার শরীরের লোম ছাটা ছোট ক্লিপারটা দিয়ে ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত করি কোর্টাকে। হিসেব করে দেখলাম, ও হিথরোতে পৌঁছে গিয়েছে কিংবা পৌঁছে যাবে অল্প কিছু ক্ষণের মধ্যে। নবাবরণও পৌঁছে যাবে ওখানে। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসেই কি ও রূপককে বলে দেবে আমাদের গোপন প্রেমের সব গল্প? এরকম কেউ কোনও কালে শুনেছে, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে কোনও রকম উস্কানি না থাকা সত্ত্বেও এভাবে সারেভার করে! আর প্রেমিকার জীবনে ঝড় নিয়ে আসে? হে ভগবান, যদি দু'জন এখানে এসে আমার সামনেই ঘুষোঘুষি শুরু করে দেয়, আমি কোথায় যাব? কারপেন্টারের সঙ্গে কখনওই নবাবরণ পারবে না। যে হাড্ডি জোড়া দেয়, কাটে, সেই শক্তপোক্ত চেহারার মানুষটার সঙ্গে পাতলা চেহারার কলমজীবী কী করে পারবে? আমি বলব ওদের, 'মাঠে গিয়ে লড়াই করো তোমরা।' যে জিতবে, আমি তার গলায় মালা দেব। যেমনটা হয় লোককথা বা রূপকথায়। কোনও একটা রাশিয়ান উপন্যাসে পড়েছিলাম, একজন প্রেমিকাকে দু'জনে ভালবাসলে ওরা ডুয়েল লড়ে। খোলা জায়গায় গিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি ছোড়ে একে অপরকে তাক করে। যে বাঁচল, সে-ই পাবে ওই কন্যাকে। কাল যা হবে, দেখা যাবে। আজ অন্তত আমার বিশ বছরের পতিদেবকে একটু নিজের কায়দায় প্রেম নিবেদন করি। আমি সাতদিন জলে না ভেজানো আমার রক্ষ চুল এলোমেলো করে মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে চূড়েল সেজে ভিডিয়ো কল করলাম কারপেন্টারকে, "তুমি কোথায় গো?"

"আমি তো গাড়িতে। তুমি চান টান করা ছেড়ে দিয়েছ নাকি? এ কী চেহারা করেছ তুমি!" কপালে চোখ তুলে বলল রূপক। গাড়ি চালাচ্ছিল যে গাবদা গোবদা চেহারার মোটর সাহেব ড্রাইভার, রিয়ার ভিউতে সে রূপককে দেখে হেসে কী যেন একটা বলল।

"বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্যারাসিটামল খেয়ে এই দশা হয়েছে আমার। কাল তুমি আসবে, তাই কাল সকালে উঠে শ্যাম্পু-ট্যাম্পু করে চান করব। সেজেগুজে থাকব তোমাকে অভ্যর্থনা করতে। যদিও এয়ারপোর্টে যেতে পারব না আমি। গাড়ি পাঠিয়ে দেব।" তার পর কাজের কথাটা পাড়লাম, "তোমার একটা ভাল টুইডের কোট কিনতে হবে।"

"কেন আগেরটা তো ঠিকই আছে?"

"কোথায় ঠিক আছে? ভিতরের সুতো সব উঠে আসছে। এবার ভাল ব্র্যান্ডের টুইড নেবে তুমি।" একটু পরেই মালতীকে দিয়ে কোর্টটা আনিতে নেব আমি আর ক্লিপার দিয়ে ভিতরের আরও কিছুটা সুতো কেটে ফেলব। ইদুরের মতো। যাতে ওটা আর গায়ে চড়াবার সাহস না পায় ও। একবার মনে হল, ময়ালীর নতুন প্রেমিক খুঁজে পাওয়ার সুখবরটা এফুনি দিয়ে দিই ওকে কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর হতে মন চাইল না। হাসপাতালে গিয়েই না হয় থাকাটা থাক ও।

ও বলল, "দেখি এয়ারপোর্টের দোকানগুলোতে পাওয়া যায় কিনা।"

আমি বললাম, "ট্যাক্সিওয়ালাকে বলো এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর আগে কোনও একটা ভাল স্টোরে তোমাকে নিয়ে যেতে।"

"আচ্ছা বেশ, তোমার আর আমার সব জিনিস ওখান থেকেই কিনে নেব আধ ঘণ্টায়।"

"গুড। নাও, ছাড়বার আগে আমার গালে একটা চুমু খাও।"

"পাগলি! ড্রাইভারের সামনে..."

"ওর সামনে বলেই তো খাবে। ওকে বলো, আমি তোমার মিস্ট্রেস। মিস্ট্রেসকে যখন খুশি চুমু খেলে কেউ কিছু মনে করে না, বৌকে খেলে লোকে চোখ কপালে তোলে, ভ্রু কোঁচকায়। নাও দেরি কারো না, মি. কারপেন্টার। বি কুইক।"

রূপক ঠোট ঝুঁচলো করে আমাকে চুমু খেল ফোনে, ওপাশে সাহেব ড্রাইভার এবার হো হো করে হেসে উঠল। আমি হাসির আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আমি মুখ ভেংচে ফোন বন্ধ করে

দিলাম।



নবাবরণ

উইন্ডো সিট চেয়েছিলাম কিন্তু পোলাম মাঝখানের সিট। উইন্ডো সিটে এক সুদর্শন তরুণ আর আমার বাঁ পাশে আইল সিটে এক তরুণী, যার কোলে একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। যার হাতে একটি লোমশ টেডি বিয়ার। প্লেন আকাশে ডানা মেললে তরুণ তার রুকস্যাক থেকে ল্যাপটপ বের করে কি-বোর্ডে দ্রুত আঙুল চালিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আর আমি রেচেলের দেওয়া হাওয়ার্ড জ্যাকবসনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একগুচ্ছ ছোট লেখার সংকলন 'The Dog's Last Walk' নামক বইটি খুলে বসলাম। বইয়ের প্রথম পাতায় একটি সারমেয়র ছবি আর ঠিক তার নীচেই টাইমস লিটারারি সাল্লিমেণ্টে বইটির যে রিভিউ বেরিয়েছিল তার থেকে উদ্ধৃতি "Manages the high-wire act of being genuinely funny while dispensing genuine wisdom."

জ্যাকবসন ম্যান বুক আর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন ২০১০ সালে, 'The Finkler Question' নামক উপন্যাসটি লিখে। এই উপন্যাসটি আমার তত ভাল না লাগায় আমি জ্যাকবসনের আর কোনও বইতে হাত দিইনি। রেচেল গতকাল পাব থেকে বেরিয়ে উইজডেন বুক শপে আমাকে নিয়ে গিয়ে 'দ্য ডগস লাস্ট ওয়াক' বইটি কিনে হাতে দিয়ে বলেছিল, "দিস উইল বি আ গুড কম্পেনিয়ান ফর ইউ ডিউরিং ইয়ার্স লং ফ্লাইট।"

"আর ইউ শিওর? আই ডিডন্ট লাইক হিজ 'দ্য ফিকলার কোয়েশ্চন'।"

"সো ডিড আই, বাট দিস ইজ ডিফারেন্ট স্টাফ। ট্রাই ইট।"

ইংরেজরা ছুটি কাটাতে সি-বিচে যাক কিংবা লম্বা ফ্লাইটে চেপে বসুক, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা একটা প্রশ্ন সব সময় করে থাকে— "ডু ইউ হ্যাভ রিডিং মেটেরিয়াল উইথ ইউ?"

আমি আমার 'রিডিং মেটেরিয়াল' খুলে বসলাম কিন্তু পর ক্ষণেই বাঁ পাশ থেকে ছোট একখানি হাত এসে বইটা টানাটানি শুরু করে দিল। আমার পাশের সুন্দরী মা তার সুন্দরী মেয়েকে বলল, "নো টিনা, ডোন্ট ডু দ্যাট। আকংলকে একদম ডিস্টার্ব করবে না তুমি।"

আমি বইটা বন্ধ করে মেয়েটির রেশমের মতো নরম চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। ও 'কি কু উ আ' এরকম কিছু শব্দ বলে আমার চশমাটা ধরার জন্য হাত বাড়াল।

টিনার মা এবার দূরন্ত মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, "ডোন্ট বি সো নটি টিনা।" আমার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হাসি হেসে ও বলল, "বেবিকো সামহলকে অকেলা ট্রাভেল করনা বহত মুশকিল হায়া।"

আমি এবার সমবেদনা জানিয়ে হিন্দিতেই ওর সঙ্গে কথা শুরু করলাম। "হাজুব্যান্ড সঙ্গে থাকলে সুবিধে হতা।"

"হাজুব্যান্ড সেটা বুঝলে তো।" একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলল মেয়েটি। "ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সব সময়। মাসতুতো বোনের বিয়ে ছিল বার্মিংহামে, না গেলেই নয়। কী করি, এই দেড় বছরের মেয়েকে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম।"

জ্যাকবসন কোর্টের পকেটে চালান দিয়ে আমি মেয়েটির সঙ্গে খোশগল্পে মশগুল হয়ে পড়লাম। ওর নাম রেশমি, বাড়ি পঞ্জাবের

লুথিয়ানায়। উল তৈরির ফ্যাক্টরি আছে ওদের আর আছে একটা রিসর্ট, হিমাচলের কুফ্রিতে। অসভ্য রকমের বড়লোক ওরা। রেশমির বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে। টেডি বিয়ার ছুড়ে ফেলে টিনা আবার আমার চশমার দিকে হাত বাড়ালে আমি চশমাটা কোটের পকেটে পুরে রেশমিকে বললাম, “ওকে আমার কোলে দাও, দেখি এখন কী করে।” একগাল হেসে রেশমি ওকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বলল, “থ্যাংক ইউ স্যর” আর টিনাকে বলল, “বি আ নাইস গার্ল টিনা।”

টিনা আমার কোলে উঠে প্রথমে আমার ব্রেজারের বোতাম ছিঁড়বার চেষ্টা করল, তারপর আমার নাকটা খামচে দিল। সম্ভবী সঙ্গে আমার বিয়েটা টিকে গেলে এরকম একটা তুলতুলে বাচ্চা আমার কোলেও খেলতে পারত। আমি ওকে বুক জড়িয়ে ধরে হামি খেলায় দুই গালে, তারপর কাতুকুতু দিয়ে ওকে হাসলাম। রেশমি খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, “টিনার সঙ্গে আপনার খুব দোস্তি হয়ে গেল দেখছি।”

ও এবার হ্যান্ডব্যাগ থেকে ব্রাশ বের করে চুল আঁচড়ে, দাঁতে ক্লিপ আর আঙুলে রাবার ব্যান্ড নিয়ে খোঁপা বাঁধতে শুরু করল। আমার ডানপাশের ছেলেটি ক্রু কুঁচকে আমাদের কান্ড কারখানা দেখে অতি বিরক্ত হয়ে ল্যাপটপ বন্ধ করে, মোবাইল খুলে কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে লাগল। রেশমি সেটা লক্ষ করে চুল বাঁধতে বাঁধতেই ডান দিকে একটু ঝুঁকে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, “দেখলেন আংকল কাউটা? কোথায় বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একটু আদর করবে, তা নয়... কানে হেডফোন লাগিয়ে... যতসব।” রেশমির মুখ এতটাই আমার মুখের কাছে এসে গিয়েছিল যে, আমি ওর মুখে চকোলেটের গন্ধ আর ওর কামিজ থেকে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার বর তোমার মেয়েকে ভালবাসে তো?”

চুলে রাবার ব্যান্ড পেঁচিয়ে রেশমি মুখ বাঁকিয়ে বলল, “মেয়েকে কোলে তোলার সময় কোথায় ওর? সারাদিন ফ্যাক্টিতে আর সন্দের সময় বন্ধুবান্ধব নিয়ে হুইস্কি। শাশুড়ি ধম্মো নিয়ে থাকেন, রোজ মন্দিরে গিয়ে মাথা ঠোকেন যাতে আমার যমজ ছেলে হয় শিগগিরই। দু’দুটো ছেলে একসঙ্গে চাই তাঁরা।”

“দেখো, বিধাতার ইচ্ছেয় শাশুড়ির ইচ্ছেটা পূরণ হয়েও যেতে পারে!”

একগাল হেসে রেশমি বলল, “আপনার মুখে ঘি শক্কর পড়ুক, আংকল।”

“শ্বশুর?”

“দু’বছর আগেই স্বর্গে চলে গিয়েছেন।”

“দেওর, ননদ, জা?”

“শ্বশুর মারা যাওয়ার আগেই সম্পত্তি, ঘরবাড়ি সব ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে গিয়েছেন। পাঁচ পাঁচটা ঝি চাকর আর আয়া নিয়ে আমার সংসার। আসুন না একবার লুথিয়ানায়। অথবা গরমে কুফ্রিতে আমাদের রিসর্টে। গরমকালে এক মাস আমি থাকি ওখানে।”

“থ্যাংকস ফর ইয়োর ইনভিটেশন, ডিয়ার। দেখি কখনও...”

“আমি তো এক নাগাড়ে বক বক করে যাচ্ছি প্রথম থেকে, এবার আপনার গল্প বলুন। ব্যবসার কাজে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ইউকেতে?”

আমি জানালাম যে আমি একজন ছোট মাপের লেখক, একটা বই রিলিজ করতে গিয়েছিলাম লন্ডনে।

রেশমি বড় বড় চোখ করে তাকাল আমার দিকে। “আপনি তো সেলেব্রিটি আংকল! আর আমি আপনার কোলে মেয়েকে চাপিয়ে দিয়ে... ছি ছি।” রেশমি হাত বাড়াল মেয়ের দিকে। আমি বাধা দিলাম না কারণ হঠপুট টিনাকে কোলে নিয়ে আমার হাত টন-টন করছিল।

জ্যাকবসন আমার কোটের পকেটে রয়ে গেল। টিনা আর রেশমিকে নিয়ে কীভাবে আমার ন’ঘণ্টা কেটে গেল, টের পেলাম

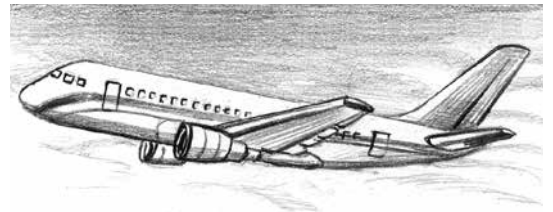
না। টিনা চারবার কোল পাল্টাল। একবার রেশমি ওকে আমার কোলে তুলে দিয়ে টয়লেটে গেল, দ্বিতীয়বার গেল টিনার ফিডিং বটল ধুয়ে পিছনে প্যান্টি থেকে দুধে বেবিফুড মিশিয়ে আনতে। লাঞ্চের সময় তৃতীয়বার কোলে নিলাম ওকে, যাতে রেশমি শান্তিতে খেতে পারে ট্রে থেকে। আর শেষে পিঠি খাবড়ে খাবড়ে মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে এক সময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল রেশমি, আমার কাঁধে মাথা রেখে। শাশুড়ির প্রার্থনার ফলে এই মেয়ের যমজ ছেলে হলে কী অবস্থা হবে, ভেবে আমার হাসিও পেল আবার কিছুটা ভয়ও হল। ওর হাত থেকে টিনার গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখে আমি চতুর্থবার টিনাকে কোলে তুলে নিলাম। আমার কোটের ল্যাগেপেলে ওর লাল পড়ল, আমার নাকে, মুখে, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে ও ‘কু কা উ আ’ বলে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উগরে দিয়ে আমাকে জাগিয়ে রাখল। আশ্চর্যের ব্যাপার, শেষদিকে আমার ডান পাশের যুবকও কানের হেডফোন রেখে ওর ক্রিয়া কলাপ দেখতে মনোযোগী হল আর দু’একবার ওর গাল টিপে আদর করল।

দুপুর বারোটা নাগাদ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে গ্লেন ল্যান্ড করলে, বেশির ভাগ যাত্রীই নেমে গেল। রেশমি যাওয়ার সময় আমাকে কী বলবে ভেবে না পেয়ে কেঁদে ফেলল আর আমিও হঠাৎ আবেগের আতিশয্যে ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, “আই হ্যাভ ভেরি মাচ এনজয়েড দ্য জার্নি উইথ ইউ অ্যান্ড টিনা।”

“আপনি সামনের গরমের কুফ্রি আসবেন আংকল,” রেশমি বলল। “আমাদের রিসর্টের নাম ‘ম্লেভিউ’, নেটে পাবেন। আমি আপনার কথা মুকেশকে বলব, আপনি এলে আমি খুব খুশি হব। ক’টা দিন আনন্দ করব। টিনাও খুশি হবে, তাই না টিনা?” আমি টিনার গালে আরেকটা চুমু খেতে গিয়ে ওর আরেকটু লালা আমার গালে নিয়ে নিলাম।

ওরা চলে যাওয়ার পরই খেয়াল করলাম, টিনার টেডি বিয়ারটা পড়ে আছে আমার পায়ের নীচেই।

এখন কে আসবে আমার পাশের সিটে? নিশ্চয়ই কলকাতা বা দিল্লির কোনও বন্ধ সন্তান। কারণ গ্লেনটা তো ওখানে গিয়েই এই লম্বা যাত্রা শেষ করবে। একবার মনে হল, বিজনেস ক্লাসে বসে রূপক ওরফে মি. কারপেন্টার কী করছে? পয়তাল্লিশ মিনিটের এই হল্ট, একবার গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়? তারপর মনে হল, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে তো দেখা হয়েই যাবে ওর সঙ্গে। ও যখন শুনবে, আমিও যাচ্ছি ওর বাড়ি, শানুর সঙ্গে দেখা করতে, তখন পরিস্থিতিটা কেমন বদলে যাবে! কিংবা কতটা নাটকীয় হবে সেটা ভেবে আমার কোনও দৃষ্টিস্তা হল না। বরং একটু হাসি পেল। শানুর ভয়, আমাদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ হবে। যে কারণে ও আমাকে আসতে না করে দিয়েছিল। কিন্তু রূপকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে, লোকটা বেশ ভদ্র, মার্জিত আর অতিথিবৎসল। শানুকে নিয়ে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হওয়ার মতো পরিস্থিতি কখনওই হবে না। করোনাকে ওর স্মৃতিশক্তি কিছুটা হারিয়েছে আর ডেঙ্গিতে ও হারিয়েছে কিছুটা মেন্টাল ব্যালেন্স। হঠাৎই খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছে ও। তাই শানু যতই নিষেধ করুক, ওর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার। রূপক নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমাকে কোনও বাধা দেবে না।



রূপক

দিল্লিতে এসে গ্লেনটা খালি হয়ে গেল। বিজনেস ক্লাসে এখন

শুধু আমি একা বসে। লেখক নবারণ চ্যাটার্জি যে এই প্লেনেই ইকোনমি ক্লাসে ট্র্যাভেল করছে, সেটা আমি জেনে গিয়েছিলাম হিথরোতে পৌঁছে সিকিউরিটি পার করতে গিয়ে। আমার মতো ও-ও তাহলে একদিন এগিয়ে নিয়েছে ওর দেশে ফেরা! লাইনে ও আমার অনেক সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওর হ্যান্ড ব্যাগে যে ট্যাগ লাগানো ছিল, তাতে ‘দিল্লি’ নয়, ‘কলকাতা’ লেখা ছিল। আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম। ও কেন কলকাতা আসছে? ওখানেও কোনও বই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছে নাকি ও? কই, সেদিন পাবে বসেও তো ও সেরকম কোনও কথা বলেনি আমাকে? শানু কল কল করে কত কথা বলল আমার সঙ্গে, ভিডিয়োতে মুখ ভেঙে দেখাল আমাকে আর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে, কিন্তু একথাটা তো বলেনি। আমার মনে এবার সন্দেহ হল, ও শানুর সঙ্গে দেখা করতেই কলকাতা আসছে নিশ্চয়ই। ওর সঙ্গে শানুর বন্ধু নয়, প্রেম-ভালবাসা চলছে, যেটা ওরা দু’জনই গোপন রেখেছে। ওর হাতে এখন দুটো পয়সা এসেছে বই লিখে, সেটা ও ওড়াবে শানুকে নিয়ে। ও উত্তর কলকাতার কোনও ছোটখাটো হোটেল গিয়ে উঠবে, তারপর সময় সুযোগ বুঝে শানুকে ডেকে নেবে প্রেমভিসারো। আমি তখন ব্যস্ত থাকব হাসপাতালে আর ওরা দু’জন ফুর্তি করে বেড়াবে! আমাকে শানু চিট করছে। আমাকে বিছানায় কেন ও কাছে ঝেঁসতে দিচ্ছে না, সেই রহস্যের খোলাসা হল এতদিনে। হোটেলের বিছানায় শানু ওর সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নবারণের ব্যাগ খুঁজলে এক দু’বোতল রেড ওয়াইন পাওয়া যাবে। কারণ, ওটাই শানুর প্রিয় ওয়াইন। এটা আমি কোনও ভাবে সহ্য করব না। ওকে শানুর রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টের ডিপার্চার কাউন্টার দিয়ে বেরিয়ে এলেই আমি ওর কলার চেপে ধরব, তারপর একপাশে টেনে নিয়ে ওকে বেদম পেটাব। আমার ধমনীতে রক্তের স্রোত দ্রুত বইতে লাগল আর মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল। আমার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই ওর মতো পাতলা, রোগা-পটকা মানুষের। মুখে দুটো ঘুঁষি মারলেই ও ছিটকে, মুখ খুবড়ে পড়বে রাস্তায়। কলেজে বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ছিলাম আমি, আপার কাট, লোয়ার কাট, পাঞ্চ সব জানি। কিন্তু লড়াইটা দু’ঘণ্টা জিইয়ে রেখে লাভ কী? ইকোনমি ক্লাস তো এখন প্রায় ফাঁকা। ওখানে গিয়ে ওকে একটু বাজিয়ে আসি। বুঝে নিই ওর কলকাতা আসার আসল মতলবখানা। একটু ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে ডায়লগ ঝাড়তে হবে আমাকে।

আমি লম্বা শ্বাস নিলাম দশবার, মনকে শান্ত করতে। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে বিজনেস ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে এলাম ইকোনমি ক্লাসে। দু’একজন করে যাত্রী আসা শুরু হয়েছে। মাঝামাঝি জায়গায় নবারণ একটা মিডল সিটে বসে বই পড়ছে। যত ঢঙ! মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছে, কতক্ষণে শানুকে হোটেলের আনিয়ে উলঙ্গ করে... আমি গিয়ে ওর সিটের পাশে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকরানি দিয়ে বললাম, “হ্যালো নবারণ, আপনিও দেখছি কলকাতা যাচ্ছেন আমার সঙ্গে!”

নবারণ মুখ তুলে আমাকে দেখে মুচকি হাসল। “ঠিক ধরেছেন। আপনি তো বিজনেস ক্লাসে ট্র্যাভেল করছেন।”

“তা করছি। ওখানের টয়লেটে একটু প্রবলেম চলছে, তাই এদিকে এলাম। তা কলকাতাতেও কি আপনার বই রিলিজের কোনও অনুষ্ঠান আছে নাকি?”

“না না আমি তো রুশদি বা শের্ট নই, আমার...”

নবারণকে কথা বন্ধ রাখতে হল কারণ দু’জন পুরুষ যাত্রী এসে দাঁড়িয়েছে ওর দু’পাশে দুটি খালি সিট দখল করতে। ওদের একজন উপরের স্টোরেজে হাতব্যাগ ঝুসছে আরেকজন নবারণের মুখের উপর দিয়ে প্রায় লাফিয়ে চলে গেল উইন্ডো সিটটা দখল করতে, যেন ওটা অন্য কেউ ছিনিয়ে নেবে ওর কাছ থেকে!

“চলুন আমরা বরং পিছনের সিটে গিয়ে বসি,” নবারণ বলল। “ওগুলো সাধারণত খালিই পড়ে থাকে।”

“তাই চলুন। একসঙ্গেই যাচ্ছি যখন, দুটো কথা বলি আপনার সঙ্গে।”

ভালই হল। পিছনে বসলে দশজনের কান এড়িয়ে মন খুলে কথা বলা যাবে। আমরা গিয়ে প্লেনের শেষ লাইনে দুটি সিট দখল করে বসলাম। ও বসল উইন্ডো সিটে আর আমি বসলাম ওর পাশেই, মিডল সিটে। আমাদের সামনের দুটো লাইন এখনও ফাঁকা। ও দুটো হয়তো ফাঁকই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত।

“আপনার বই পড়ায় বাধা দিলাম,” আমি বললাম অনুতাপদগ্ধ কাষ্ঠ হাসি হেসে।

“সময় কাটাবার জন্যই তো বই পড়া। কথা বলার লোক পেলে বই খোলার কী দরকার?”

নবারণ জানাল, পুরো রাস্তায় বই খোলার দরকার হয়নি ওর। কারণ ওর পাশে একজন পঞ্জাবি মহিলা বসে ছিলেন একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে নিয়ে আর ওদের সঙ্গে গাল-গল্প করে, বাচ্চাটাকে আদর করে ওর পুরো ন’ঘণ্টা সময় ভালই কেটে গিয়েছে। আমি জানালাম যে, আমার পাশে একজন হেঁতকা চেহারার রাজনৈতিক নেতা বসেছিলেন। যিনি পুরো রাস্তাটা বড় বড় ঢেকুর তুলে আর সশব্দে বাতকর্ম করে আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছেন।

“তা কলকাতায় কোথায় উঠবেন আপনি ঠিক করেছেন?”

নবারণ একগাল হেসে বলল, “কোথাও উঠব না আমি। আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার গাড়িতেই চড়ে বসব। আপনার বাড়ি গিয়ে শানুর সঙ্গে দেখা করব, একটু গল্প-গাছা করব। দুপুরে আপনার বাড়িতে কিছু খেতে দিলে, খেয়েও নেব। তারপর ফিরে আসব এয়ারপোর্টে। রাত ন’টার বিমানের সস্তার ফ্লাইট ধরে মাঝরাত্তে দিল্লিতে ফিরব।”

ওর কথা শুনে আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। বলে কী লোকটা? ও কি আমার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছে? ও বলেছিল ও কমিক উপন্যাস লেখে, আমার সঙ্গে কি ও মজা করছে? ও জানে না, ওকে পিটিয়ে ছাতু করার প্ল্যান করেছে। আমি। আমার বাড়িতে গেলে তো সেই প্ল্যানটা ফুলফিল করতে আমার সুবিধেই হবে। লোকটা ইংরেজিতে বই লেখে, ও কি বোকা না দুঃসাহসী?

আমি একটা টোঁক গিলে বললাম, “না না, আপত্তি থাকবে কেন? আপনি তো শানুর ফেসবুক ফ্রেন্ড। আসুন না আমার বাড়ি। ডেস্কিতে একটু কাহিল হয়ে পড়েছে বোচারা, তবে দু’পাঁচ মিনিট নিশ্চয়ই কথা বলতে পারবে ও আপনার সঙ্গে।”

“পাঁচ মিনিটে আমার কাজ হবে না রূপক। আপনার অনুমতি থাকলে, ওর সঙ্গে নিভুতে মিনিট পনেরো কথা বলব আমি।”

আমি আবার থ মেরে গেলাম! কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ মানুষ অন্যের স্ত্রী-র সঙ্গে প্রাইভেটে কথা বলার জন্য অনুমতি চায় তার স্বামীর কাছে! কে কবে শুনেছে এরকম আজগুবি কথা? নির্ঘাত গোলমাল আছে এই লোকটার মাথায়। শিল্পীরা একটু পাগলাটে টাইপের হয় শুনেছি কিন্তু এ তো দেখছি বন্ধ পাগল!

“তা না হয় বলবেন—অফ কোর্স, ইফ হার হেলথ পারমিটস,” আমি যে দরজার বাইরে কান পেতে থাকব ডাঙা-হাতে নিয়ে, সেটা ওকে নাই-বা জানালাম।

“আমার মনে হয় ও একটু মেন্টাল আনস্টেবল হয়ে পড়েছে—বিশেষত ডেস্পির ধাক্কা।”

আমি মাথা দোলালাম। এ ব্যাপারটা আমিও লক্ষ করেছি। হয়তো ওর মেনোপজের সময়টা এগিয়ে আসছে একটু আগেই।

“ইমোশনাল হয়ে পড়ে হঠাৎই আর খুব মুড সুইং হয় ওর।”

আমি অজান্তেই মাথা নাড়লাম। কারণ এটা আমারও মনে হয়েছে গত দু’দিনে ওর সঙ্গে কথা বলে।

“আমার মনে হয়, ওর মেনোপজ শুরু হতে চলেছে।”

আমি আবার মাথা নাড়লাম। কারণ আমার মনেও ঠিক এই শব্দটাই ঘোরায়ুরি করছে, বিশেষত ও কাল ট্যাক্সি ড্রাইভারের সামনে যা করে বসল ভিডিয়ো করলে, তার পরে। একটা পাঁচ-ছ’বছরের মেয়ের মতো বিহেভ করল ও।

যেন আমার মনের কথা পড়ে নিয়েই নবারণ বলল, “শি বিকামস সো একজুব্বারেন্ট, জাস্ট লাইক আ চাইল্ড অ্যান্ড দ্য নেস্টট মোমেন্ট শি স্টার্টস ক্রায়িং। ওর বয়স এখন কত হল?”

“তেতাল্লিশে পড়েছে গত ডিসেম্বরে।” কী জানি কেন, আমার মনে হল এই মানুষটা আর যাই হোক আমার ক্ষতি করতে আসছে না, আমার মতোই ও শানুর শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি ভাবলাম শানুর মুড সুইং নিয়ে ও আরও কিছু বলবে, কিন্তু ও আর কিছু বলল না। আমার ওর উপর যে রাগটা হয়েছিল, তা অনেকটা কমে গিয়েছে। নিজের সিটে ফিরে যাব কিনা ভাবছি, তখন ও হঠাৎ বলল, “আমি ওকে প্রথম কবে আমার প্রেমিকা হওয়ার প্রস্তাব দিলাম, জানো রূপক?” ও আমাকে এই প্রথম ‘তুমি’ সম্বোধন করল আর সেই সঙ্গে যে প্রসঙ্গটা আমি কীভাবে তুলব ভাবছিলাম, সেটা আমার সামনে ছুড়ে দিল কোনওরকম ভূমিকা না করেই। আমি কিছু না ভেবেই বললাম, “কখন?”

“যেদিন ও আমাকে জানাল, তুমি তোমার হাসপাতালে ময়ালী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছ। ও আমার বন্ধু ছিল, ওকে আমিই প্রেমিকা হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম তোমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। না হলে সেদিন ও তোমাকে আঁচড়ে কামড়ে কেলেকারি করত, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত।”

দ্বন্দ্বযুদ্ধে এবার আমি ব্যাকফুটে এসে গেলাম! শানু ময়ালীর খবর জেনে গিয়েছে, এটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তার জন্যও তো ও-ই দায়ী ছিল। ও যদি আমাকে শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে দূরে সরিয়ে না রাখত... কিন্তু আমি তো ময়ালীকে ভালবাসিনি, আমি শুধু সুযোগ বুঝে ওর শরীর উপভোগ করেছি এবং তা-ও যা কিছু করেছি তা কোমরের উপরেই, নীচে যাইনি। যাওয়ার চেষ্টাও করিনি। প্রতিশোধ নিতে শানু কতদূর এগিয়েছে সেটাও আমার জানা দরকার।

“তাহলে শানুর সঙ্গে তোমার প্রেম চলছে গত একবছর ধরে?” আমি তীব্র দৃষ্টিতে তাকলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

“তা বলতে পারো। ফেনাফুনি আর মেসেজ চালাচালি মোস্টলি।”

“কেন? কলকাতা আসনি ওর সঙ্গে কোনও হোটলে গিয়ে ফুঁটি করতে?”

“একদিনের জন্য কলকাতা এসেছিলাম। শানুর জোরাজুরিতেই আসতে হয়েছিল। অগস্ত মাসের এক গুমেটি গরমের দিনে গিয়েছিলাম কলকাতা। প্লেনের টিকিট শানুই পাঠিয়েছিল আমাকে কারণ আমার হাতে তখন পয়সা ছিল না। না, তুমি যা ভাবছ সেরকম কিছু না, হোটেল ভাড়া করিনি আমি। সকালে এসে বিকেলে ফিরে গেছি, চার ঘণ্টা সময় কাটিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। পার্ক হোটেলের পাত্রস-এ ওর সঙ্গে লাঞ্চ করেছিলাম সেদিন আর তারপর ওকে নিয়ে ময়দানে ঘোরাঘুরি করেছি কিছু ক্ষণ।”

“বাহ! কী সুন্দর গল্প বানিয়েছ তুমি। দিল্লি থেকে উড়ে এসে প্রেমিকার সঙ্গে বসে রেস্তোরাঁয় খাওয়া আর ময়দানে চক্কর মারা! তোমার নভেল কেন বিক্রি হয় না সেটা এবার বুঝতে পারছি। তুমি এখনও রিয়েলিস্টিক গল্প লিখতে শেখনি।”

নবরূপ আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল। “তুমি যেটা শুনলে, ওটা গল্পের সিনপসিস, তোমরা যাকে বল সারাংশ। চ্যাপ্টার ওয়াইজ বলতে অনেক সময় লাগবে। কাজেই যা শুনতে তুমি আগ্রহী, তা-ই শোনাই— হাইলাইটস অফ দ্য ডে। পাত্রস-এ রেড ওয়াইন নিয়েছিলাম শানুর জন্য কারণ ওটাই ওর পছন্দের। ওয়াইন গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে ওর ঠোঁটে বুলিয়ে দিয়েছিলাম বেশ কয়েকবার।”

“সো রোম্যান্টিক।”

“নীচে নামার সময় ফাঁকা লিফট পেয়ে ওকে চুমু খেলাম তিন তলা থেকে এক তলা অর্দি।”

“ত্রিশ সেকেন্ড মাত্র।” আমার মাথায় আবার রক্ত উঠতে শুরু করেছে কিন্তু আমি নিজেকে কন্ট্রোলে রাখছি। ওকে রাম ধোলাই দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাব আমি।

“তা হবে। তবে ময়দানে অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছিলাম। ওখানে একটা ডুমুর গাছের নীচে ওকে যে পাঁচটা চুমু খেয়েছিলাম তার প্রত্যেকটাই বেশ সময় নিয়ে।”

“পাঁচ মিনিট ধরে?”

“ঘড়ি দেখিনি তবে ওর বেশি ছাড়া কম হবে না।”

আমি আরেকবার লম্বা শ্বাস নিলাম। একে পিটিয়ে হাতের সুখ করব আমি, অনেকদিন পরে। আরেকটু খুঁচিয়ে দিতে বললাম, “তার পর কী করলে? কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাও নবরূপ।”

“ময়দানে কাপড় খোলা সম্ভব নয়, কাজেই ওটা করিনি। তা ছাড়া শানু আমাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল ও আমার সঙ্গে শোবে না। হ্যাঁ, রেড রোডে এসে ক্যাব কল করে একটা ল্যান্টানা বৃশের পিছনে নিয়ে ওর ব্লাউজ আর ব্রা খুলে দুই বুকে চুমু খেয়েছিলাম, মনে পড়ে। ও যে থার্টফোর সি কাপ ব্রা পরে, সেটা তো আমাকে আগেই লিখে জানিয়েছিল। এনিওয়ে, ইট ওয়াজ লাইক আ রোমান হলিডে টু মি। ভেরি প্লেজেন্ট অ্যান্ড সো ইনস্পায়ারিং। দিল্লি ফিরে গিয়ে আমান্ডাস চয়েস-এর পুরো একটা চ্যাপ্টার লিখে ফেলেছিলাম সে রাতে।”

“তা এখন কি তোমার নতুন উপন্যাসের জন্য ইন্সপিরেশন নিতে চলেছ ওর কাছে?”

“একদম নয়। আমি যাচ্ছি ওকে এটাই বোঝাতে যে, ওর এখন এই নাটকে যবনিকা টানার সময় হয়েছে। আমাদের খেলা শেষ হয়েছে। ব্যাক টু প্যাডেলিয়ন।”

“হঠাৎ এই শুভ বুদ্ধির উদয় হল কেন তোমার মনে?”

নবরূপ হাসল দাঁত দেখিয়ে। “কারণ তোমার প্রেমেও যবনিকা পতন হয়ে গিয়েছে, তোমার অব্যবসে।”

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। কী বলছে এই লোকটা?

“মানে?”

“মানে খুব সহজ। শানুই আমাকে জানিয়েছে তোমার প্রেমিকা ময়ালী এতদিনে তার নতুন প্রেমিকের খোঁজ পেয়েছে। কয়েকদিন আগে দক্ষিণের শপিং মলে ওদের দেখা গিয়েছে। প্রেমিকের হাত ওর কোমর জড়িয়ে ছিল।”

আমার মুখের উপর বোমা ছুড়ে দিল নবরূপ। আমি অবিশ্বাসীরা হাসি হেসে ওর কথা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। শানুর উথলে ওঠা প্রেম, ওর চুল এলোমেলো করে চুড়েল সেজে আমাকে ভ্যাংচানো এসবের অর্থ এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

নবরূপ আমার পিঠে হাত রাখল। “লুক বাড়ি, অ্যাজ শেক্সপিয়ার হাজ় সেড অল দ্য ওয়র্ল্ড ইজ আ স্টেজ অ্যান্ড উই অল মেন অ্যান্ড উওমেন আর প্লেয়ার্স। আমাদের দু’জনেই স্টেজে এতদিন যে নাটক করছিলাম তা শেষ হয়ে গেল। আমাদের স্টেজ ছাড়তে হবে, নতুন প্লেয়ার আসবে নতুন নাটকের অভিনয় করতো।”

আমি উঠে দাঁড়িলাম। নবরূপ ফিলোসফি আউড়ে আমাকে সান্ত্বনা দিল, কিন্তু ওতে আমার কাজ হবে না। এবার নিজের সিটে গিয়ে ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল খুলে পুরো এক পেগ মেরে দেব নিট, না হলে মনের জ্বালা যাবে না। আর হাসপাতালে গিয়ে ময়ালীকে চটপট কীভাবে চাকরি থেকে বের করতে হয়, সেই ফন্দি করতে হবে।

“আমাকে লিফট দেবে তো?” জিজ্ঞেস করল নবরূপ।

“দেব। লাঞ্চও পাবে আমার ওখানে।”

“থ্যাংকস আ লট, বাড়ি।”



শিঞ্জিনী

ওরা দু’জন যখন এসে বাড়িতে ঢুকল, তখন আমি ঘুমিয়েছিলাম। গোল্ডির যেউ যেউ শুনে উঠে পড়লাম। জ্বর নেই কিন্তু শরীরটা

এখনও খুব দুর্বল। আমাকে তাড়াতাড়ি সবল করার জন্য বিকাশকে দিয়ে বাজার থেকে পাকা রুইয়ের সঙ্গে শিঙি মাছও আনিয়েছিল মালতী। রূপকের জন্য দুটো অবধি অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে ও যখন জানাল বাড়ি আসতে ওর তিনটে বেজে যাবে, তখন মালতী একরকম জোর করেই আমাকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে পঁপে সেক্স আর শিঙি মাছের ঝোল দিয়ে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল।

গোল্ডির ডাক শুনে বিছানায় উঠে বসলাম, জানলার পরদা সরিয়ে নাচে তাকিয়ে দেখলাম, রূপকের সঙ্গে নবারুণও নেমে এল গাড়ি থেকে। ড্রাইভার প্রশান্ত একটা থেকেই আমাদের নতুন কেনা ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে অপেক্ষা করছিল এয়ারপোর্টের পার্কিং-এ। দু'জনের মুখেই হাসি দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম। ব্যাটাছেলেরা গ্লাসে গ্লাস ঠুকে এক চুমুক দিলেই কীভাবে বন্ধ হয়ে যায় বুঝি না! আমি তো নবারুণকে পই পই করে নিষেধ করেছিলাম এখানে না আসতে। ভেবেছিলাম, নবারুণের মুখ থেকে একটা বের্ফাস কথা বেরোলে এয়ারপোর্টেই হাতাহাতি হয়ে যাবে দু'জনের মধ্যে। আর রূপকের হাতে মার খেয়ে ও ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে কলকাতার কোনও হোটেলে। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা কে বুঝবে, হাসিমুখেই দু'জন লিফটে চড়ে ঢুকল এসে আমাদের আটতলার ফ্ল্যাটে। আমি ওদের রিসিভ করতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ঢুকে কিছু বলার আগেই রূপক এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেল আমার কপালে, যেখানে আমার শ্যাম্পু করা অবিন্যস্ত চুল লুটোপুটি করছিল। নবারুণ বলল, “ইউ লুক ভেরি ফ্রেশ শানু। জ্বর নেই তো এখন?”

আমি ওকে কটাক্ষ করে বললাম, “না। এখন আর কথা হবে না, খেতে বসে যাও তোমরা। কাপড় টাড়া পরে ছাড়বে।”

ওদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তাই বাধ্য ছেলের মতো ওরা দু'জন গিয়ে ডাইনিং টেবিলে পাশাপাশি বসল। আমি গিয়ে বসলাম ওদের উল্টো দিকের চেয়ারে। মালতীকে বললাম খাবার পরিবেশন করতে। গোল্ডি খুশিতে লেজ নেড়ে নতুন মানুষ নবারুণকে শুঁকতে লাগল। মালতী ভাতের থালা সাজিয়ে নিয়ে এলে ওরা দু'জনেই গোথ্রাসে গিলতে লাগল। আর আমি ভাবলাম, জীবনে এমন দিনও আসবে ভাবিনি কোনও দিন, যখন স্বামী আর প্রেমিক একসঙ্গে বসে খাবে আমার সামনে বসে! ময়ালীর খবরটা কি সত্যিই বলে দিয়েছে নবারুণ? যেভাবে রূপক নবারুণকে আরেক টুকরো মাছ নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, তা দেখে বিশ্বাস হয় না খারাপ খবরটা ওর কানে গিয়েছে। ওটা আমিই বলব ওকে রয়ে সয়ে, আজ রাতে কিংবা কাল কখনও।

ওদের খাওয়া শেষ হলে আমি বললাম, “তোমরা দু'জন এবার একটু বিশ্রাম করো গিয়ে, আমিও শুয়ে নিই একটু।” তারপর নবারুণকে বললাম চোখে চোখ রেখে, “দুটো দিন থাকবে তো তুমি আমাদের সঙ্গে?”

নবারুণ আঙুল দিয়ে থালা থেকে টমেটোর চাটনি চেষ্টে মুখে পুরে বলল, “না শানু, আমি আজ রাতের ফ্লাইটে ফিরে যাব দিল্লি। জরুরি কিছু কাজ আছে আমার।”

“ওমা, এভাবে কেউ আসে কলকাতা? কাল তোমাকে নলেন গুড়ের পায়স খাওয়াব ভেবেছিলাম আমি।”

“এবার হবে না, পরে কখনও...” ও কথা শেষ না করে চলে গেল ওপাশের সিঙ্গে হাত ধুতে আর রূপক ঢুকে গেল বাথরুমে।

মালতী আমার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, “এই বাবুকে আগে তো কখনও দেখিনি বৌদিমণি। এ-ও কি ডাক্তার?”

“না, উনি একজন নামকরা লেখক, বিলেতে তোর দাদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। রিয়ার কামরাটা খুলে দে, ওখানেই গড়িয়ে নরেন উনি।”

ওরা দু'জন শুতে চলে গেলে আমিও গিয়ে শুয়ে পড়লাম গেস্ট রুমে, যেটা এখন আমার রোগ শয্যা। গোল্ডি একবার এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়াল, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম আমি। একটু পরে ও চলে গেল ব্যালকনিতে নিজের জায়গায়। চোখ বুজলাম

আমি কিন্তু ঘুম এল না চোখে। একবেলার জন্য নবারুণ কেন এল এখানে? যতই সম্ভাব হয়ে থাক ওদের মধ্যে, রূপক আমাকে কথা শোনাতে ছাড়বে না। ময়ালী ওকে ছেড়ে অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে জানলে ওর মেজাজ খিঁচড়ে যাবে আর তখন নবারুণকে নিয়ে ও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে। আমার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা কতটা এগিয়েছে, জানতে চাইবে ও। আমরা কি বিছানায় গেছি সে কথাটাও তুলবে ও নির্যাত। এই দুর্বল শরীর নিয়ে ঝগড়া করতে পারব না আমি। কাজেই মুখ বুজে সহ্য করতে হবে ওর বাকবাণ। রেগে গেলে ওর মাথা ঠিক থাকে না, কী বলতে কী বলে ফেলবে, তার ঠিক নেই। ও যদি এখন আমাকে ডিভোর্স দিতে চায়, আমি কী করব? কোথায় যাব আমি? নবারুণ কি আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে? ওর তো নিজেরই চলে না। বন্ধুর বাড়িতে চিলেকোঠার একটা কামরায় থাকে ও। কী করে উঠব গিয়ে ওখানে? আর আছে আমার দিদি লিপি। ও থাকে বরাহনগরে একটা একান্নবর্তী পরিবারে। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-ভাসুর-জা নিয়ে ওর সংসার। ওখানে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এখন মনে হচ্ছে, নবারুণের সঙ্গে ছুট করে এতটা এগিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি আমার। কিন্তু কী করব, রূপক ময়ালীর দিকে ওভাবে এগিয়ে না গেলে আমিও তো নবারুণকে প্রেমিক হিসেবে মনে নিতে রাজি হতাম না। একদিন কলকাতায় এসে নবারুণ আমার জীবন পাল্টে দিয়ে গেল। ও শুধু ময়দানে আমাকে পাঁচবার চুমুই খেল না, ও যে আমাকে প্রথম থেকেই ভালবাসে তাও জানিয়ে গেল। আমিও যে ওকে মনে মনে অনেক দিন ধরে ভালবাসি, তা-ও জানিয়ে দিয়েছিলাম সেই দিন।

কখন আমার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল জানি না, চোখ খুললাম কারও হাতের ছোঁয়ায়। চোখ মেলে দেখি নবারুণ। ও হাসছে, ওর হাতে একটা টেডি বিয়ার। আমি উঠে বসলাম।

“ঘুম ভাঙলাম তোমার,” বলল ও। “নাও এটা তোমার জন্য।” ও আমার কোলে রাখল টেডিটা।

“এটা দিয়ে আমি কী করব?” আমি বললাম ভ্রু কুঁচকে। “আমি কি বাচ্চা মেয়ে?”

“প্লেনে আমার পাশে বসেছিল একটা পঞ্জাবি মেয়ে, বাচ্চা নিয়ে। দিল্লিতে ওরা নেমে গেলে দেখলাম, এটা ফেলে গিয়েছে ওরা। ভাললাম এটা তোমার কাছেই থাক।”

নবারুণ আমার কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে আমার গাল টিপে দিল।

আমি সভয়ে তাকালাম দরজার দিকে; না, দরজা ভেজিয়েই এসেছে ও। “ও কোথায়?”

“রূপক এখন ফোনে কথা বলছে ওর কলিগদের সঙ্গে।”

“আর মালতী?”

“গোল্ডিকে ঘোরাতে নিয়ে বেরোল একটু আগে। সুযোগ পেয়ে, যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে একটু প্রেম করতে এলাম।” ও হাসল, তারপর আমার হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিল।

“এসব করার কী দরকার ছিল তোমার?” আমি বললাম হিসহিসিয়ে। “কী বলেছ তুমি ওকে যে, ও তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে এখানে টেনে নিয়ে এল?”

“যা বলার ছিল ওকে বলেছি।”

“হেঁয়ালি ছাড়ো, চটপট বলো কী কথা হয়েছে তোমাদের মধ্যে?”

“আমি তো আগেই জানিয়েছিলাম তোমাকে, কী বলব ওকে। আমি জানিয়েছি আমি তোমাকে ভালবাসি।”

আমার বুকটা ধড়ফড় করতে শুরু করল, মুখ শুকিয়ে গেল। পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে এক ঢোক জল খেললাম আমি। নবারুণ ওর নীল ব্রেকজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার ঠোঁট মুছিয়ে দিল।

“তারপরও ও তোমাকে এখানে নিয়ে এল? কেন?”

“দিল্লিতে প্লেন ল্যান্ড করলে ও এসে আমার সঙ্গে ইকোনমি ক্লাসে বসেছিল। তখনই বলেছিলাম কথাটা। ও বলল, ‘চলো,

শানুকে দেখে আসবে।”

“আমি একদম বিশ্বাস করি না তোমার কথা। ও দেবদূত নয়, সাধু-সন্তও নয় যে, নিজের বৌ-এর প্রেমিককে এভাবে...”

“ও হ্যাঁ, আরেকটা কথাও জানিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। ময়ালী নতুন প্রেমিক জুটিয়েছে।”

“ও কী বলল শুনে?” উত্তেজনা, ভয়ে আমার মনে হচ্ছিল হার্ট ফেল করব।

“ও বলল, ময়ালীকে চাকরি থেকে বের করার ব্যবস্থা করবে ও, খুব শিগগিরই।”

“তা করুক। কিন্তু এত খারাপ খবরটা শুনে ও তোমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এখানে নিয়ে এল? শোনো নবাবরূপ, আমার মনে হচ্ছে তুমি নিজেকে বিপদের মুখে টেনে এনেছ। মি. কারপেন্টার তোমার হাড় গুঁড়ো করার ব্যবস্থা করবে বলেই তোমাকে এখানে টেনে এনেছে। তুমি এবার কেটে পড়ো। চূপচাপ উপরে চলে যাও আর তোমার ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো। গ্রিন মিডোজ-এর গেটে গিয়ে ক্যাব ডেকে নাও। এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকো তুমি, এখানে আর নয়।”

“আমি তো ভাবছিলাম তোমাদের সঙ্গে বসে চা-টা খেয়ে, তারপর বেরোব।”

“এটা তোমার কমিক নভেল নয়, বিউ। প্লিজ আমার কথাটা ভাব তুমি। আমার কপালে যা দুর্গতি লেখা আছে, তা তো এড়াতে পারব না! কিন্তু তুমি কেন নিজেকে ঝামেলার মধ্যে টেনে আনছ? ও জিম করে এখনও, শক্তপোক্ত শরীর। তা ছাড়া ও হাড়ের ডাক্তার, টিবিয়া, ফিব্রা... কোথায় চোট দিলে তুমি ছ’মাস বাড়িতে শুয়ে ছটফট করবে, সেটা ভালভাবেই জানে।”

নবাবরূপ এবার আমার গাল টিপল না, একগাল হেসে আমার মুখটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে ঠোঁটে চুমু খেল, তারপর বলল, “রূপককে তুমি এখনও চিনতে পারনি শানু। ও খুব ভাল মানুষ। ও তোমাকে কিছু বলবে না, দেখে নিও তুমি।”

আমি কপাল চাপড়ে বললাম, “হায় ভগবান! বিশ বছর সংসার করলাম যে মানুষটার সঙ্গে, তাকে আমি চিনি না, তুমি চেন?”

নবাবরূপ বলল, “চলো, তোমার যখন আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার ইচ্ছে, আমি না হয় তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ব। এবার নাও, তোমার শ্রীচরণযুগল একটু দেখাও তো আমাকে সোনা।”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “আবার কী নাটক করবে তুমি?”

“নাটক করতেই তো এলাম এখানে। যেটুকু বাকি ছিল, সেটা পুরো করে দিয়ে যাই।”

আমি একবার তাকালাম ওর দিকে, তারপর আমার নীল, ফুলতোলা ম্যাক্সিটা একটু টেনে পা দুটো বের করলাম ওর সামনে। আমাকে হতবাক করে দিয়ে মুখ নীচু করে আমার দুই পায়ে ও চুমু খেল, তারপর পকেট থেকে বের করল একজোড়া রূপোর নুপুর।

“তোমার জন্য এটা কিনে রেখেছিলাম অনেকদিন আগে। আমার ব্যাগের নীচেই রাখা ছিল, ভেবেছিলাম কলকাতায় এলে নিজের হাতে তোমার পায়ে পরিয়ে দেব। এতদিনে সেই সুযোগ এল।”

আমার চোখে জল এসে গেল। তেতাল্লিশ বছরের এই জীবনে আমাকে ভালবাসা জানিয়েছে কত মানুষ, তার হিসেব রাখিনি কখনও। আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে প্রেমপত্র লিখেছিল একটি ছেলে, তখন আমি কলেজের থার্ড ইয়ারে। কিন্তু একজন নামী লেখক, যার উপন্যাস বিদেশে বিক্রি হয়, সে এসে আমার পায়ে চুমু দিয়ে নুপুর পরিয়ে দেবে... এমনটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। যত্ন করে নবাবরূপ আমার দু’পায়ে নুপুর পরিয়ে দিয়ে বলল, “শিজিনী হেঁটে গেলে শিঞ্জন উঠবে না, এটা কী করে হয়? ইচ্ছে ছিল তোমার দুই পায়ে আঙুলেও সোনার আংটি পরিয়ে দিই, সেটা আর হয়ে উঠল না।”

“তুমি সতিাই পাগল বিউ,” আমি বললাম ওর গালে হাত রেখে। “তুমি যা করলে, আজ পর্যন্ত কেউ করেনি আমার জন্য। রূপকও নয়। জানি না ও কী বলবে আমাকে, কিন্তু আমি কতটা খুশি

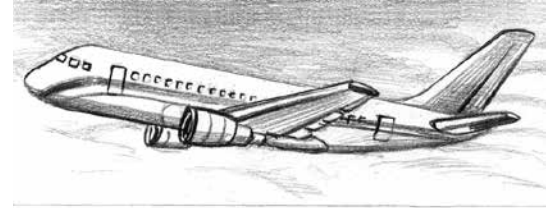
হলাম, সেটা নিশ্চয়ই আমার চোখের জল দেখেই বুঝতে পারছি।”

রূপাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নবাবরূপ উঠে দাঁড়াল। “এবার আমি বেরিয়ে পড়ি শানু, ঝামেলা বাড়িয়ে আর লাভ কী বলো?”

আমি ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম। “ঝামেলা যা হওয়ার হবে, আমি সামলে নেব। থাকো-ই না আর কিছু ক্ষণ, চা খেয়েই না হয় যেও।”

নবাবরূপ হেসে বলল, “না, আর বিলম্ব নয়। ওর সঙ্গে দেখা করাই যাব আমি।”

দশ মিনিট পরে রূপকের সঙ্গেই বেরিয়ে এল নবাবরূপ ওর ট্রলি ব্যাগ হাতে নিয়ে। আমি ওদের সঙ্গে নীচে যাওয়ার কথা বললে ওরা দু’জনেই সমস্তর আমাকে ‘না’ করে দিল। আমি গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালাম। ওরা লিফট থেকে নেমে বাইরে আসতেই প্রশান্ত গ্যারাজ থেকে গাড়ি নিয়ে এল। ওরা দু’জন কোলাকুলি করল, পরস্পরের পিঠ চাপড়াল, তারপর নবাবরূপ গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িতে ওঠার আগে ও একবার উপরে তাকাল আমাকে দেখতে। আমি হাত নাড়ালাম, ও হাত নাড়াল। যতক্ষণ গাড়িটা গ্রিন মিডোজ-এর গেট পেরিয়ে চোখের বাইরে চলে না গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ব্যালকনিতে। তারপর পায়েলের বুঁদ বুঁদ শব্দ তুলে আমি চলে এলাম আমার ঘরে।



নবাবরূপ

রেচেলের দেওয়া হাওয়ার্ড জ্যাকবসনের সেই রচনা সংকলনটির প্রথম লেখা ‘দ্য ডগস লাস্ট ওয়াক’ একটু আগেই শেষ করলাম। রাতের এই উড়ান-এ আমাকে বিরক্ত করার মতো কেউ নেই। উইন্ডো সিটে আমি, মাঝের সিটে কোনও যাত্রী নেই, ওপাশে আইল সিটে এক মধ্যবয়সি যাত্রী ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত। কমিক লেখকদের কাছে সকলে হাস্যরসের লেখা আশা করেন। কারণ তিনি তো কমেডিয়ান, তাঁর কাজ পাঠককে হাসানো। কিন্তু কমেডিয়ান কখনও কখনও মানুষকে কাঁদিয়ে থাকেন, যেমন জ্যাকবসন কাঁদালেন আমাকে তাঁর এই ছোট্ট তিন পাতার লেখাটি দিয়ে। এক মধ্যবয়স্ক মহিলা তাঁর বৃদ্ধ ল্যাব্রাডর কুকুরটিকে শেষবারের জন্য ঘোরাতে নিয়ে বেরিয়েছেন। কুকুরটি অসুস্থ, ওর পিছনের পায়ে আর্থারাইটিস থাকায় ও পা টেনে টেনে চলছে। কখনও বা বসে পড়ছে আর ওর মালিক সেই মহিলা ওর মাথায় হাত রাখছেন, ওকে সাহুনা দিচ্ছেন। যদিও তিনি বুঝতে পারছেন, এটাই ওর শেষ যাত্রা।

লেখাটা পড়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম। চোখের কোণায় যে একফোঁটা জল এসে গিয়েছিল, সেটা মুছবার কোনও চেষ্টা করলাম না। শিজিনীর পায়ে নুপুর পরিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে যে শেষ দেখা করে এলাম আমি, সেটাও বোঝিনি। এই সুন্দর দৃশ্যটা রূপকও দেখতে চেয়েছিল। আমিই ওকে মানা করেছিলাম। বলেছিলাম, ও হয়তো সন্দেহ করে বসবে যে আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি, কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। দুপুর দেড়টায় নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টে এসে কনভেইনার বেল্ট থেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লাগেজের অপেক্ষা করার সময়ই রূপককে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি ওর বাড়ি যাচ্ছি শুধু শিজিনীর সঙ্গে শেষ বার দেখা করতে। ওকে এটাও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি আমার মোবাইলের সিম চেঞ্জ করব দিল্লি ফিরে গিয়ে। যাতে ও আর কোনওভাবেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে পারে। শুনে রূপক আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে ছিল

পুরো দু’মিনিট, তারপর বলেছিল, “কী দরকার তোমার এত নিষ্ঠুর হওয়ার? ও খুব কষ্ট পাবে। থাক না তোমাদের মধ্যে এই দূরপাল্লার বন্ধুত্ব?”

আমি বলেছিলাম, “তাহয়নারূপক। তোমাদের দু’জনের মধ্যে যে ফাটল এসে গিয়েছে, সেটা জোড়া লাগাতে হলে আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে তোমাদের দু’জনের জীবন থেকে।” তারপর শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট থেকে সেই বিখ্যাত উক্তিটি ওকে শুনিয়েছিলাম – “আই মাস্ট বি ক্রুয়েল ওনলি টু বি কাইন্ড।” ও আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বলেছিল, “আই শ্যাল রিমেন গ্রেটফুল টু ইউ ফর এভার, নবারুণ।”

প্রহর শেষের আলোয় শিজিনীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টে আসার পথেই রেচেলের ফোনটা পেয়েছিলাম। ও জিজ্ঞেস করেছিল, “হ্যাড ইউ ল্যান্ডেড সেফলি অ্যাট ডেলি, ন্যাফ্রন?”

ওকে জানিয়েছিলাম, আমি কলকাতা গিয়েছিলাম, এবার ফিরছি নিজের ডেরায়।

“মেট ইউর লেডি লাভ আই সাপোজ?”

“ইয়া, অ্যান্ড ইউ ওয়াজ মাই লাস্ট ভিজিট।”

ও পাশে ক্ষণিক নিস্তব্ধতা, তারপর রেচেল জিজ্ঞেস করল, “কেন? ঝগড়া করেছ নাকি ওর সঙ্গে?”

“না, খুব ভাল ভাবে বিদায় নিয়েছি ওর কাছ থেকে।”

“কেন? কেন? কী হল তোমাদের মধ্যে? ওর হাজব্যান্ডের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাল রিলেশন হয়ে গিয়েছিল দেখলাম।”

“ইটস রাদার কমপ্লিকেটেড রেচেল। আই উইল টক টু ইউ লেটার। আমি সিম চেঞ্জ করছি দিল্লি গিয়ে, তোমাকে নতুন নম্বরটা কাল দিয়ে দেব।”

“ওঃ লর্ড! জানি না কীভাবে তোমাকে সাহুনা দেব। যে জন্য ফোন করা— একটা ভিডিও ইন্টারভিউ ফিল্ম করেছে তোমার, ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড-এর সঙ্গে। পরশু, গ্রিনিচ টাইম ইলেভেন থার্ড। বি ইন ইয়োর রুম অ্যান্ড বি প্রিপেয়ার্ড।”

“থ্যাংকস আ লট রেচেল। ইউ আর অ্যান অ্যাঞ্জেল।”

“সো সুইট অফ ইউ। টেক কেয়ার। বাই।”

আরও আধ ঘণ্টা পরে, রাত এগারোটা নাগাদ বিমান নামবে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। আমি বাইরে বেরিয়ে একটা ক্যাব ডাকব, ফিরে যাব গ্রেটার কৈলাশের সেই বর্ষাতিতে। বাড়িতে ঢুকে ব্যাগটা রেখে শুয়ে পড়ব আমি। কিন্তু তার আগেই রূপককে যেমন কথা দিয়েছি, মোবাইল খুলে সিমটা বের করে দু’টুকরো করে ফেলে দেব আমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। আগামীকাল দোকানে গিয়ে আধার কার্ড দেখিয়ে একটা নতুন সিম নিয়ে, যাদের সঙ্গে লেখার জন্য কিংবা ব্যক্তিগত কারণে যোগাযোগ রাখতে হয়, তাদের হোয়াটস অ্যাপে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেব— ‘আমার নতুন নাম্বরটা সেভ করে নাও তোমরা।’

এই লিস্ট থেকে বাদ পড়বে শুধু শিজিনী। ও হয়তো এক-দু’বার চেষ্টা করবে আমাকে ধরতে, না পেয়ে রাগ করবে, অভিমান করবে আমার উপর। তারপর একসময় পায়ের দিকে তাকিয়ে নুপুরটা দেখবে আর বুঝে নেবে যে, ওটাই ছিল আমার ফেয়ারওয়েল গিফট। প্রহর শেষের আলোয় যা আমি সম্বন্ধে ওর পায়ে বেঁধে দিয়ে এসেছি। কোনওদিন ওকে নিয়ে আমি হয়তো একটা উপন্যাসও লিখে ফেলব, যা শুরু হবে হাস্যরসাত্মক কিছু ঘটনা আর সংলাপ দিয়ে। শেষ হবে জ্যাকবসনের বৃদ্ধ কুকুরটির শেষ যাত্রার মতো একটি বিষাদাচ্ছন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে।





বলি FLASH

ভ্যালি অফ কিংস

আরব সাগর পাড়ের ইন্ডাস্ট্রিতে
রাজত্ব করেন তাঁরা। ভিন্ন
ঘরানার হিন্দি সিনেমায় রং
আনেন বিভিন্ন রকমের।
বলিউডের প্রথম সারির
নায়কদের তাই ধরা হল
রংয়ের কোলাজে

আমির খান

‘লাল সিং চড্ডা’
ব্যবসা করতে
পারেনি, কিন্তু আমির
সব সময় তৈরি
থাকেন বক্স অফিসে
দৌড়ের জন্য। হাতের
স্কেটবোর্ডটা
দেখছেন না?



শাহরুখ খান

হিন্দি সিনেমার
ইতিহাস আবার
লেখা হলে, তাঁর
সম্পর্কে একটাই
বিশেষণ ব্যবহৃত
হবে। ফিনিশ! পুড়ে
গিয়েও কীভাবে
স্বমহিমায় ফিরে
আসা যায়, তা তো
তিনিই দেখাচ্ছেন
এবছর! তিনি
'পাঠান', তিনিই
'জওয়ান'!

সলমন খান

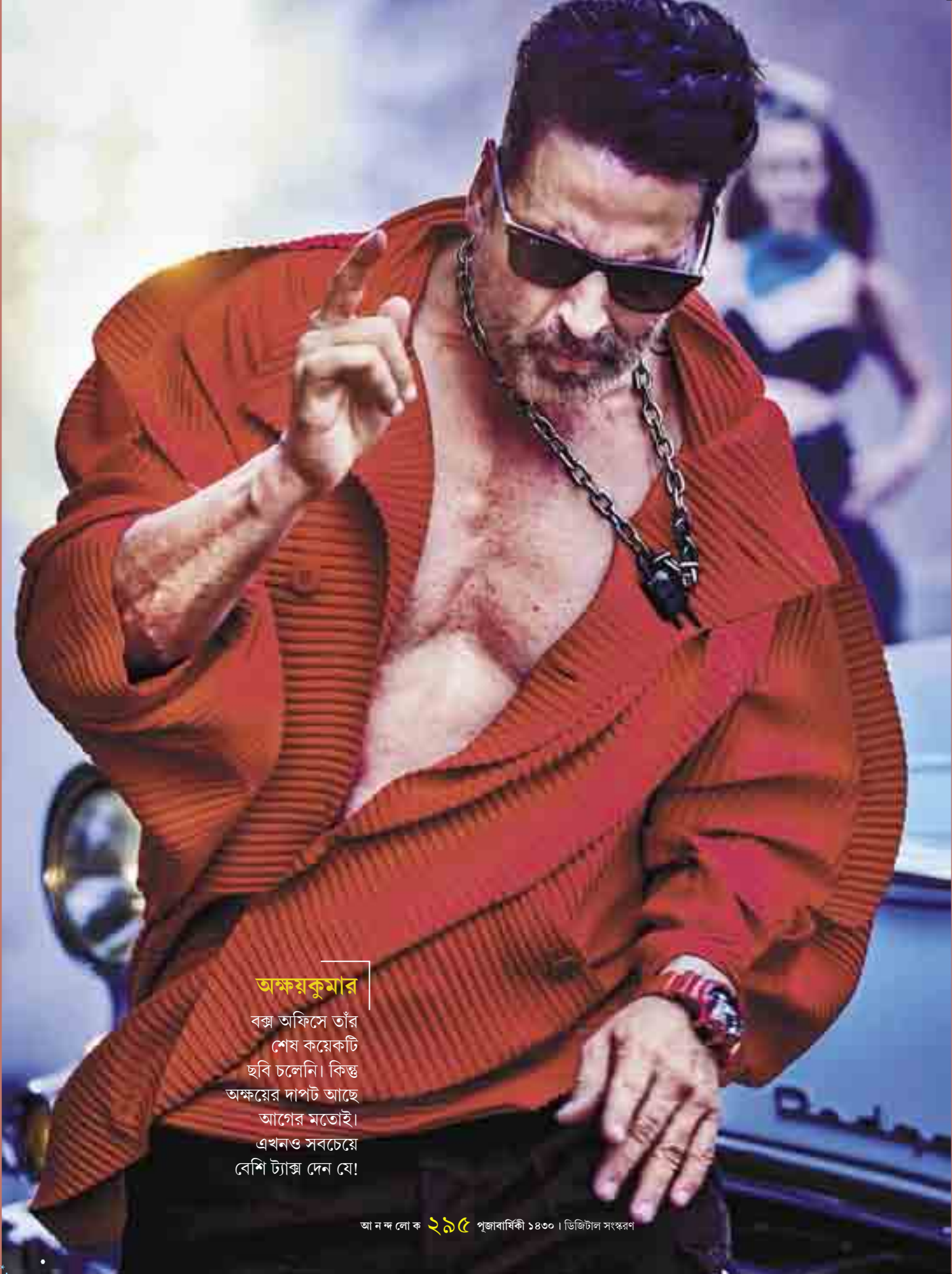
তাঁর বয়স বাড়ে, কিন্তু
তিনি বাড়েন না। এখনও
একইরকম রগচটা,
আবেগপ্রবণ, বন্ধুবৎসল
ভাইজান হয়েই রয়ে
গিয়েছেন তিনি।
এই স্বভাবের জন্য
'নারীবর্জিত' জীবনেও
তিনি সকলের জান।





অজয় দেবগন

দৃষ্টি দেখছেন? সবসময়
মাটির দিকেই থাকে।
আসলে 'দৃশ্যম'-এর
বিজয় সালগাওকরের
চরিত্রকে আত্মস্থ করে
নিয়েছেন অজয়।
মাটির দিকে তাকিয়েও
আকাশ ছুঁতে
পারেন তিনি।

A man with a beard and sunglasses, wearing a red ribbed sweater, is pointing his right index finger towards the camera. He is wearing a thick chain necklace and a watch on his left wrist. In the background, a woman in a blue and white outfit is visible, and the front of a car is partially seen.

অক্ষয়কুমার

বক্স অফিসে তাঁর
শেষ কয়েকটি
ছবি চলেনি। কিন্তু
অক্ষয়ের দাপট আছে
আগের মতোই।
এখনও সবচেয়ে
বেশি ট্যাক্স দেন যে!



সেফ আলি খান

তিনি এখনও বিশ্বাস করেন
'স্লো বাট স্টেডি' শব্দবন্ধে।
তাই তো 'আদিপুরুষ'-এ
রাবণ হিসেবে সমালোচিত
হলেও, তিনি নিজের
লক্ষ্যে স্থির। 'বিক্রম' সুলভ
রাজকীয় মেজাজটাই রাজা



শাহিদ কপূর

চোখের ভাষা
দেখেছেন? যেন
সেই সমালোচকদের
প্রতি শ্লেষ হানছেন,
যাঁরা এখনও তাঁকে
আন্ডাররেটেড
বলেন।

হত্বিক রোশন

পিছনের ওই সিঁড়িটি
দেখতে পাচ্ছেন? ওটি
সাফল্যের... ঋত্বিক যে ঠিক
কত বড় মাপের ফাইটার,
তা তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ
দেখলেই বোঝা যায়।
পরিশ্রম দিয়ে সাফল্যের
সিঁড়িতে সুপারহিরোসম
লাফ দিয়েছেন তিনি।

রণবীর কপূর

জামার আড়াল থেকে
সিন্ধু প্যাক উকি
মারছে বটে, কিন্তু
রণবীরের যাবতীয়
চুম্বক তো চোখে... ওই
গভীর দৃষ্টি প্রমাণ করে,
হৃদয়ে জায়গা করে
নিতে সুগঠিত শরীরের
দরকার পড়ে না।



রণবীর সিংহ

বৈচিত্র্যময়তার শেষ
কথা তিনি। তাই তো
ভাই থেকে প্রেমিক
হয়ে খলনায়ক... সব
চরিত্রের আত্মাকেই
টোটাম হিসেবে ধারণ
করতে পারেন।

বরুণ খওয়ান

ওই তির্যক চাহনিকে
অহংকার বলে
ভাববেন না। ওটা
আত্মগরিমার প্রকাশ
মাত্র। বরুণকে এই
আত্মগরিমা দিয়েছেন
তো প্রযোজকরা।
বরুণ তাঁদের নিরাপদ
বাজি যে।



আয়ুস্মান খুরানা

তিনি কি ভাল স্ক্রিপ্ট
খোঁজেন, নাকি স্ক্রিপ্টই
তাঁকে খুঁজে নেয়?
আয়ুস্মান যেভাবে
বক্স অফিসে সোনা
ফলাচ্ছেন, তাতে তাঁর
নাম মিডাস হলে ক্ষতি
নেই। তা হলে তিনি
সার্থকনামাই হবেন।

রাজকুমার রাও

কী ভাবছেন
অভিনেতা? এই
সাধারণ দেখতে
চেয়ারটি কি বলিউডের
এক নম্বর হওয়ার
মসনদ? রাজকুমার
যেভাবে এগোচ্ছেন,
তাতে এই সিংহাসন
দখল হয়তো
সময়ের অপেক্ষা।

কার্তিক আরিয়ান

ছবিতে বিশেষ একটি
মুদ্রার দিকে ফোকাস
করুন। কার্তিক গালের
কাছে আঙুলটি ধরেছেন
বটে, কিন্তু এক নম্বর
বোঝাচ্ছেন। বক্স
অফিস রিপোর্ট কিন্তু
বলছে, কার্তিক
এগিয়ে গিয়েছেন
তাঁর সমপ্রজন্মের
নায়কদের চেয়ে।



সিদ্ধার্থ মলহোত্র

করোনাকাল তাঁর
কেরিয়ারে গতি
এনেছে। সিদ্ধার্থ প্রমাণ
করে দিয়েছেন, তিনি
শুধু ‘গুচি-প্রাডা বয়’
নন, অভিনয়ের দিক
থেকেও ‘শেরশাহ’!

টাইগার শ্রফ

না, পোশাক জিনিসটা
তাঁর শরীরের সঙ্গে
যায় না। বাকিরা
ফ্যাশন বলতে ভাল
ক্লেডিং লাইন বোঝেন,
টাইগার বোঝেন
দেহসৌষ্ঠব!



ভিকি কৌশল

ক্যাটরিনাকে বিয়ে
পর থেকে নাকি
পুরোপুরি বাড়িমুখো
হয়ে গিয়েছেন ভিকি!
কাজের পরে বাইরে
থাকতেই চান না!
এই ছবিটা কি
বেডরুমে তোলা?



ওটিটি-র ‘বাস্তবতা’

বাস্তবকে আধার করে তৈরি হচ্ছে নানা ওটিটি-সিরিজ। মানুষও যেন সেগুলোই ভালবাসছেন বেশি। কী হতে পারে এর কারণ? অনুসন্ধানে সংবেদী চক্রবর্তী

ফেলুদার কোন গল্পে মনে নেই, লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, ‘টুথ ইজ স্ট্রংগার দ্যান ফিকশন’। তোপসে তখন ভুল শুধরে দিয়ে বলেছিল— স্ট্রংগার নয়, কথাটা হবে স্ট্রেঞ্জার। এখনকার ওয়েব কনটেন্ট দেখলে লালমোহনবাবুর কথাটাকে খুব ভুল বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাস্তব জীবনকে আধার বানিয়ে যেসব সিরিজ তৈরি হচ্ছে ওয়েবের জন্য... সেগুলো ‘স্ট্রেঞ্জ’ তো বটেই, ‘স্ট্রং’ও কি কম? বেশিরভাগ সিরিজেরই বিষয়বস্তু হচ্ছে ‘টু ক্রাইম’, অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যেসব অপরাধ ঘটে গিয়েছে। সেসব সিরিজের বিষয় বলুন বা মেজাজ, সবই রীতিমতো কড়া সুরে বাঁধা! এবং সেগুলো রীতিমতো ভালবেসে দেখেন মানুষজন! অবশ্য শুধু ‘টু ক্রাইম’ই নয়, যেসব গল্প মানুষের উত্তরণের কথা বলে, সেগুলোর কদরও কম নয়। আসল কথা একটাই, বানানো গল্পের চেয়ে বাস্তব জীবনের গভীর সত্যগুলোতেই দর্শকের ঝোঁক বেশি। এটা যাকে বলে পরীক্ষিত সত্য। কী হতে পারে

এর কারণ?

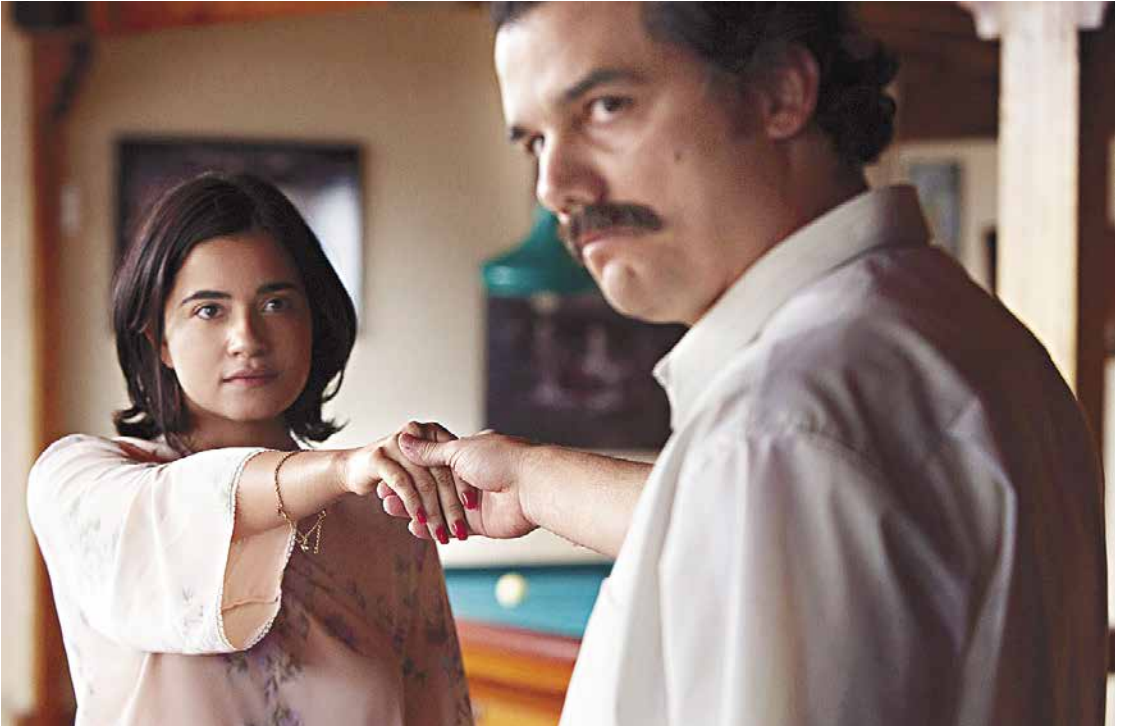
জীবন যখন অনুপ্রেরণা

আমাদের আশপাশে বিখ্যাত-অখ্যাত এমন অনেক মানুষজন রয়েছে, যাঁদের জীবন আমাদের কাছে আলোর দিশারি হয়ে উঠতে পারে। এবং তাঁদের নিয়ে দর্শকের জন্য কনটেন্ট তৈরি হওয়াও নতুন কিছু নয়। সেই নির্বাক যুগ থেকে পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রকে আশ্রয় করে ছবি বানাতেন নির্মাতারা, তা তো তাঁদের গল্পগুলো যাতে দর্শকের মনে জোর জোগায়, তার জন্যই। পুরাণ-আশ্রয়ী সেই ছবিগুলোকেই প্রথম যুগের বায়োপিক বললে খুব ভুল কিছু হবে কি? তার কিছু



■ ‘সেলফ মেড’ সিরিজের দৃশ্য

দশক পরে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আসে দেশভক্তিমূলক ছবি বানানোর ঢেউ... যার একটা বড় অংশ ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জীবনকে আধার করে বানানো ছবি। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, স্বাধীনতার পরে দেশের টালমাটাল আর্থ-সামাজিক অবস্থার ফেরে পড়া দর্শকের মুমূর্ষু মনে



■ ‘নার্কোজ’ দর্শককে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভিতর থেকে

উদ্দীপনার সঞ্চার করাও ছিল এসব ছবির উদ্দেশ্য। এসব বাদ দিলে ছবির দুনিয়ায় ‘তথ্যচিত্র’ এবং ‘কল্পচিত্র’র ভাগটা খুব স্পষ্ট ছিল, মোটামুটি নয়ের দশকের শেষ অবধি তো বটেই। যদিও সত্যি ঘটনাকে কাঠামো হিসেবে রেখে কল্পচিত্র নয়ের দশকেও হয়েছে, যেমন ‘বর্ডার’, বা তারও আগে ‘এক ডক্টর কী মওত’। তবে তখনও তা ট্রেন্ড হয়ে ওঠেনি। একবিংশ শতকে শুরু হয় ‘বায়োপিক’ অর্থাৎ জীবন-অনুসারী ছবির ট্রেন্ড। খেলোয়াড়, রূপোলি পর্দার তারকা, বিজ্ঞানী, সেনাবাহিনীর জওয়ান থেকে নেহাত সাধারণ মানুষ... এমন সব লোকেদের গল্প বেছে নিতে শুরু করলেন নির্মাতারা, যাঁদের জীবন থেকে কোনও-না-কোনওভাবে প্রেরণা পাবেন সাধারণ মানুষ। অথবা যাঁদের জীবনে কোথাও উত্তরণ রয়েছে। ‘দঙ্গল’, ‘মেরি কম’, ‘নীরজা’, ‘সঞ্জু’, ‘শকুন্তলা’ থেকে হালফিলের ‘গুঞ্জন সান্সোনা: দ্য কার্গিল গার্ল’ বা ‘রকেট্রি’র মতো ছবিগুলোই তার প্রমাণ। ক্রমে সিনেমা হলের পাশাপাশি ওটিটি এল আমাদের জীবনে... এবং ছবির পাশাপাশি এল সিরিজ। তার কয়েক বছরের মধ্যেই এল কোভিড-কাল। রোগ, পেশাগত অনিশ্চয়তা, কাছের মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা... সব কিছুই সঙ্গে লড়তে লড়তে, ক্রমে সব আশা হারিয়ে ফেলতে শুরু করলেন বহু মানুষ। বাড়ি থেকেও বেরোনোর উপায় ছিল না বলে অনেকেরই সময় কাটানোর একমাত্র মাধ্যম তখন হয়ে উঠেছিল স্মার্টফোন-

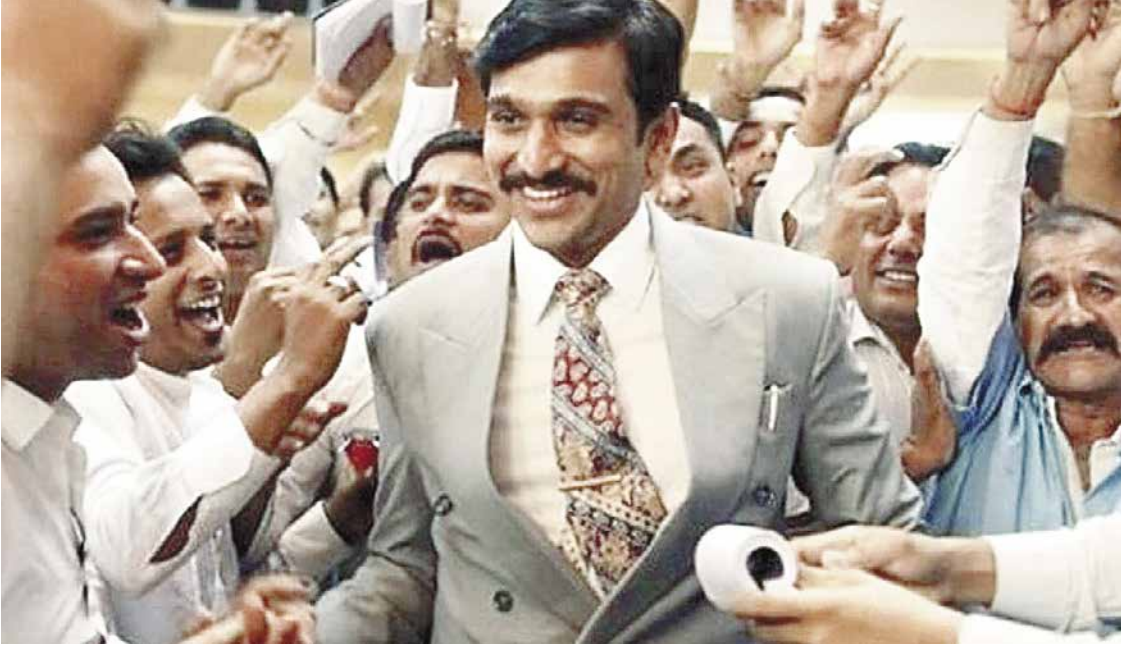
এমন সব লোকেদের গল্প বেছে নিতে শুরু করলেন নির্মাতারা, যাঁদের জীবন থেকে কোনও-না-কোনওভাবে প্রেরণা পাবেন সাধারণ মানুষ। অথবা যাঁদের জীবনে কোথাও উত্তরণ রয়েছে

ট্যাব-টিভি। ‘সেলফ মেড: ইনস্পায়ার্ড বাই দ্য লাইফ অফ ম্যাডাম সি জে ওয়াকার’, ‘কাফির’, ‘দ্য ফরগটেন আর্মি: আজাদি কে লিয়ে’র মতো সিরিজগুলো সব এই ২০১৯-’২০ সময়সীমার মধ্যেই। এবং সবগুলোই কোথাও গিয়ে আশা না হারানোর, উদ্যম বজায় রাখার গল্প বলে। ‘কাফির’-এর লেখক ভবানী আইয়ার তো বলেইছিলেন, মূল চরিত্র শেহনাজের ব্যাপারে শোনার পর তিনি আরও অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন। কারণ, “বুঝতে চেয়েছিলাম, কী চলছিল ওর মনের মধ্যে। কী সেই শক্তি, যা ওকে এত বছর ধরে জোর জুগিয়েছে। সব যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন কোন আশা আঁকড়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!” ‘রিয়্যাল লাইফ ইনস্পায়ার্ড ওয়েব সিরিজ’-এর অনেকগুলোরই প্রধান চরিত্র এই ধরনের মানুষের প্রতিনিধি।

রহস্যের সন্ধানে...

অমুক লোক কোটি কোটি টাকার স্ক্যাম করছে, তমুক সাধুর বিরুদ্ধে ভণ্ডামির অভিযোগ আনছে অগণিত মানুষ, স্ত্রীয়ে র সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় স্বামী খুনই

করে ফেলল বন্ধুকে, মাদক-মাফিয়া, অস্ত্র-মাফিয়া... এসবে আমাদের কারও কৌতুহল কম নেই, সে মুখে যে যা-ই বলুন! খবরের কাগজে এসব রোমহর্ষক খবরই সকলের আগে পড়ি আমরা। আড্ডায়-আলোচনায় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলি এদের নিয়ে। ইন্টারনেটের দৌলতে যেটুকু যা তথ্য এদের ব্যাপারে পাই, নিজেদের মতো জোড়াতালি দিয়ে মনে মনে বোঝার চেষ্টা করি— আসলে কী হয়েছিল এদের? সেই সত্যি গল্পগুলোই যদি কেউ খেটেখুটে, তথ্যনিষ্ঠ হয়ে, কখনও বা তথ্যের সঙ্গে প্রয়োজনমতো ড্রামা মিশিয়ে পর্দায় তুলে ধরেন... তখন সেগুলো দেখতে গিয়ে পর্দা থেকে চোখ সরে না আর! ‘নার্কোজ’, ‘ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড কান্ট্রি’, ‘দ্য ভার্ডিক্ট: স্টেট ভার্সেস নানাবতী’ বা ‘স্ক্যাম ১৯৯২’-র মতো সিরিজগুলো তো তাই এত জনপ্রিয়! কীভাবে সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে অপরাধী, উদ্ধার মতো উড়তে উড়তে কীভাবে কেউ আছড়ে পড়ে মাটিতে, যড়রিপুর কাছে কীভাবে কেউ সঁপে দিয়েছে সুখ, সাফল্য... এসবে যা থ্রিল রয়েছে, বানানো গল্পে তা কোথায়? এই ধরনের সিরিজও দু’রকমের হয়... এক, ডকু-সিরিজ,



■ ‘স্ক্যাম’-এ হর্শদ মেহতার জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয় স্ক্রিনে



■ ‘ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড কান্ট্রি’ অন্যতম জনপ্রিয় ডকু সিরিজ

যেখানে সত্যিকারের ফুটেজ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিই হল কনটেন্ট। দুই, ড্রামা-সিরিজ, যেখানে তথ্যগুলোকে পরিবেশন করা হয় গল্পের মোড়কে মুড়ে, প্রয়োজন মতো ড্রামার টক-বাল মিশিয়ে। রহস্যের জট পাকানো এবং জট ছাড়ানো... দুই-ই পরম পরিভূষিত দেখি আমরা।

নরখাদকের কবলে

যখন বাস্তব অনুসারী ছবি-সিরিজ বা অন্তর্জালের তথ্যভাণ্ডার আমাদের জীবনে ছিল না, খবরের কাগজেই ছিল একমাত্র ভরসা... তখনও কাগজে স্টোনম্যানের খবর পড়ে শিউরে ওঠার কথা মনে করতে পারবেন অনেকেই। তারও আগে, ‘জ্যাক দ্য রিপার’-এর গল্প শুনে আমরা ভয়ও পেয়েছি, আবার জানতেও চেয়েছি তার ব্যাপারে। ‘হরর’ পড়তে বা দেখতে আমরা অনেকেই ভালবাসি। সেই হররের উপাদান

যখন বাস্তব থেকে উঠে আসে, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি ভয় ধরায়, অনেক বেশি ধাক্কা দেয়। ভাবুন তো, একটা বড়সড় হাসিখুশি পরিবার, হঠাৎ এক সকালে দেখা

কেউ আছড়ে পড়ে মাটিতে, ষড়রিপুর কাছে কেউ সাঁপে দিয়েছে সুখ, সাফল্য... এ সব যা থ্রিল রয়েছে, বানানো গল্পে তা কোথায়?

গেল সেই পরিবারের সকলে মিলে আত্মহত্যা করেছে! কিংবা বারে গিয়ে দুটো মানুষের আলাপ হল, একজন অন্যজনকে বাড়িতে নিয়ে আসছে... ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্য নয় কিন্তু, নির্মমভাবে তাকে খুন করার জন্য! ‘টু ক্রাইম’ এক দিকে যেমন রোমাঞ্চকর হতে পারে, তেমনই সিরিয়াল কিলিং, অ্যাবিউজ ইত্যাদির মতো

■ ‘সার্পেন্ট’-এর অভিনেতারা





■ ‘কাফির’ একটি অনুপ্রেরণা মূলক সিরিজ



■ ‘নীরজা’ ছবিতে সোনম কপূর

ভয়-ধরানো জিনিসও খুব কম রয়েছে। আর এই সব ক্রাইমের তীব্রতা এত ভয়ানক ও জটিল যে, বড় পর্দায় কেউ দেখাতেই পারবে না। ওটিটি-তে সেন্সরশিপের চাপ নেই, অতএব সেটাই হল সবচেয়ে উপযোগী মঞ্চ! আর যদি ভায়োলেন্স কমও থাকে, তা হলেও সিরিজে বিষয়গুলোর অনেক গভীরে পৌঁছনো যায়, কারণ সিনেমার চেয়ে সিরিজে সময়ের পরিসরও অনেক বেশি। ‘ডামার-মনস্টার: দ্য জেফ্রি ডামার স্টোরি’, ‘হাউস অফ সিক্রেটস: দ্য বুরারি ডেথস’ বা ‘দ্য সাপেন্ট’-এর মতো সিরিজ দেখে যেমন হাড় হিম হয়ে যায়, তেমনই নির্মাতাদের মনশিয়ানা ও ডিটেলিংয়ের প্রতি যত্ন দেখে মুগ্ধ না হয়েও পারি না! এখানেও কোনওটা

ওটিটি-তে সেন্সরশিপের চাপ নেই। যদি ভায়োলেন্স কমও থাকে, তা হলেও সিরিজে বিষয়গুলো বিষয়ের অনেক গভীরে পৌঁছনো যায়

ডকু-সিরিজ, কোনওটায় মেশানো হয়েছে প্রয়োজন মতো ড্রামা। সেই ফেলুদা, জয়ন্ত-মানিক পড়ার বয়স থেকেই খুনোখুনির সঙ্গে পরিচিত আমরাও, এখন বড়বেলায় এই সব খুনোখুনি দেখে শিউরে উঠি প্রতি মুহূর্তে। আবার ‘তারপর কী হল’ জানার লোভও



■ শিউরে উঠি ‘ডামার মনস্টার’কে দেখে

সামলে রাখতে পারি না। লীনা যাদব যেমন ‘বুরারি ডেথস’ নিয়ে তথ্যচিত্র বানানোর কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন— অনেক প্রশ্নের উত্তর পাননি বলে সেগুলো খুঁজতে চেয়েছিলেন আসলে। বানানো গল্প যতই সুন্দর হোক, দিনের শেষে সেটা বানানোই। তাতে যতই ঘটনার ঘনঘটা থাকুক, বাস্তবের আলো-ছায়া, রাস্তা-গলির অ্যাপিল তার চেয়ে বেশিই হয় দর্শকের কাছে। ওটিটি-দুনিয়া সেটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে বার বার... এবং তা ভবিষ্যতেও দেবে! আর আমরা সেসব কাহিনি গোগ্রাসে গিলব।

দক্ষিণ খোলা জানলা

দক্ষিণ ভারতীয় ছবিকে
অগ্রাহ্য করার আর
কোনও জায়গা নেই।
দক্ষিণী তারাদের
উপস্থিতি এখন
আমাদের প্রাত্যহিক
বিনোদনের সঙ্গে
জড়িয়ে গিয়েছে।
কারণ, তাঁরা যে এখন
দক্ষিণ থেকে সারা
ভারতের আকাশে
ছড়িয়ে পড়েছেন...

রামচরণ তেজ

চিরঞ্জীবীর সুপুত্র 'নাটু
নাটু'-তে সারাবিশ্বকে
নাচিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে
স্থিতিধীর মতো।
আসলে সর্বভারতীয়
তারকা হিসেবে নিজের
অবস্থান সম্পর্কে আর
যে কোনও দ্বিধাই নেই।

রশ্মিকা মন্দানা

রশ্মিকার সময়টা ভাল
যাচ্ছে। অমিতাভ বচ্চনের
পর রণবীর কপুরের সঙ্গে
অভিনয় করছেন হিন্দি
ছবিতে। আবার দক্ষিণী
ছবিতেও উত্তরোত্তর
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
তাঁর পরিশ্রম করার
ক্ষমতা নাকি ঈশ্বরীয়।

সাই পল্লবী

একে ডাক্তার, তার
উপর সু-অভিনেত্রী
এবং তার চেয়েও
ভাল নৃত্যশিল্পী...
সাই পল্লবীর ট্যালেন্ট
বিস্ময়ের সঙ্গে
সম্মমেরও দাবিদার।
তেমনই প্রশংসনীয়
তাঁর সারল্য।



অল্লু অর্জুন

পরদায় তিনি যতই
দাড়িতে হাত ঘষে ভয়
দেখানোর চেষ্টা করুন
না কেন, আদতে নেহাত
সাধাসিধে ফ্যামিলি ম্যান।
তাই মানুষের ভিড়ে মিশে
যেতে সংকোচ বোধ
করেন না। কে বলবে, এই
সাধারণ মানুষটা পরদায়
'ফ্লাওয়ার' নন, 'ফায়ার'!

ধনুষ

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা
দিয়ে বাড়ছে তাঁর চার্ম।
ঐশ্বর্য্য রজনীকান্তের সঙ্গে
বিচ্ছেদ নিয়ে সাময়িক
টালমাটাল হয়েছিল
তাঁর জীবন। কিন্তু
মনের মানুষকে ফিরিয়ে
এনেছেন ধনুষ। নায়িকার
মন জয় করতে না পারলে
আর নায়ক কিসের!

সমাস্থা রুথ প্রভু

লড়াই করছেন অটো-
ইমিউন রোগের
সঙ্গে। আবার করছেন
মারকাটারি অ্যাকশন
সিরিজে অভিনয়।
সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত
জীবনেও স্যাম যেন
একজন যোদ্ধা। আর
সেই যুদ্ধে তিনি
হারতে নারাজ।

A portrait of actor Fahad Fasil, a man with a dark beard and mustache, wearing a dark button-down shirt. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background is a warm, dimly lit room with wooden furniture and framed pictures on the wall.

ফাহাদ ফাসিল

ছোট বাজেটের মলয়ালাম
ছবি হোক বা 'বিক্রম'-
এর মতো বিগ বাজেট
তামিল ছবি, ফাহাদ
ফাসিল এখন অপরিহার্য।
চোখেই যেন বিশ্বাসের
আশ্বাস নিয়ে বসে
আছেন এই অভিনেতা।

বিজয় সেতুপতি

তিনি যা-ই করেন,
দর্শকের পছন্দ হয়।
'সুপার ডিলাক্স'-এ
রূপান্তরকামী বা
'বিক্রম বেদা'র নৃশংস
খলনায়ক, বিজয়ের
বিজয়রথ থামার
কোনও চিহ্নই নেই।
তাঁর সঙ্গে অভিনয়
করতে বুক কাঁপে
তাবড় স্টারদের।

দুলকর সলমান

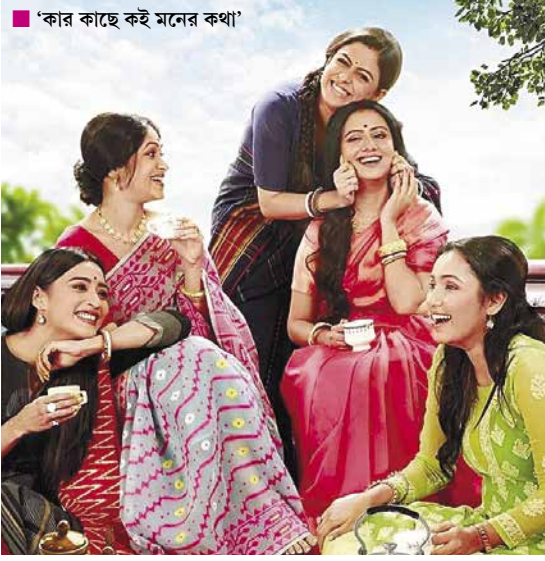
সুপুরুষ, স্টারকিড,
সফল... অথচ
অহংকারের লেশমাত্র
নেই তাঁর চোখেমুখে।
তাই এই বাজারেও
'সীতা রামম'-এর
মাধ্যমে প্রেমকাহিনিতে
বিশ্বাস ফিরিয়ে
আনতে পেরেছেন
একমাত্র দুলকর।

তমন্না ভাটিয়া

দক্ষিণ জয় তো
করেছেন অভিনয়
দিয়ে। আবার জয়
করেছেন বিজয়
ভর্মার মনও। তমন্না
যেন দক্ষিণ ও পশ্চিম
ভারতের মধ্যে খুঁজে
পেয়েছেন যোগসূত্র।
এক প্রান্তে তাঁর কর্ম,
অন্য প্রান্তে মন।



■ ‘কার কাছে কই মনের কথা’



■ ‘বাংলা মিডিয়াম’ অন্য ধরনের গল্প বলে



■ ‘জগদ্ধাত্রী’র জনপ্রিয়তা ঈষণীয়



গল্প যখন ছকভাঙা

কেউ শত বাধা পেরিয়ে গান গাইতে চায়। কেউ হতে চায় পুলিশ। কেউ জুনিয়র আর্টিস্ট, কিন্তু স্বপ্ন, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হওয়ার। বাংলা সিরিয়ালে ছকভাঙা মেয়েদের গল্প লিখেছেন অচ্যুত দাস

না, সে দিন আর নেই। বাংলা সিরিয়ালের নারী চরিত্ররা এখন আর শুধু স্বামী-সংসার-সন্তান সামলে স্বশ্রবণাড়ির গল্পনা সহ্য করে না। শাশুড়ি-বৌমার অতি চেনা ছকের বাইরে বেরিয়ে মেয়েদের নিজেদের জীবনের গল্প বাংলা সিরিয়াল বলার চেষ্টা করছে আজ অনেক দিন ধরেই। এদেশে এখনও একটা মেয়ের জীবন যথেষ্ট কঠিন, সফল মেয়ের জন্য তা আরওই বেশি।

এমতাবস্থায় সমস্ত বাধা পেরিয়ে ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া লড়াকু মেয়েদের কথা বলছে কোন সিরিয়াল? দর্শক কি সেগুলো দেখছেন?

সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যা

ফেলে আসা সময়ে মেয়েদের দিনকাল কেমন ছিল, তা নিয়ে এই



■ 'তুঁতে' সিরিয়ালের পোস্টার



■ 'বাংলা মিডিয়াম' বেশ জনপ্রিয় হয়

বাংলায় কম সিরিয়াল হয়নি। সে 'পৌষ ফাগুনের পালা' হোক বা 'সুবর্ণলতা', এদের গল্পে আমরা দেখেছি দেড়শো-দুশো বছর আগের বাংলায় মেয়েদের জীবন। বাংলার প্রথম টেলি-ধারাবাহিক 'জননী' থেকে শুরু করে 'এক আকাশের নীচে' হয়ে পরবর্তীকালে 'ইষ্টিকুটম', ভর সঙ্কের বাংলা টেলি-ধারাবাহিকে নারী চরিত্ররা বরাবরই দর্শক হৃদয়ে জ্বলজ্বল করেছে। এই সময়টায় মোটের উপর দেখা গিয়েছে, মানুষ টিভির পরদার ধারাবাহিকে পছন্দ করেছেন যৌথ পরিবারে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ঘরোয়া মেয়েটিকেই।

কেউ শিল্পী, কেউ শিক্ষক

এই জায়গা থেকে সরে এসে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার তাগিদ থেকেই বাংলা সিরিয়ালে মেয়েদের অবস্থান বদলাতে শুরু করেছে। 'মাধবীলতা' সিরিয়ালে যেমন মুখ্য চরিত্রের মেয়েটির লড়াই ছিল সংসার সামলানোর নয়, গাছ বাঁচানোর! কিংবা বুননশিল্পে পারদর্শী গ্রামের মেয়ে তুঁতে। 'তুঁতে' সিরিয়ালের এই কেন্দ্রীয়

চরিত্রের চোখে ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্ন। পুরনো শাড়ি কিনে তুঁতে তা থেকে দুর্দান্ত পোশাক বানিয়ে ফেলে নিমেষে। কিংবা ধরুন, 'বাংলা মিডিয়াম'। এই গল্পের মুখ্য চরিত্র গ্রামের মেয়ে ইন্দ্রিরা। গ্রামের স্কুলে ইন্দ্রিরা বিজ্ঞান পড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় হয়ে ওঠে অল্প দিনে। বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে সে বিজ্ঞান পড়ানোর সুযোগ পায় শহরে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।

কেউ ডাক্তার, কেউ পুলিশ

মেয়েরা হবে শান্ত, লাজুক। পুরুষের পাশে থেকে সে শুধু সংসারের শোভা বাড়াবে, দায়িত্ব সামলাবে আর অলস সময়ে গা ভাসাবে পরনিন্দা, পরচর্চায়। এই বাস্তব কবে ছিল জানা নেই, কিন্তু সিরিয়ালের গল্পে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই গল্প দেখানো হয় আজও। জেনে বা না জেনে, ঘরে ইতিমধ্যেই বৌ এনে বা না এনে একটা দুটো তিনটে বিয়ে করে ফেলছে কেউ, এ-ও দেখানো হচ্ছে আকছার। এসবের মাঝে আশা দেখাচ্ছে যে সিরিয়ালগুলো, তাদের মধ্যে বলব 'এক্সা দোক্ক'-র নাম। এই গল্পে সেনগুপ্ত পরিবারের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ে পোখরাজ সেনগুপ্ত। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেখানে পড়ে একটি মেয়েও, রাধিকা মজুমদার। 'গুড্ডি' সিরিয়ালে আবার মুখ্য চরিত্র, দার্জিলিংয়ের মেয়ে গুড্ডি মোটেই লেখাপড়া শিখে বিয়ে থা করে, সুখে সংসার করাকে জীবনের সার্থকতা মনে করে না। তার স্বপ্ন একজন সফল পুলিশ অফিসার হওয়ার।

দশ হাতে দশ দিক

দেবী দুর্গার মতো মেয়েদের হতে হবে দশভুজা। দশ হাতের এক একটি দিয়ে তারা ঘর সামলাবে, আবার ঘরের বাইরেও



রেগুলার প্লটের বাইরে গিয়ে কাজ করছি এক মাত্র আমি এবং সেটা অনেক দিন ধরেই। এ প্রসঙ্গে সবার আগে বলব, ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিরিয়াল 'মাধবীলতা'-র কথা। লঞ্চ করার পর সারা বাংলায় টিআরপি-তে সেটা এক নম্বরে ছিল। 'মাধবীলতা'র মুখ্য চরিত্র গ্রামের এক জন মেয়ে, যে গাছ বাঁচানোর লড়াই চালাত। সিরিয়ালটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন, সেটা একটা বিতর্কিত ব্যাপার, তার বিশদে আমি যাব না। তবে এর সঙ্গে কনটেন্টের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমরা ওটা বানিয়েছিলাম ওয়েব সিরিজের খাঁচে। এর পরেই বলব 'জগদ্ধাত্রী'-র কথা। লঞ্চের পর থেকে কখনও সারা বাংলায় টপার, কখনও চ্যানেলে টপার। প্রায় তিন মাস এটা বেঙ্গল টপার ছিল। বাংলা সিরিয়ালে অন্য রকম গল্প সাফল্য পায় না, 'জগদ্ধাত্রী'র সাফল্য জানলে কেউ আর সেটা বলতে পারবেন না। এক বার এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেওছিলাম যে, আমাদের এখানে প্রতিভাবান লেখক অনেকেই আছেন। আমাদের সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত একটু অন্য রকম গল্প লেখার, যাতে একঘেয়েমির অবকাশ থাকবে না। মাঝখানে আমি কাজ ছেড়েই দিতে চাইছিলাম, বোরিং কাজ করব না বলে। চ্যানেলকে বলেছিলাম, অন্য রকম কিছু করতে পারলে তবেই কাজ করব। সেই সুযোগ গুঁরা আমায় দিয়েছেন। এখন চলছে 'মুকুট', যার কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি মেয়ে কম্যাডো। রাত দশটার প্লটে 'মুকুট' সব সময় কান্ডাক্ষিত টিআরপি পাচ্ছে না হয়তো, কিন্তু ওটা ছেলেমানুষি করে বানানো হচ্ছে না। ভীষণ সিরিয়াসলি কাজটা হচ্ছে, ওয়েব সিরিজের মতো করছি। আশা করছি এ ভাবেই আরও অনেকে অন্য রকম গল্প লিখবেন। আমি 'জগদ্ধাত্রী' করার পর দেখলাম, অনেক শোয়েই নায়ক-নায়িকা ডিটেকটিভ হয়ে গেল। সে দিক দিয়ে 'জগদ্ধাত্রী' ট্রেন্ড সেটার। শাশুড়ি-বৌমার চেনা ছক থেকে এ ভাবেই আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে আসব, আসতে হবেই। প্রচুর ভাল লেখক-লেখিকা এখানে আছেন। ফলে আশা রাখাই যায়।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী
লেখক, প্রযোজক



■ ‘গুড্ডি’ ধারাবাহিকের ছবি

টিভি-সিনেমার যে-কোনও ইন্ডাস্ট্রির মতো বাংলাতেও বর্ষে বর্ষে দলে দলে মেয়েরা অভিনয়ে নিজের ছাপ রাখতে চায়। কিন্তু কাজে নেমেই সোজা নায়িকার পার্ট, সে আর জোটে ক’জনের?

কাজ করবে সমানতালে। প্রত্যাশার এই বিপুল চাপ হাসি মুখে নিজের ঘাড়ে নিয়েছে ‘জগদ্ধাত্রী’ সিরিয়ালের মুখ্য চরিত্র, জগদ্ধাত্রী। এই গল্পে জগদ্ধাত্রী আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত ‘আদর্শ বৌ’। কিন্তু বাড়িতে কেউ জানে না, তার বরের মতো জগদ্ধাত্রীও আসলে অপরাধ দমনের কাজে যুক্ত। স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসার সে-ও। কাজের জায়গায় তাকে সবাই চেনে জ্যাজ সান্যাল নামে। এই সিরিয়ালের লেখক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর গল্প নিয়েই ছকভাঙা পথে দৌড়ে চলছে আরও একটি ধারাবাহিক, ‘মুকুট’। যার মুখ্য চরিত্রে আছে এক জন মেয়ে কম্যাডো!

খাঁচার পাখির বনে উড়ান

বলা হয়, মেয়েদের নিজের বাড়ি নেই। নিজের ইচ্ছেয় সে কিছু করতে গেলে তাই তাকে কখনও শুনতে হয় বাবা-মা’র আপত্তি, কখনও মানতে হয় স্বামীর বাড়ির নিষেধ। খাঁচাবন্দি এই মেয়েরা কি তবে কখনও খাঁচার দরজা খুলে খোলা আকাশে উড়ান দেবে না? বাংলা সিরিয়ালের বিচিত্র রঙ্গক্ষেত্রে সেই গল্পও বলা হচ্ছে। ‘কার কাছে কই মনের কথা’ সিরিয়ালে যেমন, গল্পের মুখ্য চরিত্র শিমূল মিত্র ভালবেসে গান গায়। বিয়ের পর স্বশ্রবাবাড়ি এলে সেখানে কিন্তু শিমূলের গান গাওয়ার প্রতিভা কদর পায় না। কহানী মেরু টুইস্ট আসে এর পর, যখন গান গাইতে স্বশ্রবাবাড়ির সমর্থন না পেলেও

শিমূলের পাশে দাঁড়ায় স্বশ্রবাবাড়ির পাড়ার প্রতিবেশী মেয়েরা।

এ কাজটা মেয়েদের নয়

কোন কাজটা মেয়েদের নয়? কোনও কাজ শুধু পুরুষেই করবে, এ নিয়ম কে কবে ঠিক করল? কেউ করেনি। ফলে মেয়েরাও আজ সেই সমস্ত কাজই করছেন, যা সাধারণত পুরুষরা করে থাকেন। বড় শহরে আজ অনেক দিন ধরেই অটো, ট্যাক্সি কিংবা টোটো চালান মেয়েরা। কিন্তু এমন মেয়ের জীবনের গল্প কি মফসসল বা আধা শহরে সিরিয়ালের দর্শকরা নিতে পারবেন? নির্মাতারা এই ঝুঁকি নিয়েছেন ‘টুস্পা অটোওয়ালি’-তে। এই ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্র টুস্পা অটো চালায়। পরিবারে সে এক মাত্র রোজগারে। অটো চালানোর পাশাপাশি সে কলেজেও পড়তে যায়। আমাদের সমাজ এখন অনেক মুক্তমনা, এ কথা আমরা মুখে যতই বলি না কেন, আজও গাড়ি চালকের আসনে কোনও মেয়ে বসছে শুনলে আমাদের মধ্যে অনেকেই সন্দ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। টুস্পা অটোওয়ালি-তেও টুস্পাকে অটো চালাতে দেখে যাত্রীদের মনের দ্বিধা দেখানো হয়েছে। কিন্তু নিজের লক্ষ্যে অনড় থাকে টুস্পা। এগিয়ে চলে নিজের ছন্দে।

নায়িকা-ই বা নয় কেন?

টিভি-সিনেমার যে কোনও ভাষার ইন্ডাস্ট্রির

মতো বাংলাতেও বর্ষে-বর্ষে দলে-দলে মেয়েরা অভিনয়ে নিজের ছাপ রেখে যেতে চায়। কিন্তু কাজে নেমেই সোজা নায়িকার পার্ট, সে আর জোটে ক’জনের? প্রতিনিয়ত লড়াইয়ে অভ্যস্ত এক জুনিয়র আর্টিস্ট মেয়ের গল্প বলে একটা সিরিয়াল, নাম, ‘নায়িকা নম্বর ওয়ান’। এই গল্পের মুখ্য চরিত্রের পুরো নাম শীতলা সিকদার। ছোট করে শীলা। আর পাঁচ থুড়ি, পাঁচশো জন জুনিয়র আর্টিস্টের মতো শীলারও একই স্বপ্ন, এক দিন নায়িকা নম্বর ওয়ান হওয়ার।

সবই তো হল, তবে...

তা হলে বোঝা গেল, বাংলা সিরিয়ালে মেয়েরা আজকাল শুধু সংসারের জন্য



■ ‘মাখবীলতা’ সিরিয়ালের দৃশ্য

প্রাণপাত না করে অনেকেই অন্য রকম কিছু করছেন। বিশেষ করে সম্প্রচার শুরু হওয়ার আগে সিরিয়ালের যে বালক দর্শকের সামনে আসে, তা দেখলে সত্যিই মনে হয় টেলি-সিরিয়ালের জগতে মেয়েদের বুঝি সুদিন এল। কিন্তু সত্যিই কি এল? সিরিয়ালগুলোর গল্প কিছুদিন এগোলে দেখি...

* ‘তুঁতে’ যতই ভাল পোশাক বানাক, বাড়িতে তাকে নিতাদিন সহ্য করতে হয় সং মায়ের অত্যাচার। টাকার লোভে সেই সং মা-ই তুঁতেকে পাঠিয়ে দেয় শহরে। তুঁতে গৃহসহায়িকার কাজ পায় নামী ডিজাইনার লাইডীদের বাড়িতে। গ্রামের মেয়ে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চায় শুনে সে বাড়িতে অনেকেই তুঁতেকে উপহাস করেন।

* ‘এক্সা দোকা’র গল্পে দুই ডাক্তার পোখরাজ, রাধিকা দু’জনেই পরিবারের



উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের গল্প বলে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছে, এমন সিরিয়াল অনেক আছে। ‘মোহর’ সিরিয়ালে দেখানো হয়েছিল, একটি স্কুলে স্টুডেন্ট হয়ে পড়তে এসে এক জন মেয়ে ভবিষ্যতে সেই স্কুলেরই টিচার হয়। মোহর অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। সবার আগে যদি কোনও ছকভাঙা মেয়ে চরিত্রের কথা বলতে হয় তবে সে ‘ইন্টিকুটুম’-এর বাহা। ‘শ্রীময়ী’-ও তাই। এগুলো সবই কাল্ট শো। ‘শ্রীময়ী’ তো এখনও বিভিন্ন ভাষায় চলছে। মানে গল্পটার এখনও আবেদন আছে। ‘কুসুমদোলা’-র কথাও বলব। আমি নিজে সিরিয়াল দেখি না, তাই অন্য সিরিয়ালে কী দেখানো হচ্ছে, আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। আমি শুধু আমার গল্পগুলোর কথা বলতে পারি। এ বার, শুধু এক জন মেয়ের এমপাওয়ারমেন্ট তো একটা গল্পকে সফল গল্প করে তুলতে পারে না। গল্পটাও তো আমাকে ভাল ভাবে বলতে হবে। হতেই পারে, দর্শক কোনও চরিত্রকে খুব পছন্দ করলেন। কিন্তু গল্পটাই কারও মনে ধরল না। উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের গল্প দেখতে পছন্দ করেন এমন অনেকে আছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে কোনও সৃজনশীল ক্ষেত্রেই মানুষের পছন্দ আগে থেকে বুঝে ওঠা অসম্ভব। নানা রকম দর্শক আছেন। তাঁদের নানা রকম জিনিস ভাল লাগাই স্বাভাবিক। কোন গল্প কখন কাকে উপকে যাবে, সেটা একান্তই নির্ভর করে গল্পকারের মনশিয়ানার উপর। আমরা কিন্তু সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ বানাচ্ছি না। গল্পটাকে বুনতে বুনতে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমি নিজে যেমন মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প বলতে ভালবাসি। আবার আমি যেহেতু মেয়েদের নিয়ে একটা কাজও করি (লীনা গঙ্গোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন), তাই মেয়েদের এমপাওয়ারমেন্ট আমাকে খুব টানে। আমার নিজের চার পাশে যা দেখি, তা-ই লেখার চেষ্টা করি।

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
লেখক, প্রযোজক

মুখ চেয়ে একে অন্যকে টেকা দিতে চায়। রাধিকা এক সময় পোখরাজকে বিয়ে করে। কিন্তু রাধিকা ভাত্তারি পড়ার জন্য নিজের স্বশুরবাড়ির সম্মতি পায় না। এই মতান্তরের জেরে রাধিকা-পোখরাজের বিয়ে টেকে না। ডিভোর্সের পর দুই পরিবারে তিক্ততা বাড়ে।

* ‘গুড্ডি’র গল্পও অনেক আশা জাগিয়েও বরাবরই অপ্রত্যাশিত বাঁক নিয়ে আলোড়ন তুলেছে খুব। গল্পের মুখ্য চরিত্র গুড্ডি জড়িয়ে পড়েছে ত্রিকোণ প্রেমে। সেই ত্রিকোণ প্রেমেও, অনেকে বলেন, ক্রমে ঢুকে পড়েছে অচেনা যত বিচিত্র জটিলতা। * ‘নায়িকা নম্বর ওয়ান’-এ জীবনে চলার পথে শীলা বহু বাধার সন্মুখীন হলেও সে তার সবই উপকে যায় হাসি মুখে। কিন্তু কালক্রমে তার জীবনে আসে শুদ্ধ, যার



■ ‘মুকুট’ সিরিয়ালের দৃশ্য

জেরে জুনিয়র আর্টিস্ট শীলার জীবনে উপস্থিত হয় এক অদ্ভুত অস্তিত্ব সঙ্কট! অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রেই গল্পের গরু অচেনা রাস্তায় স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে না পেয়ে গুঁতো মেরে ঢুকে পড়েছে প্রেম, অপ্রেম, বিয়ে, সংসারের সেই চেনা মাঠেই।

এমতাবস্থায় বাংলা সিরিয়ালে যা দেখানো হচ্ছে, তা আমাদের আশপাশে সত্যি-সত্যি হচ্ছে নাকি আমাদের আশপাশে যা হচ্ছে, তা মোটেই দেখানো হচ্ছে না সিরিয়ালে—

স্বাদের গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের ক্ষমতায়নকেও ছুঁয়ে যেতে। বিপুল সংখ্যক দর্শকের আশীর্বাদধন্য বাংলা সিরিয়ালের হাতে ক্ষমতা আছে, গল্পের ছলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর। মেয়ে মানেই দুর্বল, মেয়ে মানেই সংসারের জন্য বলিপ্রদত্ত,



■ ‘টুপ্পা অটোওয়ালি’ সিরিয়ালের পোস্টার



■ ‘জগদ্ধাত্রী’ সিরিয়ালের পোস্টার

বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গল্পের গরু অচেনা রাস্তায় স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে গুঁতো মেরে ঢুকে পড়েছে প্রেম অপ্রেম বিয়ে সংসারের সেই চেনা মাঠেই।

এই তর্ক চলবে। তবে গত ক’বছর ধরে যে বিভিন্ন ভাষার মতো বাংলাতেও সিরিয়ালে সিনেমায় নাটকে মেয়েদের চেনা ছকের বাইরে বেরোতে দেখা যাচ্ছে, এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। সিরিয়ালের লেখক-নির্মাতারাও চেষ্টা করছেন নানা

মেয়ে মানেই তাকে হতে হবে দশভুজা— একপেশে এই ধারণাগুলো এক জন মানুষের মন থেকেও যদি দূর করতে পারে কোনও বাংলা সিরিয়াল, টিআরপি-র ইদুরদৌড়ের উর্ধ্বে উঠে সেটাই হবে তার সবচেয়ে বড় সাফল্য।

দেখে অবাক হয়ে যাই

হলিউডের এই এক মজা!
কাউকে দেখেই বলতে পারবেন
না, ‘ইনি অভিনয়টা না ঠিক
পারেন না...’ আজ যিনি নবীন,
পরের ছবিতেই প্রাঞ্জের মতো
অভিনয় করছেন! আর কিছু
নায়ক তো যুগ-যুগ ধরে মনের
কোণে বসত করছেন...

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও

ডিক্যাপ্রিও সকলের
‘প্রিয়’ বললে ভুল হয়
না। মার্টিন স্করসেসির
প্রিয় এই অভিনেতা
যে কখন কাকে মন
দিয়ে ফেলেন, সেটা
বোঝা দায়। এমনিতে
তাঁর স্টেটাস ‘সিঙ্গেল’!



ব্র্যাড পিট

সন্তানদের কাস্টডির
ঝামেলা মিটেতেই,
ঝাড়া হাত-পা হয়ে
প্রেমের খেলায়
নেমে পড়েছেন
'ব্র্যাড পিট' নামের
সেক্স সিম্বল।

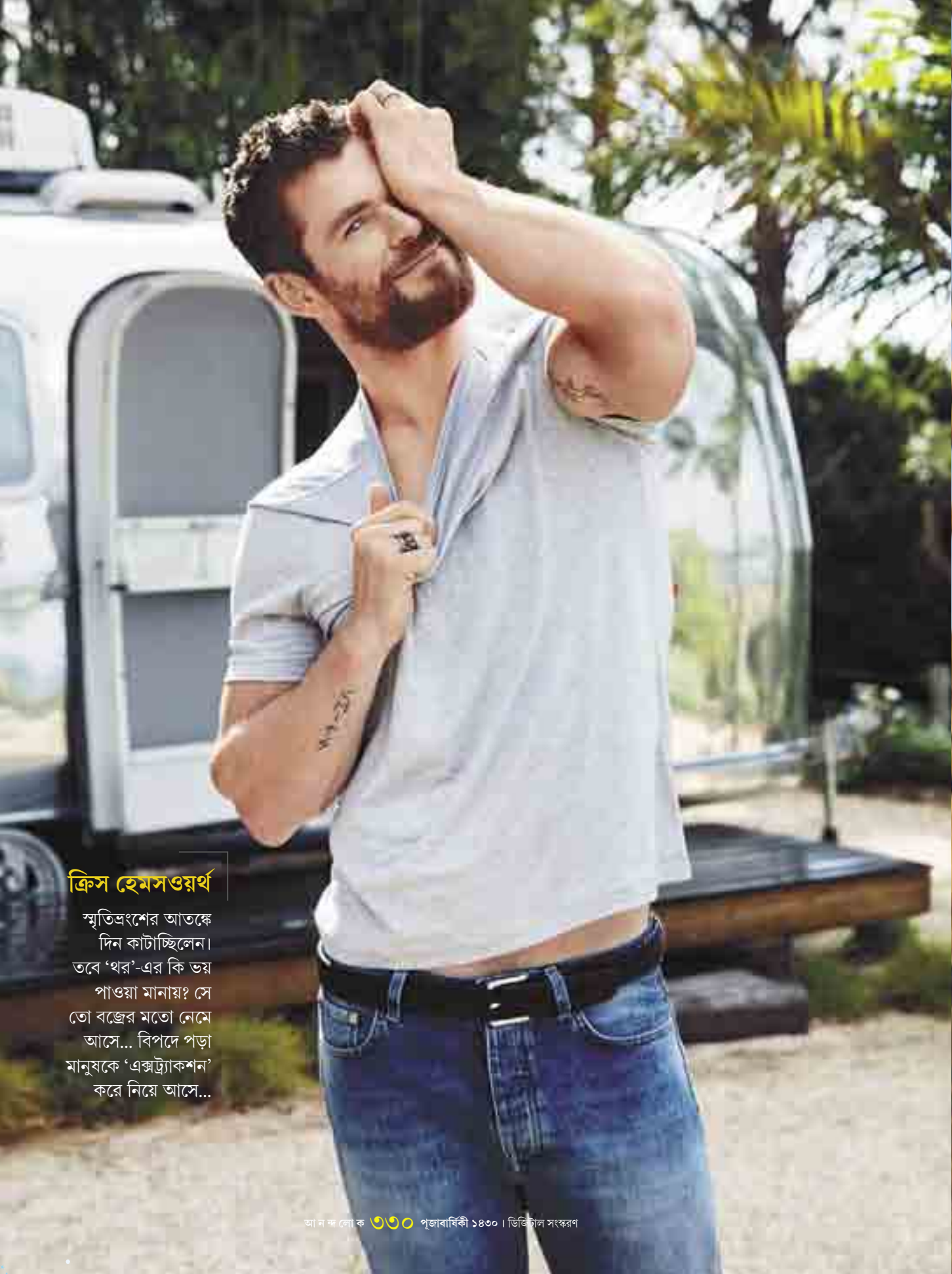
কিলিয়ান মার্কি

বরাবর একটু আড়ালে
থাকতে ভালবাসেন।
'পিকি ব্লাইন্ডার্স'-এ
প্রচুর জনপ্রিয়তা
কুড়িয়ে আবার লুকিয়ে
পড়েছিলেন। কিন্তু
'ওপেনহাইমার'-কে
কি নেপথ্যে রাখা যায়?

A close-up photograph of a man with short, dark hair and blue eyes, wearing a white lab coat. He is holding a clear glass to his lips and drinking. The background is a plain, light-colored wall. The lab coat has 'D.C.' embroidered on the lower right side.

ড্যানিয়েল ক্রেগ

তিনি আর জেমস
বন্ড হবেন না তো
কী হয়েছে, 'নাইভস
আউট'-এর ক্ষুরধার
গোয়েন্দা বেনোয়া
ব্লাঁ হয়েই কুপোকাত
করছেন সকলকে।



ক্রিস হেমসওয়ার্থ

স্মৃতিভ্রংশের আতঙ্কে
দিন কাটাচ্ছিলেন।
তবে 'থর'-এর কি ভয়
পাওয়া মানায়? সে
তো বজ্রের মতো নেমে
আসে... বিপদে পড়া
মানুষকে 'এক্সট্রাকশন'
করে নিয়ে আসে...

ক্রিস্চান বেল

‘গিরগিটি’ বিশেষণটা
যে প্রশংসাসূচক হতে
পারে, তার প্রমাণ এই
ভদ্রলোক। প্রতিটি
ছবিতে নিজের লুক
এমন বদলান তিনি যে,
তাঁকে গিরগিটি ছাড়া
কিছু বলা যায় না!

ক্রিস ইভান্স

পৃথিবীর ‘সেক্সিয়েস্ট
ম্যান’-এর মন যে
পর্তুগিজ অভিনেত্রী
অ্যালবা ব্যাপতিস্তাতে
বাঁধা পড়েছে! তা
জেনে হৃদয়ভঙ্গ
হয় কোটি কোটি
মহিলার। তাই বলে
ইনি আজীবন সিঙ্গেল
থাকবেন নাকি?

রবার্ট প্যাটিনসন

চকোলেট বয় থেকে
নিজের যে ডার্ক ইমেজ
তৈরির চেষ্টা করছেন
রবার্ট, 'ব্যাটম্যান'
তাতে সিলমোহর
দিলেও চোখের ওই
প্রেমিকভাব লুকোবেন
কী করে?



অস্টিন বাটলার

‘এলভিস’ করার
পর থেকে নাকি
প্রেসলির কণ্ঠেই
কথা বলছিলেন।
তাই আপাতত
বিরতি নিয়েছেন
নিজেকে ‘অস্টিন’-এ
ফেরানোর জন্য।
মহিলা ভক্তরা অবশ্য
ততদিন অপেক্ষা
করতে রাজি নন!



অ্যাড্ৰু গারফিল্ড

অ্যাড্ৰু যেন
অভিনেতা হিসেবে
অন্য উচ্চতায় নিয়ে
গিয়েছেন নিজেকে।
তবে থাকতে
ভালবাসেন মাটির
কাছাকাছি, প্রকৃতির
মাঝে, বরাবর।

তুমি সুন্দর হে

সৌন্দর্য তাঁদের প্রিয় সহচরী।
তবে অভিনয় দক্ষতার
সঙ্গে নিত্যদিনের দাম্পত্য।
হলিউডের এই সুন্দরীরা
রূপে-গুণে আশ্চর্য করে
দেখ দর্শককে

অ্যান হ্যাথওয়ে

তিনিই নাকি হতেন
'বার্ভি'। কিন্তু তাঁর সেই
'প্রিন্সেস ডায়েরিজ'-
এর জনপ্রিয়তাই হল
কাল... না হলে এখনও
পুতুল-সুন্দরী হিসেবে
ভক্তদের মনে স্থায়ী
হতে পারেন!



গ্যাল গ্যাডট

গ্যাল গ্যাডট সৌন্দর্য
প্রতিযোগিতার ফসল।
কিন্তু এই ইজরায়েলি
সুন্দরী দর্শকের মন জয়
করেছেন নিজের ব্যক্তিত্বে।
কারণ প্রতিযোগিতায়
তিনি জেতেননি। যিনি
জিতেছিলেন, হারিয়ে
গিয়েছেন কোথায়
কে জানে!

মার্গো রবি

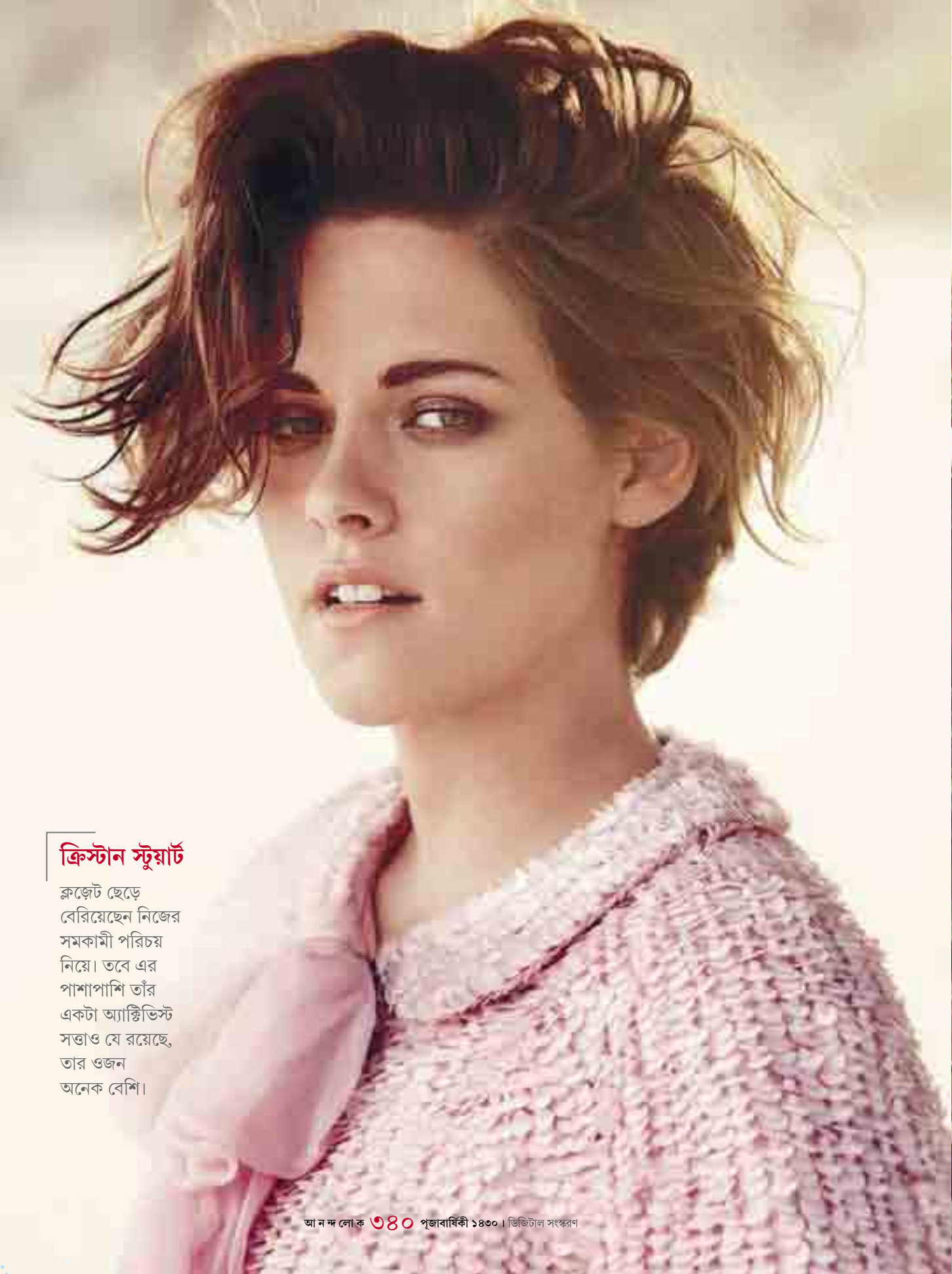
কখনও তিনি 'হার্লে
কুইন', কখনও
গুপ্তচর 'নেলি লা
রয়'... তবে 'বার্বি'
তাকে যে জনপ্রিয়তা
দিয়েছে, আপাতত
তাঁর ধারেকাছে
যেতে পারাও
সৌভাগ্যের ব্যাপার...



A close-up photograph of Scarlett Johansson lying on her back in a field of tall, green grass. She is looking directly at the camera with a slight smile. Her blonde hair is styled in loose waves. She is wearing several colorful, patterned bangles on her right wrist. The lighting is bright and natural, suggesting a sunny day outdoors.

স্কারলেট ইয়োহানসন

আবেদনের কথা
উঠলে পুরনো সুরার
মতোই উঠে আসে
স্কারলেটের নাম।
কারণ বলে দিতে
হবে কি? নিজেই
খুঁজে নিন না
ওই চোখে!



ক্রিস্টান স্টুয়ার্ট

ক্লজেট ছেড়ে
বেরিয়েছেন নিজের
সমকামী পরিচয়
নিয়ে। তবে এর
পাশাপাশি তাঁর
একটা অ্যাক্টিভিস্ট
সত্তাও যে রয়েছে,
তার ওজন
অনেক বেশি।

ত্রি লারসন

অভিনয়ের জাত
তো আগেই
চিনিয়েছিলেন।
কিন্তু এবার
বুঝি জনপ্রিয়তা
চান তিনি।
তাই 'ক্যাপ্টেন
মার্ভেল'-এর পর
হয়ে উঠেছেন
'ফাস্ট অ্যান্ড
ফিউরিয়াস'

এমিলি ব্লান্ট

সন্তানদের চাহিদায়
'জাঙ্গল ব্রুজ'
করেছিলেন। এবার
নিজের অভিনয়ের
খিঁদে মেটাতে হয়েছেন
ওপেনহাইমার-ঘরণী।
তবে সিনেমা শেষ হতেই
আবার ঢুকে পড়েছেন
ঘরের ভিতর।

ফ্লোরেন্স পিউ

তাঁর জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সুন্দরী, সু-অভিনেত্রী...
হবে না? তবে
'ওপেনহাইমার'-এ তাঁর
নগ্ন শরীরে এদেশে যে
দৃষ্টিকটু কালো পোশাক
পরানো হল, তা তিনি
জানতেই পারলেন না!

জেভায়া

জেভায়া যেন ‘মাস’
এবং ‘ক্লাস’-এর মধ্যে
ব্যালেন্স করে চলা
এক নারী। একদিকে
জনপ্রিয় ফ্যাশগাইডের
মুখ হচ্ছেন, অন্যদিকে
বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অবাক
করছেন... এই বয়সে
এই প্রজ্ঞা আসে
কোথা থেকে?

